সূচী

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—শ্রীযুক্ত সুধীশ চন্দ্র পাল মহাশয় আমাদের অন্যতম এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীকুমুদনলিনী রায়চৌধুরী সম্পাদিত

ক্যালকাটা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,—৬৫ নং সার্পেণ্টাইন লেন, কলিকাতা হইতে

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মহাত্মা গান্ধী ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে

মহাত্মা গান্ধী

আধুনিক কালে ভারতবর্ষের মধ্যে বহু বৎসর যুদ্ধ হয় নাই। মোপ্‌লা বিদ্রোহকে শেষ যুদ্ধ বলা যাইতে পারে। ইহাতেও স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ না হইলেও দাঙ্গা হাঙ্গামা ও ডাকাইতি এ-দেশে এখনও হইয়া থাকে। এবং তাহাতে স্ত্রীলোকদিগকে অত্যাচার ও লাঞ্ছনা খুবই সহ্য করিতে হয়। অত্যাচার হইতে রক্ষা করা পুলিশের কাজ, কিন্তু কখন কখন তাহারাই অত্যাচারী হইয়া থাকে।

বাংলাদেশের সর্ব্বাপেক্ষা লজ্জা ও দুঃখের কথা এই যে, এখানে গৃহস্থের বাড়ীর মধ্য হইতে, রাত্রে, সন্ধ্যায় এমন কি দিনে দুপুরে, কখন কখন স্বামী পিতা ভ্রাতার সম্মুখ হইতে অপহৃতা হন।

নারীদের এইরূপ দুর্গতি যে দেশে ও যেখানে হয়, তথাকার কতকগুলা লোক দুর্ব্বৃত্ত ও পশুপ্রকৃতি এবং অন্য কতকগুলা লোক দুর্ব্বল ও কাপুরুষ।

বস্তুতঃ, নারীদিগকে প্রায় সব সময় বা বেশীর ভাগ সময় অন্তঃপুরে রাখিবার সপক্ষে যে যুক্তি দেখান হয়, যে, নতুবা তাহাদের মান ইজ্জৎ সম্ভ্রম থাকিবে না, সেই যুক্তির মধ্যেই ইহা উহ্য রহিয়াছে, যে, দেশের বহুসংখ্যক লোক এরূপ জঘন্য প্রকৃতির যে তাহারা সুযোগ পাইলেই স্ত্রীলোকদিগের অনিষ্ট করিবে, এবং যাহারা অনিষ্ট করিবে না তাহারা এরূপ বলহীন ভীরু ও কাপুরুষ, যে, তাহাদের দ্বারা নারীর রক্ষার আশা নাই। সুতরাং অবরোধপ্রথা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে।

সমুদয় পৃথিবীতে নরমাংস ভোজনের বিরুদ্ধে যেমন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্কার ও লোকমত জন্মিয়াছে, নারীর উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধেও তেমনি একটি প্রবল সংস্কার ও লোকমত বদ্ধমূল হইলে বুঝিব, যে পৃথিবীর লোক সভ্য হইয়াছে।

বাংলা দেশের দুর্গতি দূর করিতে হইলে প্রত্যেক সমর্থ পুরুষকে নারীর মান সম্ভ্রম রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিতে হইবে ; এবং যাঁহারা অবিবাহিত, এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইবার মত সাহস ও বল তাঁহাদের না থাকিলে তাঁহাদিগকে আমরণ অবিবাহিত থাকিতে হইবে।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

অনন্ত আশ্রয়

বহু দুঃখ দেছ বলি, করি অভিমান
ফিরায়ে কি রব মুখ, হে আমার নাথ,
ঠেলে প্রসারিত বাহু? সহায়ে আঘাত
অবশেষে এনে যদি থাক অন্ত দান,
আনন্দ কি আশীর্ব্বাদ,—করি প্রত্যাখ্যান
চলে যাব? না, না, প্রভো, জুড়ি দুই হাত
দাঁড়াইনু নতশির। তব বজ্রপাত
অমৃত বর্ষণ আর সমান কল্যাণ।

আনন্দ দিয়াছ যত সে তো পুরস্কার
নহে মোর কোন পুণ্য, কোন যোগ্যতার ;
বেদনা দিয়াছ যত, তাও সব নয়
আমার পাপের শাস্তি। ওহে পূর্ণজ্ঞান,
পূর্ণপ্রেম, কি বুঝিব তোমার বিধান ?
শুধু জানি তুমি মোর অনন্ত আশ্রয়।

শ্রীকামিনী রায়।

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

আমাদের আলোচ্য বিষয় ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস। সভ্যতা-বিকাশের দিক্ দিয়া ইউরোপের আধুনিক ইতিহাসের একটা মোটামুটি আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য। এই সভ্যতার মূল কোথায়, কোন্ পথে ইহার উন্নতি হইল, ইহার লক্ষ্য কোন্ দিকে, ইহার প্রকৃতি কি, এই সকল প্রশ্ন সম্মুখে রাখিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

"ইউরোপীয় সভ্যতা" বলিয়া যে কথাটি ব্যবহার করিলাম, তাহা নিরর্থক নহে। বাস্তবিক-পক্ষে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সভ্যতার মধ্যে এমন একটা ঐক্য আছে, যাহা লক্ষ্য করিলে "ইউরোপীয় সভ্যতা" বলিয়া একটা স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নানা-প্রকার স্থান, কাল, অবস্থাভেদ সত্বেও এই সভ্যতা সর্ব্বত্র একই প্রকার ঘটনা সমাবেশে উদ্ভূত হইয়াছে, একই মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছে এবং প্রায় সর্ব্বত্র একই প্রকার ফল প্রসব করিয়াছে। ইউরোপের এই সার্ব্বদেশিক সভ্যতার দিকেই আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই।

আবার ইহাও সুস্পষ্ট যে, এই সভ্যতার মূল ইউরোপের কোন একটি দেশের ইতিহাসের মধ্যে আবিষ্কার করা যায় না। ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস একদিকে যেমন সংক্ষিপ্ত ও অল্পকালব্যাপী, অন্য দিকে ইহার বৈচিত্র্য তেমনি বিস্ময়কর। কোন একটি দেশে ইহা সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করে নাই। ইহার সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ রূপ [illegible] করিতে হইলে, বহুদূর দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে হইবে। ইহার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিবার জন্য কখনও ফ্রান্স, কখনও ইংলণ্ড, কখনও জার্ম্মাণী, কখনও বা স্পেনে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

তবে ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনার পক্ষে ফ্রান্সের অধিবাসিবর্গের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে। কারণ, ফ্রান্স বরাবর ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া আসিয়াছে। আমি এ কথা বলিতে চাহি না যে, ফ্রান্স সকল সময়ে এবং সকল দিক্

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য "সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রন্থাবলী"র অন্তর্গত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

দিয়া সমগ্র ইউরোপীয় জাতির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে। কোন কোন যুগে ইটালী কলা-শিল্পের ক্ষেত্রে ফ্রান্সকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে; কখনও বা ইংলণ্ড রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দিক্ দিয়া অধিকতর উন্নতিসাধন করিয়াছে। এইরূপ বিশেষ বিশেষ যুগে ইউরোপের অন্যান্য জাতি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ফ্রান্স অপেক্ষা অধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, যখনই ফ্রান্স দেখিয়াছে যে, অন্য কোন জাতি তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতেছে, তখনই সে নবীন উদ্যমে অক্লান্ত চেষ্টায় অল্পকালের মধ্যেই সকলের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে—ইউরোপের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, ইহাও দেখা যায় যে, যখনই কোন নূতন ভাব বা প্রতিষ্ঠান দেশবিশেষে উদ্ভূত হইয়া সমগ্র ইউরোপে ব্যাপ্তি ও সফলতা লাভ করিতে চাহিয়াছে, তখনই সেগুলিকে একবার ফ্রান্সের মাটিতে নূতন করিয়া তৈয়ারী হইতে হইয়াছে, এবং এই ফ্রান্স হইতে একপ্রকার নবজীবন লাভ করিয়া তাহারা ইউরোপ জয় করিতে বাহির হইয়াছে। এমন কোন মহান্ ভাব নাই, সভ্যতার এমন কোন মূলসূত্র নাই, যাহা ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িবার পূর্ব্বে, এইরূপে ফ্রান্সের ভিতর দিয়া যায় নাই।

তাহার কারণ এই। ফরাসী জাতির চরিত্রের মধ্যে এমন একটা সামাজিক সৌহৃদ্যের ভাব আছে, এমন একটা সহানুভূতির ক্ষমতা আছে, যাহাতে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ফরাসী জাতি সহজে ও অবাধে সর্ব্বত্র প্রসার লাভ করিতে সমর্থ হয়। তাহাদের ভাষার গুণেই হউক, তাহাদের চিন্তার বিশিষ্ট ভঙ্গীর দরুণই হউক, বা তাহাদের মার্জ্জিত শিষ্টাচারের দরুণই হউক, এটা নিশ্চয় যে, ফরাসীজাতির চিন্তা ও ভাব অন্যান্য জাতির চিন্তা ও ভাব অপেক্ষা অধিক-পরিমাণে প্রাঞ্জল, সুস্পষ্ট ও জনসাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য হয় এবং সেই জন্য লোকসমাজে সহজেই প্রসার লাভ করে। এক কথায় প্রাঞ্জলতা, সামাজিকতা ও সহানুভূতিক্ষমতা, এই তিনটি গুণ লইয়াই ফ্রান্সের জাতীয় প্রকৃতির বিশেষত্ব এবং এই গুণেই ফ্রান্স ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে নেতৃস্থান অধিকার করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে।

সুতরাং ইউরোপীয় সভ্যতার মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিতে হইলে, ফ্রান্সকেই আমাদের আলোচনার কেন্দ্রস্বরূপ অবলম্বন করিতে হইবে।

এইখানে কতকগুলি গোড়াকার কথা পরিষ্কার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। কিছুদিন হইতে একটা কথা উঠিয়াছে যে, বাস্তব তথ্য ও বাস্তব ঘটনাবলীর যথাযথ বিবরণ প্রদান করাই ইতিহাসের একমাত্র কর্ত্তব্য। তথ্যের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া ইতিহাসের পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা। ইহা যথার্থ কথা, সন্দেহ নাই, কিন্তু এটা মনে রাখিতে হইবে যে, সাধারণে আপাতদৃষ্টিতে যে সকল তথ্যকে ইতিহাসের একমাত্র বিষয় বলিয়া মনে করিতে চাহেন, তাহা ছাড়া আরও বহুসংখ্যক ও বহুপ্রকারের তথ্য আছে, যাহা ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য। সকল তথ্যই একশ্রেণীর নহে। এমন অনেক তথ্য ও ঘটনা আছে, যাহা বাহ্য ও সহজে প্রত্যক্ষগোচর—যথা, যুদ্ধ, বিগ্রহ ও রাষ্ট্রশক্তিপ্রবর্ত্তিত নানা বাহ্য অনুষ্ঠান। আবার অনেক তথ্য আছে, যাহা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জগতের তথ্য। যদিও ইহারা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম, সহজে বাহির হইতে চোখে পড়ে না, তথাপি ইহারা কাল্পনিক নহে, সম্পূর্ণরূপে বাস্তব।

আবার একদিকে যেমন এমন অনেক ঘটনা আছে, যাহা স্বতন্ত্র, দেশকালনির্দ্দিষ্ট, সংজ্ঞাবিশিষ্ট, তেমনি অপর দিকে এমন অনেক ঘটনা আছে, যাহারা ব্যাপক, যাহারা কোন বিশেষ সংজ্ঞার দ্বারা চিহ্নিত নয়, যাহাদের সন তারিখ নির্দ্দেশ করা যায় না, যাহাদিগকে কোন নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না, অথচ যাহাদিগকে ইতিহাস হইতে বাদ দিলে, ইতিহাস অঙ্গহীন হইয়া পড়ে।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পরস্পর সম্বন্ধনির্ণয় ও যোগসূত্র আবিষ্কার, তাহাদের কার্য্য-কারণবিচার—এক কথায় আমরা যাহাকে ইতিহাসের তত্ত্বাংশ বলিয়া থাকি—এ সমস্তই ইতিহাসের বিষয়ীভূত এবং যুদ্ধ-বিগ্রহাদি বাহ্য ঘটনার বিবরণ অপেক্ষা ঐতিহাসিকতার হিসাবে কোন অংশে ন্যূন নহে। এই সকল সূক্ষ্ম তথ্যের যথাযথ বিবৃতি ও বিশ্লেষণ করা বা ইহাদিগকে সুস্পষ্ট ও জীবন্ত রঙ্গে ফুটাইয়া তোলা যে অপেক্ষাকৃত দুরূহ ও শ্রমসঙ্কুল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুরূহ বলিয়া ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিবার উপায় নাই। কারণ, এইগুলিই ইতিহাসের সারাংশ।

আমরা যাহাকে সভ্যতা বলি, তাহা এইরূপ একটি সূক্ষ্ম, জটিল, ব্যাপক ও নিগূঢ় ঐতিহাসিক তথ্য। ইহার বিবরণ দেওয়া কঠিন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার একটি বাস্তব সত্তা আছে, ইতিহাসে স্থান পাইবার অধিকার আছে। আমরা ইহার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারি। এ প্রশ্ন উঠিতে পারে এবং উঠিয়াছে যে, এই সভ্যতা জিনিষটা ভাল কি মন্দ,—কেহ বা ইহাকে লইয়া আনন্দে উন্মত্ত, কাহারও নিকট বা ইহা আক্ষেপের বিষয়। এই সভ্যতা জিনিষটা কি বিশ্বজনীন, না বিশেষ বিশেষ দেশ বা যুগের মধ্যে ইহার গণ্ডী আবদ্ধ? সমগ্র মানব জাতির এক সাধারণ সভ্যতা, বিশ্বমানবের এক সাধারণ নিয়তি বলিয়া একটা কিছু আছে কি? বিভিন্ন মানবজাতি যুগে যুগে এমন কিছু কি রাখিয়া যাইতেছেন, যাহার বিনাশ নাই, যাহা কালে কালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বিশাল হইতে বিশালতর আকার ধারণ করিতেছে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত যাহার গতির বিরাম নাই? আমার ত দৃঢ়বিশ্বাস যে, বাস্তবিকই বিশ্বমানবের একটা সাধারণ নিয়তি আছে, মানবসভ্যতা যুগে যুগে নানা জাতির মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইয়া ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিতেছে, এবং এই বিশ্বমানব-সভ্যতার বিরাট ইতিহাস লিখিত হইবার যোগ্য। যাহা হউক, এসব বড় বড় প্রশ্ন উত্থাপন করিব না, এটুকু বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করিবেন যে, যদি আমরা দেশ ও কালের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আমাদের আলোচনা আবদ্ধ করিয়া লই, যদি কোন একটি জাতির নির্দ্দিষ্ট কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস লইয়া আমরা গবেষণায় প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে এই সভ্যতার ইতিহাস রচনা একেবারে অসম্ভব চেষ্টা হইবে না। শুধু তাহাই নহে, এই ইতিহাসই শ্রেষ্ঠ ইতিহাস, সমস্ত ইতিহাসই এই ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। বাস্তবিক পক্ষে, আপনাদিগের কি ইহা মনে হয় না যে, যাবতীয় ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনার একমাত্র পরিণতি এই সভ্যতায়। বাণিজ্য বলুন, শিল্প বলুন, যুদ্ধ-বিগ্রহ বলুন, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান বলুন, শাসন-ব্যবস্থা বলুন যখনই তাহাদিগকে সমষ্টিভাবে দেখিবার চেষ্টা করা যায়, যখনই তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা যায়, যখনই তাহাদিগকে পরীক্ষা ও বিচার করিবার

সময় হয়, তখনই আমাদিগকে প্রশ্ন করিতে হয়—ইহারা কে, কি পরিমাণে জাতিবিশেষের সভ্যতাকে গঠিত ও পরিপুষ্ট করিয়াছে, সভ্যতার উপর তাহারা কি পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এইরূপেই আমরা জাতীয় জীবনের অঙ্গস্বরূপ এই সকল ব্যাপার সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ ধারণা করিতে সমর্থ হই, তাহাদের যথার্থ মূল্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হই। তাহারা যেন এক একটি নদী, জাতীয় সভ্যতার মহাসমুদ্রে তাহারা কে কতটুকু জল আনিয়া দিল, তাহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। কথাটা যে কত সত্য, তাহা একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। রাজশাসনে যথেচ্ছাচারিতা বা অরাজকতা—উভয়ই জাতীয় জীবনের পক্ষে অকল্যাণকর বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন, কেহই ইহাদিগকে বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। কিন্তু যদি কোনরূপে গৌণভাবে এই যথেচ্ছতন্ত্র বা অরাজকতার দ্বারা জাতীয় সভ্যতার কোনরূপ পরিপুষ্টি সাধিত হয়, যদি তাহারা জাতিকে উন্নতির পথে কিছুমাত্র অগ্রসর করিয়া দিয়া থাকে তাহা হইলে, আমরা কিয়ৎপরিমাণে তাহাদিগকে মনে মনে ক্ষমা করিয়া থাকি, তাহাদের অন্যায় অত্যাচার উৎপীড়ন আমরা কতক পরিমাণে উপেক্ষা করিয়া থাকি। অর্থাৎ যেখানেই আমরা পরিণামে সভ্যতা দেখিতে পাই, সেখানেই সেই সভ্যতার খাতিরে আমরা পূর্ব্বগামী দুঃখ কষ্ট অপমান সমস্তই ভুলিয়া যাইতে চাই।

আবার কতকগুলি ঐতিহাসিক তথ্য আছে, যাহার সহিত সামাজিক জীবনের মুখ্য সম্বন্ধ নাই, যাহা মুখ্যতঃ মানুষের ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ জীবনের সহিত জড়িত, যথা ধর্ম্মবিশ্বাস, দার্শনিক তত্ত্ব, বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলাশিল্প। মানুষের নৈতিক উন্নতি বা মানসিক তৃপ্তি-সাধন ইহাদিগের প্রধান লক্ষ্য, সামাজিক উন্নতি-সাধন তত নহে।

ধর্ম্ম সর্ব্বদেশে মানুষকে সভ্য করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া গৌরব করিয়া থাকে। বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলাশিল্প, ইহারাও অল্পাধিকপরিমাণে এই গৌরবের অংশ দাবী করিয়া থাকে। যখনই আমরা এই দাবী স্বীকার করিয়াছি, যখনই আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে, ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান বা শিল্পের দ্বারা মানব-সভ্যতার পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে, তখনই আমরা মনে করিয়াছি যে, এতদ্দ্বারা ধর্ম্ম-সাহিত্যাদিরই গৌরববৃদ্ধি হইল। ধর্ম্ম-সাহিত্যাদি স্বপ্রতিষ্ঠ, তাহাদের মহত্ত্ব বা মূল্য আপেক্ষিক নহে। বাহ্য ফলাফল বিচার করিয়া তাহাদের মূল্য নিরূপণ হয় না। মানুষের আত্মার সহিতই তাহাদের মুখ্য সম্বন্ধ। এমন যে অন্তরঙ্গ বস্তু, সভ্যতার সংস্পর্শে ইহাদেরও মূল্য বৃদ্ধি হয়। শুধু যে মূল্য বৃদ্ধি হয়, তাহা নহে; অনেক সময় কেবল সভ্যতার উপর কে কি পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, বিশেষ ভাবে সেই দিক্ দিয়াই ধর্ম্ম, দর্শন, সাহিত্যাদির বিচার করিতে হয় এবং বিশেষ বিশেষ সময়ে কেবল সভ্যতার দিক্ দিয়াই তাহাদের চূড়ান্ত মূল্য নির্ণয় করিতে হয়।

এখন তাহা হইলে সভ্যতার ইতিহাস আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে একবার দেখা যাউক, এই সভ্যতাবস্তুর স্বরূপ কি?

সভ্যতা (Civilisation) কথাটি বহুকাল হইতে বহুদেশে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সাধারণতঃ লোকে যে অর্থে কথাটি ব্যবহার করে, তাহা অল্পাধিক পরিমাণে ব্যাপক ও স্পষ্ট। যাহাই হউক, কথাটির যখন ব্যবহার আছে, তখন ইহার একটা যেমন হউক, অর্থও আছে।

ইহার সর্ব্বজন-প্রচলিত সহজবুদ্ধিগোচর যে লৌকিক অর্থ, তাহাই আমাদিগকে বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে হইবে। কারণ, এই সকল ব্যাপক শব্দের যে লৌকিক অর্থ তাহা প্রায়ই বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার অপেক্ষা সুনির্দ্দিষ্ট হয়। কোন শব্দের লৌকিক অর্থ সমগ্র সমাজের বহুকালার্জ্জিত অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ। কিন্তু বিজ্ঞানের দ্বারা আমরা শব্দের যে সংজ্ঞা প্রস্তুত করিয়া লই, তাহা ব্যক্তিবিশেষ বা অল্পসংখ্যক লোকের অভিজ্ঞতার ফল; বিশেষ কোন একটা সত্যের অনুভূতি হইতে এই সকল সংজ্ঞার উৎপত্তি। সেই জন্য শব্দের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা প্রায়ই লৌকিক সংজ্ঞা অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ ও একদেশদর্শী হয়। সুতরাং সমগ্র মানব-জাতির সাধারণ বুদ্ধি অনুসারে এই Civilisation শব্দটির মধ্যে যতগুলি ভাব অনুস্যূত আছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমরা সভ্যতা বস্তুটির প্রকৃত পরিচয়-লাভের দিকে অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারিব। সভ্যতা শব্দের একটা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করিয়া আমরা ততদূর অগ্রসর হইতে পারিব না।

প্রথমে আমি আপনাদের সম্মুখে কতকগুলি কাল্পনিক সমাজের চিত্র ধরিতে চাই। এই চিত্রগুলি একে একে বিচার করিয়া দেখা যাউক যে, লোকসাধারণে সভ্য সমাজ বলিলে যাহা বুঝে, তাহা এর মধ্যে কোন্ চিত্রের সঙ্গে মিলে।

প্রথমে এমন একটি সমাজ কল্পনা করা যাউক, যেখানে বাহ্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন অভাব নাই, রাজকর পরিমাণে অল্প, বিচার-ব্যবস্থা সুপরিচালিত, এক কথায় যেখানে লোকের বাহ্য জীবনযাত্রা পরমসুখে ও সুনিয়মে পরিচালিত হয়। কিন্তু সেখানে অপর দিকে লোকের নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবন স্ফূর্ত্তি লাভ করিবার সুযোগ পায় না; এমন কি, এগুলিকে জোর করিয়া চাপিয়া রাখা হয়, মানুষের বুদ্ধি, বিবেক কল্পনাকে চিরকালের জন্য জড় ও অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখার জন্য বিধিমত চেষ্টা করা হয়। এরূপ সমাজের চিত্র ইতিহাসে নিতান্ত বিরল নহে। এমন অনেক অভিজাততন্ত্র রাষ্ট্র দেখা গিয়াছে, যেখানে জনসাধারণ মেষপালের ন্যায় সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত পালিত হইয়াছে, কিন্তু মানসিক বা নৈতিক উন্নতির অবসর পায় নাই। এই চিত্র কি সভ্যতার চিত্র? এই সমাজ কি সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে?

এইবার অন্য একটি সমাজের চিত্র কল্পনা করা যাউক। এখানে লোকের বাহ্য জীবন-যাত্রা, তত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত পরিচালিত না হউক, তবু একেবারে দুঃসহ নহে। এখানে কিন্তু নৈতিক ও মানসিক দিক্‌টা অবজ্ঞাত নহে। জনসাধারণকে কিয়ৎপরিমাণে মানসিক ও আধ্যাত্মিক খাদ্য যোগান হইয়া থাকে। তাহাদের মনে উচ্চ ও পবিত্র ভাব অঙ্কুরিত করিয়া দেওয়া হয়। ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা কতকদূর পর্য্যন্ত বেশ উন্নত ও পরিপুষ্ট, কিন্তু তাহাদের মনে যাহাতে স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যের ভাব কোনরূপে স্থান না পায়, তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়। পূর্ব্বোক্ত সমাজে যেমন বাহ্য ও শারীরিক অভাব পূরণের জন্য যথোপযোগী ব্যবস্থা আছে, এখানে তেমনি নৈতিক ও মানসিক অভাব পূরণের জন্য রীতিমত ব্যবস্থা আছে। যাহার যেটুকু প্রাপ্য, তাহাকে সেইটুকু সত্য বন্টন করিয়া দেওয়া হয়, স্বাধীনভাবে সত্যানুসন্ধানে কাহারও অধিকার নাই। স্থাবরতাই এই সমাজের অন্তরঙ্গ জীবনের প্রধান

বিশেষত্ব। এসিয়ার অধিকাংশ অধিবাসিবর্গ এইরূপ সমাজে বাস করিয়া আসিতেছে। যেখানেই দেবতন্ত্র বা যাজকতন্ত্রের দ্বারা জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক গতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেইখানেই এই অবস্থা। দৃষ্টান্তস্বরূপ হিন্দুসমাজের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানেও আবার সেই প্রশ্ন করি, এরূপ সমাজে কি সভ্যতার বিকাশ বা পুষ্টি হইতেছে?

এইবার সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন প্রকারের এক সমাজের কল্পনা করা যাউক। এ সমাজে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার অবাধ স্ফূর্ত্তি, কিন্তু সাম্য ও শৃঙ্খলার একান্ত অভাব। এখানে দুর্ব্বল সবলের অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষায় অসমর্থ। এখানে বল ও আকস্মিক ভাগ্যের রাজত্ব। সকলেই জানেন, ইউরোপকে এই অবস্থার ভিতর দিয়া আসিতে হইয়াছে। এটা কি সভ্যতার অবস্থা? অবশ্য ইহার মধ্যে সভ্যতার অনেক মূলতত্ত্ব নিহিত আছে, এবং এই তত্ত্বগুলি হয় ত ক্রমশঃ বিকশিত ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে; কিন্তু সমাজের মধ্যে যে ভাবের প্রধান আধিপত্য, সেটা যে সভ্যতা নহে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সর্ব্বশেষে আমি আর একটি সমাজ-চিত্রের অবতারণা করিব। এ সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা খুব বেশী; বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে অবস্থার তারতম্যও খুব অল্প অথবা অল্পকালস্থায়ী। কিন্তু এখানে সামাজিক বন্ধনের গ্রন্থি শিথিল; ব্যক্তিগত স্বার্থ ব্যতীত সকলের সাধারণ স্বার্থ বলিয়া কোন বস্তুর ধারণা নাই। প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তি আপন আপন শক্তি ও প্রতিভা লইয়া স্বতন্ত্রভাবে জীবন যাপন করে এবং অবশেষে সমাজের উপর কোন প্রভাব বিস্তার না করিয়াই, পশ্চাতে কোন চিহ্ন না রাখিয়াই, সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করে। যুগের পর যুগ পুরুষানুক্রমে তাহারা একই ভাবে জীবন যাপন করিয়া যায়, কোথাও কোন উন্নতি বা পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। অসভ্য জাতিদিগের এই অবস্থা; তাহাদের মধ্যে স্বাধীনতা ও সাম্য আছে, কিন্তু সভ্যতা নিশ্চয়ই নাই।

এইরূপ আরও অনেক কাল্পনিক সমাজের অবতারণা করা যায়, কিন্তু সভ্যতা শব্দের লৌকিক ও সহজ অর্থ নির্দ্ধারণের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। এটা বেশ স্পষ্ট যে, এই সকল কল্পিত সমাজের মধ্যে কোনটিই মানবজাতির সহজ বুদ্ধিতে সভ্যসমাজ বলিয়া গৃহীত হইবে না। কেন গৃহীত হইবে না? কারণ, আমার মনে হয় যে, সভ্যতা কথাটার মধ্যে একটা উন্নতি বা পরিপুষ্টির ভাব অনুস্যূত আছে। সভ্য জাতি বলিলেই একটা পরিবর্ত্তনশীল, উন্নতিশীল জাতির চিত্র মনে আসে। এই উন্নতির কথাটাই যেন সভ্যতা শব্দের অন্তর্নিহিত মূল ভাব। এই উন্নতি জিনিষটি কি? এই পরিপুষ্টি কিসে হয়? এইখানেই যত গোল।

Civilisation শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে একটা বেশ পরিষ্কার ও সন্তোষজনক অর্থ পাওয়া যায়। Civilisation অর্থ Civil lifeএর সম্পূর্ণতা সাধন, সামাজিক জীবনের পুষ্টিসাধন। অর্থাৎ মানুষ মানুষের সঙ্গে যে সকল বিচিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ, সেই সকল সম্বন্ধের পূর্ণতা ও পুষ্টিসাধনই সভ্যতা।

বাস্তবিক পক্ষে Civilisation কথাটি উচ্চারণ করিলেই প্রথমে এই শেষোক্ত ভাবটিই মনে আসে। আমরা তৎক্ষণাৎ মনে মনে এমন একটি আদর্শ সমাজ চিত্রিত করিয়া লই, যেখানে সামাজিক সম্বন্ধগুলি সুপরিব্যাপ্ত, সুনিয়ন্ত্রিত ও ক্রিয়াবান্। সে সমাজে একদিকে

যেমন শক্তি ও সৌখ্য-বিধায়ক পদার্থসমূহ বহুলপরিমাণে উৎপন্ন হয়, তেমনি অপরদিকে সেই সকল পদার্থ সমাজভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সুসঙ্গত ও যথাযোগ্যভাবে বণ্টিত হয়।

কিন্তু ইহাই কি যথেষ্ট? সভ্যতা শব্দের মধ্যে কি আর কোন ভাব অন্তর্নিহিত নাই? মানবসমাজ কি তাহা হইলে পিপীলিকা-সমাজ হইতে অভিন্ন? পিপীলিকা-সমাজের যেমন সামাজিক শৃঙ্খলা ও শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই একমাত্র লক্ষ্য, মানব-সমাজেরও কি তাহাই? তাহা হইলে ত অন্নবস্ত্রাদির জন্য পরিশ্রমের মাত্রা যত বাড়ান যাইবে ও পরিশ্রমলব্ধ দ্রব্যসামগ্রী যত ন্যায়মত বণ্টিত হইবে, সমাজের উদ্দেশ্য ততই সুসিদ্ধ হইবে এবং সমাজের উন্নতিও সেই পরিমাণে হইবে।

মানবজাতির লক্ষ্য ও নিয়তি সম্বন্ধে এমন একটা সঙ্কীর্ণ ধারণা করিতে আমাদের মন কিছুতেই সম্মত হয় না। আমাদের মনে সহজেই ধারণা হয় যে, সভ্যতা জিনিষটা এ অপেক্ষা অনেক জটিল ও ব্যাপক।

সভ্যতা শব্দের লোকপ্রচলিত অর্থও আমাদের এই সহজ ধারণাকেই সমর্থন করিতেছে।

প্রথমে রোমের দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। রোমে যখন প্রজাতন্ত্র শাসনের চরমোৎকর্ষ, পিউনিক যুদ্ধ যখন সবেমাত্র শেষ হইয়াছে, রোমান চরিত্রের বিশিষ্ট সদ্‌গুণগুলি যখন বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, রোম যখন বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য লাভের দিকে অগ্রসর হইতেছে, রোমীয় সমাজের অবস্থা যখন নিঃসন্দেহ উন্নতিশীল, একদিকে সেই সময়ের রোমকে ধরুন। অপরদিকে অগষ্টসের সময়ের রোমকে ধরুন। তখন রোমের অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছে, অন্ততঃ তখন রোমীয় সমাজের উন্নতি বন্ধ হইয়াছে; রাষ্ট্রে ও সমাজে অকল্যাণকর নীতির আধিপত্যের সূচনা হইয়াছে। অথচ এমন কেহই নাই যিনি বলিবেন না যে, অগষ্টসের রোম, প্রজাতন্ত্র রোম অপেক্ষা, ফ্যাব্রিসিয়স্ ও সিন্‌সিনেটসের রোম অপেক্ষা সভ্যতায় উন্নত।

এইবার একবার আল্পস্ গিরিমালার অপর পারে যাওয়া যাউক। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের কথা ভাবুন। সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার দিক্ দিয়া দেখিলে ফ্রান্স তখন ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড অপেক্ষা নিকৃষ্ট। অথচ সকলেই বলিবেন যে, সভ্যতা-হিসাবে ফ্রান্স তখন ইউরোপের অন্যান্য সমস্ত দেশ অপেক্ষা উন্নত। ইউরোপীয় সাহিত্যের সর্ব্বত্রই এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এইরূপ আরও অনেক দেশের দৃষ্টান্ত দিয়া দেখান যাইতে পারে যে, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি সভ্যতার উন্নতি বলিয়া বিবেচিত হয় না।

ইহার অর্থ কি? সামাজিক ও আর্থিক অবস্থায় নিকৃষ্ট হইলেও, অন্য কি গুণে কোন জাতি সভ্য পদবী প্রাপ্ত হইতে পারে?

ইতিহাস বিচার করিলে দেখা যায়, যে এই সকল জাতি সামাজিক জীবনে নহে, অন্যত্র উন্নতি সাধন করিয়াছে। ইহারা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের, অন্তরঙ্গ জীবনের, সার মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন করিয়াছে। মানুষের চিন্তা, ভাব ও বৃত্তিসমূহের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। তাহাদের সমাজ-ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের মনুষ্যত্ব অপূর্ব্ব মহিমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। সামাজিক জীবনের উন্নতির পক্ষে এখনও তাহাদের অনেক কর্ত্তব্য

অবশিষ্ট আছে, কিন্তু মানসিক ও নৈতিক জীবনে তাহারা প্রভূত কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছে।

তাহাদের সমাজে অনেক লোক বাহ্যসম্পদ্ ও সামাজিক অধিকারে বঞ্চিত ; কিন্তু অনেক বড় লোক সমাজের মুখোজ্জ্বল করিতেছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা উৎকর্ষের চরমসীমায় উঠিয়াছে। যেখানেই এই সকল লক্ষণ দেখা দিয়াছে, যেখানেই মানুষের অতীন্দ্রিয় ভোগের এই সকল শ্রেষ্ঠ উপাদান সৃষ্ট হইয়াছে, সেইখানেই লোকসাধারণ সভ্যতার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে।

তাহা হইলে সভ্যতার দুইটি অঙ্গ। একদিকে সমাজের উন্নতি, অন্যদিকে মনুষ্যত্বের বিকাশ। যেখানেই মানুষের বহিরঙ্গ জীবন সজীব, উন্নতিশীল ও সুশৃঙ্খল ; যেখানেই মানুষের অন্তরঙ্গ জীবন অপূর্ব্ব জ্যোতি ও মহিমায় মণ্ডিত ; এই দুই লক্ষণ যেখানেই পাওয়া গিয়াছে, সামাজিক অবস্থার নানা ত্রুটিসত্বেও মানবসমাজ সেইখানেই সমস্বরে সভ্যতার অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়াছে।

এতক্ষণ আমরা সর্ব্বসাধারণের সহজবুদ্ধি অনুসারে সভ্যতার মূল প্রকৃতি বিশ্লেষণের চেষ্টা করিলাম। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেও আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইব। মানব সভ্যতার ইতিহাসে যেগুলি সন্ধিক্ষণ বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন, যথা খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুত্থান, সেই সন্ধিক্ষণগুলির বিচার করিলেও আমরা দেখিব যে পূর্ব্বোক্ত দুইলক্ষণের মধ্যে অন্ততঃ একটি সেখানে বিদ্যমান। খৃষ্টধর্ম্মের যখন প্রথম অভ্যুত্থান শুধু তখন নহে, অনেকদিন পর্য্যন্ত খৃষ্টধর্ম্ম সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য কোন উদ্যম প্রকাশ করে নাই। বরং সে স্পষ্টবাক্যে ঘোষণা করিয়াছে যে সামাজিক ব্যাপারে সে হস্তক্ষেপ করিবে না। সে ক্রীতদাসকে বলিয়াছে 'প্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়া যাও'। সেই যুগের সমাজের অন্যায়, অবিচার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সে অস্ত্রধারণ করে নাই। অথচ খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুত্থান যে মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটা সন্ধিক্ষণ তাহা কে অস্বীকার করিবে? কেননা ইহা মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনে একটা ঘোর পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে, মানুষের বিশ্বাস, মানুষের অন্তঃকরণের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে ; কেন না ইহা মানুষের চিন্তা ও ভাবরাজ্যে একটা নবজীবন দান করিয়াছে।

আমরা সভ্যতার ইতিহাসে আর একটা বড় সন্ধিক্ষণ দেখিয়াছি। সে ফরাসী বিপ্লব। এ বিপ্লবের উদ্দেশ্য মানুষের অন্তরঙ্গ পরিবর্ত্তন নহে, মানুষের বাহ্য অবস্থার পরিবর্ত্তন। এ সন্ধিক্ষণে মানুষের সমাজ পরিবর্ত্তিত হইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছে।

এইরূপ ইতিহাসের সর্ব্বত্র অনুসন্ধান কর, দেখিবে যে, যে কোন ঘটনাদ্বারা সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে, তাহা হয় মানুষের অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত জীবন, না হয় বহিরঙ্গ সামাজিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

এখন সভ্যতার এই যে দুইটি অঙ্গ পাওয়া গেল ইহার মধ্যে যে কোন একটিই কি সভ্যতার পক্ষে যথেষ্ট? কেবল অন্তরঙ্গ উন্নতি বা কেবল বহিরঙ্গ উন্নতি কি সভ্যতা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে? একটির আবির্ভাব হইলেই, শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক অন্যটির আবির্ভাব কি অবশ্যম্ভাবী?

আমার মনে হয়, তিনদিক্ দিয়া প্রশ্নটির বিচার হইতে পারে। প্রথমে আমরা সভ্যতার এই দুই অঙ্গের প্রকৃতি বিচার করিয়া দেখিতে পারি ইহারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত কি না। অথবা আমরা ইতিহাসের সাক্ষ্যগ্রহণ করিয়া দেখিতে পারি যে ইহারা পৃথক্ ও স্বাধীনভাবে আবির্ভূত হইয়াছে, না সর্ব্বত্রই একটির সঙ্গে সঙ্গে অপরটির আবির্ভাব হইয়াছে। অথবা আমরা এক তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করিতে পারি। আমরা লোক সাধারণের সহজবুদ্ধির সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারি। আমি প্রথমে এই শেষোক্ত পন্থা অবলম্বন করিতে চাই।

যখন দেশের অবস্থার একটা বড় রকমের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, যখন সমাজে সম্পদ্ ও শক্তির পরিপুষ্টি হয়, সামাজিক সম্পদের বণ্টনব্যবস্থায় একটা বিপ্লবকারী পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, তখন এই বিপ্লব, এই পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, ইহা অবশ্যম্ভাবী। যাহারা পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন তাঁহারা কি বলেন? তাঁহারা বলেন "মানুষের বাহিরের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিলে কি হইবে? যে পরিমাণে বাহিরের উন্নতি হইবে সেই পরিমাণে কি ভিতরের উন্নতি হইবে, চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইবে? তোমরা যে উন্নতি সাধন করিতে চাও, সে উন্নতি ছলনামাত্র, সে উন্নতি মানুষের চরিত্রের পক্ষে, অন্তরঙ্গ মানুষের পক্ষে অকল্যাণকর।" যাঁহারা সামাজিক উন্নতির পক্ষপাতী তাঁহারা ইহার বিপক্ষে প্রবল যুক্তিসমূহের অবতারণা করেন। তাঁহারা বলেন সামাজিক উন্নতির সঙ্গে নৈতিক উন্নতি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যেখানে বহিরঙ্গ জীবন সুনিয়ন্ত্রিত, সেখানে অন্তরঙ্গ জীবনও মার্জ্জিত ও পবিত্র হয়।

এইবার বিপরীত দিক্ হইতে দেখা যাউক। যখন কোন সমাজে চিত্তবৃত্তিনিচয়ের বিকাশ ও উন্নতি চলিতেছে, তখন সেই উন্নতিমার্গের পথপ্রদর্শকেরা জনসাধারণের কাছে কোন্ আশার প্রলোভন দেখান? সমাজের শৈশবাবস্থায় ধর্ম্মশাসক, ঋষি, মনীষি, কবি প্রভৃতি যে কেহ মানুষের দুর্দ্দাম প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া কোমল ও মার্জ্জিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা মানুষকে কি বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন? তাঁহারা আশা দিয়াছেন যে চিত্তবৃত্তির বিকাশের দ্বারা সামাজিক অবস্থার উন্নতি হইবে, সমাজের সম্পদ্ আরও সুশৃঙ্খলার সহিত যথাযোগ্যভাবে সকলের ভোগে নিয়োজিত হইবে।

তাহা হইলে দুই পক্ষের এই বাদ প্রতিবাদ হইতে কোন্ সত্য উদ্ধার করা যায়? এই বাদ প্রতিবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে মানুষের সহজ স্বাভাবিক ধারণায় সভ্যতার এই দুই দিক্ পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। এই দুইএর মধ্যে একটা দেখিলেই লোকে তাহার সঙ্গেই অন্যটাকেও দেখিতে আশা করে। লোকের মনে এইরূপ ধারণা আছে বলিয়াই দুইপক্ষের লোক পূর্ব্বোক্তরূপ যুক্তির অবতারণা করেন। যাঁহারা সামাজিক বিপ্লব চান না তাঁহারা দেখাইতে চেষ্টা করেন যে সমাজের উন্নতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ উন্নতির কোন অনুকূল সম্বন্ধ নাই। অন্য দিকে যাঁহারা অন্তরঙ্গ উন্নতি করিতে চান তাঁহারা দেখাইতে চেষ্টা করেন যে অন্তরঙ্গ উন্নতি হইলেই বহিরঙ্গ উন্নতি সাধিত হইবে।

যদি আমরা জগতের ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করি তাহা হইলেও আমরা সেই একই

উত্তর পাইব। আমরা দেখিব মানুষের ব্যক্তিগতভাব ও চিন্তার বিকাশ সমাজের পক্ষেও লাভজনক হইয়াছে; আবার সামাজিক অবস্থার উন্নতিতে মানুষের ব্যক্তিগত সত্তারও বিকাশ হইয়াছে। তবে কখনও বা একটি কখনও বা অন্যটি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং সেই সেই যুগের উপর একটা বিশেষ ছাপ দিয়া গিয়াছে। কখনও বা প্রথমটি বিকাশ প্রাপ্ত হইবার অনেক কাল পরে সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া, সহস্র প্রকারে রূপান্তরিত হইয়া তবে সমাজে সভ্যতার দ্বিতীয় অঙ্গটি পুষ্টিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, এবং পুষ্টিলাভ করিয়া সভ্যতাকে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু যদি সূক্ষ্মভাবে তলাইয়া দেখা যায় তাহা হইলে এই উভয় প্রকারের উন্নতির মধ্যে যে যোগসূত্র আছে তাহা আবিষ্কার করা যায়। বিধির বিধানের গতি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ নহে। সে জন্য যে বীজ বপন করিয়াছে, অমনই তাহার ফল ফলাইবার জন্য ব্যস্ত নহে। ফল তাহার নির্দ্দিষ্ট সময়ে ফলিবেই, হয়ত শত শত বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বে নয়। বিধাতার নিকট সময়ের কোন মূল্য নাই। সময়ের দূরত্ব তাঁহার নিকট তুচ্ছ, এক এক পদক্ষেপেই কত কত যুগ অতিক্রান্ত হইয়া যায়। খৃষ্টধর্ম্ম মানুষের নৈতিক ও ধর্ম্মজীবন নূতন উৎপ্রাণনা আনিয়া দিবার কত শতাব্দী পরে, কত অসংখ্য ঘটনার পরে, তবে মানুষের সামাজিক জীবনে সেই উৎপ্রাণনার যথোপযুক্ত ফল ফলিল। কিন্তু তাই বলিয়া এই ফল যে সে ফলাইতে পারে নাই, তাহা কে বলিবে?

যদি ইতিহাস ছাড়িয়া সভ্যতার ঐ দুই অঙ্গের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করা যায় তাহা হইলেও আমরা সেই একই সিদ্ধান্ত পাইব। যখন অন্তরের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, যখন মানুষ নূতন কোন একটা ভাব বা গুণ বা বৃত্তি লাভ করে, এক কথায় যখন তাহার ব্যক্তিগত সত্তা পুষ্টিলাভ করে, তখন সে কি চায়, সে কি অভাব বোধ করে? সে চায় তাহার নূতন ভাব চতুষ্পার্শ্বস্থ মানববৃন্দের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে, সে চায় তাহার অন্তরের বস্তুকে বাহিরের জগতে বাস্তব প্রতিষ্ঠা দিতে। যখনই মানুষ নূতন কিছু পায়, যখনই তাহার অন্তরে বিশ্বাস হয় যে তাহার একটা নূতন পরিণতি লাভ হইয়াছে, তখনই সে সেটিকে নিজস্ব করিয়া ভাবে।

তাহার নিজের জীবনে সে যে নূতন পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহা অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিবার জন্য সে একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণা অনুভব করে। এই প্রেরণা হইতেই বড় বড় সংস্কারকের আবির্ভাব হয়। যে সকল শক্তিমান পুরুষ নিজে রূপান্তরিত হইয়া জগতের রূপান্তরসাধন করিয়াছেন, তাঁহারা একমাত্র এই অভাববোধের দ্বারাই প্রেরিত ও চালিত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন।

আবার ধরুন সমাজে একটা বিপ্লব, একটা আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। সমাজব্যবস্থা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা সুনিয়ন্ত্রিত; সম্পত্তি ও অধিকার এখন পূর্ব্বাপেক্ষা সমান ভাবে সমাজে সর্ব্বত্র বণ্টিত; অর্থাৎ এখন মানুষের শাসন ব্যবস্থায়, পরস্পর ব্যবহারে ন্যায় ধর্ম্ম ও দয়াধর্ম্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আপনারা কি মনে করেন সমাজের এই উন্নতি, মানব জীবনের বাহ্যব্যাপারের এই সংস্কার, মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনের, মানুষের মনুষ্যত্বের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না? প্রাচীন প্রথা, প্রাচীন দৃষ্টান্ত, মহৎ

আদর্শের প্রভাব সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হয়, তাহা কি এই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, যে বাহ্যজগতে কল্যাণ ও সুনীতি প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্তর্জগতেও কল্যাণ ও সুনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজে ন্যায়ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইলে মানুষের অন্তরেও ন্যায়ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয়, অন্তরঙ্গের দ্বারা যেমন বহিরঙ্গ সংস্কৃত হয়, বহিরঙ্গের দ্বারা তেমনি অন্তরঙ্গের সংস্কার সাধিত হয়, অর্থাৎ সভ্যতার দুই অঙ্গ পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ ? এই দুই অঙ্গের বিকাশের মধ্যে বহু শতাব্দীর, বহু বাধাবিপত্তির ব্যবধান থাকিতে পারে, একটি অপরটির সহিত যুক্ত হইবার পূর্ব্বে সহস্র রূপে রূপান্তরিত হইতে পারে, কিন্তু শীঘ্রই হউক বিলম্বেই হউক তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইবেই হইবে। ইহাই তাহাদের ধর্ম্ম ও প্রকৃতি, ইহাই ইতিহাসের প্রধান তথ্য, ইহাই মানব জাতির সহজ সংস্কার।

এখন বোধ হয় সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনেকটা পরিষ্কার করা গিয়াছে। সভ্যতা কাহাকে বলে, সভ্যতার সীমা কতটুকু, সভ্যতাসম্পর্কীয় এইরূপ প্রধান প্রধান মৌলিক প্রশ্নগুলি একরূপ মোটামুটি আলোচনা করা গিয়াছে। এইখানে আমরা আর একটি প্রশ্ন তুলিব। প্রশ্নটি ইতিহাসের প্রশ্ন নহে, এটি একটি দার্শনিক সমস্যা। এ সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হয় ত মানব বুদ্ধির অতীত, কিন্তু পদে পদে আমাদিগকে এইরূপ সমস্যার একটা না একটা সমাধান করিয়া লইতে হয়, নচেৎ জীবনপথে অগ্রসর হওয়া যায় না।

সভ্যতার যে দুইটি অঙ্গের কথা বলা হইল, ইহার মধ্যে কোন্‌টি উদ্দেশ্য, কোন্‌টি উপায় ; কোন্‌টি মুখ্য, কোন্‌টী গৌণ ? মানুষ কি সামাজিক উন্নতির জন্যই, ঐহিকজীবনের সুখশান্তির জন্যই নিজের অন্তর্বৃত্তি গুলির বিকাশ সাধন করে ? না, সমাজ কেবল মানুষের ব্যক্তিগত সত্তার, মানুষের অন্তর্বৃত্তিগুলির বিকাশ, পরিপুষ্টি ও স্বচ্ছন্দলীলার ক্ষেত্র মাত্র ? অর্থাৎ মানুষ সমাজের দাস, না সমাজ মানুষের দাস ? এ প্রশ্নের উত্তর পাইলে তবে আমরা বুঝিতে পারিব মানবজীবনের চরম পরিণতি সমাজের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ কি না ; সমাজের সেবাতেই মানুষের সমস্ত নিজস্ব নিঃশেষিত হইয়া যায়, না, ইহা ছাড়া মানুষের আরও কিছু এমন অমূল্য সম্পদ আছে যাহা পার্থিব জীবন হইতে শ্রেষ্ঠ।

বন্ধুবর রোয়াইয়ে কোলার (Royer Collar) তাঁহার নিজের বিশ্বাস অনুসারে এই প্রশ্নের একটা সমাধান করিয়া দিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মদ্রোহ অপরাধ আইন সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন :—"বিভিন্ন মানব সমাজ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, জীবন ধারণ করে ও জীবন বিসর্জ্জন করে ; পৃথিবীতেই তাহারা চরম পরিণতি লাভ করে। কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণ মানুষকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। সমাজের কার্য্যে নিজের শক্তিসামর্থ্য নিয়োজিত করিবার পরও তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহার মহত্তম অংশটুকু তাহার সর্ব্বোচ্চ মনোবৃত্তিগুলি অবশিষ্ট রহিয়া যায়। এই সকল অন্তর্বৃত্তিগুলির চর্চ্চাদ্বারা সে ভগবানের দিকে, পরলোকের দিকে, এক অদৃশ্য জগতে অজ্ঞাত আনন্দের দিকে উন্নীত হয়।"

আমি একথার উপর আর কিছু বলিব না। আমি স্বাধীন ভাবে এ প্রশ্নের বিচারেও প্রবৃত্ত হইব না। আমি প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়াই সন্তুষ্ট। সভ্যতার ইতিহাসে এ প্রশ্নটি মাঝে মাঝে উঠে। সভ্যতার ইতিহাস যখন সম্পূর্ণ হয়, যখন আমাদের ঐহিক জীবন সম্বন্ধে

আর কিছু বলিবার থাকে না, মানুষ তখন জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারে না যে ইহাতেই কি সব শেষ হইল, এইখানেই কি মানবজীবনের চরম পরিণতি? সভ্যতার ইতিহাস আমাদিগকে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন করিয়া দেয়, ইহাই তাহার শেষ প্রশ্ন, ইহাই চরম সমস্যা। সমস্যাটির স্থান ও গুরুত্ব নির্দ্দেশ করিয়াই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল মনে করি।

এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে সভ্যতার ইতিহাস দুই বিভিন্ন প্রণালীতে, দুই বিভিন্ন প্রকার উপাদান লইয়া, দুই বিভিন্ন দিক হইতে আলোচিত হইতে পারে। ঐতিহাসিক কোন নির্দ্দিষ্ট যুগ বা যুগপরম্পরা ধরিয়া, কোন নির্দ্দিষ্ট জাতির মধ্যে মানবচিত্তের অন্তরতম প্রদেশে স্থান গ্রহণ করিতে পারেন; তিনি মানুষের অন্তরে যত কিছু রূপান্তর, যত কিছু বিপ্লব ঘটিয়াছে তাহা আলোচনা করিতে পারেন, চিত্রিত ও বিবৃত করিতে পারেন, এবং অবশেষে এইরূপে সেই দেশের ও সেই যুগের সভ্যতার এক ইতিহাস পাইতে পারেন। তিনি অন্য এক প্রণালীও অবলম্বন করিতে পারেন। মানুষের অন্তরঙ্গ সত্তার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া তিনি বহিঃসমাজের মধ্যে আপনার স্থান লইতে পারেন। স্বতন্ত্র ২ ব্যক্তির চিন্তা ও ভাবের বিচিত্র পরিবর্ত্তনের বিবরণ প্রদান না করিয়া তিনি বাহ্য ঘটনার, সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে পারেন। সভ্যতার এই দুই প্রকারের ইতিহাস পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ; ইহারা পরস্পরের প্রতিবিম্ব স্বরূপ। অথচ ইহাদিগকে পৃথক্ করিয়া দেখা যায়; হয় ত পৃথক্ করাই উচিত, কারণ এইরূপে উভয় ইতিহাসের বিস্তৃত ও পরিষ্কার আলোচনা হইতে পারে। আমি বর্ত্তমান গ্রন্থে সভ্যতার অন্তরঙ্গ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। আমি বাহ্যঘটনা লইয়া, দৃশ্যমান জগৎ লইয়া সমাজ লইয়া আলোচনা করিতে চাই।

আমরা প্রথমে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার শৈশবাবস্থায়, রোমীয় সাম্রাজ্যের অধঃপতনের যুগে ইউরোপীয় সভ্যতার সমস্ত উপাদান গুলি অনুসন্ধান করিতে চাই। সেই সুবিশাল ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সমাজের কি অবস্থা ছিল তাহা মনোনিবেশপূর্ব্বক গবেষণা করিতে চাই। সেখান হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া সে গুলি পাশাপাশি সাজাইতে চেষ্টা করিব। পরে সে গুলিকে গতি দান করিয়া পরবর্ত্তী পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য দিয়া তাহাদের বিচিত্র গতিপথ অনুসরণ করিয়া যাইতে চাই।

আমার বিশ্বাস এই আলোচনায় কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই আমাদের দৃঢ় ধারণা হইবে যে সভ্যতা এখনও অপরিণতবয়স্ক; জগতে সভ্যতার জীবনলীলা অবসানোন্মুখ হইতে এখনও বহু বিলম্ব আছে। মানবচিন্তা এখনও যথাসম্ভব বিকাশ লাভ করে নাই। মানব জাতির ভবিষ্যৎ পরিণতির সমগ্র ধারণা করিতে এখনও বহু বিলম্ব। প্রত্যেকে যদি নিজের মনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শের সঙ্গে বাস্তব জগতের তুলনা করিয়া দেখি, তাহা হইলেই স্পষ্ট ধারণা হইবে যে সভ্যতা ও সমাজ বাস্তবিকপক্ষে এখন অত্যন্ত শিশু; বুঝিতে পারিব যে যদিও তাহারা সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তথাপি তাহাদের গন্তব্যপথের তুলনায় সে দৈর্ঘ্য নিতান্ত তুচ্ছ। তাহাতে আমাদের বিষণ্ণ হইবার কোনই কারণ নাই। আমি যখন গত পঞ্চদশশতাব্দীব্যাপী ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী

আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিব, তখন দেখিতে পাইবেন আমাদের সময় পর্য্যন্তও কি সামাজিক ব্যাপারে, কি ব্যক্তিগত জীবনে, মানুষকে কত পরিশ্রম, কত চেষ্টা করিতে হইয়াছে, কত ঝঞ্ঝা বিপ্লব অতিক্রম করিতে হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে মানব সমাজকে যেমন ক্লেশ পাইতে হইয়াছে, মানবাত্মাকেও সেইরূপ উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে। আপনারা দেখিবেন যে কেবল আধুনিক যুগেই মানুষের মন কতকটা শান্তি ও শৃঙ্খলার আভাস পাইয়াছে। সমাজ সম্বন্ধেও সেই একই কথা। সমাজ যে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বের সঙ্গে তুলনায় সমাজ হইতে এখন অন্যায় ও উদ্বেগ অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের সাবধান হওয়া উচিত, যেন নিজেদের উন্নতি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে আমরা অহঙ্কার ও আলস্যের কবলে নিপতিত না হই। আমাদের মানসিক উন্নতিতে অতিমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমরা যেন আধুনিক কালের অনায়াসলব্ধ বিলাস ও শান্তিতে আপনাদের মনুষ্যত্ব হারাইয়া না ফেলি। X X X X X X

আমাদের অন্তরের আকাঙ্খা উদ্দাম ও প্রবল হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু কার্য্যকালে আমরা হতাশ হইয়া পড়ি, উদ্যমের একান্ত অভাব হইয়া পড়ে। আমাদের এই দুই চরিত্রগত দোষ যেন আমাদিগকে অভিভূত করিয়া না ফেলে। আমরা যেন পূর্ব্ব হইতে আমাদের শক্তি, জ্ঞান ও যোগ্যতার যথার্থ পরিমাপ লইয়া প্রস্তুত হইয়া থাকি। যেন আমাদের সাধ্যাতীত কোন বাঞ্ছা বা দুরাকাঙ্খা আমাদিগকে উন্মত্ত না করিয়া তোলে।

অনেক সময় আমাদের দুরাকাঙ্খা চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা ন্যায়, ধর্ম্ম, সত্য সমস্তই উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত হই। অথচ পূর্ব্বকালের বর্ব্বরসুলভ উদ্যম বা কর্ম্মঠতা আমাদের নাই। এইরূপ আমাদের বর্ত্তমানের যে উন্নতি লইয়া গর্ব্ব করি, সেই উন্নতির মূলে যেন আমরা কুঠারাঘাত না করি। ন্যায়পরতা, বিধিপরতন্ত্রতা, প্রকাশ্যতা ও স্বাধীনতা—আমাদের সভ্যতার এই কয়েকটি মূলমন্ত্র যেন আমরা সুদৃঢ়ভাবে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত ধরিয়া রাখি। একথা যেন আমরা মনে রাখি যে, আমরা যেমন সমস্ত ব্যাপার স্বাধীনভাবে বিচার ও পরীক্ষা করিয়া লইতে চাই, সেইরূপ আমাদের আচরণের উপরও জগতের দৃষ্টি রহিয়াছে। যথা সময়ে আমরা এই বিষয় আলোচনা করিব।

শ্রীরবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ।

তরল বায়ু

বায়ু জিনিষটির প্রকৃত স্বরূপ অনেকেই অবগত নন। এই রূপ-রস-গন্ধ-বিহীন পদার্থটির অস্তিত্ব সম্বন্ধেও হয়ত অনেকে সংশয় প্রকাশ করিতেন, যদি ইহা প্রবল ঝটিকারূপে মাঝে মাঝে আবির্ভূত হইয়া ঘর বাড়ী গাছপালা ভাঙ্গিয়া ও নদীপথে তরী, জাহাজ ও বাষ্পীয়পোত ইত্যাদিকে জলমগ্ন করিয়া তাহার অসাধারণ প্রতাপ আমাদিগকে অনুভব করিতে না দিত। মানুষ স্বভাবতঃ রূপের উপাসক; আকারবিহীন অরূপের কল্পনা বা ধ্যান তাহার পক্ষে সহজসিদ্ধ নয়; কাজেই এই নিরাকার বায়ু জিনিষটির প্রকৃত স্বভাব বা ধর্ম্ম আবিষ্কার করিতে প্রাচীন রসায়নবিদ অগ্রণী মনীষিগণেরও অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল, নানাবিধ ভ্রমাত্মক তত্ত্ব ইহার সম্বন্ধে প্রচারিত ও প্রচলিত হওয়ার পর, মাত্র ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে আধুনিক রসায়নীবিদ্যার জন্মদাতা মহামতি লেভইশিয়ার (Lavoisier) তাঁহার বিখ্যাত পরীক্ষার ফলে ইহার প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কার করেন। এই গোপন রহস্যের প্রকাশ হওয়ার পরেই রসায়নীবিদ্যা চরম সত্যের অভিমুখে তড়িৎবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। যদিও বায়ু জিনিষটিকে আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু ইহাই আমাদের জীবনের প্রধান সম্বল, খাদ্যের অভাবে মানুষকে প্রায় ৮০।৯০ দিন অবধি বাঁচিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে, জলের অভাবেও পিপাসী মানবকে কয়েক ঘণ্টা বাঁচিয়া থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু বায়ুর অভাবে ৫ মিনিট কালও বাঁচিয়া থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব, আমরা অহরহই নাকের ভিতর দিয়া দেহাভ্যন্তরে এই বায়ু গ্রহণ করিতেছি, যদি কেহ আঙ্গুলের সাহায্যে নাক দু'টি বন্ধ করিয়া রাখেন, আমাদের দেহরক্ষার জন্য বায়ুর একান্ত আবশ্যকতা সম্বন্ধে তাঁহার আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন এই বায়ুই আবার শব্দ তরঙ্গের বাহক, ইহার অভাবে আমরা কোনও শব্দ শুনিতে পাইতাম না; সঙ্গীতের মধুর আস্বাদ গ্রহণে আমরা অক্ষম হইতাম, এমন কি একে অন্যের কথাও শুনিতে পাইতাম না, ফলে এই শব্দময় জগতে এক নিরবচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতা অচল ভাবে বিরাজ করিত।

এই বায়ুরই প্রচণ্ড ঝটিকারূপে বিস্মিত ও ভীত হইয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ইহাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন। এমন কি এখনও মহাবীর পবনতনয় শ্রীরাম চন্দ্রের বরে অমরত্ব লাভ করিয়া উত্তরপশ্চিম ভারতে পূজা পাইয়া আসিতেছেন! প্রাচীন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মতে ইহা পঞ্চভূতের অন্তর্ভূত, এবং সৃষ্ট জগতের একটি প্রধান মৌলিক উপাদানরূপে গণ্য হইয়াছে, এই গেল ইহার প্রথম জীবনের কাহিনী।

লেভইশিয়ারের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে বায়ু একটি মৌলিক পদার্থ বলিয়াই গণ্য হইত, কিন্তু লেভইশিয়ার যখন ইহার প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কার করিলেন তখন দেখা গেল ইহা অম্লজান (oxygen) ও যবক্ষারজান (nitrogen) নামক দুটি বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণে উদ্ভূত, শেষোক্ত পদার্থ দুটীও বায়ুর মত রূপরসগন্ধ ও অবয়বহীন। এই বায়ু সৃষ্ট জগতের চতুর্দ্দিকে

৫০ মাইল উর্দ্ধে অবধি বেষ্টনী স্বরূপ রহিয়াছে, ইহাতেই প্রাণীর জীবন রক্ষা হয়। ইহার প্রথম উপাদান অম্লজানই প্রাণীর দেহরক্ষা করে; ইহাই নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়া প্রাণী তাহার দেহাভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলি নিষ্পন্ন করে। দ্বিতীয় উপাদান যবক্ষারজান ইহার সহিত মিশ্রিত থাকিয়া প্রাণী দেহের উপর অম্লজানের ক্রিয়াকে মৃদুভাব ও সমতাপ্রদান করে, নতুবা একমাত্র অম্লজানের ক্রিয়ার প্রখরতায় অত্যধিক আনন্দ ও বীর্য্যোৎসাহে প্রাণীগণের দেহ যন্ত্রটী অচিরেই বিকল হইয়া যাইত। অম্লজানের উপস্থিতির দরুণই আমরা অগ্নি প্রজ্বালন করিতে সক্ষম হইয়াছি; কারণ অম্লজানের অভাবে কোন জিনিষ জ্বলিতে পারে না, এই খানেও বায়ুর যবক্ষারজান অম্লজানের প্রখর ক্রিয়াকে সমতা দান করে। তাহা না হইলে কোন আকস্মিক কারণে সমস্ত জগত পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইত। এতদ্ব্যতীত যবক্ষারজান উদ্ভিদের দেহরক্ষারও সহায়তা করে; সুতরাং আমরা দেখিতে পাই বায়ু পদার্থটীর অভাবে জীব জগতের অস্তিত্ব সম্ভব হইত না।

এখন প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়ের দিকে মনোযোগ করা যাক্। আমাদের বিষয় "তরল বায়ু"। "তরল বায়ু" শব্দটির অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে বায়ু পদার্থটির স্বাভাবিক ও সাধারণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক, আমরা ইতস্ততঃ সৃষ্টজগতের মধ্যে যে সমস্ত জিনিষ দেখিতে পাই তাহাদিগকে "পদার্থ" নামে অভিহিত করা হয়। এই সকল পদার্থকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়া থাকে। প্রথম শ্রেণীর পদার্থ সমূহ স্বকীয় অবয়ববিশিষ্ট; ইহারা ইহাদের অবয়ব ও অধিকারস্থান বাহ্যশক্তির প্রভাব ভিন্ন কখনও আপ না হইতে পরিবর্ত্তন করেনা; যথা—মাটীর ঢেলা, লোহার পিণ্ড, পিতলের থালা, রূপার টাকা, মিশ্রির দানা, মার্ব্বেল পাথরের টুকরা, বরফের খণ্ড, গন্ধকের দানা ইত্যাদি, দ্বিতীয় শ্রেণীর পদার্থ সমূহের কোন স্বকীয় অবয়ব বা আকার নাই। যখন যে আধার বা পাত্রে ইহাদের রাখা হয়, সে আধার বা পাত্রের আকারই ইহারা ধারণ করে, ইহারা সাধারণতঃ চঞ্চল এবং অবকাশ পাইলেই চারিদিকে গড়াইয়া যায়, পাত্রের কোথায়ও ছিদ্র পাইলে উহার মধ্য দিয়া ইহারা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, কিন্তু উর্দ্ধদিকে ইহারা আপনা হইতে উঠিতে পারে না, উদাহরণ যথা—জল, সরিষার তৈল, দুগ্ধ, সুরা, মধু, পারদ ইত্যাদি। তৃতীয় শ্রেণীর দ্রব্য সমূহেরও কোন স্বকীয় অবয়ব নাই। ইহারা অত্যন্ত চঞ্চল ও গতিশীল, ইহাদের একস্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখা সহজ নহে, উর্দ্ধে, অধে দক্ষিণে ও বামে ইহারা অনবরত চারিদিকে ছুটিয়া বেড়ায়। কোন ভাণ্ডে ইহাদের আবদ্ধ করিয়া রাখিলে ইহারা ভাণ্ডের সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া বসে; এবং রন্ধ্র পাইলে ঐ পথে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া পালায়। ইহাদের গতি সর্ব্বত্র, ইহারা সবাই স্পর্শগুণহীন, উদাহরণ যথা:—বায়ু, জলীয় বাষ্প যাহা জল গরম করিলে উত্থিত হয়, ধোঁয়া, কোল্‌গ্যাস বা জ্বালানী গ্যাস যাহা কয়লা পুড়িয়া তৈয়ার হয়, এসিটিলিন (acetylen) গ্যাস যাহা এখন গ্রামেও উৎসবাদিতে জ্বালান হয়, গন্ধকাম্লগ্যাস যাহার উৎকট গন্ধ গন্ধক পোড়াইলে পাওয়া যায়, marsh gas যাহা জলা জমী হইতে উত্থিত হয় এবং যাহা অগ্নিসংস্পর্শে দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠে; ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, পদার্থসমূহের এরূপ বিভিন্নতার কারণ কি? কি কারণে তাহারা এরূপ বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হয়? ইহার

উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে অণুপরমাণুবাদের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হয়। বহু পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে পদার্থমাত্রেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুর সমবায়ে গঠিত। এই অণুও আবার এক বা ততোধিক পরমাণুর সমষ্টি। আমরা এখানে অণুতত্ত্বসম্বন্ধেই শুধু আলোচনা করিব; তাহাতেই আমাদের আলোচ্য বিষয়ের জটিলতা ব্যাখ্যা করিতে পারিব। আমরা দেখিয়াছি পদার্থরূপ ইমারতের এক একখানি ইষ্টক এক একটি অণু। তবে এই অণুগুলি অত্যন্ত চঞ্চল। একটু তাপ পাইলেই ইহারা ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতে চাহে, এবং শৈত্যাধিক্যে আবার একত্র জড়ীভূত হইয়া যায়। উপরে যে তিন শ্রেণীর পদার্থের বিষয় বলা হইল পণ্ডিতেরা উহাদের যথা ক্রমে নামকরণ করিয়াছেন—কঠিন পদার্থ (Solid), তরল পদার্থ (Liquids) এবং মারুত পদার্থ (Gas)। আমাদের বায়ু একটি মারুত পদার্থ। এখন অণুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতেই এই তিন প্রকার পদার্থের বিভিন্নতার কারণ আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব, প্রথমতঃ মারুত পদার্থের বিষয় আলোচনা করা যাক। এই জাতীয় পদার্থের অণুসমূহ একে অন্য হইতে দূরে অবস্থিত এবং এই ব্যবধান হেতু তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ শক্তির প্রভাব খুব ক্ষীণ, ফলে অণুসমূহ তাহাদের নিজ ধর্ম্মগুণে চারিদিকে অবাধ্য শিশুর দলের মত ছুটিয়া বেড়ায়।

তরল পদার্থের অণুসমূহের মধ্যে ব্যবধান মারুত পদার্থ হইতে কিছু কম। ফলে পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ শক্তি কিছু জাগিয়া উঠে, এই অবস্থায় অণুসমূহ তাহাদের চিরচঞ্চলতা সত্ত্বেও একে অন্যকে ছড়াইয়া বহুদূর যাইতে পারে না। যাইবার সুযোগ ঘটিলেও পরস্পরের আকর্ষণে সবাই পিপীলিকার দলের মত একসঙ্গে ছুটিতে থাকে। এই জন্যই তাহারা মাধ্যাকর্ষণের শক্তি অতিক্রম করিয়া সবাই একসঙ্গে উর্দ্ধে উঠিতে পারে না, পরস্পরের আকর্ষণ শক্তি তাহাদের চঞ্চলতাকে কথঞ্চিৎ খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছে।

কঠিন পদার্থের অণুসমূহের মধ্যে পরস্পর ব্যবধান আরও কম। ফলে তাহাদের মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ শক্তির প্রভাব খুব প্রবল, অণুসমূহের চিরচঞ্চলতা এখানে আকর্ষণ শক্তির নিকট সম্পূর্ণভাবে পরাজিত, কাজেই কঠিন পদার্থের অণুসমূহ একে অন্যকে ছাড়াইয়া যে পথ চলিতে পারে তাহা অতি নগণ্য। এখানে অণুসমূহ সেনাপতির আদেশে ব্যূহবদ্ধ সেনাদলের মত যে যাহার যথাযোগ্য স্থান প্রায় অধিকার করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, সুতরাং ইহারা ইহাদের স্বকীয় অবয়ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে।

এমন কেহও জিজ্ঞাসা করিতে পারেন মারুত পদার্থকে যথাক্রমে তরল ও কঠিন পদার্থে এবং কঠিন পদার্থকে যথাক্রমে তরল ও মারুত পদার্থে পরিণত করা যাইতে পারে কিনা? এইরূপ প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক। আমরা দেখিয়াছি অণুসমূহের চঞ্চলতার মাত্রা ও আকর্ষণ শক্তির হ্রাসবৃদ্ধির উপর পদার্থের ত্রিবিধ অবস্থা নির্ভর করে। এবং যে সব বহিঃশক্তির বলে এই চঞ্চলতা ও আকর্ষণ শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে সেই সমস্ত শক্তির প্রভাব এই অণুসমূহের উপর রীতিমতে প্রয়োগ করিলে অণুসমবায়ে গঠিত পদার্থের অবস্থান্তর অবশ্যম্ভাবী। পরীক্ষার ফলে দেখা যায় উত্তাপাধিক্যে অণুসমূহের চঞ্চলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং শৈত্যাধিক্যে তাহা ক্রমশঃ কমিতে থাকে, চঞ্চলতা বাড়িলেই তাহারা পরস্পরের আকর্ষণ

শক্তিকে ছাড়াইতে বা অতিক্রম করিতে পারে, সুতরাং উত্তাপের সাহায্যে কঠিন পদার্থকে তরল এবং তরল পদার্থকে মারুতে পরিণত করা যাইতে পারে; অথবা শৈত্যাধিক্যে মারুত পদার্থকে তরল এবং তরল পদার্থকে কঠিনে পরিণত করা যায়। আবার পরীক্ষায় ইহাও দেখা গিয়াছে যে বাহিরের চাপের প্রভাবে মারুতপদার্থের স্থানাধিকারকে সঙ্কীর্ণ করা যাইতে পারে, কাজেই অণুসমূহের ইতস্ততঃ গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান কমিয়া যায়, ফলে আকর্ষণ শক্তি বৃদ্ধি পায়, সুতরাং চাপাধিক্যে মারুত পদার্থকে তরলে পরিণত করিবার সুযোগ ঘটে।

জল পদার্থটিকে আমরা ত্রিবিধ অবস্থাতেই সর্ব্বদা দেখিতে পাই, বরফরূপে ইহা কঠিন; জলরূপে তরল এবং জলীয় বাষ্পরূপে ইহা মারুত পদার্থ। কঠিন বরফ খণ্ডকে গরম করিলেই তরল হইয়া পড়ে; এবং তরল জলকে আগুণের উপর ফুটাইয়া তুলিলেই উহা বাষ্পে পরিণত হয়। অন্যদিকে আবার জলীয় বাষ্পকে যদি ঠাণ্ডা করা হয় উহা শিশির বিন্দুরূপে আবার তরল জল হইয়া পড়ে; এবং এই তরল জলই ঠাণ্ডায় জমিয়া কঠিন বরফ হইয়া পড়ে। সুতরাং একই পদার্থের ত্রিবিধ অবস্থা ইহার অন্তর্গত তাপের হ্রাস বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে, বাহির হইতে তাপ দিয়া ইহার অন্তর্গত তাপকে বাড়াইয়া দিলে অণুগণের চঞ্চলতা বৃদ্ধি পায় এবং কঠিন পদার্থের তরল ও মারুত অবস্থায় পরিণতির সুযোগ ঘটে। অন্যদিকে তেমন বাহিরের শৈত্যে যদি ইহার অন্তর্গত তাপকে নিষ্কাশিত করা যায়, তাহা হইলে অণুর চঞ্চলতা হ্রাস পাইয়া আকর্ষণ শক্তির ক্রিয়া প্রবল হইয়া পড়ে, ফলে মারুত পদার্থের তরল ও কঠিন অবস্থায় পরিণতির সহায়তা হয়।

প্রবন্ধের শিরোনামায় "তরল বায়ু" দেখিয়া হয়তঃ অনেকে প্রথম ইহার অর্থগ্রহণে সক্ষম হন নাই। এখন অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে আমাদের এই রূপ-রস-গন্ধ ও অবয়ব-হীন বায়ুরূপ মারুত পদার্থকেও জলের মত তরল পদার্থে পরিণত করা কিছুই আশ্চর্য্য বা অসম্ভব নহে। এখন এই বায়ুকে কিরূপে তরল করা হইয়াছে তাহারই বিস্ময়কর কাহিনী এখানে বিবৃত করিব।

প্রথমতঃ ক্রমশঃ চাপের মাত্রা বাড়াইয়া বায়ু বা তাহার একতম উপাদান অম্লজানকে তরলীভূত করিবার প্রয়াস হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক (Faraday) ফ্যারাডে, বারথেলো (Berthelot) এবং নেটেরার (Natterer) এইরূপ প্রক্রিয়ার সাহায্যে বায়ু বা তাহার উপাদান অম্লজানকে তরল করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হন, কিন্তু অন্যবিধ অনেক প্রকার মারুত পদার্থকে কেবল এইরূপ একমাত্র চাপের প্রভাবেই তরলীভূত করিতে তাঁহারা সমর্থ হইয়াছিলেন, ফলে ফ্যারাডে প্রথম সিদ্ধান্ত করিলেন যে বায়ু ও তাহার উপদানদ্বয় চিরমারুত পদার্থ। ইহারা সর্ব্বাবস্থাতেই মারুত থাকিবে; কোনও প্রকার বাহিরের শক্তির সাহায্যে ইহাদিগকে তরলীভূত করা সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু পরবর্ত্তী পরীক্ষার ফলে Faraday দেখিলেন যে প্রত্যেক মারুত পদার্থের এমন একটি উত্তাপের সীমা আছে যাহার উপরে ইহাকে কেবল মাত্র চাপের সাহায্যে কিছুতেই তরল করা যায় না ; এই সীমাকে তাঁহারা "চরম তাপমাত্রা (critical temperature)

বলিয়া নামকরণ করিলেন, সুতরাং বায়ুকে বা তাহার উপাদানদ্বয়কে তরলীভূত করিবার তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত ব্যর্থ প্রয়াসের প্রকৃত কারণ এখন স্থিরীকৃত হইল। বোঝা গেল বায়ু বা তাহার উপাদানদ্বয়ের পক্ষে এই চরমসীমা অত্যন্ত নীচে; ক্রমশঃ শৈত্য প্রয়োগে এই চরম তাপমাত্রা অতিক্রম করিতে না পারিলে তাহাদিগকে কিছুতেই তরলীভূত করা যাইবে না।

এই সঙ্কেত পাইয়া জেনেভানগরবাসী পদার্থবৈজ্ঞানিক পিক্‌টেট Pictet ১৮৭৭ খৃঃ অব্দের ২৪শে ডিসেম্বরে ক্রমশঃ শৈত্য প্রয়োগে অম্লজানকে শীতল করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে চাপের মাত্রা ভীষণভাবে বাড়াইয়া বায়ুর একতম উপাদান অম্লজানকে তরলে পরিণত করিতে সমর্থ হন; এই পরীক্ষায় তিনি অম্লজানের উপর সাধারণ বায়ুমণ্ডলের চাপের দুইশত গুণ চাপ (200 atmospheric pressure) প্রয়োগ করিয়াছিলেন, এবং অম্লজানকে-১৩০°C (সেণ্টিগ্রেড) অবধি ঠাণ্ডা করিয়াছিলেন। বিযুক্ত—১৩০° ডিগ্রি শৈত্যের মাত্রাটা কত তাহা অনেকেই হয় ত বুঝিতে পারিবেন না। যে তাপ মাত্রায় জল সিদ্ধ হইয়া ফুটিতে আরম্ভ করে তাহাকে সাধারণতঃ ১০০° ডিগ্রি তাপমাত্রা বলিয়া ধারণা করা হয়। আবার বরফ সংযুক্ত জলের যে তাপমাত্রা তাহাকে সাধারণতঃ 0. ডিগ্রি বা শূন্য তাপমাত্রা বলিয়া ধরা হয়, সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায় বরফ এবং জল ফুটিবার মধ্যে যে তাপের ব্যবধান তাহাকে একশত সমান ভাগে বিভক্ত করিলে আমাদের ব্যবহার্য্য এক একটি তাপমাত্রার পরিমাণ পাওয়া যায়। বরফ হইতেও যখন কোন দ্রব্য আরো অধিকতর শীতল হইতে থাকে তখন তাহার তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির বা বরফের তাপমাত্রার নীচে নামিতে থাকে। এই রূপে যখন কোন দ্রব্যের তাপ শূন্যের নীচে আমাদের পূর্ব্বোক্ত গণনামতে ১৩০ মাত্রা নামিয়া যায় তখন তাহার তাপের পরিমাণকে বিযুক্ত—১৩০ ডিগ্রি বা মাত্রা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। এতদ্ব্যতীত তাপ পরিমাপের অন্যবিধ প্রথাও প্রচলিত আছে।

১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দের ২রা ডিসেম্বর তারিখে, পিকটেটের (Pictet) সমসাময়িক ফরাসী দেশীয় বৈজ্ঞানিক মহামতি কেইলিটেট্ (Caillitet) এক অভিনব উপায়ে বায়ুর উপাদান অম্লজানকে তরলীভূত করিতে কৃতকার্য্য হন। তিনি তাঁহার পরীক্ষার ফল ফরাসী দেশীয় বিজ্ঞান মহাসভায় (French Academy of Science) ২২শে ডিসেম্বর তারিখে জ্ঞাপন করেন, ঐ একই দিনে পিকটেটও তাঁহার পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত সভায় প্রেরণ করেন। কেইলিটেট গুরুতর চাপের বলে আবদ্ধ অম্লজানকে পিকটেটের মত কেবলমাত্র বাহ্যিক শৈত্য প্রয়োগে শীতল করিতে প্রয়াস করেন নাই। তিনি এই চাপাবদ্ধ অম্লজানকে তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রের রন্ধ্রপথে হঠাৎ উন্মুক্ত করিয়া দেন। অতি সঙ্কীর্ণস্থানে আবদ্ধ অসংখ্য অম্লজান অণু হঠাৎ মুক্তি পাইয়া তাহাদের স্বাভাবিক চঞ্চলতাধর্ম্মবশতঃ চরিদিকে ছুটিয়া পলাইতে থাকে। ঠিক যেন পাঠশালার গুরুমহাশয়ের বেতের ভয়ে বহুক্ষণ যাবৎ আবদ্ধ দুরন্ত শিশুর দল হঠাৎ ছুটি পাইয়া গৃহাভিমুখে দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। গুরুতর চাপের প্রভাবে পূর্ণভাবে বিকাশপ্রাপ্ত পরস্পর অকর্ষণশক্তিকে ছিন্ন করিয়া চারিদিকে ছুটিয়া যাইতে অণুসমূহের প্রচুর তাপশক্তির অপচয় হয়, ফলে তাহারা অত্যন্ত শীতল হইয়া পড়ে, এই স্বকৃত শৈত্যের প্রভাবে তাহাদের চঞ্চলতা ক্রমশঃ হ্রাস পায় এবং আংশিকভাবে তাহারা তরল অবস্থায় পরিণত হয়।

কিন্তু পিকটেট বা কেইলিটেট কেহই এই তরল মারুতকে কিছুক্ষণ অবধি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে বা অধিক পরিমাণে তৈয়ার করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহারা শুধু পরীক্ষা-মন্দিরে তাঁহাদের উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে যে বায়ু বা তাহার উপাদানসমূহকে তরল অবস্থায় পরিণত করা যাইতে পারে, মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র ইহাই দেখাইতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী কালে পোলাণ্ডদেশবাসী বৈজ্ঞানিক রবলুইস্কি (Wroblewski) এবং ওলজুইস্কি (Olzewski) পিকটেটের প্রণালী অনুসরণ করিয়া ১৮৮৩ খৃঃ অব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখে বায়ুর উপাদান অম্লজানকে জলের ন্যায় স্বচ্ছ তরল পদার্থে পরিণত করিতে এবং উহাকে বিন্দু বিন্দু রূপে অল্পপরিমাণে বিশিষ্ট শীতল পাত্রে সংগ্রহ করিতে ও সক্ষম হন।

এখন আমরা এই বায়ুকে কিরূপে প্রচুর পরিমাণে তরলীভূত করিয়া বহুবিধ হিতকর শিল্পকার্য্যে প্রয়োগ করা হইতেছে তাহারই কাহিনী বিবৃত করিব। অনেকে হয়ত ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিবেন যে এতকাল এত চেষ্টার ফলে বৈজ্ঞানিকগণ যাহাকে মাত্র কয়েক বিন্দু রূপে তরল অবস্থায় পাইতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহাকে যে মণে মণে উৎপন্ন করিয়া শিল্পকার্য্যের উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে, সম্ভবপর নহে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণের বুদ্ধি কৌশলে এই অসম্ভবও সম্ভবে পরিণত হইয়াছে। এবং বর্ত্তমানে তরল বায়ু উৎপাদন একটি বৃহৎ ও আবশ্যকীয় শিল্পে পরিণত হইয়াছে।

যে সমস্ত প্রণালীতে বর্ত্তমানে বায়ুকে বহুল পরিমাণে তরল করা হইতেছে, তাহাদের মূলে যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত আছে প্রথমে তাহারই আলোচনা করিব। দুই প্রকার প্রণালীতে বর্ত্তমানে বায়ুকে তরল করা হইতেছে।

প্রথম প্রণালী কেইলিটেটের প্রণালীরই অনুরূপ। অর্থাৎ গুরুতর চাপাবদ্ধ বায়ুকে হঠাৎ রন্ধ্রপথে পলায়ন করিতে দেওয়া হয়। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি এইরূপ অকস্মাৎ আয়তন প্রসারের দরুণ অণুসমূহের তাপশক্তির বহুল অপচয় হয়। ফলে তাহারা তাহাদের চঞ্চলতা হারাইয়া কথঞ্চিৎ শীতল হইয়া পড়ে, পরস্পর আকর্ষণশক্তির বিরুদ্ধে প্রসারিত হইতে যাইয়া অণুসমূহ তাহাদের স্বকীয় তাপশক্তি হারাইতে থাকে। এইরূপ বারম্বার সঙ্কোচন প্রসারণের ফলে বায়ুর অণুসমষ্টি ক্রমশঃ শীতল হইয়া তরল অবস্থায় পরিণত হয়। এই প্রণালীকে আভ্যন্তরীণ কার্য্যকৃত তরল অবস্থায় পরিণতি এই নাম দেওয়া হইয়াছে।

১৮৯৫ খৃঃ অব্দে জার্ম্মান অধ্যাপক লিণ্ডে (Linde) এবং তাহার কিছুকাল পরে ইংলণ্ডের হেম্পসন (Hampson) এই প্রণালীপ্রয়োগে বায়ুকে বহুল পরিমাণে তরলীভূত করিবার যন্ত্র আবিষ্কার করেন, বর্ত্তমানে পৃথিবীর অনেক শিল্পকেন্দ্রেই লিণ্ডে কৃত যন্ত্রের ব্যবহার হইতেছে। ১নং চিত্রে ইহার একটি সরল প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। আভ্যন্তরীণ "ক" নলের মধ্যদিয়া গুরুতর চাপের অধীনে দমকলের সাহায্যে বিশুদ্ধ, শুষ্ক এবং শীতল বায়ুকে প্রেরণ করা হয়। বিশুদ্ধ ও শুষ্ক বলিবার বিশেষ কারণ আছে। বায়ুতে সাধারণতঃ বহুল পরিমাণে জলীয় বাষ্প বর্ত্তমান থাকে, একটু ঠাণ্ডা পাইলেই ইহা জমিয়া জল বা বরফ হইয়া পড়ে। বরফ হইলে কলের রন্ধ্রপথ ইত্যাদি আটকাইয়া পড়ে। সুতরাং ইহাকে পূর্ব্বেই বায়ু হইতে ছাড়াইয়া লইতে হয়। বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে ইহাকে সহজেই বায়ু হইতে

অপসারিত করা যায়। এতদ্ব্যতীত বায়ুতে যথেষ্ট অঙ্গারাম্ল মারুত বা (Carbon dioxide gas) বর্ত্তমান থাকে। ইহাও অধিক শৈত্যের প্রভাবে বায়ু তরলীভূত হইবার অনেক পূর্ব্বেই তরল ও কঠিন হইয়া পড়ে। কঠিন হইলে জলীয় বাষ্পের মত ইহাও কলের যাবতীয় পথ বন্ধ করিয়া দেয়, সুতরাং ইহাকেও পূর্ব্বে বিশিষ্ট রাসায়নিক দ্রব্যের সহায়তায় বায়ু হইতে ছাড়াইয়া লইতে হয়। দমকলের প্রভাবে বায়ু গরম হইয়া পড়ে। সুতরাং দমকল হইতে বিনির্গত চাপাবদ্ধ বায়ুকে ঠাণ্ডাজলের সাহায্যে শীতল করিয়া পাঠান হয়, এই চাপাবদ্ধ শীতল বিশুদ্ধ ও শুষ্ক বায়ু "ক' নলের এক প্রান্তে "গ" চিহ্নিত রন্ধ্রপথে বাহির হইতে থাকে। এইরূপ ভাবে হঠাৎ মুক্তি পাইয়া পূর্ব্বোক্ত কারণে তাপশক্তির অপচয়ে ইহা ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। এই শীতল ও মুক্ত বায়ু "খ" চিহ্নিত বহির্নল ও আভ্যন্তরীণ "ক' নলের মধ্যবর্ত্তী স্থান দিয়া বিপরীত ভাবে পুনরায় দমকলে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই শীতল ও মুক্ত বায়ুর শৈত্যাবরণ হেতু রন্ধ্রাভিমুখী চাপাবদ্ধ বায়ুও ক্রমশঃ শীতল হইতে শীতলতর হইতে থাকে। বারংবার এইরূপ গমন ও প্রত্যাগমনের প্রভাবে ক্রমশঃ শীতলতর বায়ু রন্ধ্রপথে মুক্ত হইয়া আরো শীতল হইয়া পড়ে। পরিশেষে এমন একসময় উপস্থিত হয় যখন রন্ধ্রপথ হইতে মুক্ত হওয়া মাত্রই অত্যধিক শৈত্যপ্রভাবে ইহা আংশিকভাবে তরলাবস্থায় পরিণত হয়। এই তরল বায়ু বিন্দু বিন্দু রূপে "ঘ" চিহ্নিত ভাণ্ডে সঞ্চিত হয়। ভাণ্ডের নিম্নস্থ রন্ধ্রবিশিষ্ট নল "ঙ" খুলিয়া ঐ তরল বায়ু ভাণ্ড হইতে বাহির করা যাইতে পারে।

এখন দ্বিতীয় প্রণালীতে যে বায়ুকে বর্ত্তমানে বহুল পরিমাণে তরল করা হইতেছে তাহার বিষয় আলোচনা করিব। আমরা দেখিয়াছি পরস্পর আকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে কাজ করিতে যাইয়া বায়ুর অন্তর্গত তাপশক্তির হ্রাস ঘটে। এইরূপে অন্য কোন বাহ্যিক কাজ করিলেও অণুসমূহের শক্তির অপচয় হয় ইহাও পরীক্ষার ফলে দেখা যায়, অর্থাৎ আমাদের যেমন কোন কাজ করিতে শক্তি ব্যয় করিতে হয় এবং গুরুতর কাজের দরুণ অধিক শক্তি ব্যয় করিলে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ি, বায়ু বা অন্য কোন মারুত পদার্থের অনুসমূহের কোন কাজ করিতে হইলে ঠিক তদ্রূপ শক্তি ব্যয় হয়। এবং তাহাদিগকে দিয়া বহুক্ষণ যাবৎ গুরুতর কাজ করাইলে শক্তির অতিঅপচয়ে তাহারাও শ্রান্ত হইয়া পড়ে। তাহারা তখন তাহাদের স্বাভাবিক চঞ্চলতা হারাইয়া তরল পদার্থের অণুর মত কথঞ্চিৎ জড়ভাবাপন্ন হয়। এই অবস্থায় তাহাদিগকে তরলপদার্থের অণুর মত এক স্থানে ধরিয়া রাখা সম্ভব হয়, অর্থাৎ তাহারা তরল অবস্থায় পরিণত হয়। চালকবিহীন গাড়ী লইয়া ঘোড়া যখন দৌড়াইতে থাকে তাহাকে তখন ধরিয়া রাখা সহজ নহে; কিন্তু দৌড়াইতে দৌড়াইতে সে যখন শ্রান্ত হইয়া পড়ে তখন সে অনায়াসেই ধরা দেয়। সেইরূপ স্বাভাবিক চঞ্চল ও গতিশীল বায়ুর অণুও ঘোড়ার মত কাজ করিতে করিতে শক্তি ব্যয় করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়ে। বাহ্যিক কাজ করিতে যাইয়া বহুল পরিমাণে তাপশক্তির ব্যয়ে যখন তাহারা অত্যন্ত শীতল বা জড় হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের তরল অবস্থায়ও পরিণতি ঘটে। প্রথমোক্ত প্রণালীতে বায়ুর অণুসমূহ শুধু পরস্পর আকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে কাজ করিয়া থাকে, কোন বাহ্যিক আবশ্যকীয় কাজ তাহাদিগের নিকট হইতে আদায় করা হয় না, এই জন্যই প্রথম প্রণালীকে বৈজ্ঞানিকগণ **"আভ্যন্তরীণ কাজের ফলে বায়ুর তরলাবস্থায়**

পরিণতি" এই নাম দিয়েছেন; কিন্তু সহজেই দেখা যায় যে দ্বিতীয় প্রণালীতে বায়ুকে তরল করিবার অনেক সুবিধা আছে। প্রথমতঃ বায়ুর অণুসমূহের উপর গুরুভার কাজ চাপাইয়া অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহাদিগকে তরল করা যাইতে পারিবে, এবং এক ঢিলে দুই পাখী মারার মত বায়ুকে তরল করিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার নিকট হইতে আমাদের আবশ্যকীয় অনেক কাজও আদায় করা যাইতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ প্রথমোক্ত প্রণালীর মত ইহাতে বায়ুকে গুরুতর চাপের অধীনে প্রথমে আবদ্ধ করিতে হয় না, অল্পচাপ প্রয়োগেই সুফল পাওয়া যায়। সুতরাং ইহাতে যথেষ্ট শক্তির অপচয় নিবারণ ও ব্যয়সংক্ষেপ ঘটে। বহুকাল যাবৎ অনেক বৈজ্ঞানিক এই সুবিধাকর প্রণালীতে বায়ু তরল করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, লিণ্ডেও তাহার মধ্যে একজন। কিন্তু কলকৌশল ও তাহার পরিচালনের নানাবিধ অসুবিধাহেতু তাঁহারা কেহই সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে লিণ্ডে প্রথমোক্ত প্রণালীতে বায়ুকে তরল করিবার উপায় আবিষ্কার করেন, কিন্তু ফরাসী দেশীয় বৈজ্ঞানিক ক্লাদ (Claude) বহুবৎসরব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও গবেষণার ফলে ১৯০২ খৃঃ অব্দে এই প্রণালীতে বায়ুকে বহুল পরিমাণে ও অতি সহজে তরল করিতে সক্ষম হন। তিনি পূর্ব্বোক্ত সর্ব্ববিধ অসুবিধা নানা চেষ্টা ও উদ্ভাবনার সাহায্যে অতিক্রম করিয়া সফলতা অর্জ্জন করেন। ২নং চিত্রে "ক্লাদ" উদ্ভাবিত যন্ত্রের একটি সরল প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। এই প্রণালীতে বাহ্যিক কাজের ফলের সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ কাজের ফলেরও সহায়তা পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা ইহাকে **"বাহ্যিক কাজের ফলে বায়ুর তরলাবস্থায় পরিণতি"** এই নাম দিয়াছেন। পৃথিবীর বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্রসমূহে লিণ্ডের ন্যায় ক্লাদের যন্ত্রেরও এখন বহুল ব্যবহার হইতেছে। এমন কি অনেক স্থলে পূর্ব্ব ব্যবহৃত লিণ্ডের যন্ত্রের পরিবর্ত্তে এই অধিক শক্তিশালী ক্লাদের যন্ত্র স্থান পাইতেছে। দমকলের সাহায্যে আভ্যন্তরীণ "ক" নলের মধ্য দিয়া স্বল্প চাপে প্রেরিত শুষ্ক, বিশুদ্ধ ও শীতল বায়ু "গ" চিহ্নিত মটর যন্ত্রে প্রবেশ করিয়া বাহ্যিক কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই বাহ্যিক ও সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ কাজের ফলে মুক্ত বায়ু শীতল হইয়া পড়ে। তৎপর এই প্রসারিত মুক্ত শীতল বায়ু বিপরীত দিকে "খ" চিহ্নিত বহির্নল ও আভ্যন্তরীণ "ক" নলের মধ্যবর্ত্তী পথ দিয়া দমকলাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করে। মটরযন্ত্রাভিমুখী চাপাবদ্ধ বায়ু ইহার শৈত্যাবরণ হেতু ক্রমশঃ শীতল হইতে থাকে, এবং বাহ্যিক কাজের পর মটরযন্ত্র হইতে বহির্গত হইয়া আরো শীতল হইয়া পড়ে। বারংবার এই প্রণালীতে অন্তর ও বহির্গমনের ফলে বায়ু এতই শীতল হইয়া পড়ে যে পরিশেষে ইহা তরলাবস্থার "ঘ" চিহ্নিত ভাণ্ডে জমিতে আরম্ভ করে, তখন ভাণ্ডনিম্নস্থ রন্ধ্রমুখ খুলিয়া উহা বহির্পাত্রে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কি পরিমাণে এই তরল বায়ু নানাবিধ শিল্পের জন্য বর্ত্তমানে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি মাত্র উদাহরণ দিয়া এখানে দেখাইতে চেষ্টা করিব। এই তরল বায়ু হইতে সহজেই বায়ুর একতম উপাদান যবক্ষারজানকে (Nitrogen) বিভিন্ন করিয়া লওয়া হয়। এবং এই যবক্ষারজান অপর্য্যাপ্তপরিমাণে কৃত্রিম সার (উদ্ভিদের খাদ্য) প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। সারপ্রস্তুতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কারখানা নরওয়ে দেশের অডা (Odda) নামক
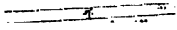
১নং চিত্র
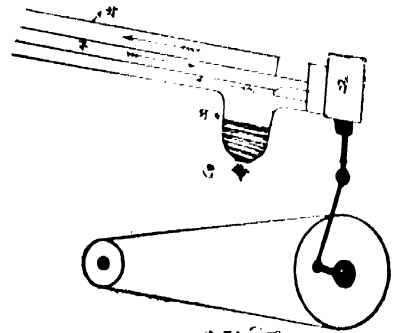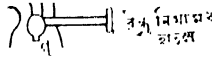
২নং চিত্র

৩ নং চিত্র।

৪ নং চিত্র।

৫ নং চিত্র।

৬নং চিত্র।

৭নং চিত্র।

৮ নং চিত্র।

৯ নং চিত্র।
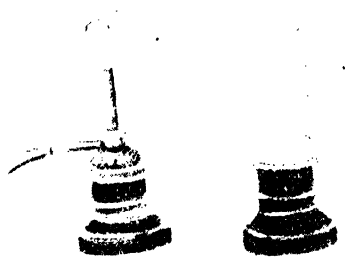
স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানে বায়ু তরলীকরণের যে যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে উহাতে দৈনিক ১০০ টন ওজনের (১ টন আমাদের ২৭ মণের সমান) তরল বায়ু প্রস্তুত হয়।

তরল বায়ুর অদ্ভুত গুণাবলীর কিঞ্চিৎ উদাহরণ দিয়া আমাদের প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

তরলবায়ুর তাপমাত্রা বিযুক্ত ১৯৩·৫° ডিগ্রি (—193·5° c) অর্থাৎ বরফের যে শীতলতা তাহা অপেক্ষাও ইহার শৈত্য ১৯৩°৫ ডিগ্রি অধিক। আমাদের সাধারণ বায়ুমণ্ডলের তাপ ২৫° ডিগ্রি হইবে—অবশ্য খুব শীতপ্রধান দেশে নহে। কাজেই তরল বায়ু যখন আমাদের সাধারণ বায়ুর সংস্পর্শে আসিবে তখন জ্বলন্ত তপ্তলৌহের উপর প্রক্ষিপ্ত জলের ন্যায় মুহূর্ত্তেই ইহা উড়িয়া যাইবে, এখন আপনারা নিঃসন্দেহই এ প্রশ্ন করিবেন) তাহা হইলে কি করিয়া ইহাকে সঞ্চয় করা হয়। ৩ নং চিত্রে তরল বায়ু সংরক্ষণের পাত্রের প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। ইহারা সকলেই দ্বিপর্দ্দারূপ অঙ্গবিশিষ্ট কাচের পাত্র; দুই পর্দ্দার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে পূর্ব্বেই বায়ুবিহীন করিয়া এই সমস্ত পাত্র গঠিত হয়। বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্রের সাহায্যে সমস্ত বায়ু বাহির করিয়া লওয়া হয়। অধিকন্তু পর্দ্দা দুইটীর ভিতরের দিক্ উজ্জ্বল রৌপ্যাস্তরণে আবৃত করা হয়। ইহাদের নাম ডেওয়ারের (Dewar's Vacuum Vessel) বায়ুহীন পাত্র। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে তাপ শক্তি বা তাপতরঙ্গ জড় পদার্থের অণুর সহযোগ ব্যতীত এক স্থান হইতে অন্যস্থানে প্রবাহিত হইতে পারে না, এবং উজ্জ্বল মসৃণ পাত্রের ভিতর দিয়া ইহা প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত পাত্রে তরল বায়ু সংগ্রহ করিলে বাহিরের তাপ পাত্রের মসৃণ গাত্র ভেদ করিয়া এবং পর্দ্দাভ্যন্তরস্থ বায়ুবিহীন অবকাশের মধ্য দিয়া তরল বায়ুতে পৌঁছিতে পারে না অতএব এইরূপে তরল বায়ু সংরক্ষণ করিলে উহা সহজে বাষ্পীভূত হইয়া পলায়ন করিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিযুক্ত ১৯৩°৫ ডিগ্রীর তাপে (—193·5 c) বা শৈত্যে তরলবায়ু জলের মত ফুটিতে থাকে। সুতরাং কোন সাধারণ পাত্রে তরল বায়ু রাখিয়া উহার চারিদিকে বরফ ঢালিয়া দিলেও উহা ভীষণ ভাবে ফুটিতে থাকিবে এবং উহা হইতে সজোরে বাষ্পীভূত বায়ু বিনির্গত হইতে থাকিবে। ৪নং চিত্রে এইরূপ পরীক্ষার নমুনা প্রতিকৃতির সাহায্যে দেখান গেল। পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন প্রকাণ্ড বরফের স্তূপের উপর স্থিত তরলবায়ুর পাত্র হইতে কিরূপ সজোরে বাষ্পোদ্গম হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে পাত্রের বহির্গাত্রের উপর বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প শৈত্য প্রভাবে জমিয়া বরফের আবরণ উৎপন্ন করিয়াছে। সাধারণতঃ এই পরীক্ষাকে "ঐন্দ্রজালিক বা মায়াময় কেতলি বা পাত্র" বলা হইয়া থাকে। কারণ এ যেন বরফের উপর বসাইয়া জল ফুটান হইতেছে।

কাজেই আমরা দেখিতে পাই বায়ুমণ্ডলের তাপে সাধারণ যে কোন পাত্রে তরলবায়ু সংরক্ষণ অসম্ভব। যদি পাত্রের মুখ ছিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হয় তবে মুহূর্ত্তমধ্যেই সেই ছিপি বাষ্পীভূত বায়ুর বেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে। ৫নং চিত্রে উহাই দেখান হইতেছে।

তরল বায়ু এতই শীতল যে যদি উহা হাতের উপর ঢালা যায় তবে আমাদের হাত জমিয়া পাথর হইয়া যাইবে বা আগুনে ঝল্সিয়া যেরূপ অসাড় হয় সেইরূপ দেখাইবে। এইরূপ অনুমান খুব স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই তরল বায়ু নির্ব্বিবাদে

হাতের উপর ঢালা যাইতে পারে; এমন কি মুহূর্ত্ত কাল অবধি ইহাতে আঙ্গুল ডুবাইয়া রাখা যাইতে পারে, কিম্বা জলের মত কোন নলের সাহায্যে টানিয়া মুখ গহ্বরে লওয়া যাইতে পারে। ইহাতে কোনই কষ্ট অনুভূত হয় না। তবে আঙ্গুল যদি অধিকক্ষণ ডুবাইয়া রাখা হয় তাহা হইলে আর রক্ষা নাই; উহা জমিয়া একটি শুষ্ক হলুদে রংএর পদার্থের মতন দেখাইবে, এবং এতই ভঙ্গুর হইবে যে সজোরে আঘাত দিলে উহা ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যাইবে, সেইরূপ মুখে টানিয়া লইবার সময় যদি হঠাৎ খানিকটা তরল বায়ু গিলিয়া ফেলা যায় তবে উহা পেটে যাইয়া দেহাভ্যন্তরীন উত্তাপে হঠাৎ বাষ্পীভূত হইয়া এমন বাড়িয়া উঠিবে পরীক্ষাকারীর উদর বেলুনের মত ফুলিতে থাকিবে এবং তৎক্ষণাৎ বিশেষ উপায়াবলম্বনে উহাকে নাকে মুখে বাহির করিয়া না দিলে বিপদ ঘটিবারও সম্ভাবনা আছে, তবে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য যে নির্ব্বিবাদে ইহাকে হাতের উপর ঢালা বা মুখের অভ্যন্তরে গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে। অতিশীতল তরলবায়ু হাতের নিকটে আসিলেই শরীরের তাপে তখনই আংশিক ভাবে বাষ্পীভূত হইয়া পড়ে, সুতরাং হাতের চামড়ার সহিত তাহার সংস্পর্শ ঘটেনা। তবে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঢালিতে থাকিলে তরলবায়ুর নৈকট্য বশতঃ হাতও ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে, তখন ইহার সহিত শীতল বায়ুর সহজ সংস্পর্শ ঘটে। তখনই বিপদ অবশ্যম্ভাবী। একই কারণে মুখের অভ্যন্তরেও ইহাকে মুহূর্ত্তমাত্র রাখা যাইতে পারে, এখানেও দেরীতে বিশেষ বিপদ ঘটে; এ যেন ঠিক উত্তপ্ত রক্তবর্ণ লোহার উপর শীতল জলের বিন্দু নিক্ষেপ করা হইতেছে। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন এইরূপ অবস্থায় জল বিন্দুটি কিছুকালের জন্য লোহার সংস্পর্শে না আসিয়া উহার কিঞ্চিৎ উপরে শুধু নৃত্য করিতে থাকে; অবশ্য পরিশেষে অত্যধিক উত্তাপে উহা সম্পূর্ণ বাষ্পীভূত হইয়া যায়। ইহার কারণ, পড়িবা মাত্রই জ্বলন্ত লোহার প্রখরতাপে জলবিন্দুর কিয়দংশ বাষ্পীভূত হইয়া লৌহ ও উহার মধ্যে একটি ব্যবধান তৈয়ার করিয়া রাখে, তাহাতে জলবিন্দুটি কিছুক্ষণের জন্য লৌহ তাপ হইতে রক্ষা পাইয়া অবস্থিতি করিতে পারে; ৬নং ও ৭নং চিত্রে পাঠকগণ পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারের পরীক্ষার প্রতিকৃতি দেখিতে পাইবেন।

আর একটি বিস্ময়কর পরীক্ষার বিবরণ উল্লেখ করিব। একটি নলসংযুক্ত ধাতু গোলক তরলবায়ুর ভিতর কিছুকালের জন্য ডুবাইয়া শীতল করিয়া যদি পুনরায় উহাকে কোন অগ্নি-শিখার ভিতর ধরিয়া রাখা হয় তবে কিছুকাল যাবৎ এই অগ্নিশিখার ভিতর উহার চারিদিকে ক্রমশঃ বরফের আবরণ পড়িতে থাকিবে, সত্যই ইহা বৈজ্ঞানিকের ইন্দ্রজাল! ইহার কারণ বিশেষ দুর্ব্বোধ্য নহে। তরলবায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া ধাতব গোলকটি প্রায় বিযুক্ত ১৯৩.৫ ডিগ্রির শৈত্য মাত্রায় শীতল হয়। তখন ইহাকে অগ্নিশিখার মধ্যে ধরিলে অগ্নিশিখাজাত জলীয় বাষ্প উহার সংস্পর্শে বরফ হইয়া উহার চারিদিকে জমিতে থাকে, অবশ্য কিছুক্ষণ পরে অগ্নিশিখার তাপে যখন ঐ ধাতব গোলকও পুনরায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে তখন এইরূপ অদ্ভুত দৃশ্য আর দৃষ্টিগোচর হইবে না। ৮ নং চিত্রে ইহাই দেখান হইতেছে।

আমাদের নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী, ফল ফুলুরি যেমন আঙ্গুর কমলালেবু ইত্যাদি জিনিষকে যদি তরলবায়ুতে ধুইয়া লওয়া হয় তবে উহা এতই শক্ত হয় যে উহা চিবাইয়া নরম

করা ত দূরের কথা, কাহারো মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলে রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী। এক একটি আঙ্গুরফল যেন এক একটি মার্ব্বেল পাথরের বল বা গোলা হইয়া পড়ে, অবশ্য এই অবস্থা চিরস্থায়ী নহে, কিছুক্ষণ পরেই উহারা উহাদের স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। খানিকটা পারদ যদি একটি কাচের নলে ঢালিয়া তরলবায়ুর মধ্যে ডুবাইয়া রাখা যায়, তবে উহার ভিতর পারদ জমিয়া এতই কঠিন হয় যে ঐ কঠিন পারদ নল হইতে বাহির করিয়া হাতুড়ির মত কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। ৯ নং চিত্রে এইরূপ পারদের হাতুড়ির সাহায্যে পেরেক পোতা হইতেছে ইহাই দেখান যাইতেছে।

আর একটি মাত্র অদ্ভুত পরীক্ষার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। একটি মৃদুভাবে জ্বলন্ত বা দীপ্ত দেশলাইএর কাঠি যদি তরলবায়ুতে ডুবান যায় অনেকেই মনে করিবেন যে অতিমাত্র শৈত্যের সংস্পর্শে উহা তৎক্ষণাৎ একেবারেই নিবিয়া যাইবে, কিন্তু ঠিক বিপরীত দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ নির্ব্বাণোন্মুখ দেশলাই কাঠি ভীষণভাবে জ্বলিয়া উঠে। অধিক উত্তাপ ও ভীষণ শীত যেন এই দৃশ্যে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া আছে দেখিতে পাইবেন। কথায় বলে ভাল মন্দ সবকিছুরই একই চরম পরিণতি ঘটে—Extremities meet! এইরূপ ঘটিবার কারণ নির্দ্দেশ কিছুই কঠিন নহে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি বায়ুর একতম উপাদান অম্লজান (oxygen) অগ্নিপ্রজ্বালনের প্রধান সহায়। তরল বায়ুতে ঐ অম্লজানও তরল অবস্থায় ঘনীভূত হইয়া আছে। এই ঘনীভূত অম্লজানের প্রভাবে অগ্নিশিখা সহজেই প্রবল হইয়া উঠে।

অদ্যকার মত বায়ুর জীবন কাহিনী এই খানেই শেষ করি।

এই প্রবন্ধে প্রদর্শিত চিত্র ক্লাদে কৃত Liquid Air নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়।

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

(৭)

বঙ্কিম চন্দ্র

রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের আলোচনার সময় বঙ্কিমের উপন্যাস সমূহের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ হইয়াছে। এখন কেবল কলাকৌশলের দিক্ দিয়া তাঁহার উপন্যাসাবলীর কালানুক্রমিক বিচার করিতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাঙ্গালা উপন্যাস পূর্ণ যৌবনের শক্তি ও সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে যে ক্ষীণতা, কল্পনাদৈন্য, ও ভাবগভীরতার অভাবের পরিচয় পাই, তাহার চিহ্ন বঙ্কিমের উপন্যাসে লুপ্ত হইয়াছে। তাঁহার সব কয়টী উপন্যাসের মধ্যেই একটা সতেজ ও সমৃদ্ধ ভাব খেলিয়া যাইতেছে, জীবনের গভীর রস ও বিকাশগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে,

ও জীবনের মর্ম্মস্থলে যে নিগূঢ় রহস্য আছে, তাহার উপর আলোকপাত করা হইয়াছে। অবশ্য আধুনিক বাস্তব-প্রবণতার জন্য উপন্যাস সম্বন্ধে আমাদের রুচি ও আদর্শের অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে; উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা যেরূপ নিখুঁত বাস্তবতার দাবী করি, রোমান্সের আকাশ বাতাসে পরিবর্দ্ধিত বঙ্কিম ততখানি দাবী পূরণ করেন না। কিন্তু জীবন সম্বন্ধে একটা সাধারণ সত্য ধারণা দেওয়া যদি ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব হয়, এবং বাস্তবতা যদি সেই সত্যলাভের অন্যতম উপায়মাত্র হয়, তাহা হইলে আধুনিক বাস্তবাতিশয়ের অভাব বঙ্কিমের গুরুতর দোষ বলিয়া বিবেচিত হইবে না; কেননা, তাঁহার সমস্ত উপন্যাসের উপরই একটী বৃহত্তর সত্যের ছাপ বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তথ্যের রন্ধ্রগুলি তিনি কল্পনার দ্বারা পূরণ করিয়াছেন; কিন্তু মোটের উপর তাঁহার জীবন চিত্রণ সত্যানুগামী হইয়া উঠিয়াছে; জীবনকে বিচিত্র রসে পূর্ণ ও কল্পনার ইন্দ্রজালে বেষ্টন করিয়াছেন বটে কিন্তু সত্যের সূর্য্যালোকের পথ অবরুদ্ধ করেন নাই। ইহাই তাঁহার চরম কৃতিত্ব; তিনি সত্যকে রসহীনতা ও নির্জ্জীবতার উপর প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, জীবনের সত্য চিত্র দিতে গিয়া তাহাকে শুষ্ক করিয়া ফেলেন নাই, পরন্তু বিচিত্র রসের উৎসারের মধ্যেই ইন্দ্রধনুবর্ণরঞ্জিত সত্যের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। এ সমস্ত বিষয়ের সাধারণ আলোচনা পরে হইবে; এখন আমরা বঙ্কিমের প্রত্যেক উপন্যাস বিশ্লেষণ করিয়া তাহারা কতদূর পর্য্যন্ত মানবহৃদয়ের গভীরস্তরে প্রবেশ করিয়াছে, ও জীবন সম্বন্ধে সত্য ধারণা ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমের সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস। ইহা ১৮৬৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। শচীশ বাবু তাঁহার বঙ্কিমজীবনীতে লিখিয়াছেন যে বঙ্কিমের ভ্রাতারা দুর্গেশনন্দিনী সম্বন্ধে বিশেষ অনুকূল মত প্রকাশ করেন নাই, এবং অনেকটা তাঁহাদের প্রতিকূল মন্তব্যে নিরুৎসাহ হইয়াই বঙ্কিম উহার মুদ্রাঙ্কণ কিছুদিন স্থগিত রাখেন। অবশ্য তাঁহাদের প্রতিকূল সমালোচনার হেতু কি ছিল, তাহা আমরা জানিনা; কিন্তু সমসাময়িক সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই বিরুদ্ধ মত আমাদের নিকট একটা নিতান্তই বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। আজকাল যুগান্তর শব্দটা আমরা যখন তখন ও নিতান্ত সামান্য কারণেই, অনেকটা ভাষাতে তীব্রতা যোজনার জন্যই ব্যবহার করিয়া থাকি; কিন্তু ইহা বলিলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না যে দুর্গেশনন্দিনী বাস্তবিকই বঙ্গ-উপন্যাস-জগতে একটী যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস আলালের ঘরের দুলালের সঙ্গে ইহার ব্যবধান বিস্তর; আলালের ঘরের দুলালে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস সম্পূর্ণ দানা বাঁধিয়া উঠে নাই, উপন্যাসের উপাদানগুলি অনেকটা বিক্ষিপ্ত ও আকস্মিক ভাবেই উপস্থিত থাকিয়া একটী রসমূলক ও মনস্তত্ত্বমূলক যোগসূত্রের প্রতীক্ষা করিতেছিল; বিশেষতঃ ইতিহাসের বিশাল ক্ষেত্র উপন্যাসের নিকট রুদ্ধ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এক মুহূর্ত্তে ইতিহাসের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিয়া উপন্যাসের সীমা, বিস্তার ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আশ্চর্য্য ভাবে বাড়াইয়া দিলেন; ইতিহাসের ঘটনাবহুল, উদ্দীপনাময় ক্ষেত্র হইতে বিচিত্র রস ও বর্ণ সংগ্রহ করিয়া, জীবনকে রঞ্জিত করিলেন, তাহার সাধারণ গতিবেগ বর্দ্ধিত করিলেন ও আমাদের দৈনিক হৃদয়-স্পন্দনকে দ্রুততর করিয়া দিলেন। ইতিহাসের সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্ত্তগুলিতে জীবনে যে অসাধারণ আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সঞ্চার হয়, আমাদের

সাধারণ জীবনের শীর্ণ নদীতে যে প্রবল স্রোতোবেগ প্রবাহিত হয়, তাহার পরিচয় দিলেন অতএব দুর্গেশনন্দিনী আমাদের উপন্যাসসাহিত্যে একটী নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছে; যে পথ দিয়া উহার অশ্বারোহী পুরুষটী অশ্বচালনা করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃত পক্ষে রোমান্সের রাজপথ, এবং বঙ্গউপন্যাসে প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রই এই রাজপথের রেখাপাত করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রথম রচনায় অপরিণতির চিহ্ন অনেক। ইহার ঐতিহাসিক আবেষ্টনের বিরলসন্নিবেশের বিষয় আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। মোগল পাঠানের যুদ্ধ বৃত্তান্ত নিতান্ত ক্ষীণ রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে; ঐতিহাসিক পুরুষগুলির— মানসিংহ, কতলুখাঁ প্রভৃতির চরিত্রও বিশেষ গভীরতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সহিত চিত্রিত হয় নাই। ঐতিহাসিক প্রতিবেশ রচনা বঙ্কিমের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, বর্ণিত যুগের বিশেষত্ব ফুটাইয়া তোলাতেও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না; তবে ঐতিহাসিক বিপ্লব একজন সাধারণ দুর্গস্বামীর ভাগ্যের উপর কিরূপ অতর্কিত বজ্রপাতের মত আসিয়া পড়ে, তাহার একটী জ্বলন্ত চিত্র আমরা উপন্যাসটিতে পাই। কয়েকটী ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদের মধ্যেই বঙ্কিম এই প্রলয় ঝটিকার প্রথম আবির্ভাব হইতে শেষ পরিণতি পর্য্যন্ত দেখাইয়াছেন; ইহাদের মধ্য দিয়া ঘটনা পুঞ্জ আশ্চর্য্য দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হইয়াছে। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে দিগ্‌গজ বিমলার সমস্ত লঘু হাস্য-পরিহাসের অবাস্তবতাকে ছাপাইয়া এক অজ্ঞাত অথচ আসন্ন বিপদের শঙ্কা ঘনাইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, দুর্গজয়ের বিবরণ, ওস্‌মানের কৌশল বিমলার সপ্রতিভতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বীরেন্দ্রসিংহের উন্মত্ত যুদ্ধচেষ্টা জগৎসিংহের বীরত্ব সমস্তই একটা প্রকৃত যুদ্ধের ভীষণতায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। বীরেন্দ্রসিংহের বিচারের দৃশ্যে তাঁহার দৃঢ় তেজস্বিতা ও বংশ গৌরব সম্বন্ধে প্রচণ্ড অভিমান অতীতের উত্তেজনাময় ক্ষেত্রে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎক্ষেপের মত মানব মনের যে উদ্দাম বিকাশ হইয়া থাকে, তাহার একটী সুন্দর উদাহরণ। কতলুখাঁর হত্যার দৃশ্যটীও অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাসময় ভাষার সাহায্যে একটী মদির মোহে আচ্ছন্ন হইয়াছে। অবশ্য এখানে বঙ্কিম উপন্যাস অপেক্ষা গীতিকাব্যেরই অধিকতর উপযোগী গুণের পরিচয় দিয়াছেন। কারাগারে আয়েষার প্রেমাভিব্যক্তিটীও চমৎকার কলাকৌশলের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে; একটা অপ্রত্যাশিত বিকাশের বিস্ময় আমাদের মনকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে। এখানে বঙ্কিমের প্রণালী বাস্তব ঔপন্যাসিকের প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; তিনি আয়েষার মনে প্রথম প্রণয় সঞ্চার ও উহার ক্রমবৃদ্ধির কোন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেন নাই; তাহার সেবা ও সহানুভূতি যে কোন গোপন মুহূর্ত্তে প্রণয়ে রূপান্তরিত হইল, বা ওস্‌মানের প্রতি স্নেহের সহিত এই নবজাত প্রেমের কোন বিরোধ সংঘর্ষ হইয়াছিল কি না তাহার কোন পরিচয় দেন নাই; একেবারে পূর্ণবিকশিত অপ্রতিরোধনীয় প্রেমের বিকাশ দেখাইয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছেন, ও ইহার রহস্যময় প্রকৃতিটীর একটি নূতন দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়াছেন। অবশ্য পারিবারিক বা সামাজিক উপন্যাসে আমরা এই সমস্ত ভাব বিকাশের একটি সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ, একটী প্রকৃতিমূলক ব্যাখ্যা আশা করিয়া থাকি; এবং বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার পরবর্ত্তী দুই একখানি উপন্যাসে—'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'বিষবৃক্ষে' এইরূপ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার

প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রথম উপন্যাসে, কতকটা ঐতিহাসিক ঘটনা বাহুল্যের জন্য, ও কতকটা একটা অপ্রত্যাশিত পরিণতির অবতারণার দ্বারা গল্পাংশের আকর্ষণ বৃদ্ধি করিবার জন্য, এরূপ মনস্তত্ত্বমূলক বিশ্লেষণে হস্তক্ষেপ করেন নাই। অবশ্য মনস্তত্ত্ব আলোচনার দিক্ হইতে ইহাকে একটি ত্রুটি বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

চরিত্র সৃজনের দিক্ দিয়াও বঙ্কিম এই উপন্যাসে খুব উচ্চ অঙ্গের কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই; চরিত্র ফোটাইয়া তোলা এখানে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল বলিয়াও মনে হয় না। ঘটনার প্রবল প্রবাহের মধ্যে তিনি কোথাও অধিকক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পান নাই, ঐতিহাসিক স্রোতের মধ্যে দীর্ঘ ও গভীর চরিত্র বিশ্লেষণের অবসর পান নাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অনেকগুলি চরিত্র স্বল্প দুই একটা রেখায় বেশ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। দুই তিনটী দৃশ্যের মধ্যেই বীরেন্দ্র সিংহের চরিত্রের অসীম দাঢ্য ও অহঙ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে। ওস্মানের হৃদয়ে একটী অনির্ব্বাণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তীব্র হিংসার বিকাশ দেখাইয়া বঙ্কিম তাহাকে একটী বাস্তব মূর্ত্তি করিয়া তুলিয়াছেন, একটা বিশেষত্বহীন আদর্শমাত্রে পর্য্যবসিত হইতে দেন নাই। এই হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ক্রোধেই তাহাকে একটা বিশেষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, একটী দেশ্ কালোচিত উপযোগিতা আনিয়া দিয়াছে। স্ত্রীচরিত্রগুলির মধ্যে, তিলোত্তমা, বিমলা, ও আয়েষার রূপ ও প্রকৃতির বিভিন্নতা বঙ্কিম কেবল একটী অদ্ভুত শব্দসম্পদের দ্বারাই ফুটাইয়াছেন; 'তিলোত্তমা' ও 'আয়েষা' প্রায়ই নীরব, নিতান্ত স্বল্পভাষী; অথচ কেবল মাত্র নিপুণ শব্দচয়নের দ্বারা লেখক তাহাদের স্বাতন্ত্র্য ও প্রকৃতিগত প্রভেদটী এমন সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিলোত্তমার বালিকাসুলভ, ব্রীড়াবনত প্রেম-বিহ্বলতা, ও আয়েষার মহীয়ান্ গাম্ভীর্য্য ও গভীর আত্মসংযম, ইহাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন যে তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধে ভুল করিবার আমাদের কোনও অবসর থাকে না।

'দুর্গেশ-নন্দিনী' উপন্যাসে ঘটনা বৈচিত্র্যে গল্পাংশের আকর্ষণই প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে; বিশ্লেষণ ও কথোপকথনের দ্বারা চরিত্র চিত্রণের তাদৃশ চেষ্টা হয় নাই। তথাপি দুই একটী স্থলে কথোপকথনেও বঙ্কিম বেশ দক্ষতা ও কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। বিশেষতঃ শৈলেশ্বর মন্দিরে বিমলা ও জগৎসিংহের যে দুইবার কথোপকথন হইয়াছে, তাহার মধ্যে লেখকের যথেষ্ট শক্তি ও কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য কেবল গল্প-রচনার দিক্ দিয়াও নবীন লেখকের যে দুই একটী ত্রুটি বিচ্যুতি পাওয়া যায় না, এমন নহে। বিমলা ও বীরেন্দ্রসিংহের মধ্যে সম্বন্ধটী অনাবশ্যক জটিলতা ও রহস্যে আবৃত করা হইয়াছে; এবং বিমলার দীর্ঘ আত্মপরিচয়পত্রে কতকগুলি ব্যাপারের অসম্ভাব্যতা পাঠকের বিদ্রোহোন্মুখ মনকে পীড়িত করিতে থাকে। দিগ্‌গজ-উপাখ্যানের সমস্তটাই, স্থানে স্থানে প্রকৃত রসিকতা থাকা সত্ত্বেও, মোটের উপর আতিশয্য ও অতিরঞ্জনের দ্বারা বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেক উপন্যাসেই যে সন্ন্যাসী জাতীয় একটা জীব প্রবর্ত্তন করিয়া অতিপ্রাকৃতের অবতারণা করিবার পথটী খুলিয়া রাখেন, তাহার প্রথম নিদর্শন আমরা অভিরামস্বামীতে পাইয়া থাকি। অভিরামস্বামীর আখ্যায়িকার মধ্যে বিশেষ কোন কার্য্য নাই; তিনি কেবল বিমলা বীরেন্দ্রসিংহের গোপন সম্বন্ধের একটা জীবন্ত নিদর্শন স্বরূপই উপন্যাস মধ্যে স্থান লাভ

করিয়াছেন; আর বীরেন্দ্রসিংহকে মোগল-পক্ষ অবলম্বনের প্রবৃত্তি দিয়া গল্পের tragedy কে আসন্নতর করিয়া দিয়াছেন। তবে বঙ্কিম এই প্রথম উপন্যাসে তাঁহার সন্ন্যাসীকে একেবারে রমানন্দ স্বামী বা সত্যানন্দের মত আদর্শলোকের কুহেলিকার মধ্যে লইয়া যান নাই; তাঁহাকে এক জ্যোতিষজ্ঞান ছাড়া আর কোন অতিমানবগুণের অধিকারী করিয়া দেখান নাই; এমন কি তাঁহার যৌবনের পদস্খলনের পরিচয় দিয়া বাস্তবতার দিক হইতে যথেষ্ট সাহসেরই পরিচয় দিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের আর্টের আর একটী লক্ষণও 'দুর্গেশনন্দিনী'তে সূচিত হইয়াছে। বঙ্কিম তাঁহার প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই বাস্তব বর্ণনার মধ্যে একটা অতিপ্রাকৃতের ছায়াপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন কোন উপন্যাসে এই অতিপ্রাকৃতের ছায়া সম্ভব অসম্ভবের সীমা রেখা অতিক্রম করিয়া যায় না; মানুষের মানসিক অবস্থার সহিত একটা গূঢ় সাঙ্কেতিকতার সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে; ইউরোপের নিতান্ত আধুনিক গল্প নাটকে যে একটা symbolism, একটা রহস্যের ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা অনেকটা তাহারই অনুরূপ। ইহা প্রায়ই স্বপ্ন বা অন্য কোন গুরুতর মানসিক বিকারের রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, এবং কোন কোন স্থলে ইহার একটী সন্তোষজনক মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ 'বিষবৃক্ষে' কুন্দনন্দিনীর ও 'রজনী'তে শচীন্দ্রের স্বপ্ন উল্লেখ করা যাইতে পারে; শৈবলিনীর বিকারগ্রস্ত মস্তিষ্কের নরক বিভীষিকার প্রতিচ্ছায়া ইহার চরম দৃষ্টান্ত। যোগবলের দ্বারা শৈবলিনীর অমানুষিক শক্তিলাভও চন্দ্রশেখরে স্থান পাইয়াছে; আনন্দমঠে গ্রন্থশেষে যে মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাই, তিনি যে অতিমানবেরও অনেক উর্দ্ধে তাহা স্বীকার করিতে আমাদের অণুমাত্রও দ্বিধা থাকে না। অবশ্য উপন্যাসের বাস্তবতার দিক্ দিয়া ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিই অগ্রাহ্য ও সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য; বাস্তব জগতের শেষসীমা বা চরম সম্ভাবনার মধ্যেও তাহাদিগকে স্থান দিতে পারি না। কিন্তু সম্ভব হউক, অসম্ভব হউক, উপন্যাসের পক্ষে উপযুক্ত হউক, অনুপ-যুক্ত হউক, এই আলো-ছায়া-মিশ্র, রহস্য-সঙ্কেত-পূর্ণ বাস্তব-অবাস্তবের সীমান্ত প্রদেশের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের একটী স্বাভাবিক প্রবণতা ও দৃঢ় আকর্ষণ ছিল সন্দেহ নাই। তাঁহার সমস্ত অবাস্তব-ব্যাপারের মধ্যেও এমন একটা দৃঢ় সংযম ও সঙ্গতি, এমন একটা আন্তরিকতা ও অভ্রান্ত কল্পনা সমৃদ্ধির পরিচয় পাই, যাহাতে সেগুলিকে একটী উচ্চ সৃজনী-শক্তির ফল বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা বাধ্য হই; তাহারা যে কেবল কল্পনার বিলাস-বিভ্রম, বা অসংযত উচ্ছ্বাস-চাপল্য নহে, লেখকের অন্তঃকরণের একটী গভীর স্তরে যে তাহাদের মূল আছে, তাহা আমাদের স্বতঃই প্রতীতি জন্মে। বঙ্কিমের মধ্যে যে সুপ্ত কবিটী কবিতার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন নাই, তিনিই যেন প্রতিশোধ লইবার জন্য ঔপন্যাসিকের বাস্তব-চিত্রগুলির উপর কল্পলোকের এক অসম্ভব আলোক নিক্ষেপ করিয়া উপন্যাসগুলিকে রহস্য-জটিল ও দুরধিগম্য করিয়া তোলেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে তিলোত্তমা আরোগ্যলাভের পর জগৎসিংহের নিকট তাঁহার রুগ্নশয্যার যে স্বপ্নবিবরণটা বলিয়াছেন, তাহা এই নিগূঢ় সৌন্দর্য্যের আলোকে প্লাবিত হইয়া উঠিয়াছে, অথচ উপন্যাসোচিত বাস্তবতার সীমাও লঙ্ঘন করে নাই। এই একটী ক্ষুদ্র বর্ণনাতেই তাঁহার কল্পনাশক্তির অসাধারণ ভবিষ্যৎ বিকাশের বীজটী পাওয়া যায়।

'দুর্গেশনন্দিনী' সম্বন্ধে আমাদের মতামতের একটা সংক্ষিপ্তসার দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 'দুর্গেশনন্দিনী' ঐতিহাসিক উপন্যাস; সুতরাং চরিত্রাঙ্কণ অপেক্ষা ঘটনাবৈচিত্র্যের দিকেই লেখকের অধিক মনোযোগ। গল্প-রচনাতে নবীন লেখক যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন; ঐতিহাসিক বিপ্লব যে দুর্দ্দমনীয় বেগের সহিত সাধারণ জীবনের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়, কয়েকটি অধ্যায়ে তাহা বিশেষ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। চরিত্রাঙ্কণের দিক্ দিয়া খুব গভীর বাস্তবতা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পরিচয় পাই না; তবে গুরুতর বাহ্যঘটনার অভিভবের মধ্যে যতটুকু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকশিত হওয়া সম্ভব, বঙ্কিমচন্দ্র ততটুকু সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন। বিমলা, জগৎসিংহ, কতলুখাঁ, বিদ্যাদিগ্‌গজ, আয়েসা, তিলোত্তমা—ইহাদের চরিত্রের খুব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ না হইলেও, লেখক ইহাদের গভীরতম বাস্তব স্তর স্পর্শ না করিলেও, ইহাদিগকে ছায়াময় বা প্রাণহীন বলিয়া কখনই মনে হয় না। বীরেন্দ্রসিংহ ও ওস্‌মানের ক্ষেত্রে, চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের জন্য, তাঁহাদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য আর একটু স্ফুটতর হইয়াছে। গভীর বিশ্লেষণ-শক্তির অভাব জন্য বঙ্কিমকে দোষ দিবার পূর্ব্বে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, যে ঐতিহাসিক উপন্যাসে সাধারণতঃ জীবনের যে অংশ আলোচিত হয়, তাহা খুব বাস্তব স্তর পর্য্যন্ত প্রবেশ করে না। কিন্তু একটা বাহ্য চাকৃচিক্য ও আদর্শ উজ্জ্বলতায় আপনাকে প্রকাশ করে—যুদ্ধক্ষেত্রে বিপদের মধ্যে যেমন চিরন্তন পারিবারিক সুখ দুঃখের কথা চাপা পড়ে, সেইরূপ ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঘটনা বৈচিত্র্যের মধ্যে মানুষের প্রাথমিক বাস্তব গুণগুলি একটা বীরোচিত প্রকাশ, একটা আদর্শ জ্যোতিঃমণ্ডলের অন্তরালে ঢাকা থাকে। এই হিসাবে বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস তাঁহার প্রতিভার অনুপযুক্ত দান হয় নাই ও পূর্ব্ববর্ত্তী উপন্যাস সমূহের তুলনায় ইহা যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে একটা যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিখ

(১)

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অপচার রোধ করিবার উপায়রূপে অহিংস অসহযোগকে ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে কিনা, সমস্ত ভারতবর্ষ গান্ধীজীর বাণী শুনিয়া যখন এই প্রশ্নের কোন সত্য সমাধান করিতে পারিতেছিল না, তখন এই ভারতেরই এক প্রান্তে পঞ্চনদবিধৌত পাঞ্জাবে সমরকুশল শিখগণ তাহাদের সামাজিক ও ধর্ম্মজীবনের অপচার রোধ করিবার জন্য রাষ্ট্রীয় ও পৌরাহিত্যের প্রবল শক্তিমান স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। অহিংসাকে এরূপ ব্যাপকভাবে জাতি বা ধর্ম্মহিসাবে নিজেদের সমগ্র জীবনে গ্রহণ করা ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষে বর্ত্তমান কালে কখনও হয় নাই। য়ুরোপের ইতিহাসের খৃষ্টীয়শতকের প্রথম যুগে পরাক্রান্ত রোমক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান মুষ্টিমেয়, খৃষ্টের বাণীমুগ্ধ ভক্ত খৃষ্টিয়ানদিগের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে।

এতদিন সকলে জানিত সকল প্রকার অত্যাচারের প্রতিরোধের পন্থা হিংসামূলক আঘাতমূলক বিদ্রোহ; সুতরাং শিখদের এই অহিংস সংগ্রামে সমস্ত ভারতবর্ষের উৎসুক দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িয়াছে।

তাহারা জয় লাভ করিয়াছে; যদিও তাহাদের এ সংগ্রাম শেষ হয় নাই, যদিও রক্তবীজ-প্রাণ অপচার একের পর একটী করিয়া জন্ম লাভ করিতেছে, নূতন আকারে দেখা দিতেছে, তবুও একটী সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া, বিরোধের এই অভিনব পন্থা যে শ্রেয় এবং কাম্য, ইহা প্রমাণ করিয়া শিখগণ আজ জগতের ইতিহাসে এক নূতন আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছে।

কিন্তু যে জাতি বৃটিশ বাহিনীতে নির্ভীক সমরকুশল শ্রেষ্ঠ সৈন্য যোগাইয়া আসিয়াছে, যে জাতি গুরুগোবিন্দের নেতৃত্বে মুসলমান অত্যাচারে, রণজিৎসিংহ ও ফুলাসিংহের অধীনে ইংরেজশক্তির সশস্ত্র প্রতিকূলতা করিয়া জয়লাভ করিয়াছে, যাহাদের জীবনে অহিংসা অপেক্ষা হিংসা এবং আঘাতই সহজবোধ্য ও সহজগ্রাহ্য, তাহারা কোন্ শক্তির প্রেরণায় এই অভিনব পথ গ্রহণ করিল এবং তাহাদের ধর্ম্মে ও সমাজধর্ম্মে কি এমন ছিল, যাহার জন্য তাহারা এই প্রতিকূল আবেষ্টনের ভিতরেও জয় লাভ করিল, এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে।

আজিকার দ্বিধাসঙ্কুল, সংশয়ক্ষুব্ধ রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের দিনেও এই প্রশ্নের একটা উত্তর পাইলে অনেক সংশয় দূর হইতে পারে।

ইহার উত্তর পাইতে হইলে শিখধর্ম্মের ও জাতির ইতিহাস আলোচনা করার প্রয়োজন।

যুগের পর যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া, ভারতের জ্ঞানের ভাণ্ডারকে যে বিবিধ বিচিত্র ঐশ্বর্য্যে সম্পদবান করিয়া, যে একটী অখণ্ড জ্ঞানের তপস্যার ভারতবর্ষ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ হইয়া আমরা সে গুলির প্রতি উদাসীন আছি। তাই ভারতবর্ষের অখণ্ড মূর্ত্তিটী আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না, তাই মারহাট্টার অভ্যুদয়, শিখের জাগ্রতি আমাদের ভারতের ইতিহাসে আগ্নেয়-গিরির আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতেরই মত বিচ্ছিন্ন, পৌর্ব্বাপর্য্যহীন বলিয়া মনে হয়।

আজ যে শিখ জাগিয়াছে, তাহার এ জাগ্রতি আকস্মিক নহে এ কথাটা বুঝিতে হইলে তাহাদের ধর্ম্ম ও জাতীয়তার কি ভাবে ক্রমবিকাশ হইয়াছিল, ভারতের ইতিহাসের লুপ্তপ্রায় অধ্যায়ের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে এক দীন বেদিক্ষত্রিয়ের গৃহে জন্মলাভ করিয়া গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৮) ভারতের ভূমিতে এই যে সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করিয়া দিয়াছিলেন, তেগ্‌বাহাদুর এই জাতিপ্রতিষ্ঠার যজ্ঞে নিজের জীবনাহুতি দিয়াছিলেন, গুরু গোবিন্দ শিখধর্ম্মের ও জাতীয়তার যে উদ্বোধনে শস্ত্রপাণি ঋত্বিকের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই শিখ ধর্ম্ম ও জাতি ভারতের ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব স্থান গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। নানক আসিয়া দেখিলেন ভারতবর্ষ কুসংস্কারাচ্ছন্ন, জাতীয়তাবোধহীন, গৃহকলহরত, ধর্ম্মবিমুখ, শতবন্ধনে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন; দেশ তখন পদে পদে সকল লাঞ্ছনা অবনতশিরে গ্রহণ করিয়া জয়চাঁদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে; ইহার প্রতিকারের কোন চেষ্টাই নাই।

তিনি প্রচার করিলেন এক পরব্রহ্মের উপাসনা, তিনি সৎ, শ্রী, অকাল। ব্রাহ্মণের

আভিজাত্যের ও দেশের শত্রুর হস্ত হইতে মুক্তির পথ দেখাইবার জন্য, শিখ ও পন্থের সৃষ্টির সূত্রপাত করিয়া তিনি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীকে মিলাইবার আয়োজন করিয়া গেলেন। তিনি জাতিভেদ মানিলেন না; সহস্রকোটী দেবতা মিলিয়া অজ্ঞ হিন্দুর মনে ভেদবুদ্ধি জাগাইয়া যে তাহাদের জীবন বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, যে গুণকর্ম্মবিভাগজাত জাতিভেদের আদর্শের ব্যভিচারে ব্রাহ্মণ্যের অন্যায় অত্যাচার হইতেছিল, তাহা হইতে দেশকে মুক্তি দিবার জন্য তিনি বলিলেন, "ঈশ্বরের দৃষ্টিতে হিন্দু মুসলমান নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই, সকলেই সমান"।

"শিখ" কথাটীর ব্যুৎপত্তি শাস্ ধাতু হইতে, তাহার অর্থ শিষ্য; শিখের জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে, দুঃখের সহিত, আভিজাত্যের সহিত, অন্যায়ের সহিত সংগ্রাম করিতেই তাহার জন্ম, তাহার জীবন গুরুর কঠোর অনুশাসনে শাসিত। তাহার নিকট ব্যক্তিগত মুক্তিই একমাত্র কাম্য নহে, সমষ্টির মুক্তিও তাহার নিকট একান্ত সত্য, "পন্থ" তাহার জীবনে অনেকখানি স্থান পায়।

ভারতবর্ষে নানকের পূর্ব্বে অনেক সংস্কারকই আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের যুগের প্রয়োজনানুযায়ী পথনির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা অধিকাংশস্থলেই ব্যক্তির জন্য; সমগ্র দেশ বা জাতির জন্য তাহা প্রযুজ্য নহে; সমাজ, রাষ্ট্র তাঁহাদের নিকট অনেকটা অপ্রয়োজন। সংসার মিথ্যা; সমাজ, রাষ্ট্র সকলই মিথ্যা। ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া ন্যায় কি অন্যায়, সে বিচারের এখন প্রয়োজন নাই; যখন সমাজ ও সমাজধর্ম্মের মধ্যে ব্যভিচার প্রবেশ করে, যখন ব্যক্তিগত পরিশুদ্ধির আয়োজন চাই, একথা একান্ত সত্য।

সেই ব্যক্তির মুক্তিকেই যখন চরম এবং একমাত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্র ও সমাজধর্ম্মের কথা ভুলিয়া যাই তখন তাহাতেও একটা মিথ্যার সৃষ্টি হয়। সমাজও যেমন একান্তভাবে সত্য নহে, ব্যক্তিও তেমন একান্তভাবে সত্য নহে; সেভাবে সত্যের সাধনা সমাজের ধ্বংসেরই কারণ হয় এবং সামাজিক যে শক্তি অল্পশক্তিমান্ জনসাধারণকে বিধৃত করিয়া রহিয়াছে, তাহা নষ্ট হইলে পরিণামে ব্যক্তিরই ক্ষতি হয়; সত্যের এরূপ বিচ্ছিন্ন পরিকল্পনা হয়ত দুএকজন মেধাবী লোকের পক্ষে সহজ হয়, কিন্তু সমগ্র দৃষ্টিতে দেখিলে তাহা সাধারণগ্রাহ্য নয় বলিয়াই ঈপ্সিত নহে। প্রাচীন ভারত বুঝিয়াছিল ব্যক্তির উপরেই সমষ্টির সৃষ্টি এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে কোন একটাকে বাদ দিলে অন্যায়ই বাড়িয়া চলে। তাই ভারত ব্যক্তির ও সমষ্টির জীবনের মধ্যে একটী সাম্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, গৃহস্থাশ্রমকেও জীবনের একটী একান্ত সত্য অনুষ্ঠানরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, সে কোন দিন সমাজকেও ছোট করে নাই, ব্যক্তিকেও ছোট করে নাই।

মধ্যযুগে ভারতবর্ষে কবীর, নানক, রামানন্দ, দাদু, মীরা প্রভৃতি যে বিচিত্রভাবে জীবন ও সত্যকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে নানকের উপলব্ধির বৈচিত্র্য —এই ব্যক্তি ও সমষ্টিকে মিলাইয়া নূতন জীবনের সৃষ্টির চেষ্টায়।

They (the reformers before Nanak) aimed chiefly at emancipation from priest-craft or from grossness of idolatory and poly-

theism. They formed pious associations of contended quietists or they gave themselves up to the contemplation of futurity in the hope of approaching bliss, rather than called upon their fellow-creatures to throw aside every social as well as religious trammel and to arise a new people freed from the debasing corruption of ages. They perfected forms of dissent rather than planted the germs of nations and their sects remain to this day as they left them. It was reserved for Nanak to perceive the true principles of reform and to lay those broad foundations which enabled his successor Gobind to fire the minds of his countrymen with a new nationality and to give practical effect to the doctrine that lowest is equal with the highest in race as in creed, in political rights as in religious hopes."

(Cunnigham—History of the Sikhs Chap II)

তিনি দেখিলেন ভারত যে শুধু অন্তরের দৈন্যে, মিথ্যা আভিজাত্যের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইতেছে তাহা নহে; যখন জাতি মরণোন্মুখ হয় তখন বাহির হইতেও শত্রু আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত করিয়া দেয়। বাবর তখন দেশের জীর্ণ অবস্থা দেখিয়া ভারতবর্ষ জয়ের চেষ্টা করিতেছিলেন; বাবরের সেনার সংহত শক্তির নিকট ভারতবর্ষ পরাজয় স্বীকার করিতেছে। তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করিবার শক্তিটুকুও ভারতবর্ষের নাই। সমাজ ও রাষ্ট্রকে অস্বীকার করিয়া যে পাপের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহারই ফলে ভারতবর্ষ এই লাঞ্ছনাকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। তাই তিনি যে আচারগুলি, যে জাতিভেদপ্রথা, মানুষকে মানুষ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন!

তিনি বলিলেন, "ধর্ম্ম শুধু কথার কথা নহে, যে সকলকে সমান দেখিয়াছে, সেই ধর্ম্মকে জানিয়াছে; সমাধি প্রদক্ষিণ করা, শ্মশানে বাস করা, নানা আসন সাধনা করাই ধর্ম্ম নহে; দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ান, পবিত্র স্থান দর্শন করাই ধর্ম্ম নহে; এই বিশ্বের মিথ্যার মধ্যে সত্যকে ধরিয়া দাঁড়াও, ধর্ম্মের পথ খুঁজিয়া পাইবে।"

তিনি ধর্ম্ম প্রচার করিলেন দেশের ভাষায়; দেশের বাণীকে উপেক্ষা করিয়া জনসাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য মৃতভাষাকে তিনি গ্রহণ করিলেন না; এই ভাবে দেশকে, দেশের ভাষাকে ভালবাসিতে শিখাইয়া জাতীয়তার উদ্বোধন করিলেন।

নানক সন্ন্যাস স্বীকার করেন নাই; পবিত্র গৃহস্থ জীবনই সাধারণ মানবের লক্ষ্য সেটাকে নিজের জীবনে প্রমাণ করিতে তিনি নিজে গৃহধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

মানুষ কি ভাবে বড় হইয়া উঠিবে তাহাই তিনি প্রচার করিলেন—

"আগুণের দহনে প্রকৃত মানুষ গড়িয়া উঠিবে; পবিত্রতার উপর প্রতিষ্ঠা রাখিয়া ধৈর্য্য তাহাকে গড়িবে; দুঃখের দহনে, ভগবৎভীরুতার প্রেমের আগুণে সে গড়িয়া উঠিবে; সাধারণজ্ঞান ও ভগবৎবাণী তাহাকে পথে চালাইয়া লইয়া যাইবে।"

তিনি নিজের দৈবশক্তির দাবী করিলেন না; যদিও পরবর্ত্তীকালে ভক্তগণ

তাঁহার উপর নানা দৈবী ক্রিয়ার আরোপ করিয়াছেন ; তিনি প্রতিদিনের জীবনে যে সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় তাহাই পরিমার্জ্জিত করিয়া অধ্যাত্মজীবনের সহায় করিয়া লইতে বলিলেন।

পন্থের সৃষ্টি করিয়া দুর্দ্ধর্ষ মোগলশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার আয়োজন এই ভাবে নানক করিয়া গেলেন।

পন্থ শিখজাতির ইতিহাসে তাই একটা খুব বড় স্থান অধিকার করিয়া আছে।

তাঁহার পরে একে একে নয় গুরু আসিয়া নানকের এই মানসী প্রতিমাকে নানা ঐশ্বর্য্যে সাজাইয়া গিয়াছেন।

নানকের আদর্শ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার পুত্র শ্রীচন্দ্ উদাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া ভারতবর্ষের প্রচলিত ধারার অনুসরণ করিলেন ; তিনি বলিলেন, সন্ন্যাসই জীবনের পরম সাধনা ; সমাজধর্ম্ম, রাষ্ট্রধর্ম্ম নহে।

শিখেদের মধ্যে প্রথম বিরোধের অঙ্কুর এইভাবে সৃষ্টি হইল।

কিন্তু শিখসাধারণ ও নানক শ্রীচন্দ্‌কে স্বীকার করিলেন না ; প্রিয় শিষ্য লেহনাকে 'অঙ্গদ'—নিজ অঙ্গ হইতে সম্ভূত—নাম দিয়া নানক দ্বিতীয় গুরুর পদে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া গেলেন।

অঙ্গদ (১৫৩৯—১৫৫২) শিখকে গুরুর প্রতি পরমনির্ভরশীলতা শিখাইয়া দিয়া যান। তৃতীয় গুরু অমরদাস (১৫৫২—১৫৭৪) সন্ন্যাসবাদী উদাসী সম্প্রদায় শিখধর্ম্মের বিরোধী এটা স্পষ্ট করিয়া প্রচার করিয়া যান। তিনি প্রচার করিয়া গেলেন সংযম ও সাম্য। নারীকে তিনি পুরুষের সমান আসন দিয়া গেলেন।

"এই দেহ তাঁহার মন্দির, তাঁহার দুর্গ : বিশ্বের সকল মানবই তাঁহার প্রতিচ্ছবি। সুতরাং কাহাকেও ছোট করিও না।

অমরদাস (১৫৭৪—১৫৮১) তাঁহার জামাতা রামদাসকে গুরুর পদে অভিষিক্ত করিয়া যান। রামদাস শিখকে অভয় সেবার ব্রতে উদ্বোধিত করিয়া গেলেন ; শিখকে গুরু বলিলেন "সকল কুসংস্কার, সকল ভয় দূর করিয়া দাও, ভগবান্ ছাড়া আর কাহাকেও ভয় করিবার নাই ; যে পাপচারী সেই শুধু ভীরু ; সত্যকে যে জানিয়াছে তাহার আর ভয় নাই।" (শ্রীরাগ)

রামদাসই লঙ্গরের সৃষ্টি করেন ; সেখানে সকলেরই সমান অধিকার, সমান আদর। প্রত্যেক শিখই তাহার উপার্জ্জনের কিছু অংশ পরের সেবায় উৎসর্গ করিবে, রামদাসের সময় এই ভাব শিখধর্ম্মে স্থান লাভ করে। এই ভাবে শিখধর্ম্মে গণতন্ত্রবাদের ভিত্তি স্থাপিত হয়। রামদাস অমৃতসর নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে শিখধর্ম্মের কেন্দ্র করেন।

গুরু নানকের জন্মস্থানকে শিখধর্ম্মের কেন্দ্ররূপে শিখগণ কোনদিনই স্বীকার করেন নাই এবং যেদিন হইতে অমরদাস 'উদাসী' সম্প্রদায়কে শিখ সম্প্রদায় হইতে বিভিন্ন বলিয়া প্রচার করিলেন, সেইদিন হইতে শিখগণ নানকানা গুরুদ্বার সম্বন্ধে কোন হস্তক্ষেপ করে নাই।

শিখগণ শুধু সংসারকে স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কি ভাবে মানুষের নৈতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক মুক্তি আসিতে পারে তাহার চেষ্টাও তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন।

রামদাসের পরবর্ত্তী গুরু অর্জ্জুন (১৫৮১—১৬০৬) ব্যবসায় করাকে গুরুমর্য্যাদার হানিকর মনে করেন নাই।

অর্জ্জুন দীনকে, তাহার কায়িক পরিশ্রমকে উচ্চ আসন দিয়া গিয়াছিলেন। তাহার জীবনের মর্য্যাদা তিনি প্রচার করিলেন; তিনি বলিলেন,

"ভগ্ন কুটীরে জীর্ণকন্থায় যে দিন কাটাইতেছে, জাতির সম্মান, শ্রদ্ধা যে পায় না, যে গৃহহারা, বন্ধুহীন, আত্মীয়স্বজনহীন, প্রিয়হীন, শ্রী ও সৌন্দর্য্য যাহাকে বরণ করিয়া লয় নাই, তাহার হৃদয়ে যদি ভাগবতপ্রেম থাকে, সে-ই বিশ্বের সম্রাট"। (জয়ৎশ্রীকি বর)

গুরু অর্জ্জুন শিখদের ধর্ম্মগ্রন্থ "আদিগ্রন্থ" সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন; তাহাতে তিনি হিন্দু মুসলমান সাধকগণের বাণীকে সাদরে স্থান দিয়াছিলেন, মুসলমান জোলা কবীর, নামদেব চর্ম্মকার, রুইদাস সকলেরই দোঁহা ও শবদ গ্রন্থসাহেবে সংকলিত হইয়াছে।

অর্জ্জুন ত্যাগের বাণী প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন্ নাই, যাহাদিগকে তিনি সেবাব্রত অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন তাহাদের সঙ্গেই তিনি নিজের জীবনে সে ব্রত সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। তরণতারণে তিনি কুষ্ঠরোগীদের সেবার জন্য একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিত্তকে বড় করিয়া দেখেন নাই, কিন্তু তাহাকে ছোট করেন নাই; বিত্ত মায়া নহে, কাঞ্চন পাপ আনে না, "ধার্ম্মিক যে, সে যদি ভগবানের পথে চলে তবে তাহার পক্ষে বিত্ত অর্জ্জন পাপ নহে" (সারঙ্গকী বর); অর্জ্জুনের "সুখমণি" শিখদের অন্যতম ধর্ম্মগ্রন্থ, মানব-জীবনের ভবিষ্যৎ আশার বাণীতে উদ্দীপ্ত; শ্রান্ত ক্লান্ত পান্থ তাহা পাঠে যথেষ্ট সান্ত্বনা লাভ করে।

গুরু হরগোবিন্দ পরবর্ত্তী গুরু (১৬০৬—১৬৪৫) তিনি শিখজাতিকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে শিক্ষা দেন; তিনিই শিখজাতিকে এক অপূর্ব্ব শক্তিমান সামরিক জাতিতে পরিণত করিবার সূত্রপাত করেন। হরগোবিন্দের সময়েই শিখদের অপূর্ব্ব জয় ধ্বনি "সৎ, শ্রী, অকাল" এর জন্ম হয়। শিখমণ্ডলীর মুখে যে কেহ এই জয় ধ্বনি উচ্চারিত হইতে শুনিয়াছে সেই জানে কতখানি প্রাণ ঢালিয়া দিয়া শিখ এই মন্ত্র উচ্চারণ করে।

"সৎ শ্রীঅকাল" অর্থে বিশ্বের দেবতা যিনি তিনি সৎ, শ্রীমান্ সর্ব্বশ্রীমণ্ডিত এবং অকাল, কালাতীত, কাল তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না।

এ যে অভয় মন্ত্র; মানবের আত্মা কালকে অতিক্রম করিয়া চলে, মৃত্যু তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, কোথায় তাহার ভয়? শত্রুর অসি তাহাকে আঘাত করিতে পারে না, কোন অত্যাচারই তাহার পরম শ্রী কাড়িয়া লইতে পারে না

হরগোবিন্দের পরে হররায় (১৬৪৫—১৬৬১) গুরুর আসন লাভ করেন। যে কমনীয়তার অভাবে শৌর্য্য অত্যাচারী হইয়া উঠে, হরগোবিন্দ শিখজাতিকে সেই কমনীয়তা শিক্ষা দেন; কিন্তু তিনি ভীরু ছিলেন না। দিল্লীশ্বর আরঙ্জেব তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলে তাঁহার অত্যাচারের প্রতিবাদস্বরূপ তিনি সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন।

তৎপরবর্ত্তী গুরু হরকিষণ (১৬৬১—১৬৬৪) অতি অল্প বয়সেই প্রাণত্যাগ করেন? কিন্তু তিনি শিখদের মধ্যে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন দ্বারা গুরুগ্রহণ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া গণবাদের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া যান। হরকিষণের পর তেগবাহাদুর ৫২ বৎসর বয়সে ১৬২১

খৃঃ অব্দে গুরুপদে অভিষিক্ত হন। তখন আরঙ্জেব দিল্লীর সম্রাট। হিন্দু ভারতবর্ষ তখন আরঙ্জেবের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া তেগ্‌বাহাদুর স্বজাতির এই চরম দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। মুসলমান অত্যাচার হইতে দূরে থাকিবার জন্য তেগ্‌বাহাদুর অমৃতসর ত্যাগ করিয়া শতদ্রুতীরে আনন্দপুর গ্রামে বাস স্থাপন করেন।

তেগ্‌বাহাদুর নিজের শোণিত দিয়া শিখধর্ম্মের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া দিয়া যান। কথিত আছে লোকপরম্পরায় আরঙ্জেব তেগ্‌বাহাদুরের সম্পর্দ্ধ বাণী—সম্রাট গুরুদিগকে কোনদিনই মুসলমান করিতে পারিবেন না—শুনিয়া তাঁহাকে রাজসভায় নিমন্ত্রণ করেন। তেগ্‌বাহাদুর আরঙ্জেবের নিকট আসিলে আরঙ্জেব তাঁহাকে মুসলমান করিবার জন্য নানা প্রলোভন দেখান; তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেন। শিরশ্ছেদন করিবার পরে দেখা গেল তাঁহার কণ্ঠসংলগ্ন একটী পত্রে লেখা রহিয়াছে—"শির দিয়া ত সের ন দিয়া"—শির দিলাম তবুও ধর্ম্ম দিলাম না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া গুরু তেগ্‌বাহাদুরের এই অমর বাণী শিখকে অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া ধর্ম্মের জন্য প্রাণবলি দিতে শিখাইয়াছে।

দিল্লীতে যখন গুরু তেগবাহাদুরকে হত্যা করা হয় তাহা শিখদিগের তীর্থস্থান হইয়া আছে। সীস্‌গঞ্জ গুরুদ্বার তেগবাহাদুরের মৃত্যুর স্মৃতিরঞ্জিত হইয়া আজও দাড়াইয়া এই অভয়বাণী প্রচার করিতেছে;—"জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য।

পিতার হত্যার প্রতিশোধ লইবার সংকল্প বুকে লইয়া তরুণ গোবিন্দ সিংহ গুরুর আসন গ্রহণ করেন।

তিনি শিখদের শেষ গুরু।

তাঁহার সময়েই শিখজাতি প্রবলতম হইয়া উঠে; মুসলমানের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি শিখজাতিকে এমন এক সুদৃঢ় সংগঠিত জাতিতে পরিণত করেন যাহার বিক্রমে একদিন দিল্লীর সিংহাসনও টলমল হইয়া উঠিয়াছিল এবং যাহা ধর্ম্মের একাগ্রতা শৌর্য্যে ও বিশ্বস্ততায় পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র ক্রমওয়েলের অজেয় বাহিনীরই তুলনীয় হইতে পারে।

শিখের নিকট গুরুর আসন অতিপবিত্র। তাহার জীবনে গুরু ও গুরুর বাণীর প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা বিরাজ করে অন্যকোন সম্বন্ধের সহিত তাহার তুলনাই হইতে পারে না। বিশ্বের দেবতা ও তাঁহার বাণী মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়াছে গুরুর মধ্যে। 'বাণীর' গ্রন্থ সাহেবের আসনের নিম্নেই গুরুর আসন। শিখেদের নিকট গুরু একমাত্রই; তিনি বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দশগুরুর রূপ ধারণ করিয়াছেন। গ্রন্থ সাহেবে বিভিন্ন গুরুর রচিত উপদেশ নানকের নামেই সংকলিত হইয়াছে।

গুরু গোবিন্দই প্রথম, গুরুরা মানবমাত্র, তাঁহারা যে পন্থের প্রতিনিধি, এইটী প্রচার করিয়া শিখের আত্মসম্মান আত্মনির্ভর জাগাইয়া দেন। এতদিন গুরুর পাদস্পৃষ্ট জলে শিখের দীক্ষা হইত কিন্তু গুরু গোবিন্দ কৃপাণস্পৃষ্ট জলে অভিষেকের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি শিখকে 'সিংহ' উপাধি দেন।

গণতন্ত্রবাদকে শিখধর্ম্মের মূলমন্ত্র করিবার জন্য গুরু গোবিন্দ পন্থ নির্ব্বাচিত 'পাঁচ পিয়ারার (পঞ্চ প্রিয়তমের) হস্তে দীক্ষা লন। পন্থ এবং খালসাকে এইভাবে তিনি গুরুর আসন দেন।

গোবিন্দসিংহ শিখকে বীর্য্যের পাঁচটী সাধন গ্রহণ করিতে বলেন। কেশ, কঙ্ক, (বেণীর মধ্যে রক্ষিত চিরুনী) কড়া, (হস্তের লৌহবলয়) কৃপাণ, (ক্ষুদ্রতরবারী) কছ (জাঙ্গিয়া); প্রকৃত শিখ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া নানা অত্যাচার মাথায় বহিয়া শেষ গুরুর এই অনুশাসন মানিয়া আসিয়াছে। এগুলি শিখের ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। ইহার একটীরও জন্য শিখ প্রাণপণ করিয়া আসিয়াছে। এই কেশ রক্ষার জন্য তরুণবীর তরুসিংহ বেণীর সহিত মাথা দিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিল।

গোবিন্দসিংহের সময়ে যখন মোগল সুবেদারের আদেশে সৈন্যগণ শৃগালের মত শিখ খুঁজিয়া বাহির করিয়া হত্যা করিতেছিল তখন তাহাদের পরিচয় ছিল এই পঞ্চ 'ক'। এইগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য সত্য শিখ স্বেচ্ছায় স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসন গ্রহণ করিয়া রাজ-পুতনার মরুভূমিতে, পর্ব্বতে, অরণ্যে, উপত্যকায় শত কষ্ট, শত অত্যাচার সহ্য করিয়া অনিদ্রায়, অনাহারে দিন কাটাইয়া দিয়াছিল। যে ভীরু সেই দুর্দ্দিনে প্রকৃত শিখ বলিয়া পরিচয় না দিয়া, বেণী কাটিয়া, পঞ্চ 'ক' ত্যাগ করিয়া মাথা বাঁচাইয়াছিল তাহারা আজও 'সহজধারী' নামে পরিচিত, আর যাহারা শত অত্যাচার সহ্য করিয়া ধর্ম্মের অঙ্গহানির অপমান হইতে নিজেকে বাঁচাইয়াছিল, প্রাণ দিয়াছিল, তবুও ধর্ম্ম দেয় নাই, তাহারাই, 'অমৃতধারী' এই গৌরবময় বিশেষণে ভূষিত হইয়াছিল।

গুরুগোবিন্দ আজীবন মোগলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া গিয়াছিলেন; একমুহূর্ত্তের বিশ্রামও তিনি গ্রহণ করেন নাই। কি ভাবে শিখকে শৌর্য্যে বীর্য্যে অতুলনীয় করিয়া তুলিয়া জগতে এক অপূর্ব্ব জাতির সৃষ্টি করিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার ধ্যান। হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, তাহার উপরে যে দেবতা আছেন তাঁহারই সেবা করিতে হইবে। সময় বহিয়া যাইতেছে,—কই তোমার সেবা ত' অপূর্ণ রহিয়া গেল, তোমার জীবন ব্যর্থ হইল: তোমার দেহকে মন্দির কর, বিবেকের অচঞ্চল প্রদীপ তাহাতে জ্বালাও। সত্যজ্ঞানের সম্মার্জ্জনী হাতে লইয়া ভীরুতার আবর্জ্জনা ঝাড়িয়া ফেল।

শুধু তাঁহারই প্রেমের প্রেমিক হও; সে প্রেমের জন্য যে কষ্ট মাথায় পাতিয়া লয় স্বর্গ তাহারই।

সত্যের নিষ্কম্প দীপ শিখা যাহার হৃদয়ে জ্বলিতেছে, সেই একমাত্র দেবতাকে যে ভুলিয়া যায় নাই—দেবতার প্রেমে ও বিশ্বাসে যাহার হৃদয় পূর্ণ সেই খালসার প্রকৃত সভ্য, সেই-ই প্রকৃত "শিখ"।

গোবিন্দ এই শিক্ষা দিয়া গেলেন।

তাঁহার পর আর কেহ গুরু হয় নাই। গুরুর আসন তিনি খালসাকে দিয়া গিয়াছিলেন।

এই ভাবে একে একে দশ গুরুর হাতে দুই শতাব্দীর মধ্যে পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে এক অপূর্ব্ব জাতির সৃষ্টি হইল, যাহা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে সত্যাগ্রহকে বরণ করিয়া

লইয়াছে, যাহা কোনদিনই পার্থিব ক্ষতির ভয়ে অত্যাচারের নিকট মাথা নত করে নাই, শত লাঞ্ছনাও যাহা সত্যে আলোকে প্রদীপ্ত মুখের হাসি দিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে।

শিখের নিকট গুরুর আসন কত বড় সেটা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। গুরু গোবিন্দের সময়ে কিরূপে ধীরে ধীরে পন্থই গুরুর আসন গ্রহণ করিল তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

শিখধর্ম্ম মূলতঃ গণতান্ত্রিক; এবং শিখের ধর্ম্ম রাজনীতি অর্থনীতি সমাজ ও ব্যষ্টি সকলেই মিলাইয়া লইয়াছিল। সুতরাং তাহাদের প্রতিনিধি সভা এই খালসা—ইহারও এইসকল অধিকারই ছিল। সে অধিকার যে কত প্রবল তাহা আমরা কয়েকটি ঘটনা হইতে বুঝিতে পারি। গুরুগোবিন্দকেও একবার নিয়মচ্যুতি অপরাধে খালসার হস্ত হইতে দণ্ডগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। পরাক্রমশালী মহারাজ রণজিৎ সিংহকেও একবার অকাল তখ্‌তের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিচার ভিক্ষা করিয়া দণ্ডগ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

এই পন্থের আসন ছিল গুরুদ্বারগুলিতে। এই গুরুদ্বারগুলিকে কেন্দ্র করিয়া শিখের ধর্ম্ম, রাজনীতি এবং সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। গুরুদ্বারগুলির অসীম ক্ষমতা ছিল; এবং অকাল তখ্‌ত, আনন্দ পুর সাহিব, পাটনা সাহিব এবং হজুর সাহিব এই চারিটি মুখ্য গুরুদ্বারের অনুশাসনে সমস্ত শিখ জাতি বদ্ধ ছিল। তাহাদের মধ্যে আবার অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত অকাল তখ্‌তই সর্ব্বপ্রধান ছিল। গুরু হরগোবিন্দ ১৬০৯ খৃ: অব্দে অকাল তখ্‌তএর প্রতিষ্ঠা করিয়া কৃপাণ দীক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়া যান।

গুরু নানককে যখন কতকগুলি যোগী অতি-প্রাকৃত কোন কিছু দেখাইয়া, তাঁহার ব্রহ্ম দর্শনের সত্যতা প্রমাণ করিয়া, তাঁহার প্রচারিত নবধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন, তখন নানক সে অনুরোধ অস্বীকার করিয়া বলেন যে তিনি 'বাণী' ও পন্থ রাখিয়া যাইতেছেন তাহাই নবীন ধর্ম্মের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবে। গুরু নানক ও পরবর্ত্তী গুরুগণ বিভিন্নস্থানে সঙ্গতের প্রতিষ্ঠা করিয়া সেগুলিকে শিখ জীবনের কেন্দ্র করিয়া দিয়া যান। এই সঙ্গতগুলিও প্রথম প্রথম প্রচার কার্য্য করিয়া আসিয়াছিল। ধীরে ধীরে এই মসনদ্ বা সঙ্গতগুলি পরাক্রমশালী হইয়া উঠিল। এই মসনদগুলি শিখজাতিকে সংহত করিয়া রাখিয়াছিল। প্রতি বৎসর দীপালি উপলক্ষে 'সরবৎ খালসা' অর্থাৎ সমস্ত শিখজাতি মিলিত হইয়া তাহাদের সত্তা উপলব্ধি করিত।

যেখানেই সঙ্গত ছিল, সেইখানেই গুরুদ্বার গড়িয়া উঠিয়াছিল। গুরুদ্বারগুলি শিখের জীবনে এক অপূর্ব্ব স্থান লাভ করিয়াছে। তাহার প্রাণের উৎস এই গুরুদ্বার; প্রেমিকের সমস্ত একাগ্রতা লইয়া তাহারা গুরুদ্বারে নিজের জীবন, অর্থ সম্পদ উৎসর্গ করিত। শিখের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য, কি ভাবে সে নিজের গুরুদ্বারটীকে সাজাইয়া তুলিবে! গুরুগোবিন্দ সিংহের সময় হইতেই প্রত্যেক শিখকে তাহার আয়ের দশমাংশ গুরুদ্বারের ও লঙ্গড়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হইত। প্রতি শিখ আনন্দের সহিত এ গুরুভার গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। এইরূপে শিখ তাহার জীবনের সারটুকু গুরুদ্বারকে দিয়া আসিয়াছে।

এইজন্য গুরুদ্বারগুলি ধনী হইয়া উঠিতেছিল। শিখের নিকট গুরুদ্বার কত বড়, তাহা

একটী ঘটনা হইতে বোঝা যাইবে। একবার মহারাজ রণজিৎ সিংহ এক বহুমূল্য মুক্তামালা উপহার পান; তিনি সে হার কণ্ঠে ধারণ করিতে অস্বীকার করিয়া, এ হার গুরুরই উপযুক্ত বলিয়া তাহা স্বর্ণ-মন্দিরে প্রেরণ করেন।

কিন্তু যেখানেই ধনের কেন্দ্রীকরণ, সেইখানেই অধিকারের ব্যভিচার ঘটে। স্থানে স্থানে গুরুদ্বারগুলির মোহন্তগণ যথেচ্ছাচারী, বিলাসী, আচারভ্রষ্ট, আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতেছিল। স্থানীয় সঙ্গত গুলির উপর পর্য্যবেক্ষণের ভার ছিল। গুরু গোবিন্দ ব্যভিচারী মোহন্তকে অধিকারচ্যুত করিবার অধিকারও সঙ্গতগুলিকে দান করিয়া, কতকগুলি মোহন্তকে পদচ্যুত করেন।

যখনই সঙ্গত বা পন্থ কোন গুরু দ্বারের শাসনে অন্যায় দেখিতে পাইয়াছে, তখনই গুরুদ্বারের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য কঠোর হস্তে সকল অন্যায় দূর করিয়াছে। এইরূপে অমৃতসরের স্বর্ণ-মন্দির, আনন্দপুর সাহিব প্রভৃতি গুরুদ্বার সমূহ প্রথমে উদাসীগণের হস্তে ছিল, কিন্তু পন্থ তাহাদের হস্ত হইতে সে ভার লইয়া সিংহদের হস্তে অর্পণ করেন।

গুরুদ্বারগুলির পবিত্রতার সহিত শিখেদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্ম জীবনের পবিত্রতার গূঢ় যোগ ছিল বলিয়াই শিখগণ গুরুদ্বারগুলির ভাল মন্দ সম্বন্ধে সর্ব্বদাই এতটা সচেতন ছিলেন।

মোগল শাসনের সময় পর্য্যন্তও গুরুদ্বারগুলির উপর সঙ্গতগুলির এই অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু বৃটীশ শাসনের সময়েই তাহাদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইতে আরম্ভ হয়।

বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি গুরুদ্বারের ভার নিজে লইলেন, কতকগুলি গুরুদ্বারকে আইনে মোহন্তগণের নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। এতদিন ধরিয়া সেবকের হৃদয়-শোণিত দানে যে গুরুদ্বারগুলি সম্পদশালী হইয়া উঠিতেছিল, যাহাদের উদ্দেশ্য ছিল শিখ জাতির পবিত্রতা রক্ষা করা, সেগুলি আজ মোহন্তগণের বিলাসের ব্যভিচার লীলানিকেতন হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু শিখসঙ্গত নিরুপায়। আইনের দ্বারে তাহার প্রতিকারের উপায় নাই। অবশ্য কোনস্থানে অন্যায় লক্ষিত হইলে মোহন্তকে পদচ্যুত করিবার ব্যবস্থা ছিল বটে, কিন্তু সে ব্যবস্থা বিধি নিষেধের নাগপাশে কার্য্যতঃ অকর্ম্মণ্য হইয়াই দাঁড়াইয়াছিল।

অমৃতসরের স্বর্ণ-মন্দির ও তরণ তারণের পবিত্র গুরুদ্বার গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হইল।

কোন কোন স্থানে মোহন্তগণ আইন বাঁচাইয়া কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্যে গুরুদ্বারের সম্পত্তি নিজস্ব করিয়া লইয়া, তাহাতে বিলাস লালসার ইন্ধন যোগাইবার জন্য যথেচ্ছাচারী হইয়া গুরুদ্বার সম্পত্তি বিক্রয় করিতে লাগিল।

তাহারা যে শুধু সম্পত্তি বিষয়েই যথেচ্ছাচারিতা আরম্ভ করিল তাহা নহে, তাহারা অম্লান বদনে অকুণ্ঠিত চিত্তে শিখধর্ম্মবিরোধী ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনও করিতে লাগিল।

কিন্তু এই আদর্শচ্যুতি একদিনেই হয় নাই, বহুবর্ষ পূর্ব্ব হইতেই তাহার ক্রিয়া চলিতেছিল।

যতদিন গুরুগণ জীবিত ছিলেন এবং যতদিন শিখের বিষয়বাসনা পার্থিবসম্পদলিপ্সা প্রবল হইয়া উঠে নাই, ততদিন শিখ ধর্ম্মের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ ছিল। গণতান্ত্রিক শিখধর্ম্মে প্রভুত্ব কোন দিনই বংশানুক্রমিক হইতে পারে নাই, বরং মোহন্ত এবং গুরুর পদ যে নির্ব্বাচন দ্বারা স্থিরীকৃত হইত তাহা দেখিয়াছি। কিন্তু গুরুগণের তিরোধানের পর সে প্রথারও পরিবর্ত্তন ঘটিল।•

যতদিন গুরুগোবিন্দ ও তৎনির্ব্বাচিত পাঁচ পিয়ারারা ছিলেন ততদিন আদর্শ ঠিক ছিল। কিন্তু তাঁহারা চলিয়া গেলে শিখ সাধারণের উপর সমস্ত ভার আসিয়া পড়িল। সেই সুযোগে গুরুদ্বারগুলি কতগুলি সম্প্রদায়বিশেষের অধীন হইয়া পড়িল।

শিখধর্ম্মের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইয়া, এই আদর্শ—সাঙ্কর্য্য আসিবার আর একটি কারণ হইয়াছিল মুসলমানদিগের সহিত বিরোধ। এতদিন হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকলকেই সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে

শিখধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল, বহু মুসলমানও যে শিখধর্ম্মে উচ্চ আসন লাভ করিয়াছিল, শিখধর্ম্মের ইতিহাসে তাহার বহু প্রমাণ আছে। কিন্তু মুসলমান বাদসাহগণের সহিত বিরোধ ক্রমে মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি বিরোধে রূপান্তরিত হইয়া উঠিল। শিখ ধর্ম্ম তাহার ঔদার্য্য হারাইল। ধর্ম্ম যখন তাহার ঔদার্য্য হারাইয়া সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন তাহার মধ্যে নানা ব্যভিচারের সৃষ্টি হয় এবং সমাজদেহে একটী রোগ দেখা দিলে ধীরে ধীরে অন্য রোগ আসিয়া পড়ে।

সহজধারী শিখের অভ্যুদয় এই আদর্শের ব্যভিচারের প্রথম স্তর। কিন্তু শিখধর্ম্মের আদর্শ প্রবলতম আঘাত পায় মহারাজ রণজিৎ সিংহের সময়। গণতন্ত্রবাদের ধ্বংসের উপর তিনি সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করেন। সাম্রাজ্যের মূল কথা প্রভুত্ব ও অধিকারের এককেন্দ্রীকরণ। রণজিৎ যদিও সাম্রাজ্যবাদের সহিত সনাতন শিখ ধর্ম্মের আদর্শ মিলাইয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পরে সে চেষ্টা লোপ পাইল। এবং শিখ ধর্ম্মের বিশেষত্ব যে গণতন্ত্রবাদ তাহা নষ্ট হইয়া গেল। সুযোগ বুঝিয়া মোহন্তগণ নিরঙ্কুশভাবে যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল।

এইরূপে যে আদর্শের ব্যভিচার গুরুদ্বারে হইতে লাগিল, সমগ্র শিখ জাতির উপর তাহার প্রভাব বিস্তার লাভ করিল।

সুতরাং ধর্ম্মকে ও জাতিকে অবশ্যম্ভাবী বিনাশের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য, মুক্তিলাভ করিবার জন্য সংস্কারের প্রয়োজন হইয়া উঠিল, এবং সেই প্রয়োজন বোধ হইতেই শিখের জীবনের সত্যাগ্রহের সুপ্ত আদর্শ আবার জাগিয়া উঠিতেই মুক্তির সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল।

আকালী ও নির্ম্মল সম্প্রদায়

এই স্থলে আকালী ও নির্ম্মল সম্প্রদায় সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন। গুরুগোবিন্দ সিংহের সময় অমৃতধারী শিখের অভ্যুদয় হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে তিনি আবার দুইটী বিভাগ করেন—'আকালী' ও নির্ম্মল।

গুরুগোবিন্দ ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা ও ধর্ম্মের ভিত্তি দৃঢ়তর করিবার জন্য সংস্কৃত ভাষা ও দেশের প্রাচীনরীতিনীতিজ্ঞ ও ধর্ম্মজ্ঞ কতগুলি লোক তৈয়ারী করিবার চেষ্টা করেন; তাহাতেই 'নির্ম্মল' সম্প্রদায়ের সৃষ্টি; কতগুলি শিখকে নির্ব্বাচিত করিয়া তিনি কাশীতে সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পাঠাইয়া দেন; তাহাদেরই উপর পরে পৌরহিত্যের ভার অর্পণ করা হয়; তাহারা ছিল "নির্ম্মল", তাহাদের দৃষ্টি ও জীবন ছিল "নির্ম্মল"; বুদ্ধি ও জ্ঞান ছিল সবল; গুরুর মৃত্যুর পর ধর্ম্ম ব্যাখ্যার ভার তাহাদের উপরই পড়ে।

'আকালী' কথাটীর অর্থ—কালাতীত; যাহারা কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া চলে; মৃত্যু যাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া কর্ত্তব্যবিমূঢ় করিতে পারেনা, যাহারা অমর। সমস্ত দুর্দ্দিনে তাহারাই ছিল গুরুর সঙ্গী; শৌর্য্যে অতুলনীয়, অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এই আকালী শিখজাতি ও ধর্ম্মকে সকল অপমান, সকল লাঞ্ছনা হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। তাহাদের সরল সবল ঋজু উন্নত দেহ, বেণীবদ্ধ শির, কৃষ্ণ উষ্ণীষ, নির্ভীক প্রশান্ত দৃষ্টি, কোষে কৃপান, হস্তে লৌহবলয়। ছায়ার ন্যায় সুখে দুঃখে গুরুর অনুসরণ করিয়া তাঁহার মৃত্যুর পর জাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারাই শিখ আদর্শকে জাগাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে।

শ্রীনির্ভয় সিংহ।

অনন্তের সুরে

পূর্ণশান্তি, পূর্ণশক্তি, পূর্ণৈশ্বর্য্য

প্রস্তাবনা

আশাবাদীও ঠিক ; নৈরাশ্যবাদীও ঠিক। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর, ঠিক যেন আলো আঁধারে প্রভেদ ; তবু, দুইই ঠিক। নিজের নিজের দিক হইতে দেখিলে প্রত্যেকেই ঠিক, আর এই দেখিবার দিক্‌—প্রত্যেকের জীবনের ধারণা স্থির করিয়া দেয়। জীবন সবল হইবে না দুর্ব্বল হইবে, বীর্য্যবান হইবে না বীর্য্যহীন হইবে, শান্তিময় হইবে না ব্যথাময় হইবে, সফল হইবে না বিফল হইবে তাহা স্থির হয় এই দেখিবার দিক্ হইতে, মানুষ কি ভাবে জগৎ দেখে তাহা হইতে।

জগৎকে সমগ্র ভাবে দেখিবার, বিষয় গুলির পরস্পর সম্বন্ধ অব্যাহত রাখিয়া দেখিবার ক্ষমতা আশাবাদীর আছে। নৈরাশ্যবাদীর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, একদেশদর্শী। একের বুদ্ধি জ্ঞানালোকে আলোকিত, অন্যের বুদ্ধি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন। প্রত্যেকেই তার জন্য নিজের নিজের ভিতর হইতে সৃষ্টি করিতেছে, আর প্রত্যেকের দেখিবার দিক্ এই সৃষ্টির ফল নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছে। আশাবাদী, তাঁহার উন্নত জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে, নিজের স্বর্গ নিজে গড়িয়া নিতেছেন, আর যে পরিমাণে নিজের স্বর্গ গড়িতেছেন, সেই পরিমাণেই অন্য সকলের স্বর্গও গড়িতেছেন। আর সেই নৈরাশ্যবাদী, তাঁহার সীমাবদ্ধ দৃষ্টি দিয়া নিজের নরক নিজে গড়িতেছেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানবসমাজের নরক গড়িতেও সাহায্য করিতেছেন।

তোমার আমার মধ্যে, আশাবাদীর প্রধান প্রধান গুণ দেখা যায়। আমরা ত তবে প্রতি ঘণ্টায় নিজেদের স্বর্গ, নিজেদের নরকও গড়িতেছি, আর সেই সঙ্গে জগতের স্বর্গ, জগতের নরকও গড়িতে সাহায্য করিতেছি।

ইংরাজী heaven কথাটার অর্থ শৃঙ্খলা। ইংরাজের hell কথাটা আসিয়াছে প্রাচীন ইং hell হইতে ; hell অর্থে চারিদিকে এক দেওয়াল দেওয়া, পৃথক করা ; to be helled অর্থে হইত অন্য হইতে পৃথক করা। শৃঙ্খলা বলিয়া যদি কোন জিনিষ থাকে তবে এমন কিছুই নিশ্চয় আছে যাহার সঙ্গে ঠিক সম্বন্ধ স্থাপন করা যাইতে পারে ; কারণ, কোনও জিনিষের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেই সে বিষয়ে শৃঙ্খলা হইল। আর helled বা স্বতন্ত্র বা পৃথক বলিয়া যদি কোন ও জিনিষ থাকে তবে যাহার সঙ্গে স্বতন্ত্র বা পৃথক্ সেই বস্তুটির অস্তিত্ব নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে।

বিশ্বের বড় কথা

বিশ্বের মূল কথা, বড় কথা,—সেই অনন্ত প্রাণের আধার সেই অনন্তশক্তির আধার মহাপ্রাণ, যিনি সকলের পশ্চাতে, যিনি সকলের প্রাণদাতা, যিনি সকলের মধ্যে, সকল বিষয়ের অন্তর দিয়া প্রকাশিত ; সেই স্বয়ংসিদ্ধ প্রাণশক্তি যাহা হইতে সকলে আসিয়াছে, এবং শুধু আসে নাই, আসিতেছেও বটে। ব্যক্তির জীবন বলিয়া যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে অনন্ত জীবনের এমন আধার নিশ্চয় আছে, যাহা হইতে ইহা আসিয়াছে। প্রেম বলিয়া কোনও গুণ বা শক্তি যদি থাকে, তাহা হইলে তাহার মূলে অনন্তপ্রেমের উৎস নিশ্চয় আছে। জ্ঞান যদি থাকে তবে তাহার পশ্চাতে সর্ব্বজ্ঞানময় কোনও আধার অবশ্যই আছে, যাহা হইতে ঐ জ্ঞানের উৎপত্তি। শান্তির সম্বন্ধেও ঐ কথা, শক্তির সম্বন্ধেও ঐ কথা, জড়বস্তু বলিয়া যাহা বুঝাই সে সম্বন্ধেও ঐ একই কথা।

তাহা হইলে সকলের পশ্চাতে এই অনন্তপ্রাণময়, অনন্তশক্তিময় আত্মা আছেন, তিনিই সকলের নিদান। এই অনন্তশক্তি সৃজন করিতেছেন, কর্ম্ম করিতেছেন, শাসন করিতেছেন, মহা অপরিবর্ত্তনীয় বিধির সাহায্যে, শক্তির সাহায্যে। সমস্ত বিশ্বজগৎ দিয়া এই সব বিধি ও শক্তি চলিয়াছে, ইহারা আমাদের আশেপাশে একেবারে বেষ্টন করিয়া আছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক কর্ম্ম ঠিক এই সব বিধান ও শক্তির অনুসারেই চালিত হয়। পথের ধারে যে ফুলটি ফোটে তাহা ফোটে, বাড়ে, হাসে, ঝরিয়া পড়ে—কতকগুলি মহা অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম অনুসারে। যে তুষার কণাটুকু স্বর্গ মর্ত্ত্যের অন্তরালে খেলা করে, তাহা গড়িয়া উঠে, পড়ে, গলিয়া যায়—কতকগুলি মহা অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম অনুসারে।

এক দিক দিয়া দেখিলে এই বিপুল বিশ্বে নিয়ম ছাড়া আর কিছুই নাই। একথা সত্য হইলে, এ সবার পিছনে এমন একটি শক্তি নিশ্চয়ই আছে, যাহা এই সমস্ত নিয়ম সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা এই সমস্ত নিয়ম হইতে অধিক শক্তিমান্। সকলের পিছনে এই যে অনন্তপ্রাণময় অনন্ত-শক্তিময় আত্মা আছেন, ইঁহাকেই আমি ঈশ্বর বলি। যে নামই দাওনা কেন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, "পরং জ্যোতিঃ" "সর্ব্বশক্তিমান্" "পরমাত্মা" ইত্যাদি। যতক্ষণ মূল কথাটি, বড় কথাটি লইয়া আমাদের কোনও গোল নাই, ততক্ষণ যে নামই দেওয়া হোক তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।

ভগবানই সেই অনন্তস্বরূপ পরমাত্মা যিনি একাকী সমস্ত বিশ্ব পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহা হইতেই সকলের জন্ম, তাঁহাতেই সকলের স্থিতি, তাঁহার বাহিরে কিছুই নাই। বাস্তবিক্ সত্য কথাই ত এই যে, তাঁহাতেই আমাদের জীবন তাঁহাতেই আমাদের গতি ও স্থিতি। তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, প্রাণশক্তিই তিনি। তাঁহার নিকট হইতে আমরা আমাদের জীবন পাইয়াছি ও পাইতেছি। ভগবত জীবনের অংশ আমরা পাইয়াছি ; যদিও আমরা জীবাত্মা এবং তিনি পরমাত্মা, আমরা এবং অন্য সকলেই তাঁহার অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং আমরা তাঁহা হইতে ভিন্ন, তথাপি ভগবানের জীবন ও মানুষের জীবন মূলে সমান, সুতরাং এক। উভয়ের প্রভেদ মূলে নয়, গুণে নয়, পরিমাণে।

এমন অনেক জ্ঞানী মহাপ্রাণ ছিলেন ও আছেন, যাঁহারা বিশ্বাস করিতেন এবং করেন যে আমরা দৈবস্রোতের মত আমাদের জীবন ভগবানের কাছ হইতে পাইয়াছি। এ রকমও অনেকে ছিলেন ও আছেন যাঁহারা বিশ্বাস করিতেন এবং করেন যে মানব জীবন ও ভাগবত জীবন তুল্যমূল্য,—সুতরাং মানুষ ও ভগবান এক। কোনটি ঠিক ? দুই ই ঠিক, ঠিক করিয়া বুঝিলে দুই ই ঠিক।

প্রথম পক্ষের কথা ;—যদি সকলের পিছনে "ভগবান" নামধেয় এক অনন্ত আত্মা-থাকিয়া থাকে, এবং সেই আত্মা যদি সকলের নিদান হয়, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন এই অনন্ত উৎস হইতে এই দিব্যস্রোতে ভাসিয়া আসিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনশক্তি যদি আমরা পরমাত্মা হইতে পাইয়া থাকি, যদি আমরা অনন্ত স্বরূপের অংশ হই, তবে প্রত্যেকের জীবনে যে পরিমাণে পরমাত্মার প্রকাশ, তাহা গুণতঃ সেই আদিকারণের সমান হইবে, ঠিক যেমন সাগরের একবিন্দু জলও গুণে, প্রকৃতিতে, সাগরের সমান। আর অন্যথাই বা কি করিয়া সম্ভবে ? কিন্তু শেষোক্ত বিষয়ে ভুলের সম্ভাবনা :—মানবজীবন ও ভাগবত জীবন একই উপাদানে গঠিত হইলেও পরমাত্মা জীবাত্মাকে এতদূর ছাড়াইয়া গিয়াছেন যে তিনি সর্ব্বব্যাপী। অর্থাৎ—গুণতঃ ইহারা এক, পরিমাণ সম্বন্ধে তাহাদের প্রভেদ অতি বিশাল।

এই ভাবে দেখিলে কি স্পষ্ট বোঝা যায় না যে দুই মতই সত্য, দুই মতই এক ? কেবল মাত্র একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটি বিশদ করা যাইতে পারে।

এক পাহাড় তাহার পাশে এক উপত্যকা, উপত্যকায় একটা জলাধার, তাহাতে

পাহাড়ের উপরে এক অফুরন্ত উৎস আছে তাহা হইতে জল আসে। তাহা হইলে কথা ত সত্য যে, উপত্যকায় পাহাড়ের উৎস হইতে জল প্রবাহের গুণে জল আসে? এ কথা ও ত সত্য যে, উপত্যকার ক্ষুদ্র জলাধার ও তাহার মূল উৎস এই উভয়ে প্রকৃতিগত, লক্ষণগত ও গুণতঃ কোনও প্রভেদ নাই? শুধু এইটুকু প্রভেদ, যে—পাহাড়ের গায়ে যে জলাধার আছে তাহার পরিমাণ নীচে যে জল আছে তাহার পরিমাণ অপেক্ষা এত অধিক যে ঐরূপ অসংখ্য জলধার পূর্ণ করিলেও তাহার কিছুমাত্র হ্রাস ঘটে না।

মানুষের জীবনেও সেই কথা। অন্যান্য সকল বিষয়ে আমাদের যতই মতান্তর থাকুক, এ বিষয়ে যদি আমরা একমত হইয়া থাকি যে সকলের পশ্চাতে এই অনন্তস্বরূপ পরমাত্মা আছেন, ইনি সকলের প্রাণশক্তি, ইনিই সকলের আদিকারণ, তাহা হইলে ব্যক্তিবিশেষের জীবন, তোমার আমার জীবন, এই অনন্ত উৎস হইতে দৈবস্রোতে নিশ্চয় ভাসিয়া আসিয়াছে। আর একথা সত্য হইলে, মানুষের কাছে যে জীবনী শক্তি এই দৈব স্রোতে ভাসিয়া আসে, তাহার ও এই অনন্ত স্বরূপ প্রাণশক্তির মধ্যে উপাদানগত ঐক্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। প্রভেদ অবশ্য আছে, কিন্তু যে প্রভেদ মূলের প্রভেদ নয়, তাহা পরিমাণের প্রভেদ।

যদি একথা সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা কি ইহা হইতে অনুমান করিতে পারি না যে এই দৈবস্রোতের সম্মুখে মানুষ যতই গা ঢালিয়া দিবে, ততই সে ঈশ্বরের কাছে যাইবে? একথাও আমরা ইহা হইতে পাই যে ভগবানের কাছে মানুষ এইভাবে যতটা অগ্রসর হইতে পারিবে, ততই সে দৈবশক্তি অর্জ্জন করিতে পারিবে। আর দৈবশক্তি যখন অসীম, তখন মানুষের গণ্ডী কি তাহার স্বকৃত নয়, তাহার আত্মজ্ঞানের অভাব জন্য নয়?

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত।

গান্ধিজী

সে আজ প্রায় দুই বৎসরের কথা। ১৯২২ সালের মাসে লণ্ডনপ্রবাসকালে জনৈক বন্ধু তথাকার সুবিখ্যাত হোর্বন রেস্তরাঁতে চা পান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তখন দেশে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বন্যা বহিতেছে। এবং তাহার ঘাত প্রতিঘাত সুদূর ইংলণ্ড প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদিগের নিকট পর্য্যন্তও পৌছিয়াছে। সেই দিন সেই রেস্তরাঁয় সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া মনে হইতেছিল,—এই সেই ঘর, এই খানেই একদিন যুবক গান্ধী তেজের সহিত পাশ্চাত্য সভ্যতার বহিরাবণের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া তাহা বহন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই স্থানেই তাঁহার জীবনের গতি একদিক হইতে অন্যদিকে পরিচালিত হইয়াছিল। তখন যাহার অঙ্কুর, আজ তাহারই পূর্ণ বিকাশ, এই অসহযোগ আন্দোলনে প্রকাশ পাইতেছে।

সেই সময়ে লণ্ডনস্থ এক ভারতীয় ছাত্রাবাস (Shakespeare Hut) হইতে পরিচালিত "Indus" নামক পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর যৌবন কালের এক প্রতিকৃতি বাহির হয়। সেই ছবি দেখিয়া আমরা সকলেই অবাক হইয়াছিলাম ও ভাবিয়াছিলাম এই কি সেই? প্রৌঢ়াবস্থায় যাহার কৌপীন সম্বল, এই কি তাঁহার যৌবনের বেশ!

যৌবনের প্রারম্ভে গান্ধী বিলাতী বেশে সজ্জিত হইয়া সেই সভ্যতায় নিজেকে সুসভ্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। জীবনসন্ধ্যায় আবার কৌপীন ধারণ করিয়া "আত্মশক্তির" (soul force) বীজমন্ত্র প্রচার করিলেন। আজ ক্ষীণদেহী কৌপীনধারী গান্ধী

মহাত্মাজীকে ভারতের আপামর সাধারণ দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করে। ইউরোপবাসী অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহাকে জগতের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া সম্মান করেন। এমন কি কেহ কেহ তাঁহাকে যীশু খ্রীষ্টের সহিত তুলনা করিতেও কুণ্ঠিত হন না। মানবের এ কি প্রভূত প্রভাব। সেই হোবর্ণ রেস্তরাঁতে বলিয়া মনে হইতেছিল—মানুষের জীবনের এ কি পরিবর্ত্তন!

ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয় যে, খদ্দরমণ্ডিত মহাত্মাগান্ধী এককালে বিলাতে অবস্থানের সময়ে thorough gentleman হইবার জন্য শিক্ষকের নিকট নিয়মমত বেহালা বাদন শিক্ষা করিতেন ও বিলাতী নৃত্যকলাকুশল হইবার জন্য যথারীতি নাচের lesson নিতেন। পরে এই হোবর্ণ রেস্তরাঁতেই তাঁহার কুহক ভাঙ্গিয়াছিল এবং সেই দিনই তিনি তাঁহার সখের বেহালাটী চুরমার করিয়াছিলেন ও নৃত্যবিদ্যা শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই দিনই তাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিকে পরিচালিত হইল।

যাহারা গান্ধীর জীবনের ঘটনাবলীর সহিত পরিচিত তাঁহারা এ সমস্ত খবর জানেন। যেদিন গান্ধী লণ্ডনে টিলবারী ডকে জাহাজ হইতে নামিলেন, সেদিন তাঁহাকে তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ী যাওয়ার জন্য লণ্ডনের রাস্তা দিয়া অনেকটা পথ হাঁটিতে হইয়াছিল। তাঁহার গায়ে ভারতে প্রস্তুত বিলাতী পোষাক, তাহা খাটি বিলাতী হাল ফ্যাসান মতন নহে। সেই পোষাকে একটী কৃষ্ণ মূর্ত্তিকে রাস্তায় যাইতে দেখিয়া সকলেই তাঁহার দিকে তাকাইতে ছিল। এমন ভাবে সকলে তাকাইতে ছিল—(যাহাকে ইংরেজী ভাবিয়া rude বলা চলে) যে তাঁহার নিকট তাহা নিতান্ত অশোভন মনে হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন যে যাঁহারা বাঁধা বেশ ভূষার প্রতি একটা অনুরক্ত যে বিদেশীর গায়ে তাহার এতটুকু ব্যতিক্রমও ক্ষমা করিতে পারেনা, তাহাদের সভ্যতা নিতান্তই বহির্ম্মুখী; রাস্তায় যাইতে যাইতেই সেই সভ্যতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা অনেকটা কমিয়া গেল।

কিন্তু লণ্ডনবাসী যে বন্ধুর নিকট তিনি আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, তিনি তাঁহাকে অন্য শিক্ষা দিবার প্রয়াস পাইলেন। "ইংলিশ জেন্টলম্যান" হইতে হইলে তাঁহাকে যে আদবকায়দা-দুরস্ত হইতে হইবে গানবাজানা শিখিতে হইলে, বেহালাবাদনপটু হইতে হইবে, নৃত্যকলা-কুশল হইতে হইবে। যুবক গান্ধী তাহাই মানিয়া নিলেন ও তাহার শিক্ষানবীশী আরম্ভ করিলেন। মাতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে মদ্য মাংস রমণী স্পর্শ করিবেন না। সে প্রতিজ্ঞা অবশ্যই তিনি রক্ষা করিলেন। কিন্তু একদিনের এক ঘটনায় তাঁহার মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। একরাত্রিতে হোবর্ণ রেস্তরাঁ গৃহে ডিনার খাইবার জন্য তাঁহার বন্ধু এক ভোজের আয়োজন করিলেন। ডিনার টেবিলে ভৃত্য সুপ পরিবেষণ করিয়া গেল। সুপ মাংসে প্রস্তুত, মনে এ শঙ্কা হওয়াতে গান্ধী ভৃত্যকে সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। বন্ধুপ্রবর তাঁহারা এই এটিকেটভঙ্গের জন্য ভৎসনা করিলেন। গান্ধীর তাহা অসহনীয় মনে হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ ভোজন টেবিল পরিত্যাগ করিলেন। সেই রাত্রি হইতেই ইংলিশ জেন্টলম্যান হওয়ার বাসনা তাঁহার চিরকালের জন্য ঘুচিয়া গেল। তাঁহার ভুল ভাঙ্গিল।

তারপর যে পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া তাঁহার জীবনের গতি পরিচালিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার জীবনীপাঠকমাত্রেই জানেন। অনেক চিন্তা ও সাধনার ফলে তিনি তাঁহার "আত্মশক্তি" ও "অসহযোগ" মন্ত্রে উপনীত হইয়াছেন। যে মন্ত্র প্রচার করিবার ফলে তিনি কারাবাসী হইয়াছিলেন, আজ কারামুক্ত হইয়াও সেই মন্ত্রেই অটল বিশ্বাসী রহিয়াছেন। তাঁহার রাজনৈতিক মত সম্বন্ধে অনেক মতভেদ হওয়া সম্ভব। অসহযোগ মন্ত্র হয়ত অনেকে মনের সহিত গ্রহণে অসমর্থ কিন্তু তাঁহার প্রভূত চরিত্রবল ও ঐকান্তিক সাধনা প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট শ্রদ্ধা ও পূজার সামগ্রী। তাঁহার বিচারকালে কারাদণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও বিচারপতি বলিয়াছিলেন,—even those who differ from

you in politics look up to you as a man of high ideals and leading noble and even saintly life. একথা প্রত্যেক ভারতবাসী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া জানেন। বিদেশী যাঁহারা তাঁহার মন্ত্রে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারাও তাঁহার সততায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে এই কৌপীনধারী ক্ষীণদেহী ভারতবাসীকে প্রবল প্রতাপশালী বৃটিশ গভর্ণমেণ্টেরও সমীহ করিয়া চলিতে হয়। এ ভক্তি সম্মান আহরণ করিতে তাঁহাকে কোন প্রকার বাহিরের চাকচিক্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই। ভিতরের তেজ ও গরিমা তাঁহাকে জগতবাসীর চক্ষে সম্মানের আসনে স্থান দিয়াছে।

শ্রীশান্তিভূষণ দত্ত।

মহাত্মাগান্ধীর পত্র

(১১)

রবিবার
চৈত্র কৃষ্ণা দ্বিতীয়া

কল্যাণীয় মণিলাল,

* * * * মিঃ কোলেনবেক যখনই শোননা কেন, তোমার নিয়ম ভঙ্গ করা উচিত নয়। ভোজন সম্বন্ধেও এই নিয়ম রক্ষণ করা উচিত। যে কথাটা তুমি বুঝিতে পার নাই তাহার অর্থ যাহারা শুধু আইনের জন্য অর্থাৎ আইনের ভয়ে কোন কাজ করে তাহারা অভিশপ্ত। কিন্তু যাহারা আবার আইনঅনুযায়ী কাজও করে না তাঁহারা অধিকতর অভিশপ্ত (বাইবেল)। ইহার অর্থ, শুধু পড়াশুনা করিলেই মোক্ষলাভের পথ পাওয়া যায় না। গীতাতেও এইরূপ কথিত হইয়াছে; শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন"।

ইহার অর্থ এই নয় যে তুমি শাস্ত্রবিহিত কার্য্য একেবারেই করিও না। সেটা ত করিতেই হইবে; কিন্তু সেখানে থামিলে চলিবে না; তাহার নিগূঢ় অর্থটা বুঝিয়া, তাহার মূল কারণ জানিয়া, নিজেকে উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে ইহাই তাহার অর্থ। যে বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শুষ্ক ব্রহ্মবাদী হয়, তাহার "ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট" গতি হয়। সে শাস্ত্রের সাহায্য ত পায়ই না, জ্ঞানের আশ্রয়ও হারায়, এমনি তাহার দশা হয়। সেই জন্যই সেন্টপল গেলিশিয়ানদের বলিয়াছিলেন—"তোমরা শাস্ত্রানুসারে কাজ করিয়া যাইতে পারো, কিন্তু যদি যীশুর প্রতি শ্রদ্ধা না রাখ, তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী না চল, তাহা হইলে তোমাদের জীবন অভিশপ্ত হইবে।" শাস্ত্রের নামে শত শত পাপের অনুষ্ঠান হইতেছে। পঞ্চম রোম্যান্সের ২০ শ্লোকের অর্থত' সহজ। "শাস্ত্রজ্ঞতা যেমন যেমন বাড়িয়া চলিয়াছে, পাপও সেই অনুপাতে বাড়িয়া চলিয়াছে"; কিন্তু যখন পাপের জঞ্জাল জড় হইয়া পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়াছে, তখন ভগবানের কৃপা হইয়াছে। সার কথা এই যে এই কলিকালে শুষ্ক শাস্ত্রজ্ঞানের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া এমন মানুষ আসিবে যে ভক্তিমার্গের সাহায্যে শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ করিবে। এটাও ভগবানের দয়া।

জীবনে পরিবর্ত্তনের আগে বিচার করিও। কিন্তু একবার পরিবর্ত্তন করার পর নূতনকে জোঁকের মত ধরিয়া থাকিতে হইবে। মিঃ কে—র ভক্ত হওয়া উচিত, কিন্তু যেখানে তাঁহার কোন দোষ বা দৌর্ব্বল্য দেখিবে, সেখানে দূরে থাকিও। তুমি জীবনে যে পরিবর্ত্তন আনিয়াছ তাহা খুব বুঝিয়া কর নাই। মিঃ কে—যাহা কিছু করিবেন সকলই

যে তোমায় করিতে হইবে এটা কিছু নয়। নিজে স্বতন্ত্র বিচার করিয়া তদনুযায়ী চলাই তোমার উচিত। সেটা করিবার সময় যদি কখনও কিছু ভুল হয় তাহার জন্য ভয় নাই; নির্ম্মল চিত্তে বিচার করিয়া তদনুযায়ী চলার অধিকার তোমার আছে।

নৈতিক দৃষ্টিতে যেটা তোমার কাছে ভাল বলিয়া মনে হইবে সেটা করা তোমার কর্ত্তব্য। তুমি মুক্তির অর্থ বুঝিয়া মুক্তিকামী হও ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু যতক্ষণ না তোমার স্বতন্ত্র বিচার করিবার শক্তি ও দৃঢ়তা আসিবে, ততক্ষণ তুমি তাহার উপযুক্ত হইবে না। এখন তোমার অবস্থা কতকটা লতার মত। লতা যে গাছকে আশ্রয় করে তাহার মতই তাহার আকৃতি হয়। কিন্তু আত্মার স্বরূপ এরূপ নহে, আত্মা স্বতন্ত্র ও সর্ব্বশক্তিমান্।

(১২)

ভাইশ্রী

শ্রীরামচন্দ্র যখন বনে যাইতেছিলেন তখন দশরথ তাঁহাকে বলিলেন কৈকেয়ীর নিকট যে সত্য তিনি করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কিছু ভাবিতে হইবে না, সত্যভঙ্গ (বচনভঙ্গ) হয় হউক্, তিনি যেন না যান। এই লৌকিক ও স্থুল পুত্রবাৎসল্যজাত ইচ্ছাকে ঠেলিয়া শ্রীরাম চন্দ্র বনে যাইয়া সত্য পিতৃভক্তি প্রকাশ করিয়া নিজেকে ও দশরথকে অমর করিলেন। হরিশ্চন্দ্র স্ত্রীকে বিক্রয় করিয়া, পুত্রের গলায় আঘাত করিয়া স্ত্রীর প্রতি প্রেমও পুত্রবাৎসল্যের নিদর্শন দেখাইয়া গেলেন। প্রহ্লাদ পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পিতৃভক্তি দেখাইয়া পিতাকে উদ্ধার করিল। মীরাবাই রাণা কুম্ভকে ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ভক্ত করিলেন। দয়ানন্দ পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া—বিবাহ না করিয়া—যাহারা তাঁহার অনুগমন করিতেছল তাহাদের ছাড়িয়া মাতৃভক্তি পিতৃভক্তি দেখাইয়াছিলেন। বুদ্ধ তরুণী স্ত্রীকে নিদ্রিত রাখিয়া গৃহত্যাগ করিলেন।

এমন অনেক উদাহরণই আমরা পাইব। সেগুলিকে বিবেচনা করিয়া সেরূপ অবস্থা হইলে অন্তরে বিচার করিয়া সত্যনীতির দৃষ্টিতে যাহা ভাল মনে হইবে সেইটা করাই উচিত।

এই কথা শুনিবার বেলায় স্থূল ও সূক্ষ্ম ভক্তির ধারা মিশিয়া যায় সুতরাং এই সকল উদাহরণ লই পূর্ণসত্য আমার কাছে ফুটিয়া ওঠে না। সত্যপথের পথিকের কাছে বিপদের মধ্যেও সত্যপথ উদ্ভাসিত হয় আমরা সর্ব্বদাই বৈরাগ্যবিষয়ক কবিতা পড়ি, কিন্তু বিচারসঙ্কটের সময় যদি সেগুলা আমার কাজে না লাগে, তাহা হইলে সেগুলাকে "পাখীর বুলিই" বলা উচিত। সকল সময়ে গীতা পড়ি, অথচ যদি অন্তকালে তাহার কোন সহায়তা না পাই, তাহা হইলে গীতা পড়া না পড়া দুইই সমান হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং আমি বলি অল্পই পড়ো, কিন্তু যেটুকু পড় সেটা বুঝিয়া লও এবং তদনুযায়ী চলো।

যখন আমি আমার শুভকামী বন্ধুদের সম্বন্ধেও উদাসীন হইতে পারিব, তখনই আমি প্রকৃত দয়াবান হইতে পারিব, তখনই আমি সত্যভাবে শুভকামীদের সেবা করিতে পারিব। 'বা' সম্বন্ধে আমি যতবেশী উদাসীন হইতেছি, ততই তাঁহার অধিকতর সেবা করিতে পারিতেছি। বুদ্ধ তাঁহার মাতাপিতাকে ত্যাগ করিয়াই তাঁহাদের উদ্ধার করিলেন; গোপীচন্দ্র বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াই প্রকৃত মাতৃভক্তি দেখাইতে পারিলেন। তেমনি তুমি নিজের চরিত্র গঠন করিয়া; নির্ম্মল নীতিগ্রহণ করিয়াই তোমার মাতাপিতার সেবা করিতে পারিবে। যখন তোমার আত্মা পবিত্র হইবে তখন তোমার পরম বন্ধুগণের উপর তোমার চরিত্রের প্রভাব হইবেই।

সূচী

শ্রীফুল্লনলিনী রায়চৌধুরী সম্পাদিত

ক্যালকাটা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,—৬৫ নং সার্পেণ্টাইন লেন, কলিকাতা হইতে

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নব্যভারত

দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড]　　জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১　　[২য় সংখ্যা

মধ্বাচার্য্য

মাধ্বসম্প্রদায়

মধ্যযুগের নয়শত বৎসরের মধ্যে চারিজন মহাপুরুষ ভারতে অবতীর্ণ হইয়া ভারত-ধর্ম্মক্ষেত্রে চারিটী নূতন ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া গিয়াছিলেন। ৬৮৬ খৃষ্টাব্দে কালডী গ্রামে অদ্বৈতবাদ-প্রবর্ত্তক শ্রীশঙ্করের আবির্ভাব হয়। ইহার ৪০১ বৎসর পরে পেরুমবুদুরে ১০৮৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারোদ্দেশে আবির্ভূত হন। ইহার পর শতবর্ষের কিছু পরে তুলবদেশে শ্রীমধ্ব জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জন্মকাল এখনও জানিতে পারা যায় নাই। তবে শ্রীমধ্বের তিরোভাব যে ১৩১৭ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল প্রত্নবস্তুতাত্ত্বিকেরা তাহা স্থির করিয়াছেন। যাহাহউক, ইহার ২৬৮ বৎসর পরে ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আবির্ভূত হন। ইঁহাদের মধ্যে শঙ্কর অদ্বৈতবাদ, রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মধ্ব দ্বৈতবাদ এবং চৈতন্য অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রচার করেন। শঙ্কর অদ্বৈতবাদী, আর রামানুজ, মধ্ব ও চৈতন্য দ্বৈতবাদী বলিয়া প্রখ্যাত। মধ্ব ও চৈতন্যের মধ্যবর্ত্তী সময়ে আরও কয়েকজন মহাত্মা ধর্ম্মমত প্রচার করেন। ত্রয়োদশ শতকে বিষ্ণুস্বামী দ্বৈতবাদের ভিতর দিয়া এবং নিম্বার্ক ভেদাভেদ বাদের প্রচারে দেশ মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। ইহাতে ষোড়শ শতকে বল্লভাচার্য্যের শুদ্ধাদ্বৈতমত প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা হইয়াছিল।

শ্রীমধ্বাচার্য্য মাধ্বসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। পূর্ণবোধ বা পূর্ণপ্রজ্ঞ নামে তিনি পরিচিত। উপনয়নের পর তিনি নয় বৎসর বয়সে বিদ্যাভ্যাসে রত হন। সনককুলোদ্ভব আচার্য্য অচ্যুত-প্রেক্ষের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মধ্যগেহে শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন। তারপর তিনি গীতাভাষ্য রচনা করিয়া হিমালয়ে বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হন। প্রবাদ আছে—এই ভাষ্য তিনি বেদ-ব্যাসকে প্রদান করেন। বেদব্যাসও বহু সমাদর করিয়া তাঁহাকে তিনটী শালগ্রামশিলা প্রদান করেন।

এই সম্প্রদায় শ্রীবৈষ্ণব বা রামানুজ-সম্প্রদায় অপেক্ষা আধুনিক, একথা পূর্ব্বেই বলা

হইয়াছে। মাধ্বদিগের গ্রন্থে বর্ণিত আছে, মধ্বাচার্য্য—সুব্রহ্মণ্য, উদিপি ও মধ্যতন এই তিনটী স্থানের মঠে পূর্ব্বোক্ত তিনটী শিলা স্থাপন করেন। এ ছাড়া, উদিপিতে আরও একটী কৃষ্ণ-বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই বিগ্রহ স্থাপন সম্বন্ধে একটী গল্প আছে :—কোনও বণিকের একখানি সোনার নৌকা মলবর যাইতে যাইতে তুলবদেশের নিকটে গিয়া ডুবিয়া যায়। ঐ নৌকায় এক কৃষ্ণবিগ্রহ গোপীচন্দন মৃত্তিকায় ঢাকা ছিলেন। মধ্বাচার্য্য দৈবশক্তিবলে তাহা জানিতে পারিয়া প্রতিমা উঠাইয়া আনিয়া উদিপিতে প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত উদিপি নগর এই সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত। ইঁহার সম্বন্ধে এইরূপ অনেক অলৌকিক ঘটনা আছে। মহাপুরুষ সম্বন্ধে অলৌকিক কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায় না, এমন বোধ হয় কখনও ঘটে না।

যৌবনে মধ্বাচার্য্য ভীমাকৃতি ছিলেন বলিয়া তাঁহার একটী নাম 'ভীম'। কেহ কেহ তাঁহাকে বায়ুর অবতার এবং কেহ কেহ তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়াছেন। মাধ্বদিগের মতে, ইঁহাদের মধ্যে বায়ুর উপাসনা ছাড়া অন্য কাহারও উপাসনায় ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি অসম্ভব।

শঙ্করের মায়াবাদের সবিশেষ আলোচনা করিয়া মধ্ব বেদান্ত পাঠ করেন। আচার্য্য কিছুদিন উদিপিতে অবস্থান করিয়া, সুত্রভাষ্য ঋগ্‌ভাষ্য, দশোপনিষদ্‌ভাষ্য, অনুবাক্‌নির্ণয়বিবরণ, অনুবেদান্তরসপ্রকরণ, ভারততাৎপর্য্যনির্ণয়, ভাগবত তাৎপর্য্য, গীতাতাৎপর্য্য, কৃষ্ণামৃতমহার্ণব, তন্ত্রসার প্রভৃতি ৩৭ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। এইগুলির মধ্যে বেদান্তসূত্র, ভগবদ্‌গীতা ও ভারততাৎপর্য্যনির্ণয় প্রধান।

তিনি কয়েকবার ভ্রমণে বহির্গত হন ও দ্বৈতবাদের প্রচার আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি দক্ষিণভারত পরিভ্রমণ করেন ও চারিমাস রামেশ্বরে থাকিয়া আবার উদিপিতে আসেন। প্রথম বারের ভ্রমণ ও মতপ্রচারের সময় শঙ্করের শৃঙ্গেরীমঠের শৈব সন্ন্যাসীদের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। এই বিরোধ বড় সহজ হয় নাই। উভয় পক্ষই উভয় পক্ষের মতবাদের ভুল দেখাইয়া, নিন্দা করিয়া, কুৎসা রটাইয়া নিজ নিজ বিশ্বাসানুসারে ধর্ম্মপ্রচার করিতে চাহিয়াছেন।

প্রথমবারের ভ্রমণেই আচার্য্যের মত খুব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ফিরিয়া আসিয়া কয়েক বৎসর উদিপিতে থাকিয়া, তিনি বেদান্তসূত্র শেষ করেন। দ্বিতীয়বার তিনি উত্তর ভারতে ভ্রমণ করেন। তার পরেই হরিদ্বারে গমন করেন। তখন উপবাস ও ধ্যানধারণায় তিনি এমন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, প্রিয় শিষ্যগণকে পরিত্যাগ করিয়াও সাধনায় সিদ্ধিলাভের আশায় হিমালয়ে চলিয়া যান। সহসা তাঁহার হিমালয়ে প্রস্থান করিবার কারণ অজ্ঞাত হইলেও তপস্যা ও আত্মমতের সিদ্ধির মানসেই যে তিনি গিয়াছিলেন, তাহা বোঝা যায়। সেখানেও তিনি নাকি মহাভারতকার ব্যাসের সাক্ষাৎ পান। শঙ্করের সঙ্গেও তিনি নাকি আলাপ করিয়াছিলেন। ব্যাস বা শঙ্করের সহিত মধ্বের সাক্ষাৎকার একেবারে অসম্ভব। যাহা হউক উদিপিতে ফিরিয়া আসিয়া শঙ্করমতের একজন প্রধান সন্ন্যাসীকে তিনি দীক্ষিত করেন। ইহাতেও শঙ্করাচার্য্যের শৃঙ্গেরীমঠের শিষ্যদের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। তাঁহারা তাঁহাদের মতবিরোধী এই নূতন আচার্য্য ও নূতন মতের উচ্ছেদ সাধনের প্রয়াস পান।

মধ্বাচার্য্যের শিষ্যসংখ্যা ক্রমশঃ যখন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন তিনি উদিপির মন্দির ছাড়া ক্রমে ক্রমে আরও আটটী মন্দির প্রস্তুত করাইয়া বিবিধ বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করেন এবং নিজ ভ্রাতাকে ও গোদাবরীতীরস্থ ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব আটজন সন্ন্যাসীকে ঐগুলির অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করেন। যে সময় যিনি অধ্যক্ষতা করিবার ভার লন, দেবালয়ের যাবতীয় ব্যয়ভার তখন তাঁহাকেই বহন করিতে হয়। প্রশংসা লাভের জন্য অধ্যক্ষেরা ধুমধাম করিয়া ব্যয়ের মাত্রা এত বৃদ্ধি করিয়া ফেলেন যে, তের হাজার হইতে কুড়ি হাজার টাকা পর্য্যন্তও সময় সময় ব্যয় হইয়া যায়। এই অর্থ সংগ্রহের জন্য সন্ন্যাসীরা বিষয়ী শিষ্য-প্রশিষ্যের কাছে নানা স্থানে গিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন এবং যিনি যখন অধ্যক্ষ থাকেন, তাঁহার অধ্যক্ষতার সময় তাঁহার সংগৃহীত অর্থ উদিপির মন্দিরে দেব-সেবায় ব্যয় করিয়া থাকেন।

কানুর, পেজাওর, আদমার, ফলমার, কৃষ্ণকুর, ঝিরার, ঝোদ, পুত্তি, এই আট স্থানে আটটি দেবালয় আছে। এই আটটি দেবালয়ই তুলব রাজ্যের অন্তর্গত। মধ্বাচার্য্য, তাঁহার শিষ্য পদ্মনাভ তীর্থকে বলেন যে, তুমি আমার মত প্রচার কর ও দেব-সেবাদির জন্য অর্থ সংগ্রহ কর। তিনি ইঁহাকে আরও কয়েকটী মঠ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেন। সেই সময় হইতে এক একজন করিয়া শিষ্য সেখানকার অধ্যক্ষ হইয়া আসিতেছেন। উদিপির মন্দিরেও তাঁহারা গমন করেন, কিন্তু অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন না।

সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য লোকের দীক্ষাগুরু হইবার অধিকার এ সম্প্রদায়ের মধ্যে নাই। জাতিতে নীচ না হইলে আচার্য্যগণ সকল জাতিকেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। পৈতৃক শিষ্যমণ্ডলীর উপর গুরুদেবের অধিকার অসাধারণ। গুরুত্ব-পদ বিক্রয় ও বন্ধক দিবার পদ্ধতি ইঁহাদের মধ্যে রহিয়াছে। এই উপায়ে গুরুর আপদে বিপদে অর্থোপার্জ্জন হয়; কিন্তু শিষ্যের গুরুত্যাগ ও গুরু-গ্রহণ—গুরুর ব্যবসায়ের অন্তর্গত।

এই সম্প্রদায়ের মধ্যে চিরকালের মত যাঁহারা সংসার-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, শৈশব হইতেই তাঁহাদিগকে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয়। উদাসীন আচার্য্যগণ দণ্ডীদের মত যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করেন, দণ্ডকমণ্ডলু গ্রহণ করেন, মস্তক মুণ্ডিত করেন এবং এক এক খণ্ড গৈরিক বস্ত্র পরিধান করেন।

মধ্বাচারীরা উত্তপ্ত লৌহের দ্বারা স্কন্ধ ও বক্ষোদেশে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের চিহ্ন অঙ্কিত করেন এবং শ্রীবৈষ্ণবদিগের ন্যায় নাসামূল হইতে কেশ পর্য্যন্ত দুটী ঊর্দ্ধরেখা চিহ্নিত করিয়া দেন। দুই রেখার দুই দিক্, আর একটি রেখা দ্বারা ভ্রূর মধ্যদেশে যোগ করিয়া দেন। রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা ঐ দুই ঊর্দ্ধরেখার মধ্য দিয়া পীত ও রক্তবর্ণ আর একটা ঊর্দ্ধরেখা অঙ্কন করেন; মধ্বাচারীরা তাহার পরিবর্ত্তে নারায়ণকে নিবেদন করিয়া, গন্ধদ্রব্যের ভস্মদ্বারা ঐ স্থলে একটি কৃষ্ণবর্ণ রেখা অঙ্কিত করিয়া তাহার শেষভাগে হরিদ্রাময় গোলাকার একটি তিলক করিয়া থাকেন।

ইঁহারাও অন্যান্য বৈষ্ণবের ন্যায় বিষ্ণুকে বিশ্বকারণ, পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন এবং নিজের মত পোষণের জন্য উপনিষৎ ও অন্যান্য গ্রন্থাদির বচন উদ্ধৃত করেন। ইঁহাদের

মতে প্রথমে একমাত্র অদ্বিতীয় সর্ব্বকারণস্বরূপ ভগবান্ নারায়ণ বিদ্যমান ছিলেন। জগৎ তাঁহা হইতেই উৎপন্ন। তিনি অশেষরূপগুণসম্পন্ন, অনির্ব্বচনীয়স্বরূপ ও স্বতন্ত্র। মধ্বাচারীরা জীব ও পরমেশ্বরের পৃথক্ পৃথক্ সত্তা স্বীকার করায় দ্বৈতবাদী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই জন্যই ইঁহাদের সঙ্গে রামানুজের মতবৈষম্য ঘটিয়াছে। ইঁহারা বলেন, জীব নিত্য ঈশ্বরের অধীন।

পক্ষী ও সূত্রে, বৃক্ষ ও রসে, নদী ও সমুদ্রে, শুদ্ধ জল ও লবণে, চোর ও হৃত দ্রব্যে, পুরুষ ও ইন্দ্রিয় বিষয়ে যেমন প্রভেদ, জীব ও ঈশ্বরেও সেইরূপ প্রভেদ। আরও পঞ্চ প্রকারের ভেদ ইঁহারা স্বীকার করেন।

জীবেশ্বর ভেদ, জড়েশ্বর ভেদ, জড়-জীব-ভেদ এবং জীবগণ ও জড় পদার্থের ভেদ, এই পঞ্চ ভেদের নামই প্রপঞ্চ। ইঁহারা পরমাত্মায় জীবের লয় বা নির্ব্বাণমুক্তি অস্বীকার করেন এবং শৈবদের যোগ ও বৈষ্ণবের সাযুজ্য স্বীকার করেন না।

ইঁহারা বলেন,—লক্ষ্মী, ভূমি ও লীলাদেবী, এই তিন পত্নীর সঙ্গে নারায়ণ, স্বর্গীয় বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় ঐশ্বর্য্য-সুখ সম্ভোগ করেন। তিনি স্বরূপ অবস্থায় গুণের অতীত, কিন্তু যখন মায়ার সহিত সংযুক্ত হন, তখন সত্ত্ব, রজঃ, তম, এই তিন গুণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে আবির্ভূত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতে থাকেন। ইঁহারা বলেন,—বিষ্ণু প্রধান, পুরাণ-সমুদায়ে বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি; ব্রহ্মার অশ্রুতে রুদ্রের উৎপত্তি।

ইঁহাদের মতে উপাসনার তিনটি অঙ্গ;—প্রথমতঃ অঙ্কন (শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন ধারণ)। দ্বিতীয় অঙ্গনামকরণ (বিষ্ণুর নামে সন্তানগণের নামকরণ)। তৃতীয় অঙ্গভজন (কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভজনের অনুষ্ঠান)। দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা মানসিক ভজন। সত্যকথন, হিতকথন, প্রিয়ভাষণ ও শাস্ত্রানুশীলন, এই চারিটী বাচিক ভজন; আর দান, পরিত্রাণ, পরিরক্ষণ, এই তিনটি কায়িক ভজন।

ভজনং দশবিধং—বাচা সত্যং হিতং প্রিয়ং স্বাধ্যায়ঃ, কায়েন দানং পরিত্রাণং পরিরক্ষণং, মনসা দয়া স্পৃহা শ্রদ্ধা চেতি, অত্রৈকৈকং নিষ্পাদ্য নারায়ণে সমর্পণং ভজনমিতি। এই দশটী মধ্বাচারী সম্প্রদায়ের ধর্ম্মনীতির সার। অন্যান্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ন্যায় ইঁহাদিগের বিগ্রহ-পূজা এবং দেবোৎসব প্রচলিত আছে। উদিপির বিগ্রহের নয়টী উপাচারে পূজা হয়। ইঁহাদের দেবালয়ে বিষ্ণুমূর্ত্তির সহিত শিব, পার্ব্বতী ও গণেশের প্রতিমূর্ত্তি থাকে এবং তাঁহাদের যথানিয়মে পূজা হয়। ইঁহাদের মতে শিব ও ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতাই অনিত্য ও ক্ষর, লক্ষ্মীই একমাত্র অক্ষর। বিষ্ণু ক্ষরাক্ষর হইতে প্রধান ও স্বতন্ত্র।

মধ্বাচারীদের দেব-সেবা, দেবতান্তরের নিন্দা না করা এবং সকল দেবদেবীকে নমস্কার করা প্রভৃতি সদ্গুণসকল শ্রীচৈতন্যদেবও স্বীকার করেন।

মধ্বাচারীদের ধর্ম্মমতের প্রধান কথা উপনিষদের ব্রাহ্মণই বিষ্ণু। দ্বিতীয়তঃ যখনই তিনি অবতীর্ণ হন, বায়ুর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন।

মণিমঞ্জরী গ্রন্থে প্রথমতঃ মধ্বাচার্য্যের কথা পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ মাধ্ববিজয়

গ্রন্থে আলোচনা আছে। কিন্তু এই উভয় গ্রন্থই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। নারায়ণ নামক কোনও ব্যক্তি গ্রন্থ দুইখানি লেখেন। এই নারায়ণ ত্রিবিক্রমের পুত্র এবং ইনি মধ্বাচার্য্যের অনুগত শিষ্য। বায়ুস্তুতি নামক ত্রিবিক্রমের আর একখানি গ্রন্থ আছে। কৃষ্ণস্বামী আয়ারের শ্রীমাধব ও মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায় সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এই সমস্ত বিবরণ হইতেই এই সম্প্রদায়ের বিবরণ সংগ্রহ করা যায়।

বৈষ্ণবদিগের চারিটি প্রধান সম্প্রদায় আছে। দ্বিতীয় প্রধান সম্প্রদায়ের নাম ব্রহ্মসম্প্রদায়। মধ্বাচার্য্য এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া যেমন ইহাকে মাধ্ব সম্প্রদায় বলে, তেমন আবার ব্রহ্মসম্প্রদায় নামেও এই সম্প্রদায় অভিহিত হইয়া থাকেন।

মণিমঞ্জরী গ্রন্থের প্রথম চারি সর্গে রাম ও কৃষ্ণ অবতারের কথা আছে। রামের ভক্ত হনুমান্, এই হনুমান্ কিন্তু বায়ুপুত্র। কিন্তু কৃষ্ণের সখা অর্জ্জুন হওয়া উচিত ছিল, এখানে কিন্তু ভীমের উল্লেখ দেখিতে পাই। এই ভীমও কিন্তু বায়ুপুত্র। বনপর্ব্বে (মহাভারতে) উল্লিখিত আছে, হিমালয়ের পশ্চাদ্‌ভাগে যক্ষ বা রাক্ষস জাতিকে ভীম আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের সেনাপতি মণিমান্‌কে নিহত করিয়াছিলেন। মণিমান্ এক সময়ে অগস্ত্য ঋষিকে অপমান করিয়াছিলেন, অগস্ত্য ঋষি সেই জন্য অমর মণিমান্‌কে "তোমার মৃত্যু হউক" বলিয়া অভিসম্পাত করেন। এই পুস্তকখানি মধ্বাচার্য্য পুনর্ব্বার লিখিয়া সম্পাদন করেন।

মণিমঞ্জরীর ৫ম সর্গে কলিযুগের বর্ণনা আছে। লোকায়তের পুত্র চাণক্য শকুনি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, চার্ব্বাক, জৈন ও পাশুপত মত ধ্বংস করেন। বেদের অসুরেরা কৃষ্ণ ও ভীমের বিরুদ্ধাচরণ করে। এই সময় বেদান্তের দোহাই দিয়া প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমত প্রচারের জন্য মণিমন্তই শঙ্কর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।* মণিমন্ত ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর বেশে বেদান্ত ধ্বংস করিতে চান।

কেহ কেহ বলেন,—মধ্বাচার্য্য প্রথমে শৈব ব্রাহ্মণ ছিলেন; তার পর বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, শৈব ও বৈষ্ণবের পরস্পরের বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য চেষ্টা করেন। প্রথমে তিনি অনন্তেশ্বর নামক শিবমন্দিরে দীক্ষিত হন। দ্বিতীয়তঃ তিনি শঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত তীর্থ উপাধি গ্রহণ করেন। তৃতীয়তঃ মধ্বাচারীদিগের দেবালয়ে বিষ্ণুর সহিত একত্র শিবপার্ব্বতী প্রভৃতিরও পূজার ব্যবস্থা করেন। চতুর্থতঃ মানব ও শঙ্কর-গুরুদিগের শিষ্যেরা পরস্পর উভয় পক্ষীয় গুরুদিগেরই নমস্কার ও শ্রদ্ধাভক্তি করেন এবং শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী মঠের মহান্ত, উদিপি নগরের কৃষ্ণ-মন্দিরে পূজা করিতে আসেন। যে সকল শৈব ও বৈষ্ণব এরূপ সদ্ভাবসম্পন্ন না হইয়া পরস্পর বিদ্বেষ প্রকাশ করেন, মধ্বাচারীরা তাঁহাদের পাষণ্ড বলিয়া অবজ্ঞা ও নিন্দা করেন। কিন্তু গ্রীয়ার্সন বলেন, অনেকেরই বিশ্বাস, এই সম্প্রদায় শৈব ও বৈষ্ণবের মিলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রামাণ্য গ্রন্থাদির অনুশীলন করিয়া ইহার সত্যতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ দূর হয় নাই।

* মধ্বাচারীরা শঙ্কর শব্দের বানানে শ-এর পরিবর্ত্তে স-কার ব্যবহার করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করকে বর্ণসঙ্কর প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ সর্গে কুমারিল ভট্টের দিগ্বিজয়ের কথা আছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাকরের কথাও আছে। এই মণিমন্তই বিধবার জারজ সন্তান; ইনিই শঙ্করাচার্য্য। অন্য গ্রন্থে আছে, বিশিষ্টা দেবী উৎকট তপস্যাচরণ করিতে আরম্ভ করেন; সেই জন্য স্বয়ং মহেশ্বর তাঁহার গর্ভে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু এই ঘটনায় বিশিষ্টা দেবীর উপর সামাজিক শাসনও আরম্ভ হয়। এমন কি, তাঁহার পিতা অবধি ইহাতে কন্যার প্রতি বিরূপ হন। কিন্তু বিশিষ্টা দেবীর পিতা শিবকর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হওয়ার পরে কন্যার প্রতি সদয় হন। কুমারী মেরীর গর্ভে যেরূপ যিশুখৃষ্ট জন্মিয়াছিলেন, বিধবা বিশিষ্টা দেবীর গর্ভেও তেমনই জগদ্‌গুরু শঙ্কারাচার্য্যের আবির্ভাব হইয়াছিল।

ঘোর দারিদ্র্য-দশায় শঙ্করাচার্য্য প্রতিপালিত। তিনি অল্প বয়সেই সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং গুরুর কাছে গিয়া অভীষ্ট সিদ্ধি সম্বন্ধে বিফলমনোরথ হন। তার পর তাঁহার মত সম্বন্ধে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং বেদান্তের ধর্ম্মমত মনে দৃঢ় করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা করেন। শঙ্কর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ, এমন কথাও অনেকে বলিয়াছেন।

সপ্তম সর্গে আছে, শঙ্কর তাঁর এক ব্রাহ্মণ অতিথি-পত্নীর সতীত্ব নষ্ট করেন। তিনি যাদুবিদ্যা প্রভাবে তাঁহার মত প্রচার করেন ও দলের পুষ্টি সাধন করেন। তারপর তিনি পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বাঙ্গালী জীবনের ছায়াপাত

বিদ্যা-শিক্ষা

প্রাচীন ভারতে শিশুর পঞ্চম বর্ষে বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ হইত। রঘুবংশের তৃতীয় সর্গের অষ্টবিংশতি শ্লোকের টীকায় মল্লিনাথ এসম্বন্ধে একটী প্রাচীন বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"প্রাপ্তে তু পঞ্চমে বর্ষে বিদ্যারম্ভঞ্চ কারয়েৎ।

কবিকঙ্কণের সময়েও তাহাই হইত; শ্রীমন্তের পঞ্চম বর্ষে কর্ণবেধ ও কুলপুরোহিতের নিকট "হাতে খড়ি" হইয়াছিল—

"শুনি বাক্য খুল্লনার দ্বিজ কৈল অঙ্গীকার
হাতে খড়ি দিল শুভক্ষণে।"

বৃন্দাবনদাস-কৃত "চৈতন্য ভাগবতে"ও "হাতে খড়ি"র উল্লেখ আছে—

"হেন মতে ক্রীড়া করে গৌরাঙ্গ গোপাল।
হাতে খড়ি দিবার হইল আসি কাল॥"

এখন যেমন এদেশের মুদির দোকানে এবং উত্তর ভারতের গ্রাম্য পাঠশালায় কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠফলকের উপর খড়ি দিয়া কিম্বা শ্বেতবর্ণ ফলকের উপর কালি দিয়া লিখিবার প্রথা

প্রচলিত আছে, প্রাচীন ভারতেও সেই প্রথা প্রচলিত ছিল; বস্তুতঃ তখন ফলক আধুনিক শ্লেটের কাজ করিত। সুবিখ্যাত স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তাঁহার "ব্যবহারতত্ত্ব" নামক গ্রন্থে ব্যাস সংহিতা হইতে এ সম্বন্ধে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"পাণ্ডুলেখ্যেন ফলকে ভূমৌ বা প্রথমং লিখেৎ।
ঊনাধিকন্তু সংশোধ্য পশ্চাৎ পত্রে নিবেশয়েৎ॥"

উদ্ধৃত বচনের ভাবার্থ এই যে, কোনও দলিল পত্রে কিছু লিখিবার পূর্ব্বে ফলকে বা ভূমিতলে উহার একটা মুসাবিদা লিখিয়া সংশোধন করিবে। মুসলমান ভ্রমণকারী আলবারুণি নয়শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন; তিনিও এখানকার পাঠশালার ছাত্রদিগকে কৃষ্ণবর্ণ ফলকে খড়ি দিয়া অক্ষর বিন্যাস করিতে দেখিয়াছিলেন।

কবিকঙ্কণ শ্রীমন্তের বিদ্যাভ্যাস বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

পড়য়ে সাধুর বালা প্রথমে আঠার কলা
বিহানেতে করিয়া ভোজন।
গুরুবাক্য দিয়া কর্ণে চিনিল অনেক বর্ণে
ভুঞ্জিল পালিল শুভক্ষণ॥
পড়িল শ্রীপতি দত্ত জানিতে শাস্ত্রের তত্ত্ব
রাত্রি দিবা করয়ে ভাবনা।
নিবিষ্ট করিয়া মন লেখে পড়ে অনুক্ষণ
দিনে দিনে বাড়য়ে ধারণা॥
রক্ষিত পঞ্জিকা টীকা ন্যায় কোষ নাটিকা
গণবৃত্তি আর ব্যাকরণ।
জানিতে শাস্ত্রের তত্ত্ব পড়িল অনেক মত
বিদ্যা বিনে নাহি অন্য মন॥
পড়ি রামায়ণ দণ্ডী করিতে কবিত্ব খণ্ডী
নানা ছন্দে পড়িল পিঙ্গল।
করি দৃঢ় অনুরাগ পড়িল ভারবি মাঘ
বন্ধুজনে বাড়ে কুতূহল॥ *

* ইহার পরে পুস্তকান্তরে এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়—

"পড়িয়া উদাত বৃত্তি, ধীর সভায় পুরোবর্ত্তী,
নিরন্তর করয়ে বিচার।
দিবানিশি যত্নবান, পড়ি ভট্টি অভিধান,
পুথি শুধি বিবিধ প্রকার॥
জৈমিনি ভারত সুত, তবে পড়ে মেঘদূত,
নৈষধ কুমারসম্ভবে।
দিবানিশি নাহি জানি, পড়ে রঘু শ্বেতবাণী,
রাঘব পাণ্ডবী জয়দেবে॥

জৈমিনি ভারতামৃত ব্যাস পড়ে মেঘদূত
নিষধ কুমার সম্ভবে।
দিবা নিশি নাহি জানি পড়ে রঘু শ্বেত মুনি
রামগুরু প্রসন্নরাঘবে॥
বৈদিক জ্যোতিষ যত বিশেষ বলিব কত
একে একে পড়িল শ্রীপতি।
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
দামিন্যায় যাহার বসতি॥"

কবিকঙ্কণের সময়ে "পাঠশালের" (চতুষ্পাঠীর) গুরুমহাশয় পৌরোহিত্য কার্য্যও করিতেন, শ্রীপতির শিক্ষা-গুরু ও কুলপুরোহিত দনাই ওঝা (জনার্দ্দন উপাধ্যায়) তাঁহাকে যে কারণে "পাঠশাল" হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন, কবি তাহা সবিশেষ বিবৃত করিয়া সেকালের ব্রাহ্মণ শিক্ষা-গুরুর আত্মম্ভরিতা ও জাত্যভিমানের বেশ পরিচয় দিয়াছেন—

"সমাপ্ত করিয়া আগে নিজ অধ্যয়ন।
কৌতুকে শুনেন যত পড়য়ে ব্রাহ্মণ॥
রাম ওঝার পো নামে দামোদর।
কুলে ওঝা বাঁড়ুরি পদবী রত্নাকর॥
পূর্ব্বপক্ষ করে সাধু সভা বিদ্যমানে।
আপনে দনাই ওঝা করে সমাধানে॥
পুত্র বুদ্ধে অজামিল বলি নারায়ণে।
বৈকুণ্ঠ চলিলা দ্বিজ চাপিয়া বিমানে॥
দ্বিজ হয়ে বহুকাল বেশ্যা করি সঙ্গ।
এজন পাইল মুক্তি এই বড় রঙ্গ॥
গজেন্দ্র পাইল মুক্তি হরির পরশে।
চতুর্ভুজ হয়ে গেল বৈকুণ্ঠ নিবাসে॥
দিয়া কৃষ্ণে পূতনা গরল স্তনপান।
রাক্ষসী গোলক গেল চাপিয়া বিমান॥
যশোদা দেবকী দুহে পাইল যে গতি।

অব্যাহত কাব্য পড়ি, অভ্যাস করিল বড়ি'
রত্নাবলী সাহিত্য দর্পণে।
দিবা নিশি নাহি জানে, পড়ে সাধু সাবধানে,
প্রসন্ন রাঘব রামগুণে॥
দৈব জ্যোতিষ যত, বিশেষ বলিব কত,
একে একে পড়িল শ্রীপতি।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ,
দামুন্যায় যাহার বসতি॥"

বিষস্তন পিয়াইয়া পাইল সেমতি ॥
মুচকুন্দ কৈল স্তব দৈবকীনন্দনে।
তবে কেন কৈল গর্ব্ব শরীর কারণে ॥
তৎক্ষণাৎ পাপ নাশ হইল দ্বিজবর।
তবে মুক্তিপদ তারে দিল গদাধর ॥
এতেক বচন যদি বলিল শ্রীপতি।
সমাধান বুঝাবারে ওঝা কৈল মতি ॥
কৃষ্ণ ইচ্ছা ব্যতিরেক নাহি সমাধান।
হাসিয়া বলিল গুরু সভা বিদ্যমান ॥
গুরুটীকার বিচার কর, না বল ঝটিত।
কেন বা প্রভুর ইচ্ছা হবে অনুচিত ?
সক্রোধ হইলা দ্বিজ সাধুর বচনে ;
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণে ভণে ॥"
"পঁচাশী বৎসর হৈল আমার বয়েস।
নিরন্তর অধ্যয়ন টীকার নাহি লেশ ॥
শিশু বুঝাবারে মোর টীকার বিচার।
ইহার অধিক অপমান নাহি আর ॥
বুঝিনু বচন নাহি প্রবেশিল পেট।
উচিত বলিতে তোর মাথা হবে হেঁট ॥
গুরু উচিত বলিতে কিবা মান অভিমান ॥
শাস্ত্রের বচনে নাহি কর অবধান ॥
গোত্রে দুর্ব্বাসা ঋষি কুলে দত্ত বেণিয়া।
ব্রাহ্মণের মত নহি বল্লাল-সেনিয়া ॥
মাথা হেঁট হবার কারণ আমি চাই।
যদি নাহি বল রাধাকান্তের দোহাই ॥
পিতা দীর্ঘ পরবাসে তোমার জনম।
নাহি জান আপনার জাতির মরম ॥
মরি গেল ধনপতি স্থান বহু দিশ ॥
মায়ের আয়তি হাতে, ভোজন আমিষ ॥
বেহুয়া এমত জনে শুনাই পুরাণ।
এই হেতু আমার এতেক অপমান ॥
রাজার সভায় পিতা আছেন সিংহলে।
কহিছ নিঠুর বাণী পৈতার বলে ॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া তোমার সহি কটু কথা।

কহিতে উচিত এখন মনে পাবে ব্যথা ॥
উগ্র ব্রাহ্মণ জাতি সহজে চপল।
তমোগুণে কহ কথা হইয়া প্রবল ॥
ছুঁইতে না যুয়ায় বেটা জাতিতে ঢেমনে।
উগ্র বসিয়া গালি দিল ব্রাহ্মণে ॥
অবিলম্বে যাও বেটা পাঠশাল ছাড়ি।
মাথা ভাঙ্গিব পাছে মারিয়া পাবুড়ি ॥
ধনের গরব বেটা মোরে না দেখাও।
গৌরব রাখিয়া বেটা এথা হৈতে যাও ॥
অবিচারে মিথ্যা গুরু পরিবাদ বল।
ঢেমনের ঘরে কেমনে খাও জল ॥
পঞ্চাশ কাহন করি লও মাসের মাস।
আমি যদি ঢেমন তোমার জাতি নাশ ॥
বুঝিয়া না কহ কথা হইয়া পণ্ডিত।
কোপেতে উন্মত্ত হয়ে বল অনুচিত ॥
আছয়ে গঙ্গার জল বিষ্ণুর ভবনে।
চাহিলে আনিয়া দেয় উত্তম ব্রাহ্মণে ॥
পঞ্চাশ কাহন লই পড়াইয়া বেতন।
তোমার ঘরের জল খায় সে কোন্ ব্রাহ্মণ ॥
শ্রীমন্তের দুই চক্ষু ধারা শ্রাবণ।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥"

গুরু ধনাঢ্যের সন্তানের নিকট মাসিক পঞ্চাশ কাহন কড়ি বেতন পাইতেন, কিন্তু অন্যান্য ছাত্রের নিকট যে যৎসামান্য বেতন পাইতেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

মাণিক গাঙ্গুলি কৃত "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল" কাব্যে রাণী রঞ্জাবতীর পুত্র লাউসেন ও কর্পূরের বিদ্যাশিক্ষার বিস্তারিত বিবরণ আছে—

"নরোত্তম নিত্য নিবিষ্টতা বড়ি।
আরম্ভ করিল বিদ্যা দিয়া হাতে খড়ি ॥
অকার আদি ক্ষকারান্ত যে যে বর্ণগুলি।
ক্রমিক হইতে ভূমে লেখালা সকলি ॥
বর পুত্র ধর্ম্মের ধীষণবান হয়।
হলো অনায়াসে দিন দশে বর্ণ পরিচয় ॥
ব্যাকরণ প্রথমে সে পড়িল নানা মত।
পাণিনি কলাপ ভাষ্য কোষ শত শত ॥
অষ্ট দিন আমূলক প'ড়ে অভিধান।

দৃঢ় হল দোঁহাকার দিব্যান্তর জ্ঞান ॥
অবশেষে পড়িলেন সাহিত্য সকল।
মুরারী ভারবি ভট্টি নৈষধ পিঙ্গল ॥
কালিদাসকৃত কাব্য অন্য কাব্য কত।
অলঙ্কার জ্যোতিষ আগম তর্কশাস্ত্র ॥

* * * *

বাকী নাই শাস্ত্র কিছু সকল পড়িলা।
সেই কথা নরোত্তম সকল কহিলা ॥
মল্ল বিদ্যা দোঁহে করাও অভ্যাস।
ভাল হয় ভূপতি শুন আমার ভাষ ॥

সে কালে বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা বড় একটা ছিল না, কিন্তু ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যেও সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট অনুশীলন হইত। আমরা পূর্ব্বেই শ্রীপতির বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়াছি। ঘটক ধনপতি সওদাগরের সহিত খুল্লনার বিবাহপ্রস্তাবকালে বরের গুণ ব্যাখ্যা করিতে করিতে বলিতেছেন—

"দানে কর্ণ সমান উচ্চ অভিলাষ।
নাটক নাটিকা কাব্য করেছে অভ্যাস ॥

খুল্লনাও নিতান্ত অশিক্ষিতা ছিলেন না, তাঁহার সপত্নী লহনা যখন তাঁহাকে ধনপতির লিখিত বলিয়া একখানা কৃত্রিম পত্র পড়িতে দিলেন, তখন তিনি তাহা পড়িয়াই বুঝিলেন যে উহা তাঁহার স্বামীর লেখা নহে—

"লহনার বোলে পড়িল পাতি।
হাসে ছন্দ দেখি ভিন্ন ভাতি ॥
বলে 'দিদি ! ইথে নাহিক ত্রাস।
কেন লিখি পত্র কর উপহাস ॥
মোর প্রভুর অক্ষর ভিন্ন ছন্দ।
কেনে লিখি পত্র কপট প্রবন্ধ ॥' "

কবিকঙ্কণের সময়ে স্ত্রীলোকে পত্র পড়িতে এবং লিখিতেও পারিতেন। উপরোক্ত জাল চিঠি ধনপতির হস্তগত হইলে তিনি উহা লীলাবতী ব্রাহ্মণীর লেখা বলিয়া ধরিতে পারিয়াছিলেন—

"উজানী নগরে বৈসে যত জন জানি।
একে একে অক্ষর সবার আমি চিনি ॥
পাপমতি হিংসামতি তুহুলো দুঃশীলা।
কপটে লিখিল পাতি তোর সই লীলা ॥"

বঙ্গদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা জয়দেব গোস্বামীর সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বাদশ

শতাব্দীতে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল এবং তৎপরেও কয়েক শতাব্দী কাল এদেশ সংস্কৃত-সাহিত্যজগতে উচ্চস্থান রক্ষা করিয়াছিল। চৈতন্যের সময়ে, অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে, নবদ্বীপ ন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্রানুশীলনের জন্য ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। সে সময়ে বাসুদেব সার্ব্বভৌম নামক একজন অদ্বিতীয় অধ্যাপক এখানে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার অধ্যাপনার কথা আর কি বলিব? চৈতন্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তাঁহার ছাত্র ছিলেন। তখন হইতে নবদ্বীপে নানাপ্রদেশবাসী বিদ্যার্থীর সমাগম হইতে লাগিল; চৈতন্যভাগবত-রচয়িতা বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

> "চতুর্দ্দিক হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
> নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
> চাটীগ্রামনিবাসী'ও অনেক তথায়।
> পড়েন বৈষ্ণব সব রহেন গঙ্গায়॥"

এখনও ন্যায় শাস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য দেশ বিদেশ হইতে বিদ্যার্থীরা নবদ্বীপে আসিয়া থাকেন।

নবদ্বীপের রাজারা অধ্যাপকদিগকে উৎসাহ দিতে ক্রটী করেন নাই। ৺কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"এই সময়ে নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রব্যবসায়ী হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, রামগোপাল সার্ব্বভৌম, প্রাণনাথ ন্যায়পঞ্চানন; ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী গোপাল ন্যায়ালঙ্কার, রামানন্দ বাচস্পতি, বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন; ষড়্দর্শনবেত্তা শিবরাম বাচস্পতি, রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ, রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, শরণ তর্কালঙ্কার, মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার, কান্ত বিদ্যালঙ্কার, শঙ্কর তর্কবাগীশ; গুপ্তিপাড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, ত্রিবেণীতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, শান্তিপুরে রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিরাজমান ছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ নিয়ত রাজসন্নিধানে থাকিতেন, অপর পণ্ডিতগণ রাজার আহ্বান-মতে উপস্থিত হইতেন। রাজা তাঁহাদিগকে বহু যত্ন ও সমাদর সহকারে রাখিয়া তাঁহাদের সহিত শাস্ত্র আলাপ করিতেন।"

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সময়ে যে সকল বিখ্যাত পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন ৺কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় তাঁহাদেরও নাম করিয়াছেন—

"এই রাজার সময়ে, নবদ্বীপে শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, কালীনাথ চূড়ামণি, কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ, রামনাথ তর্কপঞ্চানন, রামলোচন ন্যায়ভূষণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক, এবং রাম নাথ তর্কসিদ্ধান্ত, রামদাস সিদ্ধান্ত, কালীকিঙ্কর বিদ্যাবাগীশ, কৃপারাম তর্কভূষণ প্রভৃতি বিখ্যাত স্মার্ত্ত ছিলেন। ত্রিবেণীনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও শান্তিপুর-বাসী সুবিখ্যাত রাধা মোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্যও তদানীং বিদ্যমান ছিলেন।"

চৈতন্যভাগবত-কার বৃন্দাবনদাসের সময়ে কালিদাস, ভবভূতি ও জয়দেব সর্ব্বপ্রধান কবি বলিয়া গণ্য হইতেন—

"ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।
তা সবার কবিত্বে আছে দোষের আভাস॥"

"চৈতন্যচরিতামৃত" হইতে জানা যায় যে মহাপ্রভু বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও জয়দেবের বড় ভক্ত ছিলেন—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দে।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দে॥"

চৈতন্যের সময় হইতে বঙ্গের গ্রামে গ্রামে হরিসঙ্কীর্ত্তন ও পথে পথে বৈষ্ণব বৈরাগীর গান প্রবর্ত্তিত হইয়া আবালবৃদ্ধবনিতার ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিয়াছিল। সুপাঠক কর্ত্তৃক ভাগবতাদি-পুরাণ-পাঠও লোকশিক্ষার—বিশেষতঃ নারীশিক্ষার—সামান্য সহায়তা করে নাই। কবিকঙ্কণের সময়ে পুরাণ পাঠ খুব প্রচলিত ছিল। ধনপতির বিদেশ হইতে গৃহে প্রত্যাগমন কামনায়—

"প্রতি দিন ভাগবত শুনেন লহনা।"

সিংহল-রাজ-দুহিতা সুশীলা শ্রীমন্তকে সিংহলে ধরিয়া রাখিবার জন্য যে সকল সুখের উল্লেখ করিয়াছিলেন মাঘ মাসে পুরাণ শ্রবণ তন্মধ্যে একটি—

"মাঘ মাসে প্রভাতে করিয়া স্নান দান।
সুপাঠক আনি দিব শুনিবে পুরাণ॥"

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র ঘোষ।

নয়নিকা

তোমারে জানিনা আমি, শুধু জানি তব
নয়নের সম্মোহন, ওই আঁখি দিয়া
মনে হয় বুঝি তব চিরমৌনী হিয়া
মোর সাথে কথা কয়। এমনি নীরব
পূর্ণিমার স্নিগ্ধদৃষ্টি, তারকার বাণী,
কুসুমের কানাকানি আঁখি ভরে শুনি
এমনি নিঃশব্দ সুরে; সন্ধ্যা উষারাণী
অনিমিখ্ স্তব্ধ নেত্রে ছায়ালোক বুনি
ইন্দ্রজাল রচে হেন এ চিরচঞ্চল
চিত্তটিরে বাঁধিবারে। তোমার নয়নে
নিখিলের মৌনবাণী করুণ কোমল
ছন্দ সুরে ভাষা পায়; মুগ্ধ দরশনে
যবে মোর মুখপানে চাও সচকিতে
চিত্ত হয় বাণীময় আঁখির দৃষ্টিতে।

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা।

প্রাচীন ভারতের সাম্রাজ্যবাদ

মানব ব্যষ্টিভাবে ব্যক্তিগতজীবনে ও সমষ্টিভাবে রাষ্ট্রীয় জীবনে অপরের উপর প্রভুত্ব করিয়া নিজের অহঙ্কার বৃত্তি চরিতার্থ করিতে চায়। যখনই কোন দেশে কোন রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হয়, তখনই তাহার শক্তিকে অপর দেশ জয় করিবার জন্য নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করে। সে রাষ্ট্র মিসর, আসেরিয়া, ব্যাবিলন, স্পেন বা রাসিয়ার ন্যায় রাজতন্ত্রশাসিতই হউক, বা রোম, ভিনিস্ বা ওলন্দাজ গণতন্ত্রের ন্যায় প্রজাশাসিতই হউক, অপরের ধনরত্ন লুন্টন কার্য্যে উভয়েই সমানরূপ পারদর্শিতা দেখাইয়াছে। কখন কখন এই লুন্টন কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য বিজয়ী রাষ্ট্র বিজাতিদিগকে একেবারে ধরাধাম হইতে অপসারিত করিয়া দিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আসেরিয়া ও স্পেনের নাম করা যাইতে পারে। আবার নিজদের মধ্যে যাঁহারা গণতন্ত্রের উদার সাম্যবাদ প্রচার করিয়া সুসভ্য বলিয়া লোকসমাজে পুজিত হইয়াছেন; তাঁহারাও অপরের উপর প্রভুত্ব করিবার আকাঙ্খা হইতে মুক্ত নহেন। পেরিক্লিসের যুগের এথেন্স তাহার প্রত্যেক নাগরিককে যাহা ইচ্ছা করিবার ক্ষমতা দিয়াছে বলিয়া গর্ব্ব করিলেও, আইওনিয়ান্ ও ইজিয়ান সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী তাঁহাদের সমজাতীয় লোকদিগকে অধীনতার শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে বিন্দু মাত্র দ্বিধা বোধ করে নাই। বহু রক্তপাতের পর গতশতাব্দীতে ফরাসীদেশে সাম্যবাদের উপর ভিত্তি করিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল—কিন্তু যখন জর্ম্মানী, গ্রেট্‌ব্রিটন ও ইতালী স্বীয় স্বীয় অধিকার বিস্তারের জন্য আফ্রিকা চীন প্রভৃতি দেশ ও মহাদেশ নিজদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইতেছিলেন, তখন কিন্তু ফরাসীরা সাম্যবাদের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া, অকুণ্ঠিত ভাবে কৃষ্ণ ও পীতকায় ব্যক্তিগণকে নিজেদের অধীন করিয়া লইতে ক্রটী করিলেন না।

সাম্রাজ্য স্থাপিত হইলে, বহুশক্তি একস্থলে কেন্দ্রীভূত হয়—হয়ত অনেক অনেক অরাজক উপদ্রবপরিপূর্ণ স্থানে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়—সাম্রাজ্যের মধ্যে অধিকাংশ স্থলে শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়। এইগুলি সাম্রাজ্যের গুণ সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির মধ্যেই একটী বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে—সাম্রাজ্য সেই বৈশিষ্ট্যকে নিষ্পেষিত করিয়া একছাঁচে ঢালিয়া নূতন করিয়া তাহাদিগকে গঠন করিতে চায়। তাহাতে বিশ্বসভ্যতার ক্ষতি ভিন্ন লাভ হয় না, ইহাই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত মত।

প্রাচীন ভারতের বিশেষ গৌরবের কথা এই যে তথায় জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুন্ন রাখিয়া সাম্রাজ্যস্থাপনের সাধু প্রচেষ্টা হইয়াছিল। প্রাচীন ভারত এই দুরূহ কার্য্যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিল, তাহা আমরা এই প্রবন্ধে দেখিতে পাইব। তবে প্রথমেই একটী কথা স্মরণ রাখা ভাল যে ভারতবর্ষ এক প্রকাণ্ড মহাদেশ—ইহার কিয়দংশ যিনি বা যাঁহারা জয় করিতে সমর্থ হইতেছেন, তাঁহারা সম্রাট নামে অভিহিত হইতে পারেন।

ঋগ্বেদ রচনার সেই সুদূর অতীতকালে ভারতীয় ঋষিগণের নিকট সাম্রাজ্যের কথা অপরিজ্ঞাত ছিল না। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে ঋষি প্রজাপতি "দ্বিমাতা হোতা বিদথেষু সম্রালম্বগ্রং চরতি ক্ষেতি বুধঃ" (৩৫৫।৭) এই বাক্যে সম্রাট শব্দদ্বারা অগ্নিকে উপলক্ষণ করিয়া রাজগণের অধীশ্বর বা উচ্চ শ্রেণীর সম্রাটকে বুঝাইয়াছেন। বৈদিক সাহিত্যে অধিরাজ, মহারাজ, একরাজ, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই শব্দগুলি যে বহু বিস্তৃত জনপদের অধীশ্বরত্বদ্যোতকই হইবে এরূপ কোন কথা নাই—তবে অনেকগুলি রাজার উপর যাঁহারা প্রভুত্ব করিতেন, তাঁহারাই যে উক্ত উপাধির অধিকারী হইতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত আছে যে রাজা রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন, আর সম্রাট বাজপেয় যজ্ঞ করিবেন—রাজা অপেক্ষা সম্রাট উচ্চপদস্থ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ভারতের প্রাচীন সম্রাটগণের একটী তালিকা দিয়া বলা হইয়াছে যে তাঁহারা আদিত্যের ন্যায় সমৃদ্ধিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তাপ প্রদান করেন ও সকলদিক হইতে কর গ্রহণ করেন:—তে সর্ব্ব এব মহজ্জগ্মুরেতং ভক্ষং ভক্ষয়িত্বা সর্ব্বে হৈব মহারাজা আসু' রাদিত্য ইহ স্ম শ্রিয়াং প্রতিষ্ঠিত স্তপতি সর্ব্বাভ্যো দিগ্‌ভ্যো বলিমাবহ" (সপ্তম পঞ্জিকা ৩৪)। সায়ণাচার্য্য মহারাজশব্দের ব্যাখ্যায় সার্ব্বভৌম অর্থ দিয়া বলিতেছেন "যথা আদিত্যো দ্যুলোকে প্রতিষ্ঠিত স্তপতি, এবমেতে 'শ্রিয়াং' গজাশ্বদিকায়াং সম্পদি প্রতিষ্ঠিতা: সন্তঃ 'তপন্তি' শত্রূণাং তপংকুর্ব্বন্তি তথা সর্ব্বাভ্যো দিগ্‌ভঃ সর্ব্বদিকবস্থিতেভ্যো রাজভ্যঃ শকাশাদ্ বলিমাবহন্তো করমাদদানাঃ স্বামিনো ভবন্তি।" কৌশতকী (৫।৫) ও শতপথ ব্রাহ্মণ (১৩।৪।২১) এবং মহাভারত পুরাণাদিতেও প্রাচীনভারতের সম্রাটগণের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। "চক্রবর্ত্তী" শব্দদ্বারা মণ্ডলাধিস্থিত বহু রাজসেবিত সম্রাট্ বিশেষকে বুঝাইয়া থাকে। এই শব্দটী মৈত্রয়ণী উপনিষদে প্রথম দেখা যায়—অথ কিমেতৈর্বা পরেন্যে মহাধনুর্ধরাশ্চক্রবর্ত্তিনঃ কেচিৎ। সুদ্যুম্ন, ভুরি দ্যুম্নেন্দ্রদ্যুম্ন কুবলয়াশ্ব্যা যৌবনাশ্ব বধ্রশশ্বা, শ্ব পতিঃ, শশবিন্দু, হরিশ্চন্দ্রো ম্বরীষং ননক্তু, সর্যাতি, যযাত্য নরন্তো, ক্ষ সেনাদয়ঃ।" উল্লিখিত পঞ্চদশজন সম্রাট চক্রবর্ত্তীর আসন লাভ করিয়াছিলেন।

এতদ্বারা প্রমাণিত হইল যে প্রাচীনভারতে, অতি সুদূর অতীত কালেও সাম্রাজ্য ছিল। এখন এই সাম্রাজ্যের গঠন প্রণালীই বা কিরূপ ছিল, কি মতবাদের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাউক।

সাম্রাজ্য লাভ করিতে হইলে বিজীগিষু রাজাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইত। এই যজ্ঞের একটা অঙ্গ ছিল এই যে একটী অশ্বকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত এবং যে কেহ পারেন, ইহা ধরুণ ইহা ঘোষণা করা হইত। যাঁহাদের রাজ্য দিয়া অশ্ব চলিয়া যাওয়া সত্বেও, ধরিতেন না, তাঁহারা, ও যাঁহারা ধরিয়া পরাজিত হইতেন, তাঁহারাও রাজার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন। যজ্ঞ সুসম্পাদনার্থ এইরূপ একশতজন বশীভূত রাজার প্রয়োজন হইত—তাঁহারা সকলেই যজ্ঞসভায় উপস্থিত হইতেন। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির প্রথম যুগে সম্রাটগণ বিজিত রাজাদিগকে উচ্ছেদ করিয়া, তাঁহাদের রাজ্য অপহরণ করিয়া লইতেন না—কেবলমাত্র তাঁহাদের বশস্বীকারউক্তিতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। খৃষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টমশতাব্দীর ইংলণ্ডের

Bretwaldaউপাধিধারী রাজগণের ন্যায় তাঁহারা নিকটবর্ত্তী রাজ্যসমূহের উপর সামান্যমাত্র অধিকার রাখিতেন। এথেন্সের সাম্রাজ্য অপেক্ষাও ইহার সংগঠন (organisaton) শিথিল ছিল, কেননা এথেন্সে অধীন রাষ্ট্র হইতে রীতিমত কর আসিত ও কঠিন কঠিন বিচার রাজধানীতে সম্পন্ন হইত। মহামতি কাশীপ্রসাদ জয়সওয়ল বলেন যে রাজগণ সম্রাটের অধীনে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন "sometimes the sovereigns under the Emperor formed a constitution as the one described in the Mababharata under Jarasandba when several officers on the model of the vedic High Functionaries were appointed from amongst the sorereigns under the Emperor" মহাভারতে সভাপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের নিকট জরাসন্ধের সম্রাট হইবার যোগ্যতা সম্বন্ধে বলিতেছেন—

সোঽবণীং মধ্যমাং ভূক্তা মিথো ভেদমমন্ত্রত।
প্রভুর্যস্তু পরো রাজা যস্মিন্নেক বশে জগৎ॥
স সাম্রাজ্যং মহারাজ প্রাপ্তো ভবতি যোগতঃ।
তৎ স রাজা জরাসন্ধং সংশ্রিত্য কিল সর্ব্বশঃ॥
রাজন্ সেনাপতি র্জাতঃ শিশুপালঃ প্রতাপবান্।
তমেব চ মহারাজ শিষ্যবৎ সমুপস্থিতঃ॥
বক্রঃ করূষাধিপতি র্মায়াযোধী মহাবলঃ।
অপরৌ চ মহাবীর্য্যৌ মহাত্মানৌ সমাশ্রিতৌ॥
জরাসন্ধং মহাবীর্য্যং তৌ হংসডিম্ভকাবুভৌ।
বক্র দন্তঃ করূষশ্চ করভো মেঘবাহনঃ।
মূর্দ্ধ্না দিব্যমণিং বিভ্রদ্ যমদ্ভুত মণিং বিদুঃ॥ (সভা ১৪।৯)

ইহাতে দেখা যায় যে শিশুপাল, বক্র, করূষ, হংস, ডিম্বক, দন্তবক্র, করভ, মেঘবাহন প্রভৃতি নৃপতি তাঁহাদের রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াও জরাসন্ধের সহিত মিলিত হইয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধনের সভার রাজকবি বাণভট্টও তাঁহার হর্ষচরিতে আমাদের যুক্তি সমর্থন করিতেছেন। তিনি বলেন যে প্রাচীনকালের নৃপতিগণ সাধারণতঃ রাজ্যাদিজয় করিয়া নিজরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতেন না—"নাতি জিগীষবঃ খলু পূর্ব্বে যেনাল্প এব ভূভাগে ভূয়াং শো ভগদত্ত দন্তবক্র ক্রাথকর্ণ কৌরব শিশুপাল সাল্ব জরাসন্ধ সিন্ধুরাজ প্রভৃতয়ো হ ভবন্ ভুপতয়ঃ। সন্তুষ্টো রাজা যুধিষ্টিরো যোঽ সহত সমীপএব ধনঞ্জয় জনিত জগৎকম্পঃ কিম্পুরুষাণাম্ রাজ্যম্"।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার।

যুগ সমস্যা

আমরা যে যুগে বাস করছি, সেই যুগ বস্তুটা যে কি, তার লক্ষণ কি, তার প্রকৃতি কি, কিসের দ্বারা এই বর্ত্তমান যুগ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগ হতে বিশিষ্ট হয়েছে, এই যুগের গতি কোন্ দিকে, অনেক সময় আমরা তা ভাল করে একটুকু তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করিনা। যা চলে আসছে, যা চলে যাচ্ছে, আমরা অনেক সময় মনে করি, তাই বুঝি চিরদিন চলে আসছে. তাই বুঝি চিরদিন চলে যাবে। কিন্তু একটু ধীর হয়ে আমাদের চারিদিকে যে চিন্তাস্রোত, যে ভাবনা স্রোত, যে ঘটনা স্রোত চলছে, এগুলি যদি একটু পরীক্ষা করে দেখি, তা হলে এই যুগের কতক গুলি বিশিষ্ট লক্ষণ আমাদের চোখে পড়ে।

এ যুগের প্রথম লক্ষণ এই যে—এ যুগ অত্যন্ত প্রত্যক্ষবাদী, ইংরেজীতে যাকে বলে Positivist। এই প্রত্যক্ষবাদ বলতে গেলে এ যুগের প্রবর্ত্তন করেছে। আপনারা জানেন ইউরোপে একটা প্রত্যক্ষবাদ দর্শন ও সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আমাদের প্রথম যৌবনে এই প্রত্যক্ষবাদ সম্প্রদায়ের কথা আমরা অনেক শুনেছি। তাঁদের প্রচার হ'ত; এই যে কোনপ্রতিষ্ঠিত প্রত্যক্ষবাদ সেটা এই যুগের বিশিষ্ট লক্ষণ। এই যুগে যা চোখে দেখি না তা বিশ্বাস করতে পারিনা, বিশ্বাস করতে চাইনা। ঈশ্বর আছেন, প্রমাণ কি? মানুষের আত্মা আছে, মরণের পর যে আত্মা থাকে প্রমাণ কি? ধর্ম্ম বলে যে একটা বস্তু আছে, ধর্ম্মের একটা সাধনা আছে, নিয়ম আছে, তা পালন করে চলতে হয়, না করলে প্রত্যবায়-ভাগী হ'তে হয়, প্রমাণ কি? মানুষ সকল বিষয়ে প্রমাণের অন্বেষণ করে। আর প্রমাণ বলতে অধিকাংশ লোক ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলে গ্রহণ করে। ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে এই ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষকে আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠতম মনীষীরা একমাত্র প্রমাণ বলে গ্রহণ করেছেন। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ এবং এই ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত অনুমান ও উপমান এই তিনটীকে তাঁরা একমাত্র প্রমাণ বলে মেনেছেন। যা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ করা যায়না অথবা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা যা প্রত্যক্ষ করি সেই প্রত্যক্ষের উপর অনুমান দ্বারা যা প্রতিষ্ঠিত হয় না অথবা উপমান দ্বারা যা প্রতিষ্ঠিত হয় না তাকে তাঁরা সত্য বলে, প্রমাণ বলে, সে বস্তু আছে বলে স্বীকার করতেন না; এখন পর্য্যন্ত এই প্রত্যক্ষ-বাদ এ যুগের প্রধান ধর্ম্ম হয়ে রয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান এই প্রত্যক্ষবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পরীক্ষা করে লোক সব দেখতে চায়। প্রাচীন শাস্ত্রের প্রামাণ্য পরীক্ষা না করে লোক আর মানতে চায় না। লোকে আচার্য্যদের উপদেশ বা আদর্শ পরীক্ষা না করে মানতে চায় না। এখনকার একটা প্রধান লক্ষণ এই প্রত্যক্ষবাদ।

আর একটা লক্ষণ—স্বাধীনতা। গত দেড়শ দুশ বৎসর কাল মানুষ একটা অদ্ভুত স্বাধীনতার প্রেরণায় উন্মত্তের মত ছুটেছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ যত প্রকার বাইরের অধিকার—ধর্ম্মের গুরুর হোক, আচার্য্যের হোক,—সমাজে হোক

নীতিতে হোক, যত কিছু বাইরের অধিকার, সে অধিকারকে অগ্রাহ্য করে চলেছে। তাকে সত্য বলে মান্‌ব, যা আমার জ্ঞানে অনুভবে সত্য বলে ধরা পড়বে। তাকে ভাল বলে গ্রহণ করব, যা আমার ধর্ম্মবুদ্ধির নিকট ভাল বলে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। গুরুর কথায় কিছু সত্য বলে মান্‌বনা, ভাল বলে গ্রহণ করবনা। আমার ভিতরে যে বুদ্ধি আছে, বুদ্ধিবৃত্তি আছে, আমার ভিতরে যে সত্যের কষ্টিপাথর আছে, সে কষ্টিপাথরে কষে প্রাচীন শাস্ত্রকে পরীক্ষা করে দেখব, সে কষ্টিপাথরে কষে গুরুর উপদেশ, পুরাতন কিম্বদন্তীসমূহ পরীক্ষা করে দেখব, সে কষ্টিপাথরে কষে কোনটা সত্য, কোনটা সত্য নয়, এটা আমি সিদ্ধান্ত করে নেব, গুরুর কথা এখানে মানবনা। এই যে নিজের বুদ্ধির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, এটা এই যুগের একটা অতি প্রধান লক্ষণ।

কেবল বুদ্ধি সম্বন্ধে নয়, কর্ম্ম সম্বন্ধে, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাই ; কোনটা আমার কর্ত্তব্য, কোনটা আমার কর্ত্তব্য নয়, সেটা—আমার প্রাণের মধ্যে, আমার প্রকৃতির ভিতরে যে ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেক আছে ইংরাজীতে যাকে conscience বলে, যে আমাকে বলে দেয়, কোনটা ভাল কোনটা মন্দ সেই যে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেক—তার দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিচার করে চলব ; আমার ধর্ম্মবুদ্ধি যাকে ধর্ম্ম বলে না, তা শতশাস্ত্রবাক্যদ্বারা সমর্থিত হলেও অথবা প্রাচীন গুরুজনের আদেশের দ্বারা সমর্থিত হলেও, আমি গ্রহণ করবনা। এই যে চিন্তার স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, individualism, এটা এ যুগের একটা প্রধান লক্ষণ।

এ যুগের তৃতীয় লক্ষণ যা ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠছে সেটা এই—এ যুগে মানুষকে সকলের চাইতে বড় করে দেখে। মানুষ আগে আর কখনও মানুষের চক্ষে এত বড় ব'লে প্রতিভাত হয় নি। এ যুগের চিন্তা ও সাধনা মানুষকে এত বাড়িয়ে তুলিতে চেষ্টা করেছে যে, সাধারণতঃ আমরা যাকে মানুষ বলি তাকে নিয়ে আমাদের কুলোয় না; আমরা চাই এই মানুষের উপরে অতিমানুষ, manএর উপর superman। একজন নয়, আমরা চাই বহু অতিমানুষ ; মানুষ কত বড় হ'তে পারে তার সন্ধান এ যুগ পেয়েছে, সকলের ভিতরে মহামিলন জেগে উঠেছে। প্রত্যক্ষবাদের অনুশীলন করতে গিয়ে মানুষ দেখতে পেয়েছে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের আড়ালে আরেকটা কিছু আছে যার সঙ্কেত ইন্দ্রিয় বহন করে আনে, যাকে ইন্দ্রিয় প্রকাশ করতে পারে না ; ইন্দ্রিয়ের ভিতর অতীন্দ্রিয়ের সাড়া পেয়েছে। এই যে চক্ষু, এর ভিতর এমন একটা জিনিষের সাড়া আছে যাকে চক্ষু দেখতে পায়না ; প্রিয়তমের মুখের উপর চোখ দুটো ফেলে যখন অতৃপ্তনয়নে তার মুখে কি মধু আছে, কি রস আছে নির্ণিমেষ চোখে তা পান করি তখন চোখ বলে আমার দেখা হলনা, এই যা দেখছি তার ভিতর আরো দ্রষ্টব্য আছে। কান যখন সঙ্গীত শোনে, সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে—যতই সঙ্গীত পঞ্চম হইতে সপ্তমে উঠে, সঙ্গীত যিনি করেন তাঁর কণ্ঠকে অবলম্বন করে রাগিণী আকাশে উঠে যায় তান লয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুরের সঙ্গে সঙ্গে, তার পরতে পরতে আমার প্রাণের ভিতরের রাগিণী আকাশে ভেসে যায় এটা যখন লক্ষ্যকরে দেখি, তখন বুঝি আমার সব শোনা হলনা, সবটা কান দিয়ে ধরতে পারলাম না, এই শব্দের ভিতরে একটা অশব্দ জাগ্রত হয়ে আমার কানকে যে অশব্দের দিকে টেনে নিয়ে যায়! সকল ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ব্যাপার যখন চিন্তা করে দেখি, ভিতরে ঢুকে দেখি, তখন

দেখতে পাই প্রত্যক্ষের অন্তরালে বিশাল অতীন্দ্রিয় জগত, অমৃতময় অনন্ত অতীন্দ্রিয় জগত, রসময় আনন্দময় অতীন্দ্রিয় জগত, আলোকময় জ্ঞানময় অতীন্দ্রিয় জগৎ রয়েছে। ইন্দ্রিয় আর অতীন্দ্রিয়ের এই যে ব্যবধান, এর সেতু কোথায়? কোথায় পাই সেই সেতু যাতে ইন্দ্রিয় আর অতীন্দ্রিয়ের ব্যবধান বিনষ্ট করে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অতীন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠা করতে পারি, অতীন্দ্রিয়ের ভিতর ইন্দ্রিয়কে নিয়ে তাকে তার চরম পরিতৃপ্তি দান করতে পারি। এই যে ব্যবধান এর ভিতর একটা মিলন পিপাসা জেগে উঠেছে। প্রত্যক্ষবাদের ভিতর যা দেখা যায় না তাকে দেখবার জন্য একটা পিপাসা জেগেছে। ইন্দ্রিয় আর অতীন্দ্রিয়ের মধ্যে মিলন করবার একটা আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। এই প্রত্যক্ষবাদের ভিতর দিয়ে যখন আমরা জীবতত্ত্ব অনুশীলন করি, biological laboratoryতে যখন জীবকোষাণ্ পরীক্ষা করি, তখন সেখানে জীবন আর যা জীবন নয়, জড় আর চেতন এর মধ্যে যে বিশাল ব্যবধান আছে সেই ব্যবধান নষ্ট করবার প্রবল চেষ্টা জেগে উঠে। আমাদের বন্ধু জগদীশচন্দ্র এই চেষ্টা করছেন। যাদের জীবিত বলি, আর যাদের জীবিত নয় বলি, চেতন অচেতন, জড় আর জীবনের মধ্যে বহু যুগ যুগান্তর ধরে যে বিশাল ব্যবধান ছিল তিনি সেটা নষ্ট করবার চেষ্টা করছেন। চোখে দেখে যাকে জীবিত বলি তার যে সমুদয় লক্ষণ আছে, যাকে অচেতন বলি তার ভিতরেও সে সমুদয় লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। আপনারা জানেন তিনি এমন সব যন্ত্র আবিস্কার করেছেন যাতে যা চোখে দেখা যায়না—যেমন জীবন ক্রিয়া—সেটাও যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে আরম্ভ করেছেন। এই যে মিলনের চেষ্টা, ইন্দ্রিয় আর অতীন্দ্রিয়ের মধ্যে সেতু নির্ম্মাণের চেষ্টা, এটাও এ যুগের একটা প্রধান লক্ষণ।

যেমন ইন্দ্রিয় আর অতীন্দ্রিয়ের মধ্যে সেতু নির্ম্মাণের চেষ্টা হচ্ছে, মিলনের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে, তেমনি স্বাধীনতার সঙ্গে বশ্যতার সমন্বয়ের চেষ্টা হয়েছে। এই যে মানুষ স্বাধীন হতে চাচ্ছে, সকলকে বাদ দিয়ে নিজে যা সত্য বলে মনে করি তাই সত্য, আমার যে কষ্টি-পাথর তাই সত্য, যারা শ্রেষ্ঠ তাদেরও এই ভাবে অগ্রাহ্য করছি, এই যে ব্যবধান, প্রাচীন শাস্ত্রের সঙ্গে আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই যে ব্যবধান, যা স্বাধীনতার প্রেরণায় জেগে উঠেছে, এই ব্যবধান নষ্ট করবার জন্য মানুষ চেষ্টা করছে, মানুষের মন এই ব্যবধান আর সহ্য করতে পারছে না। সত্য অন্বেষণ করতে গিয়ে সে বলছে আমিই কি কেবল সত্য দেখছি? দুনিয়ায় আর কেউ কি সত্য দেখছে না, যদি তারা দেখে থাকে তবে তাদের সঙ্গে মিলন করতে হবে, আধুনিক কালেই কি কেবল সত্য প্রকাশিত হচ্ছে? প্রাচীনকালে কি হয় নি? যদি হয়ে থাকে তবে প্রাচীনকালের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আধুনিক অভিজ্ঞতার সমন্বয় করতে হবে, উভয়ের দ্বারা উভয়কে পরীক্ষা করতে হবে। কেবল আমার ব্যক্তিগত যে জ্ঞান তাই সত্যের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ নয়। আর দশ জনের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতার মিলন করে কোন্ জায়গায় আমার ভুল, সেটা বুঝে সে ভুল শোধরাতে হবে। এই যে মিলনের চেষ্টা, স্বাধীনতার সঙ্গে সমষ্টিগত বশ্যতার মিলনের চেষ্টা, এটা এ যুগের একটা প্রধান লক্ষণ।

তারপর, যেমন মানবতা আর অতিমানবতা, তেমনি মানুষ আর ঈশ্বরের মধ্যেও যে একটা ব্যবধান বহুদিন ছিল, সে ব্যবধানকে নষ্ট করে মহামিলন করতে হবে, এটাও এ যুগের সমস্যা।

এ ত দেখলাম ভাবের দিক দিয়ে। কিন্তু কর্ম্মের দিক দিয়ে, সমাজের দিক দিয়ে, ইতিহাসের দিক দিয়ে দেখতে গেলে এ যুগের আর একটা লক্ষণ আছে, তাকে জাতীয়তা বলতে পারা যায়, ইংরাজিতে যাকে nationalism বলে। আপনারা জানেন Lord Morley পরলোক গমনের কিছু কাল পূর্ব্বে একটা কথা বলেছেন। তাঁর শেষ গ্রন্থখানিতে বলেছেন গত শতাব্দীতে ইউরোপের last word nationalism। এই যে জাতীয়তা —ইউরোপের ইতিহাসে কেন, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে—আজ পর্য্যন্ত শেষ কথা, অর্থাৎ প্রত্যেক জাতি বা nation—জাতি কথাটাতে ঠিক nation বুঝায় না, আমরা জোর করে অনুবাদ করছি, জাতি বলতে গোজাতি, মনুষ্যজাতি ইত্যাদি বুঝায়, কিন্তু nation বলে যে বস্তু, সমাজ বল্লে তা কতকটা বুঝায়।—এই যে জাতীয়তা এটা আধুনিক ইতিহাসের প্রধান কথা। এর ফলে প্রত্যেক জাতি স্বপ্রতিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছে, প্রত্যেক জাতি আপনার অভ্যুদয় বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করছে, প্রত্যেক জাতি স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করছে। যারা পরাধীন ছিল গত একশত বৎসরের মধ্যে তাদের অনেকে স্বাধীন হয়েছে, যারা পররাষ্ট্রের অধীন না হয়ে স্বদেশের কোন রাজা বা সম্প্রদায়বিশেষের অধীন ছিল তারা সে অধীনতা নষ্ট করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে, এই যে nationalism বা জাতীয়তা এটা এ যুগের বিশেষ লক্ষণ। প্রত্যেক জাতি স্বপ্রতিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছে; তাতে পরস্পরের সঙ্গে বিরোধ করছে, কে কাকে খাট করে নিজে বড় হবে, কে কার অভ্যুদয় নষ্ট করে নিজের অভ্যুদয় বাড়িয়ে তুলবে, সর্ব্বদা তার চেষ্টা চলছে এই যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এর ফলে সংসারময়, বর্ত্তমান সভ্যজগতময় একটা সমর কোলাহল জেগে উঠেছে, কিছুদিন পূর্ব্বে এই আগুণ দপ করে জ্বলে উঠেছিল, এখন একটু নিভেছে বটে কিন্তু জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষের মূল এখনও রয়েছে এই যে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ করবার প্রবৃত্তি এই প্রবৃত্তি এখনো রয়েছে। সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতি যে একত্র মিলিত হবে তার সম্ভাবনা এখনো জাগে নি কিন্তু সম্ভাবনা না জাগলেও মানুষের মন এই মিলনের জন্য পিপাসিত হয়েছে। সকল দেশে লড়াই যারা করছে, তারা শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে এখন শান্তি অন্বেষণ করছে। জার্ম্মাণ, ইংরেজ, ফরাসী, ইটালীয় সকলেই ভিতরে ভিতরে শান্তির অন্বেষণ করছে; কিন্তু আপনার কর্ম্মের জালে আবদ্ধ হয়ে, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, সে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারছেনা অথচ জাতীয় স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে জাতিতে জাতিতে যে বিরোধ জেগেছে তাকে নষ্ট করে মিলনের আকাঙ্ক্ষা দুনিয়াময় জেগেছে। সুতরাং একটু তলিয়ে দেখলে দেখতে পাই এই যুগের সমস্যা মহামিলন সমস্যা। মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ দূর করে মহামিলন কি করে হবে, এটা এ যুগের প্রধান প্রশ্ন। এই যে ইন্দ্রিয় আর অতীন্দ্রিয়ে বিরোধ, এই বিরোধ নষ্ট করে দুইএর মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা কি করে হবে এটা এযুগের প্রধান সমস্যা। স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সমাজ শাসনের যে বিরোধ চলছে এ বিরোধ নষ্ট ক'রে ক'রে এর ভিতর সমন্বয় কি ক'রে হবে বর্ত্তমান যুগের এটা একটা প্রধান সমস্যা।

এইরূপে আমরা দেখতে পাই বর্ত্তমান যুগসমস্যা মহামিলন সমস্যা। দেবতাতে আর মানুষে মিলনের জন্য আমরা আকাঙ্ক্ষিত, মানুষে মানুষে মিলনের জন্য আমরা আকাঙ্ক্ষিত

ধর্ম্মে ধর্ম্মে মিলনের জন্য, সত্যে সত্যে সমন্বয়ের জন্য, আমরা আকাঙ্ক্ষিত। কি করে এই সমন্বয় হবে, কি করে এই মহামিলন সাধনা দ্বারা আমরা শুদ্ধি লাভ করব, এই-ই বর্ত্তমান যুগের মুখ্য সমস্যা। এই সমস্যা নানা আকারে, নানা ভাবে, নানা ক্ষেত্রে—আপনাকে ফুটিয়ে তুলছে। বিজ্ঞানে এই সমস্যা, দর্শনে এই সমস্যা, ধর্ম্মে এই সমস্যা, সমাজে এই সমস্যা, রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে এই সমস্যা, কি করে এর মীমাংসা হবে এটা দুনিয়াময় সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রথম প্রশ্ন।

ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব উপলক্ষে এ কথা তোলা প্রয়োজনীয়, সমীচীন ও সঙ্গত। সঙ্গত বলছি এই জন্য. ব্রাহ্ম সমাজ প্রথম যখন উঠে, এই সংকল্প নিয়ে উঠেছিল যে, এই বিরোধের ভিতর মিলন প্রতিষ্ঠা করবে। রাজা রামমোহন রায় যখন ব্রাহ্ম সমাজ প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন তখন তিনি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের ভিতর একটা মিলন প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্ম সভা গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। মহর্ষিও একটা গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস এই মহামিলনসমস্যার ইতিহাসের নামান্তর মাত্র, কেশবচন্দ্রও সর্ব্বধর্ম্মের মিলনের চেষ্টা করেছেন। আর আজ ব্রাহ্ম যুবকেরা মাঘোৎসবের বার্ষিক উৎসব করছেন। তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করছি, হে স্বাধীনতার সাধকবৃন্দ, আপনারা কি এই মিলন ভূমিতে দাঁড়িয়ে এই মহামিলনের আদর্শ চোখে দেখেছেন, যেখানে ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ নাই, জাতিতে জাতিতে বিরোধ নাই, ইন্দ্রিয়ে অতীন্দ্রিয়ে বিরোধ নাই, মানুষে দেবতায় বিরোধ নাই, ব্যক্তি আর সমাজে বিরোধ নাই, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিরোধ নাই, এই মহামিলনের ক্ষেত্রের ছবি আপনাদের চিত্ত পটে প্রতিফলিত হয়েছে কি? যদি প্রতিফলিত হয়ে থাকে, ব্রাহ্ম সমাজকে সফল করতে পারবেন। ব্রাহ্ম সমাজ যে সংকল্প নিয়ে জন্মেছিল সে সংকল্প সিদ্ধির দিকে তাকে এগিয়ে দিতে পারবেন।

সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধ এক সময়ে খুব জেগে উঠেছিল, খুব প্রখর হয়েছিল। আমরা তখন বালক ছিলাম যখন সমাজ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে শাসন করত। সমাজের সে শক্তি নষ্ট হয়েছে, হিন্দু সমাজেরও গেছে, অন্য সমাজেরও গেছে। সুতরাং সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছে কেহ এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও সমাজিক শাসন গোঁজামিল দিয়ে চলেছেন, সত্য সমন্বয় এখনো কেহ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নাই এই সমন্বয় প্রতিষ্ঠা না হলে সমাজে শৃঙ্খলা থাকবেনা। ব্যক্তিকে বাহিরের থেকে সমাজের শাসন মেনে চলতে হবে এমন কথা আমি বৃদ্ধ বয়সে বলিনা, ব্যক্তিকে সমাজের বাহিরের শাসন দণ্ড মাথাপেতে নিতে হবে একথা বলিনা, কিন্তু ব্যক্তিকে সমাজের সঙ্গে একত্র হতে হবে একথা আমি শত মুখে বলি। সমাজ আমার থেকে পৃথক নয় যেমন মায়ের গর্ভে ভ্রূণ ছিলাম, তেমনি সমাজ গর্ভে বাস করছি একথা কি সত্যি নয়? মায়ের শোণিত থেকে শিশু গর্ভস্থ প্রাণে আপনার জীবনীশক্তি সংগ্রহ করে, মায়ের শোণিত তার ভিতরে প্রবাহিত হয়ে জীবনকে রক্ষা করে থাকে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ফুটিয়ে তোলে, তেমনি আমাদের প্রত্যেকের জীবন কি সমাজের মধ্যে নয়? এই যে সমাজরূপ মাতা তার শোণিত দ্বারা, তার রক্ত দ্বারা, তার প্রাণ দ্বারা আমাদের জীবনীশক্তি রক্ষা করছে ও ফুটিয়ে তুলছে একথা কি

সত্য নয় ? এই যে বাংলা ভাষায় কথা বলছি, কে আমায় ভাষা দিল ? এই ভাষা আমার সমাজের ভাষা। যে সমুদয় উপমা ব্যবহার করছি, কোথায় পেলাম উপমা। এ ত আমার কল্পনা নয়, সৃষ্টি নয় ; আমার সমাজের লোকেরা, সমাজের জ্ঞানীরা ঋষিরা যে সাধনা করে গেছেন, তাঁদের সাধনলব্ধ শক্তি এই ভাষার ভিতরে সঞ্চারিত হয়ে আমার চিন্তাকে প্রসারিত করছে, রসনাকে বাগ্মী করে তুলছে, এ বন্ধন ছিন্ন হলে জ্ঞান পঙ্গু হবে, ভাব শুষ্ক হয়ে যাবে। যদি সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হয়, তবে আমার জ্ঞান বিজ্ঞান সব নিষ্ফল হয়ে যাবে, সমাজের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ, সে এত খেলো নয়, সমাজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ত বাহিরের নয় ; সমাজ অঙ্গীস্বরূপ আমি সমাজের অঙ্গস্বরূপ, এই যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ইংরেজীতে যাকে Organic relation বলে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের এই যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, এটা যখন অনুভব করি তখন বুঝি, সমাজজীবন আমার জীবনের বৃহত্তর জীবন। তখন দেখি, সমাজের শক্তি আমার শক্তির বৃহত্তর শক্তি, আমার শক্তির আধার এবং অবলম্বন, সমাজজীবন আমার ব্যক্তিগত জীবনের আশ্রয় এবং অবলম্বন, এর সঙ্গে সম্বন্ধ ত যাবার নয় সুতরাং এই সমাজকে অগ্রাহ্য করতে পারিনা, কিন্তু আবার বলি সমাজকে সব সময় গ্রাহ্যও করতে পারিনা। সমাজ যদি আমার ধর্ম্মবুদ্ধিতে আঘাত দেয়, জ্ঞানের উপর আঘাত দেয়, উপর হতে শাসন করতে আসে, তবে সমাজ শাসন মেনে চলা আমার পক্ষে সম্ভব হবেনা, সুতরাং এর একটা সমাধান বা সমন্বয় করতে হবে ; সমাজকে সমন্বয়ের দিকে যেতে হবে, আমাকেও সমন্বয়ের দিকে যেতে হবে, কি করে যাব ?

আমার যে স্বাধীনতা, অনেক সময় যদি পরীক্ষা করে দেখি তবে দেখি, সে স্বাধীনতা আর কিছু না—আমার ভোগবিলাস, আমার ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির প্রেরণাকে স্বাধীনতা নাম দিয়ে অনেক সময় বাড়িয়ে তুলি, এই যে আমি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, এর পিছনে কতটা আমার ইন্দ্রিয়ের প্রেরণা আর কতটা আমার সমষ্টিগত ব্যক্তিত্ব বা মনুষ্যত্বের প্রেরণা, পরখ করে দেখতে হবে। সুতরাং বিকৃত স্বাধীনতাকে সব বিষয়ে সম্পূর্ণ সংযত করে কোনটা ধর্ম্ম কোনটা অধর্ম্ম বিচার করে চলতে হবে ; কেননা অনেক সময় আমরা স্বাধীনতা ও ইন্দ্রিয় প্রেরণাতে প্রভেদ বুঝতে পারিনা, এইজন্য ইন্দ্রিয় প্রেরণাকে আত্মার প্রেরণা, বিবেকের প্রেরণা বলে গ্রহণ করি। এ পথে স্বাধীনতা লাভ হবে না। এ ভাবে সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন হবেনা। সুতরাং হে যুবক তোমার কর্ত্তব্য এই যে, তুমি আপনাকে সংযত করে ব্রহ্মজ্ঞান ও সত্যধর্ম্ম সাধন করে ইন্দ্রিয়গ্রামকে আপনার বশে আনবে। যখন ইন্দ্রিয়গ্রাম তোমার বশে আসবে তখন তুমি আপনি শুদ্ধ হবে, তখন তোমার স্বাধীনতার নিকট সমাজকে মাথা নত করতে হবে। তুমি যদি বিশুদ্ধ হও, নির্ম্মল হও, তুমি যদি আপনার ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংযত কর, তোমার ভিতর সমাজ যদি দেখে তুমি যে সমাজবিধি ভাঙ্গছ সেই ভাঙ্গার পিছনে তোমার অসংযত ইন্দ্রিয়লালসা নাই কিন্তু জলন্ত ধর্ম্মবুদ্ধি রয়েছে, হয়ত সমাজ তোমার কর্ম্মের প্রতিবাদ করিতে পারে, বাইরে তোমাকে অপাংক্তেয় করতে পারে কিন্তু ভিতরে, তোমার ধর্ম্মকে, তোমার চরিত্রকে, তোমার বিশুদ্ধতাকে সাষ্টাঙ্গে

প্রণিপাত করবে—একথা কল্পনার কথা নয়। ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীনেরা যখন সমাজবিধি ভেঙ্গে দিয়েছিলেন তাঁরা ইন্দ্রিয় প্রেরণায় ভাঙ্গেন নাই, তাঁরা অসংযত ইন্দ্রিয় প্রেরণার লোভে সমাজ বিধি ভাঙ্গেন নাই, তাঁরা যখন সমাজ বিধি ভেঙ্গে আত্মীয় স্বজন ছেড়ে এসেছেন তখন ইন্দ্রিয় প্রেরণায় আসেন নি। তাঁরা এসেছেন—সমাজ তাঁদের বর্জ্জন করেছে, তাঁরা এমন কর্ম্ম করেছেন সমাজ বর্জ্জন করতে বাধ্য হয়েছে, সেটা লাভের জন্য করেন নি, কিন্তু বিশুদ্ধ চরিত্র থেকে নিজের ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণায় তা করেছেন। সুতরাং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিন্তু স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করবার অধিকার লাভ করতে হলে সে অধিকার সংযম ব্যতীত হয় না। যেখানে সংযম নাই সেখানে স্ব নাই, যেখানে স্ব নাই সেখানে স্বাধীনতা নাই ইন্দ্রিয়াধীনতা আছে; লোভের অধীনতা আছে স্বাধীনতা নাই কেননা সংযমের উপরই মানুষের স্ব বস্তু, আত্মবস্তু প্রকাশিত হয়। আত্মবস্তু প্রকাশিত যখন হয়, তার অধীনতাকে সত্য স্বাধীনতা বলে, এরূপ ভাবে যুবকেরা যদি স্বাধীনতার সাধনা করেন তাহলে সমাজের সঙ্গে একত্ব সাধন তাঁদের পক্ষে সহজ হবে।

সমাজকে কি করতে হবে? যুবককে যা করতে হবে সমাজকেও তাই করতে হবে। ভগবানকে সাধক যেমন শ্রদ্ধা করেন তেমনি প্রত্যেক বালক, প্রত্যেক বালিকা প্রত্যেক শিশুর প্রত্যেক নরনারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সমাজ ভক্তি শ্রদ্ধা করবে। সমাজ কারো স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করবেনা। হে সমাজ যদি তোমরা অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে চাও—তবে ব্যক্তি যেমন তোমার সঙ্গে একত্ব সাধন করতে চেষ্টা করবে তেমনি হে সমাজ তোমাকে ব্যক্তির সঙ্গে একত্ব সাধন করতে চেষ্টা করতে হবে। যে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেছে তার সঙ্গেও একত্ব সাধন করতে হবে। যিশুখৃষ্ট যেমন জগতের পাপভার আপনার মস্তকে গ্রহণ করে জগৎকে পাপহীন করবার জন্য এসেছিলেন তেমনি হে সমাজ প্রত্যেক দুর্ব্বৃত্ত তোমার সমষ্টিগত শক্তির অন্তর্গত, সে তোমার প্রাণের ভিতর জেগে আছে, তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করতে হবে, দ্বন্দ্ব করলে চলবেনা কেননা ব্যক্তি যেমন সমাজের পাপের অংশ ভাগী, সুতরাং ব্যক্তি যেমন আপনাকে সংযত করবে, করে সমাজে বাস করবে, তেমনি সমাজকে সংযত হয়ে চলতে হবে। সমাজের অধিকার বাড়ে কোথায়? ব্যক্তির স্বাধীনতার শেষ যেখানে। এখানে তাকে বাড়তে দিতে হবে। এর উপর অধিকার চালালে চলবেনা, অর্থাৎ সমাজকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব মেনে চলতে হবে, বৃদ্ধকে যুবক হতে হবে, হয়ে যৌবন সাধন করতে হবে। যৌবনের চাঞ্চল্য বৃদ্ধ জানেন, কত ধানে কত চাল হয়, বৃদ্ধেরা যেমন জানেন যুবকেরা তেমন জানেন না বৃদ্ধেরা ঘর পোড়া গরু সুতরাং তাঁদের সিন্দুরে মেঘ দেখলে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক বটে কিন্তু ভয় পেলে চলবেনা, মনে করতে হবে আপনার যৌবনকে ধ্যান করতে হবে আপনার যৌবনকে এবং ধ্যান করে যুবক যারা তাদের সঙ্গে একত্ব সাধন করতে হবে, তারা যদি উচ্ছৃঙ্খল হয়, সহিষ্ণুতার সঙ্গে সে উচ্ছৃঙ্খলতা সয়ে যেতে হবে নইলে এর মীমাংসা হবেনা। একপ্রাণতা দ্বারা, আত্মবিলোপের দ্বারা যেমন বিরোধের মীমাংসা হয়, আর কিছু দ্বারা তেমন হয় না। সুতরাং

যুবককে সমাজের প্রতি ভক্তিমান হতে হবে, সমাজকেও ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে ধর্ম্মের আসনে বসিয়ে সে স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে।

কেবল সমাজের কথা কেন, এই যে স্বাধীনতার উপর হাত দেওয়া, এর মত পাপ আর কিছু আছে বলে কল্পনা করতে পারিনা। অন্য যে পাপ সেটা ইন্দ্রিয়ের তাড়ায় হয়, লোভে পাপ হয়, সাংসারিক বিষয় থেকে হয়, কিন্তু এই যে অপরের স্বাধীনতার উপর হাত দেওয়া, এখানে স্বাভাবিক লোভ নাই, ইন্দ্রিয়ের তাড়া নাই। এটা অস্বাভাবিক জিনিষ, এটা সব চাইতে বড় পাপ, এ পাপ সব চাইতে হীন। এই যে বিধান এটা কর, ওটা করনা এ কথাকে আমি বড় ভয় করি। আমি কাকেও একথা বলতে চাইনা এটা কর ওটা কোরোনা, পুত্রকে বলতে পারি এটা কর, না করলে এই ফল হবে। বিচারের ভার কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের ভার শেষ মীমাংসার ভার তার উপর যদি ছেড়ে না দিই তবে তারা কখনও মানুষ হবেনা; যদি ছেলেকে কেবল কোলে করে চালাই তবে তার পায়ের শক্তি হবেনা সে হাঁটতে পারবেনা; যারা বালক বালিকা তাদের যদি কেবল বিধান দ্বারা চালাই এ পথে যেয়োনা ও পথে যেয়োনা এরূপ বিধি নিষেধের বন্ধনে যদি তাদের চালাই তবে তারা আত্মস্থ হবেনা, আপনার উপর দাঁড়াতে শিখবেনা। সুতরাং এই যে বিধি, একে অত্যন্ত ভয় করি। হয়ত পুত্রকে কখনো সংস্কার বশতঃ বলতে পারি, কিন্তু সজ্ঞানে বলিনা এটা করোনা ওটা কর। কেন না বলা মুস্কিল। বৃদ্ধেরা একবার ভেবে দেখুন। পুত্রকে আদেশ করলেন তুমি এটা কর, পুত্রের মনে সেটা লাগলনা। তার মনঃপূত কথা হলনা, তার মনে হল এটা না করাই ভাল; তখন যদি সেটা করে পিতার প্রতি ভক্তি রইল বটে, কিন্তু আপনার কাছে আপনি দায়ী থাকতে পারলনা। পিতার আদেশ অগ্রাহ্য করলে নিজের কাছে দায়ী রইল বটে, কিন্তু পিতার প্রতি যে ভক্তি শ্রদ্ধা সে বিষয়ে অপরাধী হল। সুতরাং পিতা একবার ভাবুন পুত্রকে যদি বিধি নিষেধ দেন তাতে তার কত অনিষ্ট করেন। মনঃপূত না হলে নিজের কাছে ঋণী রইলনা, নিজের কাছে ঋণী থাকতে গিয়া যদি কথা না রাখ তবে পিতার অবজ্ঞা করা হল, পিতৃ ভক্তির ব্যাঘাত হল সুতরাং এ ক্ষেত্রে কি ধান না দেওয়াই ভাল, কিছু না বলাই ভাল, তাকে তার স্বাধীনতাতে প্রতিষ্ঠিত রাখাই ভাল, যেমন পিতা পুত্রের সম্বন্ধ, তেমনি থাকে স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ। ব্যক্তি আর সমাজের সেই সম্বন্ধ, সকল সম্বন্ধে একথা খাটে; মানুষকে স্বাধীন রাখ, তার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করোনা। *

শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল

* মাঘোৎসবে ছাত্রসমাজের উৎসবসভায় বিবৃত।

গুজরাত বিদ্যাপীঠ

(১)

অসহযোগ আন্দোলনের পরে ভারতবর্ষে অনেক জাতীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে তাহাদের অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে, যে দুই একটি এখনও আছে তাহা প্রকৃতপক্ষে না থাকার মধ্যেই। কিন্তু আমেদাবাদ গুজরাত বিদ্যাপীঠ সম্বন্ধে এ কথা খাটে না; ইহা এখনও সমানভাবেই সগর্ব্বে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইতিমধ্যেই গুজরাত বিদ্যাপীঠ ভারতবর্ষের মধ্যে কিছু প্রতিপত্তিও লাভ করিয়াছে। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি গুজরাত বিদ্যাপীঠ সম্বন্ধে কিছু কিছু জানেন, অন্ততঃ ইহার নামের সহিত আজ ভারতে অনেকেই পরিচিত।

১৯২০ সালে নভেম্বর মাসে আমেদাবাদে এই বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ইহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমাপন করেন। বম্বে, বরোদা, ভাওনগর, আমেদাবাদ, পুনা প্রভৃতি অনেক স্থান হইতে ছাত্রগণ তাহাদের কলেজ ত্যাগ করিয়া আমেদাবাদ আসিয়া সমবেত হয়। যাঁহার আজ্ঞায় তাহারা তাহাদের কলেজ ছাড়িয়া আসিয়াছে, তিনি তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন এই বিশ্বাস লইয়া তাহারা আমেদাবাদে উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ তাহাদের জন্যই এক কলেজ স্থাপিত হয়, সেই কলেজের নাম গুজরাত মহাবিদ্যালয়। ইতিমধ্যে গুজরাতে অনেক স্কুল গভর্ণমেণ্ট সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাতলে আসিয়া মিলিত হয়। এই সব স্কুলের শিক্ষণ পরিদর্শন, পরীক্ষা ইত্যাদির সুব্যবস্থা করিবার জন্য এক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন হয়, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামই গুজরাত বিদ্যাপীঠ। গুজরাত মহাবিদ্যালয়ও এই বিদ্যাপীঠের অন্তর্ভুক্ত।

এই বিদ্যাপীঠের প্রথম Chancellor মনোনীত হন মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী স্বয়ং। আজও তিনিই এই বিদ্যাপীঠের চান্সেলর। আর Vice Chancellor মনোনীত হন শ্রীযুক্ত অসুদামল টেকচাঁদ গিডওয়ানি। তিনি Principal A. T. Gidvani এই নামেই প্রসিদ্ধ। আজ তাঁহার বয়স প্রায় ৩২ বৎসর। এই অল্প বয়সেই তিনি দেশে বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি অকসফোর্ড হইতে M. A. পাশ করিয়া আসিয়া কিছুদিন এলাহাবাদে গভর্ণমেণ্ট কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। তখন তিনি ছিলেন এক বড় সাহেব অর্থাৎ I. E. S. বিভাগে তখন তিনি কাজ করিতেন। পরে মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী হইয়া বিকানীরে যান। সেখানে ৩।৪ মাস কাজ করিবার পর মহারাজার সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হয়। মহারাজা এমন এক ব্যবহার করেন যাহাতে তিনি অপমানিত বোধ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ মহারাজার কার্য্য পরিত্যাগ করেন। মহারাজা কখনই ভাবেন না যে গিডওয়ানি এত সহজেই এক মুহূর্ত্তেই এই কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন, তিনি তাঁহার পরিত্যাগ পত্র হাতে করিয়া পড়িতে পড়িতে বলিয়াছিলেন "হাঁ, এখানকার কাজ আপনার উপযুক্ত নয়, আপনার উপযুক্ত স্থান কলেজ।" গিডওয়ানি দিল্লী

আসিয়া রামযশ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হন। যখন অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয় তখন তিনি এই কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তিনি কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং মহাত্মা গান্ধি তাঁহাকে দিল্লী হইতে আমেদাবাদে লইয়া আসেন ও মহাবিদ্যালয়ের আচার্য্য (অর্থাৎ প্রিন্সিপ্যাল) নিযুক্ত করেন। প্রিন্সিপ্যাল হওয়ার পর তিনি বিদ্যাপীঠের Vice Chancellor মনোনীত হন; এবং বিদ্যাপীঠের Vice Chancellor স্বরূপে তাঁহাকে ভারতের অনেক স্থানে যাইতে হয়। এই সম্পর্কে তিনি বিদ্যাপীঠের নাম চারিদিকে ছড়াইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা করিবার অসাধারণ ক্ষমতা আছে। দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের পর লালা লাজপত রায় লিখিয়াছিলেন,"এবার কংগ্রেসে অনেক সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা শুনিলাম—কিন্তু গিডওয়ানির বক্তৃতাই আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম বলিয়া মনে হইল।"

অনেকে হয়ত মনে করিবেন আমি অনুষ্ঠানের (Institution) কথা বলিতে বসিয়া ব্যক্তি বিশেষের (person) কথা কেন বলিতেছি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে এই দুইটি জিনিষকে পৃথক করা অতি কঠিন; ইট পাথরে বা আইন কানুনে কোন কলেজ তৈয়ারী হয় না। কলেজকে ভাল ভাবে জানিতে হইলে কলেজের ভিতরে যিনি বসিয়া আছেন তাঁহাকেই আগে জানা দরকার। কলেজের ফটোগ্রাফে কেবল মাত্র ইটপাথরগুলি দেখিতে পারি এবং তাহার আইন কানুনে এক আড়ম্বরের ভাব বুঝিতে পারি; কিন্তু কলেজকে ঠিক ভাবে দেখিতে হইলে এই বাহিরের জাঁকজমক এবং ডাকহাঁক লক্ষ্য না করিয়া, লক্ষ্য করিতে হইবে তাহার ভিতরের অন্তরটী; সে বস্তুটি কি এবং কি রকম, তাহাই আমাদিগকে ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। ব্যক্তিবিশেষের প্রভাবের মূল্য কি তাহা তখন ঠিক করিয়া বুঝিতে পারিব। গুজরাত বিদ্যাপীঠ কেন, প্রত্যেক অনুষ্ঠানই তাহার কর্ম্মীদের সহিত এক আন্তরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ; এ সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া গেলে অনুষ্ঠানকে সম্পূর্ণভাবে দেখা হয় না; গুজরাত বিদ্যাপীঠের কথা জানিতে হইলে তাহার কর্ম্মীদের কথা জানা অত্যন্ত আবশ্যক। তাঁহারাই বিদ্যাপীঠকে গড়িয়া তুলিতেছেন; তাঁহারা যেমন, বিদ্যাপীঠও তেমন হইবে। তবে তাহার প্রতিষ্ঠাতার কথা এখানে কিছুই বলিতেছিনা, কারণ মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র; তাই তাহার Vice Chancellor ও প্রিন্সিপালের কথা এখানে কিছু বলিতেছি।

শ্রীযুক্ত গিডওয়ানি আজ জেলে। কেমন করিয়া তাঁহার জেল হইল এখন তাহাই বলিব। গত বৎসরে কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনের পর গিডওয়ানি ও জহরলাল নেহরু নাভা রাজ্যের অন্তর্গত জয়টুতে গমন করেন। সেখানে আকালী শিখদের উপর কিরকম অত্যাচার হইতেছে ও তাহারা কি প্রকার কাজ করিতেছে তাহাই স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তাঁহারা সেখানে গিয়াছিলেন। তাঁহারা এক আকালী জাঠার অনুগমন করিতেছিলেন। তাঁহারা যখন নাভা রাজ্যে প্রবেশ করেন, তখন আকালীদের সহিত তাঁহাদিগকে বন্দী করা হয়। বিচারে তাঁহাদের প্রত্যেকের আড়াই বৎসর জেল হয়; কিন্তু নাভা রাজ্যের সবই আশ্চর্য্য ব্যাপার। তাঁহাদিগকে জেলে পুরা হইল—কিন্তু পরক্ষণেই মুক্ত করিয়া দিয়া বলা হইল "তোমরা আজ বাড়ী যাও; আবার যদি কখনও নাভারাজ্যে প্রবেশ কর, তবে তখন এই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। এখন শাস্তি মুলতবি রহিল"। তাঁহারা বলিলেন "এখন আমাদের

নাভারাজ্যে বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই তবে যখন প্রয়োজন হইবে তখন নিশ্চয়ই আবার আসিব"। কয়েক দিন পরেই সেই প্রয়োজন আসিল এবং গিডওয়ানি সাহেবকে পুনরায় নাভায় প্রত্যাগমন করিতে হইল। যখন পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট আকালীদের শিরোমনি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটিকে এক বিপ্লববাদী অতএব বেআইনী সভা বলিয়া ঘোষণা করিলেন তখন তাহাদের মধ্যে এক হৈ চৈ পড়িয়া গেল। তাহাদের প্রাণে যেন নূতন বল আসিল। প্রবন্ধক কমিটির সভ্যের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল ; তাহারা প্রকাশ্যে এই তথাকথিত বিপ্লববাদী সমিতির সভায় যোগদান করিল, এবং সহরে সহরে ও গ্রামে গ্রামে বড় বড় মিছিল বাহির করিয়া তাহাদের গুরু গম্ভীর "সত্ শ্রী আকাল" "সত্ শ্রী আকাল" ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল। আকালী শিখেরা অধিকাংশই যুদ্ধপ্রত্যাগত সৈন্য ; তাহারা যখন সামরিক পদ্ধতি অনুসারে ধীরপদবিক্ষেপে মার্চ্চকরিয়া ব্যাণ্ডের তালে তালে গান করিয়া সহর পরিভ্রমণ করিতে লাগিল, তখন গভর্ণমেণ্ট বুঝিলেন যে ইহাদিগকে দমন করা তত সহজ হইবে না ; যাহা হউক গভর্ণমেণ্ট এক এক করিয়া তাহাদের নেতাদিগকে বন্দী করিতে লাগিলেন এবং কমিটিকে ধ্বংস করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিখেরা সামরিক জাতি ; তাহারা diciplined organisationএর মূল্য বোঝে;তাহারাও তাহাদের কমিটীর পক্ষ হইতে অনেক আয়োজন করিতে লাগিল। তাহারা এক Information Bureau স্থাপিত করিল ; সেখান হইতে সকল সংবাদপত্রে সঠিক সংবাদ দেওয়া হইবে ; আকালীরা কি করিতেছে, কেন করিতেছে, কোথায় যাইতেছে, কে ধৃত হইতেছে, কে হত বা আহত হইতেছে—সমস্ত সংবাদ এখান হইতে সর্ব্বত্র প্রেরণ করা হইবে। এই কাজের জন্য একজন উপযুক্ত লোকের অত্যন্ত আবশ্যক। শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহরু গিড়ওয়ানি সাহেবকে তার করেন—"আপনি শীঘ্র অমৃতসর যাইয়া এই কাজে তাহাদিগকে সাহায্য করুন"। পরে, প্রবন্ধক কমিটিও তাঁহাকে অমৃতসর আনিবার জন্য আমদাবাদে লোক প্রেরণ করেন। প্রবন্ধক কমিটির অনুরোধে গুজরাট প্রান্তিকসমিতি (Guzrat Provincial Congress Commitee) গিড়ওয়ানি সাহেবকে কয়েক মাসের জন্য অমৃতসর যাইতে অনুমতি দেন। কথা ছিল তিনি শিখদের Information Bureau ঠিক ভাবে দাঁড় করাইয়া দিয়া আবার কলেজে ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু সে কথা রহিলনা, তাঁহার আর এখন ফিরা হইল না। জয়টু হত্যাকাণ্ডের পর তিনি এবং ডাক্তার কিচ্লু যখন হত ও আহতদিগকে দেখিবার জন্য সেখানে যান তখন নাভা সরকারের আদেশে তাহাদের দুই জনকেই বন্দী করা হয়। বিচারে ডাক্তার কিচলুর মুক্তি হইল ; কিন্তু গিডওয়ানি সাহেব আবার নাভা রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে সেই পুর্ব্বকার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে বলা হইল। অতএব তিনি এখন জেলে। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে জেলে দেখিতে গিয়াছেন। তখন নাভা সরকার আদেশ করিলেন যে তাঁহাদিগকে ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা বলিতে হইবে ; অবশ্য দুইজনেই তাহাতে অস্বীকার করিলেন ; তাঁহাদের মাতৃভাষা সিন্ধি ব্যতীত বিদেশী ভাষায় তাঁহারা বাক্যালাপ করিতে রাজী নহেন। শ্রীমতী গিডওয়ানি তাঁহার স্বামীকে দেখিয়া চলিয়া আসিলেন, তাঁহারা পরস্পর কোন বাক্যালাপ করিলেন না।

আজ প্রায় এক বৎসর গিডওয়ানি সাহেব To-Morrow নমে এক মাসিক পত্র চালাইতেছিলেন ; তিনিই তাহার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে সেই কাগজটী বন্ধ হইয়া গিয়াছে ; নতুবা বিদ্যাপীঠ ও মহাবিদ্যালয়ের কাজ যেমন চলিতেছিল এখনও তেমনি চলিতেছে। সমস্ত ভার এখন যাঁহার উপর পড়িয়াছে, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত জিবতরাম কৃপালানি। ইনিও সিন্ধি। ইনি সত্যাগ্রহাশ্রমে থাকেন এবং সেখানে Distinguished *Vagabond* বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত। তাঁহার বয়স প্রায় ৩৬ কি ৩৭ ; এখনও বিবাহ করেন নাই,—ছাত্রাবস্থায় তাঁহাকে অনেক কলেজ দেখিতে হইয়াছে ; তিনি তখন যেমন ছিলেন এখনও ঠিক তেমনিই আছেন, আগুনের হল্কার মত তেজস্বী, দীপ্ত, রুদ্র ও স্পষ্ট ভাষী ; তিনি কাহাকেও খাতির করিয়া কোন কথা বলেন না এবং কখন বলেন নাই। যাহা তিনি ভাল মনে করেন, তাহা তিনি করিবেনই করিবেন তখন কাহাকে তিনি গ্রাহ্য করেন না। যখন প্রয়োজন হয় এবং যখন তিনি ভাল মনে করেন তখন তিনি মহাত্মা গান্ধীকেও কর্কশ কথা শুনাইয়া দেন। এ রকম ছাত্র যে এক কলেজে ৪ বৎসর টিঁকিয়া থাকিতে পারিবে না তাহা বলাই বাহুল্য। করাচী কলেজ হইতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়—তখন তিনি যান বম্বে উইলসন কলেজে ; কিছুদিন পর সেখান হইতেও বিতাড়িত হইয়া তিনি যান বরোদা কলেজে। সেখানেও টিকিতে পারিলেন না—বিতাড়িত হইয়া এবার গেলেন পুনা ফারগুসন কলেজে। এই প্রকারে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি বি, এ পাশ করিলেন এবং পরে এম, এও পাশ করিলেন। পাঠ শেষ করিয়া তিনি বাহির হইলেন দেশ-ভ্রমণে ; দেশভ্রমণের সময় তাঁহার যেমন আকৃতি ছিল এখন ঠিক তাহাই আছে, লম্বা লম্বা জটার মত চুল, ভবঘুরে পাগলা পাগলা চেহারা, একখানি সার্ট ও একজোড়া ধুতিতে তাঁহার বেশ ভাল ভাবেই বৎসর কাটিয়া যাইতেছে। তিনি কাশ্মীরে অমরনাথ ও শ্রীনগর, হিমালয়ে হরিদ্বার ও বদরিকা, শেষে নেপাল ও ভুটান পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া অবশেষে মহাত্মা গান্ধীর সহিত যোগ দেন। মহাত্মা গান্ধী যখন কায়রা জেলে সত্যাগ্রহ সুরু করেন, তখন তিনি তাঁহার সহিত একত্রে কাজ করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী যখন চম্পারনে কাজ করিতে আসেন, তখন তিনি তাঁহার এই শিষ্যটীকে লইয়া আসিয়াছিলেন ; সেখানেও কৃপালানি সাহেব অতি সুচারুভাবে কাজ করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন।

যখন অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয় তখন তিনি বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁহার গুরুর আহ্বান, তিনি তৎক্ষণাৎ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছাড়িয়া দিয়া আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি বলেন "এই অসহযোগ আন্দোলনের দোষগুণ আমি বিচার করিনা, এই আন্দোলনই যখন ভারতে বিদেশী শাসনের (foreign rule) বিরুদ্ধে, তখন ইহাতে আমি যোগ দিবই। যাহাতে ভারত আবার স্বাধীন হয় তাহাই ভাল।" বারানসীতে তিনি এক আশ্রম স্থাপন করেন—সে আশ্রম এখনও বেশ ভাল ভাবেই চলিতেছে।

তিনি যে গুজরাত মহাবিদ্যালয়ের ন্যায় এক নূতন ধরণের কলেজের উপযুক্ত প্রিন্সিপ্যাল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তিনি ভীষণ, তিনি দীপ্ত, তিনি রুদ্র, তিনি কঠোর— তিনি এক অদ্ভুত কর্ম্মী ; তিনি এক distinguished vagabond। তাঁহার এক ভাই ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গত বলকান সমরে টার্কির পক্ষে যুদ্ধ করিতে ট্রিপলি যাইয়া প্রাণ হারান।

প্রিন্সিপ্যাল জিবতরাম কৃপালানিও তাঁহার এই ভাইয়ের ন্যায়ই তীব্র ও জ্বলন্ত ; তাঁহার ছয়মাস জেল হইয়াছিল ; ছয়মাস কেন ছয়বৎসর জেল হইলেও তাঁহার আপত্তি নাই।

গুজরাত মহাবিদ্যালয়
আমেদাবাদ

শ্রীইন্দুভূষণ মজুমদার

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে আমি কোন বিশেষ জাতি বা বিশেষ কালের বিচার না করিয়া সাধারণ ভাবে, বিশুদ্ধ দার্শনিকতত্ত্বহিসাবে সভ্যতা বস্তুটির স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আজ আমি ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু এই আখ্যানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমি মোটামুটি ভাবে এই সভ্যতার বিশিষ্ট প্রকৃতি ও গঠনের সহিত আপনাদের পরিচয় স্থাপন করিতে চাই। আমি কেবল ততটুকু পরিস্ফুটভাবে ইহার প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিয়া দিতে চাই, যাহাতে জগতের অন্যান্য দেশের সভ্যতা হইতে ইহা যে বিভিন্ন প্রকৃতির সভ্যতা, এইটুকুই আপনাদের মনে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইতে পারে। আমি একথা জোর করিয়া বলিতে পারি না যে আমার বর্ণিত চিত্র এমন যথাযথ ও সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইবে যে আপনারা দেখিবামাত্রই ইহাকে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতিকৃতি বলিয়া চিনিতে পারিবেন।

এশিয়াতেই হউক বা ইউরোপেই হউক, আধুনিক ইউরোপের পূর্ব্বে যে সকল স্থানে সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছে, সেই সকল স্থানের সভ্যতার মধ্যে, এমন কি গ্রীক ও রোমীয় সভ্যতার মধ্যেও, একটা বৈচিত্র্যাভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক সভ্যতাই যেন একটিমাত্র করিয়া মূলতথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, একটিমাত্র করিয়া মূলভাব হইতে উদ্ভূত। যেন সমাজ সে সব স্থানে একটিমাত্র মূলতত্ত্ব আশ্রয় করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে, এবং সে সব স্থানের রীতিনীতি অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠান সমস্তই যেন একটিমাত্র মূলতত্ত্বদ্বারা গঠিত ও অনুপ্রাণিত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন মিশর দেশে এক যাজকতন্ত্ররূপ মূলতত্ত্বদ্বারা সমগ্র সমাজ শাসিত ও অনুপ্রাণিত। এই একটিমাত্র তত্ত্ব সেখানকার রীতিনীতি, সেখানকার স্থাপত্য এবং সভ্যতার যাবতীয় নিদর্শনের মধ্যে ফুটিয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষেও আপনারা সেই একই তত্ত্বের প্রভাব দেখিতে পাইবেন। সেখানে এখনও পর্য্যন্ত আপনারা সেই যাজকতন্ত্রের আধিপত্য দেখিতে পাইবেন। আবার অন্য কোন কোন দেশে আপনারা অন্য এক তত্ত্বের প্রভাব দেখিবেন, যথা সমাজে বিজেতৃজাতির আধিপত্য। এ সকল সমাজে একমাত্র বলের আধিপত্য দেখা যাইবে। সমাজের বিধিব্যবস্থা, সমাজের প্রকৃতি, সমস্তই সেখানে বলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত। অন্যত্র আবার সমাজে জনতন্ত্রনীতির বিকাশ ও আধিপত্য। এশিয়ামাইনর, সীরিয়া, ফীনিশিয়া প্রভৃতি দেশের সমুদ্রোপকূলে যে সমস্ত বাণিজ্যসমৃদ্ধিসম্পন্ন রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে এই জনতন্ত্রনীতির আধিপত্য দেখা যায়। মোটের উপর দেখা যায় প্রাচীন সভ্যতামাত্রই এক একটি বিশেষ ভাব বা তত্ত্বের ছাপ লইয়া নিজ নিজ

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার স[illegible]কার এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য [illegible] বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

রীতিনীতি প্রতিষ্ঠানাদি গঠন করিয়া লইয়াছিল ; একটি প্রবলশক্তিদ্বারা তাহাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনযাত্রাপ্রণালী শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত।

আমি একথা বলিতে চাই না যে এই সকল রাষ্ট্রের সভ্যতার মধ্যে যে একমুখীনতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা আদিম কাল হইতে বরাবরই তাহাদের মধ্যে প্রবল ছিল। ঐ সকল দেশের প্রাচীনতর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে সমাজের আভ্যন্তরীণ ভিন্ন ভিন্ন শক্তি সময়ে সময়ে সমাজের উপর একাধিপত্য স্থাপন করিবার জন্য পরস্পর লড়াই করিয়াছে। যথা প্রাচীন মিশর, ইক্রিয়া, গ্রীস প্রভৃতি দেশে যোদ্ধৃসমাজ যাজকসমাজের বিরুদ্ধে লড়িয়াছে। অন্যত্র গোষ্ঠীগত বা বংশগত ঐক্যের ভাব অন্যপ্রকার স্বাধীন একতা-বন্ধনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে ; কোথাও বা অভিজাততন্ত্রের সহিত জনতন্ত্রের সংঘর্ষ ঘটিয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ এই সকল বিভিন্ন তন্ত্রের সংঘর্ষ প্রাগৈতিকহাসিকযুগে সংঘটিত হইয়াছে, এবং ঐতিহাসিক যুগে তাহাদের অস্পষ্ট স্মৃতিমাত্র রহিয়া গিয়াছে।

কোন কোন স্থলে ঐতিহাসিক যুগেও জাতীয় জীবনের মধ্যে এই সকল সংঘর্ষের পুনরাবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই অল্পকালের মধ্যেই এই সকল সংঘর্ষের পর্য্যবসান হইয়াছে। পরস্পর বিবদমান বিভিন্নশক্তির মধ্যে কোন একটি শক্তি অল্পকালের মধ্যেই সমাজে একাধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই সকল প্রাচীন সমাজের ইতিহাসে এককালে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির অবস্থান ও সংঘর্ষ কখনও অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই, সাময়িক বিক্ষোভমাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে।

ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে অধিকাংশ প্রাচীন সভ্যতার মধ্যেই কোন প্রকার জটিলতা বা উপাদানবৈচিত্র্য নাই। এক একটি জাতির ইতিহাসমধ্যে এক একটি মূলতত্ত্বের আধিপত্য। প্রাচীন সমাজের এই একবর্ত্তিতার ফল ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ফল প্রসব করিয়াছে। প্রাচীন গ্রীসে এই একবর্ত্তিতার ফলে সমাজের বিকাশ ও পরিণতি অতি অল্প কালের মধ্যেই সম্পন্ন হইয়াছিল। কোনও জাতি এত শীঘ্র এমন সফলতার সহিত জাতীয় শক্তির বিকাশ সাধনে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু এই বিস্ময়জনক উন্নতি ও পুষ্টির পর, গ্রীশ যেন হঠাৎ একেবারে অবসাদ-গ্রস্ত হইয়া পড়িল। গ্রীশের জাতীয় ক্ষয় ও বিনাশ সম্পূর্ণ রূপে সাধিত হইতে কিছু সময় লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু এই ক্ষয়ের সূত্রপাত হইল বড় শীঘ্র। মনে হয় যেন গ্রীক সভ্যতার প্রাণতত্ত্বের সৃজনীশক্তি একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেল ; এপর্য্যন্ত আর এমন কোনও নূতন শক্তির আবির্ভাব হয় নাই যাহাতে এই সভ্যতাকে নবজীবন দান করিতে পারে।

অন্যত্র, মিশর ও ভারতবর্ষে সামাজিক জীবনে একটিমাত্র তত্ত্বের একাধিপত্যের ফল অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছে। সেখানে সমাজ স্থিতিশীল হইয়া পড়িয়াছে। একবর্ত্তিতার ফলে দাঁড়া-ইয়াছে বৈচিত্র্যাভাব। সমাজ সেখানে বিনাশপ্রাপ্ত হয় নাই, টিকিয়া রহিয়াছে, কিন্তু গতি নাই, চাঞ্চল্য নাই, সামাজিক জীবন যেন বরফের মত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে।

এই কারণেই সমস্ত প্রাচীন সভ্যতার মধ্যেই একটা একাধিপত্যস্থাপনের চেষ্টা, বিরোধী মত, বিরোধী শক্তিকে জোর করিয়া দমন করিবার চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। এই একাধি-পত্যের চেষ্টা সর্ব্বত্র ধর্ম্মনীতি বা শাসননীতির নামে চালান হইয়াছে। সমাজ কোন একটি

বিশেষ শক্তির একচেটিয়া সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হইয়াছে,সে শক্তি অন্য কোন শক্তির অস্তিত্বমাত্র থাকিতে দেয় নাই। সমস্ত বিরোধী ভাব, বিরোধী শক্তি সে নির্ম্মমভাবে দলন ও নিষ্পীড়ন করিয়াছে। শাসন শক্তি কখনও তাহার পার্শ্বে অন্য কোন শক্তি বা তত্ত্বের প্রকাশ অথবা ক্রিয়া স্বীকার করে নাই।

সভ্যতার এই একনীতিবর্ত্তিতা সাহিত্য বা অন্যান্য মানস সৃষ্টির উপরেও একটা বিশেষ ছাপ দিয়াছে। ইউরোপের সর্ব্বত্রই আজকাল ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যের যে সকল নিদর্শন ছড়াইয়া গিয়াছে, তাহার সহিত সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত হইয়াছেন। সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, সেগুলি সব এক ছাঁচে ঢালা, সেগুলি যেন সব এক তথ্যের পরিণতি, এক ভাবের প্রকাশ।—ধর্ম্মগ্রন্থ বল, ঐতিহাসিক কিম্বদন্তী বল, নাটক মহাকাব্য বল, সর্ব্বত্রই এক প্রকৃতির ছাপ। ঐতিহাসিক ঘটনা ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে বৈচিত্র্যহীনতা, যে প্রকৃতি-সাম্য, মানস সৃষ্টির মধ্যেও তাহারই ছাপ। শুধু ভারতে নয়, মানববুদ্ধির শ্রেষ্ঠ সম্পদের ভাণ্ডার যে গ্রীস্, সেই গ্রীস্‌দেশেও সাহিত্য ও কলারাজ্যে এই একাকারের রাজত্ব।

আধুনিক ইউরোপের সভ্যতা এই বিষয়ে প্রাচীন সভ্যতার ঠিক বিপরীত। সাধারণ ভাবে বিচার করিলে দেখা যায় এই সভ্যতার প্রকৃতি বৈচিত্র্যময়, জটিল, বিক্ষুব্ধ। ইহার মধ্যে সকল প্রকারের সমাজনীতি, সকল প্রকারের সমাজগঠন, একত্র পাশাপাশি রহিয়াছে। অপার্থিব ও পার্থিব শক্তি—যাজক তন্ত্র, রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও জনতন্ত্র সকল প্রকার শাসন তন্ত্রের উপাদান; এবং রাষ্ট্রশরীর ও সমাজশরীরের সকল প্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়া ভিড় করিয়া ঠেলাঠেলি করিতেছে। স্বাধীনতা, অর্থসম্পদ ও সামাজিক প্রতিপত্তির সর্ব্ববিধ স্তর ইহার মধ্যে পাশাপাশি রহিয়াছে। এই সকল বিভিন্ন শক্তি অনবরত পরস্পরের বিরুদ্ধে বল পরীক্ষা করিতেছে, কিন্তু কেহই অন্যগুলিকে নিঃশেষে দলন করিতে পারিতেছেনা, কেহই সমাজের উপর, রাষ্ট্রের উপর নিজের একাধিপত্য স্থাপন করিতে পারিতেছেনা। প্রাচীন কালে প্রত্যেক যুগেই, সমস্ত সমাজ যেন এক ছাঁচে ঢালা ছিল। কখনও বা বিশুদ্ধ রাজতন্ত্র, কখনও বা বিশুদ্ধ যাজকতন্ত্র, কখনও বা বিশুদ্ধ জনতন্ত্রের অভ্যুদয় হইয়াছে, কিন্তু সেই সেই কালে সেই সেই তন্ত্রের সম্পূর্ণ আধিপত্য। আধুনিক ইউরোপ সকল প্রকার সমাজ ব্যবস্থার, সমাজ গঠনের সকল প্রকার নূতন প্রচেষ্টার নিদর্শন লইয়া আমাদের সমক্ষে উপস্থিত। এখানে বিশুদ্ধ বা মিশ্র রাজতন্ত্র, যাজকতন্ত্র, অল্পবিস্তর আভিজাত্যপ্রমুখ জনতন্ত্র, সকল প্রকার শাসন ব্যবস্থাই এককালে পাশাপাশি সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। অথচ তাহাদের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে একটা পারিবারিক সাদৃশ্য লক্ষ্য না ~~করা অসম্ভব।~~ করিয়া থাকা যায় না।

আধুনিক ইউরোপের চিন্তা ও ভাবরাজ্যেও সেই বৈচিত্র্য, সেই সংঘর্ষ। যাজক তন্ত্রবাদ, রাজতন্ত্রবাদ, অভিজাততন্ত্রবাদ, জনতন্ত্রবাদ, এই সকল বিভিন্ন মত ও বিশ্বাস পরস্পরকে খণ্ডন করিতেছে, পরস্পরকে হঠাইতে চেষ্টা করিতেছে, পরস্পরের স্বচ্ছন্দ-বিকাশে বাধা দিতেছে এবং পরস্পরের রূপান্তর সাধন করিতেছে। মধ্যযুগের লেখকদিগের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা নিঃসঙ্কোচ ও স্পষ্টবাদী তাঁহাদের লেখা পড়িয়া দেখুন; কোথাও দেখিবেন না যে কোন একটি ভাব বা চিন্তাকে তাহার চরম পরিণতি পর্য্যন্ত ফুটাইয়া তোলা

হইয়াছে। যিনি স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজশাসনের একান্ত পক্ষপাতী তিনিও সহসা স্বকীয় মতবাদের চরম ফলাফল বিবেচনা করিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়ান। তাঁহার চারিদিকে যে আরও পাঁচ রকমের চিন্তাপ্রণালী, আরও পাঁচ রকমের ভাবসমষ্টি সমাজের মধ্যে মাথা তুলিয়া আছে, সে দিকে তিনি চক্ষুমুদ্রিত করিতে পারেন না। কাজেই তাঁহার চিন্তাস্রোতের স্বাভাবিক গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাঁহার ভাবস্রোত আতিশয্যে পৌঁছিতে পায় না। আবার যাঁহারা জনতন্ত্রের পক্ষপাতী তাঁহারাও সেই এক নিয়মের বশবর্ত্তী। প্রাচীন সাহিত্য দর্শনে দেখা যায় এক একটি মতবাদ নিঃসঙ্কোচে কোনও দিকে না তাকাইয়া অনুকূল যুক্তি দ্বারা পথঘাট বাঁধিয়া একেবারে তাহার চরম পরিণতিতে গিয়া পৌঁছিয়াছে। বিরুদ্ধ মতবাদের অস্তিত্বই সে স্বীকার করে না, নানা বিরোধীমতবাদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য সে নিজকে কখনও খর্ব্ব করে নাই। মধ্যযুগের ইউরোপের চিন্তারাজ্যে এইরূপ নিঃসঙ্কোচ একদেশদর্শিতা ও একমুখী গতি কুত্রাপি দেখা যায় না। চিন্তার রাজ্যে যেরূপ, ভাবরাজ্যে ও এই উভয় যুগের মধ্যে সেই একরূপ পার্থক্য। মধ্যযুগের ইউরোপে একদিকে যেমন দেখা যায় প্রবল স্বাতন্ত্র্যানুরাগ, অপর দিকে তেমনি তাহার পার্শ্বেই সহজস্বীকৃত কুণ্ঠালেশহীন শাসনবশ্যতা; একদিকে অসাধারণ প্রভুভক্তি, অসাধারণ রাজভক্তি, অপর দিকে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া অপর কাহারও দিকে না তাকাইয়া স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবে নিজের ইচ্ছাশক্তি খাটাইবার জন্য অদম্য বাসনা। সমাজে যে বৈচিত্র্য ও বিক্ষোভ, মানুষের ভাবরাজ্যেও সেই বৈচিত্র্য ও বিক্ষোভ।

রসসাহিত্যক্ষেত্রেও সেই এক প্রকৃতির ছাপ। একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে শিল্পকলা ও সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া মধ্যযুগের সাহিত্য ইউরোপের প্রাচীন সাহিত্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট; কিন্তু ভাব ও চিন্তার গভীরতার দিক দিয়া এই আধুনিক সাহিত্য প্রাচীন সাহিত্য অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিসম্পদশালী। মানব আত্মা এখন নানা বিভিন্ন দিক দিয়া এবং গভীরতর স্তর পর্য্যন্ত নাড়া পাইয়াছে। এবং এই কারণেই এইযুগে শিল্পগঠনে পারিপাট্যের অসম্পূর্ণতা ঘটিয়াছে। কারণ শিল্পের উপাদান যত বিচিত্র, যত অপূর্ব্ব, যত সংখ্যায় অধিক হইবে, সেই উপাদানগুলিকে একত্র সংহত করিয়া বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল শিল্পাবয়বে পরিণত করা তত কঠিন হইবে। যে যে গুণে শিল্পসৃষ্টির সৌন্দর্য্য সাধিত হয় তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে, সুস্পষ্টতা, সরলতা, এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমস্ত গঠনভঙ্গীর মধ্যে ভাবদ্যোতনামূলক একাত্মতা। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার অসাধারণ ভাববৈচিত্র্য ও চিন্তাবৈচিত্র্যের দরুণ এই সরলতা ও প্রাঞ্জলতা সাধন করা শিল্পের পক্ষে দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে।

তাহা হইলে দেখা গেল আধুনিক সভ্যতার এই প্রধান বিশেষত্ব কি ভাবরাজ্যে কি চিন্তারাজ্যে, কি সাহিত্যক্ষেত্রে, কি শিল্পক্ষেত্রে, সর্ব্বত্রই ফুটিয়া রহিয়াছে। অবশ্য শিল্প বা সাহিত্যের এক একটি বিশেষ ক্ষেত্রে মানবাত্মার বিশেষ বিশেষ বিকাশ পৃথক করিয়া আলোচনা করিলে, আমরা সাধারণতঃ দেখি যে ঐ সকল ক্ষেত্রে প্রাচীন অপেক্ষা আধুনিক শিল্পসাহিত্য নিকৃষ্ট। কিন্তু অন্য দিকে যদি আমরা সমষ্টিভাবে বিচার করি তাহা হইলে দেখিব আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা অন্য যে কোন সভ্যতা অপেক্ষা তুলনাতীতরূপে সম্পদশালী

কারণ ইহার মধ্যে একই সময়ে নানা বিচিত্র দিক দিয়া মানবাত্মা বিকাশ ও পুষ্টি লাভ করিয়াছে। ফলে আপনারা দেখিতেছেন যে যদিও এই সভ্যতা পঞ্চদশ শতাব্দী অতিক্রম করিয়াছে, তথাপি ইহা এখনও ক্রমোন্নতিশীল। এ সভ্যতা গ্রীকসভ্যতার মত রাতারাতি বাড়িয়া উঠে নাই সত্য, কিন্তু ইহার উন্নতির বেগ কখনও রুদ্ধ হয় নাই। তাহার সম্মুখে ভবিষ্য জগতে যে বিশাল লীলাক্ষেত্র বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহার আভাস পাইয়া সে দিনে দিনে নূতন উদ্যমে দ্রুততর বেগে অগ্রসর হইতেছে, কারণ সে ক্রমশঃই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা ও স্ফূর্ত্তি অর্জ্জন করিতেছে। অন্যান্য সভ্যতায় এক মূলনীতির, এক ছাঁচের প্রাধান্য বা একাধিপত্যের ফলে যেমন স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন ক্রিয়া স্ফূর্ত্তি পায় নাই, আধুনিক ইউরোপে তেমনি সমাজব্যবস্থায় নানা বিরোধী শক্তি, নানা বিভিন্ন জাতি, নানা বিভিন্ন শ্রেণীর একত্র অবস্থানের দরুণ বর্ত্তমানকালের স্বাধীনতা জন্মলাভ করিয়াছে। কারণ এই সকল পরস্পর বিরোধী শক্তি কেহ কাহাকে একেবারে ঠেলিয়া ফেলিতে পারে নাই। এবং কেহ কাহাকে নির্ম্মূল করিয়া উৎসাদিত করিতে পারে নাই বলিয়াই নানা বিভিন্ন মত, নানা বিভিন্ন চিন্তাসূত্র, নানা বিভিন্ন ভাবসূত্র বাধ্য হইয়া পরস্পরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করিয়া রহিয়াছে। প্রত্যেকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছে যে সে একটা বিশেষ ক্ষেত্রে উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনের ভার লইবে। সুতরাং অন্য সর্ব্বত্রই যেখানে একনীতির আধিপত্যের দরুণ দণ্ডমূলক শাসনের প্রাধান্য হইয়াছে, আধুনিক ইউরোপে সেখানে সভ্যতার উপাদানবৈচিত্র্যের ফলে এবং এই সকল উপাদানের নিয়ত সংঘর্ষ ও বিরোধের ফলে উৎপন্ন হইল ইউরোপীয় স্বাধীনতা। ইহাই আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার বিশেষ মহত্ব।

ইহারই দরুণ সে অন্যান্য সভ্যতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে। এ দাবী যে সম্পূর্ণরূপে ন্যায়সঙ্গত তাহা একটু তলাইয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। একবার ইউরোপীয় সভ্যতার কথা ভুলিয়া গিয়া সাধারণ ভাবে জগৎ প্রকৃতির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখুন। জগৎ কি নিয়মে চলিতেছে? সেও কি ঠিক এইরূপ উপাদানবৈচিত্র্য লইয়া নানা বিচিত্র শক্তির সংঘর্ষের মধ্য দিয়া চলিতেছে না? বাস্তবিক পক্ষে এই জগৎপ্রকৃতির মধ্যেও কোন একটি তত্ব, কোন একটি নিয়ম শৃঙ্খলা, কোন একটা ভাব, কোন একটি বিশেষ শক্তি, অন্য সমস্ত শক্তির প্রভাব বিনষ্ট করিয়া একাধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই।

নানা বিচিত্র শক্তি, নানা বিচিত্র তত্ব, নানা বিচিত্র পদ্ধতি, পরস্পরের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে, পরস্পরকে খর্ব্ব করিতেছে, পরস্পরের সঙ্গে অনবরত লড়াই করিতেছে; কখনও একটি, কখনও বা অন্যটি প্রাধান্য লাভ করিতেছে, কিন্তু কেহ কখনও সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইতেছে না, সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইতেছে না। এই বিশাল জগদ্ব্যাপারের গতি অবশ্য একটা সামঞ্জস্যের দিকে, একটা একীকরণের দিকে। সে সামঞ্জস্য, সে আদর্শে হয় ত কখনও উপনীত হওয়া যাইবে না, কিন্তু মানবজাতি স্বাধীন চেষ্টা ও উদ্যমের দ্বারা সেই আদর্শের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। ইহাই যদি জগতের সাধারণ প্রকৃতি হয়, তাহা হইলে ইউরোপীয় সভ্যতাকে বিশাল জগৎপ্রকৃতির যথার্থ প্রতিকৃতি বলিতে হইবে। ইহার মধ্যে সঙ্কীর্ণতা নাই, একদেশবর্ত্তিতা নাই, স্থাবরতা নাই। আমার বিশ্বাস জগতের ইতিহাসে এই প্রথম সভ্যতা

হইতে বিশেষত্বের ছাপ মুছিয়া গিয়াছে; মানব সভ্যতা এই প্রথম বিশাল বিশ্বনাট্যের মতই বিচিত্র উপাদান লইয়া, বিচিত্র সম্পদে সম্পন্ন হইয়া, বিচিত্র সংঘর্ষের মধ্য হইতে বলসঞ্চয় করিয়া সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং একথা বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে ইউরোপীয় সভ্যতা সনাতন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে, বিশ্বস্রষ্টার উদ্দেশ্য অনুসারে অগ্রসর হইতেছে। ইহাই হইল ইহার শ্রেষ্ঠতার যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত পরিমাপ।

আমি চাই যে আপনারা বরাবর ইউরোপীয় সভ্যতার এই মৌলিক বিশিষ্টতার কথা মনে করিয়া রাখিবেন। আপাততঃ আমি কেবল কথাটি বলিয়া রাখিলাম। পরে ঘটনা পরম্পরার বিবৃতি ও অভিব্যক্তি দ্বারাই ইহা প্রমাণিত হইবে। তথাপি, যদি আমি দেখাইতে পারি যে এই সভ্যতার শৈশবাবস্থাতেই এই বিশিষ্টতার মূল কারণ ও উপাদানসকল বর্ত্তমান রহিয়াছে; যদি ইহার জন্ম কালে, রোমীয় সাম্রাজ্যের পতন মুহূর্ত্তে, জগতের তৎকালীন অবস্থার মধ্যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে যে সকল ঘটনার সমন্বয়ে ইউরোপীয় সভ্যতা গঠিত হইয়াছে তাহার মধ্যেই এই বিক্ষোভ, এই বৈচিত্র্য, এই বহুমুখীনতার লক্ষণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমার মূলসূত্রের যে এটা একটা প্রবল সমর্থন হইবে, তাহা অবশ্য আপনারা স্বীকার করিবেন। আমি এখন এই গবেষণায় প্রবৃত্ত হইব। প্রথমে আমি রোমীয় সাম্রাজ্যের অবসানযুগে ইউরোপের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিব, এবং নানা প্রথা, প্রতিষ্ঠান, বিশ্বাস, ভাব ও চিন্তা হইতে আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিব যে প্রাচীন জগৎ বর্ত্তমান জগৎকে কি কি উপাদান দান করিয়া গেল। যদি এই উপাদানের মধ্যেই আপনারা দেখিতে পান যে ইউরোপীয় সভ্যতার পূর্ব্বোক্ত বিশেষ প্রকৃতির ছাপ রহিয়াছে, তাহা হইলে আপনাদিগের নিকট আমার প্রদত্ত পরিচয় নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে না।

প্রথমে আমাদের স্পষ্টরূপে ধারণা করা দরকার যে রোমীয় সাম্রাজ্যের যথার্থ স্বরূপ কি এবং কেমন করিয়াই বা ইহা গঠিত হইল।

রোম মূলতঃ ছিল একটি মিউনিসিপালিটি অর্থাৎ পৌরসঙ্ঘ। মাত্র একটি প্রাচীরবেষ্টিত নগরের অধিবাসীবর্গের উপযোগী রীতিনীতি প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি হইল রোমের শাসনতন্ত্র। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সমস্তই হইল পৌর প্রতিষ্ঠান, ইহাই তাহাদের বিশিষ্ট প্রকৃতি। একথা যে শুধু রোমের পক্ষে খাটে তাহা নয়। যদি আমরা তদানীন্তন ইটালীর দিকে তাকাই, তাহা হইলে রোমের চতুর্দ্দিকে কতকগুলি নগর ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাই না। তখন জনসঙ্ঘ বা জাতি বলিলে বুঝাইত কেবলমাত্র কতকগুলি নগরের, কতকগুলি পৌরতন্ত্রের সমবায়। লাটিন জাতি ছিল কতকগুলি লাটিন নগরের সমবায়। সেইরূপ, ইটুস্কান Etruscan জাতি, সাম্নাইট (Samnite) জাতি, সেবাইন (Sabine) জাতি, বৃহত্তর গ্রীসের (Graecia Magna) অধিবাসী বৃন্দ, সকলের পক্ষেই ঐ এক বর্ণনা প্রযোজ্য।

তখন সহরের বাহিরে দেশ বলিয়া কোন ব্যাপার ছিল না। অবশ্য ভূমি ছিল, এবং ভূমিতে চাষআবাদও হইত, কিন্তু এখনকার মত পল্লীজনপদ ছিল না, পল্লীসমাজ ছিল না। ভূম্যধিকারীগণ নগরবাসী ছিলেন। তাঁহারা মাঝে মাঝে স্ব স্ব ভূমি সম্পত্তি পরিদর্শন করিতে

বাহির হইতেন, এবং সঙ্গে কতকগুলি ক্রীতদাস লইয়া যাইতেন। কিন্তু আমরা এখন পল্লীভূমি বলিতে যাহা বুঝি—অর্থাৎ সমস্ত দেশ জুড়িয়া একটি গ্রাম বা পল্লীর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকসমষ্টির বাস, এ ব্যাপার প্রাচীন ইটালীতে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। রোমীয় রাষ্ট্র যখন ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িল, তখন সে কি করিল? ইতিহাস অনুধাবন করিয়া দেখ, দেখিবে সে হয় নূতন নূতন নগর জয় করিয়া লইল, না হয় নূতন নূতন নগর প্রতিষ্ঠা করিল। বিভিন্ন নগরের সহিতই সে যুদ্ধ করিয়াছে, বিভিন্ন নগরের সহিতই সে মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে; এবং বিভিন্ন নগরেই সে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে; রোমের জগদ্বিজয়ের ইতিহাস নগরবিজয় ও নগরপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস। প্রাচ্যদেশে অবশ্য রোমের সাম্রাজ্যবিস্তার ঠিক একেবারে এই প্রণালীতে সম্পন্ন হয় নাই। সেখানে জনসংঘ ইউরোপীয় জনসংঘের ভিন্ন ভিন্ন নগরচক্রে ঝাঁক বাঁধিয়া থাকিত না। কিন্তু আমরা যখন কেবল এখানে ইউরোপীয় লোকসমষ্টির কথাই আলোচনা করিতেছি, তখন প্রাচ্যদেশে কি ঘটিয়াছিল তাহা লইয়া আমাদের কোনও প্রয়োজন নাই।

প্রতীচ্য ভূভাগের সর্ব্বত্রই কিন্তু আমরা পূর্ব্বোক্ত তথ্যের নিদর্শন প্রাপ্ত হই। গলে (Gaul) বলুন, স্পেনে (Spain) বলুন, আমরা কেবল সহরের কথাই শুনিতে পাই। সহরের বাহিরে একটু দূরে যাইলেই সমগ্র দেশ জলা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। রোমীয় স্থাপত্য কীর্ত্তি, রোমের রাজপথগুলির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করুন। দেখিবেন কতকগুলি বড় বড় রাজপথ নগর হইতে নগরান্তরে গিয়া পৌঁছিয়াছে। আজকাল পল্লীখণ্ডে যেমন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথ পরস্পরকে কাটিয়া সমস্ত দেশময় ছড়াইয়া রহিয়াছে, তখন তাহা দেখা যাইত না। মধ্যযুগ হইতে এপর্য্যন্ত দেশের সর্ব্বত্র যে অগণিত গ্রাম, পল্লী আবাস, উপাসনামন্দির ছড়াইয়া গিয়াছে, রোমীয় যুগে তাহার কিছুই ছিল না। রোম কেবল আমাদিগের জন্য কতকগুলি বিপুল পৌরকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে। রোমীয় স্থাপত্যকীর্ত্তিমাত্রই পৌরকীর্ত্তি, বহুলোকসমষ্টির উপভোগের জন্য সংগঠিত হইয়াছিল। রোমীয় জগতের যে দিক দিয়াই আলোচনা করুন দেখিবেন সেই নগরপ্রাধান্য, সেই পৌর আদর্শের একাধিপত্য এবং সামাজিক হিসাবে পল্লীভূখণ্ডের অস্তিত্বাভাব।

রোমীয় জগতের এই পৌরপ্রকৃতির দরুণ রাষ্ট্রীয় বন্ধনের একতা সম্পাদন এবং একতা সংরক্ষণ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হইয়াছিল; রোমের মত একটি পৌর রাষ্ট্রের পক্ষে জগৎ বিজয় করা যত সহজ হইয়াছিল, বিজিত জগৎ শাসন করা ও তন্মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করা তদপেক্ষা অনেক বেশী কঠিন হইয়াছিল। তাই যেমনি রাষ্ট্রবিস্তার কার্য্য সম্পূর্ণ হইল, সমগ্র প্রতীচ্যখণ্ড ও প্রাচ্যখণ্ডের অনেকখানি রোমীয় শাসনের অধীন হইয়া পড়িল, অমনি সাম্রাজ্যভুক্ত সেই ছোট বড় সংখ্যাতীত পৌর রাষ্ট্রগুলি (যাহারা নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যের জন্য, স্বাধীনতার জন্যই গঠিত হইয়াছিল,) চারিদিকে বিযুক্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। কাজেই এমন একটি শাসনতন্ত্রের আবশ্যক হইয়া পড়িল, যাহাতে নানা বিচ্ছিন্ন উপাদান একত্র বাঁধিয়া রাখিতে পারে, নানা বিকীর্ণ শক্তিপুঞ্জ এক কেন্দ্র হইতে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইতে পারে। সাম্রাজ্যতন্ত্র যে রোমের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িল, ইহাই হইল তাহার অন্যতম কারণ।

সাম্রাজ্যতন্ত্র এই বিচ্ছিন্ন বিকীর্ণ সমাজের মধ্যে একতা ও সংযোগ সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিছুদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্যও হইয়াছিল। অগষ্টস্ ও ডাইওক্লিশিয়ানের রাজত্বের অন্তর্বর্ত্তী কালেই, পৌরব্যবস্থা প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গেই রোমীয় জগৎ ব্যাপিয়া একটি সুবিশাল ঐককেন্দ্রিক শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। সমগ্র সাম্রাজ্য জালের মত ঘিরিয়া কতকগুলি ক্রমপরম্পরাবিন্যস্ত পরস্পরসম্বদ্ধ, সাম্রাজ্যকেন্দ্রের সহিত দৃঢ়শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজপুরুষ বসান হইল। তাহাদের একমাত্র কাজ হইল সমাজের মধ্যে রাজশক্তির ইচ্ছাকে ফলবতী করা, সমাজের উদ্যম, সমাজের সম্পদ্ রাজশক্তির হস্তে তুলিয়া দেওয়া।

এই ব্যবস্থা যে শুধু রোমীয় জগতের নানা বিচ্ছিন্ন শক্তি, নানা বিচিত্র উপাদান একত্র করিয়া ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহা নয়, উপরন্তু জনসাধারণের মনে অতি সহজে ও অনায়াসেই স্বেচ্ছাতন্ত্র ও কেন্দ্রশক্তির ভাব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই ক্ষীণসূত্রে মিলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে, এই পৌররাষ্ট্রসমষ্টির মধ্যে কেমন করিয়া যে এত শীঘ্র পূতগরিমমণ্ডিত একমাত্র সম্রাট্ মহিমার প্রতি এমন একটা অচলা ভক্তি প্রতিষ্ঠালাভ করিল, তাহা বিস্ময়ের ব্যাপার। রোমীয় জগতের নানা বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্যে একটা একতাবন্ধন আনার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই খুব প্রবলভাবে অনুভূত হইয়াছিল, নচেৎ কেমন করিয়া এত সহজে এই স্বেচ্ছাতন্ত্রনীতি জনবৃন্দের বিশ্বাস শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইল?

জন সাধারণের এই বিশ্বাসের সাহায্যে, প্রকাণ্ড একটা জালের মত বিস্তৃত এই শাসনযন্ত্রের সাহায্যে এবং তৎসহযোগী সামরিক ব্যবস্থার সাহায্যে, রোমীয় সাম্রাজ্য আভ্যন্তরীণ প্রলয়ের বিরুদ্ধে এবং বাহির হইতে বর্ব্বর-আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে লাগিল। এইরূপে সে অনেকদিন ধরিয়া, জরাগ্রস্ত হইয়াও, লড়াই করিয়া করিয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু এমনি একটা মুহূর্ত্ত আসিল যখন আর লড়াই করা চলিল না, প্রলয়শক্তিরই জয় হইল। স্বেচ্ছাতন্ত্রনীতির শাসনকৌশল, দাসভাবাপন্ন প্রজাবৃন্দের ঔদাসীন্য, কিছুতেই আর এই বিপুলকায় শাসনযন্ত্রটিকে টিকাইয়া রাখিতে পারিলনা। চতুর্থ শতাব্দীতে সর্ব্বত্রই রোমীয় সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন বিখণ্ডিত হইয়া পড়িল। বর্ব্বরগণ চারিদিক হইতে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িল। বিজিত প্রদেশগুলি আর কোন বাধা দিল না; তাহারা সাম্রাজ্যের ভাগ্যে কি হইল সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া নিশ্চেষ্ট রহিল। এই সময়ে, কোন কোন সম্রাটের মনে এক নূতন কল্পনার উদ্রেক হইল। তাঁহারা একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে চাহিলেন যে স্বেচ্ছাতন্ত্র শাসন-প্রণালী অপেক্ষা জনসাধারণকে স্বাধীনতার আশ্বাস দিয়া রোমীয় সাম্রাজ্যের একত্বরক্ষা করার বেশী সুবিধা হয় কিনা। অর্থাৎ আজকাল যেমন রাষ্ট্রভুক্ত বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধি সঙ্ঘের দ্বারাই শাসন কার্য্য পরিচালিত হয়, সেই রূপ কোন একটা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়া দেখিতে চাহিলেন। ৪১৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ হনোরিয়স (Honorius) ও কনিষ্ঠ থিওডোসিয়স্ গল-প্রদেশের (Gaul) শাসন কর্ত্তা এগ্রিকোলার নিকট একটি আদেশ পত্র পাঠাইয়াছিলেন। এই পত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য গলপ্রদেশের দক্ষিণাংশে একপ্রকার জনপ্রতিনিধিচালিত শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা; এবং ইহার সাহায্যে সাম্রাজ্যের একত্ব বজায় রাখা। নিম্নে এই আদেশপত্রের মর্ম্ম প্রদত্ত হইল :—

"আপনি যে সন্তোষজনক মন্তব্য দিয়াছেন তদনুসারে নিম্নোক্ত আদেশগুলি আইনস্বরূপ জারী করিতেছি। আপনার শাসনভুক্ত সাতটি প্রদেশ এই আইনের দ্বারা বাধ্য থাকিবে। আইন গুলি এমন যে তাহারা নিজেরাই এরূপ বিধি আকাঙ্খা ও প্রার্থনা করিতে পারিত। দেখা যায় যে প্রত্যেক প্রদেশ হইতে, এমন কি প্রত্যেক নগর হইতে অনেক কর্ম্মচারী অথবা বিশেষ বিশেষ প্রতিনিধি, হিসাব নিকাশ দিবার জন্য অথবা ভূম্যধিকারিবর্গের স্বার্থ সম্পর্কিত নানা বিষয়ে আপনার সহিত আলোচনা করিবার জন্য অনেক সময় আসিয়া উপস্থিত হন। আমরা স্থির করিয়াছি এবৎসর হইতে বৎসরে একবার করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজধানী আর্ল্ (Arles) নগরে উপরোক্ত সাতটি প্রদেশের অধিবাসিবর্গের একটি সম্মিলন আহ্বান করিলে অনেক উপকার হয় এবং ব্যবস্থাটী সময়োচিত হয়। এই ব্যবস্থায় আমরা সাধারণের স্বার্থ ও বিশেষ বিশেষ পক্ষের স্বার্থ উভয় দিকেই সমান দৃষ্টি দিয়াছি। প্রথমতঃ শাসনকর্ত্তার সম্মুখে দেশের প্রধান প্রধান অধিবাসীবর্গের একত্র সম্মিলনের দরুণ প্রত্যেক আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে যথাযথ তথ্য পাওয়া যাইবে। এই সম্মিলনে যাহা কিছু আলোচনা বা মীমাংসা হইবে, তাহা বিভিন্ন প্রদেশে কাহারও অবিদিত থাকিবে না। এবং যাঁহারা ঐ সম্মিলনে উপস্থিত হইতে পারিবেন না তাঁহারাও সম্মিলনপ্রণীত ন্যায়বিধি দ্বারা বাধ্য থাকিবেন। উপরন্তু আর্ল্ নগরে এই বার্ষিক সম্মিলনের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া আমরা এমন একটী ব্যবস্থা করিলাম যাহাতে সাধারণেরও লাভ হয় এবং সামাজিকতারও বৃদ্ধি ও প্রসার হয়। বাস্তবিক পক্ষে, নগরটি এমন সুন্দর ভাবে অবস্থিত যে দলে দলে বিদেশীগণ এখানে সমাগত হয়, এবং অন্যান্য স্থানে যাহা কিছু উৎপন্ন বা প্রস্তুত হয়, সমস্তই এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। কি বিপুলঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত প্রাচ্যখণ্ড, কি সুগন্ধবিস্তারী আরবমরু, কি সূক্ষ্মকারুকুশল আসীরিয়া, কি উর্ব্বর আফ্রিকা, কি সুন্দর স্পেন, কি বীরপ্রসূ গল্—যেখানে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা এই আর্লনগরীতে এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় যে সেগুলিকে এইখানকার ক্ষেত্রেই উৎপন্ন বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ রোন্ নদীর সহিত টস্কান্ সমুদ্রের যোগ থাকায় উভয়ের তীরবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশই পরস্পরের প্রতিবেশীস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। অতএব যখন সমগ্র পৃথিবী আপনার শ্রেষ্ঠদ্রব্য সম্ভার আনিয়া এই নগরের চরণে ঢালিয়া দিতেছে, যখন সকল দেশের বিশেষ বিশেষ দ্রব্যসামগ্রী স্থলপথে, সমুদ্রপথে, নদীপথে, পালের সাহায্যে, দাঁড়ের সাহায্যে, শকটের সাহায্যে এই নগরে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, তখন এরূপ ভোগসমৃদ্ধিশালী, বাণিজ্যকুশল ভগবচ্চিহ্নিত নগরে এই জনসম্মিলন আহ্বান করিবার জন্য এই যে আদেশ দিতেছি, ইহাতে গল্ মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল কিরূপে দেখিতে পায়?

পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তা পেট্রোনিয়স্ সাধুউদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া পূর্ব্বে আদেশ করিয়াছিলেন যে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হউক। কিন্তু মধ্যবর্ত্তীকালের বিপ্লব ও অনধিকারীগণ কর্ত্তৃক রাজ্যাধিকারের দরুণ প্রথাটি উঠিয়া যাওয়ায় আমরা ইহাকে পুনরায় নূতন উদ্যমের সহিত উজ্জীবিত করিতে সংকল্প করিয়াছি। অতএব হে প্রিয় ভ্রাতঃ এগ্রিকোলা, আপনি এই আদেশ অনুসারে, এবং আপনার পূর্ব্ববর্ত্তীগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথা অনুসারে, আপনার শাসনাধীন প্রদেশ সমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত নিয়মগুলি পালন করাইবেন।

যাবতীয় রাজকর্ম্মাধিকারী, পৌরকর্ম্মাধিকারী, ভূম্যধিকারী এবং বিভিন্ন প্রদেশের বিচারাধিকারী সকলকে বিদিত করা যাইতেছে যে প্রতি বৎসর অগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে তাঁহারা আর্ল নগরীতে সম্মিলিত হইয়া অধিবেশন করিবেন। অধিবেশনের তারিখ তাঁহারা ইচ্ছামত ধার্য্য করিবেন।

নোবেম্ পপুলিনিয়া ও দ্বিতীয় আকুইতেন এই দুই সুদূরবর্ত্তী প্রদেশের বিচারক বর্গ অত্যাবশ্যক কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে, যথারীতি প্রতিনিধি পাঠাইতে পারেন।

যাহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে অবহেলা করিবেন, তাঁহারা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। বিচারকদিগের পক্ষে এই অর্থদণ্ডের পরিমাণ পাঁচ সুবর্ণ মুদ্রা এবং পৌর সংঘের (Curia) পরিষদদিগের ও অন্যান্য উচ্চপদধারী ব্যক্তিদিগের পক্ষে তিন সুবর্ণ মুদ্রা হইবে।

আমরা এই উপায়ে বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীবর্গের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে চাই। আমাদের ইহাও স্থির বিশ্বাস যে এই উপায়ে আর্ল নগরীও শ্রীসমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিবে।

রাজাজ্ঞা যথানিয়মে প্রচারিত হইল বটে, কিন্তু যাহাদের উপকারের জন্য এই ব্যবস্থা সেই প্রদেশ ও সেই নগরগুলি কিন্তু এ দান গ্রহণ করিল না। কেহই প্রতিনিধি পাঠায় না, কেহই আর্ল যাইতে প্রস্তুত নয়। সেই আদিম অনভিব্যক্ত সমাজের পক্ষে এই সর্ব্বজনীন কেন্দ্রীকরণ একীকরণের আদর্শ সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল। স্থানীয় ভাব পৌর ভাব, সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ বদান্যতার ভাব পুনরায় জাগিয়া উঠিল, সুতরাং একটা সার্ব্বজনীন রাষ্ট্রীয় সমাজ বা দেশ বলিতে আমরা এখন যাহা বুঝি, তাহা পুনরায় গড়িয়া তোলা অসম্ভব বলিয়া প্রমাণিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন নগর আপন আপন প্রাচীন বেষ্টনের মধ্যে নিজকে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিল। এবং সাম্রাজ্যের পতন হইল, কারণ কেহই নিজকে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অঙ্গস্বরূপ বিবেচনা করিতে চাহিল না, পৌর জনবর্গ কেবল আপন আপন পুরীর অঙ্গ হইয়া থাকিতে চাহিল। অতএব রোমীয় সাম্রাজ্যের শৈশবে যেরূপ, পতনকালেও সেইরূপ পৌরভাব ও পৌর আদর্শের প্রাধান্য দেখিতে পাই। রোমীয় জগৎ পুনরায় তাহার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিল। পুরসমষ্টি লইয়াই এই জগদ্ব্যাপী সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছিল; সাম্রাজ্যের পতন হইল, কিন্তু পৌররাষ্ট্রগুলি রহিয়া গেল।

প্রাচীন রোমীয় সভ্যতা আমাদিগকে এই পৌরতন্ত্রপদ্ধতি দান করিয়া গিয়াছে। অবশ্য রোমীয় সভ্যতার অবসান যুগে এই পদ্ধতির অনেক অবনতি ঘটিয়াছিল; কিন্তু তথাপি রোমীয় জগতের যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যাবতীয় উপাদানের বিলয় প্রাপ্তির পর ইহাই একমাত্র যথার্থ, একমাত্র সুগঠিত প্রতিষ্ঠান, যাহা টিকিয়া গেল।

একমাত্র বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে। কারণ আরও একটি বস্তু, আরও একটি আদর্শ সঙ্গে সঙ্গে টিকিয়া গেল। সেটি হইল সাম্রাজ্যের কল্পনা, সম্রাট্ নামের মোহিনী শক্তি, এক দেবমহিমামণ্ডিত স্বেচ্ছাতন্ত্র বিশ্ববিজয়ী সম্রাট্‌শক্তির আদর্শ।

এই দুইটি বস্তু রোমীয় সভ্যতা ইউরোপীয় সভ্যতাকে দান করিয়া গেল—একদিকে

পৌররাষ্ট্রতন্ত্র এবং তাহার আনুষঙ্গিক রীতি নীতি প্রথা ও স্বাতন্ত্র্যনীতি; অন্যদিকে এক বিশ্বব্যাপী একাকার ব্যবহারবিধিসমষ্টি, স্বেচ্ছাতন্ত্র শক্তির আদর্শ, দৈবমহিমান্বিত রাজশক্তির আদর্শ, সাম্রাজ্যের আদর্শ, শৃঙ্খলাবন্ধন ও বশীকরণ নীতি।

কিন্তু ঐ সময়েই রোমীয় সমাজের মর্ম্মস্থলেই আর এক প্রকার সমাজ গড়িয়া উঠিল। এ সমাজের প্রকৃতি ও মূলনীতি অন্যরূপ। ইহা এক সম্পূর্ণ নূতন ভাবসমষ্টির দ্বারা সঞ্জীবিত। আমি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সংঘের বা চর্চ্চের কথা বলিতেছি। মনে রাখিবেন আমি খৃষ্টধর্ম্মের কথা বলিতেছি না, খৃষ্টীয় চর্চ্চের কথা বলিতেছি, খৃষ্টীয় সমাজের ধর্ম্মশাসনপ্রতিষ্ঠানের কথা বলিতেছি। চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে ও পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে খৃষ্টধর্ম্ম আর কেবল ভিন্ন ভিন্ন লোকের ব্যক্তিগত মত বা বিশ্বাসের বিষয় ছিল না, ইহা তখন একটি সুনিয়ন্ত্রিত সুব্যবস্থিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে ইহা তখন গঠনপ্রাপ্ত হইয়াছে—শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে; ইহার তখন একটা ধর্ম্মশাসনপদ্ধতি দাঁড়াইয়াছে, যাজকসংঘ গঠিত হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মকার্য্যের জন্য যাজকবৃন্দের ক্রমবন্ধন ও শ্রেণীবিন্যাস হইয়াছে, আর্থিক আয় সংস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে, স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিবার নানা উপায় আয়ত্ত হইয়াছে, প্রাদেশিক সঙ্গীতি, জাতীয় সঙ্গীতি, সাধারণ মহাসঙ্গীতি প্রভৃতি বিরাট সমাজবন্ধনের উপযোগী মিলনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবং সাধারণ সংসদে বিচার বিতর্ক করিবার পদ্ধতি, সংসদে বসিয়া দশজনে মিলিয়া সমাজসম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা করিবার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এক কথায়, খ্রীষ্টধর্ম্ম এযুগে শুধু একটা ধর্ম্মমাত্র নয়, একটা চর্চ্চ অর্থাৎ ধর্ম্ম সমাজে পরিণত হইয়াছে।

খৃষ্ট ধর্ম্ম যদি এই চর্চ্চের আকার প্রাপ্ত না হইত, বলিতে পারিনা তাহা হইলে রোমীয় সাম্রাজ্যের অধঃপতনের মধ্যে ইহার কি দশা হইত। আমি এখানে কেবল সহজমানববুদ্ধিগোচর বিচারে প্রবৃত্ত। স্বাভাবিক ঘটনার স্বাভাবিক পরিণতিপ্রণালীর বাহিরে যাহা কিছু সে সব ব্যাপার আদৌ স্পর্শ না করিয়া আমি বিচার করিতেছি। খৃষ্টধর্ম্ম যদি পূর্ব্ব পূর্ব্বযুগের মত কেবল একটা মত বা বিশ্বাস বা ভাবসমষ্টিরূপেই থাকিত, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস ইহা রোম সাম্রাজ্যের বিলয় ও বিদেশী বর্ব্বরদিগের আক্রমণকালে সেই মহাবিপ্লবের মধ্যে কোথায় তলাইয়া যাইত। পরবর্ত্তীযুগে এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় এইরূপই এক বহিঃশত্রুর আক্রমণের ফলে ইহার রসাতল প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। সেই মুসলমান আক্রমণকালে সুগঠিত সুনিয়ন্ত্রিত চর্চ্চ-আকারে সংহত থাকা সত্ত্বেও খৃষ্টধর্ম্ম আত্মরক্ষণ করিতে পারে নাই। সুতরাং রোমসাম্রাজ্যের অধঃপতনকালে ঐরূপ ঘটিবার সমধিক সম্ভাবনা ছিল। সে সময়ে এমন কোন উপায় ছিল না যাহার সাহায্যে আজকাল প্রতিষ্ঠানের সাহায্যব্যতিরেকেও নৈতিক ও আধ্যাত্মিকশক্তি সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করে, বিরুদ্ধশক্তিকে বাধাপ্রদান করে; এমন কোন উপায় ছিল না যদ্দ্বারা কোন বিশুদ্ধ সত্য বা বিশুদ্ধ আদর্শ মানবসাধারণের মানসরাজ্যে অধিকার বিস্তার করে, মানুষের কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করে, ঘটনা পরম্পরার স্রোত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। চতুর্থ শতাব্দীতে এমন কিছুই ছিল না যাহাতে ব্যক্তিগত ভাব, ব্যক্তিগত চিন্তা এরূপ প্রভাবশালী হইয়া উঠিতে পারে। ইহা সুস্পষ্ট যে এমন একটা প্রলয় বিপ্লবের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিবার পক্ষে একটা প্রবল সুসম্বদ্ধ সুনিয়ন্ত্রিত সমাজের একান্ত আবশ্যক ছিল।

আমার বোধ হয় যদি বলা যায় যে চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে ও পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে খৃষ্টীয় চর্চ্চ্ই খৃষ্টধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছিল তাহা হইলে কিছু মাত্র অত্যুক্তি হইবে না। রোম-সাম্রাজ্যের অন্তিমকালে ও বর্ব্বর-অধিকারের আদিমযুগে ইউরোপীয় সমাজের ভিতরে ভিতরে যে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল সেই ভাঙ্গনের বিরুদ্ধে এক চর্চ্চ্ই তাহার ব্যবস্থান প্রতিষ্ঠান লইয়া, তাহার ধর্ম্মশাসকবৃন্দ লইয়া, তাহার বিরাট শক্তি লইয়া সমাজকে টিকাইয়া রাখিয়াছিল ; এবং বিদেশী বর্ব্বরদিগকে আয়ত্তাধীন করিয়া মধ্যস্থস্বরূপ রোমীয়জগৎ ও বর্ব্বরজগতের মধ্যে একতাস্থাপন করত: পরস্পরের মধ্যে শিক্ষাসভ্যতার আদান প্রদানের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। অতএব, খৃষ্টধর্ম্ম তখন হইতে আধুনিক সভ্যতাকে কি কি দান করিল, কি কি নূতন উপাদান আনিয়া দিল, তাহা আবিষ্কার করিতে হইলে, খৃষ্টধর্ম্মের দিকে তত লক্ষ্য না করিয়া, এই খৃষ্টীয় চর্চ্চের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সে সময়ে খৃষ্টীয় চর্চ্চের স্বরূপ ও প্রকৃতি কিরূপ ছিল ? (ক্রমশঃ)

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

ইরোকোআদের গোষ্ঠী প্রথা

(জার্ম্মাণ সমাজতত্ত্ববিৎ এঙ্গেলসপ্রণীত গ্রন্থের এক অধ্যায়)

কুটুম্ববাচক শব্দ ও আত্মীয়তার সম্বন্ধ আলোচনা করিতে করিতে ইয়াঙ্কি পণ্ডিত মর্গান সাবেক কালের পারিবারিক প্রথাগুলা আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। এই ধরণেরই আর এক আবিষ্কারের জন্য মর্গ্যান নৃতত্ত্ববিদ্যার আসরে নাম করিয়াছেন। মানব সমাজে সুপ্রচলিত গোষ্ঠী বা জ্ঞাতিপ্রথা সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্তগুলা এই দ্বিতীয় আবিষ্কারের অন্তর্গত।

আমেরিকার ইণ্ডিয়ান সমাজে যৌন কেন্দ্রগুলা এক একটা জানোআরের নামে অভিহিত হয়। এইগুলা মর্গ্যানের মতে গ্রীকদের "গেনেআ" এবং রোমাণদের "গেনেস" হইতে অভিন্ন। ইণ্ডিয়ানরূপগুলাই গ্রীকরোমাণরূপ অপেক্ষা পুরাণা। গ্রীক রোমাণ প্রথা ইণ্ডিয়ান হইতে উদ্ভূত। প্রাচীন গ্রীসে এবং রোমে সমাজ "গেনস্" "ফ্রাত্রী" এবং জাতি এই তিন স্তরে পর পর সাজানো ছিল। ইণ্ডিয়ান সমাজের স্তরবিন্যাসও অবিকল এইরূপ। মর্গ্যান আরও বলেন যে উৎকর্ষের যুগে পদার্পণ করা পর্য্যন্ত দুনিয়ার সকল "বার্ব্বার" জাতিই "গেনস্" প্রথার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

এই আবিষ্কার সাধিত হইবামাত্র প্রাচীন গ্রীস ও রোমের বহু কঠিন ও জটিল প্রশ্ন বুঝিতে সাহায্য হইয়াছে। অধিকন্তু খাঁটি রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবার পূর্ব্বে আদিম মানব কোন পথে কি উপায়ে বিকাশ লাভ করিয়াছিল সেই বিষয়েও ধারণা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে।

ইংরেজ নৃতত্ত্ববিদেরা এত দিন প্রাচীন সমাজ সম্বন্ধে "গা-জুরি" করিয়া যে সে মত বাজারে চালাইতেছিলেন। মর্গ্যানের সিদ্ধান্তে সেই সব এক নিমেষে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দেও মর্গ্যান তাঁহার আবিষ্কারগুলা প্রচার করিতে পারেন নাই। তাহার পর তিনি যে সব গবেষণা করিয়াছেন তাহার দ্বারাই সমাজবিজ্ঞানের রাজ্যে একটা যুগান্তর সাধিত হইয়াছে।

মর্গ্যান "গেন্স্" নামক ল্যাটিন শব্দ ব্যবহার করিয়া ইণ্ডিয়ানদের যৌন বা বিবাহ-কেন্দ্র বিবৃত করিয়াছেন। গ্রীক "গেনোস্" এবং ল্যাটিন গেন্স্ আর্য্য ধাতু গণ (জন) হইতে উৎপন্ন। গন (জন) ধাতুর অর্থ উৎপন্ন করা। গেনোস্, গেন্স্, সংস্কৃত "জন", গথিক "কুনি", প্রাচীন নর্স এবং অ্যাংলো স্যাকসন্ "কিন", ইংরেজি "কিন', মিড্ল হাই জার্ম্মান "কিয়েন্নে' এই সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি একরূপ। প্রত্যেক শব্দেই উৎপত্তি, বংশ ইত্যাদি বুঝায়। ল্যাটিন এবং গ্রীকশব্দের দ্বারা বিশেষভাবে এইরূপ এক যৌনকেন্দ্র বুঝান হইত যাহার লোকেরা কোনো এক পূর্ব্বপুরুষের সন্তান বলিয়া নিজকে গৌরবান্বিত বিবেচনা করিত। এই কেন্দ্রের নর নারীরা কতকগুলা ধর্ম্ম ও সামাজিক রীতি নীতি পালন করিয়া অন্যান্য কেন্দ্রের লোকজন হইতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে যত্ন লইত। গেন্স্ এবং গেনোসের উৎপত্তি তত্ত্ব এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে মর্গ্যানের পূর্ব্বে ঐতিহাসিকেরা এক প্রকার অজ্ঞ ছিলেন। গেন্স্‌কে জাতি বা গোষ্ঠী ধরিয়া লইতেছি।

পুনালুয়া প্রথার পরিবার আলোচনা করিলে গেন্স্ সম্বন্ধে কতকগুলা মূলতথ্য পাওয়া যায়। এই প্রথায় পুনালুয়া অর্থাৎ নিকট আত্মীয়দের ভিতর পরস্পর বিবাহ চলিত। পুনালুয়ারা আপন মায়ের পেটের ভাই বোন নয়, নিকট আত্মীয় মাত্র। তখন ভাইয়ে বোনে বিবাহ নিষিদ্ধ।

সেই অবস্থায় বাপের নাম জানা ছিল না। মায়ের নামে চলিত পরিবার এবং বংশলতিকা। কোন জননীর বংশধরহিসাবে যে সকল নরনারী এক কেন্দ্র গড়িয়া তুলিত, তাহারাই হইত গেনসের লোক। মেয়েদের জন্য স্বামী আসিত অন্যান্য কেন্দ্র হইতে। কাজেই পৌত্র পৌত্রীরা গেন্সের লোক বিবেচিত হইত না। ইহারা অন্যান্য গেন্সের লোক। কিন্তু মেয়েদের সন্তানেরা নিজ গেন্সেরই ব্যক্তি বিবেচিত হইত।

(১) গোষ্ঠী শাসন

ইরোকোআ সমাজের সেনেকাজাতি আট গোষ্ঠী বা জাতিকেন্দ্রে বিভক্ত। প্রত্যেকের নাম আলাদা। জানোআরহিসাবে নামকরণ হয়। প্রথম জাতিকেন্দ্রের নাম নেকড়ে বাঘ, দ্বিতীয়ের নাম ভল্লুক, তৃতীয়ের নাম কচ্ছপ, চতুর্থের নাম বীভার (চতুষ্পদ উভচর জীব। ইঁদুর জাতীয় জন্তু পায়ী। এ জানোআরের লোম পাশ্চাত্যেরা পোষাকে ব্যবহার করে।) অপর চারটা জানোআর বা গোষ্ঠীর নাম হরিন, স্নাইপ (লম্বা ঠোঁট ওয়ালা জলাশয় চারী পাখী) হেরণ (পাখী) এবং বাজ (পাখী)। প্রত্যেক গোষ্ঠিরই কতকগুলা স্বধর্ম্ম আছে।

প্রথমতঃ শান্তির সময় গোষ্ঠী কর্ত্তৃক "সাখেম" (নায়ক) বাছাই করা করা হয়। লড়াইয়ের সময়ও এক স্বতন্ত্র নেতা নির্ব্বাচিত হয়। সাখেম গোষ্ঠীরই একজন। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে এই পদ একপ্রকার বংশানুক্রমিক। কিন্তু লড়াইয়ের নায়ক

গোষ্ঠীর বাহির হইতে নির্ব্বাচিত করা সম্ভব। এই পদে অনেক সময় কোনো লোক বাহাল না থাকিলেও চলে, কিন্তু সাখেমের পদ কখনই খালি থাকিতে পারে না।

সাখেম বংশানুক্রমেই নির্ব্বাচিত হয় বটে। কিন্তু পুত্র তাহার পিতার গদিতে বসিতে পায় না। কেননা পুত্র তাহার জননীর গোষ্ঠির লোক। জননীবিধির নিয়মে ভাই কিম্বা ভাগ্নেই উত্তরাধিকারী।

মেয়ে পুরুষ উভয়েই সাখেম বাছাইয়ে ভোট দেয়। কিন্তু কোনো এক গোষ্ঠী একাকী তাহার গোষ্ঠী নায়ক নির্ব্বাচনে অধিকারী নয়। অপর সাত গোষ্ঠি মত দিলে তবে সাখেমের বাছাই ইরোকোআ ফেডারেশ্যন বা যুক্তরাষ্ট্রের বড় সভায় মঞ্জুর হয়।

সাখেমের একতিয়ার প্রধানতঃ নৈতিকধরনের। জোর জবরদস্তির কোনো সুযোগ তাঁহার তাঁবে নাই। সেনেকা জাতির সভায় তাঁহার ঠাঁই আছে। অধিকন্তু সর্ব্ব"জাতি" সমন্বিত গোটা ইরোকোআ রাষ্ট্রের ফেডারাল সভায়ও তাঁহার বসিবার ক্ষমতা আছে।

লড়াইয়ের নায়ক লড়াই ছাড়া অন্য কোনো অধিকার ভোগ করে না।

দ্বিতীয়তঃ, গোষ্ঠী যখন তখন খুসী অনুসারে দুই নায়ককেই বরখাস্ত করিতে পারে। মেয়ে পুরুষ উভয়েই একসঙ্গে এই বিষয় আলোচনা করে। বরখাস্ত হইবার পর ইহারা সমাজে অন্যান্য পুরুষের মতন মামুলি যোদ্ধা অথবা অন্য কিছু রূপে জীবন চালাইতে থাকে। আর এক কথা, নরনারীদের মতের বিরুদ্ধেও "জাতি" সভা অর্থাৎ আটগোষ্ঠী সমন্বিত সেনেকা পরিষৎ কোনো গোষ্ঠীর নায়কদিগকে বরখাস্ত করিতে অধিকারী।

তৃতীয়তঃ গোষ্ঠীর ভিতর পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ। এই নিষেধের বিধানই গোষ্ঠীর বন্ধন রজ্জু। নিয়মটা "নেতি"-মূলক বটে, কিন্তু এই "নিষেধাত্মক" নিয়মেই রক্ত সম্বন্ধের "অস্তিত্ব" সমাজের উপর তাহার ক্ষমতা দেখাইতেছে। ইহার জোরেই রক্তের টান অনুসারে জ্ঞাতি-কেন্দ্র গড়িয়া উঠে।

এই তথ্যটা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই মর্গ্যান যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে সাহেবজ এবং বর্ব্বর নরনারীদের বিবাহ প্রথা কোনো পর্য্যটক এবং গবেষকই বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা এই সকল সমাজের বিভিন্ন কেন্দ্র সম্বন্ধে অস্পষ্ট এবং গোঁজ-মিলপূর্ণ বৃত্তান্ত দিয়াগিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিলেন এই সকল সমাজের কেন্দ্রগুলার ভিতর পরস্পর বিবাহ হয় না। কিন্তু এই তথ্যের অর্থ বুঝা কঠিন। স্কটল্যাণ্ডের নৃতত্ত্ববিৎ ম্যাকলেনান নেপোলিয়ানি যথেচ্ছাচারের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন :—"জাতিগুলা দুই শ্রেণীর অন্তর্গত। এক শ্রেণীকে এক্‌সোগেমাস বলে। অর্থাৎ ইহার ভিতর পরস্পরবিবাহ নিষিদ্ধ। অপর শ্রেণীকে এণ্ডোগেমাস বলে। এখানে কেন্দ্রের ভিতরকার নরনারী বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়।"

এই ধরণের হ-য-ব-র-ল সৃষ্টি করিয়া ম্যাকলেনান আর এক অদ্ভুত আবিষ্কারে মাতিয়া গিয়াছিলেন। এক্‌সোগেমি (বা বহির্ব্বিবাহ) পুরাণা কি এণ্ডোগেমি (অর্থাৎ অন্তর্ব্বিবাহ) পুরাণা এই আলোচনায় তাঁহার দিন কাটিয়াছে। রক্তসংশ্রবের জোরে গোষ্ঠী কায়েম হয়, সুতরাং গোষ্ঠীর ভিতর নরনারীর বিবাহ অসম্ভব, মর্গ্যান যেই এই তথ্য আবিষ্কার করিলেন

তখনই ম্যাক্লেনানের অদ্ভুত মতগুলা চাপা পড়িয়া গেল। ইরোকোআদের ভিতর নিষেধ বিধানটা বেশ জারি।

চতুর্থতঃ, লোক মারা পড়িলে তাহাদের সম্পত্তি গোষ্ঠীর অন্যান্য ব্যক্তির হাতে আসে। গোষ্ঠীর বাহিরের কেহ এই ধনের উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। পুরুষের উত্তরাধিকারী হয় ভাই, বোন এবং মামারা। মেয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নিজ ছেলেপুলে এবং বোন, কিন্তু ভাইয়েরা নয়। স্বামীর ধনে স্ত্রীর অধিকার নাই, স্ত্রীর ধনেও স্বামীর অধিকার নাই। আবার ছেলেপুলেরা জনকের সম্পত্তি ভোগ করিতে অধিকারী নয়।

পঞ্চমতঃ, গোষ্ঠীর ব্যক্তিরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে বাধ্য, বিশেষতঃ কোনো বিদেশী যদি তাহাদের কোনো এক জনের লোকসান করে তাহা হইলে গোটা গোষ্ঠী প্রতিহিংসার ধর্ম্মে মাতিয়া উঠে। লোকসানমাত্রই গোষ্ঠীগত, ব্যক্তিগত নয়। গোটা ইরোকোআ সমাজে রক্তহিংসা সুপ্রচলিত। বিদেশীর হাতে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে গোষ্ঠী সেই বিদেশীর প্রাণ সংহার করিতে অধিকারী। যদি দোষী ব্যক্তির গোষ্ঠী আপোসে মাপ চায় অথবা ক্ষতিপূরণ করিতে রাজি হয়, তাহা হইলে কোনো কোনো সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠী তাহাতেই সুখী হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে শান্ত না হইলে গোষ্ঠী এক বা একাধিক লোক বাহাল করিয়া সেই দোষীকে যমালয়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করে। যদি দোষী এই উপায়ে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়, তবে তাহার গোষ্ঠী হইতে কোনো নালিশ চলিতে পারে না। খুনের সাজা খুন,—এই নীতি সকল গোষ্ঠীই মানিয়া থাকে।

ষষ্ঠতঃ, প্রত্যেক গোষ্ঠীরই কতকগুলা বাঁধা নাম আছে। এই নামকরণ একচেটিয়া। অর্থাৎ অন্যান্য গোষ্ঠীতে কোনো ব্যক্তি এই সকল নামে পরিচিত হইতে পারে না। কাজেই একটা নাম শুনিবামাত্র তাহার "গুষ্টির খবর" বলিয়া দেওয়া সম্ভব। নামের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলা দাবীদাওয়াও গোষ্ঠীগত।

সপ্তমতঃ, বিদেশীকে নিজের করিয়া লওয়া গোষ্ঠীর একতিয়ারের অন্তর্গত। একবার কোনো গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইলে বিদেশীরা গোটা জাতির লোকই বিবেচিত হয়। লড়াইয়ের বন্দী সকলকেই খুন করা হয় না। যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহারা এই প্রণালীতে গোষ্ঠীর পোষ্যপুত্রবিশেষ। এই ধরণের বহু পোষ্য সেনেকা জাতির অন্তর্গত হিসাবে গোষ্ঠীর একতিয়ার ভোগ করে। পোষ্যগ্রহণ করিবার জন্য গোষ্ঠীর কোনো লোককে বলিতে হয় ;—"আমি অমুককে ভাই বা বোন বলিয়া গ্রহণ করিলাম।" মেয়েরা পোষ্যগ্রহণ করিবার সময় বলে ;—"অমুক বিদেশী আজ হইতে আমার সন্তান।" পোষ্যগ্রহণ কাণ্ড একটা বড় গোছের ঘটাসমন্বিত উৎসববিশেষ। গোষ্ঠীতে লোক কমিতে থাকিলে এই উপায়েই লোকসংখ্যা বাড়ানো হইয়া থাকে। এক গোষ্ঠী হইতে অপর গোষ্ঠীতে পোষ্য লওয়ার রেওয়াজ অনেক দেখা গিয়াছে। ইরোকোআদের ভিতর জাতি সভার প্রকাশ্য বৈঠকে ধর্ম্মকর্ম্মের সহিত "পোষ্যযজ্ঞ" অনুষ্ঠিত হয়।

অষ্টমতঃ, ধর্ম্মকর্ম্ম নামে কতকগুলি স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান ইণ্ডিয়ান সমাজে দেখা যায় না। গোষ্ঠীর সংস্রবেই ইহাদের ধর্ম্মোৎসবজাতীয় সকল কাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষে

সাখেম এবং লড়াইনায়ক পুরোহিতের কাজ করে। ইহাদিগকে তখন ধর্ম্মরক্ষক বলা হয়। বৎসরে ছয়টা মহোৎসব ইরোকোআদের পঞ্জিকায় ঠাঁই পাইয়াছে।

নবমতঃ, প্রত্যেক গোষ্ঠীর এক একটা সার্ব্বজনিক কবরের ঠাঁই আছে। নিউইয়র্ক প্রদেশে শ্বেতাঙ্গ নরনারীরা ইরোকোআদের সকল জায়গাই অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কাজেই আজকাল আর ইহাদের স্বতন্ত্র গোরস্থান দেখা যায় না। কিন্তু পূর্ব্বে ছিল। ইরোকোআদের নিকটআত্মীয় তুস্কারোরা এবং অন্যান্য সমাজে আজও গোষ্ঠীগত সার্ব্বজনিক কবর দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল ইহারা খ্রীষ্টধর্ম্মে পরিণত। তথাপি গোরস্থানের ভিতর প্রত্যেক গোষ্ঠীর জন্য নিজ নিজ কবরের সারি নির্দ্দিষ্ট আছে। জননীকে তাহার সন্তান সন্ততির সারিতেই কবর দেওয়া হয়। কিন্তু জনকের ঠাঁই অন্যত্র। ইরোকোআ সমাজে গোটা গোষ্ঠী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সাহায্য করে।

দশমতঃ, প্রত্যেক গোষ্ঠীর একটা করিয়া সভা বা পরিষৎ থাকে। প্রবীণবয়সের যে কোনো পুরুষ এবং নারী এই সভায় বসিতে পারে। প্রত্যেকের অধিকারও সমান। সাখেম, লড়াই-নায়ক এবং ধর্ম্মরক্ষক তিনজাতীয় কর্ম্মচারী বাছাই করা গোষ্ঠী সভার কাজ। প্রতিহিংসা লওয়া এবং পোষ্যগ্রহণ করাও এই সভায় আলোচিত হয়। গোষ্ঠীর সকলকাজেই সভার কর্ত্তৃত্ব বিরাজমান।

এই দশ দফা হইতে বেশ বুঝা যায় কেন মর্গ্যান ইণ্ডিয়ান সমাজকে সাম্য, মৈত্রী এবং ভ্রাতৃত্বের আদর্শ দৃষ্টান্তস্থল বিবেচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি অপরের সমান। সাখেম ইত্যাদি নায়কেরাও কোনো বিষয়ে "হাতীঘোড়া" নয়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্বাধীনতার সহায় এবং সংরক্ষক।

গোষ্ঠী যখন এই রূপ ব্যক্তিত্ব এবং স্বাতন্ত্র্যের নিয়মে গঠিত, তখন গোষ্ঠী সমন্বিত "জাতি" এবং জাতি সমন্বিত "ফেডারেশ্যন" ও সাম্যমূলক গণতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা দেখাদিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? মর্গ্যান গোষ্ঠীর স্বধর্ম্মগুলা আলোচনা করিতে গিয়াই ইরোকোআ এবং অন্যান্য সমাজের "যুক্তরাষ্ট্রের" বনিয়াদ ধরিতে পারিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান সমাজের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এবং আত্মকর্ত্তৃত্বের গোড়ার কথা গোষ্ঠীর জীবন।

উত্তর আমেরিকা যে সময় ইয়োরোপের আবিষ্কারে আসে, তখন সেখানকার সকল অধিবাসীই জননীবিধির নিয়মে গোষ্ঠীর বিধানে নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল। কেবল মাত্র ডাকোটা সমাজে গোষ্ঠী প্রথা উঠিয়া গিয়াছিল। অধিকন্তু ওজিবাওয়া, ওমাহা এবং যুকাটানের মায়া সমাজে মেয়ের ঠাঁয়ে পুরুষের উত্তরাধিকার দেখা দিয়াছিল।

(২) ফ্রাত্রী

কোনো কোনো "জাতি" পাঁচ ছয় গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। ইহাদের তিন, চার বা পাঁচটায় মিলিয়া একটা সমাজকেন্দ্র গড়িয়া তুলিত। এই ধরণের গোষ্ঠী সমবায়কে মর্গ্যান প্রাচীন গ্রীক প্রথার অনুরূপ বিবেচনা করিয়াছেন। এই গোষ্ঠী সমবায়কে ইনি গ্রীক "ফ্রাত্রী" শব্দেই অভিহিতও করিয়াছেন। ইরোকোআদের সেনেকা জাতির আট গোষ্ঠী। এই আট গোষ্ঠি দুই ফ্রাত্রীর অন্তর্গত। প্রত্যেক ফ্রাত্রীতে চারটা করিয়া গোষ্ঠি ছিল।

এই ফ্রাত্রীগুলার উৎপত্তি হইল কি করিয়া? সাবেক কালে ফ্রাত্রী স্বয়ংই একটা সম্পূর্ণ জাতি বিবেচিত হইত। প্রত্যেক ফ্রাত্রীতে অন্ততঃ দুইটা করিয়া গোষ্ঠী থাকা আবশ্যক হইত কেননা তাহা না হইলে বিবাহের বরকন্যা জুটিত না। মনে রাখিতে হইবে যে গোষ্ঠীর ভিতর পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ

জাতিটা লোকসংখ্যায় বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীও দুই বা ততোধিক টুকরায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তখন এক একটা সাবেক গোষ্ঠী ফ্রাত্রীতে পরিণত হইত। ফ্রাত্রীর সঙ্গে গোষ্ঠীর রক্তসম্বন্ধ অতি নিকট।

সেনেকা এবং অন্যান্য ইণ্ডিয়ান সমাজে ফ্রাত্রীর অন্তর্গত গোষ্ঠীগুলা পরস্পর ভাই স্বরূপ। অপরাপর ফ্রাত্রীর গোষ্ঠীর সঙ্গে এই সব গোষ্ঠীর সম্বন্ধ খুড়তত ভাইয়ের মতন। এই কারণে প্রথম প্রথম সেনেকারা ফ্রাত্রীর ভিতর বিবাহের আদান প্রদান নিষিদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু পরে একমাত্র গোষ্ঠীর ভিতর এই নিষেধ আবদ্ধ করা হইয়াছে।

ভল্লুক এবং হরিণ এই দুই গোষ্ঠীকে সেনেকারা সর্ব্ব প্রাচীন বিবেচনা করে। ইহাদের লোকপরম্পরা অনুসারে অন্যান্য গোষ্ঠী এই দুই গোষ্ঠী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

গোষ্ঠীগুলা কোনো কোনো সময় "নির্ব্বংশ"ও হইয়াছে। তখন কোন ফ্রাত্রী হইতে একটা গোটা গোষ্ঠী আসিয়া তাহার ঠাঁই পূরণ করিয়াছে। এই কারণে গোষ্ঠীর নাম দেখিয়া অতি সহজে তাহার সঙ্গে ফ্রাত্রীগুলার এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর সম্বন্ধ বুঝা যায় না। সর্ব্বত্রই কিছু কিছু জটিলতা সৃষ্ট হইয়াছে।

ইরোকোআদের ফ্রাত্রীকে কোনো কোনো বিষয়ে সমাজকেন্দ্র বিবেচনা করিতে হইবে। ধর্ম্ম-কেন্দ্র রূপেও ইহার কাজকর্ম্ম লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য।

১। বল খেলার বেলায় ফ্রাত্রীতে ফ্রাত্রীতে টক্কর চলে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সেরা খেলোআড় পাঠায়। দুই দলের অন্যান্য লোকেরা দুই দিকে দাঁড়াইয়া নিজ নিজ খেলোআড়-দিগকে উৎসাহিত করে। খেলার উপর বাজিও চলে।

২। "জাতি"-সভায় প্রত্যেক ফ্রাত্রীর সাখেম এবং লড়াই-নায়কেরা পরস্পর উল্টাদিকে মুখামুখি হইয়া বসে। বক্তারা দুইদিকে ফিরিয়া দুই স্বতন্ত্র দলের সম্মুখে বক্তৃতা করিয়া থাকে।

৩। কোনো লোক খুন হইলে গোষ্ঠীর লোকেরা নিজ ফ্রাত্রীর অন্যান্য গোষ্ঠীর নিকট আবেদন করে। ফ্রাত্রী বৈঠক ডাকিয়া শলা করে। পরে খুনীর ফ্রাত্রীকে ক্ষতিপূরণের জন্য তলব করা হয়। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বাদানুবাদ চলে না। ফ্রাত্রীতে ফ্রাত্রীতে মামলা মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হয়। এই ক্ষেত্রে ফ্রাত্রীকে সাবেক কালের "জাতির" জেরই বিবেচনা করা উচিত।

৪। গোষ্ঠীভুক্ত কোনো নামজাদা লোক মারা পড়িলে নিজ ফ্রাত্রীর নর নারীরা শোকের ভার বহন করে মাত্র। কিন্তু কবর দেওয়া এবং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার অন্যান্য কাজের জন্য জাতির অপর ফ্রাত্রী দায়িত্ব গ্রহণ করে। সাখেমের মৃত্যু হইলে জাতিকে এবং ইরোকোআ যুক্তরাষ্ট্রের সভাকে খবর দেওয়ার ভারও এই অপর ফ্রাত্রীর হাতে।

৫। সাখেম নির্ব্বাচনের বেলায়ও একমাত্র নিজ ফ্রাত্রীর মতামতই চরম নয়। অপর ফ্রাত্রী আপত্তি করিলে বাছাই রদ হইতে পারে।

৬। ধর্ম্মকর্ম্মের কাণ্ডেও প্রত্যেক ফ্রাত্রী নিজস্ব রক্ষা করিয়া চলে। সেনেকো সমাজে ধর্ম্ম লইয়া কিছু কিছু গুহ্য কারবার আছে এই সকল কারবার দুই সমিতির অধীনে পরিচালিত। হয়। যে সে লোক এই সব সমিতিতে ঠাঁই পায় না। নানা প্রকার তুকমুকের চল আছে। তদনুসারে সভ্য বাছাই হয়। কিন্তু প্রত্যেক ফ্রাত্রী এক একটা সমিতির অধিকারী। সেনেকাদের আট গোষ্ঠীর দুই ফ্রাত্রীর জন্য দুই সমিতি আছে।

৭। লোস্কালার চার কোণে চার বংশ দিক রক্ষার ভার লইয়াছিল। শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় এই রীতি দেখা গিয়াছে। এই চার বংশকে যদি চার ফ্রাত্রী বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে গ্রীকসমাজের মতন ইণ্ডিয়ানসমাজেও ফ্রাত্রী ছিল সামরিক জীবনের কেন্দ্র। জার্ম্মাণ সমাজেও এই ধরণের সামরিক কেন্দ্র ছিল। প্রত্যেক বংশই নিজ পোষাকে সাজিয়া, নিজ নিশান লইয়া স্বতন্ত্র দলে লড়িতে যাইত। প্রত্যেকের নায়কও ছিল স্বতন্ত্র।

৩। জাতি

একাধিক গোষ্ঠীর মিলনে হয় ফ্রাত্রী। সেইরূপ একাধিক ফ্রাত্রীর সমবায়ে "ট্রাইব" বা জাতি গড়িয়া উঠে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে,—বিশেষতঃ যেখানে লোক সংখ্যা নেহাৎ কমিয়া আসিয়াছে,—মধ্যের কেন্দ্রটা অর্থাৎ ফ্রাত্রী আজকাল আর দেখা যায় না।

ইণ্ডিয়ান সমাজে ট্রাইব (জাতি) কাহাকে বলিব? প্রত্যেক গোষ্ঠী এবং ফ্রাত্রীর মতন প্রত্যেক জাতিরও কতকগুলা "সামান্য লক্ষণ" আছে। এইগুলিকে জাতির স্বধর্ম্মের অন্তর্গত বিবেচনা করিতে হইবে।

১। প্রত্যেকজাতি একটা স্বতন্ত্র জনপদের অধিকারী। ইহার একটা বিশিষ্ট নামও আছে। জনপদ সুবিস্তৃত। শিকার এবং মাছধরার সুযোগও জমিজমার অন্তর্গত। জাতিগত জনপদ বা "দেশের" লাগা জমিন কাহারও সম্পত্তি নয়। এই "খোলা মাঠের" সাহায্যে পরবর্ত্তী জাতি হইতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা হয়। অনধিকৃত "উদাসীনীকৃত" জমিনটার আয়তন কখনও ছোট, কখনও বা বেশ বড়। জাতি দুইটা যদি ভাষায় লাগালাগি হয়, তাহা হইলে অল্প মাত্র "খোলামাঠের" রেওয়াজ থাকে। কিন্তু এই দুয়ের ভাষায় যদি কোনো প্রকার সংশ্রব না থাকে তাহা হইলে উদাসীন জমিনের বিস্তৃতি খুব বেশী।

ইণ্ডিয়ান সমাজের এই জাতি বা দেশ পার্থক্যের নিয়ম প্রাচীন জার্ম্মাণ সমাজেও দেখাগিয়াছে। বনভূমিগুলা ছিল জার্ম্মাণদের সীমানা বিশেষ। সীজার বলেন সুয়েভিরা তাহাদের স্বদেশকে মরুভূমি দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। ডেনিশ এবং জার্ম্মাণ জাতি দ্বয়ের পার্থক্য সাধিত হইত "ইজার্ণহোল্ট" এর দ্বারা। ডেনিশ ভাষায় ইহাকে "য়ার্ণবেড" বলে। স্যাক্সনদের সীমানা ছিল "জাক্সেন হ্বাল্ড" (স্যাকসন বন)। শ্লাভজাতি হইতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য জার্ম্মাণরা "ব্রাণিবর" কায়েম করিয়াছিল। এই শ্লাভ শব্দ আজকালকার ব্রাণ্ডেনবুর্গ প্রদেশের মূলে দেখিতে পাইতেছি।

এই ধরণের সীমানার ভিতরকার সকল জমিজমা জাতির সমবেত সম্পত্তি। অন্যান্য

জাতিরা সেই জাতির অধিকার স্বীকার করিয়া চলে। এই ভূমি অন্যান্যের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা তাহার কর্ত্তব্যের অন্তর্গত। লোকসংখ্যা প্রচুর পরিমাণে না বাড়া পর্য্যন্ত স্বভূমির সীমানা কাঠায় বিঘায় নির্দ্দিষ্ট না থাকিলেও চলে. কিন্তু চৌহদ্দি নির্দ্দেশ করার দরকার লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়ই হয়।

. জাতিগুলার নামকরণ কেন হয় বলা কঠিন। নরনারীরা নিজে বাছিয়া একটা নাম গ্রহণ করে কিনা সন্দেহ। নাম একটা আকস্মিক অচিন্তিতপূর্ব্ব ঘটনাবিশেষ। কোন কোন সময়ে নিজেরা হয়ত একটা নাম বাছিয়া লইয়াছে। কিন্তু তাহার প্রতিবেশী জাতি তাহাকে অন্য এক নামে ডাকে। জার্ম্মাণদের নামও তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তী কেল্টজাতির দেওয়া।

২। প্রত্যেক জাতির একটা করিয়া স্বতন্ত্র ভাষা আছে। ভাষা এবং জাতি আয়তনে সমবিস্তৃত। যতদূর স্বভাষা, ততদূর স্বজাতি। আমেরিকার পুরাণা ভাষা ভাঙিয়া নয়া নয়া ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নয়া নয়া জাতিও দেখা দিয়াছে। এই রূপে নব নব ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নয়া নয়া জাতিও দেখা দিয়াছে। এইরূপে নব নব ভাষা ও জাতির উৎপত্তি আজও চলিতেছে। কখনো কখনো দুই দুর্ব্বল জাতি সম্মিলিত হইয়া একটা জাতি গড়িয়া তুলিয়াছে। এই ব্যবস্থায় উভয়েই নিজ নিজ ভাষার ব্যবহার রক্ষা করিতে ছাড়ে নাই। গড়পড়তা ২০০০ হাজার নরনারী এক একটা ইণ্ডিয়ান ভাষায় কথা বলে। অর্থাৎ এতগুলা লোক এক একটা জাতির অন্তর্গত। চেরোকীরা গুন্তিতে ২৬০০০। অন্য কোনো ভাষাভাষীর সংখ্যা এত বেশী নয়।

৩। প্রত্যেক জাতি নিজ ফ্রাত্রীর অনুমোদিত এবং গোষ্ঠীর নির্ব্বাচিত সাখেম এবং লড়াই-নায়ককে প্রকাশ্য সভায় গদিতে বসাইবার অধিকারী।

৪। গোষ্ঠীর মতের বিরুদ্ধেও জাতি ইচ্ছা করিলে এই নায়কগণকে বরখাস্ত করিতেও পারে। গোষ্ঠী নায়কেরা সকলেই জাতি-সভার সভ্য। কাজেই তাহাদের উপর জাতির একতিয়ার থাকা অস্বাভাবিক নয়। জাতিগুলা আবার এক বৃহত্তর কেন্দ্রের-ফেডারেশ্যনের অন্তর্গত। কাজেই ফেডারল সভাও ইচ্ছা করিলে গোষ্ঠীনায়কগণকে বরখাস্ত করিতে পারে।

৫। প্রত্যেক জাতি কতকগুলা সার্ব্বজনিক ধর্ম্মকর্ম্ম মানিয়া চলে। অন্যান্য বার্ব্বারদের মতনই ইণ্ডিয়ানরাও ধার্ম্মিক জাতি। তাহাদের দেবদেবী-তত্ত্ব এবং রীতিনীতিগুলা সম্বন্ধে সবে মাত্র গবেষণা সুরু হইয়াছে। মানুষের আকারে তাহারা দেবদেবীর কল্পনা করিয়া থাকে। কিন্তু প্রতিমা গড়িবার যুগ পর্য্যন্ত ইহারা উঠিতে পারে নাই। প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জের আরাধনা তাহাদের আধ্যাত্মিক জীবনের গোড়ার কথা। সর্ব্বভূতে ঐশীশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিবার পথে ইহারা ধাপে ধাপে উঠিতেছে। নাচ গান খেলাধূলা সমন্বিত মহোচ্ছবের সঙ্গে প্রত্যেক জাতি ষোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থা করিতে অভ্যস্ত। নাচ এই সকল পালা পার্ব্বণের বিশেষত্ব। ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রত্যেক জাতি নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলে।

৬। সার্ব্বজনিক কাজকর্ম্ম চালাইবার জন্য প্রত্যেক জাতির একটা করিয়া সভা থাকে। এই সভায় বসে জাতির অন্তর্গত গোষ্ঠীনায়কেরা। ইহারাই খাঁটি প্রতিনিধি,—কেন না

ইহাদিগকে যখন তখন বরখাস্ত করা সম্ভব। সভার কাজকর্ম্ম চলে খোলা বাজারে। অর্থাৎ জাতির যে কোনো লোক—মেয়েরাও—সভায় উপস্থিত হইয়া আলোচনায় যোগ দিতে অধিকারী। কিন্তু বিচার এবং ব্যবস্থা করিবার এক্তিয়ার এক মাত্র সভারই। প্রত্যেক বিধান "সর্ব্বসম্মতি" ক্রমে জারি হওয়া চাই। জার্ম্মাণদের মার্ক সভায়ও এইরূপ সর্ব্বসম্মতির নিয়ম ছিল। "বিদেশী" অর্থাৎ অন্যান্য জাতির সঙ্গে—"পররাষ্ট্র" বিষয়ে সভার কাজগুলা প্রধান ঠাঁই অধিকার করে। বিদেশীদের দূত গ্রহণ করা এবং লড়াই বা সন্ধি ঘোষণা করাও সভার কাজ। স্বেচ্ছা-সেবকরাই লড়াইয়ের প্রধান ফৌজ।

যে যে জাতির সঙ্গে মিত্রতার সন্ধি কায়েম হয় নাই, তাহাদের সঙ্গে জাতিমাত্রেরই লড়াইয়ের নীতি চলিতে পারে। এই ধরণের শত্রুদের বিরুদ্ধে নামজাদা যোদ্ধারা লড়াইয়ের কাজকর্ম্মে ভার লয়। পল্টনে সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য ইহারা লড়াইয়ের নাচ সুরু করিয়া দেয়। যে যে এই নাচে যোগ দেয় তাহারাই স্বেচ্ছাসেবক। যাঁহা নাচে যোগ, তাঁহা দলগঠন এবং রণযাত্রা। অপরপক্ষেও স্বয়ংসেবকেরাই স্বদেশরক্ষার ভার লয়। লড়াইয়ের যাত্রার সময় এবং লড়াই হইতে ফিরিবার সময় দেশ সুদ্ধ হৈ হৈ রৈ রৈ এবং মহোচ্ছোব চলে।

এমন কি জাতিসভার অনুমতি-না লইয়াই স্বয়ংসেবকেরা এই ধরণের লড়াই বাধাইতে পারে। ট্যাসিটাসবিবৃত জার্ম্মাণ সমাজেও এই ধরণের স্বয়ংসেবকনিয়ন্ত্রিত লড়াইয়ের নিয়ম দেখিতে পাই। কিন্তু জার্ম্মাণদের ভিতর স্বয়ংসেবকের দল স্থায়ী সংগঠনের আকার গ্রহণ করিয়াছিল। শান্তির সময়ও এই দল বজায় থাকিত।

বিপুল সেনাবাহিনী এই বিধানে দেখা যায় না। দূরদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার উপলক্ষেও ইণ্ডিয়ানরা অল্পসংখ্যক ফৌজের দলই কায়েম করিতে অভ্যস্ত। প্রত্যেক দল নিজ নিজ নেতার হুকুম তামিল করে। এই সকল নেতারা একত্রে মিলিয়া রণনীতি এবং লড়াইয়ের কৌশল সম্বন্ধে শল্লা করে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে দক্ষিণ রাইনের আলেমানি জার্ম্মাণরাও এই প্রণালীতেই লড়াইয়ের ব্যবস্থা করিত।

৭। কোনো কোনো জাতির মাথায় একজন নায়ক দেখিতে পাই। তাঁহার ক্ষমতা অবশ্য যথেষ্ট সঙ্কুচিত। সাধারণতঃ এই ব্যক্তি অন্যতম সাখেম। জাতিসভা বসিয়া ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই জাতি-নায়ক কাজ সামলাইতে অধিকারী। মোটের উপর ইঁহাকে স্থায়ী কর্ম্মাধ্যক্ষ বিবেচনা করা বলিতে পারে। উচ্চতম লড়াই-নায়কই পরবর্ত্তী কালে স্থায়ী কর্ম্মাধ্যক্ষে পরিণত হইয়াছিল।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

ভ্রমসংশোধন

যুগ সমস্যা প্রবন্ধে ৬৫ পৃষ্ঠায় ১১ ও ১২ লাইনে "এই যে কোনপ্রতিষ্ঠিত প্রত্যক্ষবাদ সেটা এই যুগের বিশিষ্ট লক্ষণ," ইহার স্থলে কোমতপ্রতিষ্ঠিত ইত্যাদি হইবে।

সূচী

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী

U. Ray & Sons, Calcutta.

নব্যভারত

দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড] আষাঢ়, ১৩৩১ ৩য় সংখ্যা

যোগদর্শনের চিত্ত

সাংখ্য ও যোগ এক পর্য্যায়ের দর্শন। কারণ, দেখা যায় যে, পাতঞ্জল দর্শনে কাপিল দর্শনের চতুর্বিংশতিতত্ত্ব অঙ্গীকৃত ও সমর্থিত হইয়াছে। *

সাংখ্যাচার্য্যেরা এই বৈচিত্র্যময় বিবিধ বিশ্বের বিশ্লেষণ ও সমূহন করিয়া এক চরম দ্বৈতে উপনীত হইয়াছেন। সে মহাদ্বৈত—পুরুষ ও প্রকৃতি। যোগদর্শনের ভাষায় পুরুষের নাম দ্রষ্টা (subject—বিষয়ী) এবং প্রকৃতির নাম দৃশ্য (object = বিষয়)। পুরুষ কেবল অমল, অসঙ্গ, অপরিণামী, নিষ্ক্রিয়, নিরীহ, নির্গুণ, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ।

আর দৃশ্য ?

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্ ॥ ২।১৮ ॥

---

* সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতিতত্ত্ব কি কি ?

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতি র্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।

ষোড়শকস্তুবিকারো ন প্রকৃতির্ণবিকৃতিঃ পুরুষঃ—সাংখ্যকারিকা, ৩।

যিনি প্রকৃতিও নন, বিকৃতিও নন, সেই পুরুষ ব্যতীত প্রধান বা মূল প্রকৃতি, মহৎতত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব ও পঞ্চ তন্মাত্র—এই সপ্ত প্রকৃতি—বিকৃতি এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থূলভূত—এই ষোড়শ বিকার পতঞ্জলি এই ২৪ তত্ত্বের বিভাগ করিয়া বলিয়াছেন—

বিশেষা বিশেষ লিঙ্গমাত্রা—লিঙ্গানি গুণ পর্ব্বানি

অলিঙ্গ (মূল প্রকৃতি), লিঙ্গমাত্র (মহৎতত্ত্ব) অবিশেষ (অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র) এবং বিশেষ (ষোড়শবিকার)—ত্রৈগুণ্য বা প্রকৃতির এই চারি পর্ব্ব। •

সেই জন্য ব্রহ্মসূত্রে সাংখ্যমতের নিরাস করিয়া সূত্রকার লিখিয়াছেন

অনেনযোগঃ প্রত্যুক্তঃ অর্থাৎ ইহার দ্বারায় যোগদর্শনও নিরাকৃত হইল। এরূপ বলার তাৎপর্য্য, এই যে যোগদর্শনে যখন সাংখ্যোক্ত পদার্থাবলীই স্বীকৃত হইয়াছে, তখন সাংখ্য নিরাস দ্বারাই পাতঞ্জলও নিরাকৃত হইল। এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন এতেন সাংখ্যস্মৃতিপ্রত্যাখ্যানেন যোগস্মৃতি রপি প্রত্যাখ্যাতা দ্রষ্টব্যা ইত্যাতি দর্শতি তত্রাপি শ্রুতিবিরোধন প্রধানং স্বতন্ত্রমেব কারণং মহদাদীনিচ কার্য্যাণি অলোকবেদপ্রসিদ্ধানি কল্প্যন্তে।

সত্ত্ব প্রকাশশীল, রজঃ ক্রিয়াশীল এবং তমঃ স্থিতিশীল। অতএব পাতঞ্জল দর্শনের দৃশ্য সাংখ্যের প্রধানশব্দবাচ্য ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ; এতেঃ গুণা পরস্পরোপরক্ত প্রবিভাগাঃ পরিণামিনঃ প্রধানশব্দবাচ্যা ভবন্তি। এতদ্দৃশ্যমিত্যুচ্যতে—ব্যাসভাষ্য।

এই দৃশ্য বা প্রকৃতি ভূত ও ইন্দ্রিয়াত্মক—কারণ, প্রকৃতির বিকারদ্বারাই বাহ্যবস্তু (objects) ও ইন্দ্রিয়াদি গঠিত।

এই প্রকৃতির পরিচয়স্থলে ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি।

ব্যক্তং তথা প্রধানম্—কারিকা ১১।

[বিষয়ঃ=গ্রাহ্যঃ (objects)

সামান্যং=সাধারণং ঘটাদিবৎ অনেকপুরুষৈঃ গৃহীতং—বাচস্পতি]

অর্থাৎ প্রধান বা প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক, অবিবেকী, বিষয় (দৃশ্য), সামান্য (Common —সাধারণ) জড় ও পরিণামী।

অন্যত্র, সাংখ্যাচার্য্যেরা প্রকৃতির পরিচয়স্থলে এই দুইটি প্রাচীন বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

সূক্ষ্মমলিঙ্গম্ অনাদিনিধনং তথা প্রসবধর্ম্মি।

নিরবয়বমেকমেবহি সাধারণমেতদ্ অব্যক্তং ॥

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং

তথাচ নিত্যং রসগন্ধবর্জ্জিতং

অনাদিমধ্যং মহতঃ পরং ধ্রুবং

প্রধানমেতৎ প্রবদন্তি সূরয়ঃ ॥

অর্থাৎ প্রকৃতি সূক্ষ্ম, অলিঙ্গ, অনাদিনিধন, পরিণামী, নিরবয়ব, এক ও সাধারণ। প্রকৃতি নিত্য, অব্যয়, পঞ্চেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, আদি-ও মধ্যহীন, মহতের পর এবং ধ্রুব।

এই পুরুষ ও প্রকৃতি—দ্রষ্ট ও দৃশ্যরূপ মহাদ্বৈতের মধ্যে চিত্ত কোন্ পর্য্যায়ভুক্ত ?

আমরা দেখিয়াছি সাংখ্যাচার্য্যেরা পুরুষকে শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বরূপ বলিয়াছেন।

পতঞ্জলিরও এই মত। তিনি বলেন—

"দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ।—২।২০ ॥ সূত্র।

অর্থাৎ দ্রষ্টা বা পুরুষ চিন্মাত্র এবং শুদ্ধ বা কেবল। শুদ্ধ অর্থে বিশেষণাপরামৃষ্টঃ [বিশেষণানি ধর্ম্মাঃ তৈঃ অপরামৃষ্টঃ—বাচস্পতি] অতএব নির্গুণ। চিত্ত কিন্তু ত্রিগুণাত্মক—

চিত্তং হি প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিশীলত্বাৎ ত্রিগুণম্। চিত্ত যখন ত্রিগুণাত্মক তখন ইহা নিশ্চয়ই প্রকৃতির পর্য্যায়ভুক্ত। প্রকৃতি প্রসবধর্ম্মী অর্থাৎ নিয়ত পরিণামশীল। চিত্তের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে ইহারও সর্ব্বদাই পরিণাম ঘটিতেছে।

চলঞ্চ গুণবৃত্তম ইতি ক্ষিপ্র পরিণামি চিত্তমুক্তং। ব্যাসভাষ্য।

অন্যত্র ব্যাসভাষ্যে উক্ত হইয়াছে :—

খ্যাতিপর্য্যবসানং হি চিত্তচেষ্টিতমিতি। ১।৫০॥

পরিণাম কি ? ইহার উত্তরে ব্যাসভাষ্য বলিতেছেন :—

অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্ব্ব ধর্ম্মনিবৃত্তৌ
ধর্ম্মান্তরোৎপত্তিঃ পরিণামঃ—২।১৩।, ব্যাসভাষ্য।

এই পরিণামের সন্তান বা ধারাকে যোগদর্শনে "ক্রম" বলা হইয়াছে। কালের যে 'লব' বা সু-সূক্ষ্ম অংশ তাহার নাম ক্ষণ। ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতির এবং প্রকৃতির বিকার চিত্তের পরিণাম ঘটিতেছে।

ক্ষণ প্রতিযোগী পরিণামাপরান্ত নির্গ্রাহ্যঃ ক্রম ॥—॥৪।৩৩॥

চিত্ত যখন প্রকৃতির পর্য্যায়ভুক্ত তখন ইহা চেতন বা স্বপ্রকাশ হইতে পারে না। তাই পতঞ্জলি সূত্র করিয়াছেন :—

নতৎ স্বভাসং দৃশ্যত্বাৎ—৪।১১

সাংখ্যমতে পুরুষ এক নহে—বহু। প্রত্যেক পুরুষ এক একটি চিত্তের সহিত অনাদি কাল হইতে সংযুক্ত আছে।

চিত্ত পুরুষয়োঃ অনাদি স্ব-স্বামিভাব সম্বন্ধঃ। বিজ্ঞানভিক্ষু।

বাচস্পতিও এই মর্ম্মে বলিয়াছেন :—

অনাদিত্বাচ্চ সংযোগপরম্পরায়াঃ।

এই সম্পর্কে যোগদর্শনের উপদেশ এই :—

তাসামনাদিত্বং আশিষো নিত্যত্বাৎ ৪।১০। যোগসূত্র।

ইহার উপর ব্যাসভাষ্য এইরূপ—

অনাদিবাসনানুবিদ্ধম ইদং চিত্তং নিমিত্তবশাৎ কাশ্চিদেব বাসনাঃ প্রতিলভ্য পুরুষস্য ভোগায় উপাবর্ত্ততে।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের ভাষায়—পুরুষেণ সংসৃষ্টা ইয়মনাদিকালপ্রবৃত্তা ক্ষেত্রাকারপরিণতা প্রকৃতিঃ অর্থাৎ চিত্তাকারে পরিণত প্রকৃতির এক খণ্ড বা ভগ্নাংশকে পুরুষ অনাদি কাল হইতে নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন—পুরুষ স্বামী—এই চিত্ত তাহার স্ব। *

আমরা দেখিলাম যে, এই চিত্ত যখন প্রকৃতির উপাদানে গঠিত, তখন ইহা নিশ্চয়ই জড় বা অচেতন। কিন্তু যেহেতু ইহার সহিত চিন্ময় পুরুষের অনাদি সংযোগ সিদ্ধ সম্বন্ধ, অতএব জড় হইলেও চিত্তকে সর্ব্বদাই স'চেতন মনে হয়। ঈশ্বর কৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

তস্মাৎ তৎ সংযোগাদ্ অচেতনং চেতনাবদ্ ইব লিঙ্গম্—কারিকা, ২০

এবং মহদাদি লিঙ্গং পুরুষসংযোগাৎ চেতনাবদ্ ইব ভবতি—গৌড়পাদ

[লিঙ্গ=সান্তঃকরণাবুদ্ধি বা চিত্ত]

সেইজন্য বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন—বুদ্ধেশ্চ যা চিত্তা সা পুরুষসান্নিধ্যাৎ।

বিত্ত বা বুদ্ধির এই যে চিত্তা তাহা চিৎ বা পুরুষের সান্নিধ্যজনিত।

সাংখ্যসূত্র এই মর্ম্মে বলিয়াছেন :—

অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলিতত্বাৎ লোহবৎ অধিষ্ঠাতৃত্বম্—১।৯৯ সূত্র।

---

* সাংখ্যযোগদর্শন প্রবাদাঃ "স্ব" সন্দেস পুরুষামেক স্বামিরং চিত্তস্য ভাক্তারম উপযন্তি ৪।২১—সূত্রের ভাষ্য।

অন্তঃকরণং হি তপ্তলোহবৎ চেতনোজ্জ্বলিতং ভবতি।

অতস্তস্য চেতনায়-মানতয়া অধিষ্ঠাতৃত্বম্—বিজ্ঞানভিক্ষু।

"যেমন অগ্নির সংস্পর্শে লৌহের উষ্ণত্ব, সেইরূপ চিৎসংস্পর্শে চিত্ত বা অন্তঃকরণের চেতনত্ব। সেই জন্যই চিত্ত (অন্তঃকরণ) সচেতনবৎ প্রতীয়মান হয়। ব্যাসভাষ্যও এই মর্ম্মে বলিতেছেন :—অচেতনং চেতনমিব স্ফটিকমনিকল্পং সর্ব্বার্থমিতি উচ্যতে। অর্থাৎ অচেতন চিত্ত সচেতনবৎ প্রতীত হয়।

ইন্দ্রিয় দ্বারা এই চিত্তের বিষয়ের বা বাহ্যবস্তুর সহিত সংস্পর্শ হইলে চিত্ত তদাকারে আকারিত হয়। যোগদর্শনের ভাষায় ইহাকে 'উপরাগ' বলে—

তদুপরাগাপেক্ষিতত্বাৎ চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতং ৪।১৭ সূত্র।

যেন চ বিষয়েন উপরক্তং চিত্তং স বিষয়ো জ্ঞাতঃ ততোঽন্যঃ পুণরজ্ঞাতঃ—ব্যাসভাষ্য।

কিন্তু ঐরূপ উপরাগেই অনুভূতি প্রক্রিয়ার অবসান হয় না। উহার সহিত অতঃপর চিত্তের বা পুরুষের সংযোগ হয় :—

সাচ বৃত্তিঃ অর্থোপরক্তা প্রতিবিম্বরূপেন পুরুষাধিরূঢ়া সতী ভাসতে। অর্থাৎ বিষয় (object,) দ্বারা উপরঞ্জিত বৃত্তি প্রতিবিম্বরূপে পুরুষে অধিরূঢ় হইলে তবে অনুভূতি হয়।

সেইজন্য সাংখ্যকার বলিয়াছেন :—

চিদবসানো ভোগঃ—১।১০৪

পতঞ্জলি এই কথার সমর্থন করিয়া বলিতেছেন :—

দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থম্—৪।২২

[দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং বিষয়বিষয়িনির্ভাসং চেতনাচেতনস্বরূপাপন্নম্—ব্যাসভাষ্য]

এ সম্বন্ধে বাচস্পতি মিশ্রের বক্তব্য এই :—

জড়স্বভাবোপি অর্থঃ (objects) ইন্দ্রিয়- প্রণালিকয়া চিত্তমুপরঞ্জয়তি। তদেবং ভূতং চিত্তদর্পণম্ উপসংক্রান্ত প্রতিবিম্বাচিতিশক্তিঃ চিত্তম্ অর্থোপরক্তং চেতয়মানার্থম্ অনুভবতি।

ইহাকেই যোগদর্শনের ভাষায় বৃত্তিসারূপ্য বলে—বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র—১।৪।

ব্যুত্থানে যাঃ চিত্তবৃত্তয়ঃ তদ্-অবশিষ্টবৃত্তিঃ পুরুষঃ—ব্যাসভাষ্য।

পুরুষ এই রূপে 'প্রত্যয়ানুপশ্য' হন। (২।১ সূত্র)।

প্রত্যয়ং বৌদ্ধমনুপশ্যতি। তমনুপশ্যন্ ন তদাত্মাপি তদাত্মক ইব প্রত্যবভাসতে।

—ব্যাসভাষ্য।

এই চিত্তবৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়া পতঞ্জলি বলিয়াছেন—বৃত্তি পঞ্চবিধ।

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয়ঃ—১।৭

প্রমাণ বিপর্য্যয় বিকল্প নিদ্রাস্মৃতয়ঃ—১।৭

যোগদর্শনের মতে নিদ্রাও বৃত্তি, কারণ, নিদ্রোত্থিতের স্মরণ হয় 'সুখমহং অস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদ্ অবেদিষম্'। এই অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তিকে নিদ্রা বলে। (১।১০ সূত্র) *

স্মৃতির বৃত্তিত্ব বিষয়ে মতভেদ নাই—অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ—১।১১

* স খল্বয়ং প্রবুদ্ধস্য প্রত্যবমর্শো ন স্যাদ অসতি প্রত্যয়ানুভবে—ব্যাসভাষ্য।

পতঞ্জলির মতে জ্ঞানক্রিয়ায় বস্তুর সহিত বৃত্তির সামঞ্জস্য থাকা উচিত। যেখানে এই সামঞ্জস্য থাকে, সেই বোধ প্রমাজ্ঞান বা প্রমাণ। আর যেখানে ঐ সামঞ্জস্য না থাকে সে বোধ মিথ্যাজ্ঞান বা বিপর্য্যয়।

বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানম্ অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্—১।৮॥

কখন কখন বস্তু নাই, অথচ শব্দজ্ঞানের অনুপাতী বৃত্তির উদয় হয়, তাহাকে বিকল্প বলে; বিকল্পও বৃত্তি।

শব্দ জ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ—১।৯

এতক্ষণ আমরা চিত্তের Psychologyর আলোচনা করিলাম। এইবার চিত্তের Pathologyর আলোচনা করিতে হইবে—নতুবা যোগদর্শনের যাঁহা উদ্দিষ্ট, আমরা সেখানে পঁহুছিতে পারিব না।

এই যে পঞ্চবিধ বৃত্তি, তাহারা সকলেই সুখ দুঃখ ও মোহাত্মক—

সর্ব্বাশ্চৈতা বৃত্তয়ঃ সুখদুঃখ-মোহাত্মিকাঃ; কারণ, প্রখ্যা প্রবৃত্তি স্থিতিরূপা বুদ্ধিগুণাঃ পরস্পরানুগ্রহতন্ত্রীভূত্বা শান্তং ঘোরং মূঢ়ংবা প্রত্যয়ং ত্রিগুণমেব আরভন্তে—২।১৫, ব্যাসভাষ্য।

যেহেতু চিত্তপ্রকৃতির বিকার অতএব ত্রিগুণাত্মক এবং ঐ তিনগুণ (সত্ব, রজঃ ও তমঃ) নিয়ত পরস্পর-উপমর্দ্দশীল, অতএব চিত্তের বৃত্তি বা প্রত্যয় হয় শান্ত (সুখাত্মক), নয় ঘোর (দুঃখাত্মক), না হয় মূঢ় (মোহাত্মক) হইবেই হইবে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে যোগদর্শনের চিত্ত পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের অনুমোদিত Tabula Rasa বা clean slate নহে; ইহা সংখ্যাতীত বাসনা দ্বারা বিচিত্রিত

তদ্ অসংখ্যেয়বাসনাভিঃ চিত্রং—৪।২৩

বাসনা = সংস্কার। সংস্কার দ্বিবিধ। ক্লেশরূপ ও কর্ম্মরূপ। অসংখ্যেয়' কর্ম্মবাসনাঃ ক্লেশবাসনাশ্চ চিত্তমেব অধিশেরতে নতু পুরুষং। তথা চ বাসনাধীনা বিপাকাঃ চিত্তাশ্রয়তয়া চিত্তস্য ভোক্তৃতামাবহন্তি।—বাচস্পতি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অনুষ্ঠিত শুক্ল, কৃষ্ণ ও শুক্লকৃষ্ণ কর্ম্মের সংস্কার আশয়রূপে চিত্তে সংলগ্ন আছে।—

কর্ম্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমেতরেষাম্॥—৪।৭

ক্লেশ ও কর্ম্মের নিয়ত সম্বন্ধ—ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ঃ।—(২।১২ সূত্র)।

এই ক্লেশ পঞ্চবিধ—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ বা মরণত্রাস। অবিদ্যা = বিপর্য্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান—অতস্মিন তদবুদ্ধি। অস্মিতা = অভিমান—দৃক্ ও দর্শনশক্তির একাত্মতা। (২.৯)

এই পঞ্চক্লেশের মধ্যে অবিদ্যাই প্রধান—

অবিদ্যা-ক্ষেত্রম্ উত্তরেষাং প্রসুপ্ত তনুবিচ্ছিন্নো দারানাম॥—১।৪

এই পঞ্চ ক্লেশ সংস্কাররূপে বীজভাবে চিত্তে অনুবিদ্ধ থাকে এবং সহজেই বৃত্তিরূপে উপচিত হইয়া উদার বা লব্ধবৃত্তি হয়। যোগদর্শন বলেন যে, চিত্তকে সম্পূর্ণ বৃত্তিশূন্য করিয়া এই দ্বিবিধ বাসনা বির্নিমুক্ত করিতে হইবে; কারণ, তাহা হইলেই পুরুষ স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ হইয়া কৈবল্য লাভ করিবেন। ইহাই জীবের পরমার্থ।

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্।—১।৩। তদ্ দৃশেঃ কৈবলম্।—২।২৫

চিত্তের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে, চিত্তের পাঁচটি অবস্থা বা ভূমি আছে—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ।

ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তং একাগ্রং নিরুদ্ধমিতি চিত্ত ভূময়ঃ—ব্যাস ভাষ্য।

ক্ষিপ্ত ও মূঢ় চিত্তের পক্ষে যোগ অসম্ভব, কিন্তু বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র করিতে পারিলে যোগের সম্ভাবনা হয়। সেইজন্য পতঞ্জলি বিক্ষেপের আলোচনা করিয়াছেন; কারণ বিক্ষেপই যোগের অন্তরায় এবং দুঃখ, নৈরাশ্য, চাপল্য ও শ্বাসপ্রশ্বাস বিক্ষেপের নিত্য সহচর। দুঃখদৌর্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্ব শ্বাসপ্রশ্বাসা বিক্ষেপ সহভুবঃ॥—১।৩৮

বিক্ষেপ কি কি?

ব্যাধিস্ত্যান সংশয় প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধ ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি

চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ।—১।৩১

(স্ত্যান = জড়তা, অনবস্থিত্ব-অপ্রতিষ্ঠা)

যথোচিত উপায় দ্বারা ঐ বিক্ষেপের নিরাস করিয়া চিত্তকে একাগ্র করিতে হইবে। পতঞ্জলি প্রথমতঃ সাধককে একতত্ত্বের অভ্যাস করিতে বলিয়াছেন—তৎপ্রতিষেধার্থম্ একতত্ত্বাভ্যাসঃ।—১।৩২

পরে মৈত্রী,করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার অনুশীলন করিয়া চিত্তের প্রসাদন করিতে হইবে।

মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম ২।৩৩

অতঃপর ক্রিয়াযোগ দ্বারা চিত্তের পরিকর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে। ক্রিয়াযোগ কি?—

তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ—২ ১ সূত্র

ক্রিয়াযোগের ফল কি?

সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনুকরণার্থশ্চ—২।২

ত্রিবিধ ক্রিয়াযোগের মধ্যে ঈশ্বরপ্রনিধানই মুখ্য। কারণ তদ্দ্বারা বিশেষভাবে অন্তরায়ের বারণ হয়;—

ততঃ প্রত্যকৃচেতনাধিগমোঽন্তরায়াভাবশ্চ।—১।২৯।

বলা বাহুল্য সাধনভিন্ন সিদ্ধি হয় না—ন চ সিদ্ধিরন্তরেন সাধনম্। চিত্তের অশুদ্ধিক্ষয়ের জন্য স্থিরতর উপায়—নিয়মিতভাবে অষ্টাঙ্গযোগের অনুষ্ঠান।—যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদ্ অশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিঃ—২।২৮

যোগের অষ্টাঙ্গ কি কি?

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি।—(২।২৯)

যোগপ্রক্রিয়ার আলোচনা এ প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে; অতএব আমরা অষ্ট যোগাঙ্গের অনুধাবন না করিয়া চিত্তের প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসি।

সাধক যখন পূর্ব্বোক্ত প্রণালী ও প্রক্রিয়ার দ্বারা বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র ভূমিতে উপনীত করিতে পারেন, তখন ধারণায় তাঁহার চিত্তের যোগ্যতা হয়। অবশ্য পরিণামী চিত্তের পরিণামের তখনও বিরতি হয় না, কিন্তু তখন বৃত্তির প্রবাহ একতান হয়। ইহাই ধ্যান—

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতাধ্যানম্।— ৩।২

ততঃ পুনঃ শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌচিত্তস্য একাগ্রতা পরিণামঃ।—৩।১২

এইরূপে চিত্তঃ ক্ষীণবৃত্তি হইলে তাহার স্বচ্ছতা সাধিত হইয়া অভিজাত মণির ন্যায় (clear crystal) বস্তুর যথাযথ প্রতিকৃতিগ্রহণের সামর্থ্য উপজাত হয়—ইহাকেই সমাপত্তি বলে।

ক্ষীণবৃত্তেঃ অভিজাতস্যেব মনেঃ গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ---১।৪১

এই সমাপত্তি স্থূলসূক্ষ্ম-গ্রাহ্যভেদে চতুর্ব্বিধ। স্থূলের সমাপত্তি বিকল্পের দ্বারা সঙ্কীর্ণ হইলে তাহাকে সবিতর্ক, এবং বিকল্প হইতে বিশুদ্ধ অর্থাৎ অর্থমাত্র নির্ভাস হইলে তাহাকে নির্বিতর্ক বলে। এইরূপ সূক্ষ্মের সমাপত্তিকে সঙ্কীর্ণ ও বিশুদ্ধভেদে সবিচার ও নির্বিচার বলে। ইহাদিগের সাধারণ নাম সম্প্রজ্ঞাত বা সবীজ সমাধি।

বিতর্কবিচারানন্দা-স্মিতারূপানুগমাৎসম্প্রজ্ঞাতঃ॥

এ সকল সমাধিই 'সালম্ব'—'নিরালম্ব' নহে।

সর্ব্ব এতে সালম্বনাঃ সমাধয়ঃ।

বিতর্কের আলম্বন স্থূল, বিচারের সূক্ষ্ম, আনন্দের হ্লাদ এবং অস্মিতার একাত্মিকা সম্বিৎ।

বিতর্কশ্চিত্তস্যালম্বনে স্থূল আভোগঃ। সূক্ষ্মো বিচারঃ আনন্দোহ্লাদঃ। একাত্মিকা সংবিদস্মিতা।

এ অবস্থায় ধ্যান পরিপক্ক হইয়া চিত্তবৃত্তি 'অর্থ-মাত্র-নির্ভাস'; যেন স্বরূপশূন্য হইয়া যায়।

তদেব (ধ্যানম্) অর্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ॥— ৩।৩

এইবার চিত্তের একাগ্র ভূমির ঊর্দ্ধে নিরুদ্ধ ভূমিতে আরোহণ করিবার যোগ্যতা হয়। তখন একাগ্র পরিণামের স্থলে চিত্তের নিরোধ পরিণাম আরম্ভ হয়।

ব্যুত্থান নিরোধ সংস্কারয়োরভিভব-প্রাদুর্ভাবৌ
নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধ-পরিণামঃ॥—৩।৯, সূত্র।

ইহার ফলে চিত্তনদী প্রশান্তবাহী হইয়া (তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ—৩।১০) চিত্তের সমাধি—পরিণাম আরম্ভ হয়।

সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ সমাধি পরিণামঃ॥—৩।১১

এই সমাধি পরিণামের সংস্কার ব্যুত্থানের সংস্কারকে নিরুদ্ধ করিয়া অসংপ্রজ্ঞাত বা নির্বীজ সমাধি আনয়ন করে।

তজ্জঃ সংস্কারঃ অন্যসংস্কার প্রতিবন্ধী —১।৫০

তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধাৎ নির্বীজঃ সমাধিঃ—১।৫১

ইহাই পরিপক্ক যোগ—

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ—১।২, সূত্র।

এ অবস্থায় বৃত্তির বিরাম হয় বটে কিন্তু চিত্তের সংস্কার অবশিষ্ট থাকে—

বিরাম প্রত্যয়াভ্যাস পূর্ব্বঃ সংস্কার শেষোঽন্য

অর্থাৎ সে অবস্থাতেও কর্ম্মের সংস্কার ও ক্লেশের সংস্কার বাসনারূপে চিত্তে অনুস্থত থাকে। অবশ্য ক্লেশের বৃত্তি পূর্ব্বেই ধ্যানদ্বারা প্রতিহত হইয়াছে —ধ্যানহেয়াস্তদ্বৃত্তয়ঃ—২।১১। এবং ক্রিয়া যোগদ্বারা ক্লেশ সকল তনূকৃতও হইয়াছে, সমাধি ভাবনার্থঃ ক্লেশ তনূকরণার্থশ্চ—২।২॥

কিন্তু ক্লেশের সূক্ষ্ম সংস্কার ?

তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ—২।১০

যে যোগীর চিত্ত ধ্যানে পরিপক্ক হইয়াছে তাঁহার আর নূতন "আশয়" হয়না।

তত্র ধ্যানজমনাশয়ং—৪।৬

তত্র যবেদ ধ্যানজং চিত্তং তদেবানাশয়ং তস্যৈব নাস্ত্যাশয়োরাগাদি প্রবৃত্তিঃ ততঃ পুণ্যপাপাভিসম্বন্ধঃ ক্ষীণক্লেশত্বাদ্যোগিন ইতি—ব্যাসভাষ্য।

এ অবস্থায় যোগী চিত্ত হইতে পুরুষের প্রভেদ উপলব্ধি করেন। সেইজন্য তাঁহাকে বিশেষ দর্শী' বলা হয়। বিশেষ = প্রভেদ (distinction)। এই উপলব্ধিকে বিবেকখ্যাতি বা 'প্রসংখ্যান' বলে। এই বিবেকখ্যাতি হইলে যোগীর চিত্তে আত্মভাবভাবনার নিবৃত্তি হয়।

বিশেষদর্শিন আত্মভাবভাবনা বিনিবৃত্তিঃ—৪। ৩

যে চিত্ত পূর্ব্বে অজ্ঞান নিম্ন ও বিষয় প্রাগভার ছিল, তাহা এখন বিবেকোন্মুখ এবং কৈবল্য-প্রবণ হয়।

তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্য প্রাগভারং চিত্তং—৪।২৬।

এইবার যোগীর বিবেকখ্যাতিতেও বিরাগ উৎপন্ন হইয়া সংস্কারবীজ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তাঁহার ধর্ম্মমেঘ সমাধি উৎপন্ন হয়।

প্রসঙখ্যানে প্যাকুসীদস্য সর্ব্ব বিবেকখ্যাতি ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ।—৪৪।২৯

সংস্কারবীজক্ষয়ান্নাস্য প্রত্যয়ান্তরাস্যুৎ পদ্যতে তদাস্য ধর্ম্মমেঘো নাম সমাধি র্ভবতি॥ ব্যাসভাষ্য

তখন যোগীর ক্লেশ সংস্কার ও কর্ম্ম সংস্কার সমূলে বিনষ্ট হয়।

ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ ॥৪।৩০॥

তল্লাভাৎ অবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ সমুল কাষং কষিতাঃ ভবন্তি। কুশলা কুশলাশ্চ কর্ম্মাশয়াঃ সমূলঘাতং হতা ভবন্তি—ব্যাসভাষ্য

এইরূপে যোগীর জ্ঞান সমস্ত আবরণমল হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অনন্ত ও অপরিসীম হয় এবং আকাশে খদ্যোতের ন্যায় তাঁহার পক্ষে জ্ঞেয় স্বল্পমাত্র থাকে।

তদা সর্ব্বাবরণাপেতস্য জ্ঞানস্য আনন্ত্যাৎ জ্ঞেয়ম্ অল্পম্॥ —৪।৩১

এইরূপে চিত্তের প্রয়োজন অবসিত হওয়ায় তাহার পরিণাম-ক্রম পরিসমাপ্ত হয় এবং চিত্ত স্বয়ং—সে যে প্রকৃতির বিকার সেই প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়।

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রম সমাপ্তি গুণানাম্॥—৪।৩২॥

পুরুষার্থ শূন্যানাং গুণানাম্ প্রতিপ্রসবঃ—৪।৩৪॥

তখন পুরুষ চিত্তের সহিত অনাদি সিদ্ধ সম্বন্ধ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া অমল; কেবল শুদ্ধ বুদ্ধ অবস্থায় 'স্ব প্রতিষ্ঠ' হন।

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্—১।৩।

ইহাকেই কৈবল্য বলে।

কৈবল্যং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি ॥

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

গুজরাত বিদ্যাপীঠ

(২)

এখন বিদ্যাপীঠের বিধিব্যবস্থার কথা কিছু বলিব। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাকে "বিনীত" পরীক্ষা বলা হয়; এই পরীক্ষায় পাশ করিয়া ছাত্রেরা মহাবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়। মহাবিদ্যালয়ে ৪ বৎসর পড়িতে হয়; প্রথম বৎসরের পর যে পরীক্ষা হয় তাহাকে প্রথমা পরীক্ষা বলে। প্রথমা পরীক্ষার পরেই বি এ। বম্বে বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ বৎসর বি, এ, পড়িতে হয়, কিন্তু এখানে পড়িতে হয় ৩ বৎসর। মাননীয় সার মাইকেল স্যাডলার মহোদয়ও এই প্রকার পদ্ধতির অনুমোদন করিয়াছেন; ইণ্টারমিডিয়েটে এক বৎসর অতিবাহিত করিয়া দুই বৎসরের পরিবর্ত্তে তিন বৎসর কোন এক বিষয় অধ্যয়ন করিলে তাহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে, ইহাই মনে হয়। সেজন্য দেখা যায় যে গুজরাত বিদ্যাপীঠের বি, এ, পাঠ্যাবলী অন্যান্য ইউনিভারসিটীর Honours পাঠ্যবলীর সমান।

এখানে ইংরাজী অবশ্যপাঠ্য নহে। প্রথমা পরীক্ষায়, ভাষার মধ্যে গুজরাতী এবং হিন্দি বা উর্দ্দু অবশ্যপাঠ্য; ইচ্ছাধীন পাঠ্য (opional) যেমন—ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, বাংলা বা মারাঠী ইহার যে কোনও একটী ভাষা লইতে হইবে। অধিকাংশ ছাত্রই ইংরাজী পড়ে, তবে অনেক বাংলাও পড়ে। বাংলা তাহারা পড়িতে, বুঝিতে, রচনা করিতে বেশ ভাল ভাবেই শেখে, তবে কথা বলিতে তেমন পারে না, কারণ বাংলায় কথা বলিবার বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ হয় না; ক্লাশেই যাহা কিছু সম্ভব—তাহাই হয় ও সেইটুকুই শেখে গুজরাতীরা বাংলা ভাষা খুব পছন্দ করে, এবং অনায়াসে শিখিতে পারে; বাংলার সহিত তাহাদের মাতৃভাষার এত সাদৃশ্য আছে যে বাংলা শিখিতে তাহাদের বিশেষ কোন কষ্ট হয় না। বিশেষতঃ গুজরাতী, হিন্দি ও মারাঠী ব্যাকরণের তুলনায় বাংলা ব্যাকরণ এত সহজ যে, যে পরিশ্রমে মারাঠী শিখা যায়, তাহার অর্দ্ধেক পরিশ্রমে বেশ ভাল করিয়াই বাংলা শিখা যায়। ছাত্রদেরই এই মত।

প্রথমা পরীক্ষায় আর যে সব বিষয় আছে তাহার কথা বলিলাম না; এখন বি, এ, পরীক্ষার পাঠ্যাবলীর কথা বলিল। বি, এতে কয়েকটী "মন্দির" আছে, যেমন ভাষা মন্দির, গণিত মন্দির, ব্যবসায় মন্দির (Commerce), রাজনীতি মন্দির (Politics), আর্য্যবিদ্যা মন্দির (Philosophy), ললিত কলা মন্দির (Fine Arts) ইত্যাদি ; বি, এ পরীক্ষাকে এখানে "স্নাতক" পরীক্ষা বলে ; এই স্নাতক পরীক্ষায় যে কোন এক "মন্দির" গ্রহণ করিতে হইবে ; কিন্তু ছাত্র যে কোন মন্দিরই গ্রহণ করুক না কেন, তাহাকে গুজরাতী এবং হিন্দী বা উর্দ্দু পড়িতেই হইবে। এই দুইটী ভাষা স্নাতক পরীক্ষাতেই অবশ্য পাঠ্য।

সকল মন্দিরের বিবরণ দিতে গেলে প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া যায়। দুই তিনটী মন্দির সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়াই অন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিব। আর্য্যবিদ্যা মন্দিরে হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয় ; ললিতকলা মন্দিরে প্রধানতঃ গান এবং বাদ্য শি[illegible] দেওয়া হয়। এখানকার গানের সহিত বাংলা গানের যথেষ্ট প্রভেদ আছে ; এখা[illegible] সঙ্গীত পদ্ধতি মারাঠী ছাঁচে ঢালা ; অর্থাৎ সঙ্গীতে কালোয়াতী ভাব প্রবল ; ওস্তাদের গান বিজ্ঞানসম্মত বটে, কিন্তু তেমন মনোমুগ্ধকর নহে। আবার বাংলা গান চিত্তাকর্ষক বটে, কিন্তু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তাহাতে অবৈজ্ঞানিক অনেক দোষ পাওয়া যায়। মোটের উপর, কালোয়াতী গান "very scientific but not very artistic." এই ললিত কলা মন্দিরের অধ্যাপকের নাম শ্রীযুক্ত শঙ্কর রাও পাঠক। ইনি যেমন গান করিতে পারেন, তেমনই বাজাইতে পারেন ; বীণ, এস্রাজ, সেতার, বেহালা ও দিলরুবাতে তিনি সিদ্ধহস্ত, কিন্তু বেহালাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বাদ্যযন্ত্র—এ অঞ্চলে তাঁহার ন্যায় বেহালাবাদক দ্বিতীয় কেহ নাই। বম্বে গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ে ১৫ বৎসর সঙ্গীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি এ অঞ্চলে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি হারমোনিয়মের মোটেই পক্ষপাতী নহেন, সেইজন্য এ মন্দিরে হারমোনিয়মের কোন স্থান নাই। বাঙালী গায়ক হারমোনিয়মের যতই ভক্ত হউন না কেন, এ কথা তাঁহাকে মানিতে হইবে যে একই নিশ্বাসে বীণ, সেতার ও হারমোনিয়মকে বাদ্য যন্ত্র বলিলে, বীণ ও সেতারকে কিছু অপমানিত করা হয়।

ভাষা মন্দিরে ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, আরবী, পারসী, সংস্কৃত, বাংলা, মারাঠী ও গুজরাতী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। ভাষা মন্দিরের ছাত্রকে যে কোন দুইটী ভাষা শিখিতে হয় ; যে বাংলা পড়িবে, তাহাকে দ্বিতীয় আর একটী ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যেক ভাষায় ৫টী করিয়া প্রশ্ন পত্র। বাংলা ভাষার গ্রন্থগুলির নাম—(১) গদ্য ও প্রবন্ধ রচনা, "প্রাচীন সাহিত্য," "প্রভাত চিন্তা," "প্রতিভা" (২) পদ্য ও কাব্য—"পলাশীর যুদ্ধ," "গীতাঞ্জলি," "মেঘনাদ বধ কাব্য," "শিবাজী কাব্য" (৩) উপন্যাস—গোরা, দত্তা, দুর্গেশনন্দিনী। (৪) নাটক—সাজাহান, চিত্রা, ডাকঘর, বিল্বমঙ্গল, রিজিয়া। (৫) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও প্রাচীন কাব্য—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ইত্যাদি, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

কলেজে ড্রইং, পেণ্টিং ও ফটোগ্রাফিও শিক্ষা দেওয়া হয়। শীঘ্রই যাহাতে কৃষি [illegible] শিক্ষা [illegible] হইতে পারে—তাহারও চেষ্টা হইতেছে! বিজ্ঞান শিক্ষার বন্দোবস্ত

আমদাবাদ মহাবিদ্যালয়ে নাই—সে বন্দোবস্ত আছে বম্বে মহাবিদ্যালয়ে। সেখানে chemistry, physics, dyeing, cleaning, soap making ইত্যাদি ব্যবহারিক শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়। কলেজের এই বিজ্ঞান বিভাগে নির্দ্ধারিত সংখ্যার অধিক ছাত্র লওয়া হয় না। বিজ্ঞান বিভাগ ব্যতীত Arts বিভাগও এই কলেজে আছে। এই কলেজও গুজরাত বিদ্যাপীঠের অন্তর্ভুক্ত। ইহার প্রিন্সিপ্যালের নাম শ্রীযুক্ত পুন্তাম্বেকার। ইনি অক্‌সফোর্ড হইতে এম এ পাশ করিয়া আসিয়া সুরাত কলেজে কার্য্য করিতেছিলেন; শ্রীযুক্ত গিডওয়ানির সংশ্রবে আসিয়া ইনি সুরাত কলেজ ছাড়িয়া বম্বে মহাবিদ্যালয়ে আসেন। তিনি অতি সুদক্ষ ও সুবিজ্ঞ প্রিন্সিপ্যাল।

গুজরাত বিদ্যাপীঠের একটী প্রধান বিশেষত্ব যে যতদূর সম্ভব সব বিষয়ই গুজরাতীতে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রথমা পরীক্ষায় অর্থশাস্ত্র (Economics), প্রমাণশাস্ত্র (logic) এমন কি গণিতশাস্ত্রও গুজরাতীতে শিখান হয়। স্নাতক বিভাগে এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যাহা গুজরাতীতে বুঝান কঠিন; সাধারণতঃ তাহা ইংরাজীতেই শিখান হয়; কিন্তু তবুও যতদূর সম্ভব চেষ্টা চলিতেছে; চেষ্টার ক্রুটী নাই। তবে এ বিষয়ের প্রধান প্রতিবন্ধক হইতেছে গুজরাতী অধ্যাপকের অভাব। গুজরাতীরা ব্যবসাদার জাতি; তাহারা প্রথমে বোঝে টাকা। শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রায় সকলেরই ব্যবসার দিকে ঝোঁক। যতই উচ্চশিক্ষিত হউক না কেন তাহারা সহজে টাকা ভুলিতে পারে না। অথচ, গুজরাত বিদ্যাপীঠের এমন ক্ষমতা নাই যে বেশী মাহিয়ানা দিয়া এই সকল উপযুক্ত লোককে কলেজে নিযুক্ত করিতে পারে। তাহারা এই কলেজে যোগ দিলে গুজরাতের এবং গুজরাতী ভাষার অনেক উপকার হইত; তাহা সকলেই বোঝে, কিন্তু কোন উপায় নাই। সেইজন্য নিকটস্থ মারাঠী ও সিন্ধি অধ্যাপক আনিয়া কাজ চালান হইতেছে। তাঁহারা গুজরাতী জানেন না; গুজরাতী শিখিয়া গুজরাতীর বক্তৃতা করা তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং তাহা ভাল হইবে কিনা তাহাও সন্দেহজনক। সেইজন্য তাঁহারা ইংরাজীতে বক্তৃতা দেন। তবে যে সব গুজরাতী অধ্যাপক আছেন, তাঁহারা যত দূর পারেন গুজরাতীতে বক্তৃতা করেন। গুজরাত বিদ্যাপীঠ আশা করে যে, যে সকল উপযুক্ত ছাত্র কলেজ হইতে ভালভাবে পাশ করিয়া বাহির হইবে, তাহারা আবার তাহাদের কলেজেই ফিরিয়া আসিবে; এখানে শিক্ষকতা করিয়া বিদ্যাপীঠের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবে এবং তাহাদের দেশের ও মাতৃভাষার উন্নতি সাধন করিতে থাকিবে। বিদ্যাপীঠে এম এ পড়াইবার কোন ব্যবস্থা নাই, কয়েকটী বিষয়ে পাঠ্যাবলী নির্দ্দিষ্ট করা আছে। স্নাতক হইয়া কোন বিষয়ে প্রবন্ধ (Thesis) পাঠাইলে এবং তাহা অনুমোদিত হইলে তাহাকে এম, এ উপাধি দেওয়া হয়।

বিদ্যাপীঠের আর্থিক অবস্থার কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই। মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা প্রায় দুইশত। প্রত্যেক ছাত্রের কলেজ ফি বাৎসরিক ৯০৲, কিন্তু বাৎসরিক আঠার হাজার বা কুড়ি হাজার টাকায় কোন বিদ্যাপীঠ চলিতে পারে না; গুজরাত বিদ্যাপীঠের পুস্তকাগার অতি বৃহৎ—প্রথমে যে ৪০ হাজার টাকার পুস্তক খরিদ করিয়া লাইব্রেরী উদ্ঘাটন করা হয়, তাহা ছাড়াও গত কয়েক বৎসর লাইব্রেরীর জন্য

বাৎসরিক দশহাজার টাকা দেওয়া হইতেছে। লাইব্রেরীর "পুরাতত্ত্ব" বিভাগে কয়েক জন অধ্যাপক research কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। বিদ্যাপীঠের খরচ সামান্য নহে। কিন্তু বিদ্যাপীঠ টাকার জন্য তত ভয় বা ভাবনা করে না, গুজরাত বিদ্যাপীঠের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে ভাল ভাবে কাজ করিতে পারিলে এবং ভাল কাজ দেখাইতে পারিলে, গুজরাতের লোক বিদ্যাপীঠকে অর্থ সাহায্য করিতে দ্বিধা বোধ করিবে না! গুজরাত কেন, সর্ব্বত্রই একই নিয়ম—ভাল কাজ করিতে থাকিলে টাকার অভাব হয় না; টাকা আসিবেই আসিবে। কেবল মাত্র বাক্য ব্যয় করিলে এবং Prospectus ছাপাইলে ও কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে টাকা আসে না; মূলে আসল কাজ চাই। ইতিমধ্যেই গুজরাত বিদ্যাপীঠ গুজরাতের এক গর্ব্বের ও গৌরবের জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গত বৎসর মহাত্মা গান্ধির জন্মদিন উপলক্ষে গুজরাতবাসীগণ তাহাদের এই স্নেহের জিনিষটীকে ১২লক্ষ টাকা উপহার দিয়াছিল। গুজরাত বিদ্যাপীঠ চাহিয়াছিল দশলক্ষ—পাইয়াছিল ১২লক্ষ। ২রা অক্টোবর (মহাত্মার জন্মদিন) অতিবাহিত হইয়া গেলে আর টাকা লওয়া হইল না। সেই টাকায় বিদ্যাপীঠের কলেজ ও হষ্টেলের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ হইতেছে। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় যাইয়া বিদ্যাপীঠের ভিত্তি স্থাপন কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। বার লক্ষ টাকা শীঘ্রই খরচ হইয়া যাইবে—তখন আরও টাকার প্রয়োজন হইবে। কিন্তু ভাবনা কি? বিদ্যাপীঠের Chancellor মহাত্মা মোহনদাস আজ স্বয়ং কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত। যাঁহার আহ্বানে সমস্ত হিন্দুস্থান কাঁপিয়া উঠে, সমস্ত গুজরাত যাঁহার চরণে ভক্তিভরে প্রণত—তাঁহার প্রিয় বিদ্যাপীঠের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই উজ্জ্বল।

শ্রীইন্দুভূষণ মজুমদার

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস *

দ্বিতীয় অধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শুদ্ধ মানববুদ্ধিগোচর বিচারপ্রণালী অবলম্বন করিয়া, যদি আমরা খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত, খৃষ্টীয় সমাজের অভিব্যক্তির ইতিহাস আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিব এই সময়ের মধ্যে ইহা তিনটি পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা অতিক্রম করিয়াছে।

একেবারে প্রথম অবস্থায় খৃষ্টীয় সমাজ কেবল মাত্র এক ধর্ম্মবিশ্বাস ও এক ধর্ম্মভাবে মিলিত সম্প্রদায়মাত্র ছিল। এই আদিম খৃষ্টীয় সমাজ কতকগুলি ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মবিশ্বাস একত্র পোষণ

* শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

করিবার জন্য সম্মিলিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কোন দৃঢ়বদ্ধ ধর্ম্মবাদ ছিল না, শাসন পদ্ধতি ছিল না, ধর্ম্মশাসনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত যাজকসংঘ ছিল না।

অবশ্য কোন সম্প্রদায়ই—তা সে যত শিশুই হউক না কেন, তাহার গঠন যতই দুর্ব্বল হউক না কেন,—কোন সম্প্রদায়ই একটা নৈতিক বা আধ্যাত্মিক শক্তির নেতৃত্ব ভিন্ন টিকিতে পারে না। এই নেতৃশক্তিব্যতীত তাহাকে পরিচালন করিবে কে, তাহাকে উজ্জীবিত করিয়া রাখিবে কে? আদিমযুগের এই বিভিন্ন খৃষ্টীয় উপাসকসংঘের মধ্যে এমন লোক অবশ্য ছিলেন, যাঁহারা ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, শিক্ষা দিতেন, শাসন করিতেন, কিন্তু কোন সর্ব্বজনমান্য সুনির্দ্দিষ্ট শাসনবিধি ছিল না, বিধিনির্দ্দিষ্ট কোন ধর্ম্মশাস্ত্রও ছিল না। বিশ্বাস ও ভাবের ঐক্যে গ্রথিত একটী শিথিলগ্রন্থি উপাসকসম্প্রদায়মাত্র, এই ছিল খৃষ্টীয় সমাজের আদিম অবস্থা।

যে পরিমাণে খৃষ্টধর্ম্ম দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল ও বিস্তার লাভ করিতে লাগিল, সেই পরিমাণে খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমশঃ নির্দ্দিষ্ট মতবাদ, নিয়মপদ্ধতি, শাসনবিধি ও শাসন-কর্ত্তার আবির্ভাব হইতে লাগিল। এক শ্রেণীর ধর্ম্মশাসকের নাম হইল প্রেস্‌বিটার বা প্রাচীন, তাঁহারাই পরে যাজক বা পুরোহিত হইলেন; আর এক শ্রেণীর নাম হইল এপিস্কোপয় অর্থাৎ পরিদর্শক, তাঁহারা পরে হইলেন বিশপ্; অন্য একশ্রেণীর নাম হইল ডিয়াকোনয় বা ডিকন্, তাঁহারা দরিদ্র পোষণ ও ভিক্ষা বিতরণের ভার পাইলেন।

এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ধর্ম্মাধিকারীবর্গের কাহার কি কার্য্য, কাহাঁর কি অধিকার ছিল, তাহা সূক্ষ্মভাবে নির্দ্দেশ করা এখন এক প্রকার অসম্ভব। পরস্পরের অধিকারের সীমারেখা সম্ভবতঃ অস্পষ্ট ও পরিবর্ত্তনশীল ছিল, কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। তথাপি এই দ্বিতীয় যুগের এই একটা বিশেষত্ব ছিল যে ধর্ম্মশাসনব্যবস্থায় তখন সাধারণ উপাসকবৃন্দেরই প্রাধান্য ছিল। কর্ম্মচারিনিয়োগ, বিধিনিষেধ-প্রবর্ত্তন প্রভৃতি সকল বিষয়েই সাধারণ উপাসকবৃন্দের মতই প্রবল ছিল। চর্চ্চের শাসনব্যবস্থা ও সাধারণ খৃষ্টীয় সমাজ এ দুইএর মধ্যে তখনও পর্য্যন্ত কোন পার্থক্য ছিল না। পরস্পর পরস্পর হইতে ব্যবহিত বা স্বতন্ত্র ছিল না। খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ে তখন সাধারণ জনবর্গের প্রভাবই প্রবল ছিল।

তৃতীয় যুগে সমস্তই পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তখন সাধারণ সমাজ হইতে পৃথক্ একটি যাজকসংঘ গঠিত হইল। এই যাজকসংঘের নিজেদের ধনসম্পত্তি ছিল, নিজেদের নির্দ্দিষ্ট এলাকা ছিল, নিজেদের একটা বিশেষ সংগঠনপদ্ধতি ছিল। এক কথায় ইহারা নিজেরাই একটা অন্যনিরপেক্ষ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ সমাজে পরিণত হইল। যে বৃহৎ সমাজের সম্পর্কে এই যাজকসংঘের সৃষ্টি ও স্থিতি, যে সমাজের উপর নেতৃত্ব করিয়া ইহাদের প্রসার ও প্রতিপত্তি, সেই সাধারণ খৃষ্টীয় সম্প্রদায় হইতে পৃথক্‌ভাবে ও স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার সামর্থ্য ও সঙ্গতি ইঁহারা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এই হইল খৃষ্টীয় চর্চ্চের সংগঠনক্রমের তৃতীয় ক্রম। এই আকারেই পঞ্চমশতাব্দীর প্রারম্ভে ইহার আবির্ভাব। রাজশাসনের সঙ্গে প্রজাবৃন্দের যে সমস্ত সম্পর্ক রহিত হইয়া গিয়াছিল তাহা নহে; বরং এমন সর্ব্বগ্রাসী শাসনব্যবস্থা আর কখনও হয় নাই; কিন্তু যেখানে যেখানে যাজকবৃন্দের

সহিত উপাসকসম্প্রদায়ের সম্পর্ক, সে সমস্ত বিষয়ে যাজকবৃন্দের প্রভাব অপ্রতিহত ছিল।

এই সময়ে খৃষ্টীয় যাজকসংঘের প্রভাব বৃদ্ধির আর একটী অন্যপ্রকারের কারণ ছিল। বিশপ্ ও যাজকগণই প্রধান প্রধান পৌরকর্ম্মচারী ছিলেন। আপনারা দেখিয়াছেন যে বাস্তবিকপক্ষে বলিতে গেলে শেষ পর্য্যন্ত রোমীয় সাম্রাজ্যের কেবল এই পৌরশাসনতন্ত্রটুকুই অবশিষ্ট ছিল। সম্রাট্‌দিগের যথেচ্ছশাসনের উপদ্রবে ও নগরগুলির অধঃপতন হওয়ায়, পৌরসংসদের পারিষদ্বর্গ নিরাশ ও উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এদিকে নবজীবনসম্পন্ন ও নবোদ্যমে বলীয়ান্ বিশপ্ ও যাজকবৃন্দ স্বভাবতঃই সকল বিষয় পরিদর্শন ও পরিচালন করিতে প্রস্তুত ও অগ্রসর হইলেন। এজন্য তাঁহাদিগকে দোষ দিলে, সমাজের সমস্ত ক্ষমতা তাঁহারা অনধিকার সত্ত্বেও গ্রাস করিয়াছেন বলিলে, অন্যায় হইবে। কারণ এই ব্যাপার স্বাভাবিক নিয়মেই সম্পন্ন হইয়াছিল। কেবল যাজকেরাই তখন নৈতিকবলে বলীয়ান্ ও সজীব ছিলেন, কাজে কাজেই তাঁহারা সকল ক্ষেত্রেই প্রভাবশালী হইয়া উঠিলেন। বিশ্বজগতের এই নিয়ম। তদানীন্তন সম্রাট্‌দিগের সমস্ত বিধিবিধানেই এই পরিণতির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। থিওডোসিয়াস্ বা জষ্টিনিয়ানের বিধিসংহিতা খুলিয়া দেখুন, দেখিবেন এমন অনেক বিধি আছে যাহা দ্বারা বিসপ্ ও যাজকদিগের উপর পৌরব্যাপার পরিচালনের ভার দেওয়া হইতেছে। এখানে জষ্টিনিয়ানপ্রবর্ত্তিত কয়েকটী বিধি দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

(১) নগর সমূহের বাৎসরিক কার্য্য পরিচালনের জন্য আমরা নিম্নোক্ত বিধান প্রবর্ত্তন করিতেছি। পৌর সম্পত্তির উপস্বত্ব বা দানসূত্রে প্রাপ্ত নগরের যত আয় আছে তাহার ব্যবস্থা করা; পূর্ত্তকার্য্য; শস্য ভাণ্ডার স্থাপন; পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ, স্নানাগার, বন্দর প্রভৃতির পরিরক্ষণ; প্রাচীর ও সেতু নির্ম্মাণ; পৌরব্যাপারসম্পৃক্ত মামলা মোকদ্দমা চালান, এসমস্ত ব্যাপারই এই পৌর কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত। আমরা বিধান করিতেছি যে বিসপ ও নগরের সর্ব্বোচ্চশ্রেণী হইতে নির্ব্বাচিত তিনজন লোক একত্র হইয়া একটি সমিতি গঠন করিবেন। তাঁহারা প্রতিবৎসর যে যে কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করিবেন; কার্য্যকারকগণ যাহাতে যথারীতি সমস্ত কার্য্য পরিচালন করেন, রীতিমত হিসাবনিকাশ দেন, পৌরকীর্ত্তি, রাজপথ, পয়ঃপ্রণালী, স্নানাগার বা অন্যান্য কর্ম্মের জন্য নির্দ্দিষ্ট অর্থ যাহাতে যথাযুক্তভাবে নিয়োগ করেন, এবিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

(২) ৫০০ স্বর্ণ মুদ্রার অনধিক আয়সম্পন্ন নাবালকদিগের অভিভাবক নিয়োগ সম্বন্ধে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার অনুমতির অপেক্ষা করিতে হইবে না, কারণ তাহাতে অনর্থক ব্যয়বাহুল্য হয়। আমরা বিধান করিতেছি যে এই সকল ক্ষেত্রে স্থানীয় বিশপ্ ও অন্যান্য পৌরপদধারিবর্গের সহযোগে পৌরশাসনকর্ত্তাই অভিভাবক নিয়োগ করিবেন।

৩। আমাদের ইচ্ছা বিশপ্, যাজকবর্গ, ভূস্বামিবর্গ, প্রধানবর্গ ও পৌরসংসদের পারিষদ্বর্গ একত্র হইয়া পুররক্ষক নির্ব্বাচন ও নিয়োগ করিবেন।

এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। সর্ব্বত্রই এক ব্যাপার লক্ষিত

হয় যে রোমীয়দিগের পৌরতন্ত্র ও মধ্যযুগের পৌরতন্ত্রের মধ্যবর্ত্তী স্থলে যাজকতন্ত্র ও পৌরতন্ত্রের এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। প্রাচীন পৌরতন্ত্রে পৌরশাসনকর্ত্তৃগণের প্রাধান্য ছিল; আধুনিকযুগের পৌরতন্ত্রগঠন অন্তর্বিধ, এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থলে দেখা যায় পৌরতন্ত্রে যাজকবর্গের প্রাধান্য।

এখন আপনারা দেখিতে পাইতেছেন যে খৃষ্টীয় চর্চ্চ, কতকপরিমাণে তাহার গঠন প্রণালীর দরুণ, কতকপরিমাণে খৃষ্টীয় জনবৃন্দের উপর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাবের দরুণ এবং কতকপরিমাণে পৌরব্যাপারে যোগ দেওয়ার দরুণ, কি প্রভূত ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছিল। এইরূপে খৃষ্টীয় চর্চ্চ এই যুগ হইতেই আধুনিক সভ্যতার বিকাশ সাধনে ও প্রকৃতি সংগঠনে প্রধান সহায় হইয়া চলিল। এখন একবার দেখা যাউক তখন হইতে খৃষ্টীয় চর্চ্চ কোন্ কোন্ বস্তু, কোন্ কোন্ উপাদান ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল।

প্রথমতঃ এইটাই একটা পরম লাভ যে সেই জড়শক্তিপ্লাবিত সমাজের মধ্যে এমন একটা শক্তিকেন্দ্র গড়িয়া উঠিল, যাহার প্রভাব ও শক্তি নৈতিক বা আধ্যাত্মিক,যাহার প্রতিষ্ঠা মানুষের বিশ্বাস ও ধারণার রাজ্যে, মানুষের হৃদয়বৃত্তির রাজ্যে। যদি সে সময় খৃষ্টীয় চর্চ্চ না থাকিত তাহা হইলে সমগ্র জগৎ বিশুদ্ধ জড়শক্তির কবলে নিপতিত হইত। একমাত্র চর্চ্চই কেবল নৈতিক শক্তির আধার ছিল। শুধু তাই নয়, সমস্ত মানববিধানের ঊর্দ্ধে যে একটা শ্রেষ্ঠতর বিধান আছে, শ্রেষ্ঠতর শাসনপদ্ধতি আছে, এ ধারণাটা চর্চ্চই পোষণ ও প্রচার করিয়াছিল। মানবের মুক্তিসাধনকল্পে, চর্চ্চ এই এক মৌলিক সত্য প্রচার করিল যে সমস্ত মানববিধানের ঊর্দ্ধে এমন একটা শাসনবিধি আছে,যাহা যুগভেদে ও প্রথাভেদে কখনও বা বিচারবুদ্ধিসিদ্ধ, কখনও বা বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট বলিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু যাহা সর্ব্বত্রও সর্ব্বকালে —আখ্যাভেদসত্ত্বেও— মূলতঃ এক, নিত্য, সনাতন।

এক কথায়, এই ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে একটি বড় ব্যাপার সাধিত হইল, সেটি হইতেছে ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক শাসনের পার্থক্য সাধন। এই পার্থক্য হইতেই ধর্ম্মবিবেকের স্বাধীনতা সাধন সম্ভব হইল। সুসম্পূর্ণ ও সুবিস্তৃত বিবেকস্বাতন্ত্র্যের মূলে যে তত্ত্ব, এই শাসনপার্থক্যের মূলেও সেই তত্ত্ব ভিন্ন অন্য কোন তত্ত্ব নাই। মানুষের আত্মার উপর, বিশ্বাসের উপর, সত্যের উপর যে জড়শক্তির, বাহুবলের কোন প্রভাব বা অধিকার নাই, এই ধারণার উপরই এই শাসনস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা। চিন্তাজগৎ ও কার্য্যজগৎ, বাহ্যব্যাপার ও অন্তর্ব্যাপারের মধ্যে যে প্রভেদ স্থাপিত হইল, তাহা হইতেই ইহার উদ্ভব। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে নৈতিক স্বাধীনতার জন্য ইউরোপ এত যুঝিয়াছে, যে নীতির প্রতিষ্ঠা হইতে এত দীর্ঘকাল লাগিল, অনেক সময় যাজকসংঘের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যে নীতি অগ্রসর হইয়াছে, ব্যক্তিগত বিবেকবুদ্ধির সেই স্বাতন্ত্র্যনীতি ইউরোপীয় সভ্যতার শৈশবেই ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক শাসনের স্বাতন্ত্র্যনামে উপস্থাপিত হইয়াছিল। এবং চারিদিকের বর্ব্বর প্রাধান্যের মধ্যে আত্মরক্ষার জন্য খৃষ্টীয় চর্চ্চই এই নীতির প্রবর্ত্তন ও সংরক্ষণ করেন।

তাহা হইলে পঞ্চম শতাব্দীতে খৃষ্টীয় চর্চ্চ ইউরোপীয় সমাজের তিনটি মহৎ কল্যাণ সাধন করেন,—(১) সমাজে নৈতিক প্রভাবের প্রতিষ্ঠা, (২) পার্থিব ব্যাপারে বিধাতৃবিহিত শাসননীতির সংরক্ষণ ও (৩) পার্থিব ও অপার্থিব শাসনতন্ত্রের স্বাতন্ত্র্যসাধন এমন কি, যে

সময়েও চর্চ্চের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে সমাজস্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল না। সেই পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেই এমন কতকগুলি অকল্যাণকর নীতির আবির্ভাব হইল, ইউরোপীয় সভ্যতার অভিব্যক্তির ইতিহাসে যাহার প্রভাব নিতান্ত অল্প নয়। প্রথমতঃ এই সময়ে চর্চ্চের শাসন ব্যবস্থায় শাসক ও শাসিত বর্গের মধ্যে একটা পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত হইল। শাসনকর্ত্তৃগণ শাসনাধীন জনবৃন্দের সম্পর্কে যাহাতে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হইতে পারেন, তাঁহারা যাহাতে জনবৃন্দের উপর স্বকীয় বিধান অবাধে চালাইতে পারেন, তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বাধীন বুদ্ধির সম্মতিসাপেক্ষ না হইয়া তাহাদের মন প্রাণ অধিকার করিয়া বসিতে পারেন, সেই দিকে চেষ্টা হইতে লাগিল। উপরন্তু চর্চ্চের চেষ্টা হইল যাহাতে সমাজে যাজকতন্ত্রনীতির প্রাধান্য স্থাপিত হয়, যাহাতে তাঁহারা পার্থিব শাসন ক্ষমতার উপরও স্বীয় অধিকারবিস্তার করিতে পারেন, যাহাতে তাঁহারা সমাজে একেশ্বর হইয়া রাজত্ব করিতে পারেন। এবং চর্চ্চ যখন পার্থিব রাজক্ষমতা করায়ত্ত করিতে, এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে অলক্ষ্য গতিতে যাজকতন্ত্র নীতির প্রাধান্য স্থাপন করিতে অপারগ হইলেন, তখন তিনি পার্থিক রাজবর্গের যথেচ্ছশক্তির ভাগী হইবার নিমিত্ত জনবর্গের স্বাধীনতার হানি করিয়া তাঁহাদের সহিত সহায়তাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

ইরোকোআদের গোষ্ঠি প্রথা

(৪) সংযুক্ত-জাতি

আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের ভিতর একাধিক জাতি সম্মিলিত হইয়া এক একটা লীগ বা জাতিসমবায় বা যুক্তজাতি গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই ধরণের "যুক্তজাতি"ই ইণ্ডিয়ান সমাজ-বিন্যাসে চরমতম কেন্দ্র।

অল্পসংখ্যক লোকের জাতিগুলা পরস্পর লড়াই করিয়া মরিত। ইহাদের অধীনে জমি থাকিত অনেক। পরস্পরের ভিতর ব্যবধানও স্থানহিসাবে যথেষ্ট। এই সকল অসুবিধা এড়াইবার জন্য মাঝে মাঝে আত্মীয় বা কুটুম্ব শ্রেণীর জাতিরা লীগ গড়িয়া তুলিতে ঝুঁকিত। কিন্তু লীগগুলা বেশীদিন টিঁকিত না। আবার দুর্যোগ চলিয়া গেলেই জাতিরা স্ব স্ব প্রধান হইয়া পড়িত। শেষ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই কোনো কোনো জাতি লীগ ভাঙ্গিয়া দিবার পরও আবার এক লীগ কায়েম করিয়াছে। ইরোকোআরা ইণ্ডিয়ানদের "সংযুক্ত জাতি" গঠনের প্রয়াসে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

মিসিসিপি দরিয়ার পশ্চিমে ইরোকোআদের আদিম বাসস্থান। ইহারা বোধ হয় বিশাল ডাকোটা সমাজেরই এক অংশ। নানা জনপদে বিচরণ করিতে করিতে অবশেষে ইহারা বর্ত্তমান নিউইয়র্ক প্রদেশে আসিয়া আড্ডা গাড়ে। ইরোকোআদের পাঁচ জাতি :—সেনেকা, কায়ুগা, ও নোণ্ডাগা, ও নাইডা এবং মোহক।

মাছ এবং হরিণের মাংস ইরোকোআদের প্রধান খাদ্য। আদিম ধরণের বাগান হইতে শাক শব্জীও আসে। ইহাদের পল্লীগুলা খুঁটার বেড়া দিয়া দুর্গাকারে সুরক্ষিত। ইহাদের লোক সংখ্যা বিশ হাজার। কোনো কোনো "গোষ্ঠী" পাঁচ জাতির প্রত্যেকটায়ই বিদ্যমান। ইহাদের সকলের ভাষা প্রায় এক ভাষারই বিভিন্ন শাখা স্বরূপ। "দেশগুলা"ও পরস্পর লাগা।

পুরাণা ইণ্ডিয়ানদিগকে খেদাইয়া দিয়া ইরোকোআ ইণ্ডিয়ানরা নিউইয়র্কের জনপদে জনপদে জুড়িয়া বসিয়াছিল। শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভের ফলে ইহাদের দখল অধিকার হইয়াছে। এই কারণে,—বোধ হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে—পাঁচ বিজয়ী জাতি "যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ" এক লীগ বা মিত্রসঙ্ঘে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে ইরোকোআ যুক্ত রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়। তখন ইহাদের তাঁবে ছিল বিপুল জনপদ। বহু নরনারী ইহাদের করদাতায় পরিণতও হইয়াছিল।

মেক্‌সিকো, নিউমেক্‌সিকো এবং পেরু এই তিন দেশের ইণ্ডিয়ানরা "বার্ব্বার" যুগের উচ্চতর স্তরে অবস্থিত ছিল। কিন্তু আমেরিকার অন্যান্য আদিমবাসীরা কোনোদিন বার্ব্বার অবস্থার নিম্নতর কোঠা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। নিউইয়র্ক প্রদেশের ইরোকোআ যুক্ত-রাষ্ট্র এই সকল নিম্নতর বার্ব্বার সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

ইরোকোআদের যুক্তরাষ্ট্রে নিম্নলিখিত বিধানের পরিচয় পাই :—

১। সমরক্তজ পাঁচ জাতি চিরকালের জন্য মিত্রসঙ্ঘে পরিণত হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ প্রত্যেক কাজে প্রত্যেক জাতি পুরাপুরি স্বাধীন। জাতিগুলার ভিতর পরস্পর সাম্যও সুরক্ষিত। রক্তের ঐক্যই এই যুক্তজাতির গোড়ার কথা। তিনটা জাতিকে জনকস্থানীয় বিবেচনা করা উচিত। ইহারা পরস্পর ভাই বলিয়া ডাকিত। অপর দুই জাতি ছিল সন্তান-স্থানীয়। ইহারাও পরস্পর ভাই স্বরূপ।

প্রত্যেক জাতির ভিতরকার 'গোষ্ঠী'গুলার ভিতরও রক্তের টান বেশ স্পষ্ট। সর্ব্বপ্রধান তিনটা গোষ্ঠী পাঁচ জাতির প্রত্যেকটায়ই জীবিত ছিল। গোষ্ঠীর লোকেরা (বিভিন্ন "জাতির" অন্তর্গত থাকা সত্ত্বেও) পরস্পর ভাই বলিয়া ডাকিত।

আর তিনটা গোষ্ঠীর লোকজন মাত্র তিনটা জাতির ভিতর জীবিত ছিল। ইহারাও পরস্পর ভাই বলিয়া ডাকিত।

ভাষার ঐক্যও পাঁচ জাতিকে এক পূর্ব্বপুরুষের এবং এক রক্তের কথা স্মরণ করাইয়া দিত। ইরোকোআ যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তির দুর্ব্বলতার কোনো কারণ ছিল না।

২। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ছিল সংযুক্ত সভা বা পরিষৎ। এই ফেডার‍্যাল সভায় বসিত পঞ্চাশজন সাখেম। ইহাদের ক্ষমতা এবং ইজ্জৎ সমান সমান। যুক্ত-জাতিসম্পর্কিত অর্থাৎ ফেডার‍্যাল সকল কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধেই এই পরিষদের অধিকার।

৩। যুক্তজাতিসম্পর্কিত কাজ কর্ম্মের জন্য প্রত্যেক জাতিকে এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীকে দায়িত্ব লইতে হইত। সেই সকল দায়িত্বের কাজে সংযুক্ত পরিষৎ পঞ্চাশ সাখেমকে বাহাল করিত। বস্তুতঃ ফেডার‍্যাল নামে এই পঞ্চাশটা পদ নয়া কায়েম করা হইয়াছিল। পদগুলার

জন্য কর্ম্মচারী বাছাই করা গোষ্ঠীর অধিকার। গোষ্ঠী দ্বারা ইহাদিগকে বরখাস্ত করাও সম্ভব। কিন্তু সংযুক্ত সভা মঞ্জুর না করিলে কোনো সাখেম সংযুক্ত কাজের গদিতে বসিতে পারিত না।

৪। সংযুক্ত পরিষদের কর্ম্মচারীস্বরূপ এই সাখেমরা নিজ নিজ জাতির সাখেমও থাকিত। নিজ নিজ জাতি সভায়ও ইহাদের আসন ছিল।

৫। সংযুক্ত পরিষদের সকল বিধানে "সর্ব্বসম্মতি" আবশ্যক।

৬। প্রত্যেক জাতি স্বতন্ত্র দলবদ্ধ ভাবে মত দিত। অর্থাৎ জাতি সভার লোকেরা সংযুক্ত সভায় বসিয়া আলাদা আলাদা যার যেরূপ খুসী ভোট দিতে পারিত না।

৭। যে কোনো জাতি সংযুক্ত সভার বৈঠক বসাইতে অধিকারী ছিল। আপন খেয়ালে সংযুক্ত সভা নিজের বৈঠক ভাঙিতে পারিত না।

৮। সংযুক্ত-পরিষৎ খোলা বাজারে কাজ চালাইত। ইরোকোআ সমাজের যে কোনো লোক সভায় উপস্থিত থাকিতে অধিকারী ছিল এবং আলোচনায় যোগ দিতেও পারিত। কিন্তু ভোট দিবার ক্ষমতা ছিল একমাত্র পরিষদের সভ্যদের।

৯। ইরোকোআ যুক্ত রাষ্ট্রের মাথায় কোনো নায়ক বা স্থায়ী কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিল না।

১০। লড়াইয়ের জন্য দুইজন নায়কের ব্যবস্থা ছিল। উভয়ের ক্ষমতা এবং কাজ কর্ম্ম একরূপ ও সমান। স্পার্টায় এই ধরণেরই দুই রাজাকে এবং রোমে দুই কন্সালকে শাসন পদ্ধতির প্রধান অঙ্গ স্বরূপ দেখিতে পাই।

এই গেল ইরোকোআদের রাষ্ট্র শাসনের রীতি। চারশ বৎসর ধরিয়া ইহারা এই পদ্ধতি অনুসারে সার্ব্বজনিক কাজ কর্ম্ম চালাইয়া আসিয়াছে। আজও এই শাসন পদ্ধতিই চলিতেছে।

(৫) সেকাল ও একাল

কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ইরোকোআদের জীবন যাত্রায় খাঁটি "রাষ্ট্র" নামক কোনো বস্তু গড়িয়া উঠিয়াছিল কি? মর্গ্যানের মতে ইরোকোআদের শাসন ব্যবস্থাগুলাকে "সমাজ" সঙ্ঘের বা সামাজিক কেন্দ্রের নিয়ম কানুনই বিবেচনা করাই উচিত। এই সমাজের লোকেরা রাষ্ট্র নামক সঙ্ঘ বা কেন্দ্র চিনিত না। রাষ্ট্র বলিলে "দণ্ড" দিবার ক্ষমতাওয়ালা একটা বিশেষ সঙ্ঘ বুঝায়। এই সঙ্ঘ সমাজের জনসমষ্টি হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু সেইরূপ দণ্ডধরের ধারণা ইরোকোআদের জন্মে নাই।

প্রাচীন জার্ম্মাণ "মার্ক" বা পল্লীস্বরাজের প্রতিষ্ঠানগুলা বর্ণনা করিতে যাইয়া মাওবারও এইরূপই বলিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় জার্ম্মাণরা সমাজশাসনের অধীনে জীবন ধারণ করিত। রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠান তাহাদের জানা ছিল না। সামাজিক কেন্দ্র-গুলা হইতেই রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রও গড়িয়া উঠিতে পারিত সন্দেহ নাই, পরে গড়িয়া উঠিয়া ছিলও। এই কারণে মাওবার প্রাচীনতম পল্লীপ্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডধরের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ ও স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন।

উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে একটা জাতি ক্রমশঃ বিশাল মহাদেশে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। এক একটা জাতি ভাঙিয়া

চুরিয়া নানা স্ব স্ব প্রধান জাতিতে পরিণত হয়। ভাষাও ভাঙিতে ভাঙিতে একদম স্বতন্ত্র নতুন নতুন বহু ভাষার সৃষ্টি করে। সেই গুলার ঐক্য ত দূরের কথা, পরস্পর সম্বন্ধও বুঝিয়া উঠা কঠিন হয়। এক একটা গোষ্ঠীও নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইতে থাকে। সাবেক গোষ্ঠী গুলাকে ফ্রাত্রীরূপে বজায় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধানতম গোষ্ঠীদের নাম এমন কি সুদূর-বিস্তৃত পরস্পরবিচ্ছিন্ন জাতির ভিতরও প্রচলিত। নেকড়ে এবং ভল্লুক ইণ্ডিয়ান সমাজের বহু জাতির ভিতরই গোষ্ঠীর নাম জোগাইতেছে। আর ইরোকোআদের যে শাসন প্রণালী বিরত হইল তাহা এক প্রকার প্রায় সকল ইণ্ডিয়ানসম্বন্ধেই খাটে। এইমাত্র প্রভেদ যে, কোনো কোনো জাতি উচ্চতম ফেডার‍্যাল বা সংযুক্ত জাতি গড়িয়া তুলিতে পারে নাই।

এই সমাজ শাসনের গোড়ার কথাই গোষ্ঠী। এই গোড়া হইতে ফ্রাত্রী এবং ফ্রাত্রী হইতে জাতি নামক সমাজ কেন্দ্রের উৎপত্তি। প্রত্যেক কেন্দ্রই রক্তের ঐক্যে গঠিত,—তবে ধাপের পর ধাপে ঐক্যটা কথঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত। প্রত্যেক কেন্দ্রই স্বরাট্ এবং তিন কেন্দ্রের পরিপূর্ণ জনসমাজ মানবজীবনের সকল কর্ত্তব্য পালনেই পুরাপুরি সমর্থ। সার্ব্বজনিক কাজের জন্য এই তিন প্রকার সমরক্তজ সমাজকেন্দ্রের অতিরিক্ত আর কোনো কেন্দ্র বা সঙ্ঘ আবশ্যক হয় না।

জগতের যেখানে যেখানে "গেন্স্" বা গোষ্ঠী নামক রক্ত কেন্দ্র বা বিবাহ ও পারিবারিক কেন্দ্র দেখিতে পাই সেই খানেই গোষ্ঠী ফ্রাত্রী জাতি সমন্বিত তিন কেন্দ্র পরিপূর্ণ জন সমাজের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলে বিচারে ভুল হইবে না। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমাণ সমাজ সম্বন্ধে অনেক তথ্য ঐতিহাসিকগণের নিকট পাইয়াছি। সেইগুলা সবই এই ইণ্ডিয়ানদের শাসন প্রণালীর অনুরূপ। যেখানে যেখানে গ্রীক রোমাণ জীবন বিষয়ক তথ্য কম মিলে, সেই সকল ক্ষেত্রে ইণ্ডিয়ান সমাজের নজির দেখিলেই প্রাচীনতম ইয়োরোপীয় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হইতে পারিবে।

কি অপূর্ব্ব সুন্দর সরল এই গোষ্ঠীপ্রথা! কোন ফৌজ, বরকন্দাজ, পাহারাওয়ালা, নবাব, আমীর, জমিদার, রাজাবাদসা, কোতোয়াল, হাকিম, জজ, জেল, মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদির দরকার হয় না। অথচ সকল কাজই চলিতেছে সিজিল মিছিল।

ঝগড়াঝাঁটি সবই গোটা কেন্দ্রের—গোষ্ঠীর ফ্রাত্রীর অথবা জাতির শালিসীতে মীমাংসা করা হয়। রক্ত-প্রতিহিংসার বিধান আছে বটে, কিন্তু সে প্রায় এক প্রকার ব্যতিরেক বিশেষ—চরম অবস্থার ব্যবস্থা মাত্র। আজকালকার প্রাণদণ্ড তাহারই আধুনিক রূপ। বর্ত্তমান যুগের সভ্যতা মাফিক সকল প্রকার সু-কু ইহার সঙ্গে জড়িত।

বর্ত্তমান কালের জটিল আমলাতন্ত্র এই সমাজে অপরিচিত। অথচ তাহার বিধানে আজকালের চেয়ে বেশী পরিমাণ সর্ব্বজনিক কাজ সামলানো হইয়া থাকে। বাস্তুভিটায় একাধিক পরিবার সমবেত ভাবে বসবাস করে। জমিজমা গোটা জাতির সম্পত্তি। তবে বাগান গুলাকে বাস্তুভিটার সামিল বিবেচনা করা হয় মাত্র। অর্থাৎ সাময়িক ভাবে এই জাতিগত সম্পত্তির উপর পরিবারের ভোগস্বত্ব থাকে।

মামলার বিচারে দুই দলই খোলসাভাবে সামনাসামনি নিষ্পত্তি করিতে অভ্যস্ত।

যুগযুগান্তরের গতানুগতিক সনাতন নিয়মগুলাই বিচার কার্য্যে আইনবিশেষ। নির্দ্ধন বা অভাবগ্রস্ত নামক কোনো শ্রেণী এই সমাজে নাই। বুড়া, রোগী এবং অকর্ম্মণ্য নরনারীর জন্য যৌথ সম্পত্তি হইতে ব্যবস্থা করা হয়। ব্যক্তিমাত্রেই স্বাধীন এবং পরস্পর সমান। মেয়েদের স্বাধীনতাও বাদ যায় না। গোলামের উৎপত্তি হয় নাই। পরাধীন বলিয়াও কোনো জাতি এখানে দেখা যায় না। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইরোকোআরা ঈরী এবং আর এক উদাসীন জাতিকে হারাইয়া নিজেদের সঙ্গে সমান ভাবে সংযুক্ত জাতির সামিল করিয়া লইতে চাহিয়াছিল। পরাজিতেরা এই সংযোগ বিধানে আপত্তি করায় তাহাদিগকে তাহাদের মুল্লুক হইতে খেদাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহাদিগকে গোলামে পরিণত করিবার অথবা বিজিত জাতি রূপে নিজ তাঁবে রাখিবার চেষ্টা করা হয় নাই।

এই সমাজের নরনারী কি খাসা! যে সকল শ্বেতাঙ্গ পর্যটক ইণ্ডিয়ানদের সংস্পর্শে আসিয়াছে, তাহারা ইহাদের আন্তরিকতা, ব্যক্তিত্ব, চরিত্রবত্তা এবং সৎসাহস দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে।

সাহসিকতার দৃষ্টান্ত সম্প্রতি আফ্রিকার আদিম অধিবাসিদিগের জীবনেও অনেক পাওয়া গিয়াছে। জুলু এবং নিউবিয়ান জাতির লোকেরা বিনা বন্দুকে এক মাত্র বল্লমের সাহায্যে ইয়োরোপীয় সৈন্যদিগকে কাবু করিতে পারিয়াছে। ইংরেজ পল্টন ইহাদের রণনৈপুণ্যে অনেকবার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বাধ্য হইয়াছে। ইংরেজরা বলে যে এক এক কাফির চব্বিশ ঘণ্টায় ঘোড়ার চেয়ে বেশী চলিতে সমর্থ।

সেকালের নরনারী ছিল এইরূপই। বর্ত্তমান যুগের ধনী-নির্দ্ধনশ্রেণীবিভক্ত সমাজের মজুর চাষীরা, বার্ব্বার যুগের গোষ্ঠীশাসিত স্বাধীন ব্যক্তিদের তুলনায়, যারপরনাই নগণ্য। দুয়ে প্রভেদ বিপুল।

কিন্তু এই খানেই সেই গোষ্ঠী সভ্যতার সীমানা। ইণ্ডিয়ানরা জাতি কেন্দ্রের উপরে উঠিতে পারে নাই। সন্ধির ফলে যে যে ক্ষেত্রে লীগ বা সংযুক্ত জাতি গড়িয়া উঠিয়াছিল সেই সকল ক্ষেত্রে একটা উচ্চতর কেন্দ্রের অধীনে শান্তি ও শৃঙ্খলা চলিত। কিন্তু অপারপর জাতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিত মাত্র খাদ্যখাদকের। জাতির বাহিরে অতএব গোষ্ঠীর বাহিরে *অতএব শত্রু—এই ছিল নীতি শাস্ত্র। আর শত্রুর উচ্ছেদ সাধনে পাশবিক নির্দ্দয়তার যথেচ্ছ* ব্যবহার চলিত।

প্রকৃতিকে ব্যবহার করিয়া প্রচুর পরিমাণে ধনোৎপাদন করিতে ইণ্ডিয়ানরা শিখে নাই। এই জন্যই সুবিস্তৃত মহাদেশের অতি সামান্যমাত্র জনপদে অল্প সংখ্যক নরনারীর বিকাশ সাধিত হইতে পারিয়াছিল। বস্তুতঃ তাহাদের জীবনের উপর প্রকৃতি অতি ভীষণ ভাবে দখল বসাইয়াছিল। জগতের যা কিছু সবই তাহাদের চিন্তায় গুহ্য, রহস্যময়, পবিত্র। এমন কি গোষ্ঠী, ফ্রাত্রী, জাতি ইত্যাদি সমাজকেন্দ্রগুলাও যেন প্রকৃতির গড়া প্রতিষ্ঠান, অতএব প্রণম্য, সকল অবস্থায়ই স্বীকার্য্য। এই রূপ ছিল তাহাদের চিন্তাপদ্ধতি, ইহাই তাহাদের ধর্ম্মের ভিত্তি।

বার্ব্বার যুগের গোষ্ঠীশাসিত জনসমাজগুলা সর্ব্বত্রই এইরূপ প্রকৃতির দাস।

কোনো একটা জাতিকে অপর কোনো জাতি হইতে সহজে পৃথক করা সম্ভব নয়। শিশুর মতন প্রত্যেকের নাড়ীই আদিম প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত। সেই সমাজ জগতের সর্ব্বত্রই ভাঙিয়া গিয়াছে। কিন্তু গোষ্ঠী প্রথার পরিবর্ত্তে সভ্যতার জগতে আসিয়াছে কি বস্তু? ধনীনির্দ্ধনপ্রভেদ, অর্থ পৈশাচিকতা. পরনিপীড়ন এবং সমবেত সামাজিক ধর্মজীবনের উপর দুইচার দশজনের প্রভুত্ব। সেকাল*আর একালে কি প্রভেদ? গোষ্ঠী-সমবায় বনাম "শ্রেণী"-বিরোধ।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

বিদ্বজ্জনবরেণ্য স্বর্গীয় আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের রাজনৈতিক জীবনের এক পৃষ্ঠা

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে যখন বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব্বাভাষে লর্ড কার্জ্জন চট্টগ্রাম বিভাগ মাত্র আসাম প্রদেশের সামিল করার জন্য প্রস্তাবের ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন, তখন ত্রিপুরা চট্টগ্রাম ও নওয়াখালী জেলার কলিকাতাস্থ ছাত্রাবাসসমূহে এক মহা আতঙ্কমূলক গভীর আন্দোলন উপস্থিত হইল। তখন উক্ত চট্টগ্রাম বিভাগীয় সম্মিলনী তদনীন্তন কলিকাতায় রাজনৈতিক গগনের প্রধান প্রধান ভাস্বরদের সহিত দিনের পর দিন দরবার করিতে যাইয়া, কোথায়ও বা ব্যর্থ মনোরথ হইতেন, কোথায়ও বা সাদর সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইতেন। সুদূর চট্টগ্রাম বিভাগের কথায় কাহারও প্রাণে তেমন বেদনার সঞ্চার হয় নাই। কিন্তু প্রথম দর্শনেই সৌম্যমূর্ত্তি প্রিয়দর্শন চৌধুরী মহাশয় আমাদের অতি আপনার হইয়া দাঁড়াইলেন। তখনও আন্দোলনটী কলিকাতায় ছাত্রাবাস হইতে সুদূর মফস্বলে কেন্দ্রীভূত হয় নাই। উদারহৃদয় চৌধুরী মহাশয় ছেলেদের এই আন্দোলনকে হেলার চক্ষে দেখিলেন না, বরং উৎসাহ দিয়া ইহার ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

তৎপূর্ব্বে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আর একবার চট্টগ্রাম বিভাগ আসামভুক্ত হওয়ার প্রস্তাব হয়। তখন ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামবাসী ছাত্রদের চেষ্টায় ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পরলোকগত মহামতি আনন্দ চার্লু দ্বারা প্রশ্নের সাহায্যে ইহার বিরুদ্ধে প্রবল লোক মত জ্ঞাপন করায়, সরকারের সেই কুচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

তাঁহার নিকট আমরা ছাত্রবৃন্দ যে আন্তরিক সহানুভূতি পাইয়াছি, তাহা ভুলিবার নয়। আমাদের ছাত্রাবাসের ছাত্রদের চেষ্টার ফলে বেঙ্গলী ও অমৃতবাজার পত্রিকায় চট্টগ্রাম বিভাগের আসামভুক্ত হওয়া প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র ভাবে প্রবন্ধ প্রকাশিত লাগিল। ক্রমে প্রধান প্রধান স্থানে আন্দোলনের ক্ষীণ রেখা দেখা দিল। তখন্ পর্য্যন্ত চৌধুরী মহাশয় শুভানুধ্যায়ী উপদেষ্টা মাত্র, আন্দোলনের কর্ম্মক্ষেত্রে স্বয়ং ঝাঁপাইয়া পড়েন নাই।

লর্ড কার্জ্জন বেঙ্গলী ও অমৃত বাজারের এই তীব্র আন্দোলনের ফলে জেদটী ভালরূপেই জাহির করিলেন। ১৯০৩ খ্রীঃ এক শুভ প্রাতকালে সরকারী পত্রে প্রকাশিত হইল শুধু

চট্টগ্রাম বিভাগ নয়, ঢাকা বিভাগ ও রাজসাহী বিভাগের সমগ্র জুড়িয়া আসাম সহ এক নব প্রদেশ গঠিত হইবে।

চৌধুরী মহাশয় আর আসরে না নামিয়া পারিলেন না। মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী সে সময়ে কলিকাতায় লোয়ার সার্কুলার রোডে অবস্থান করিতেছিলেন। যে দিন সেই সংবাদ বাহির হইল, সেই দিন সন্ধ্যায় চৌধুরী মহাশয় মহাশয় মহারাজ সূর্য্যকান্তের বাসভবনে হাইকোর্ট হইতে আসিয়া হাজির হইলেন। উভয়ের মর্ম্মব্যথা একই স্থানে, কাজেই পরামর্শ ও অভিসন্ধি স্থির হইতে সময় লাগিল না। তাঁহারা স্থির করিলেন প্রতিষ্ঠিত মফস্বলের জমীদারদের মুখপাত্র বঙ্গীয় জমিদারী সভাকে (Bengal Landholder Association) কেন্দ্র করিয়া এমন রাজনৈতিক আন্দোলনের সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহার প্রভাবে সরকার বাহাদুর কম্পিত হন ও রাজনৈতিক লোকশিক্ষায় দেশবাসীর আগ্রহ জন্মে। চৌধুরী মহাশয় মনে মনে স্থির করিলেন বাঙ্গালার রাজনৈতিক জীবনে নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে; আন্দোলনকে পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় কেন্দ্রীভূত করিয়া শত শত শাখা প্রশাখায় দেশময় তাহার তীব্র প্রভাব আপামর সর্ব্বসাধারণের উপর বিস্তার করিতে হইবে। মোট কথা তাহাকে মূর্ত্তিমান জীবন্ত করিয়া তুলিতে হইবে।

সেই সময়ে বঙ্গীয় জমীদার সভার সভাপতি মহারাজা সূর্য্যকান্ত ও সম্পাদক চৌধুরী মহাশয়। সহযোগী সম্পাদক ত্রিপুরাবাসী ছৈয়দ সমসুল হুদা।

মহারাজা বাহাদুরের যুক্তি ও তর্কের উপর প্রবল বন্যা বহাইয়া চৌধুরী মহাশয় মহারাজাকে বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনকে জীবন্ত মূর্ত্তিমান আন্দোলনে পরিণত করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন। রাজপুরুষদের রোষ ভয় হইতে বিমুক্ত হইয়া জাতীয় জীবন যজ্ঞে আহুতি দিতে মহারাজা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। সেই শুভসন্ধ্যায় দুই মহা কর্ম্মবীরের প্রাণের প্রতিজ্ঞায় বঙ্গদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের নব ধারার সূত্রপাত হইল।

বঙ্গীয় জমীদার সভাকে কেন্দ্র করিয়া তিনি সমবেত ভাবে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে এই লোকশিক্ষারূপ বঙ্গভঙ্গআন্দোলনের ভিতর দিয়া যে রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদান করিলেন তাহা এ দেশে নূতন। লোকমত গঠনের জন্য সহস্র সহস্র পুস্তিকা প্রচারিত হইয়া বিলি হইতে লাগিল। গণতন্ত্রবাদী পাশ্চাত্য দেশের অনুরূপ রাজনৈতিক আন্দোলনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কেন্দ্রে কেন্দ্রে তাহার প্রভাব বিস্তারের অভিনব প্রয়াস তিনিই প্রথম করেন। লক্ষ লক্ষ পুস্তিকার সাহায্যে এক দল দেশহিতৈষী শিক্ষিত যুবকবৃন্দ উত্তর বঙ্গ ও পূর্ব্ব বঙ্গের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে অতি অল্পকালমধ্যে যে মহা আন্দোলনের সৃষ্টি করেন ও প্রবল লোকমত গঠন করেন, তাহার প্রভাব দেখিয়া লর্ড কার্জ্জন বিস্মিত ও চকিত হইয়া উঠিলেন। তাহার অঙ্গুলি চালনায় নাইট সাহেবের প্রতিষ্ঠিত রেটক্লীক্ সম্পাদিত ষ্টেষসমান বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে সতেজে লেখনী চালাইলেন। এমন কি বাঙ্গালীবিদ্বেষী ইংলিযমানও সময় সময় বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিতেন। বঙ্গীয় জমীদার সভার কার্য্যালয়ে প্রণালী স্থির হইয়া দেশময় তাহার কার্য্যের প্রভাব বিস্তৃত হইত। প্রতি সন্ধ্যায় জমীদার সভাগৃহে একটী পরামর্শসভা বসিত। সংবাদ পত্রের মতামত সংগ্রহ জন্য, পুস্তিকা প্রচার জন্য, মফস্বলে

কর্ম্মী পাঠাইবার জন্য বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ ছিল। আমরা ইহার পর জাতীয় জীবনে এতদূর অগ্রসর হইয়াছি, বর্ত্তমানে ইহাকে গুরুতর কার্য্য বলিয়াই মনে হইবে না, কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সফলতা হইতেই আমরা আত্মনির্ভরের ভাব ও কার্য্য প্রণালী সুনিয়ন্ত্রিত করিবার শিক্ষা পাইয়াছি।

এই আন্দোলনে অস্থির হইয়া লর্ড কার্জ্জন মৈমনসিংহ ও ঢাকা যাইতে বাধ্য হইলেন। মহারাজার শশীকান্ত লজকে ২৪ ঘণ্টার জন্য সরকারী বাসভবনে পরিবর্ত্তিত করিয়া লর্ড কার্জ্জন মহারাজার অতিথি হইলেন। এবং ভোজনের টেবিলে মহারাজকে বলিলেন আপনি এই আন্দোলনের কর্ণধার কেন? মহারাজ উত্তর করিলেন আপনার দেশে টুইড নদীকে সীমানা করিয়া দুইটা কাল্পনিক প্রদেশের সৃষ্টি করিলে আপনার প্রাণে কি ব্যথা হয় না? যুক্তিতে হার মানিয়া লর্ড কার্জ্জন তাহার পর ঢাকায় আসিয়া নবাব ছলিমুল্লাকে মধ্যবিন্দু করিয়া আন্দোলনটিকে হিন্দু মুসলমানের একটী জীবন্ত বিরোধে পরিণত করেন।

চৌধুরী মহাশয় পূর্ব্বাহ্নে হাইকোর্টে মহামতি কটন সাহেবের বঙ্গভঙ্গ বিষয়ের রিপোর্ট সংগ্রহ করিয়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় জনৈক বন্ধুর সাহায্যে ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া তৎপরবর্ত্তী দিবসে তাহা পত্রিকা ও বেঙ্গলীতে ছাপাইয়া রাজনৈতিক আন্দোলনের বাজীমাত দেখাইয়া রাজপুরুষদের চমকাইয়া দেন।

দেশের জন শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া লোকমত গঠন করিলে তাহার শক্তি যে অপরাজেয় এবং সেই শক্তির নিকট প্রবল রাজশক্তিকেও মাথা নোয়াইতে হয় এই শিক্ষা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ভিতর দিয়া মহাপ্রাণ আশুতোষ দিয়া গিয়াছেন। আন্দোলনকে মূর্ত্ত করিতে হইলে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে তাহার প্রতি শিরায় উপশিরায় লোক মত গঠিত করিতে হইবে, এই শিক্ষা আশুতোষ দিয়া গিয়াছেন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় শিক্ষার যে কল্পনা দেশের মানস চক্ষে প্রতিভাত হয় তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা আশুতোষই করেন। সেই সুবিখ্যাত পান্তির মধ্যেই তিনি সেই বর্ষের এম, এ, পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা না দিতে উপদেশ দেন। ইহাই সেই গোলামখানার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান। সেই সুবিখ্যাত পান্তের মাঠেই পরলোকগত সুবোধ মল্লিক ও বাবু ব্রজেন্দ্র কিশোর হইতে ৬ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ের Bengal National Council of Education প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। আমরা চাহিনা তব শিক্ষা, চাই নব দীক্ষা এই মন্ত্রে দেশকে অনুপ্রাণিত করেন।

পরবর্ত্তী যুগে মহাত্মা গান্ধী যে অসহযোগ আন্দোলন সৃষ্টি করেন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বয়কটের ভিতরের, নূতন জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ভিতরে ও পল্লীতে পল্লীতে দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিতরে সেই বীজ অঙ্কুরে লুকায়িত ছিল। তাহার মূলে সেই মহাপ্রাণ আশু চৌধুরী। আজ তাহা ফল পুষ্প শোভিত হইয়া মহামহী-রূপে পরিণত হইয়াছে। আজ তাহার শক্তিতে দেশ শক্তিমান, নির্ভরশীল। তাহার পরিণতিতে নবজাগ্রত দেশ আত্মত্যাগের ও সত্যাগ্রহের বন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে।

শ্রীবিধুভূষণ দত্ত

যুগসমস্যা

এই ভাবে যদি আমরা চলি, সমাজ যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় শ্রদ্ধা করে চলে, আর ব্যক্তি যদি আপনার স্বাধীনতা সাধন করতে গিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে সংযম সাধন করে চলে, তাহলে দেখবে মানব সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধ নষ্ট হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের বৃহত্তর জীবনে আপনার ক্ষুদ্র জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে সমাজের বৃহত্তর শক্তির সঙ্গে আপনার ক্ষুদ্র শক্তি মিলিয়ে দিয়ে, সমাজকে বড় করে নিজে বড় হয়েছে। এই ভাবে যেমন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মিলন চাই, তেমনি জাতিতে জাতিতে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে মিলন চাই, ভারতবর্ষের এটা বিশেষভাবে প্রয়োজন। রাজা রামমোহন রায় তাই এ মিলন করবার চেষ্টা করেছিলেন।

এই মুহূর্ত্তের প্রধান সমস্যা এই যে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ, এটাও একটা মহাবিরোধ। বিরোধ সর্ব্বত্র ধর্ম্মে বিরোধ, সমাজে বিরোধ, রাষ্ট্রে বিরোধ, এই বিরোধে আমাদের উন্নতি কতকটা আটকা পড়েছে। এর মীমাংসা করতে হবে, বাইরের মিলনের পূর্ব্বে ঘরের মিলন করতে হবে, বিশ্বের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের পূর্ব্বে আমাদের সমাজের কোলাহল নিবৃত্ত করতে হবে।

এ কাজ ব্রাহ্ম সমাজ আরম্ভ করেছিল, রাজা রামমোহন রায় এ কাজ আরম্ভ করেছিলেন; তিনি একদিকে বেদান্ত, অন্যদিকে খৃষ্টান শাস্ত্র ও মুসলমান শাস্ত্র, এর মধ্যে মিলন বা সমন্বয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন, সকল ধর্ম্মের ভিতর সত্য রয়েছে, তার আশ্রয়ে তিনি একটা সম্মিলন ক্ষেত্র গড়তে চেষ্টা করেছেন, এটা মৌলিক সমন্বয়। তার পর কেশব চন্দ্র তার প্রচারের কাজ অনেক করেছেন, সে কাজ আর কেহ করেনি। গিরীশ বাবু হিন্দু মুসলমানের মিলনের জন্য যে কাজ করেছেন সে কাজও আর কেহ করে নি, গিরীশ বাবু প্রথম কোরান বাংলায় অনুবাদ করলেন। আমি হিন্দু ব্রাহ্ম সকলকে অনুরোধ করি এই গ্রন্থ কয় খানা—১০ ভাগ তাপসমালা—যদি পড়েন, তাহলে দেখতে পাবেন—ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে যারা আছেন তাঁদেরও বিশেষ ভাবে বলি, হিন্দু ভাইদেরও বিশেষ ভাবে বলি—তাঁরা যদি তাপস মালা পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন তাঁরা যে ধর্ম্মের আদর্শের অনুসরণ করছেন, সে আদর্শ খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মেও প্রকাশিত হয়েছে; এই যে একত্ব, এ একত্ব চিরন্তন একত্ব, সনাতন একত্ব। তখন তাঁরা মুসলমানকে মুসলমান বলে অগ্রাহ্য অশ্রদ্ধা করতে পারবেন না।

মুসলমানদেরও তাই করতে হবে; এই ভারতবর্ষে যে সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন বিদেশী ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে, খৃষ্টান আছে, মুসলমান আছে, পার্শী আছে, তাদেরও এ বিষয়ে একটা কর্ত্তব্য আছে। এই যে মুসলমান ভারতবর্ষে এসেছে, এতে ভারতবর্ষের ইসলাম ক্রমেই গড়ে উঠছে, ভারতবর্ষের মুসলমানদের ভিতর নূতন ভাব, নূতন সাধনা ক্রমেই প্রতিষ্ঠিত হচ্চে। আমি যখন সিন্ধু দেশে করাচী, হায়দ্রাবাদে যাই, সেখানে দেখেছি হিন্দু গুরু আছে, তার মুসলমান শিষ্য সে শিষ্য হিন্দু সাধনা করে না, তাদের সুফিবাদ, এটা ভারতবর্ষের ইসলামের শাখা স্বরূপ। ভারতবর্ষের চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে, ভারতবর্ষের চিন্তার প্রভাবে থেকে ইসলাম সাধনা যে আকার ধারণ করেছে, সুফিদের ভিতর তাইই দেখা যায়। এ স্বাভাবিক, গ্রীসের চিন্তার ও সাধনার সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রাচীন ইহুদী ধর্ম্ম যেমন গভীর উদার ও বিশ্বপ্রাণ হল, তেমনি ইসলাম

ভারতবর্ষে আসায় ভারতবর্ষের ইসলাম নূতন আকার গ্রহণ করবে না কেন? এখানকার প্রভাবে ভারতবর্ষের ইসলাম কি নূতন ভাবে গড়ে উঠবে না? ভারতবর্ষের মুসলমান নেতাগণের এটা কর্ত্তব্য যে ভারতবর্ষের মুসলমানগণের বৈশিষ্ট্য দ্বারা জগতের ইসলাম সাধনাকে পরিপূর্ণ করেন।

এ কাজ ব্রাহ্ম সমাজ আরম্ভ করেছিল। খৃষ্টান ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাই, ধর্ম্মেই মিলন করতে হলে এই সূত্রে করতে হবে. এদেশে যে সকল খৃষ্টান এসে বাস করেছেন তাঁরা ভারতবর্ষের সাধনার সঙ্গে খৃষ্টান সাধনা যুক্ত করে, ভারতবর্ষের সাধনার সঙ্গে খৃষ্টান সাধনা মিলিয়ে দিয়ে, ভারতবর্ষের সাধনার প্রভাবে খৃষ্টান সাধনাকে গড়ে তুলে, বিরাট একটা খৃষ্টান সাধনা জগতের সম্মুখে কি দাঁড় করাতে পারেন না?

আজ কাল যাকে হিন্দু ধর্ম্ম বলি এটা অবান্তর জিনিষ নয়, নানা স্রোতে মিশে বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্ম গড়ে উঠেছে। তেমনি ভারতবর্ষের সাধনা স্রোতের সঙ্গে মিশে ইসলামের সাধনা নূতন ভাবে গড়ে উঠবেনা কেন? খৃষ্টান সাধনা নূতন ভাবে গড়ে উঠবেনা কেন? এই ভাবে সমন্বয়ের চেষ্টা করতে হবে।

তারপর জাতিতে জাতিতে সমন্বয়। এটাও একটা বড় কাজ। এই যে বিরোধ, এ বিরোধকেও নষ্ট করতে হবে। যদি এই বিরোধকে নষ্ট করতে না পারি তাহলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই পৃথিবীর সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে—ইউরোপ আশঙ্কা করছে, অনেকে তাই আশঙ্কা করছে—ইউরোপীয় সভ্যতা বুঝি ভেঙ্গে গেল। এই যে জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, রেষারেষি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এই যে সমর আয়োজন, এতে ইউরোপ ধ্বংসের মুখে যাবে, যে বিপ্লব এসেছে এই বিপ্লবের মাঝখানে ভারতের প্রাচীন সাধনা ও সভ্যতা যা যুগযুগান্ত ধরে বজায় ছিল সেটা কি নিশ্চিহ্ন হবে, মুছে যাবে? এটা ভাবতে হবে, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে মিলনের চেষ্টা করতে হবে, এ মিলনে স্বাধীনতা বিন্দু পরিমাণেও সঙ্কুচিত হবে না, এ মিলনে দাস আর প্রভুর মিলন হবেনা—এ মিলন সৌখ্যের মিলন হবে, সমকক্ষের মিলন হবে, সুতরাং এই মহামিলনে আমাদের সাহায্য করতে হবে। তাহ'লে ভারতবর্ষকে বড় করে তুলতে হবে, জগতের অন্যান্য জাতির সমকক্ষ করে তুলতে হবে। এই ভাবে যদি এই সকল সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা করি, তাহলে আমাদের যতটুকু শক্তি সেই পরিমাণে বর্ত্তমান যুগ সমস্যার মীমাংসার কতকটা সাহায্য করতে পারব।

এ বিষয়ে এই আমার শেষ কথা—এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ কর্ত্তব্য আছে, এ বিষয়ে ব্রাহ্ম যুবকদের বিশেষ কর্ত্তব্য আছে, আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব যে পরিমাণে নষ্ট হয়েছে, সেই পরিমাণে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান যুগ সমস্যার সমাধানের সম্ভাবনা হ্রাস হয়ে গিয়াছে। আর কাকেও দেখি না, যার দ্বারা এ সমস্যার সমাধান হতে পারে—ব্রাহ্ম সমাজে দেখি না। এখানে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলতে পারব না। এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়েছিলেন প্রাচীন ব্রাহ্ম সমাজ। সে ব্রাহ্ম সমাজ আমরা দেখে এসেছি। সে ব্রাহ্ম সমাজ যে আদর্শ ধরে চলেছিল, সে আদর্শ আজ কোথায়? ব্রাহ্ম যুবকেরা কি সে আদর্শের অনুসরণ করছেন, না, তাঁরা অন্যান্যের মত বিষয়ে লিপ্ত হয়ে যাতে ধন মান যশ হয় তাতে ব্যস্ত

হয়ে আছেন; যখন ব্রাহ্ম সমাজে এসেছিলাম তখন ব্রাহ্ম সমাজে স্বাধীনতার মহা যজ্ঞ কুণ্ড রচিত হয়েছিল কোথায় সেই কুণ্ড, কোথায় সেই অগ্নি, কোথায় হোতা, কোথায় যজমান, কোথায় সেই পুরোহিত? ব্রাহ্ম সমাজে যখন প্রথম এসেছিলাম তখন বালকেরও মুখে শুনতাম এক প্রশ্ন—সত্য কি? ধর্ম্ম কি? সেই সত্যের অন্বেষণ আজ কোথায়? ব্রাহ্ম সমাজে যখন প্রথম এসেছি, তখন দেখিছি ব্রাহ্মদের ভিতর জ্বলন্ত বিষয়বৈরাগ্য? সেই বিষয় বৈরাগ্য আজ কৈ? সে ভাব ত কারো ভিতর দেখি না, ব্রাহ্ম সমাজে যখন প্রথম এসেছি, তখন দেখেছি একটা জ্বলন্ত মানব প্রীতি, কেবল আমার গণ্ডী নয়, কেবল আমার সমাজ নয়, কেবল আমার পরিবার নয়, সমগ্র মানবের কল্যাণ করতে হবে, সমগ্র দেশের কল্যাণ করতে হবে, সমগ্রের উন্নতির উপর আমার উন্নতি নির্ভর করে, সমগ্রের অভ্যুদয়ের উপর আমার অভ্যুদয় নির্ভর করে, আমি যেমন আমার পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যক্তিগত জীবন লাভ করি তেমনি আমার পরিবার, সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৃহত্তর জীবন লাভ করে। আবার তেমনি আমার সমাজ হাজার হাজার সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৃহত্তম জীবন লাভ করে, এই বৃহত্তম জীবন যদি ব্রাহ্ম সমাজকে লাভ করতে হয় তবে কেবল আপন গণ্ডীতে বদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না, কেবল ঘরের দরজা বদ্ধ করে সাধন ভজন করলে চলবেনা। ভিতরে যেতে হবে, সাধনের শক্তি লাভ করে বাহিরে আসতে হবে, আপনার সাধনলব্ধ জ্ঞান জগতকে দিবার জন্য আসতে হবে, প্রচারকভাবে নয়, কেবল দেবার জন্য নয়, তার নেবার কি কিছু নাই? অতি কৃপণ সে, যে নিতে সঙ্কুচিত হয়। অতি দরিদ্র সে, যে অপরের কাছ থেকে নিতে লজ্জা বোধ করে। প্রকৃত ধনী সে, যে নিতে জানে এবং দিতে পারে। প্রকৃত উদার সে, যে কারো কাছ থেকে কিছু নিতে লজ্জা বোধ করে না। আমার নিতে লজ্জা হবে কেন? এই যে নিতে লজ্জা, কারো কাছ থেকে নেব না, ইউরোপের কাছ থেকে নেব না, আমেরিকার কাছ থেকে নেব না, এই যে স্বজাত্যাভিমান—এ ত অভিমান নয়, এ ত আপনার মহত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, ক্ষুদ্রত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে ছোট সে ভাবতে পারে যদি কারো কাছ থেকে কিছু নিই তা হ'লে "আমি ছোট" এই প্রকাশিত হয়ে পড়বে। যে বড়, সে সেটা ভাবেনা। সে যেমন দিতে পারে, তেমন নিতেও পারে। ব্রাহ্ম সমাজ একদিন বাহিরের থোক নিয়েছে, দুই হাত দিয়ে নিয়েছে। পিপাসিত যেমন জল নেয়, একদিন ব্রাহ্ম সমাজ চতুর্দ্দিক থেকে তেমনি নিয়েছে, আজ কি ব্রাহ্ম সমাজ নিবেনা? বিধাতার প্রেরণা কি কেবল বেদেতেই আছে, তার পর কি নাই? উপনিষদেই আছে, তার পর কি নাই? কেবল কোরানেই কি আছে, তার পর কি নাই? আজও কি বিধাতা লীলা করেন না? এই ভারতবর্ষে এই বাংলাদেশে চারিদিকে কত জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা হচ্ছে, চারিদিগে কত প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, এই সকলের ভিতর থেকে ব্রাহ্ম সমাজের কি কিছু নেবার নাই? নিতে হলে যেতে হবে তাদের মাঝখানে, ঝাপিয়ে পড়তে হবে, আপনাকে বড় ভেবে নয়, তাদের উদ্ধারের জন্য নয়। নিজে উদ্ধার হবার জন্য তাদের মাঝখানে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। সকলের কাছে যেতে হবে, সকলকে গুরু মেনে যেতে হবে, শিক্ষক মেনে যেতে হবে, যার যা দিবার দাও ভাই! কি আছে তোমার গোপন

ধন? আন, আন, আন, আমি যে ভিখারী, আমার যে পিপাসার শেষ নাই, হে সাধক! হে যোগী, হে সন্ন্যাসী, হে ভক্ত, কি দেবে দাও, প্রাচীন নয়, নূতন।

সকলের সঙ্গে মতে না মিলতে পারে, মত বড় নয়। মতের চাইতে বড় সত্য, মতের চাইতে বড় জীবন, মতের চাইতে বড় সাধন, মতের চাইতে বড় সিদ্ধি, মত মনোময় কোষের কথা, প্রকৃত সত্য বিজ্ঞানময় কোষের কথা, তার উপরে সিদ্ধি, তার উপরে আনন্দময় কোষ ব্রহ্মলোক। সুতরাং এখানে সঙ্কুচিত হলে চলবেনা। কি কোথায় আছে দাও। আজ এই উৎসবের মুখে ব্রাহ্ম সমাজ কি বলতে পরে এস, এস এস, কে দেবে এস। তোমার কি আছে নিয়ে এস, এই আমার মন্দির, এই আমার ঠাকুর এখানে আমি বড় প্রদর্শনী খুলেছি এই প্রদর্শনীতে কার কি আছে নিয়ে এস। ভক্ত তোমার কি আছে নিয়ে এস, বাউল তোমার কি আছে নিয়ে এস, খ্রীষ্টান তোমার কি আছে নিয়ে এস। বৈষ্ণব, শাক্ত, মুসলমান, বৌদ্ধ তোমার কি আছে—নিয়ে এস। এরূপ ভাবে যদি একটা জ্বলন্ত বুভুক্ষা নিয়ে, জ্বলন্ত পিপাসা নিয়ে ব্রাহ্ম সমাজ আবার সত্যের সন্ধানে যেতে পারে, আবার যদি আদর্শের সঙ্কেত ধরে চলতে পারে, তবে আবার নব জীবন আনতে পারে। বড় প্রয়োজন, ব্রাহ্ম সমাজ একসময়ে স্বাধীনতার ধ্বজা তুলে সংস্কার বর্জ্জন করে এসেছিল। সংস্কার বর্জ্জিত স্বাধীনতার ধ্বজা তোলার আবার প্রয়োজন হয়েচে।

স্বরাজের কথা যে যাই বলুক না কেন, স্বাধীনতার ধ্বজা কোথাও দেখতে পাই না, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাতে তার একটা সত্য আদর্শ দেখতে পাই না। সামাজিক স্বাধীনতাতেও তার একটা সত্য আদর্শ দেখতে পাই না। আদর্শের পশ্চাতে পাগলের মত হয়ে ছুটে গিয়েছে তেমন লোক ত দেখতে পাই না। সকলে রামও বলে কাপড়ও তোলে। আদর্শের কথা কেবল মুখেই শুনি, সকলেই লাভ ক্ষতি গণনা করে বলে, হে যুবক তুমি বৃদ্ধ হও নাই হে ব্রাহ্ম সমাজের যুবক, তুমি বৃদ্ধ হও নাই, ১৬ বৎসরে তুমি বুড়া হও নাই। ২৫ বৎসরে বার্দ্ধক্যে অবসন্ন হয়ে পড় নাই, তোমাদের ক্ষতি লাভ গণনা করলে চলবেনা। লাভ ক্ষতি গণনা করে যদি চল, তবে সত্য লাভ হবেনা। যা বুঝবে সত্য বলে, ছুটে যাও তার পশ্চাতে; পেছনে কেউ তোমার বিদ্রূপ করলে, তোমার প্রতিবাদ করলে অসংযত হবে না। এই ভাবে ব্রাহ্ম সমাজকে চালাতে পারি, আমার এমন শক্তি নাই। তোমাদের প্রাণে আগুন জেলে দিই সে শক্তি আমার নাই কিন্তু ইচ্ছা হয় মরবার আগে আবার যেন অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত দেখতে পারি, যে আগুন দেখে পতঙ্গের মত নিজে ছুটে এসেছি। ভগবান তোমাদের কৃপা করুন।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

প্রাচীন ভারতে সাম্রাজ্যবাদ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মগধের রাজনীতিবিদগণ কিন্তু প্রাচীন ভারতের এই সনাতন রীতির পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে মগধপ্রদেশ ধর্ম্মবিপ্লবের সৃজন করিয়াছে—এখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সে একটী বিশিষ্ট মতবাদ লইয়া উপস্থিত হইল। মগধ আর অন্যান্য দেশের শ্রদ্ধাগুলি লইয়া সন্তুষ্ট থাকিল না—সে একেবারে সকলদেশ জয় করিয়া নিজের শাসনাধীনে আনিতে চাহিল। মহারাজ বিম্বিসার অঙ্গদেশ জয় করিয়া এই নীতির সূত্রপাত করেন। তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু লিচ্ছিবি ও তাহাদের মিত্র মল্লদিগকে পরাজিত করিয়া মগতের সীমাবৃদ্ধি করিলেন ও অপরদিকে কোশলের সহিত যুদ্ধ করিয়া কোশল অধিকার করিয়া লইলেন। এইস্থানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে মগধের রাষ্ট্রনেতৃগণ চিরকাল ক্রমাগতভাবে গণতন্ত্রগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। জরাসন্ধ বৃষ্ণি সংঘের মধ্যে ভেদনীতির বীজ বপন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে—; আবার অশ্বঘোষকৃত "সুমঙ্গল বিলাসিনী" পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে অজাতশত্রুর মন্ত্রী বাৎসকার বজ্জিদের প্রতি উক্ত নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তৎপরে কৌটীল্য, লিচ্ছিবিক, ব্রিজিক, মল্লক, মদ্রক, কুকুর, কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি সংঘের মধ্যে ভেদ জন্মাইবার জন্য কিরূপ কূটনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা তৎকৃত অর্থশাস্ত্রের "সঙ্ঘভেদ" অধ্যায় পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়।

বিম্বিসারীয় বংশের পর নন্দগণ মগধের সিংহাসনাধিরোহণ করিয়াও মগধের চিরন্তন জয়নীতির (Policy of annexation) অনুসরণ করিয়াছিলেন। পুরাণসমূহ একবাক্যে বলিতেছেন যে নন্দবংশীয়গণ ক্ষত্রিয়দিগকে উচ্ছেদ করিয়া তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করতঃ "রাজচক্রবর্ত্তী" পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঠিক্ এই সময়েই আমরা অবন্তী ও কৌশাম্বীর রাজবংশের চিহ্ন আর দেখিতে পাই না—তজ্জন্য অনুমান হয় যে পুরাণের উক্ত বাক্য সত্য ও নন্দগণ উচ্চআকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া ক্ষত্রিয়গণের রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। আর নন্দবংশীয়দের রাজ্য যে খুব বিস্তৃত ছিল একথা সেকন্দর সাহের সহিত আগত গ্রীকদিগের বিবরণী পাঠ করিলেও অবগত হওয়া যায়।

পররাজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ রাজ্যের বিস্তারনীতি কৌটীল্য কেবলমাত্র গ্রন্থ লিখিয়া উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হন নাই—তিনি নিজের জীবনেও এই নীতি পালন করিতে যাইয়া মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে সমগ্র উত্তরভারতের একচ্ছত্র সম্রাট পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার কূটনীতি ও রাষ্ট্রীয় প্রতিভা যেরূপ বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিল, সেরূপ আর ভারতবর্ষে দ্বিতীয়বার হয় নাই। তিনি বিজীগিষু নৃপতিকে উপদেশ দিতেছেন যে নিজের রাজ্যের নিকটবর্ত্তী শত্রুরাজ্য গ্রহণ করিয়া পরে মধ্যম রাজার রাজ্য গ্রহণ করিবে এবং তাহার পরে উদাসীন নৃপতির রাজ্যও বলপূর্ব্বক হরণ করিবে—পৃথিবী জয় করিবার ইহাই প্রথম নীতি। এই রাজনৈতিকের দৃষ্টি কেবলমাত্র রাজ্য-প্রসারের দিকেই নিবদ্ধ ছিল। সেই লক্ষ্য সম্পাদন করিবার জন্য কোন নৈতিক নিয়ম মানিবার প্রয়োজন তিনি বোধ করিতেন না।

তাই তিনি বিষ বা গুপ্তঘাতক দ্বারা প্রতিবেশী নৃপতিকে হত্যা করিতে উপদেশ দিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করেন নাই। উক্তকার্য্য সাধন করিবার জন্য বেশ্যা নিযুক্ত করাকেও পাপকার্য্য মনে করেন নাই। বিজীগিষু নৃপতির সহিত বন্ধুত্ব করিয়াও যে কেহ নিস্তার পাইবে, সে উপায় নাই—যখনই সেই বন্ধু কোন প্রকার রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করিবেন, তখনই তাহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখা হইত ও সম্ভব হইলে তাঁহার নিকটস্থ কোন শত্রু-রাজার সহিত তাঁহার ঝগড়া বাধাইয়া দিয়া কণ্টক দিয়া কণ্টক দূর করা হইত।

এইস্থলে আমাদের বিশেষরূপে মনে রাখা প্রয়োজন যে কৌটীল্যের এই অধর্ম্মমূলক রাষ্ট্রনীতির সহিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারার কোন সামঞ্জস্য ছিল না। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে প্রাচীন ভারতে পররাজ্য নিজ অধিকারে আনিয়া সাম্রাজ্যগঠন করা হইত না—এক্ষণে মগধের রাজনৈতিকগণ এই নূতন নীতি অবলম্বন করায় জনসাধারণ হয়ত ইহাতে সন্তুষ্ট হয় নাই, এজন্য কৌটীল্যকেও এ নীতি যতদূর সম্ভব শিথিল করিয়া লোকমতানুসরণ করিতে হইয়াছে। এইরূপ মতগ্রহণ করিলেই আমরা কৌটীল্যের অর্থশাস্ত্রের যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব—নতুবা ইহা কতকগুলি পরস্পর বিরোধী বাক্যের সমষ্টি বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কারণ যখন তিনি বিজয়ী রাজার প্রতি উপদেশ দিতেছেন যে নিহত রাজার দেশ, ধন স্ত্রী বা পুত্রের প্রতি লোভ করিও না ও সেই রাজ্যে নিহত রাজার আত্মীয়কে স্থাপন করিবে, তখন কৌটীল্য কেবলমাত্র প্রাচীনযুগের রাষ্ট্রনীতি ব্যাখ্যা করিতেছেন—তাঁহার নিজের মত বলিতেছেন না। (৮।১৬)। কেননা অন্যত্র (১৩।৫) তিনি বলিতেছেন "যশ্চ তৎকুলীনঃ প্রত্যাদেয়মাদাতুং শক্তঃ প্রত্যন্তাটবীস্থো বা প্রবাধিতুমভিজাতঃ; তস্মৈবিগুণাং ভূমিং প্রযচ্ছেৎ; গুণবত্যাশ্চতুর্ভাগং বা। কোশ দণ্ডদানমবস্থাপ্য যদুপকুর্ব্বাণঃ পৌরজানপদান্ কোপয়েৎ, কুপিতৈস্তৈরেণং—ঘাতয়েৎ" অর্থাৎ শত্রুকুলের মধ্যে যদি কেহ এমন থাকে যে বিজিতদেশ পুনরধিকার করিতে পারে ও সে প্রান্তদেশে বন্য ভূমিতে অবস্থান করে ও বিজয়ীর প্রতি উৎপাত করে, তবে তাহাকে অনুর্ব্বর ভূমি বা উর্ব্বর ভূমির একচতুর্থাংশ দিবে—কিন্তু এই সর্ত্ত করিবে যে বিজয়ীকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধন ও সৈন্য দিবে। সে যখন ঐ ধন ও সৈন্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিবে—তখন প্রজারা তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইবে ও তাহারা তাহাকে হত্যা করিবে"। কৌটীল্যের মতে এইরূপ সাধু উদ্দেশ্যের জন্য বিজিতরাজের আত্মীয়কে রাজ্যে পুনঃ স্থাপিত করিতে হইবে!

যদি কোন রাজা পরাজিত হইয়া শরণাপন্ন হন, তাহা হইলেও তিনি যে প্রাচীন যুগের ন্যায় নিজরাজ্যে স্বচ্ছন্দে শাসন করিতে পারিবেন, এরূপ সম্ভাবনা ছিল না। মৌর্য্যযুগে পরাজিত রাজা যে অবস্থা লাভ করিতেন, তাহা রোমানগণ কর্ত্তৃক বিজিত রাজ্য অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট ছিল। পরাজিত রাজা সম্বন্ধে কৌটীল্য বলিতেছেন—"দুর্গাদীনি চ কর্ম্মস্থাবাহবিবাহ পুত্রাভিষেকাশ্চ পণ্যহস্তিগ্রহণ সত্র যাত্রাবিহারগমণানি চানুজ্ঞাতঃ কুর্ব্বীত" অর্থাৎ—দুর্গাদি-নির্ম্মান, কোন দ্রব্যলাভ, বিবাহ, পুত্রের অভিষেক বাণিজ্য, হস্তিসংগ্রহ, যুদ্ধের জন্য স্থান নির্ম্মান, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা এই সকল কার্য্যেই স্বাধীন রাজার অনুমতি লইয়া করিতে হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে রোমাণগণ প্রদত্ত Jus commercium বা Jus

privatium কিছুই পরাজিত রাজাকে মৌর্য্যগণ দিতেন না। এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত রাজ্য কতদিন যে তাহার নামমাত্র স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিত, তাহা যাঁহারা রোমান বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার কাহিনী অবগত আছেন তাঁহাদিগকে আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে না।

এইরূপ নীতি অবলম্বন করিয়াও কিন্তু মৌর্য্য সাম্রাজ্য অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। তাহার পতনের নানারূপ কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে ঐ পতনের অন্যতম কারণ এই যে মৌর্য্যগণ ভারতের সনাতন রাষ্ট্রনীতিকে অবহেলা করিয়া উচ্ছেদতন্ত্র অবলম্বন সাম্রাজ্য করায় অনেকেই ইহার দুর্ব্বলতার দিন ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। সুঙ্গগণের সময়ে যে উক্ত নীতির প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা আমরা কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র পাঠে অবগত হইতে পারি। অগ্নিমিত্রের সৈন্য বিদর্ভ জয় করিল কিন্তু উক্ত রাজ্য নিজেদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া মাধবসেন ও যজ্ঞসেনের মধ্যে উহা বিভাগ করিয়া দিলেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রোমান সাম্রাজ্য যে Divide et empera, বা ভেদনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা এদেশে অপরিজ্ঞাত ছিল না। যখন মাধবসেন ও যজ্ঞসেনের মধ্যে বিদর্ভ ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে স্থির হইল তখন অমাত্যগণ বলিতেছেন—

দ্বিধা বিভক্তাং শ্রিয়মুদ্বহন্তৌ
ধুরং রথাশ্ববিব যংগ্রহীতুঃ।
তৌ স্থাস্যতস্তে নৃপতে নিদিশে
পরস্পরাবগ্রহ নির্ব্বিকারৌ॥

অর্থাৎ "যেমন রথাশ্বযুগল পরস্পর আক্রমণের অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়া সারথির বশে থাকিয়া দুইভাগে বিভক্ত রথভার বহন করিয়া থাকে, তেমন তাঁহারাও পরস্পরের আক্রমণে উদাসীন হইয়া আপনার অধীনে দ্বিধা বিভক্ত রাজ্যভার বহন করিবেন।"

মৌর্য্য যুগের রাজনীতির প্রতিক্রিয়ার কথা আমরা মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রেও দেখিতে পাই। মনু (৭।২০২) বলিতেছেন যে সকলের ইচ্ছা ভাল করিয়া অবগত লইয়া পরাজিত রাজার সিংহাসনে, উক্ত রাজার কোন আত্মীয়কে স্থাপন করা হউক ও বিজয়ী তাঁহার নিজের সর্ত্ত প্রদান করুন। বিষ্ণুও এই মতের কথা বলিতেছেন "শত্রুর রাজধানী জয় করিয়া তাহাতে উক্ত বংশের কোন বংশধরকে স্থাপন করিয়া তাঁহাকেই রাজ সম্মান দিবে"। কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনাকালে এই ভাবের কথা বলিতেছেন—

"গৃহীত প্রতিমুক্তস্য স ধর্ম্ম বিজয়ী নৃপঃ
শ্রিয়ং মহেন্দ্রনাথস্য জহার নতু মেদিনীম্"

বাণভট্ট কাদম্বরীতে বলিতেছেন যে দিগ্বিজয়কালে চন্দ্রাপীড় কোন রাজাকে উচ্ছেদ করেন নাই তাঁহাদের স্তুতিনতিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে স্বরাজ্যেই করদরাজারূপে রাখিয়াছিলেন

"শনৈঃ শনৈশ্চ পরিভ্রমন্, নতান্ নময়ন, আশ্বাশয়ম্ ভীতান্, রক্ষণ শরণগতান্, উন্মূলয়ন্

বিটপকান্ উৎসাদয়ণ কণ্টকান্, অভিষিন স্থান স্থানেষু রাজ পুত্রান্, সমর্জ্জয়ন রত্নানি, প্রতীচ্ছন পায়নানি, গৃধ্বন্ বারান্ আদিশন্ দেশব্যবস্থাঃ, স্থাপয়ন্ স্বচিহ্নানি, কুর্ব্বন্ কীর্ত্তনানি, লেখয়ন্ শাশনানি, পৃথিবীং বচচার”

ধর্ম্ম শাস্ত্রের উপদেশ ও কাব্য নাটকের বর্ণনা হইতে ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াও আমার মৌর্য্য নীতির পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। এলাহাবাদের স্তম্ভলিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে সমুদ্রগুপ্ত নিকটবর্ত্তী রাজ্যগুলির উচ্ছেদ করিলেও মৌর্য্যগণের ন্যায় সর্ব্বগ্রাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস করেন নাই—দক্ষিণাপথের রাজাদিগকে তিনি পরাজিত করিয়াও স্বরাজ্যে পুনস্থাপিত করিয়াছিলেন “সর্ব্বদক্ষিণাপথরাজগ্রহণ মোক্ষানুগ্রহ-জনিত প্রতাপ।”

এই প্রসঙ্গে একটী কথা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। কোন দেশ তাহার অতীত ইতিহাসকে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে পারে না। মৌর্য্যগণের বিশাল সাম্রাজ্য পরবর্ত্তী কালের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল, কিন্তু ওরূপভাবে স্থানীয় প্রতিভার বিকাশের পথে বাধা দিয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করা ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিবিরুদ্ধ হওয়ায়, গুপ্ত সম্রাটগণ একটা সামঞ্জস্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা নিকটবর্ত্তী রাজ্যগুলি লইয়া সাম্রাজ্য গঠন করিতেন, কিন্তু সেই সাম্রাজ্যকে অতিবিস্তৃত করিবার প্রয়াসী হয়েন নাই।

দাক্ষিণাত্য সম্রাট দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজনীতিও এইরূপ ছিল—লাটমালবের গুর্জ্জর কোশল কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ তিনি জয় করিলেও, তাহা রাজ্যান্তর্ভুক্ত করিয়া লন নাই। রাজ তরঙ্গিনীতে দেখা যায় কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্য বিজিত রাজাদিগের নিকট বিনয়বাক্য পাইলেই সন্তুষ্ট হইতেন, তাঁহাদের রাজ্য হরণ করিতেন না।

নম্রাঞ্জলিষু বন্ধেষু—রাজভির্ব্বিজয়ো ন্মমে
পার্থিব পৃথুবিক্রান্তি যুধি ক্রোধং মুমোচ বঃ॥ ৪।১১৯॥

প্রাচীন ভারতের সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, খণ্ড খণ্ড প্রদেশ গুলির স্বতন্ত্র প্রতিভাকে বিকাশ করাইবার সুযোগ এখানে প্রদত্ত হইয়াছিল। সেই সুযোগ দিবার জন্যই প্রত্যেক প্রদেশের অল্পাধিক পরিমাণে স্বাধীনতা দেওয়া হইত। কৌটীল্য উচ্ছেদ মন্ত্রের মহাপুরোহিত হইলেও, ভারতের সনাতন প্রথা যে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা, তাহা বিলোপ করেন নাই। তিনি বিজয়ী রাজাকে বলিয়াছেন “তস্মাৎসমানশীলবেষ ভাষাচারতা মুপগচ্ছেৎ। দেশদৈবতসমাজোৎববিহারেষু চ ভক্তিমনুবর্ত্তেত॥ তিনি সেই দেশের বেশ ভুষা আচার ব্যবহার ভাষা ও ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া চলিবেন। মনুও (৭।২০৩) উক্ত প্রকার উপদেশ দিয়াগিয়াছেন। বিষ্ণুও (৩।৪২) বলিতেছেন যে শত্রুর রাজ্যজয় করিয়া সে দেশের বিধি যেন রহিত না করা হয়। স্থানীয় প্রথাকে এতদুর সম্মান করা হইত যে, সমস্ত সাম্রাজ্য ব্যাপিয়া একপ্রকার মুদ্রা প্রচলনের পর্য্যন্ত চেষ্টা হয় নাই, যেস্থানে যেরূপ মুদ্রা প্রচলিত ছিল, সেই স্থানে সেইরূপ মুদ্রাই রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। Rapson বলেন Indian coin types are essentially local in character. At no period with which we are acqnainted, whether in the history of ancient or mediaeral

India, has the same kiud of coinage been cnrrent throughout one of the great empires. Each province of such an empire as a rule retained its own coin

এইরূপে সর্ব্বতোভাবে স্থানীয় প্রতিভার বিকাশের ক্ষেত্র ভারতবর্ষে ছিল বলিয়াই আমরা বাৎস্যায়নের কামসূত্রে প্রত্যেক প্রদেশের স্বতন্ত্র সভ্যতার পরিচয় পাই—প্রত্যেক প্রদেশের স্বতন্ত্র ভাষা ও স্বতন্ত্র ধর্ম্ম গঠিত হইয়াছিল। আর সেই জন্যই ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা এতগুলি মতবাদ পাইয়াছি।

কিন্তু কোন নীতিই সর্ব্ব গুণের আকর হইতে পারে না। মানব অসম্পূর্ণ—তাহার সকল কাজেই অসম্পূর্ণতা থাকিবে। তাই ভারতীয় সম্রাজ্যে উক্ত গুণ বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইলেও, তাহার এই মহৎ দোষ ছিল যে বিভিন্ন প্রদেশগুলি পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে পরিচিত হইয়াও একরূপ জীবন যাপন করিয়া সুদৃঢ় ভাবে সংযুক্ত হইতে পারে নাই—ভারতীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে একটীও রোমান সাম্রাজ্যের ন্যায় সুদৃঢ় ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ভারতবর্ষকে ছাড়িয়া দিলে উপনিবেশগুলি লইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বোধ হয় পুনরায় সেই সমস্যার অবির্ভাব হইবে।

শ্রীবিমান বিহারী মজুমদার

বিপদে

রামশর্ম্মার (৺নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের) ইংরাজী কবিতা হইতে]

দুখ বিপদের গভীর রজনী যবে
ছড়াবে হৃদয়ে অন্ধকাররাশি যত ;
হয়োনা নিরাশ, হয়োনা নিরাশ ভবে,
বিশ্বাসআলোকে দীপ্ত করো তব পথ।
অগ্রসর হ'য়ো, বিপদে না করি ভয়,
অন্ধকারতম রজনীও নাহি রবে,
হেরিবে অদূরে আশা-সূর্য্যালোকোদয়,
আনন্দ-প্রসূন পথে প্রস্ফুটিত হ'বে।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

স্বর্গীয় রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শারদীয় পূর্ণিমার চন্দ্রকিরণধারায় যখন ব্রজভূমি প্লাবিত হইতেছিল, পুষ্পভারে অবনত পাদপশ্রেণী যখন মধুধারা বর্ষণ করিতেছিল, মত্তভ্রমরগুঞ্জনে কুঞ্জবন মুখরিত হইতেছিল, অকস্মাৎ বাঁশী বাজিয়া উঠিল, যমুনা পুলকে ফুলিয়া ফুলিয়া বিপরীত দিকে বহিল। বায়ু স্তম্ভিত হইল, কুলবালাগণ আপন আপন কর্ম্ম অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়া সুর লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। এ কি কবির কল্পনা? সুরের আকর্ষণী শক্তি কি অস্বীকার করা যায়? হরিণ ব্যাধের বংশীনাদে আকৃষ্ট হইয়া ধরা পড়ে, এ কথা কি মিথ্যা? পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক ৺ নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে একজন সাধু মহাজনের সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া একটী কুকুর এত অচলপ্রায় হইয়াছিল, অনেক তাড়নায়ও সে নড়িল না। অবশেষে গান থামিলে পর চলিয়া গেল। শব্দের উদ্দীপনা শক্তি এবং সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি অস্বীকার করা যায় না।

পঁয়তাল্লিশ বৎসরের কথা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমার অশিক্ষিত স্বরেই তখন ভক্তেরা তৃপ্ত হইতেন। অকস্মাৎ একদিন উপর হইতে একটী নূতন সুর ভাসিয়া আসিল। ভক্ত নরনারীর প্রাণপাত্র ছাপাইয়া ভাব উচ্ছসিত হইল। শিক্ষিত কণ্ঠ হইতে গান উঠিল—

"প্রাণ পিঞ্জরের পাখী
গাও না রে"

ভক্তিভাজন প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বেদী হইতে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিলেন "আবার গাও, আবার গাও," একটা গানই এক ঘণ্টা ধরিয়া চলিল। সঙ্গীত সুধা পান করিয়া সকলেই পরিতৃপ্ত হইলেন এবং উৎসুকচিত্তে গায়কের সন্ধান নিয়া জানিলেন তিনি রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। রামপুরহাটের স্কুলের পণ্ডিত।

গোস্বামী মহাশয়ের ভজনা ও রাজকুমার বাবুর কণ্ঠ, ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির যুগ আনয়ন করিয়াছিল। গোস্বামী মহাশয় তাঁহার সঙ্গীতে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন, একদিন সশিষ্য তাঁহার গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কানে কানে বলিয়াছিলেন

"তোমার হৃদয় আমার হইল,
আমার হৃদয় তোমার হইল"।

শেষ জীবনে রাজকুমার বাবুকে অর্থাভাবে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু দারিদ্র্যের কসাঘাতে ক্লিষ্ট হইয়াও তিনি সঙ্গীতচর্চ্চা ছাড়েন নাই। আমি "নৌকা বিলাস" প্রভৃতি পালা প্রস্তুত করিবার পর তিনি কথকতা প্রণালীতে ভক্তি প্রচার করিবার সঙ্কল্প করিয়া "জগাই মাধাই উদ্ধার" "ধ্রুবচরিত্র" "প্রহ্লাদ চরিত্র" "বামণ ভিক্ষা" প্রভৃতি অতি সুন্দর পালা ব্যাখ্যা করিতেন এবং সুকণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তনে সকলকে মুগ্ধ করিতেন।

তাঁহার প্রথম গুরু ৺ পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়। তাঁহারই নিকট তাঁহার সঙ্গীত শিক্ষা।

মৃত্যুর চারি বৎসর পূর্ব্বে তিনি একজন সাধুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁহার কৃতিত্ব অল্প ছিল না। রামপুরহাটে তিনি পুলিশপীড়িত বহু যুবককে আশ্রয় দিয়াছেন, তাঁহার স্বদেশী সঙ্গীতে উদ্দীপনার তড়িৎ প্রবাহিত হইত। একদা "বল মা বিধির এ কি বিধি" এই গানের দ্বারা জনসংঘকে এত উত্তেজিত করিয়াছিলেন, যে অবশেষে পুলিশ আসিয়া তাঁহার গান থামাইয়া দিল।

শেষবার কলিকাতায় আসিয়া দেহরক্ষার জন্যই যেন স্বধাম নবদ্বীপে সত্বর ফিরিয়া গেলেন। ভক্তেরা আনন্দধামে তাঁহাকে পাইয়া উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিতেছেন।

শ্রীসুন্দরী মোহন দাস।

স্বর্গীয় সার আশুতোষ চৌধুরী।

১৮৮৬ সালে আমি প্রথম স্বর্গীয় মহাত্মা আশুতোষ চৌধুরীকে জানিতে পারিয়াছিলাম। ১৯০১ হইতে ১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত বিশেষ ভাবে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিবার আমার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। সেই সময়ে তাঁহার হৃদয়ের উচ্চতম আশা ও আকাঙ্খা এবং তাঁহার দেশ সেবার ও জন সেবার প্রণালী সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমার জানিবার সুযোগ হইয়াছিল। বাংলার তিনি কি ছিলেন তাহা জানিবার সেইরূপ সুবিধা হয়ত অনেকের হয় নাই। বোধ হয় সেই জন্য সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক ঐ স্মৃতির তর্পণে যোগ দিতে আদিষ্ট হইয়াছি। এই অতর্কিত আদেশে বাধ্য হইয়া নিতান্ত অপ্রস্তুত অবস্থায়, যাহা দেখিয়াছিলাম ও জানিয়াছিলাম তাহারই কয়েকটি কথা বলিবার জন্য, আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়, মৃত মহাত্মার সর্ব্বজনপ্রীতি, ব্যবহার সৌজন্য, জাতীয় শিক্ষা প্রচার, তাঁহার অগাধ অনুরাগ ও অপরিসীম যত্ন, তাঁহার সুকুমার ও সর্ব্বপ্রকার কলা শিল্পের প্রতি অশেষ অনুরক্তির কথা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার অতুলনীয় সৌভ্রাত্র, তাঁহার, কমনীয় পরিজনপ্রিয়তা, তাঁহার দেশপ্রেম, দীনে দয়া, বিপন্নের সহায়তার অশেষ দৃষ্টান্তের বিস্তৃত বিবরণ আপনারা শুনিয়াছেন। কিন্তু সকলাপেক্ষা যে সাধনায় তাঁহাকে সর্ব্বদা অভিভূত রাখিত, তাঁহার সেই একনিষ্ঠ দেশপ্রেমের কথা শ্রীযুত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় বলিতে গিয়াও থামিয়া গিয়াছেন—কেন না তাঁহার মতে সাহিত্যপরিষদে "রাজনীতির আলোচনা না করাই সমীচীন।" তিনি হয়ত মনে করিয়াছেন সব কথা বলিতে গেলে হয়ত রাষ্ট্রনীতির ভিতরে আসিয়া পড়িতে হয়। কিন্তু জীবিত ব্যক্তির সম্বন্ধে যাহা রাষ্ট্রনীতি স্বর্গগত মহাত্মাদের সম্বন্ধে তাহাই ত ইতিহাস। ইতিহাসের আলোচনায় কখনও

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শোকসভায় পঠিত।

কোনও দোষ হইতে পারে না, সাহিত্য পরিষদেও না। আশা করি সভাপতি মহাশয় আমাকে ঐরূপ ঐতিহাসিক কথার দুই একটা দৃষ্টান্তের অবতারণার অনুমতি দিতে দ্বিধা করিবেন না। বৰ্দ্ধমানে বঙ্গের প্রাদেশিক সমিতির সভাপতির অভিভাষণে তিনি পরাধীন জাতির রাষ্ট্রনীতি চর্চ্চার ব্যর্থতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অনেকেরই স্মরণ আছে এবং আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা মহাশয়েরা সকলেই তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় কেহই এই সংক্ষিপ্ত চুম্বক মূলসূত্রটির কোনও ব্যাখ্যা করেন নাই। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় মনে হয় মহাত্মাজির Doctrine of non-co-operationএর ইহা একটি খাঁটি পূর্ব্বাভাস। আপনারা আজকাল, পরাধীন জাতির রাষ্ট্রনৈতিক সাধন মন্ত্ররূপে, Passive Resistance, Non-co-operation, Responsive Co-operation, Civil Disobedience প্রভৃতি কত কথাই শুনিতেছেন। আমি এই সকল চুম্বকসূত্র গুলির কোনও বাঙ্গলা অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিব না। কেবল আপনাদের নিকট ইহাই নিবেদন করিতে চাই যে আপনারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন যে চৌধুরী মহাশয়ের A subject race has no politics কথার মধ্যে এই সব সংক্ষিপ্ত সূত্র স্থান পায় কি না। ভারতব্যাপী আন্দোলনে আজ কাল পথে ঘাটে সর্ব্বত্র যে সব কথার পুনঃ পুনঃ ব্যবহার হইতেছে, প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে অসীম সাহসিকতার সহিত চৌধুরী মহাশয় দেশের মঙ্গলকামীদের ভিতর অকুতোভয়ে তাহারই পূর্ব্বাভাস ঘোষণা করিয়াছিলেন।

সেই সময়ে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক সভা সমিতির কি ব্যবস্থা ছিল, তাহা হয়ত আজ অনেকেরই স্মরণ নাই। ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সভা ও ভারত-সভা তখন রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সবিশেষ প্রতিপত্তিশালী। স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পালের নেতৃত্বে বাঙ্গালার ভূস্বামীগণ ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সভার পৃষ্টপোষক। সুরেন্দ্র বাবু ভারতসভার প্রাণ ও কর্ণধার। উভয় সভাই আবেদন নিবেদন লইয়া ব্যস্ত। কংগ্রেস কনফারেন্সেও সেই সব প্রচলিত ধারার অনুসরণে সমস্ত শক্তি প্রার্থনাপত্রের উদ্গিরণে পর্য্যবসিত হইতেছিল। আর ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সভা, বেসরকারী সাহেবীদলের সহযোগিতার মোহে দেশদ্রোহিতার সীমায় আসিয়া পৌছিয়া ছিলেন। স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিয়াও বলিতে পারি যে বাঙ্গলার ভূস্বামীগণ সেই যুগে নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনচিত্ততা একেবারে হারাইয়া ফেলিয়া ছিলেন। দুর্গতির চরম সীমার উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারা যায় যে অতি হীনভাবে সাহেবী সহানুভূতি আকর্ষণ করার জন্য লর্ড রিপনের খাজনার আইনের খসড়াকে তাঁহারা Ilbert Bill No II বলিয়া প্রকাশ্যভাবে অভিহিত করিয়া ছিলেন। এই সব ব্যবহারে দেশের দুর্গতির প্রতিরোধের জন্য চৌধুরী মহাশয় বাঙ্গলায় একটি স্বাধীনচেতা ও স্বাবলম্বী মনস্বী সম্প্রদায় গঠনে একটি রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সৃজন করিয়া বঙ্গদেশের চিন্তার ধারার গতি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। মৃত মহাত্মার নির্দ্দেশে ও ঐকান্তিক চেষ্টায় পরলোকগত মহারাজা সূর্য্যকান্ত ও আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে এখনও বর্ত্তমান মহারাজা নাটোর বাঙ্গলার অধঃপতিত ভূস্বামীদের মধ্য হইতে কয়েকটিকে লইয়া এক নির্ভীক, স্বাবলম্বী ও স্বাধীনচেতা সম্প্রদায় গঠন করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, লাল-

মোহন ঘোষ, তারকনাথ পালিত, এস্ পি সিংহ, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, সত্যরঞ্জন দাস, চিত্তরঞ্জন দাস, রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, রায় পার্ব্বতীশঙ্কর প্রভৃতি প্রবীন ও নবীন ব্যবহারাজীব ও দেশের একনিষ্ঠ সেবক লইয়া সেই মণ্ডলী গঠিত হইয়া ছিল। লর্ড কার্জ্জন যখন Indian Universities Commissionএর সৃষ্টি করিয়া দেশে উচ্চশিক্ষার বিভ্রাট ঘটাইতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তখন ইহারাই চৌধুরী মহাশয়ের প্রদর্শিত পথে সেই চেষ্টার প্রথম পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ান। তারপর বাঙ্গলা বিধ্বস্ত করিবার দ্বিতীয় অমোঘ অস্ত্র বাঙ্গলা বিভাগ। আজ বিস্তারিত-ভাবে সেই পুরাতন কথার অবতারণা করিয়া আপনাদের সময় নষ্ট করিতে সাহস হয় না, কিন্তু আশা করি আজ সকলেই স্মরণ করিবেন যে মহাপুরুষ সাক্ষাতে ও পরোক্ষে সেই বিপুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত স্বাধীনতার বৈজয়ন্তী তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, আজ তাঁহারই পবিত্র স্মৃতির সম্মান করিবার জন্য আমরা একত্রিত হইয়াছি। এই আন্দোলনে যাঁহারা প্রাণপাত করিয়া অশেষরূপে চৌধুরী মহাশয়ের সহায়তা করিয়াছিলেন, বিশেষভাবে আজ তাঁহাদিগকেও মনে পড়িতেছে—পরলোকগত একনিষ্ঠ-দেশসেবক ভ্রাতৃযুগল স্বর্গীয় শিশিরকুমার ও মতিলাল ঘোষ। কেহ অত্যুক্তি মনে করিবেন না, সেই আন্দোলনেই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে প্রথম সাড়া পড়িল। জন মর্লীর "Settled Fact"এর কথা আপনাদের সকলেরই স্মরণ আছে। সেই আন্দোলনের তরঙ্গ "Settled Fact" কোথায় উড়িয়া গেল। মেমোরিয়াল গেল বটে, কিন্তু আর সেই কাহ্নীর গাথুনী তাহাতে রহিল না। জোরের সহিত বলা হইল ইহা সমগ্র বাঙ্গলার অধিবাসীর সমবেত দৃঢ় আকাঙ্খা—ইহা অবশ্যই শুনিতে হইবে It must be heard আন্দোলন বাঙ্গলা হইতে ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল—বাঙ্গলার গৃহকথা ভারতের সম্মিলিত বাণী হইল। মহারাষ্ট্রীয় চিৎ পাবন ব্রাহ্মণ হইতে পঞ্জাবের আর্য্য ও মান্দ্রাজের পঞ্চমা দেশমাতৃকার আহ্বানে জাগিয়া উঠিলেন—আন্দোলনের ঢেউ সজোরে সাগর পারে গিয়া পৌঁছিল। ভারতের ভাগ্যবিধাতা—লর্ড হার্ডিংকে পাঠাইয়া দ্বিধাবিভক্ত বাঙ্গলাকে জোড়া লাগাইলেন। বাঙ্গালীর নব জীবন লাভ হইল। চৌধুরী মহাশয় চিরদিনের মতন বাঙ্গলার হাওয়া ফিরাইয়া দিতে সক্ষম হইলেন। আজ আপনাদের স্মরণ করা উচিত কাহার অদম্য চেষ্টায় ও অসীম সাহসিকতায় খাটোয়াদের সেই নির্ব্বাণোন্মুখ লক্ষ্মীতুলসী কাপড়ের কল বাঙ্গলার বঙ্গলক্ষ্মী মিলে পরিণত হইয়াছিল। "স্বদেশীর" প্রতিজ্ঞা বৃদ্ধ প্রৌঢ়ের আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া যুবক ও বালক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বিস্তার করিয়া চলিল। ঘরে ঘরে Haterseyloom ও fly shuttle loom এর আবির্ভাবের আয়োজন হইল। চৌধুরী মহাশয় গ্রামে গ্রামে সুতা যোগাইয়া এই সখ তাঁত বাচাইয়া রাখিলেন। স্বদেশী জিনিষের ডাক পাতিয়া গেল। খাঁটী দেশী মাল সরবরাহ করিবার জন্য ইণ্ডিয়ান ষ্টোরের সৃষ্টি হইল। আর চামড়া ট্যানিং শিখাইবার জন্য চৌধুরী মহাশয় নিজব্যয়ে মান্দ্রাজে পরলোকগত দেবেন্দ্র নাথ চৌধুরীকে পাঠাইলেন। ইনি দেশী ট্যানিং কিছু কিছু জানিতেন। কাজেই খুঁজিয়া তাহাকেই বাহির করা হইল। দেবেন বাবু ট্যানিং শিখিয়া ফিরিয়া আসিলে চৌধুরী মহাশয় ও আরও চারিজন লোকের প্রদত্ত সামান্য মূলধন লইয়া

একটি ছোটখাট ট্যানিংয়ের কারখানা চারিনম্বর পুলের নিকট খোলা হইল। দেবেন চৌধুরী সেই কারখানার অধ্যক্ষ ও expert হইলেন। দেবেন বাবু কিছুকাল পর ডাক্তার নীলরতন সরকারের নিকট এই ক্ষুদ্র কারখানা বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। জানি না আজ কয়জনে জানেন যে সেই ক্ষুদ্র আয়োজন হইতে আজ এই সুবৃহৎ National Tannery দাঁড়াইয়াছে। সুদক্ষকর্ম্মী মিঃ বিরাজ মোহন দাসের তত্ত্বাবধানে ও গবর্ণমেন্টের সহায়তায় আজ ইহা প্রকাণ্ড মহীরুহ। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের কথা আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তারা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। জাতীয় শিক্ষাবিধানে ব্যবহারিক শিক্ষার স্থান কত প্রয়োজনীয় তাহা চৌধুরী মহাশয় বিশেষরূপে জানিতেন বলিয়াই Bengal Technical Institute এর প্রতিষ্ঠা। পরলোকগত তারকচন্দ্র পালিত ও ডাক্তার নীলরতন সরকারের প্রবর্ত্তনে Bengal Technical Instituteএ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রধান পরিণতি।

আজ যে বাঙ্গালী "স্বদেশী", আজ যে বাঙ্গলার যুবক স্বাবলম্বী হইবার আকাঙ্খা দেখাইতেছে, ইহার সকলের গোড়ায় স্বর্গীয় চৌধুরী মহাশয়ের একনিষ্ঠ চেষ্টা ও অনুপ্রাণনা। আজ যে আমরা বঙ্গলক্ষ্মীমিল, ন্যাসেনেল ট্যানারী, বেঙ্গল টেকনিকেল ইনিষ্টিটিউট প্রভৃতি যে সমুদয় প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গলার জাগরণের পরিচয় পাই তার সবগুলির মূলেই তিনি।

আজ আরও মনে হয় তাঁহার সেই জাতীয় প্রতিষ্ঠান "রাখিবন্ধন", আনন্দসভা, সঙ্গীত ও শিল্পকলার সমাবেশ। ইহাদের সকলেরই মূলে তাঁহার ঐকান্তিক দেশ-প্রাণতা। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি; কেননা দিগ্‌ভ্রান্ত বাঙ্গালী জাতিকে উপনিষদের রম্যকাননে ফিরাইয়া নিতে ইহাই যুগ প্রবর্ত্তক রামমোহন রায়ের প্রধান প্রচেষ্টা। তিনি Oriental Art Societyর পৃষ্টপোষক, কেননা সেই সুকুমার কলা তাঁহারই দেশের অজন্তা, ইলোরা, বেশনগর, মামলাপুরাম, এলিফান্টা, বোরোবোদুর (Borobodur) প্রভৃতির প্রাচীন আদর্শের লুপ্তোদ্ধারের সুবৃহৎ আয়োজন। রাফেল, রানোণ্ডের পদানুসরণ না করিয়া দেশী-কলম তুলিয়া লইবার প্রতিষ্ঠান। পিয়ানো, হারমোনিয়াম ও গ্রামোফোনে যখন দেশ প্লাবিত তখন তাঁহারই চেষ্টায় বাঙ্গালী মোজার্ট হাণ্ডেল ও জোয়াকিমকে ছাড়িয়া আবার তানসেনের তানপুরা আর তামিলের বীণ্ মৃদঙ্গ পাখোয়াজের সঙ্গতে সুর মিলাইয়া শ্মশান্ ভারতে প্রাচীন রাগরাগিনীর স্বরালাপের সূত্রপাত করিয়াছে। আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতিকে সর্ব্ববিষয়ে হৃত গৌরবের পূর্ব্বাভাস দেখাইয়া জাতির চিন্তার ধারা এইরূপে সর্ব্ববিষয়ে দেশপ্রাণতায় ফিরাইয়া নিতে যিনি নিজের অতুল শক্তি অকপটে অজস্রভাবে ঢালিয়া দিয়াছিলেন আজ তাঁহার শোকে সমবেদনা জানাইতে পরিষদের এই বিশিষ্ট আয়োজন।

জীবনের শেষ অধ্যায়ের দুই একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতে চাই। বাঙ্গলার বিপ্লবযুগের দুই একটি কথা না বলিলে এই ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে। সরকার বাহাদুর তখন উন্মার্গগামী বাঙ্গলী জাতিকে ও বিধ্বস্ত বাঙ্গলা দেশকে শান্ত করিতে ব্যস্ত। Minto-Morley, Montford, প্রভৃতি নানারূপ মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা হইতেছে, দ্বিধা-বিভক্ত শাসন-তন্ত্রের মোহে কত কর্ম্মী মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। বাঙ্গালীকে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদের লোভ দেখাইয়া প্রচলিত শাসনপ্রণালীর অনুরাগী করার চেষ্টা হইতেছে।

এস, পি, সিংহ সরকারী কার্য্য গ্রহণ্ করিয়া হাইকোর্টের ব্যবসা ছাড়িয়াছেন। চৌধুরী মহাশয়ের ব্যবসা ক্ষেত্রে একচ্ছত্র প্রতাপ, বিপুল অর্থ আসিতেছে, আর অর্থ হইতেও তাঁহার নিকট অধিকতর আদরণীয় দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা, তাঁহার নায়কত্ব ও উপদেশ পরামর্শের প্রার্থনায় তাঁহাকে চারিদিক হইতে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। সেই সময় সুচতুর Sir Lawrence Jenkins কে দ্বিতীয়বার হাইকোর্টের কর্ণধার করিয়া পাঠান হইল। বিলাতী শাসন পরিষদ ইহা বাঙ্গলা শান্ত করার একটি বিশিষ্ট উপায় মনে করিয়া ছিলেন। Sir Lawrence Jenkins রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্র হইতে এই তেজস্বী মনস্বীকে বিচারকের উচ্চ আসনে বসাইতে অতিমাত্রায় উদ্যোগী হইলেন। জেঙ্কিসের নানারূপ বাকজালে ও মন্ত্র কৌশলে চৌধুরী মহাশয় বিপুল অর্থ ও জাতির ভবিষ্যত পশ্চাতে ফেলিয়া হাইকোর্টের বিচারাসনে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইলেন। আমরা আমাদের নেতা ও নিয়ন্তা হারাইলাম। তাঁহার বিচারাসনের কার্য্যের সম্বন্ধে কোনও কথা বলার আমার অধিকার নাই। কালপূর্ণ হইলে তিনি পুনরায় ব্যবসা-ক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু হৃত স্বাস্থ্য আর ফিরিয়া পাইলেন না। সেই ভগ্ন স্বাস্থ্য ও পরিশ্রান্ত দেহ লইয়া তিনি আর একবার দেশ সেবার জন্য পরিশোধিত বাঙ্গলা-শাসন-পরিষদে ঢুকিলেন কিন্তু আর তেমন করিয়া কিছুই ধরিতে পারিলেন না। আজ ঐসব কথার আলোচনার সময় নহে। আমাদের আজ কেবলই মনে হইতেছে এই নীরবকর্ম্মী প্রথম ও মধ্য জীবনে নানারূপে নানাভাবে জীবন্মৃত বাঙ্গালী জাতিকে, দ্বিধা বিভক্ত বাঙ্গলাদেশকে, হতাদৃত প্রাচীন কলা শাস্ত্রকে, গতগৌরব শ্রমশিল্পকে পুনরায় দেশে সুপ্রতিষ্ঠ করিতে কত অধিক কার্য্যতৎপরতা দেখাইয়া গিয়াছেন। শোকাচ্ছন্ন আমরা তাঁহাকে চিরদিনের মত হারাইয়াও তাহার কর্ম্মময় জীবনের সর্ব্বোতোমুখী সফলতার প্রমাণ পাইয়া আশ্বস্ত হইতে চেষ্টা করিতেছি। পূর্ণব্রত কর্ম্মবীর নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে অনন্তশয্যায় চিরশান্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার অমর আত্মার আশীর্ব্বাদ তাঁহার দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠানগুলির উপর বর্ষিত হউক, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মনীষী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার মনুষ্যজীবনের কর্ম্ম শেষ করিয়া 'অমানব লোকে' প্রয়াণ করিলেন; মানুষের জীবনে ইহা নূতন ঘটনা নয়। 'জন্মিলে মরিতে হইবে' ইহা অলঙ্ঘনীয় বিধান। কত আসিতেছে—কত যাইতেছে; এরূপ আবার কত আসিবে যাইবে; কাজেই এরূপ আসা যাওয়া ব্যাপার সাধারণ অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের মনে কোনরূপ গভীর রেখাপাত করিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্য সমাজ প্রায়ই ইহার হিসাব নিকাশ লইয়া মাথা ঘামাইতে ইচ্ছা করে না; কারণ তাহাতে সমাজের বড় কিছু আসে যায়

না। যেমন একটী চলিয়া যায়, পর মুহূর্ত্তেই আবার একটী আসিয়া তাহার স্থান পূর্ণ করে। কিন্তু সময়ে সময়ে এই মানুষের মধ্যেই এমন একটী মানুষের আবির্ভাব হয়, যাঁহার আবির্ভাব বা তিরোভাবের ব্যাপারটীকে সাধারণপর্য্যায়ভুক্ত মনে করিয়া মনুষ্য সমাজ উদাসীন থাকিতে পারে না; তাঁহারা যখন আসেন তখন যেমন তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীর স্থান পূর্ণ করিতেই আসেন না, তাহা হইতে অনেক উচ্চ, অনেক মহান্, বিধাতার একটী নূতন সৃষ্টি রূপেই প্রতিভাত হন, আবার যখন চলিয়া যান, তখন তাঁহাদের স্থান পূর্ণ করিতেও আর বড় কেহ আসে না। যাহারা আসে তাহারা তাঁহাদের তুলনায় বড় ক্ষুদ্র, বড় নগণ্য; কাজেই এ শ্রেণীর মানব বা মহামানবের আবির্ভাব ও তিরোভাবে সমাজের মধ্যে যে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাহাদ্বারা সমাজের মূলদেশ পর্য্যন্ত কম্পিত হয়, আর সে কম্পন দুমাস ছমাস বা দু দশ বৎসরেই প্রশমিত হয় না। যুগের পর যুগ ধরিয়া তাহা সমানভাবেই চলিতে থাকে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ দেশে এই শ্রেণীর মানব বা মহামানব। তাঁহার বিয়োগে এ দেশে আজ যে বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে—দু'দশ দিনে বা দু দশ বৎসরেই তাহা প্রশমিত হইবে না; কারণ তাঁহার অভাব যে বড় অভাব, সে অভাব যে পূর্ণ হইবার নয়।

আশুতোষ যে কেবল বাঙ্গালার পুরুষশ্রেষ্ঠ ছিলেন তাহা নহে, তিনি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার মনস্বিতা যে কেবল বাঙ্গালীরই সম্পত্তি ছিল তাহা নহে, তাহা সমগ্র মনুষ্যসমাজেরই সম্পদ। কোন একটা ক্ষুদ্র জাতি বা কোনও ক্ষুদ্র প্রদেশের আকাঙ্খা পূর্ণ করিবার যোগ্য শক্তি সংগ্রহ করিয়া যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা সেই জাতির পুরুষ বা প্রাদেশিক পুরুষরূপে গণ্য হইতে পারেন, কারণ, তাঁহাদের শক্তি সেই ক্ষুদ্র জাতি বা প্রদেশ বিশেষের আকাঙ্খা পূরণেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়; কিন্তু যাঁহারা তদপেক্ষা অধিক শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, একটা জাতি বা একটা প্রদেশের আকাঙ্খা পূরণেই যাঁহাদের শক্তি নিঃশেষে ব্যয়িত হইয়া যায় না, যাঁহাদের শক্তি সমগ্র মনুষ্য সমাজের আকাঙ্খা পূরণে সমর্থ, তাঁহাদিগকে কোনও একটা বিশেষ জাতির বা প্রদেশের মনুষ্য বলিয়া মনে করা সঙ্গত নয়। এই হিসাবে আশুতোষকে কেবল বাঙ্গালারই একটী বিশিষ্ট সম্পদ বলিয়া মনে করিলে তাঁহার সম্বন্ধে অবিচার করা হইবে। বিশ্বের আকাঙ্খা পূর্ণ করিবার যোগ্য শক্তি লইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভাবে যে মনীষা, যে প্রতিভার অভাব হইয়াছে, তদ্দ্বারা কেবল যে বাঙ্গালা দেশ বা বাঙ্গালা জাতিই হতশ্রী হইল তাহা নহে—তাহাতে সমগ্র মনুষ্য সমাজই হীনপ্রভ হইয়াছে।

আশুতোষ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গলাদেশের অতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ বংশ। ইঁহার বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রথমে জিরেট বলাগড় গ্রামে আসিয়া অধিবাস করেন। এই বলাগড় হইতে ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য ৮০।৮৫ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে গ্রাজুয়েট হইয়া ভবানীপুরে চিকিৎসাব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বাস করেন। এই সময়ে ইনি একজন বিখ্যাত ডাক্তার বলিয়া জনসমাজে পরিচিত ছিলেন।

১৮৬৪ সালের ২৮ এ জুন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আশুতোষ ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। হেমন্তকুমার তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র। শৈশবে তাঁহার স্বাস্থ্য খুব খারাপ ছিল। রোগ তাঁহার লাগিয়াই ছিল। শরীরে বল লাভের জন্য কয়েক মাস তাঁহাকে মথুরায় থাকিতে হইয়াছিল। তখন তিনি কোন বিদ্যালয়ে পড়িতেন না। নয় বৎসর বয়সেও তিনি বাড়ীতে পড়াশুনা করিতেন। পিতার যত্ন ও চেষ্টায় এই অল্প বয়সেই তাঁহার অদ্ভুত গুণাবলী বাহিরে স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, বয়স যখন তাঁহার সবে মাত্র নয় বৎসর, তখন তিনি ইউক্লিডের জ্যামিতির চারিটী ভাগ (Book) পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন; এমন কি জ্যামিতির সমস্ত অনুশীলনীগুলি তিনি স্বচ্ছন্দে প্রমাণ করিতে পারিতেন। বীজগণিতের সমীকরণ (Equations) গুলিও তিনি সহজেই কষিতে পারিতেন। ইহা হইতেই দেখা যায় তিনি কি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন, তাঁহার অদ্ভুত বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক্ বিকাশের জন্য তাঁহার গুণগ্রাহী পিতা তাঁহাকে গণিতবিষয়ক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসকল কিনিয়া দিতেন। ঐ সমস্ত পুস্তক হইতে বিশেষ বিশেষ প্রশ্নের সমাধান করিয়া খাতায় বেশ ভাল করিয়া তিনি লিখিয়া রাখিতেন। শৈশব হইতেই তিনি বিশেষ কালনিষ্ঠ ছিলেন। একটী মুহূর্ত্তও তিনি বাজে নষ্ট করিতেন না। উত্তর কালে তিনি যে গভীর জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী হইয়া পূর্ণবিকশিত কুশাগ্র ধীর প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ পুত্র দুইটীকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার পিতার প্রগাঢ় যত্ন ও ঐকান্তিক আগ্রহ। কেবল পুঁথিগত বিদ্যার ও তাহার প্রভাবলাভে আমরা যেরূপ নিষ্ঠাবান্ তাহাতে প্রকৃত শিক্ষায় নানারূপ অসুবিধাই হইয়া থাকে। কিন্তু আশুতোষের পিতা তাঁহাকে সযত্নে শৈশব হইতে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। তাঁহার নিজজীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে স্বাধীন চিন্তা প্রণালী ব্যতীত যথার্থ শিক্ষালাভ করা যায় না। তাঁহার এই চিন্তা পদ্ধতি আশুতোষের অন্তরে এমনি বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল যে তিনি যাবজ্জীবন মৌলিক গবেষণা পরিপোষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্কুলে পড়িবার সময় তাঁহার পিতা স্বীয় পরিপক্ক অভিজ্ঞতা দিয়া তাঁহার বিদ্যানুশীলনের সহায়তা করিতেন। বড় বড় লোকের জীবনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়া পুত্রের কল্পনাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিতেন। সময়ের অপব্যবহার করা যে মহাপাপ তাহাও তিনি তাঁহার হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন। দ্বাদশ বর্ষ বয়সে তিনি ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম ভাগের ২৫শে প্রতিজ্ঞার এক নূতন প্রমাণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয়স্বরূপ এই প্রমাণ ১৮৮০ সালে Combridge Messenger of Mathematicsএ প্রকাশিত হয়। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ষোল বৎসর। ইহার পূর্ব্ব বৎসর তিনি ভবানীপুর সাউথ সুবর্ব্বন্ স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ এ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। এক বৎসরের মধ্যে তিনি গণিতশাস্ত্রে এরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন যে এম্ এ পরীক্ষার উপযোগী জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৮১ সালে এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এই পরীক্ষার পূর্ব্বে তাঁহার কঠিন পীড়া হওয়ায় তিনি আশানুরূপ স্থান লাভ করিতে পারেন নাই। ১৮৮৪ সালে ২০ বৎসর বয়সে তিনি বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও প্রথম স্থান অধিকার

করিয়া গণিতে এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর বৎসর (১৮৮৬) তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়া ৮,০০০ টাকা প্রাপ্ত হন। ঐ বৎসর তিনি পদার্থ বিদ্যায়ও এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৭ সালে তিনি এম্ এ পরীক্ষায় গণিতের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২৩ বৎসর। এই বৎসর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেমন্তকুমারের মৃত্যু হয়। ১৮৮৮ সালে সিটি কলেজ হইতে তিনি বি এল পরীক্ষা দেন। কিন্তু পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ইহার পাঁচ বৎসর পরে (১৮৯৪) ৩০ বৎসর বয়সে আশুতোষ Honours in Law পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া D. L. উপাধি লাভ করেন।

১৮৮৮ সালের আগষ্ট মাস হইতে আশুতোষ কলিকাতা হাইকোর্টে (appellate side এ) ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। তখনকার বড় বড় counselদের Junior হইয়া তিনি এত সাবধানতা ও দক্ষতার সহিত কাজ করিতেন যে তাঁহাদের আশুতোষ না হইলে চলিত না। সাত বৎসরের মধ্যে তিনি হাইকোর্টে ব্যবহারাজীবদের মধ্যে অতি উচ্চস্থান লাভ করিয়া এক নামজাদা ব্যবহারাজীব হইলেন। ১৮৯৭ সালে তিনি Togore Law Lecturer নিযুক্ত হন। তিনি তিন তিন বার Tagore Law Gold Medal প্রাপ্ত হন। বিচারালয়ে যাহা কিছু যশোলাভ করা যায় একে একে তিনি সমস্তই পাইলেন। ১৯০৪ সালে তিনি অস্থায়ী বিচারপতির আসনলাভ করেন। ঐ পদে স্থায়ীভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া বরাবর প্রতিষ্ঠার সহিত কার্য্য করেন।

১৮৮৬ সালে ৫ই মে তারিখে তিনি বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্য মনোনীত হন। তাহার পূর্ব্বেই তিনি F. R. A. S. ও F. R. S. E. হইয়াছিলেন। তিনি ১৯০৮ সালে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। ঐ পদে তিনি আটবার নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই সভায় তাঁহার ক্ষমতা ও প্রভুত্ব অপ্রতিহত ছিল। ১৮৮৯ সালে Lord Landsdowne তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সদস্য (fellow) নিযুক্ত করেন। ইহার দুই মাস পরে সিণ্ডিকেটের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৮৯৬ সাল বাদে তিনি আমরণ প্রতি বৎসর সিণ্ডিকেটের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮৮৭ সালে তিনি প্রথম পরীক্ষক নিযুক্ত হন। চারি বৎসর উপর্য্যুপরি পরীক্ষক থাকেন। ১৮৯৬ সালে এম্ এ পরীক্ষায় গণিতের পরীক্ষক হন। ১৮৯০ ও ১৮৯৬ সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষায় গণিতের পরীক্ষক নিযুক্ত হন।

১৮৯৯ সালে এবং পুনরায় ১৯০১ সালে এই দুইবার তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন। ১৯০৩ সালে আবার তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ বড়লাটের সভায় প্রবেশাধিকার লাভ করেন। ঐ বৎসর তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রতিনিধি হইয়াছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেন্সেলর পদে আসীন হইয়া আশুতোষ শিক্ষাসংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ে যথেষ্ট সংস্কার করিয়াছেন।

আশুতোষ রচিত প্রবন্ধাবলী

১। A paper on an important generalization of a theorem of Dr. Salmon on Conic Sections...Cambridge Messenger of mathematics, 1883.

২। A geometrical proof of a fundamental theorem on Elliptic Functions—The Quarterly Journal of Mathematics, 1885. [পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে প্রমাণগুলি বড়ই জটিল ছিল। Dr. Cayley ইহাকে বিশেষ সহজ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।]

৩। On the Differential of a Trajectory (with a woodcut) —J. A. S. B. 1887.

৪। On Monge's Differential Equation to all Conics—J. A. S. B. 1887.

৫। A Memoir on Plane Analytic Geometry (with three wood cuts) J. A. S. B. 1887.

৬। A General Theorem on the Differential Equations of Trajectories--J. A. S. B. 1888.

৭। On Poisson's Integral (with a woodcut)—J. A. S. B. 1888.

৮। On the Differential Equation of all Parabolas—J. A. S. B. 1888.

৯। The Geometric Interpretation of Monge's Differential Equation to all Conics—J. A. S. B. 188৫. ["Nature" পত্রে এই সম্বন্ধীয় একটী প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছিল।]

১০। Some applications of Elliptic Functions to Problems of mman Values (first paper) with a wood cut—J. A. S. B. 1889.

১১। ঐ ঐ (2nd paper)—J. A. S. B. 1889.

১২। On Clebsch's Transformation of the Hydrokinetic Equations—J. A. S. B. 1890.

১৩। Note on Stokes's Theorem and Hydrokinetic Circulation J. A. S, B. 1890.

১৪। On a curve of Aberrancy—J. A, S. B. 1893.

১৫। ১৮৯৪ সালের The Indian Engineering পত্রে তাঁহার তিনটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

[এ গুলির মধ্যে Interpretation of Curves সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটীর জ্যামিতিক পদ্ধতি ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়া মুদ্রিত হয়]

আশুবাবু চারিবার বাঙ্গালায় তিনটী প্রতিষ্ঠানের সভাপতিরূপে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। দুইবার সাহিত্য সম্মিলনে, একবার কৃত্তিবাসের জন্মভূমিতে তদীয় স্মৃতিউৎসবে এবং আর একবার মাইকেলের বার্ষিক উৎসবে। এই কয়টী অভিভাষণই মুদ্রিত হইয়াছে।

আশুতোষের গ্রন্থাবলী

১। Conic Sections

২। Law of Perpetuities

৩। জ্যোতিষবিষয়ক একখানি গ্রন্থ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছেন।

আশুতোষের সাহিত্যানুশীলন

বিদেশী সাহিত্যেও আশুতোষের অধিকার ছিল। ইংরেজী ভাষায় অনূদিত য়ুরোপীয় সাহিত্যে তিনি বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আশুতোষ ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কার্য্য পরিচালনোপযোগী জর্ম্মাণভাষাও কিছু তাঁহার জানা ছিল। আরবী ভাষায় তিনি সাহিত্যাদি বেশ পড়িতে পারিতেন। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। তিনি সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য বিশেষভাবে আলোচনা করিয়ছিলেন। তিনি হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রসকল মূল সংস্কৃত ভাষাতেই পাঠ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিশেষ অধিকার দেখিয়া নদীয়ার পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে 'সরস্বতী' উপাধি মণ্ডিত করিয়াছিলেন। সিংহলের বৌদ্ধ পুণ্ডিতগণও তাঁহার বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহাদের গৌরবজনক 'সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী' উপাধি প্রদান করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন।

মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। অবসর অভাবে যদিও তিনি মাতৃভাষার তাদৃশ সেবা করিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি মাতৃভাষার জন্য যাহা করিয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহার নাম অমর হইয়া থাকিবে। তিনি মাতৃভাষার গৌরববৃদ্ধি করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্, এ পরীক্ষায় মাতৃভাষার স্থান করিয়াছিলেন এবং তন্নিম্ন পরীক্ষা গুলিতে বঙ্গভাষা অবশ্য পাঠ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ইহার জন্য বঙ্গবাসী ও বঙ্গভাষাভাষী মাত্রই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। এক সময়ে কৃত্তিবাস, কাশীদাস ও মধুসূদনের গ্রন্থপাঠ তাঁহার নিকট বিশেষ প্রিয় ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সহকারী সভাপতি হইয়া কাশীদাসী মহাভারত সম্পাদনে ব্রতী হইয়া প্রথম খণ্ড পরিষৎ হইতে প্রকাশ করেন। সাহিত্য সভারও তিনি একবার সভাপতি হইয়াছিলেন।

নির্ভীকতায় আশুতোষ অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি যাহা ভাল বুঝিতেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সঙ্কল্প হইতে কেহই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিতেন না। ১৯০৮ সালে যখন তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার বিধবা কন্যার পুনরায় বিবাহ দিতে হইবে, তখন তাঁহার সঙ্কল্প হইতে কেহ তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে পারেন নাই। ঐ বৎসরই সহস্র বাধা ও তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও তিনি কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। সেদিন বাঙ্গালার লাটকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে কিরূপ নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বজনবিদিত। তিনি হুজুগে স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন না। তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান্ স্বদেশবৎসল খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। অশনে বসনে তিনি খাঁটী হিন্দুত্বেরই পরিচয় দিতেন। বিদেশী পরিচ্ছদ ও বিদেশী আহারের তিনি কখনও পোষকতা করিতেন না; বাঙ্গালা দেশ আশুতোষকে হারাইয়া যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

শ্রীসত্যব্রত বর্ম্মা

পরলোকে আশুতোষ

জগতে সর্ব্বযুগে, সর্ব্বকালে এমন দুই একটী মহাত্মার আবির্ভাব হয়, যাঁহারা অন্য সকল হইতে স্বতন্ত্র, তাঁহাদের জীবন বাত্যাতাড়িত ধূলিরাশির মত নয়, বীচীবিক্ষোভচালিত তৃণখণ্ডের মত নয়। তাঁহারা অসাধারণ শক্তিধর, প্রভঞ্জনের মত আসিয়া জগতের সকল বিধি-ব্যবস্থা ওলট্ পালট্ করিয়া নূতন করিয়া নিজের ইচ্ছামত গড়েন। এই সকল মহাপুরুষের নাম যুগপুরুষ দেওয়া যাইতে পারে। ইঁহাদের সকলেরই কার্য্যক্ষেত্র এক হইবে এরূপ কোনও কথা নাই, কাহারও কর্ম্মক্ষেত্র রাজনীতি, কাহারও বা কোনও নির্দ্দিষ্ট সমাজ, কেহ বা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে নিজের সকল শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করেন। কিন্তু ইঁহারা কেহই শুধু আপনাপন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না—সকলেই যুগটার উপর নিজের ছাপ রাখিয়া যান।

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এমন একজন শক্তিধর পুরুষ। রাজনীতির বাগ্‌বিতণ্ডামুখর মন্ত্রণাগার কিম্বা অসংখ্য শ্রোতৃবৃন্দপরিবেষ্টিত বক্তৃতামঞ্চ তাঁহার স্থান ছিল না—সমাজের নানাবিধ দোষ ত্রুটি তাঁহার সমগ্র মন আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তাঁহার জীবনযজ্ঞ শুধু একই দেবতার মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ছিল—শুধু এক চিন্তা, এক কর্ম্ম তাঁহার দিবসের সাধনা, রাত্রির স্বপ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেবী সরস্বতীকে কি করিয়া বঙ্গীয় যুবকদের চিত্তমন্দিরে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় ইহাই ছিল তাঁহার জপ তপ, সাধন ভজন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। দিনক্ষণ, সন বৎসর, ইহাদের কোনও বিশেষ অর্থ আছে কিনা জানি না, কিন্তু বর্ত্তমান ভারতের যাঁহারা ভাগ্যনিয়ন্তা, যাঁহারা ইহাকে গড়িয়াছেন, যাঁহাদের প্রভাব আজও দেশে সমভাবে ক্রিয়া করিতেছে—তাঁহাদের সকলেরই জন্ম হইয়াছিল ১৮৬০—৭০ এই দশকে। কলিকাতায় ধনীর গৃহে তাঁহার জন্ম—ছাত্র জীবনে তাঁহাকে দেখি জ্ঞানানুসন্ধানে লিপ্ত। তাঁহার সহাধ্যায়িগণের নিকট শুনিতে পাই ছোট্ট একটি ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া তিনি বাড়ী হইতে কলেজে আসিতেন, এবং ফিরিতেন এক গাড়ী বই লইয়া। শুধু বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়েই তাঁহার মন আবদ্ধ ছিল না—সকল বিষয়ের জ্ঞানই তাঁহার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কলেজে তিনি পড়িতেন Philosophy, আর বাড়ীতে পড়িতেন Physics—এবং বাড়ীতে তাহা এমনই ভাবে পড়িতেন যে কলেজে কোনও সহপাঠীকে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া তাঁহার নিত্য কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল।

প্রশংসার সহিত পরীক্ষা কয়টি উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন। তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার মহাশয় তাঁহাকে ডাকিয়া চাকুরী দিতে চাহিলেন। আশুতোষ তাহা লইতে স্বীকৃত হইলেন না; বলিলেন—যদি কলিকাতা হইতে বাহিরে কোথাও যাইতে না হয়, আর যদি Imperial serviceএ ৫০০৲ পাঁচশত টাকা মাহিয়ানায় নিযুক্ত করা হয়, তবে তিনি ভাবিয়া দেখিতে পারেন। বলা বাহুল্য, ডিরেক্টর সাহেব এই দুইটির কিছুতেই রাজী হইতে পারিলেন না; বলিলেন, How can that be? The exigencies of service may require your presence either at Cuttack or Chittagong. তখনকার দিনে ঐ দুইটি স্থান ছিল দুর্গম। আশুতোষ তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময়ে ডিরেক্টার সাহেব তাঁহাকে ডাকিয়া নিজের অভিজ্ঞতা বলিলেন, তিনি বিলাত হইতে আমদানী হইয়াছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে দর্শন অধ্যাপনা করিবার জন্য, কিন্তু হঠাৎ একদিন গেজেট খুলিয়া দেখিলেন, তাঁহাকে ঢাকাবিভাগের স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টার করিয়া, বদলি করা হইয়াছে! তিনি তখনকার ডিরেকটারের কাছে গিয়া ইহার প্রতিবাদ করিলে, ডিরেকটার সাহেব ধীরভাবে বলিলেন,—My dear Sir, have you brought in your resignation? এই তো সরকারী চাকুরীর অবস্থা। আশুবাবু চাকুরী প্রত্যাখ্যান করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন—তাঁহার পিতার কাণে যখন এই কথা গেল, তখন তিনি পুত্রকে সম্পূর্ণ সমর্থন করিলেন। তার পরে আশুতোষের ওকালতী আরম্ভ;—প্রথমত কিছুই হইত না, কিন্তু পরে ঢাকার নবাবের এক মোকদ্দমায় তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়; তার পরে দ্রুতবেগে উন্নতির তুঙ্গ শিখরে তাঁহার গতি। রাজকীয় বিভাগে আইন শাস্ত্রে বাঙ্গালী যতদূর উঠিতে পারে তাহা তিনি উঠিয়াছিলেন। যখনই তাঁহার লেখনী হইতে কিছু বাহির হইত তখনই আমরা একটা পুরুষের উক্তি পাইতাম। স্বাধীনচেতা, সতেজ জ্ঞানগর্ভ কিছু পাইতাম। তা' সে বরেণ ঘোষের রায়ই হউক, আর লিটন্ সাহেবের পাল্টা জবাবই হউক, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর অভিভাষণই হউক, আর মাত্র তিন মাস পূর্ব্বে প্রদত্ত বিহার উড়িষ্যা গবেষণাসমিতির বক্তৃতাই হউক। বিচারাসন হইতে মাত্র কয়মাস অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ ভাবে নাই যে তিনি এমন ভাবে অতর্কিতে চলিয়া যাইবেন। দেশের জন্য, দশের জন্য, শিক্ষার জন্য তিনি আরো অনেক কিছু করিবেন, যাহা করিয়াছেন তাহার ভিত্তি দৃঢ় করিবেন ইহাই দেশের লোক আশা করিয়াছিল।

সারাজীবনই তাঁহাকে লোকের বিরাগ সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু সকল প্রকার নিন্দাবাদের মধ্যেও তিনি স্থির অবিকল থাকিতে চেষ্টা করিতেন। কলেজে যখন পড়িতেন, তখন ভবানীপুরের Wrangler বলিয়া এবং তাঁহার নানা বিষয়ের চর্চ্চাকে audacity মনে করিয়া সহপাঠীরা বিদ্বেষবশতঃ তাঁহাকে উপহাস করিত। M. A পাশ করিবার পরই যখন তাঁহাকে M. A.র পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয় তখনও ইহার বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন হইয়াছিল।

পরে যখন বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দেন, তখনও সহস্রকণ্ঠে জনসাধারণ তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। অসহযোগ আন্দোলনে যখন বিশ্ববিদ্যালয় টলমল করিতেছিল, তখন স্যার আশুতোষই লোকমতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস করেন। জীবনের শেষ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে কতই না প্রতিকূল সমালোচনা তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল! কিন্তু এই আত্মস্থ কর্ম্মনিষ্ঠ নরশার্দ্দুল কিছুতেই আপন কর্ম্ম হইতে বিচলিত হন নাই। যাহা নিজে ভাল বুঝিয়াছিলেন, তাহার পোষকতাকল্পে জনমত উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। সেই যে তিনি বলিয়াছিলেন Timidity never appeals to me. But boldness does. Boldness first, boldness second, boldness always.—তাহাই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। পরে যখন বঙ্গীয় রাষ্ট্রতরণীর কর্ণধারের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়াইতে হয়, তখনও তাঁহার এই অদম্য আত্মবিশ্বাস এতটুকু টলে নাই। তিনি নিজে যাহা ভাল বুঝিয়াছেন, যে পথে গেলে ভাল হইবে মনে করিয়াছেন, রাজরোষ, লোকাপবাদ কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া সোজা সেই লক্ষ্যের প্রতি ধাবমান হইয়াছেন। "দুটো চোখ, দুটো কান, কিন্তু একটা মুখ—শুধু উপেক্ষা, উপেক্ষা, উপেক্ষা"—স্বামীজীর এই কথা কয়টি যেন তাঁহারও কথা ছিল।

কিন্তু এই উপেক্ষার সহিত তাঁহার মনে অন্য কোনও ভাব ছিল না, সাম্প্রদায়িক ভাব, বা কোনও প্রকার সঙ্কীর্ণতা তাঁহার মনে স্থান পাইত না। যেখানে গুণের পরিচয় পাইয়াছেন তাহারই আদর করিয়াছেন, তা সে গুণী ইংরেজই হউন, আর মারাঠীই হউন, পার্শী হউন, আর দ্রাবিড় হউন, আমেরিকান হউন, আর ফরাসি হউন। এক কথায়, তাঁহার নিষ্ঠা ছিল—সঙ্কীর্ণতা ছিল না।

লর্ড কার্জ্জনের সময় যখন ইউনিভার্সিটি বিল পেশ করা হয়, তখন আশু বাবু ও গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহোদয়, দুই জনেই ছিলেন রাষ্ট্রীয় পারিষদের সদস্য। উভয়েই কর্জ্জন সাহেবের বিলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ছিলেন। গোখলে মহোদয় সারাদিন ইউনিভার্সিটির কথা পড়িতেন, ভাবিতেন, আলোচনা করিতেন, ইউনিভার্সিটির কাযে তাঁর মন প্রাণ পড়িয়া থাকিত, আর আশুবাবুর ওকালতী ছিল, নানা রূপ সভাসমিতি ছিল, ইউনিভার্সিটির কায কর্ম্ম ছিল, সেই সঙ্গে বিল সম্বন্ধীয় আলোচনা তাঁহার স্থির হইয়া থাকিত। দেশবন্ধুর সেই অভিমত "greater than a mere educationist"—অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভারতবন্ধু তিনি ছিলেন কি না তাহার শুধু ভাবজগতেই পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। তবে তিনি যে ছাত্রবন্ধু ছিলেন, সময়ে অসময়ে, কারণে অকারণে ছাত্রেরা যে তাঁহার কাছে যাইত এবং গেলেই সাহায্য মিলিত, তাহা বঙ্গের ছাত্রবৃন্দ জানিত। অনেক সময় হয়ত ছাত্রদের জন্য কিছু বলিতে গিয়া তিনি নিন্দাভাজন হইয়াছেন। ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সী কলেজের হিন্দু হোটেলের ছাত্রদের সঙ্গে সরস্বতী পূজার বিসর্জ্জনের দিন পুলিসের মারামারি হয়. মিছিলের মধ্য হইতে ৭।৮ জন ছেলেকে কনষ্টেবলরা থানায় আটকাইয়া রাখে ও তাহাদিগকে নির্দ্দয় ভাবে মারিতে থাকে। আশুতোষ এই খবর পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের মুক্তির ব্যবস্থা করেন। আর একবার, ফুলারি আমলে, কি তাহার কিছু পরে আসামে কোন এক স্কুল হষ্টেলে ইন্‌স্পেক্টার সাহেব টেবিলের উপরে যে কাগজ ছিল, তাহাতে 'বোমা' (তখন মেদিনীপুরের মোকদ্দমা বিচারাধীন ছিল) এই কথাটি ছাপার অক্ষরে দেখিতে পান, এবং ইহার জন্যই এইরূপ খবরের কাগজ দিয়া টেবিল ঢাকার জন্যই ছেলেটিকে সেই প্রদেশের স্কুলসমূহ হইতে বাহির করিয়া দেন। ছেলেটি অনেকস্থানে দরবার করিয়াও কিছু করিতে না পারিয়া, নিরুপায় হইয়া অবশেষে আশুবাবুর শরণাপন্ন হয়। আশুবাবু তাহাকে কলিকাতারই কোনও স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন, এবং যতদিন তাহার অন্য কোনও

ব্যবস্থা না হয়, ততদিন নিজের বাড়ীতেই তাহাকে রাখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত খুঁটিনাটি তাঁহার নখ দর্পনে ; তাই তিনি কোথায় কি করিলে ভাল হয় তাহা অন্য সকলের অপেক্ষা ভাল বুঝিতেন। ছাত্রদের সুখসুবিধার প্রতি তাঁহার সর্ব্বদাই লক্ষ্য থাকিত, এবং অনেক সময় ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্য, আর কাহারও ক্ষতি না করিয়া, তিনি অনেক কিছু করিয়াছেন। যখন তাঁহার সময় ছিল, তিনি ছাত্রাবাসে নিজে গিয়া দেখাশুনা করিতেন। সকলেরই তাঁর নিকট অবারিত দ্বার ছিল। তাঁহার সকল অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা—তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাশীরা পর্য্যন্ত যে নামে ডাকিত—তাহা হইতেই অনুমেয়—তাহাদের কাছে তাঁহার নাম ছিল 'জজ বাবু'। "সাহেব" তিনি কোনও দিনই হন নাই। মাতৃ ভাষার প্রতি, স্বজাতির প্রতি তাঁহার যে অনুরাগ ছিল তাহা সর্ব্বদা সুপরিস্ফুট থাকিত। যাকে বলে aggressive nationalism তাহাই তাঁহার ছিল। তাঁহার অভাবে আজ ছাত্রদের ভবিষ্যৎ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে সমাবৃত।

লোকে যাকে বলে ইন্দ্রপাত, তাহাই হইয়াছে। একজন দিক্‌পাল অনন্ত রহস্যময় গহ্বরে অন্তর্হিত হইয়াছেন। সারাজীবন, বা তাহার অধিকাংশ সময়ই, কলিকাতায়, পরিবারের মধ্যে কাটাইয়া কলিকাতার বাহিরে অধিকাংশ আত্মীয় স্বজন হইতে দূরে যে এমন ধারা সর্ব্বনাশ ঘটিবে, তাহা কে মনে করিয়াছিল ? তাঁহার জীবনী লিখিবার, তাঁহার কৃত কর্ম্মের মূল্য নিরূপণের সময় এখনও আসে নাই। তাঁহার প্রভাব এখনও আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে, সে প্রভাব কত মহান, তাহা মাপিয়া ওজন করিয়া দেখিবার সাধ্য আমাদের এখন ত নাই। কোনও ব্যক্তির বিয়োগ আমরা শুধু জাতির দিক্ হইতে কত ক্ষতি হইল তাহাই দেখি, আবার কাহারও বিয়োগ (যেমন পরিবারের মধ্যে) আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষতি, আশুতোষের এই আকস্মিক বিয়োগে উভয়বিধ ক্ষতি হইয়াছে। জাতির দিক দিয়া ক্ষতি ত হইয়াছেই, অনেকে স্বজনবিয়োগবৎ দুঃখও অন্তরে অনুভব করিতেছেন। এই প্রতিভাসমুজ্জ্বল বঙ্গদেশেও তাঁহার স্থান লইবার মত লোক কোথায় ?

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন।

সঙ্কলিকা

অতি অল্পদিন ব্যবধানে দেশের দুই অত্যুজ্জ্বল রত্ন খসিয়া পড়িয়াছে। এমন উপর্য্যুপরি দুইটী শ্রেষ্ঠ সন্তানের তিরোধান দেশের বড়ই দুর্দ্দিনের পরিচায়ক। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে যে শুধু বঙ্গদেশের বা ভারতের বিশেষ অনিষ্ট হইল তাহা নয়, বর্ত্তমান জগত একজন দিকপাল হারাইল। তাঁহার চাকুরী জীবনের শেষ হওয়ার পর তাঁহার রাজনৈতিক কর্ম্মজীবনের সূচনার আভাস পাওয়ার পূর্ব্বেই আমরা তাঁহাকে হারাইলাম। এরূপ দৃঢ়চিত্ত, কর্ম্মক্ষম, তীক্ষ্ণধী নির্ভীক পুরুষ পৃথিবীতে বিরল। অন্য দেশে জন্ম গ্রহণ করিলে তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তাঁহার নাম লিখিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু হতভাগ্য বঙ্গদেশে তাঁহার কর্ম্ম ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ প্রসারণ হয় নাই। নিজে এত বড় শক্তিশালী ও পদমর্য্যাদাসম্পন্ন লোক হইয়াও লোকের সঙ্গে এরূপ ভাবে মিশিতেন যে তাহার তুলনা মিলে না। ঘরে ঘরে তাঁহার সম্বন্ধে কত কাহিনী শোনা যাইতেছে। সকলেরই মনে আজ এক আতঙ্ক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কি হইবে ? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার প্রাণ ছিল, ইহার জন্য তিনি কি যে করিয়াছেন তাহা লিখিতে গেলেই বোধ হয় এক পুস্তক হইয়া পড়ে। ছাত্রদের জন্য তাঁহার কি অপরিসীম সহানুভূতি ছিল। ছাত্রদের

পক্ষে তিনি আশু-তোষই ছিলেন। যেমন উদার হৃদয়, তেমনি দৃঢ় ও নির্ভীক তাঁহার বিধবা কন্যার বিবাহে তাঁহার হৃদয় যে "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি"—তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আজ এই বিষাদের সময়ে শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁহার বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমরা শুধু আমাদের তীব্র বেদনার কথাই বিকাশ করিলাম।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তিরোধানের কাহিনীতে ৺আশুতোষ চৌধুরীর তিরোধানের কথা একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। জীবনক্ষেত্রে চৌধুরী মহাশয় যেমন পশ্চাতে থাকিয়া নিজের কাজ করিয়া যাইতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পশ্চাতে থাকিয়া প্রশান্ত নিরীহ ভাবে যোদ্ধা আশুতোষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছেন, মৃত্যুর পরেও পুরুষসিংহ আশুতোষের কাহিনীর কাছে আজ তাঁহার কথার আলোচনা অনেকটা নীরব হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু তাঁহার সদ্‌গুণাবলী এবং বঙ্গভঙ্গের ইতিহাসে তাঁহার কর্ম্মকীর্ত্তি চিরকাল অমর থাকিবে।

গত সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সে গোপীনাথ সাহার আত্মত্যাগের প্রশংসার জন্য যে রিজলিউসন হইয়াছে তাহা লইয়া দেশে ইংরাজী ও বাঙ্গালী সমাজের মুখপত্র কাগজ সমূহে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। ইংরাজ পক্ষীয়গণ সেই রিজলিউসনকে সোজাসুজি হত্যার বা হিংসা নীতির সমর্থক বলিয়া ধরিয়া নিয়াছেন। স্বরাজ্য দলে আপন পক্ষ সমর্থনের নানারূপ চেষ্টা হইতেছে।

স্বরাজ্যদল কি মনে করিয়া এই প্রস্তাবনা উপস্থিত করাইয়াছিলেন তাহা বুঝিতে বা বুঝাইতে যাওয়া এখন কঠিন। কিন্তু আমাদের দেশের আইনজ্ঞ নেতারা বাক্যবিন্যাসদ্বারা কিরূপ চুলচেরা তর্ক উপস্থিত করিতে পারেন, তাহা এই ব্যাপারে বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।

গোপীনাথ সাহার আত্মত্যাগ হইতে শ্রেষ্ঠতর আত্মত্যাগ দেশে হইয়া গিয়াছে। কোন কনফারেন্সে সে বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থিত হয় নাই। কোন কাজ হয় নাই বলিয়া যে হইবে না এমন নহে। কিন্তু বিষয়ের আবশ্যকতা ও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কানাইলালের সঙ্গে গোপীনাথের তুলনা করাতে কানাইলালের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কিন্তু ইহাতে বোঝা যায় আমরা এখনও ঠিক জিনিষের ঠিক মূল্য বুঝিতে শিখি নাই। গোপীনাথ সাহার দেশের সেবা করিবার ঐকান্তিক ইচ্ছা ও তজ্জন্য বিপদের সম্মুখীন হইয়া কাজ করিবার চেষ্টাতে তাহার দেশ সেবার ইচ্ছাটী যে অকৃত্রিম তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু সেই প্রস্তাবের পর ইহাকে যে ভাবে দলিয়া মুচড়াইয়া অহিংসনীতির সমর্থক বলিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা হইতেছে, তাহাকে শুধু আত্মপক্ষ সমর্থনের "ওকালতী প্যাঁচ" ভিন্ন আর কিছু মনে হয় না।

এখন দেখা যাউক, রিজলিউশনটী কি? এই রিজলিউশনের কথাগুলি নানা ভাবে পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় ১১ ই জুনের Forwordএ যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই মূল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। রিজলিউশনটী বাংলায় হইয়াছিল। তাহা এই :—

" এই সম্মিলনী সর্ব্বপ্রকার হিংসাভাব বর্জ্জন ও অহিংস ভাবকেই মূলনীতিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ও মৃত গোপীনাথ সাহার আত্মত্যাগের উচ্চ আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, মাতৃভূমির স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়াও যে মহান স্বার্থত্যাগ করিয়াছে, তন্নিমিত্ত তাহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে।"

এই প্রস্তাবে অহিংসভাবকে বজায় রাখিবার জন্য এত বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে যে স্বতঃই মনে সন্দেহের ভাব উপস্থিত হয়।

গোপীনাথ সাহা দেশের উপকার করিব বলিয়া ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া একজন সাহেবকে হত্যা করিয়া আত্মরক্ষার্থে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সংক্ষেপতঃ ঘটনা এই—

প্রথমতঃ—সে কংগ্রেসের অহিংসনীতিতে বিশ্বাস করে নাই ও অহিংসনীতির বিপক্ষে কাজ করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ—সে হত্যার পর আত্মরক্ষার্থে পলাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। কানাই লালের মত নিশ্চিত ধরা পড়িবে জানিয়া হত্যা করিতে যায় নাই। পলাইতে পারিলে আত্মত্যাগ করিতে হইবে না এ আশা বা সম্ভাবনা ছিল। এ স্থানে স্বার্থত্যাগ বা আত্মত্যাগের "মহান" ভাব দেখা যায় নাই।

তৃতীয়তঃ—তাহার ব্যারিষ্টার যখন তাহার পক্ষ হইয়া Not guilty বলিয়া সাব্যস্ত করিতে "মানসিক বিকারের" আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন সে তাহাতে বাধা দেয় নাই। কানাই লালের মত বুকের পাটা শক্ত করিয়া Guilty বলে নাই।

চতুর্থতঃ—সাধারণ আততায়ীর মত তাঁহার ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। ফাঁসির সময় সে ভীত হয় নাই, বা অত্যাচার সহিয়াও কোন কথা প্রকাশ করে নাই, ইহাই তাহার স্বার্থত্যাগ বা আত্মত্যাগ। এই ঘটনার পূর্ব্বে ও পরে অনেক আততায়ী নির্ভীক-চিত্তে ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করিয়াছে। সেই জন্য এই সাহসটাকে "মহান" বলা যায় না।

তবে তাহার উদ্দেশ্য ছিল দেশসেবা; দেশের নাম নিয়া ও দেশের জন্য এ পর্য্যন্ত যত জন প্রাণ দিয়াছে, বা প্রাণত্যাগের অপেক্ষা বেশী স্বার্থত্যাগ বা আত্মত্যাগ করিয়াছে তাহার ত কোন রিজলিউশন হয় নাই। যদি গোপীনাথের মত দেশের জন্য আরও শত শত যুবক এই পন্থা অবলম্বন করিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে আত্মত্যাগ বা স্বার্থত্যাগের "মহান্" দৃষ্টান্ত দেখায়, তবে Congress বা Conference কি সেই যুবকদের "মহান্" আত্মত্যাগের প্রশংসা করিবেন? যদি তাই হয় তবে এই রিজলিউশনের বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছু নাই। তবে এই রিজলিউশনের প্রবর্ত্তকগণ গোপীনাথের মতই বুকের পাটা শক্ত করিয়া অহিংস-নীতির আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া এই রিজলিউশনের সমর্থনজন্য আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তস্বরূপ দেশের সমক্ষে দণ্ডায়মান হউন। তাহা করিলে আর যাহাই হউক তাঁহাদের অকপটতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। কিন্তু এই যে শিখণ্ডিসুলভ কথার মারপ্যাঁচের মধ্যে আশ্রয়-গ্রহণ করার চেষ্টা, তাহা কোন মতেই বুঝিতে পারিতেছি না। কংগ্রেসের "অহিংসনীতি" সমস্ত আত্মত্যাগ বা স্বার্থত্যাগের উপর। যদি সেই অহিংসনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াও কংগ্রেসের শ্রদ্ধা ও সমর্থন পাওয়া যায়, তবে "অহিংসনীতি"টাকে বড় গলায় "মূলমন্ত্র" করিবার সার্থকতা থাকে না। তখন হসরৎ মোহানীর ন্যায় যে কোন উপায়ে "দেশের সেবাকে"ই শ্রেষ্ঠ মূলমন্ত্র বলিতে হয়। আইনের চক্ষে "অহিংসনীতির" দোহাই দিব, অথচ শত শত গোপীনাথের উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিয়া দিব, এই উভয় পন্থা চালাইতে চেষ্টা করা Politicsএর চাল হইতে পারে, কিন্তু উহা মহাত্মার দেশের Honest Politics নয়।

———

শ্রীফুল্লনলিনী রায়চৌধুরী সম্পাদিত

ক্যালকাটা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌,—৬৫ নং সার্পেণ্টাইন লেন, কলিকাতা হইতে

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচী

// নব্যভারত

দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড] শ্রাবণ, ১৩৩১ [৪র্থ সংখ্যা

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

)

অনেক লেখক আছেন, যাঁহাদের প্রতিভা বেশ ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া ক্রমশঃ চরম পরিণতি প্রাপ্ত হয়; তাঁহাদের ক্রমোন্নতির রেখাটী বেশ স্পষ্টভাবেই টানা যায়। ইঁহাদের রচনা সম্বন্ধে কালানুক্রমিক আলোচনাই প্রশস্ত; কালানুক্রমিক আলোচনার দ্বারাই ইঁহাদের প্রতিভার ক্রমবিকাশটী বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বোধ হয় এই প্রণালী তাদৃশ কার্য্যকরী হইবে না; কেন না তাঁহার প্রতিভা সময়ানুবর্ত্তী হইয়া ধীরে ধীরে বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই, প্রায় প্রথম হইতেই একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কেবল এক 'দুর্গেশনন্দিনী'কেই তাঁহার অপরিপক্ক হস্তের রচনা বলা যাইতে পারে; এক ইহার মধ্যেই কতকটা ক্ষীণতা ও অস্পষ্টতা, কতকটা গভীর অভিজ্ঞতার অভাব, কতকটা যৌবন-স্বপ্নাবেশের ছায়া অনুভব করা যায়; নবীন লেখক যে তাঁহার বাস্তব-জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাকে শব্দসম্পদ ও কল্পনারাগের দ্বারা ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বেশ বুঝিতে পারি। 'দুর্গেশনন্দিনী'র দুই বৎসর পরেই 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৭) প্রকাশিত হয়; কপালকুণ্ডলাতে বঙ্কিম-প্রতিভা তাহার সমস্ত ধূমাবরণ ত্যাগ করিয়া একটী প্রদীপ্ত অনলশিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে; 'দুর্গেশনন্দিনী'র সমস্ত অনিশ্চয়, সমস্ত সঙ্কোচ, পুরাতন প্রথার সশঙ্ক অনুবর্ত্তন বঙ্কিম সবলে কাটাইয়া উঠিয়াছেন; 'কপালকুণ্ডলা'র যে গুণটী খুব তীব্রভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা উহার অন্তর্নিহিত ভাবটীর অসামান্য মৌলিকতা ও সাহস। এখানে বঙ্কিমের প্রতিভা নিজ স্বরূপের পরিচয় পাইয়াছে, এবং সমস্ত অনুকরণ ত্যাগ করিয়া নিজের জন্য একটী সম্পূর্ণ নূতন পথ বাহির করিয়া লইয়াছে। অবশ্য এখন হইতে বঙ্কিমের প্রতিভা যে একেবারে নির্দ্দোষ ও প্রমাদশূন্য হইয়াছে, তাহা বলিতেছি না; কিন্তু এ সময়ের ভুল ভ্রান্তি একটু নূতন রকমের; অতিসাহসের ফল, ভীরুতার নহে। সময় সময় বঙ্কিম আপন প্রতিভার উপর অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন করিয়া তাহাকে গুরুভারপীড়িত করিয়া তুলিয়াছেন; উপন্যাসের

মধ্যে এমন সমস্ত প্রকৃতি-বিরুদ্ধ উপাদানের সমাবেশ করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রতিভাও সম্পূর্ণভাবে গলাইয়া মিশাইতে পারে নাই ; সময় সময় উপন্যাসকে তিনি নিজ আদর্শবাদের ছাঁচে ঢালিতে গিয়া উহার মৌলিক প্রকৃতিটী রক্ষা করিতে পারেন নাই, কল্পনার মুক্তপক্ষে উড়িয়া নীল আকাশের এমন সুদূর দেশে পৌছিয়াছেন, যেখানে আমাদের সহজ বুদ্ধি ও বিশ্বাস পায়ে হাঁটিয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিতে পারে নাই! কিন্তু এই সমস্ত ত্রুটীবিচ্যুতি দুঃসাহসের ফল, অক্ষমতার নহে ; সুতরাং ইহারা 'দুর্গেশনন্দিনী'র ত্রুটিবিচ্যুতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে বঙ্কিমের প্রতিভা দুর্গেশনন্দিনীর পরেই একেবারে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে, ক্রম বিকাশের মন্থর পথে অগ্রসর হয় নাই ; সেইজন্য কালানুক্রমিক সমালোচনা ঠিক তাঁহার পক্ষে উপযোগী হইবে কিনা সন্দেহ।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি আর এক দিক দিয়া আলোচিত হইতে পারে। স্থূলতঃ ইহারা দুইভাগে বিভক্ত—এক শ্রেণী সম্পূর্ণ বাস্তব, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বর্ণনা ও ব্যাখ্যাই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় শ্রেণী ঐতিহাসিক বা অসাধারণ ঘটনাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ ইংরাজী উপন্যাসে 'novel' ও 'romance' বলিয়া যে দুইটী প্রধান বিভাগ আছে, বঙ্কিমের উপন্যাসেও সেই দুইটী বিভাগ বর্ত্তমান এবং ইহাদের স্বতন্ত্র আলোচনা হওয়া উচিত।

এখন 'novel' ও 'romance' এর মধ্যে যে লৌকিক প্রভেদটুকু আছে, তাহা আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে। প্রধানতঃ উহাদের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা বাস্তব-গুণের আপেক্ষিক প্রাধান্য লইয়া। 'Novel' অবিমিশ্রভাবেই বাস্তব ; ইহার মধ্যে কল্পনার ইন্দ্রধনুরাগসমাবেশের অবসর অত্যন্ত অল্প। ইহার প্রধান কাজ সমসাময়িক সমাজ ও পারিবারিক জীবন চিত্রণ ; সত্য পর্য্যবেক্ষণও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণই ইহার প্রধান গুণ। যতদূর সম্ভব সমস্ত অসাধারণত্বই ইহার বর্জ্জনীয় ; কেবল আমাদের জীবন প্রবাহের মধ্যে যে সমস্ত দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি উচ্ছ্বসিত, যে সমস্ত সংঘাত বিক্ষুব্ধ ও মুখরিত হইয়া উঠে, সেই অবিসংবাদী অথচ রহস্যমণ্ডিত সত্যগুলির দ্বারাই ইহা অসাধারণত্বের সাময়িক স্পর্শলাভ করিতে পারে। 'Romance'এর বাস্তবতা অপেক্ষাকৃত মিশ্র ধরণের ; ইহা জীবনের সহজ প্রবাহ অপেক্ষা তাহার অসাধারণ উচ্ছ্বাস বা গৌরবময় মুহূর্ত্তগুলির উপরেই অধিক নির্ভর করে। জীবনের বীরোচিত বিকাশগুলি, মনের উঁচুসুরে বাঁধা ঝঙ্কার গুলি, জীবনের বর্ণবহুল শোভাযাত্রা-সমারোহ—ইহাই মুখ্যতঃ রোমান্সের বিষয় বস্তু। সেইজন্য সূর্য্যালোক-দীপ্ত, অতিপরিচিত বর্ত্তমান অপেক্ষা কুহেলিকাচ্ছন্ন, অপরিচিত অতীতের দিকেই ইহার স্বাভাবিক প্রবণতা। অতীতের বিচিত্র বেশ-ভূষা, ও আচার ব্যবহার, অতীতের আকাশ-বাতাসে লঘু মেঘখণ্ডের মত যে সমস্ত অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস ও কবিত্বময় কল্পনা ভাসিয়া বেড়ায়, রোমান্সলেখক সেই-গুলিকেই ফুটাইয়া তুলিতে যত্ন করেন। অবশ্য এই সমস্ত অসাধারণত্বের মধ্যেও রোমান্স বাস্তব জীবনের সহিত একটী নিগূঢ় ঐক্য হারায় না ; জীবনের সহিত যোগসূত্র হারাইলেই ইহা একটী সম্পূর্ণ অসম্ভব পরীর গল্পের মত অশরীরী হইয়া পড়িবে। মধ্যযুগের রোমান্স এইরূপ সম্পূর্ণ বাস্তব-সম্পর্কশূন্য ছিল বলিয়া তাহার উপন্যাসশ্রেণী মধ্যে পরিণত হইবার স্পর্দ্ধা ছিল না ; তাহাদের অন্তহীন মায়াঘন অরণ্যানীর মধ্যে আমাদের বাস্তব জীবনের প্রতিধ্বনি বড়

একটা শুনা যাইত না। কিন্তু আধুনিক যুগের যে বর্দ্ধমান বাস্তব-প্রবণতার মধ্যে সামাজিক উপন্যাস জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা রোমান্সের উপরও নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে ছাড়ে নাই। আধুনিক রোমান্সও বাস্তবতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া সত্যের কঠোর সংযম স্বীকার করিয়া লইয়াছে। রোমান্সের জগতেও আর অতিপ্রাকৃত বা অবিশ্বাসের কোন স্থান নাই। রোমান্সলেখককেও এখন বাস্তব বা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হয়; মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের দ্বারা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ স্পষ্ট করিতে হয়; ইহার বাতাসে যে বিচিত্র বর্ণের ফুল ফুটে, তাহাকে মৃত্তিকার সহিত সম্পর্কান্বিত করিয়া দেখাইতে হয়। তবে সামাজিক উপন্যাসের সঙ্গে ইহার এই মাত্র প্রভেদ যে বাস্তবতার বন্ধন ইহাকে একেবারে নাগপাশের মত সুদৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরে নাই, ইহার মধ্যে বিচিত্র ও অসাধারণ ব্যাপারের অপেক্ষাকৃত অধিক অবসর আছে; এবং সাধারণ উপন্যাসের ন্যায় রোমান্সের ক্ষেত্রে বাস্তবতার দাবী এত প্রবল বা সর্ব্বগ্রাসী নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সগুলি আলোচনার সময় সামাজিক উপন্যাসের সহিত রোমান্সের এই মৌলিক প্রভেদটী আমাদের মনে রাখিতে হইবে।

বঙ্কিম চন্দ্রের নিম্নলিখিত উপন্যাসগুলিকে রোমান্স-শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। (১) দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫); (২) কপালকুণ্ডলা (১৮৬৭); (৩) মৃণালিনী (১৮৬৯); (৪) যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪); (৫) চন্দ্রশেখর (১৮৭৫); (৬) রাজ-সিংহ (১৮৮২); (৭) আনন্দমঠ (১৮৮২); (৮) দেবীচৌধুরাণী (১৮৮৪); ও (৯) সীতারাম (১৮৮৭)। অবশ্য এই সমস্ত উপন্যাসে রোমান্সের উপাদান সমানভাবে ঘনসন্নিবিষ্ট নহে—কোথাও বা রোমান্স উপন্যাসের আকাশ বাতাসে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা সামাজিক জীবনের রন্ধ্রপথে মেঘান্তরালবর্ত্তী বিদ্যুৎশিখার ন্যায় একটা অনৈসর্গিক দীপ্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আবার তাহাদের সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যও সকল ক্ষেত্রে সমান হয় নাই; কোথাও বা বাস্তবতার সহিত অসাধারণত্বের একটী চমৎকার সমন্বয় সাধিত হইয়া, উপন্যাসখানি অনিন্দনীয় সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে; কোথাও বা অসামঞ্জস্য প্রকট হইয়া উঠিয়া উপন্যাসকে অবাস্তবতাদুষ্ট করিয়াছে ও আমাদের বিচারবুদ্ধি ও সৌন্দর্য্যবোধকে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে। এই সমস্ত দিক্ দিয়া আমাদিগকে উপন্যাসগুলির বিচার করিতে হইবে।

'দুর্গেশনন্দিনী'তে যে রোমান্স ঐতিহাসিক যুদ্ধ বিগ্রহ ও সাহিত্য-সুলভ প্রেমের আশ্রয়ে ধীরে ধীরে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল, তাহা 'কপালকুণ্ডলা'তে একেবারে সমস্ত বাহ্য অবলম্বন ত্যাগ করিয়া নিজ অন্তর্নিহিত রসের দ্বারাই পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে গতানুগতিকতার যে একটা জড়তা ছিল, তাহা 'কপালকুণ্ডলা'য় কল্পনা-শক্তির অসামান্য সাহসিকতায় সতেজ ও লীলাচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সাগরতীরবাসিনী, কাপালিক-প্রতিপালিতা চির সন্ন্যাসিনী কপালকুণ্ডলার মূর্ত্তিকল্পনায় বঙ্কিম যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা একজন বাঙ্গালী উপন্যাসিকের পক্ষে বাস্তবিকই বিস্ময়কর। আমাদের রুদ্ধ-দ্বার সঙ্কীর্ণ-পরিসর বাস্তব জীবনে রোমান্সের উদার আলোক ও মুক্ত বায়ু নিতান্তই বিরল-প্রবেশ। সময় সময় আমরা বৈদেশিক সাহিত্যের অনুকরণ করিয়া বিদেশপ্রচলিত প্রণালীর

দ্বারা আমাদের বাস্তবজীবনে রোমান্সের উচ্ছ্বসিত প্রবাহ বহাইতে চাহি ; কিন্তু এই চেষ্টা, বাস্তব জীবনের সহিত অসামঞ্জস্যের জন্য, সার্থক ও শোভন হইয়া উঠে না। যেমন প্রত্যেক দেশের মাটীতে এক এক বিশেষ রকম ফুল রঙ্গীন হইয়া উঠে, সেইরূপ প্রত্যেক দেশেই রোমান্স তথাকার বাস্তবজীবনের সহিত এক নিগূঢ় ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ, সেই বাস্তবজীবনেরই একটা উচ্চতর বিকাশ। যেমন যে জিনিষ আমরা পারিবারিক জীবনে ঘরকন্নার প্রাত্যহিক কাজের মধ্যে মনপ্রাণ দিয়া খুঁজি, তাহাই সাহিত্যে গানের সুর হইয়া বাজিয়া উঠে, সেইরূপ রোমান্সের স্বপ্নও আমাদের বাস্তব-জীবন-বৃন্তের রঙ্গীন ফুল মাত্র। ইউরোপীয় সাহিত্যে সাধারণতঃ ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের, বা বিচিত্র, বিরোধ-জটিল প্রেমের অপ্রত্যাশিত বিকাশের মধ্য দিয়া রোমান্সের অনুসন্ধান হয় ; ইউরোপীয় সভ্যতার এই স্বাভাবিক বিকাশের পথেই রোমান্স জীবনে প্রবেশ লাভ করে। কিন্তু আমাদের উপন্যাসে ইতিহাস বা প্রেমের মধ্যে যে রোমান্সকে পাওয়া যায়, তাহা ঠিক স্বাভাবিক হয় না ; বাস্তব-জীবনের ঠিক অনুবর্ত্তন করে না। কেননা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে ইউরোপের মত আমাদের দেশে ইতিহাস বা রাজনৈতিক সংঘর্ষ সাধারণ জীবনের উপর তাদৃশ প্রভাব বিস্তার করে না। প্রেমের চিরন্তন লীলা যে আমাদের সাহিত্য বা জীবনে ছিল না তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে ; কিন্তু ইউরোপীয় সমাজে প্রেমের বিচিত্র ধারা যেরূপ নূতন নূতন বিস্ময়ের মধ্যে বিকশিত হইয়াছে, আমাদের দেশে সামাজিক বৈশিষ্ট্যের জন্য ঠিক তাহা হইতে পারে নাই, প্রেম বাহিরের দিকে বৈচিত্র ও বিস্ময়কর উন্মেষ লাভ না করিয়া, অন্তর্মুখী, গভীর ও একনিষ্ঠ হইবার দিকে চলিয়াছে। অবশ্য আমাদের অতীত যুগের সামাজিক অবস্থা যে ঠিক বর্ত্তমানের মত নীরস ও বৈচিত্র্যহীন ছিল তাহা নহে ; আমাদেরও একটা বীরত্বমণ্ডিত, গৌরবময় যুগ ছিল, আমাদেরও জীবন এককালে দুঃসাহসিকতার রুদ্রতালে আবর্ত্তিত হইত, আমাদেরও প্রেম হয়ত একটা গভীর ও প্রবল আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। কিন্তু আজকাল আমাদের জীবনের ধারা এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে, পুরাতন প্রণালী হইতে এতদূর সরিয়া গিয়াছে, যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিকল্পনা দ্বারাও সেই পুরাতন দিনের জীবনযাত্রা পুনর্জ্জীবিত করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই পুরাতন আবেগ কোন চিরবিস্মৃতির মরুভূমে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাই উপন্যাসে আমাদের অতীত যুগের কাহিনী নিশীথ স্বপ্নের কুহেলিকাজড়িত বলিয়া মনে হয় ; আমাদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা একটা ইন্দ্রজালরচিত আকাশসৌধের ন্যায় বাস্তবসংস্পর্শশূন্য হইয়া পড়ে, আমাদের যুদ্ধজয় একটা মস্ত আস্ফালন ও অর্থহীন কোলাহলে পরিণত হয় ; আমাদের প্রেমাভিব্যক্তি একটা বহুপুরাতন মন্ত্রের প্রাণহীন আবৃত্তির মতই শুনায়। 'আনন্দমঠ,' 'মৃণালিনী,' 'চন্দ্রশেখর' ইত্যাদি উপন্যাসে বঙ্কিমের প্রতিভা এই কেন্দ্রস্থ ও অপরিহার্য্য দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে নিষ্ফল সংগ্রামে নিজকে ব্যথিত করিয়াছে, অসাধারণ সৌন্দর্য্যসৃষ্টির মধ্যেও একটী গূঢ় ব্যর্থতার বীজ রাখিয়া গিয়াছে।

কপালকুণ্ডলায় রোমান্টিক আবেষ্টন রচনায় বঙ্কিম অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন ; তিনি ইতিহাস ও প্রেমকে যতদূর সম্ভব পশ্চাতে রাখিয়া রোমান্সের এমন একটি উৎস

আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা আমাদের বাস্তবজীবনের কঠিন মৃত্তিকা হইতে স্বতঃই উৎসারিত হইতে পারে। আমাদের শান্ত, ধর্ম্মাভিভূত জীবনের উপর যদি কখন কল্পলোকের আলোকপাত সম্ভব হয়, তবে তাহা একটা প্রবল ধর্ম্মোন্মাদের দিক হইতেই আসিতে পারে, যুদ্ধের উদ্দীপনা বা প্রেমের উচ্ছ্বাস হইতে নহে। এই জন্যই কপালকুণ্ডলার জীবনের উপর যে একটা অসাধারণত্ব আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা তান্ত্রিকপ্রথার ভীষণতা ও সহজ ধর্ম্মপ্রবণতা হইতে উদ্ভূত বলিয়া আমাদের বাস্তব জীবনের সহিত একটা সুসঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে। আবার এই উপন্যাসের রোমাণ্টিক উপাদানগুলি—বিজন সমুদ্রতীরের অতুলনীয় মহিমা, কাপালিকের নির্ম্মম ধর্ম্ম-সাধনা—কেবল মাত্র একটা বাহ্যবৈচিত্র্যের উপায়মাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই; ইহারা কপালকুণ্ডলার চরিত্রের উপর একটী গভীর অনপনেয় প্রভাব অঙ্কিত করিয়া একটা অসাধারণ সার্থকতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। * কেননা ইহার সমস্ত রোমান্সের সার, এই সৌন্দর্য্য জগতের মধ্যমণি হইতেছে কপালকুণ্ডলার চরিত্র। সুকোমল মাধুর্য্যের চারিদিকে একটা অনমনীয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বেড়া, গার্হস্থ্য সুখভোগের মধ্যে একটা অক্ষুণ্ণ উদাসীনতার সংযম, সামাজিক বিধি নিষেধের মাঝখানে একটা শান্ত অথচ অদম্য স্বাধীনতা; অথচ কোথাও পুরুষোচিত কঠোরতা বা পরুষতার লেশমাত্র নাই, সর্ব্বত্রই একটা রমণীর কোমলতা; শিক্ষা দীক্ষায় বিভিন্ন, কিন্তু অন্তরে একটী চিরন্তনী স্ত্রীমূর্ত্তি (eternal feminine)—এরূপ অতুলনীয় চরিত্র-কল্পনা শুধু বঙ্গসাহিত্যে কেন, ইউরোপীয় সাহিত্যেও বিরল।

সামাজিক জীবনে প্রবেশের পরেও কপালকুণ্ডলার বাল্যকালের রোমাণ্টিক প্রতিবেশ তাহাকে বেষ্টন করিতে ছাড়ে নাই। পারিবারিক জীবনের নিয়মশৃঙ্খল, স্বামীর অপরিমিত ভালবাসাও তাহার নয়নের অপার্থিব স্বপ্নঘোর ঘুচাইতে পারে নাই। সমুদ্রতীরে বন্যলতাটী গৃহস্থের গৃহ-প্রাঙ্গণে রোপিত ও অজস্রস্নেহধারাসিঞ্চিত হইয়াও নূতন স্থানে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই, খুব আল্‌গা হইয়াই লাগিয়া ছিল; পুরাতন জীবন হইতে একটী তরঙ্গ আসিয়াই তাহাকে একেবারে উন্মূলিত করিয়া লইয়া গেল। তাহার অন্তরমধ্যে যে একটি চিরউদাসিনী আলুলায়িতকুন্তলা অতীত স্বাধীনতার দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছিল, তাহাকে সংসার তাহার শত আদর প্রলোভনেও পোষ মানাইতে পারিল না। অথচ তাহার মধ্যে একটা অসামাজিক বন্যতা, বা রমণীসুলভ কোমলতার অভাব কিছুই নাই। বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' নামক গল্পের নায়ক 'তারাপদ'ই 'কপালকুণ্ডলা'র একমাত্র তুলনাস্থল; অথচ আবেষ্টনের অসাধারণত্বে ও প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যে উহাদের মধ্যে কত প্রভেদ। তারাপদের ঔদাসীন্য একটী চিরচঞ্চল, ক্রীড়াশীল হরিণশিশুর বন্ধন-ভীরুত্বের ন্যায়, দিগন্তরেখাস্থিত নীল-মায়ার প্রতি একটা নামহীন, রহস্যময় আকর্ষণমাত্র; কিন্তু কপালকুণ্ডলার সংসার-বিরক্তির পশ্চাতে আমরা একটী বিশেষ ধর্ম্মসাধনার, একটী অভ্যস্ত জীবন-যাত্রার সমস্ত দুর্নিবার শক্তি অনুভব করি। তাহাছাড়া, 'তারাপদ' 'কপাল-কুণ্ডলার' একটা অপেক্ষাকৃত শান্ত, ও বাস্তব সংস্করণ; পল্লীর সাধারণ জীবনযাত্রার সহিত তাহার মুক্ত, বন্ধনহীন

* The beauty born of murmuring sounds
Has passed into her face

জীবন একটা ক্ষণিক, অথচ নিগূঢ় একাত্মতা লাভ করিয়াছে ; 'কপালকুণ্ডলার' নিঃসঙ্গতা আরও প্রগাঢ়তর। এক দয়া ও সমবেদনা ছাড়া সাধারণ সামাজিক জীবনের সহিত তাহার আর কোন যোগসূত্র নাই।

সাধারণতঃ উপন্যাসে যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা, স্বপ্নদর্শন ইত্যাদি অবতারণা করা হয়, তাহার প্রায়ই বাহ্য বৈচিত্র্যবৃদ্ধির উপায়রূপে ব্যবহৃত হয় ; কদাচিৎ, খুব বড় কলাবিদের হাতে তাহাদের মধ্যে একটা গূঢ় সাঙ্কেতিকতা থাকে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে যে সমস্ত অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন, তাহারা কবিকল্পনার ন্যায় কেবল সৌন্দর্য্য-মাত্রাত্মক নহে। পরন্তু কপাল-কুণ্ডলার চরিত্রের সহিত একটী নিগূঢ় ও সুসঙ্গতসম্বন্ধবিশিষ্ট। নবকুমারের সহিত আগমনকালে ভবিষ্যৎ শুভাশুভ জানিবার জন্য দেবী-পদে বিল্বপত্রার্পণ কেবল একটা পূজার বাহ্য অনুষ্ঠান মাত্র নহে ; ইহা কপালকুণ্ডলার ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ে একটী অজ্ঞাত আশঙ্কার ছায়া ফেলিয়া তাহার নূতন জীবনের প্রতি অনাসক্তি বাড়াইয়া তুলিয়াছে, ও ভবিষ্যৎ বিপৎপাতের ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণে সাহায্য করিয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শ্যামাসুন্দরী ও কপালকুণ্ডলার কথোপকথনের মধ্যে এই আপাত-তুচ্ছ ব্যাপারটী ধর্ম্মপ্রাণ কপালকুণ্ডলার অন্তর্জগতে কিরূপে একটী বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা ব্যক্ত হইয়াছে / আবার চতুর্থ খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলা যে আকাশপটলিখিতা নীল-নীরদ-নির্ম্মিতা ভৈরবীমূর্ত্তিকে মরণের পথে নীরবে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহাও অদ্ভুত মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের দ্বারা তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্মমোহের সহিত একাঙ্গীভূত হইয়াছে। এই কুশল মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের সঙ্গে অসাধারণত্বের গভীর সামঞ্জস্য সাধনেই কপালকুণ্ডলার বিশেষত্ব।

এই চরিত্রবিশ্লেষণ স্বল্প অথচ গভীরার্থক কয়েকটী কথার দ্বারা সুনিপুণ ভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। কোন বাস্তবতাপ্রধান লেখকের হাতে পড়িলে এই অর্থপূর্ণ মিতভাষিতা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্যাপী সুদীর্ঘ বাক্‌বিন্যাসে পরিণত হইত সন্দেহ নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের এই ক্ষমতার দুই একটী মাত্র উদাহরণ দিব। যখন কপালকুণ্ডলা সাংসারিক হিতাহিতের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া ব্রাহ্মণবেশীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল, তখন লেখক কয়েকটী মাত্র পংক্তিতে তাহার এই অসাধারণ সঙ্কল্পের মূলীভূত কারণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

"কপালকুণ্ডলা বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন না—সুতরাং বিজ্ঞের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন না। কৌতূহলপরবশ রমণীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভীমকান্তি রূপরাশি দর্শনলোলুপ যুবতীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, নৈশ বনভ্রমণবিলাসিনী সন্ন্যাসিপালিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভবানী-ভক্তিভাববিমোহিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন ; জ্বলন্ত বহ্নিশিখায় পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন। (চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।)

অল্প কথায় গভীর বিশ্লেষণের আর একটী উদাহরণ পাই, কপালকুণ্ডলার প্রতি নব-কুমারের প্রথম প্রণয় প্রকাশের বর্ণনায়।

"যখন নবকুমার দেখিলেন যে কপালকুণ্ডলা তাঁহার গৃহমধ্যে সাদরে গৃহীতা হইলেন,

তখন তাঁহার আনন্দ-সাগর উছলিয়া উঠিল ; অনাদরের ভয়ে তিনি কপালকুণ্ডলা লাভ করিয়াও কিছুমাত্র আহ্লাদ বা প্রণয়লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই। ... ...এই আশঙ্কাতেই তিনি কপাল-কুণ্ডলার পাণিগ্রহণপ্রস্তাবে অকস্মাৎ সম্মত হন নাই ; এই আশঙ্কাতেই পাণিগ্রহণ করিয়াও গৃহ গমন পর্য্যন্ত বারেকমাত্র কপালকুণ্ডলার সহিত প্রণয়-সম্ভাষণ করেন নাই ; পরিপ্লবোন্মুখ অনুরাগসিন্ধুতে বীচিমাত্র নিক্ষিপ্ত হইতে দেন নাই। কিন্তু সে আশঙ্কা দূর হইল।.. ....
এই প্রেমাবির্ভাব সর্ব্বদা কথায় ব্যক্ত হইত না. কিন্তু নবকুমার কপাল-কুণ্ডলাকে দেখিলেই যেরূপ সজললোচনে তাঁহার প্রতি অনিমিষ চাহিয়া থাকিতেন, তাহাতেই প্রকাশ পাইত। যেরূপ নিষ্প্রয়োজনে প্রয়োজন কল্পনা করিয়া কপালকুণ্ডলার কাছে আসিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত : যেরূপ বিনাপ্রসঙ্গে কপালকুণ্ডলার প্রসঙ্গ উত্থাপনের চেষ্টা পাইতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত ; যেরূপ দিবানিশি কপালকুণ্ডলার সুখস্বচ্ছন্দতার অন্বেষণ করিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত। সর্ব্বদা অন্যমনস্কতাসূচক পদবিক্ষেপেও প্রকাশ পাইত।”

কপালকুণ্ডলার আর একটি গুণ সমালোচকের বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তাহা উপন্যাসটীর অনবদ্য গঠনকৌশল। উপন্যাসখানি ঠিক একটী গ্রীক ট্র্যাজেডির মত সরল রেখায় অবিসর্পিত গতিতে সর্ব্বপ্রকার বাহুল্য-বর্জ্জিত হইয়া অবশ্যম্ভাবী বিষাদময় পরিণতির দিকে অনিবার্য্যবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রত্যেক অধ্যায় এক নিগূঢ়-কলাকৌশল-নিয়ন্ত্রিত হইয়া কেন্দ্রাভিমুখী হইয়াছে। এমন কি সুদূর মোগল রাজধানীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও অন্তঃপুরিকাদের ঈর্ষ্যাদ্বন্দ্ব পর্য্যন্ত বনবাসিনী কপালকুণ্ডলার নিয়তির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, যে অগ্নিতে সে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে তাহার ইন্ধন যোগাইয়াছে। চারিদিকের সমস্ত শক্তি যেন দৈববলে সংহত হইয়া কপালকুণ্ডলার অদৃষ্টরথকে এক অন্তহীন অতলের দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে—তাহার সংসারানাসক্তি, স্বামিপ্রণয়বঞ্চিতা শ্যামার প্রতি সমবেদনা, কাপালিকের অতন্দ্র প্রতিহিংসা, নবকুমারের আশঙ্কা-দুর্ব্বল গভীর প্রেম, পদ্মাবতীর পাষাণ প্রাণে প্রেমমন্দাকিনী ধারার অতর্কিত আবির্ভাব, সর্ব্বোপরি এক ক্রুদ্ধ দৈবশক্তির সুস্পষ্ট অঙ্গুলিসঙ্কেত—এই সমস্ত শক্তি, মানুষ এবং দৈব, সৎ ও অসৎ একসঙ্গে ভিড় করিয়া যেন রথরজ্জুর আকর্ষণে হাত দিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র জীবনের বিরুদ্ধে এতগুলি প্রচণ্ডশক্তির সমাবেশ—আমাদের মনকে এক গভীর সমাধানহীন রহস্যের বেদনায় ব্যথিত করে এবং কপালকুণ্ডলার রহস্যময় অন্তর্দ্ধান পর্য্যন্ত সমস্ত জীবনেতিহাসটি আমাদিগকে নিয়তির দুর্জ্ঞেয় লীলার একটা বিস্ময়কর বিকাশের ন্যায় অভিভূত করিয়া ফেলে।

কপালকুণ্ডলার দুই বৎসর পরে মৃণালিনী প্রকাশিত হয় (১৮৬৯)। মৃণালিনীতে বঙ্কিম আবার ইতিহাস ও প্রেমের ক্ষেত্র হইতে রস ও বর্ণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলার রোমান্সে যে একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মাধুর্য্য ও সুসঙ্গতি আছে, মৃণালিনীতে অবশ্য তাহা নাই ; তথাপি দুর্গেশনন্দিনীর সঙ্গে তুলনা করিলে বঙ্কিম উন্নতির পথে যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। চরিত্র-চিত্রণ এবং ঘটনাবিন্যাস উভয় দিকেই বঙ্কিম দুর্গেশনন্দিনীর সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। জগৎসিংহ, ওসমান, তিলোত্তমা

প্রভৃতি চরিত্রগুলিতে বাস্তবতার ভাগ একটু অল্প আছে বলিয়াই মনে হয়; বিচিত্র ঘটনাস্রোতে তাহাদের ব্যক্তিত্ব খুব ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। মৃণালিনীর চরিত্রগুলিতে বাস্তবতার চিহ্ন প্রকটতর হইয়া উঠিয়াছে। হেমচন্দ্র জগৎসিংহের মত কেবল একটা বীরোচিত আদর্শের ম্লান ছায়া মাত্র নহে, তাহার ব্যক্তিত্ব আরও সুস্পষ্ট। হেমচন্দ্রের দুর্জ্জয় ক্রোধ ও অভিমান, তাহার চিত্তচাঞ্চল্য ও পরিবর্ত্তনশীলতা ও অন্যায় হঠকারিতাই তাহাকে জগৎসিংহ অপেক্ষা স্ফুটতর বৈশিষ্ট্য দিয়াছে ও আদর্শ লোক হইতে নামাইয়া ভ্রান্তি প্রমাদ সঙ্কুল রক্তমাংসের মানুষের মধ্যে স্থান দিয়াছে। জগৎসিংহ-তিলোত্তমার প্রেমের সহিত তুলনায় হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রেম আরও একটু জটীলতর, বাস্তবতার আরও একটু গভীরতর স্তর স্পর্শ করে। মৃণালিনী নিতান্ত শান্তপ্রকৃতি ও ক্ষমাশীলা হইলেও তিলোত্তমার অপেক্ষা অধিকতর বাস্তব হইয়াছে। দুঃখের অভিজ্ঞতা ও বিপদে তেজস্বিতা তাহাকে একেবারে মোমের পুতুল হইতে দেয় নাই। গিরিজায়া বিমলার একটী অধিকতর স্বাভাবিক সংস্করণ; একজন পৌর মহিলার মুখে যে ব্যবহার একটু অশোভন ও অসংযত বলিয়া বোধ হয়, তাহা ভিখারিণীর পক্ষে সুসঙ্গত ও উপযুক্তই হইয়াছে। বিশেষতঃ মনোরমার চরিত্র কল্পনায় বঙ্কিম যে মৌলিকতা ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার কোন চিহ্ন দুর্গেশনন্দিনীতে পাই না; ইহার অনুরূপ কোন চরিত্র পূর্ব্ববর্ত্তী উপন্যাসে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসে যে কয়েকটী অবাস্তব কবি কল্পনানুযায়ী স্ত্রী চরিত্র পাই, মনোরমা তাহাদের অগ্রবর্ত্তিনী। 'দেবী চৌধুরাণী'তে দিবা নিশা ও সীতারামে জয়ন্তী এই জাতীয় চরিত্র—বাস্তব বন্ধনহীন কাল্পনিক, আমাদের সামাজিক অবস্থার সহিত সম্পর্ক রহিত,যেন লেখকের কতগুলি প্রিয় theoryর মূর্ত্ত বিকাশ মাত্র। কেবল অসাধারণ বাক্ পটুতা ও রসিকতার গুণেই তাহারা আমাদের নিকট জীবন্ত মানুষ বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহাদের বাক্যের সরসতা তাহাদের ব্যবহারের অবাস্তবতাকে অনেকখানি ঢাকিয়া দেয়। মনোরমা ইহাদের মত এতটা কাল্পনিক নহে; তাহার রহস্যময় দ্বৈতভাবের কোন মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই বটে, এই অদ্ভুত প্রকৃতি বৈষম্যের উদ্ভব কখন এবং কি প্রকারে হইল সে সম্বন্ধে লেখক আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করেন নাই বটে; কিন্তু যেরূপ আশ্চর্য্য দক্ষতা ও সুসঙ্গতির সহিত তাহার কার্য্যে ও ব্যবহারে এই দ্বৈতভাবটী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে আমাদের অবিশ্বাস আর মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে না। বিশেষতঃ পশুপতির সহিত তাহার প্রেমের অসাধারণত্ব বাহ্য বিরোধ ও ঔদাসীন্যের মধ্যে গোপন আকর্ষণ—হেমচন্দ্র মৃণালিনীর সাধারণ উচ্ছসিত প্রেমের সহিত একটী সুন্দর বৈপরীত্যের (contrast) হেতু হইয়াছে।

কিন্তু মৃণালিনীর প্রকৃত ত্রুটি হইতেছে ইহার ঐতিহাসিক আবেষ্টনে ও ইতিহাসের সহিত প্রেমকাহিনীর সামঞ্জস্য-স্থাপনে। বঙ্কিম মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গজয়ের যে চিত্র দিয়াছেন, তাহা কতদূর ইতিহাস-সম্মত তাহা বলিতে পারিনা; তবে তাহাকে উচ্চ অঙ্গের ঐতিহাসিক কল্পনাপ্রসূত বলিয়া মনে করিতে আমাদের বিশেষ দ্বিধা হয় না। সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বঙ্গজয়ের যে একটা প্রবাদ মুসলমান ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইলে,

তাহাতে পশ্চাতে বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্ধ কুসংস্কার উভয়েরই অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয়; এবং বঙ্কিম পশুপতির বিশ্বাসঘাতকতা ও বৃদ্ধ গৌড় রাজের অন্ধধর্ম্মবিশ্বাসের বর্ণনা দ্বারা এই বিরাট বিপর্য্যয়ের একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ও প্রকৃত ইতিহাসজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। তবে ঐতিহাসিক উপাদান ও প্রকৃত তথ্যের অভাব বশতঃ এই ব্যাখ্যা নিতান্ত কাল্পনিক, ফাঁকা ফাঁকা রকমের বলিয়া ঠেকে। তথ্যের যে পরিমাণ ঘনসন্নিবেশ হইলে একটা বৃহৎ ঐতিহাসিক ব্যাপার আমাদের চক্ষে সত্য ও জীবন্ত হইয়া উঠে, তাহা বঙ্কিমের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব ছিল; সেইজন্য তথ্যের অভাব কল্পনার বাস্প-স্ফীতি দ্বারা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। হেমচন্দ্র, মাধবাচার্য্য, পশুপতি, লক্ষ্মণসেন, শান্তশীল—একটা বিশাল রাজনৈতিক সঙ্কটের সন্ধিস্থলে এই সমস্ত অশরীরী প্রেতমূর্ত্তিই জাতির ভাগ্য-নিয়ন্তা, ইহা ভাবিতে মন একটা ক্ষুব্ধ অতৃপ্তি ও অবিশ্বাসের ভারে পীড়িত হইতে থাকে—তাহারা বিশাল যবন-প্লাবন-তরঙ্গের উপর ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদের মতই প্রতীয়মান হয়। এক জপসাধনা-রত ব্রাহ্মণ ও এক রাজচ্যুত প্রণয়োন্মত্ত রাজপুত্র—যাহাদের পিছনে অর্থ ও লোকবলের কোনই পরিচয় পাই না—ইহারাই মুসলমান সাম্রাজ্যধ্বংসের প্রধান ও একমাত্র উদ্যোগী, ইহা মনে করিলে ডন্ কুইক্সোট ও সাঙ্কোপাঞ্জার কথাই মনে পড়ে। বিশেষতঃ যে হেমচন্দ্রের উপর মাধবাচার্য্য এত গভীর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন, যাহাকে যবনজয়ের একমাত্র উপায় বলিয়া সমস্ত প্রণয় বিলাস হইতে দূরে রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার কার্য্য কলাপ আলোচনা করিলে এই গভীর দায়িত্বের জন্য তাহার অনুপযুক্ততার কথাই আমাদের মনে জাগিয়া উঠে। আবার পশুপতির প্রায় অনহুমেয় নির্ব্বুদ্ধিতা, সম্পূর্ণভাবে উদ্যোগহীন অবস্থায় আপনাকে এবং দেশকে শত্রুহস্তে সঁপিয়া দেওয়া, আমাদের অবিশ্বাসকে একেবারে কাণায় কাণায় ভরিয়া তোলে। লেখক নিজেও এই ত্রুটি, এই অবিশ্বাস্যতার বিষয়ে বেশ সচেতন ছিলেন, এবং পাঠকের বিদ্রোহ পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করিয়া একটা যেমন তেমন রকমের কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন—'উর্ণনাভ জাল পাতে, যুদ্ধ করে না'। বস্তুতঃ রাজনৈতিক সমস্ত ব্যাপারটীর উপরেই একটা অভিনয়োচিত অবাস্তবতা, একটা তীব্র-শ্লেষাত্মক (ironic) অসঙ্গতি ছায়াপাত করিয়াছে।

পক্ষান্তরে অবিশ্বাসের চরম সীমা অতিক্রমের পরে আমাদের মনে একটা বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। ভাবিয়া দেখিলে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হই, যে আমাদের দেশে ইতিহাসের ধারাই এরূপ কয়েকটী ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, কোন যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস সমসাময়িক কয়েকটী প্রধান ব্যক্তির কার্য্যাবলীর সমষ্টি মাত্র। জনসাধারণ নামে যে ব্যক্তিটী, ইউরোপীয় ইতিহাসে তাহার প্রভাব প্রতি পদক্ষেপেই ব্যক্ত করিয়াছে, সে আমাদের দেশের ইতিহাসক্ষেত্র হইতে একেবারে নিশ্চিহ্নভাবেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমাদের অতীতযুগের কোন গুরুতর রাজনৈতিক ঘটনার আলোচনা করিতে গেলেই, কয়েকটী ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত

বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাই আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে, এবং ইহা লইয়াই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। যে জনসাধারণের জাগ্রত, সচেষ্ট মনোভাব এই বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টাগুলিকে ঐক্য-সূত্রে গাঁথিতে পারিত, তাহারা তাহাদের সমস্ত জীবনটাই এক অবিচ্ছিন্ন নিদ্রাঘোরে কাটাইয়া দিয়াছে; বিনীতভাবে আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছে, নিশ্চেষ্টভাবে মার খাইয়াছে, কিন্তু কোনও প্রকারে নিজেদের ইচ্ছাশক্তি ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে নাই। আবার কবিকল্পনা যখন ইতিহাসকেই অনুসরণ করিয়া চলে, তখন কাল্পনিক চরিত্রগুলিকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের অপেক্ষা সজীবতর দেখিতে কিরূপে আশা করিতে পারি? ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মণসেনই যখন এত ক্ষীণজীবী, কেবল কুসংস্কার ও অক্ষমতার একটা মাংসপিণ্ড মাত্র, তখন কাল্পনিক চরিত্রগুলির মধ্যে দ্রুততর জীবন স্পন্দন ও গভীরতর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আশা করা অনুচিত বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং ঐতিহাসিক চিত্রের যে অসম্পূর্ণতা আমাদের অসন্তোষ উৎপাদন করে, তাহার জন্য বঙ্কিম অপেক্ষা আমাদের ইতিহাসধারার বিশিষ্টতাই দায়ী।

কেবল কল্পনাশক্তির দ্বারা গুরুতর ঐতিহাসিক সংঘটনের যতদূর মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করা যায়, তাহাতে বঙ্কিম কৃতকার্য্য হইয়াছেন। মহম্মদ আলির সহিত পশুপতির গুপ্ত পরামর্শ, ও বক্তিয়ার খিলিজির শাঠ্য প্রকৃত ঐতিহাসিক spiritএর দ্বারা অনুপ্রাণিত। যবন বিপ্লব নামক অধ্যায়টী (চতুর্থ খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ) উচ্চাঙ্গের বর্ণনা শক্তির পরিচয় দেয়। কিন্তু বঙ্কিমের কল্পনাশক্তির চরম বিকাশ, মানসিক বিপ্লব ও অন্তর্বিক্ষেপ ফুটাইয়া তুলিবার অতুলনীয় ক্ষমতার পরিচয়স্থল—'ধাতুমূর্ত্তির বিসর্জ্জন' নামক অধ্যায়টী (চতুর্থ খণ্ড, চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ)। এই অধ্যায়টী জীবন্ত বর্ণনাশক্তিতে ও জ্বালাময় শব্দপ্রয়োগে Dickensএর সহিত তুলনীয়। 'মৃণালিনীতে' বঙ্কিমের কলাকৌশল ও চরিত্রাঙ্কণ ক্ষমতা দুর্গেশনন্দিনী অপেক্ষা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্ব্বানুবৃত্তি

পঞ্চমশতাব্দীর ইউরোপ রোমীয় সাম্রাজ্য ও খৃষ্টীয় চার্চ্চের নিকট কি কি সভ্যতাসূত্র লাভ করিল, তাহা এতক্ষণ আলোচনা করা গেল। রোমীয় জগতের এই অবস্থায় টিউটন বর্ব্বরেরা আসিয়া রোমসাম্রাজ্য অধিকার করিল। সুতরাং ইউরোপীয় সভ্যতার শৈশবাবস্থায় যে যে উপাদান একত্র মিলিত ও মিশ্রিত হইল তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে হইলে এখন কেবল দেখিতে হইবে এই বর্ব্বর আগন্তুকেরা কি আনিয়া দিল।

মনে রাখিবেন যে বর্ব্বরদিগের ইতিহাস আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, আমরা এখানে ঘটনাপরম্পরার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হই নাই। আপনারা অবশ্য জানেন যে, যে সকল বর্ব্বর জাতি এই সময় রোমসাম্রাজ্য জয় করিয়া লইল, তাহারা প্রায় সকলেই এক মূল জাতির শাখাপ্রশাখা। আলানাই (Alanai) প্রভৃতি দুই একটী স্লাভনিক জাতি ব্যতীত তাহারা সকলেই জর্ম্মান। তাহারা সকলেই প্রায় সভ্যতার একই স্তরে উপনীত। তাহাদের মধ্যে কোন কোন জাতি রোমীয় জগতের সহিত অল্পবিস্তর সংস্পর্শে আসায় তাহাদের মধ্যে অবশ্য সভ্যতার কিছু তারতম্য ঘটিয়াছিল। যেমন গথ্ জাতি ফ্রাঙ্কদিগের অপেক্ষা নিশ্চয়ই উন্নততর ও শিষ্টতর ছিল। কিন্তু সাধারণ ভাবে বিচার করিতে হইলে, ইউরোপীয় সভ্যতার উপর প্রভাবের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, বর্ব্বরদিগের মধ্যে এই তারতম্য অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই বিবেচনা করিতে হয়।

বর্ব্বর সমাজের সাধারণ অবস্থাই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান কালে এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা বড়ই কঠিন। রোমীয় পৌরতন্ত্র বা খৃষ্টীয় চর্চ্চের স্বরূপ বুঝিতে আমাদের কোনই কষ্ট হয় না, কারণ তাহাদের প্রভাব এখনও পর্য্যন্ত চলিতেছে। বর্ত্তমান কালের বহু প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, বহু ঘটনার মধ্যে এই প্রভাবের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সেই সকল চিহ্ন চিনিয়া বা বুঝিয়া লইবার সহস্র উপায় আছে। কিন্তু বর্ব্বরদিগের রীতিনীতি ও সামাজিক অবস্থা একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সেগুলিকে উদ্ধার করিতে হইলে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া প্রাচীনতম ঐতিহাসিক নিদর্শন অথবা কল্পনার সাহায্য লইতে হয়।

বর্ব্বর প্রকৃতির যথাযথ স্বরূপ কল্পনা করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে একটি মূলভাব, মূলতথ্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। সেটী হইতেছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আনন্দ, সংসারের ও জীবনের নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্যে সতেজে ও স্বাধীনভাবে স্ফূর্ত্তি করিবার আনন্দ—শ্রান্তিবিরহিত কর্ম্মস্ফূর্ত্তির আনন্দ; সংশয়বৈষম্যবিপদসঙ্কুল জীবনযাত্রার যে আনন্দ তাহাই বর্ব্বরসমাজের প্রধান ভাব ছিল, এই আকাঙ্খার তাড়নায় বর্ব্বরেরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর বর্ব্বরদিগের মধ্যে এই ভাব যে কত প্রবল ছিল, তাহা আজকালকার সুনিয়ন্ত্রিত বিধিবদ্ধ সমাজপিঞ্জরের মধ্যে আমাদের সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন।

আমার মতে কেবল মাত্র একখানি গ্রন্থে বর্ব্বর জাতির এই বিশেষ লক্ষণ জীবন্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ব্বরধর্ম্মী সমাজে মানুষ যে যে আকাঙ্খা উদ্দেশ্য ও প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয় তাহা একমাত্র থিয়েরীপ্রণীত "নরমান কর্তৃক ইংলণ্ডবিজয়ের ইতিহাস" নামক গ্রন্থেই হোমারসুলভ সজীবতার সহিত উপলব্ধ ও চিত্রিত হইয়াছে। বর্ব্বরপ্রকৃতি ও বর্ব্বরজীবনের এমন সুস্পষ্ট চিত্র আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমেরিকার অসভ্য জাতিদের লইয়া কুপার যে সব উপন্যাস লিখিয়াছেন তাহাদের মধ্যেও কতকটা এই ধরণের জিনিষ পাওয়া যায়, কিন্তু আমার বোধ হয়, সেগুলি থিয়েরীর গ্রন্থের মত এত উৎকৃষ্ট নয়, এত সত্য নয়, এত সরল নয়। আমেরিকার অরণ্যচারী অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে, তাহাদের লোক-

ব্যবহার ও ভাবসমষ্টির মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা কতক পরিমাণে প্রাচীন জার্ম্মানদিগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অবশ্য এই সকল চিত্র কতক পরিমাণে কবিকল্পনাসুলভ আদর্শ চিত্র মাত্র—বর্ব্বরদিগের আচার, সংস্কারের মধ্যে ও জীবনপ্রণালীর মধ্যে যে একটা পাশব ভাব আছে, তাহা সম্পূর্ণ যথার্থরূপে চিত্রিত হয় নাই। এই সকল আচরণপদ্ধতির ফলে সমাজের মধ্যে যে সকল দোষ সংক্রামিত হইয়াছিল আমি কেবল তাহার কথা বলিতেছি না—স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক বর্ব্বর ব্যক্তির আন্তরিক অবস্থাও আমার মন্তব্যের বিষয় নহে। তাহাদের এই যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য প্রবল আকাঙ্খা, ইহার মধ্যে যতটা স্থূল পাশবভাব আছে, যতটা হৃদয়হীনতা আছে, তাহা থিয়েরীর গ্রন্থ পাঠে ততটা ধারণা করা যায় না। তথাপি যদি আমরা বিষয়টা তলাইয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিব এই পাশবতা, এই দেহসর্ব্বস্বতা, এই স্থূলবুদ্ধি স্বার্থপরতার মিশ্রণসত্বেও, স্বাতন্ত্র্যানুরক্তি একটি মহৎ ভাব। মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি হইতে এই ভাবের উদ্ভব। ইহা দ্বারা মানুষ নিজকে মানুষ বলিয়া উপলব্ধি করে; মানুষের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয়, মানুষ নিজের স্বাধীন বিকাশে স্বচ্ছন্দ স্ফূর্ত্তি লাভ করে।

জার্ম্মাণ বর্ব্বরদিগের দ্বারাই এই ভাব ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইল। রোমীয় জগতে ইহা অজ্ঞাত ছিল, খৃষ্টীয় চর্চ্চে ইহা অজ্ঞাত ছিল, প্রায় সমস্ত প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে ইহার অস্তিত্ব ছিল না। প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে যেখানেই স্বাধীনতার অস্তিত্ব দেখিবেন, সেখানেই ইহা রাজনৈতিক স্বাধীনতা, পৌরতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ পৌরজনের স্বায়ত্তাধিকার। মানুষ তখন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের জন্য যুঝিত না, যুঝিত পৌর অধিকারলাভের জন্য। সে তখন একটা জনসংঘের অঙ্গস্বরূপ ছিল, জনসংঘের কল্যাণার্থে নিজের ব্যক্তিগত অধিকার, ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত। খৃষ্টীয় চর্চ্চেও সেই এক ব্যাপার। খৃষ্টীয় সংঘের প্রতি একটা প্রবল অনুরাগ, সংঘের বিধানের প্রতি অচলা ভক্তি, সংঘের আধিপত্য বিস্তারের জন্য একটা তীব্রবাসনা, এই হইল খৃষ্টীয়চর্চ্চভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির মূল আন্তরিক ভাব। অথবা এও বলা যায় যে মানুষের আত্মার উপর ধর্ম্মভাবের প্রবল প্রতিক্রিয়ার ফলে, মানুষের মধ্যে একটা আত্মদানের ভাব, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া ধর্ম্মের বিধান শিরোধার্য্য করিবার ভাব জাগিয়া উঠিল। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভাব, সমস্ত বাধাবিপদ অবহেলা করিয়া কেবল আত্মতৃপ্তির জন্য স্বাধীনতা চর্চ্চার ভাব রোমীয় জগতেও ছিল না, খৃষ্টীয় সমাজেও ছিল না। বর্ব্বরেরাই এই ভাবের বীজ আনিয়া আধুনিক সভ্যতার শৈশব ক্ষেত্রে বপন করিল। ইউরোপীয় সভ্যতার পরবর্ত্তী ইতিহাসে এই ভাবের লীলা এত বিরাট, এত সহজলক্ষ্য, এত মহাফলপ্রসূ যে ইহাকে ইউরোপীয় সভ্যতার অন্যতম মৌলিক উপাদান বলিয়া স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

আধুনিক সভ্যতা বর্ব্বরদিগের নিকট অন্য একটি দ্বিতীয় উপাদানের জন্য ঋণী। সেটি হইল আশ্রিত ও আশ্রয়দাতার মধ্যে সামরিক সহায়তার চুক্তি বন্ধন। এই উপায়ে সমাজের মধ্যে, বিশেষতঃ সমাজের যোদ্ধৃবৃন্দ মধ্যে এমন একটি সম্বন্ধ পরম্পরার সৃষ্টি হইল যাহার ফলে পরস্পরের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার (এবং প্রথম প্রথম একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত সামাজিক সাম্যেরও) কিছু মাত্র ব্যতিক্রম না ঘটিয়াও সমাজের মধ্যে একটা ক্রমবিভক্ত

শ্রেণীবিভাগের প্রতিষ্ঠা হইল; এবং ইহা হইতেই পরে "ফিউডালিজ্‌ম্"-আখ্যাপ্রাপ্ত অভিজাততন্ত্রের উদ্ভব হইল। মানুষের প্রতি মানুষের আসক্তি, বাহিরের কোনরূপ বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্ত্বেও, কোন প্রকার সাধারণ সামাজিক দায় বা কর্ত্তব্যের প্রেরণা অভাবসত্ত্বেও এক একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তির প্রতি এক একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তির যে নিষ্ঠা, প্রীতি, ভক্তি, তাহারই উপর এই সম্বন্ধপরম্পরার প্রতিষ্ঠা। প্রাচীন জনতন্ত্রে দেখিবেন কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির সহিত স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্রভাবে সম্পর্কিত নয়, সকলেই পৌররাষ্ট্রের সহিত সম্বদ্ধ; বর্ব্বরদিগের মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেই সামাজিক বন্ধন স্থাপিত হইত। প্রথমে, যখন তাহারা দলে দলে ইউরোপের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত, তখন দলপতির সহিত তাঁহার অনুচরবর্গের সম্বন্ধের ভিতর দিয়া এই ব্যক্তিগত বন্ধন স্থাপিত হইত। পরে এই বন্ধন আশ্রয়দাতা ভূম্যধিকারীর সহিত অধীন ও আশ্রিত প্রজা বা ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীর সম্বন্ধ আকারে পরিণত হইল। সুতরাং মানুষে মানুষে স্বাধীন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠাস্বরূপ এই যে দ্বিতীয় মূলনীতি, ইহা বর্ব্বর দিগের নিকট হইতেই পাওয়া গেল।

এখন একবার জিজ্ঞাসা করি, যখন আমি আরম্ভেই বলিয়াছিলাম যে বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা শৈশবাবস্থা হইতেই একটা বিচিত্র বিক্ষুব্ধ ও জটিল ব্যাপার, তখন কি সেটা ভুল বলিয়াছিলাম? ইহা কি সত্য নয় যে ইউরোপীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশে যে যে উপাদান, যে যে শক্তি একত্র হইয়াছে, তাহা প্রায় সমস্তই রোমীয় সাম্রাজ্যের পতনকালেই একত্র দেখা দিয়াছে? আমরা সেই যুগে তিনটি বিভিন্ন প্রকৃতির সমাজ দেখিতে পাইলাম (১) রোমীয় সমাজের শেষ চিহ্ন স্বরূপ পৌরসমাজ; (২) খৃষ্টীয় সমাজ; ও (৩) বর্ব্বর সমাজ। এই তিন বিভিন্ন সমাজের গঠন প্রণালী বিভিন্ন, মূলনীতি বিভিন্ন, এবং অন্তঃস্যূত ভাব ও আদর্শ বিভিন্ন। একদিকে নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতার জন্য অত্যুগ্র আকাঙ্খা, অন্যদিকে সম্পূর্ণতম বশ্যতাস্বীকার; একদিকে সামরিক প্রধানবর্গের আধিপত্য, অন্যদিকে যাজকবর্গের আধিপত্য; সর্ব্বত্রই পার্থিব ও অপার্থিব শাসন শক্তির একত্র সংস্থান। চর্চ্চের বিধিবিধান, রোমীয় তন্ত্রের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যবহারবিধি, বর্ব্বরদিগের অলিখিত রীতিপদ্ধতি—সমস্তই পাশাপাশি রহিয়াছে। সর্ব্বত্রই নানা বিভিন্ন জাতি, ভাষা, সমাজ, রীতিনীতি, ভাব ও সংস্কারের সংমিশ্রণ বা একত্র সংস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ইহাতেই যথেষ্টরূপ প্রমাণিত হইতেছে যে আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার সাধারণ প্রকৃতি যে ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহা ভুল হয় নাই।

অবশ্য ইহা নিশ্চয় যে এই বৈচিত্র্য ও বিরোধের দরুণ ইউরোপকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই কারণে ইউরোপের উন্নতি হইতে এত বিলম্ব ঘটিয়াছে। এই কারণেই ইউরোপকে এত ঝটিকা দুর্য্যোগ সহিতে হইয়াছে। তথাপি ইহাতে আক্ষেপের বিষয় কিছুই নাই। ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ, জাতির পক্ষেও সেইরূপ, বিচিত্রতম সম্পূর্ণতম বিকাশের মূল্যস্বরূপ যে কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, সমস্তই সহনীয়। মোটের উপর ইউরোপীয় সমাজের এই জটিলতা, এই সংক্ষোভ ও সংঘাতই, অন্যান্যদেশসুলভ সহজ শান্ত সরলতা অপেক্ষা, মানব জাতিকে উন্নতির পক্ষে অধিকতর অগ্রসর করিয়া দিয়াছে।

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

---

* শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম, এ মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

অজন্তা

অজন্তা যাইবার দুই পথ আছে। জি, আই, পি রেলওয়ের মেন লাইনে জলগাঁও বলিয়া একটি বড় জংসন ষ্টেসন আছে। এইস্থান হইতে Tapti Valley Railway বাহির হইয়া আমালনির ও বারদৌলি দিয়া সুরাটে গিয়াছে। এই জলগাঁও ষ্টেসন নামিয়া মোটরে বরাবর অজন্তা যাওয়া যায়, জলগাঁও হইতে অজন্তা প্রায় ৪০ মাইল দূরে, একটি মোটর ভাড়া করিয়া যাইতে অনেক খরচ পড়ে। সেইজন্য অনেকে এ রাস্তা দিয়া যায় না, তাহারা যায় পাচোরা জংসনে নামিয়া। পাচোরাও জি, আই, পি রেলওয়ের মেন লাইনে একটি জংসন ষ্টেসন। এখান হইতে একটি ছোট রেলওয়ে বাহির হইয়াছে তাহার নাম পাঁচোরা জামনের রেলওয়ে, ইহা পাচোরা হইতে জামনের গিয়াছে। এই লাইনে পাস্তর বলিয়া একটী ছোট ষ্টেসন আছে। এখান হইতে অজন্তা প্রায় ১০ মাইল; সুন্দর পাকা রাস্তা আছে; হাঁটিয়াও যাওয়া যায়, গরুর গাড়ীতেও যাওয়া যায়। গরুর গাড়ীতে মাত্র তিন চারি টাকা খরচ লাগে। কয়েক মাইল যাওয়ার পরই একটী ছোট নদী পাওয়া যায়—ইহা নিজাম রাজ্যের ঠিকানা; এখান হইতে নিজাম রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে।

আমরা ছিলাম ডাকবাংলোতে; যাহারা অজন্তা দেখিতে যায়, তাহারা সকলেই এই ডাকবাংলোতে থাকে। এখান হইতে অজন্তাগুহা তিন মাইলের কিছু উপর; কিন্তু গুহার নিকটে কোন গ্রাম না থাকায় এত দূরেই ডাকবাংলো করিতে হইয়াছে। ডাকবাংলোতে কেবলমাত্র থাকিবার স্থান পাওয়া যায়, রাঁধিবার জন্য যাহা যাহা দরকার, তাহা গ্রামের বাজার হইতে খরিদ করিতে হয়। এই গ্রামের নাম ফরদাপুর। আহারের অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ-পত্র প্রায় সমস্তই এখানে পাওয়া যায়।

এই ডাকবাংলো ছাড়া এখানে নিজাম বাহাদুরের একটী Guest House আছে। হায়দ্রাবাদ হইতে যেসব বড় বড় অফিসার এখানে আসেন, তাঁহারা এই Guest হাউসেই উঠেন; আর যেমন বুঝিলাম, কোথা হইতে কোন শুভ্রচর্ম্মাবৃত ব্যক্তি আসিলে তিনিও এই অতিথিগৃহেই পদার্পণ করেন, ছোট বাংলোতে সে রকম লোকের পদধূলি প্রায় পড়ে না—বড় বাংলোতেই তিনি বিরাজ করিতে পারেন; কারণ হায়দ্রাবাদ রাজ্যে, বিশেষতঃ রাজ্যের সুদূর পল্লীগুলিতে নিজাম বাহাদুরের "আতিথ্য" পাওয়া প্রায় প্রত্যেক শ্বেতাঙ্গের একটি birth right বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, সেইজন্য তাঁহারা নিজাম বাহাদুরের এই অতিথিশালাতেই শুভাগমন করিতে পারেন। অতএব ক্ষুদ্র ডাকবাংলোটী বিশেষভাবে কৃষ্ণবর্ণ ও পীতবর্ণের লীলাস্থল। পীতবর্ণ বলিলাম, কারণ বম্বে হইতে অনেক চীন ও জাপানবাসী অজন্তার এই বৌদ্ধ গুহাগুলি দেখিবার জন্য প্রত্যেক বৎসরই এখানে আসে। তাহারাও এই ডাকবাংলোতেই উঠে।

ডাকবাংলোতে একদিন মাত্র থাকিবার অনুমতি আছে। কিন্তু আমরা তিন দিন থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিলাম অজন্তাগুহার Curator মহোদয়ের নিকট হইতে। তাঁহার

নাম শ্রীযুক্ত সৈয়দ আহাম্মদ ; ডাকবাংলোর নিকটেই তাঁহার অফিস, তাঁহার নিকট অজন্তাগুহা সম্বন্ধীয় অনেক পুস্তক ও চিত্রাদি আছে। টাকা জমা রাখিলে সে পুস্তকগুলি তাঁহার নিকট হইতে লইতে পারা যায়, যাইবার সময় পুস্তকগুলি ফেরত দিলেই টাকা ফেরত দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত আহম্মদ মহাশয়ের সহৃদয়তায় আমরা পুস্তকগুলি বিনামূল্যেই পড়িতে পাইয়াছিলাম। তিনি আমাদের অনেক উপকার করিয়াছিলেন, গুহার চিত্রগুলি ভাল করিয়া দেখিবার জন্য তিনি আমাদিগকে তাঁহার গ্যাসবাতি ব্যবহার করিবারও অনুমতি দিয়াছিলেন। গুহার মধ্যে এই বাতি ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বাতি, হারিকেন বা মোমবাতি ব্যবহার করিবার অনুমতি নাই।

ডাকবাংলো হইতে তিন মাইল দূরে অজন্তাগুহা গুহাতে যাইবার রাস্তাটী ঘুরিয়া বেঁকিয়া পাহাড়ের গা ঘেসিয়া গন্তব্যস্থান অভিমুখে চলিয়াছে। রাস্তা পাকা—মোটরগাড়ী বেশ যাইতে পারে ; গরুর গাড়ীর ত কথাই নাই। এখানে অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসে অর্থাৎ শীতকালেই লোক আসে ; এবং তখনই আসা উচিত, নতুবা কিছু কষ্ট ভোগ করিবার সম্ভাবনা আছে। বর্ষাকালে পাহাড়ী নদীগুলিতে খুব স্রোত থাকে, তখন নদী পার হওয়া কষ্টকর ; কারণ এই ছোট ছোট নদীগুলির উপর কোন পুল সেতু বা সাঁকো নাই, বর্ষা শেষ হইলেই নদীও শুকাইয়া যায় ; তখন মোটরও অনায়াসে যাইতে পারে। আবার গ্রীষ্মকালে এখানে অত্যন্ত গরম, তখন এখানে কিছুতেই আসা উচিত নহে মোটের উপর শীত কালই এখানে আসিবার উপযুক্ত সময়। তবে বর্ষাকালে, পাহাড়ে, মেঘের ও বৃষ্টির, নদীর ও ঝরণার যে মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয় শীতকালে তাহা পাওয়া যায় না, তখন নদীও মরিয়া যায়, ঝরণাও শুকাইয়া যায়। তবে মানুষ সব সুবিধাই পাইতে পারে না, এক সুবিধা পাইলে হয়ত দ্বিতীয় সুবিধা জুটে না।

ধন্য সেই বৌদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার যিনি গুহার জন্য এই পাহাড়টা নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। পাহাড়টী খাড়া আকাশের দিকে উঠিয়াছে, তাহার তলদেশ দিয়া একটা ছোট নদী বহিয়া যাইতেছে ; নদীর অপরদিকে আবার তেমনই একটী খাড়া পাহাড় সম্মুখ হইতে গুহাগুলিকে যেন যত্ন করিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এই দুইটী পাহাড় যাইয়া মিলিয়াছে এক কোণায়, সে স্থানটী খুব উচ্চ। বর্ষাকালে সেখান হইতে জল ঝরণার ন্যায় অনবরত নীচে নদীতে আসিয়া পড়িতেছে ; এই জল লইয়াই এই ছোট নদীটীর উৎপত্তি ; নদীটী দুইটী পাহাড়ের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া বাহিয়া চলিয়াছে। এই নদীটীই গুহাতে পঁহুছিবার একমাত্র পথ। পিছন হইতে আসা যায় না, সম্মুখ হইতেও আসা যায় না ; আবার একদিক পাহাড়ে বন্ধ ; এই ছোট নদীটী দিয়াই এখানে আসিতে হয়, আর দ্বিতীয় কোন পথ নাই। সেইজন্যই বলিতেছিলাম বর্ষাকালে এখানে আসা কষ্টকর—কারণ তখন এই পাহাড়ী নদীতে খুব স্রোত থাকে ; নদীর মধ্য দিয়া আসিতে কষ্ট হয়, তাহাতে বিপদও আছে।

এই প্রকার দুর্গমস্থানে গুহাগুলি প্রায় এক হাজার বৎসর লুকান ছিল, লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে থাকিয়া এই বিশ্ববিখ্যাত গুহাগুলি ধীরে ধীরে বিস্মৃতির করাল কবলে অন্তর্হিত হইতেছিল। পরিব্রাজকাচার্য্য হুয়েন সাং ভারতে আসিয়া অনেকস্থানেই দেখিয়া

ছিলেন এবং তাহাদের বিবরণও দিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু কি জানি কি কারণে তখন তিনি অজন্তায় আসিতে পারেন নাই—সেইজন্য তাহার কোন বিবরণও লিখিয়া যান নাই। তবে তিনি তখন লোকমুখে নিশ্চয়ই অজন্তার কথা শুনিয়াছিলেন; তাই তিনি ইহার কথা উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে ইহা এক প্রসিদ্ধ স্থান ; অনেক ভিক্ষু এখানে বাস করেন এবং অনেক ছাত্র এখানে অধ্যয়ন করিতে আসে। তাহার পর কত বৎসর অতিবাহিত হইল, পাঠান গেল, মোগল গেল, অজন্তাও ধীরে ধীরে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গেল। কেহই ইহার কথা কিছু জানিত না, একমাত্র হুয়েন সাংএর ভ্রমণ বৃত্তান্তেই ইহার একটু উল্লেখ ছিল ; ক্রমে ক্রমে ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অনেকের নানারূপ সন্দেহ হইতে লাগিল। কিন্তু ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ এই হারাধনের খোঁজ পাওয়া গেল। এক ইংরেজ শীকারী কর্ত্তৃক দৈবক্রমে ইহা আবিস্কৃত হইল। তিনি ছিলেন খান্দেশের মাজিষ্ট্রেট, তিনি একবার এই অঞ্চলে শীকার করিতে আসিয়াছিলেন ; শীকার করিতে করিতে পথ হারাইয়া তিনি বড়ই বিপদে পড়েন। পার্ব্বত্য প্রদেশ, জঙ্গলে ও হিংস্রজন্তুতে পরিপূর্ণ, রাস্তাঘাট কিছুই নাই—তিনি দলভ্রষ্ট হইয়া একাকী পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিতে লাগিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে নদীর পথ দিয়া তিনি যেখানে আসিলেন সেখান হইতে আজ আমরাও এই অদ্ভুত গুহাগুলি দেখিতে পারি। অধিকাংশ গুহাই তখন গাছপালা ও শৈবালে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল, কেবলমাত্র দুই একটী গুহার প্রবেশদ্বার তিনি আবিষ্কার করিতে পারিলেন। খান্দেশে ফিরিয়া যাইয়াই তিনি বম্বে গভর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার এক আবিস্কার সম্বন্ধে চিঠিপত্র লিখিতে লাগিলেন। বম্বে সরকার নিজাম সরকারকে জানাইলেন ; তখন নিজাম বাহাদুর এই মাজিষ্ট্রেট মহোদয়কেই এই গুহাগুলির উদ্ধারকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। গুহাগুলির উদ্ধারের জন্য নিজাম সরকারকে অনেক টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে—কিন্তু তাহা না করিয়া কোন উপায় ছিল না ; ব্রিটিশ সরকার আভাষে বেশ স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিয়াছিল যে নিজাম সরকার গুহাগুলিকে ভালভাবে রক্ষা না করিলে ব্রিটিশ সরকারকে তাহা করিতে হইবে ; অর্থাৎ স্থানটী ব্রিটিশের অধীনে আসিবে। গুহাগুলির অধিকারী হওয়া এক মহান গৌরবের বিষয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ; নিজাম বাহাদুর তাহা বুঝিয়াছিলেন। গুহাগুলির সংস্কারের জন্য নানা বন্দোবস্ত করা হইয়াছে ; এবং যে সকল শিল্পী ইহাদের সংস্কারের জন্য বা চিত্রের নকল লইবার জন্য আসিয়াছিলেন, নিজাম সরকার হইতে তাহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করা হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দুভূষণ মজুমদার।

যে আঁধারে কৃষ্ণা রাত্রি আমায় ঢেকে দিলে,
তারি বিরাট গহ্বর-তলে দাঁড়িয়ে করি গান—
ধন্য তুমি!—কোন্ দেবতা আমায় দিয়েছিলে
অজেয় এই প্রাণ!

গ্রহ যখন নির্দয় হ'য়ে বুকে বসায় জাঁতা,
হইনে অধীর, কাঁদিনে ত' কাতর করুণ স্বরে,
অদৃষ্টেরি লাঠির ঘায়ে নোয়াইনে ত' মাথা—
রক্ত যখন ঝরে!

হেথাকার এই অশ্রুজল আর অভিশাপের শেষে
জাগে আবার অজানা সেই অন্ধকারের ত্রাস।—
মহাকালের চোখরাঙ্গানি উড়াই তবু হেসে,
নই যে ভয়ের দাস।

জীবন জাঙ্গাল পদে পদে হোক্ না সে দুর্গম,
এই ললাটে থাক্ না লেখা যতই ভীষণ সাজা—
ভাগ্য তবু আমার অধীন, আমি যে দুর্দ্দম!
আমিই আমার রাজা। *

শ্রীমোহিত লাল মজুমদার

ভাষা সমস্যা

বাইবেলে বর্ণিত টাওয়ার অব্ বেবেল (Tower of Babel) গল্পে পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তির যে কারণ লিখিত আছে, তাহার মধ্যে কোন সত্য নিহিত আছে কিনা, তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। তবে বোধ হয় ভাষাবিভিন্নতার ফলে মানব জাতিকে যে প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা স্মরণ করিয়াই বাইবেল রচয়িতা এই গল্পে বলিয়াছেন যে ইহার মূলে রহিয়াছে দৈব অভিশাপ। ডাক্তার মারে বলেন, অতি প্রাচীনকালে সমগ্র জগতে মাত্র একটী ভাষাই প্রচলিত ছিল। কালক্রমে সেই ভাষা হইতে বহুভাষা জন্মলাভ করিয়াছে। আদিম যুগের প্রবণতা ছিল ভাষাবৃদ্ধির দিকে। যে কারণেই হউক, বহুভাষা উৎপন্ন হইয়া মানুষের ভাবের আদান প্রদানের যথেষ্ট ব্যাঘাত সাধন করিয়াছে। বর্ত্তমান সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। বিভিন্ন দেশের উপর একটী

* ইংরাজী হইতে।

রাষ্ট্রের আধিপত্য বিস্তার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার এবং কয়েকটী উৎকৃষ্ট ভাষার অত্যধিক প্রচলনের ফলে অনেক ভাষা লোপ পাইতেছে। বর্ত্তমান সভ্য জগতে ভাষা বিজ্ঞানের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য সমগ্র মানবজাতির জন্য একটী ভাষা সংগঠন। অতি দূর ভবিষ্যতে ইহা যে হইবে না, তাহা বলা যায় না।

এটুকু ঠিক যে এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যে পরিণত করা খুবই কঠিন। আধুনিক মানব সমাজে এত ভাষা বর্ত্তমানে যে তাহাদের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা একপ্রকার অসম্ভব। ডাক্তার স্যেম্ জগতের ভাষাগুলিকে ৭৬টী ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার এক একটী বিভাগে এত ভাষা যে তাহাদের একত্র করিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। একটী বিভাগের উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম। আর্য্যভাষা বিভাগ :—(ক) ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহ, (খ) ইরাণীয়ান ভাষাসমূহ, (গ) কেল্‌টিক ভাষাসমূহ, (ঘ) ইটালিয়ান ভাষাসমূহ (ঙ) থ্র্যাকিয়ান্ ও আলবানিয়ান ভাষা, (চ) গ্রীক ভাষাসমূহ, (ছ) লেটোশ্লাভনিক ভাষাসমূহ, (জ) টিউটনিক ভাষাসমূহ। ইহার এক একটী উপবিভাগের মধ্যেও আবার বহুসংখ্যক ভাষা বিদ্যমান।

ভাষাবিভিন্নতা দেশের জাতীয় ঐক্যসাধনের একটী বিশেষ অন্তরায়। অধিকাংশ স্বাধীন দেশেই দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রত্যেক রাষ্ট্রে একটী প্রধান প্রচলিত ভাষা আছে। তবে একটী দেশে অনেক গুলি ভাষার প্রচলন দেখিতে হইলে ভারতবর্ষই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ১৫০ টী ভাষা কথিত হয়। প্রধান প্রধান কয়েকটী ভাষায় কত লোক কথোপকথন করে তাহার তালিকা দিতেছি :—

হিন্দী	৮ কোটী	২০ লক্ষ	
বাংলা	৪ ,,	৮৩ ,,	৭০ হাজার
তেলেগু	২ ,,	৩৫ ,,	৪০ ,,
মারাঠী	১ ,,	৯৮ ,,	১০ ,,
তামিল	১ ,,	৮১ ,,	৩০ ,,
পাঞ্জাবী	১ ,,	৫৮ ,,	৮০ ,,
রাজস্থানী	১ ,,	৪০ ,,	৭০ ,,
পশ্চিম হিন্দী	১ ,,	৪০ ,,	৪০ ,,
গুজরাটী	১ ,,	৩ ,,	৮০ ,,
ক্যানারিস্	১ ,,	৫ ,,	৩১ ,,
উড়িষ্যা	১ ,,	১ ,,	৬০ ,,
বার্ম্মীজ		৭৮ ,,	৯০ ,,
মালয়ালাম		৬৭ ,,	৯০ ,,
পশ্চিম পাঞ্জাবী		৪৭ ,,	৮০ ,,
সিন্ধি		৩৬ ,,	৭০ ,,
পূর্ব্ব হিন্দী		২৪ ,,	২০ ,,
সাঁওতালী		২১ ,,	৪০ ,,

পাশ্‌তো	১৫ ,,	৫০
আসামী	১৫ ,,	৩০
গন্দ	১৫ ,,	৩০
পশ্চিম পাহাড়ী	১৫ ,,	৩০
কাশ্মিরী	১১ ,,	৮০
কারেন	১০ ,,	৭০
শান্‌	৯ ,,	
ওরাওন্‌	৮ ,,	
মুন্দারী	৬ ,,	
টুলু	৫ ,,	৬০
খন্দ	৫ ,,	৩০
বালোক্‌	৫ ,,	
হো	৪ ,,	২০
বিহারী	৪ ,,	২০
আরাকাণী	৩ ..	৯০
মণিপুরী	৩ ,,	১০ ,,
ইংরাজী	৩ ,,	৩ ,,

এখানে ইংরাজী সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। ইংরাজী যাহাদের মাতৃ-ভাষা কেবল তাহাদেরই সংখ্যা লিখিত হইয়াছে। ইংরাজীজানা লোকের সংখ্যা ধরিলে আরও অনেক বেশী হইবে। শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেই ইংরাজীতে কথোপকথন করিতে পারেন। মাদ্রাজে সামান্ত কুলী মজুরেরাও ইংরাজী ভাষায় বাক্যালাপ করিতে পারে। ইহাদের সংখ্যাও খুব কম নহে।

বর্ত্তমান রাজনৈতিক জাগরণের দিনে এই ভাষাসমস্যা ভারতবাসীর মন বিচলিত করিয়াছে। দেশের নেতৃবৃন্দ বলিতেছেন যে সমগ্র ভারতে বিভিন্ন প্রদেশবাসীগণের জন্য একটী বিশেষ ভাষা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। অনেকের মতে হিন্দী এই কার্য্যের জন্ম সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত। কিন্তু যে ভাষাকেই এই সম্মানীয় স্থান প্রদান করা হউক, প্রত্যেক ভারতবাসীকেই নিজের প্রাদেশিক ভাষা সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িকত্ব পরিত্যাগ করিতে হইবে। যদি কোন ভাষাবিশেষকে এই উচ্চ সম্মানে ভূষিত করিলে অন্য ভাষাবলম্বীগণ তাঁহাদের নিজ নিজ ভাষার দাবী উত্থাপন করেন, তবে তাহা দেশপ্রেমিকতার পরিবর্ত্তে মনের সঙ্কীর্ণতারই পরিচায়ক হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ক্ষুদ্র ভাষাসমূহের বিলোপ সভ্যতাবিস্তারের একটী প্রধান অঙ্গ। যিনি যে ভাষায় কথোপকথন করেন, তিনি যদি তাহার ত্রুটী সত্বেও তাহাকে জীবিত রাখিবার জন্ম চেষ্টা করেন, তবে বিলোপের স্রোত বাধাপ্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে ক্ষুদ্র ব্রিটীশ দ্বীপপুঞ্জে অনেকগুলি ভাষা প্রচলিত ছি.। আয়ারল্যাণ্ডের অধিবাসীরা আইরিস্‌ ভাষা

ব্যবহার করিত। স্কট্‌ল্যাণ্ডে কথোপকথনের ভাষা ছিল গোলিক। ওয়েল্‌সে ওয়েলশ ভাষা প্রচলিত ছিল এবং ম্যান দ্বীপে একটী নূতন ভাষা উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে আয়ারলণ্ডে শতকরা মাত্র ১৪ জন আইরিস ভাষা ব্যবহার করে। ডি ভ্যালেরা ও তাঁহার সহকর্ম্মী সিন্‌ফিনগণ কিছুদিন উক্ত ভাষা পুনঃ প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফ্রিষ্টেট্‌ স্থাপনে তাহার সাফল্যের আশা নির্ম্মূল হইয়াছে। ১৭০৭ সালে ইংলণ্ড ও স্কট্‌ল্যাণ্ডের সম্মিলনের পর হইতে স্কট্‌ল্যাণ্ড গ্রেট্‌ব্রিটেনের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছে। এখন উক্ত দেশে শতকরা মাত্র ৫ জন গোলিক ভাষায় বাক্যালাপ করেন। ওয়েল্‌স্‌ ও ইংলণ্ডের মধ্যে যথেষ্ট জাতিগত প্রভেদ; উভয়ের পূর্ব্বপুরুষ পর্য্যন্ত এক নহে। যদিও ওয়েলসে এখনও শতকরা ৪৪ জন দেশীয় ভাষায় কথোপকথন করেন, তথাপি সে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই ইংরাজি বলিতে পারেন। ম্যান দ্বীপ হইতে দেশীয় (Manx) ভাষা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। এইরূপ একটা ক্ষমতাশালী ভাষার সম্মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষায় অবনতি ও ক্রমে বিলুপ্তির উদাহরণ প্রায় সমস্ত সভ্যদেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। এ যেন ঠিক ইতিহাসের বলশালী রাজার রাজ্য বিস্তার!

ভারতবর্ষে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষার বিলোপ বিশেষ বাঞ্ছনীয় বলিয়াই মনে হয়। ইহা যে একেবারে না হইতেছে তাহাও নয়। বিভিন্ন প্রদেশে উপভাষাগুলি ক্রমেই লোপ পাইতেছে। বাংলা ভাষার অনেক উপভাষা বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে কথিত হয়। কিন্তু ক্রমে কলিকাতার ভাষাই Standard dialect হইয়া সর্ব্বত্র প্রচলিত হইতেছে।

কিন্তু এইরূপে বহু উপভাষার বিলোপ হইলেও অনেকগুলি প্রাদেশিক ভাষা জীবিত থাকিবে। যে ভাষার সাহিত্য নাই, তাহার ধ্বংস অসম্ভব নহে। কিন্তু যে ভাষাতে উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হইয়াছে, তাহা সহজে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে না। সেই জন্যই ভারতবর্ষে বাংলাভাষার জীবন দীর্ঘস্থায়ী হইবে বলিয়া মনে হয়। তাহার পরেই বোধ হয় হিন্দি ভাষার স্থান। সংখ্যা হিসাবেও হিন্দির স্থান বাংলার অনেক উচ্চে। ডাক্তার গ্রিয়ারসন বলেন "Literary Hindusthani as distinct from vernacular Hindusthani is current in various forms as the language of polite society and as a lingua franca over the whole of India proper. It is also a language of literature, both poetical and prose ভারতবর্ষের ভাষাগুলির মধ্যে যদি কোনও একটীকে রাষ্ট্রীয় ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তবে হিন্দি ও বাংলা ভাষার দাবী সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য।

এখানে আরও একটী বিষয় ভাবিয়া দেখা উচিত। যেমন একটী দেশের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিদিগের মধ্যে কথোপকথনের জন্য একটী রাষ্ট্রীয় ভাষা national language) আবশ্যক, তেমনি বিভিন্ন দেশের অধিবাসিদিগের মধ্যে বাক্যালাপের জন্য একটী আন্তর্জাতিক ভাষাও (international language) অতীব প্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষীয় কোনও ভাষাকে আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা স্বরূপ গ্রহণ করিলে প্রত্যেক ভারতবাসীকে তিনটী ভাষা শিখিতে হইবে—(১) মাতৃভাষা, (২) রাষ্ট্রীয় ভাষা ও (৩) আন্তর্জাতিক ভাষা।

আমরা এখন 'থিওরি' লইয়া আলোচনা করিতেছি। বর্ত্তমানে জগতে কোন আন্তর্জাতিক ভাষা নাই; অদূর ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ। কোন্ ভাষাকে এই মহামান্য স্থান দেওয়া হইবে সে বিষয়ে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ একমত নহেন। অধ্যাপক অটো জেস্‌পারসন বলেন That international language is best which is easiest for the greatest number of men," ডাক্তার সুইটের মতে, প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্য হইতে সুবিধামত একটী ভাষা নির্ব্বাচন করিয়া লইলেই ভাল হয়। কিন্তু অনেকে মনে করেন স্বভাবজ (natural) ভাষা দ্বারা এ কার্য্য সম্ভব হইবে না সেইজন্য ১৮৮০ অব্দে ভলাপুক্ (Volapuk) ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু তাহা বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। তারপর ১৮৮৭ অব্দে রাসিয়ার ডাক্তার জামেনহফ্ এস্‌পারেন্টো (Esperanto) ভাষা প্রবর্ত্তন করেন। ১৯০২ অব্দে এই ভাষা ইংলণ্ডে প্রণীত হয় ও ১৯০৭ অব্দে ইহার বিশেষ প্রচলন হয়। একজন ভাষা তত্ত্ববিদ্ বলেন যে Esperanto "is the most reasonable and practicable artificial language that has yet appeared." এই ভাষার প্রসারের জন্য এখনও বহুস্থানে Esperanto society আছে। ১৯০২অব্দে ইডিয়ম্ নিউট্রাল (Idiom neutral) নামে আর একটী আন্তর্জাতিক ভাষা গঠিত হয়। ডাক্তার সুইট বলেন "There can be no doubt Idiom Neutral is the simplest language that has yet been devised and most easily understood by any educated European."

ইউরোপীয়গণ এখনও কোন আন্তর্জাতিক ভাষা গ্রহণ করেন নাই। উপরোক্ত তিনটী ভাষার মধ্যে কোন একটীরও গৃহীত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। বর্ত্তমানে প্রচলিত ভাষা গুলির মধ্যে ইংরাজীই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসার লাভ করিয়াছে। বাণিজ্য উপলক্ষে ইংরাজী ভাষা অনেক স্থানে ব্যবহৃত হয়। তথা কথিত "পিজিয়ন্' (pigeon) ইংরাজী—যাহাতে লোকে ব্যাকরণ শুদ্ধির দিকে দৃষ্টি প্রদান করে না—নানাস্থানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চীন ও জাপানেও ইংরাজী যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই ইংরাজীতে ভাবের আদান প্রদান করিতে পারেন। সুতরাং মনে হয়, ইংরাজীকে আন্তর্জাতিক ভাষার মহিমান্বিত আসনে অধিষ্ঠিত করিলে বিশেষ অশোভন হয় না।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ভাষা এক অথবা বিভিন্ন হইবে সে বিষয়ে বিচার করিয়া বলা সুকঠিন। আমাদের মনে হয়, এ গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইলে পরস্পরের মধ্যে বাক্যালাপের সহজ উপায় উদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য। বিশ্বমৈত্রী সাধন করিতে হইলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভাববিনিময়ের জন্য দ্বার উদ্‌ঘাটন করা নিতান্ত আবশ্যক।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র রায়।

কবিতার স্বরূপ

কলাবিদ মাত্রেই স্রষ্টা। কবি কলাবিদ্; কাজেই কবিও স্রষ্টা। কবির সৃষ্টির ইতিহাস একটু বিভিন্নপ্রকারের। কবি একাধারেই স্রষ্টা এবং দ্রষ্টা। কবি দেখেন, সৃষ্টি করেন এবং নূতন বাণী শুনাইয়া যান। দেখা হিসাবে, সাধারণ মানুষ যা দেখেন কবিও তাই দেখেন; কিন্তু সাধারণ মানবের দর্শনশক্তি অপেক্ষা কবির দর্শনশক্তি একটু উন্নত, একটু তীক্ষ্ণ, একটু কল্পনা-প্রবণ। কবি ভাবুক। ভাবপ্রবণতার রঙিন্ কাঁচের ভিতর দিয়া কবি বাহ্যপ্রকৃতিকে দেখেন। কাযেই বাহ্য প্রকৃতি যেখানে সাধারণের কাছে বৈচিত্র্যহীন, শুভ্র ও দৈনন্দিন, কবির নিকট তাহা বৈচিত্র্যময়, রঙিন্ ও অভিনব। একটী সামান্য লালফুল, যা শত শত নরনারীর নয়নের অন্তরালে তাহার ক্ষুদ্র রক্তিম জীবনের মধুর কয়টী দিন নীরবে কাটাইয়া দেয়, কবির নিকট সে একটা নূতন জগতের ভাবময় সৌন্দর্য্যরাশির বার্ত্তা আনিয়া দেয়। কবির প্রাণবীণায় একটা আঘাতের রেশ বড় মধুর ভাবে বাজিতে থাকে যে আঘাত কবিকে বাহ্য প্রকৃতির ভিতর একটা নূতন রসের সন্ধান বলিয়া দেয়। এই ভাবপ্রবণতা ও কল্পনাপ্রিয়তা কবিকে সাধারণ মানুষের স্বরূপ হইতে ভিন্ন করিয়া দেয়।

কবির সৃষ্টি কবিতা। কবিতা কলাদেবীর কণ্ঠহারের একটী উজ্জ্বল রত্ন। কবিত্বকে কেন্দ্র করিয়াই জগতের সমস্ত চারুশিল্প বর্ত্তমান। চিত্রকর চিত্র লিখেন, কবিতাকে স্মরণ করিয়া। ভাস্কর মানসী প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন কবিত্বের প্রেরণা লইয়া। শিল্পী শিল্পসাধন করেন কবিতার দিকে চাহিয়া। চারু শিল্পের মধ্যে কবিত্ব না থাকিলে সৌন্দর্য্য থাকে না। সৌন্দর্য্য না থাকিলে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। সৌন্দর্য্য ও সত্যের মিশ্রণেই কলার উদ্ভব। সেইজন্য, কবিতা, চিত্রকলা এবং ভাস্কর্য্যের মধ্যে একটা বড় নিকট সম্বন্ধ বর্ত্তমান। "কবিতা ভাবময়ী চিত্রকলা; চিত্রকলা মূক কবিতা।" ইহা ফরাসী সাহিত্যিক ভল্‌টেয়ারের উক্তি। জার্ম্মাণ কবি ও সমালোচক লেসিং এই উক্তির সার্থকতা দেখাইয়া লাওকুয়ান্ প্রবন্ধে কবিতা চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যের সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন। বাস্তবিক এই তিনটী চারুশিল্প যেন কলাসরস্বতীর যমজ তনয়া। একই প্রেরণা, কেবল ব্যঞ্জনা ও অভিব্যক্তি ভিন্ন। সেইজন্য প্রায়ই দেখা যায়, যে সুন্দর চিত্র দর্শনে কবির কল্পনা জাগিয়া উঠিয়াছে। আবার কবির ভাবের নর্ত্তনের ভিতর চিত্রপাত দেখিয়া ভাবুক চিত্রকরের ও ভাস্করের তুলিকা ও যন্ত্র অনুপ্রাণিত হইতেছে; কলাবিদ্যার ইতিহাসে ইহা চিরন্তন কিন্তু অভিনব ব্যাপার।

কবিতার প্রাণ—ভাবপ্রবণতা ও কল্পনা। চিত্রের প্রাণ—ভাবপ্রবণতা ও কল্পনা, ভাস্কর্য্যের প্রাণ—ভাব প্রবণতা ও কল্পনা। শুধু তফাৎ এই, কবিতা সময় চায়, বলিবার জন্য। শ্রোতার কর্ণকে চায় শুনাইবার জন্য। চিত্র ও ভাস্কর্য্য স্থান চায় ফুটিয়া উঠিবার জন্য। দর্শকের চক্ষুকে চায় দেখাইবার জন্য।

ভাবপ্রবণতা, কল্পনা ও অনুভূতি না থাকিলে কবিতার প্রাণ থাকে না। জীবনীশক্তির প্রেরণার পরিবর্ত্তে থাকে মৃতদেহের হিম জড়তা। চিত্র ও কবিতার ব্যঞ্জনা ও অভিব্যক্তি

ভিন্ন। কবিতার অভিব্যক্তি ছন্দের ভিতর দিয়া, চিত্রের অভিব্যক্তি রেখার ভিতর দিয়া। ছন্দ ও রেখা কবিতার এবং চিত্রপটে রূপ এবং গতি দান করে। রেখার লীলা না থাকিলে চিত্রে গতি থাকে না। ছন্দের অবাধ স্ফুরণ না থাকিলে কবিতায় সচল গতি থাকেনা। কিন্তু অনেক সময় ছন্দ না থাকিলে কবির কল্পনা ও ভাবপ্রবণতার আধিক্যে কবিতার রূপের হানি হয় না বটে কিন্তু সচ্ছল গতি না থাকিলে কবিতার অবস্থা হয় "খঞ্জ-রূপসীর" মত। "চলিতে বাধে চরণে!"

ভাবপ্রবণতা ও কল্পনা কবিতার প্রাণ। ভাবপ্রবণতা চিন্তা নয়। চিন্তাশীল কবিতা ভাবপ্রবণ নাও হইতে পারে। ভাবপ্রবণতা কবির নিজস্ব সামগ্রী, দার্শনিকের নয়, বৈজ্ঞানিকেরও নয়। দার্শনিক ভাবপ্রবণ হইলে তাঁহার দর্শন লেখা হয় না, চক্ষু জলে ভরিয়া যায়। বৈজ্ঞানিকের শুষ্ক বক্ষেও ভাবপ্রবণতার স্থান নাই। ভাবপ্রবণতা কবিরই নিজস্ব। তাই দেখি কবির চক্ষু জলে ভরা। শুধু আর্ত্তের কাতরতা দর্শনে নয়; পথের ধারের অজানা ফুল যখন পথ-চলা পথিকের পায়ের নীচে দীর্ণ হয়, তখন সেই ফুলটীর জন্যও কবির প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। কবি ভাবপ্রবণ বলিয়াই কবিতা শ্রোতার প্রাণে বড় শীঘ্র আঘাত করে। একটী সামান্য কবিতা অতি শীঘ্র অনেক বড় কথা বুঝাইতে সক্ষম হয়। ইংরাজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই ভাবপ্রবণতাকে কবিতার মধ্যে অতি উচ্চ স্থান দিতেন। তাঁহার নিকট নির্জ্জনের চিন্তার পর ভাবপ্রবণতার অবাধ উচ্ছাসই কবিত্ব। শুধু ওয়ার্ডসওয়ার্থ নন, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের সমস্ত ইংরাজ কবিই ভাবপ্রবণ।

তারপর কল্পনা; কল্পনা না থাকিলে কবিতা উচ্চ আকাশের অনন্ত নীলিমায় অবাধ সঞ্চরণ করিতে পারে না। মাটীর ঘাসের উপরই পড়িয়া থাকে। ইংরাজ কবি শেলি কবিতার ভিতর কল্পনাকে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। কল্পনার চরম বিকাশই তাঁহার নিকট কবিত্ব। চিত্রে পরিকল্পনা না থাকিলে তাহাতে এমন সচল লীলা থাকেনা; কবিতায় কল্পনা না থাকিলে তাহাতে মোহিনী শক্তির অভাব বোধ হয়।

প্রথমেই বলিয়াছি, কবি স্রষ্টা এবং দ্রষ্টা। দ্রষ্টার কার্য্য পূরণ হয় এই কল্পনার ভিতর দিয়া। কবি শুধু সুন্দর চারু শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি তাঁহার ভিতর দিয়া এমন কিছু বলিয়া যান যা এখন নাই, ভবিষ্যতে হইবে। যার বাণী তিনিই প্রথম দান করেন। কীট্‌সের "হাইপীরিয়ন্", শেলির "প্রমিথিউস্ আন্‌বাউণ্ড" বা রবীন্দ্রনাথের "ফাল্গুনী" শুধু 'আর্টের' অমর নিদর্শন নয়, তাহার অদূর ভবিষ্যতের নূতন যুগের আগমনীরও ঘোষণা। কবির কল্পনা-ঝোরা অফুরন্ত। অফুরন্ত বলিয়াই কবিতার গতি অবাধ। কবিতা চলিতে চায় অবাধে। থামিতে চায় না। কবিতার ভিতর বেশী মাত্রায় চিন্তা বা উপদেশের স্পৃহা থাকিলে কল্পনার উদ্দাম চলাফেরা থাকে না। কাজেই কবিতার উদ্দেশ্য অনেকটা অসিদ্ধ থাকিয়া যায়।

কবিতার উদ্দেশ্য কি? কবিতা—আর্ট—কলা। সমস্ত কলাবিদ্যার যা উদ্দেশ্য কবিতারও তাহাই উদ্দেশ্য অর্থাৎ আনন্দদান। আনন্দদানের অর্থ ইহা নয় যে কবিতা শুধু হাস্যরসের সৃষ্টি করিবে। কবিতা প্রাণের এমন একটী গোপন তন্ত্রীতে আঘাত করিবে,

যেটা কোন দিন বাজে নাই, কেহ বাজায় নাই। সেই বাজনার মৃদু রেশই প্রাণের রুদ্ধ দুয়ার মুক্ত করিয়া পুলক উচ্ছ্বাস তুলিবে। ইহাই রসপ্রিয়ের আনন্দলাভ। সৌন্দর্য্যই সেই আনন্দ রস-প্রিয়ের মনে আনিয়া দেয়। কাজেই একরকম ভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে আর্টের বা কবিতার উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যের স্ফুরণ। যাহাতে সৌন্দর্য্য নাই তাহাতে আনন্দ পাওয়া যায় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চিন্তা

কহ মোরে, হে তারকা, প্রসারিয়া আলোকের রেখা
কোথায় চলেছ ভাসি সুনীল আকাশে অবিরাম,
গন্তব্যের সীমা তব আঁখিপথে দিতেছে কি দেখা,
শ্রান্ত পক্ষ সংপুটিয়া যথা তুমি লভিবে বিশ্রাম ?

কহ মোরে, শশধর, হেরিয়াছি সতত যাহারে
উদাসীন পান্থপ্রায় ছায়াপথে যেতে ভেসে ভেসে,
কোন্ দূর অজানিত গুহামাঝে, আলো বা আঁধারে
হে প্রিয়দর্শন যাত্রী, বিরাম লভিবে অবশেষে ?

কহ মোরে, প্রভঞ্জন, আকাশেতে সদা ভ্রাম্যমান,
দরিদ্র অভাগা যেন-নাহি গৃহ নাহিক আশ্রয়—
নাহি কি কোথাও তব শান্তিময় বিশ্রামের স্থান
গভীর অরণ্য কিম্বা সাগরের ফেনিল হৃদয় ?

কহ মোরে, হে তরঙ্গ, আসি রঙ্গে নাচি তালে তালে
গিরিগাত্রে আছাড়িয়া গর্জ্জিতেছ বিরাম-বিহীন,
নাহি কি কোথাও দূরে—চক্রবাল-রেখা-অন্তরালে
কূল কোন যথা তুমি ধীরে ধীরে হইবে বিলীন ?

আর তুমি, রে অশান্ত হৃদয় আমার, কহ মোরে,
তরঙ্গ, উন্মত্ত বায়ু, পরাজিত নিকটে যাহার,
নাহি কি কোথাও স্থান—ইহলোকে কিম্বা লোকান্তরে
যথা আছে তোর তরে—বিস্মৃতি ও শান্তির আগার ? *

শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ

* Auguste Lacaussade রচিত ফরাসী কবিতার কুমারী তরু দত্ত কৃত ইংরাজী অনুবাদ হইতে।

বা গ্রীশে এ বিষয়ের অনুসন্ধান হইয়াছিল বটে। কিন্তু তার সঙ্গে তুলনায় বিগত বিংশতি বৎসরে বংশানুক্রম বিষয়ে যে তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা প্রাচীন আল্‌কেমির তুলনায় বর্ত্তমান কেমিষ্ট্রীর স্থান প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। প্রাচীনকালেও গ্রীস্ ও ভারত উভয়ত্রই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির চর্চ্চা হইয়াছিল বলিয়া যেমন নিউটনের দাবী এক চুলও কমে না; প্রাচীনেরাও জানিতেন বা কল্পনানেত্রে দেখিয়াছিলেন যে উদ্ভিদেরও অনুভূতি আছে, তাহাতে জগদীশচন্দ্রের মহিমা এক তিলও খর্ব্ব হয় না। কেন না নিউটনের আবিষ্কার তাঁহার তিন নিয়ম, আর জগদীশচন্দ্রের কৃতিত্ব আমাদেরই কামারের নির্ম্মিত ক্রেস্কোগ্রাফ্ সাহায্যে উদ্ভিদের অনুভূতির পরীক্ষণ। কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কোনই সূক্ষ্ম অনুবীক্ষণ সাহায্যে প্রাচীনকালের মধ্যে এগুলির অস্তিত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবেন না। সুতরাং পুরাতন তত্ত্বও নূতনের সম্মান পাইবার যোগ্য। বংশানুক্রমতত্ত্বকে সেই দৃষ্টিতে দেখিয়াই অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য।

কেন বংশধর পূর্ব্ব পুরুষের সাদৃশ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে, এই তত্ত্ব নির্ণয় করিবার জন্য নানা মুনি নানামতের অবতারণা করিয়াছেন। সে সকলের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে জননপ্রক্রিয়ার আলোচনা প্রয়োজন। উচ্চজীব ও উদ্ভিদে পুরুষ-প্রকৃতির সমাবেশে নূতন জন্ম হইয়া থাকে। পুংবীর্য্য (sperm cell) ও স্ত্রীবীর্য্যের (Ovum or Egg) সমন্বয়ে নূতন জীবের উৎপত্তি। পুংবীর্য্যে লক্ষ লক্ষ জীবাণু (sperm) বর্ত্তমান। এই জীবাণু সকল ডিম্বের নিকটবর্ত্তী হইলে কোন অনির্দ্দিষ্ট জৈব নিয়মে উহাদ্বারা আকৃষ্ট হয় ও ডিম্বকে জড়াইয়া ধরে। যে মুহূর্ত্তে একটা জীবাণু ডিম্বের মধ্যে প্রবেশ করে, সেই মুহূর্ত্তে বিশ্বস্রষ্টার অপূর্ব্ব কৌশলে ডিম্ব গাত্র এমন কঠিন হয় যে আর কেহ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। এখন দুইই মিলিয়া এক হইয়া যায়। ইহারই নাম প্রাণ। ইহা গর্ভ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে, এবং পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই সূক্ষ্ম পদার্থটি নিজেকে সদৃশ সহস্র কোষে বিভক্ত করিয়া প্রথমতঃ এক শূন্য গর্ভ গোলকে পরিণত হয়। তৎপর, ফুটবলকে ভাঁজ করিয়া রাখার মত এক গোলাকার বাটির আকার ধারণ করে। ক্রমে বাটির চারধার পুলিপিঠার মত একত্র যোড়া লাগিয়া একটী অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে, তাহাই এই নূতন জীবের মুখের পত্তন। মুখ যখন হইল তখন শির দাঁড়ার হাড় দেখা দিল, মাথাটা ঘাড়ের উপর বসিল এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রমে দেখা দিতে লাগিল। দেখিলেই মনে হয় যেন এক অদৃশ্য হস্ত এখানে একটু টানিয়া, ওখানে একটু টিপিয়া পূর্ব্বপুরুষের প্রতিকৃতির আদর্শে তাহার বংশধরকে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতেছে। কিন্তু এই কারিকরের সূক্ষ্ম দৃষ্টি কেবল তখনই বোধগম্য হইতে পারে, যখন বুঝা যায়, যে উপাদানে এই সৃষ্টির আরম্ভ তাহা আয়তনে সূচ্যগ্রের সহস্রভাগের এক ভাগ মাত্র। ইহাই জীব বিবর্ত্তনের প্রণালী। উদ্ভিদে কিঞ্চিৎ অবান্তর পার্থক্য থাকিলেও মূল সূত্র একই।

জনন প্রক্রিয়া

Zygote

ডার্ব্বিনের সর্ব্বাবয়বী জনন মতে (Pangenesis) শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চর্ম্ম, ও কেশ, অস্থি, মজ্জা, মাংস, পেশী, হৃৎ, যকৃৎ অন্ত্র সকলেই আপনাদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম—সহজেই অনুমেয় কত সূক্ষ্ম—অঙ্কুরসমূহ পরিত্যাগ করে। সর্ব্বাঙ্গ প্রত্যঙ্গের এই সকল প্রতিনিধিরা রক্তের সঙ্গে প্রবাহিত হইয়া জনন যন্ত্রে

সর্ব্বাবয়বী জনন
Pangenesis

যাইয়া উপস্থিত হয় এবং সকলে মিলিত হইয়া একটা জীব কোষ উৎপন্ন করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে স্ত্রী ও পুং বীর্য্যের দুইটা জীব কোষের সমন্বয়ে একটী জীবনের উদ্ভব। সুতরাং সন্তানোৎপাদনে পিতা মাতা উভয়ের কার্য্যকারিতা সমান। পিতৃধারা মাতৃধারায় সকল অবয়ব একীভূত হইয়া সন্তানের জন্ম দেয়। কাজেই 'নরানাং মাতুলক্রমঃ' বা বাপকা ব্যাটা দুই ই সমান সত্য। একত্রীকৃত এই অঙ্কুর সমূহের পৃথকীকরণই (Differentiation) যখন সন্তানের পরিবর্দ্ধন, তখন সন্তান যে পিতামাতার সমধর্ম্মী হয়, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। যাহা হউক এই ব্যাখ্যায় স্বীকার করিয়া লইতে হয় যে জীব জগতের উচ্চ জাতির পুরুষ আপনার জীবদ্দশাতে সর্ব্বাবয়বের কোটি কোটি অঙ্কুর সমষ্টি সৃজন করিতেছে। ডার্ব্বিণের মত মনস্বী যে এই কল্পনার অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা স্পষ্ট অনুভব করেন নাই তাহা নহে। কিন্তু কোন জীবের জীবদ্দশাতে পীড়া বা অতিরিক্ত পরিচালনা বা অব্যবহার বশতঃ অন্তর বা বহিরিন্দ্রিয়সকলের যে বিকৃতি বা পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন ঘটে, তাহা যদি সন্তান সন্ততিতে সংক্রামিত (Inheritance of acquired Characters) হইতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাবয়বী জননরূপ কোন ব্যাখ্যা চাই, যাহাতে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলের সঙ্গেই জনন যন্ত্রের ঐরূপ একটা নিতান্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করা আবশ্যক। এ কথা বলা বাহুল্য, যে বংশানুক্রম সম্বন্ধীয় বিবদমান তত্ত্বসকলের মধ্যে এই উপার্জ্জিত প্রকৃতির উত্তরাধিকারই সর্ব্বপ্রধান এবং এ বিবাদের এখন পর্য্যন্ত কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়াছে বলিয়া ধরা যায় না। ডার্ব্বিণের সময় ইহা একরূপ সর্ব্ববাদীসম্মতই ছিল, এখন কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক জীবতত্ত্ববিদ্ ইহা স্বীকার করেন।

বর্ত্তমান সময়ে জার্ম্মাণ পণ্ডিত বিশম্যানের বংশপরম্পরায় বীজকোষের স্থায়িত্বের বীজকোষ প্রবাহ (The Continuity of the germ plasm) মত বহুমান্য Continuity of germ-plasm বলিয়া গৃহীত। তাঁহার মতে পূর্ব্ববর্ণিত প্রাণের এক অংশ (Germ-plasm, অন্য অংশের নাম Sama যাহার দ্বারা দেহ গঠিত), বংশধরের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া তাহার জীবাণু (Germ cell or sperm cell) নির্ম্মাণ করে, নিজের শরীর নির্ম্মাণে কখনও ব্যয়িত হয় না। বংশধরও আবার সেই অংশটুকু স্বীয় সন্তানকে দান করে, নিজের শরীরে গ্রহণ করে না। এইরূপে বংশ পরম্পরায় তাহা প্রবাহিত হইতে থাকে। বীজকোষ (Germ plasm) বাড়িয়া যায়, পূর্ব্বপুরুষ হইতে পর পর উত্তর পুরুষকে আশ্রয় করে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই শরীর হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া নির্ম্মিত হয় না। কথাটা একটা ফলের দৃষ্টান্তে বুঝিতে চেষ্টা করা যাক। ফলের বীচিটী পুতিয়া দিলাম—স্কন্ধ শাখা পত্র পুষ্প ফলে বৃক্ষটি সুশোভিত হইয়া উঠিল। ইহার ফলে আবার বীচি আসিল কোথা হইতে? বৃক্ষ আপনার সর্ব্বাঙ্গ হইতে উপাদান লইয়া বীচি গড়ে নাই। ঐ মূলের বীচিই যদি আপনার প্রকৃতি অবিকৃত রাখিয়া ঐ ফলসকলে যাইয়া উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে যাহা হয়, জননক্রিয়া তাহাই। বীজ কোষের উপর শরীরের কোন হাত নাই। শরীর বীজকোষের আবরণ মাত্র। বীজ কোষের রক্ষণ ও পরিপোষণই ইহার একমাত্র কার্য্য—সন্তানের উপর পিতামাতার দেহযন্ত্রের কোন প্রভাব নাই। এই মত গৃহীত হইলে পিতামাতার

পীড়াজনিত দৈহিক বিকলতা, ব্যবহার, অব্যবহার, শিক্ষা প্রভৃতি জনিত হ্রাস বৃদ্ধি, উন্নতি অবনতি যে সন্তানে সংক্রামিত হইবে না, তাহা সহজেই অনুমেয়। তবে কিছুতেই যে বীজকোষের প্রকৃতি বদলাইতে পারে না, এতদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইবে না। বরং এ কথা ঠিক, জননযন্ত্রে অবস্থিতিকালে নানা কারণে বীজ কোষের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু শরীর যন্ত্রের কোন পরিবর্ত্তন বীজকোষের মধ্য দিয়া সন্তানে বর্ত্তাইবে না।

এই জনন ব্যবস্থায় সুতরাং দাঁড়াইল এই, যে পিতা মাতার সঙ্গে যে সন্তানের সাদৃশ্য, তাহার উপর পিতা মাতার কোন প্রত্যক্ষ কৃতিত্ব নাই। একই বীজ কোন বংশ পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে এবং পিতাপুত্রের উভয়ের গুণাবলী ঐ একই বীজ কোষের প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত। সন্তান পিতামাতার মধ্য দিয়া উহা পাইয়াছে এই মাত্র সম্বন্ধ। সহধর্ম্মী উপাদান হইতে উভয়ের আরম্ভ, সমান অবস্থার মধ্য দিয়া উভয়ের পরিবর্দ্ধন, তাই উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে স্ত্রী পুং বীর্য্যের সমবায়েই সন্তানের উৎপত্তি। মাতা কেবল গর্ভধারিণী নহেন, সন্তানের উপর পিতৃত্বের দাবীও তাঁর যে পিতারই মতন। এই যে দুই

দ্বৈপৈত্রিক ধারার ফল

ধারার একীকরণে বংশ রক্ষার ব্যবস্থা, ইহা দ্বারা প্রকৃতি মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লইয়াছেন। যদি এক ধারায় বংশ রক্ষার সম্ভাবনা থাকিত, তবে সন্তান পরম্পরায় একই গুণাবলীর আবির্ভাব হইত। পরিবর্ত্তনের (Variation) দ্বারা বিভিন্ন গুণের আবির্ভাব কল্পনা করিলেও তাহা সুদূরপরাহত হইত। কিন্তু দুইএর সম্মিলনের ব্যবস্থায় কোনও জীবের পক্ষে তাহার জাতির (species) সমস্ত গুণাবলীর উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হইতেছে। মনে করা যাক্ মানব জাতি হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ইহুদী খৃষ্টান ও মুসলমান ধারায় বিভক্ত। অন্যান্যনিরপেক্ষ হইয়া যদি এক 'পিতৃপুরুষ' সন্তানোৎপাদনে সমর্থ হইত, তবে হিন্দুবংশ চিরদিন হিন্দু গুণাবলীতে, য়ীহুদীবংশ য়ীহুদী গুণাবলীতেই আবদ্ধ থাকিত। কিন্তু দুইএর সমাবেশ প্রয়োজন বলিয়া হিন্দু য়ীহুদী মিলিয়া সন্তানে উভয়ের গুণ সংক্রামিত হইবার সুযোগ রহিয়াছে। এই সন্তানের বৌদ্ধ সংযোগে, এবং তৎসন্তানের পরপর খৃষ্টান জৈন মুসলমান সহযোগিতায় কোন বিশেষ মানুষে মানব জাতির সকল গুণের সমাবেশ সূচনা করিতেছে। একধারার জননব্যবস্থায় এই মহাফল সম্ভাবিত নহে। দ্বিপৈত্রিক ধারায় তো সন্তানের জন্ম। কিন্তু পিতৃমাতৃরক্ত ভ্রূণের মধ্যে

গুণ সংক্রমন প্রণালী
Mendel's Law

জট্ পাকাইয়া এক হইয়া থাকে, গুণগুলির একটা গড় প্রস্তুত হয়, না স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রই থাকে ইহাই এখন প্রশ্ন। জীবতত্ত্ব বিজ্ঞানে যাহা মেণ্ডেলের নিয়ম (Mendel's law) বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাতে স্বতন্ত্রীকরণ (Law of Segregation) স্বীকৃত হয়। গুণগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র থাকে, কোন পুরুষে পিতৃগুণ, কোন পুরুষে মাতৃগুণ আসিয়া উপস্থিত হয়—দুইগুণ বিপরীতভাবাপন্ন হইলে কাটাকাটি হয় না। যেখানে দৃষ্টতঃ কাটাকাটি বা গড় মনে হয়, যেমন শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায়ের বা দীর্ঘকর্ণ ও ক্ষুদ্রকর্ণ ক্ষুদ্র শশকের শঙ্কর (Hybrid) সেখানেও পণ্ডিতেরা ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছেন। হঠাৎ দেখিয়া যাহা নিয়মের ব্যভিচার মনে হয়, তাহা ব্যভিচার নাও হইতে

পারে। শীতে বস্তু সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু জল যখন বরফ হয়, তখন সঙ্কুচিত না হইয়া বিস্তৃত হয়। দেখিতে বিস্ফারিত বটে, বাস্তবিক সঙ্কুচিতই হইয়াছে। ১৬টি গোলক লইয়া একটী পূর্ণগর্ভ চতুষ্কোণ প্রস্তুত কর। আবার ঐ ১৬টি গোলকের দ্বারাই যদি একটা শূন্যগর্ভ চতুষ্কোণ গড়া যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয়টি প্রথমটি অপেক্ষা আয়তনে বড়, কিন্তু গোলকগুলির মধ্যে ব্যবধান কম নয়। জলে ও বরফে পরমাণুর এইরূপ কোন সমাবেশ কল্পনা করিলে পরমাণুগুলি সঙ্কুচিত হইয়াও সমস্ত বস্তুটি বিস্তৃত দেখাইবে। হয় তো মানুষের বর্ণের নিদান বা শশকের কর্ণের পূর্ব্বাপর ইতিহাস জানিতে পারিলে এই আপাত কাটাকাটির মধ্যেও স্বতন্ত্রীকরণ ধরা পড়িতে পারে। এমন তো দেখা যায় পিতামাতা উভয়েই গৌরবর্ণ, কিন্তু সন্তান শ্যামবর্ণ হইল। অনুসন্ধানে জানা গেল উর্দ্ধতন তৃতীয় বা চতুর্থ পুরুষ একজন ঐরূপ শ্যামবর্ণ ই ছিলেন, ইতর প্রাণীতে ও উদ্ভিদে বর্ণশঙ্করের মধ্যে মেণ্ডেলের নিয়মই ধরা পড়িয়াছে। জগতে বস্তুবৈচিত্রের অন্ত নাই। সুতরাং সকল ক্ষেত্রেই ঐ নিয়ম খাটিবে কিনা তাহা অনন্ত পরীক্ষাসাপেক্ষ। যতদুর পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে বহুপরিমাণে এ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতিকায় ও বামনের সন্তান—সকলেই হইল অতিকায়। এই অতিকায়দিগের যখন বংশ বাড়িল, দেখাগেল তিনভাগ অতিকায়, একভাগ বামণ। ইহা বাস্তবিকই অদ্ভুত। পিতামাতা উভয়েই অতিকায়, অথচ সন্তান হইল বামণ। গুণের স্বতন্ত্রীকরণ ছাড়া আর কিছুতে ব্যাখ্যা হইবে না। গুণের মধ্যে যেটা অদৃশ্য হয় (এখানে যেমন বামণ) তাহাকে বলে পশ্চাদ্গত (Recessive) যেটা প্রকাশিত হয় সেটার নাম অগ্রগামী (Dominant) (অতিকায় এখানে অগ্রগামী)। কার সম্বন্ধে কে অগ্রগামী বা পশ্চাদ্গত হইবে, তাহা পরীক্ষাসাপেক্ষ। ঐ যে একভাগ বামণ, তারা যখন নিজেদের মধ্যে সন্তানোৎপাদন করে তখন সকলেই হয় বামণ। কিন্তু অতিকায়দের সকলের সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। তাদের তৃতীয়াংশ বিশুদ্ধ কেবলই অতিকায় উৎপন্ন করে। কিন্তু আর সকলে এক চতুর্থাংশ বামন জন্ম দেয়। কোন কোন গুণ সম্বন্ধে দেখা গিয়াছে, যে পিতা মাতার গুণ যেন মিশ্রিত হইয়া প্রথম গোষ্ঠির সন্তান উৎপন্ন হইল। কিন্তু সেখানেও যে গুণের স্বতন্ত্রীকরণ রহিয়াছে তাহা ধরা পড়িল পরে, তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষের সন্তানেরা অতিকায়-বামনেরই নিয়ম অনুসরণ করিল। যাহা হউক, মেণ্ডেলের উত্তরাধিকারের নিয়মের প্রধান কথা এই যে প্রাণের মধ্যে পিতা মাতার গুণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অবস্থান করে, স্পষ্ট আলাদা আলাদা থাকে, জট পাকাইয়া এক হইয়া যায় না। অবস্থার পরিবর্ত্তনে কোনটা বা পশ্চাদ্গত হয়, কোনটা বা অগ্রবর্ত্তী হইয়া সন্তান উপস্থিত হয়। জীব ও উদ্ভিদ জগতে বহু বৈচিত্রের মধ্যে এই নিয়ম পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছে।

যদি এটা একটা প্রত্যক্ষ সত্যই হইত যে সদৃশ হইতে সদৃশ উৎপন্ন হয়ই, তবে কি প্রণালীতে তাহা ঘটে ; যাহা পূর্ব্বে বলা হইল তাহা বলিলেই বংশানুক্রমবিজ্ঞান শেষ হইত।

পরিবর্ত্তন জননগত ও উপার্জ্জিত

কিন্তু সংসারে দুটি বস্তু কখনও এক রকমের হয় না, ইহাই বস্তুগত সত্য। এই বিভিন্নতা দুই প্রকারের, জন্মগত ও উপার্জ্জিত। যদি বীজকোষে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে, তবে তাহাকে জন্মগত পরিবর্ত্তন বলা যায়। বহির্জ্জগৎ দেহ যন্ত্রের উপর কোন স্থায়ী ফল উৎপন্ন করিলে তাহা উপার্জ্জিত প্রকৃতি (acquired

characters) নামে অভিহিত হয়। এই বিভিন্নতা ধরিতে গেলে ব্যবহারিক মাত্র। কোন দেহযন্ত্রকে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থানিচয় হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখা চলে না। জন্মগত প্রকৃতি যাহাই থাকুক না কেন, তাহাকে বিকশিত হইতে হইলে অনুকূল আবেষ্টনের সহায়তা চাই। বৃস্ম্যানদের মধ্যে লইয়া রাখিয়া দিলে কালিদাস-বীজকোষ অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ প্রসব করিবে না। H. B. Orr তাঁহার Development and Heredity নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, যে আবেষ্টনের প্রভাবকে অগ্রাহ্য করিয়া কোন দেহযন্ত্রই স্বীয় অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের দ্বারা পূর্ণাবয়বতা প্রাপ্ত হয় না। আবার, বীজকোষে যদি প্রবণতা না থাকে তবে অবস্থার শত অনুকূলতা সত্ত্বেও তদনুযায়ী উপার্জ্জিতগুণের আবির্ভাব হইবে না। কুকুর ছানাকে যতই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্যে ফেলা যাক্ না কেন, তাহার কখনও শৃঙ্গ গজাইবে না। শুনিয়াছি সাধনাবস্থার পরিবর্ত্তনে মনুষ্য সাধকের লাঙ্গুল বাহির হয়। কিন্তু সে কথা অশ্রদ্ধেয়। অন্যদিকে স্বাভাবিক অবস্থায় যেমন এক জাতীয় জীবের প্রত্যেক ব্যক্তিই কেবল আপন আপন জন্মগত গুণাবলীকেই বিকশিত করে, অবস্থার বৈপরীত্য যথা খাদ্যের অপ্রাচুর্য্য, অঙ্গবিশেষের অস্বাভাবিক পরিচালনা, কঠিন পীড়া প্রভৃতিতে উপার্জ্জিতগুণের আবির্ভাবও তেমনই অপরিহার্য্য। জন্মকাল হইতে যমজের একজনকে বিশুদ্ধ বায়ু, প্রচুর স্বাস্থ্যকর খাদ্য, স্বাভাবিক অঙ্গপরিচালন ও সুশিক্ষার মধ্যে, অন্যটিকে সর্ব্ববিষয়ে ইহার বিপরীত অবস্থায় প্রতিপালন করিলে, উভয়ের মধ্যে যে গুরুতর পার্থক্যের সঞ্চার হইবে তাহা উপার্জ্জিত। অন্যদিকে দুই ভিন্ন পরিবারে দুইটি সন্তানকে সম্পূর্ণ এক অবস্থার মধ্যে রাখিয়া দিলে, তাহাদের মধ্যে যে প্রভেদ দৃষ্ট হইবে তাহা সম্পূর্ণ জননগত। কার্য্যত এই দুই রকমের পার্থক্যের মধ্যে রেখা টানা অতি কঠিন সন্দেহ নাই, কিন্তু বিচার ক্ষেত্রে ইহা অস্বীকার করা চলে না।

পিতা পুত্রে বা একই পিতামাতার সন্তানগণের মধ্যে যে জন্মগত বিভিন্নতা, তাহার কারণানুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে দ্বিধারায় বংশপরম্পরাগত গুণাবলীর বিভিন্ন সংমিশ্রণে এই ভিন্নতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বংশানুক্রমের নিয়মসকল পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে এই পিতামাতার বীজকোষ ও ডিম্ব কোষের সমবায়ে অসংখ্য রকমের নব নব প্রাণের আবির্ভাব হইতে পারে। যেমন পুরাতন ইটে নূতন গৃহ নির্ম্মিত হয়, তেমনই বংশ পরম্পরাগত গুণাবলীর নব নব সংমিশ্রণে অনন্ত জন্মগতপার্থক্য সৃষ্টির সম্ভাবনা। প্রত্যেক মানুষের পিতৃমাতৃধারা, তাঁহাদেরও পিতৃমাতৃবংশ, এইরূপে উর্দ্ধদিকে কতদূর যাইতে হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। স্বজাতিকে (species) অতিক্রম করাও অসম্ভব ঘটনা নহে (Even to allied species occasionally in certain mammals—B. Hart) একথা স্মরণ করিলে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে অন্য কোন দর্শন বিজ্ঞানের সাহায্য লইতে হয় না। এইরূপ পরম্পরাগত গুণাবলীর সুফলপ্রসূ সংমিশ্রণে সময়ে সময়ে আমাদের মধ্যে রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র ও ব্রজেন্দ্রনাথ প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়া থাকে, ইহা ভগবৎকৃপা। আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতে দেখিতে পাই তিনি স্বীয় চরিত্রবৈশিষ্ট্যের কোনটি কোন্ পূর্ব্ব পুরুষ হইতে আগত তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু সকল পরিবর্ত্তনই যে দৈহিক সংমিশ্রণের ফল, তাহা নহে।

সময়ে সময়ে সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টির আবির্ভাবও হইয়া থাকে। ইহা মৌলিক পার্থক্য। বংশানুক্রমের কোন নিয়মের দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা হয় না এবং ইহা ধীরে ধীরেও বিকশিত হয় না, হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই ইহার নাম আকস্মিক পরিবর্ত্তন Accidental variation, Single variation বা mutation, তবে ইহা বুঝা শক্ত নয়। সংমিশ্রণে একাধিক বস্তু চাই। আদি পিতামাতা একযুগল নন, বহু যুগল, ইহা পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত। যিনি আদিতে বহুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং সংমিশ্রণ ছাড়াই নূতন গড়িয়াছিলেন, তিনি এখন হঠাৎ সৃষ্টি হইতে হস্ত সম্বরণ করিয়া বসিয়া থাকিবেন সৃষ্টি ছাড়িয়া কেবল নির্ম্মাণ করিতেছেন, ইহা ধরিয়া লইবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখা যাইতেছে না। তত্ত্ববিদগণ জীব ও উদ্ভিদ্ জগতে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণদ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে ভগবান এখনও সৃষ্টি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার লীলা ফুরাইয়া যায় নাই। সৃষ্টিতে এখনও নূতন তত্ত্বের আবির্ভাব হইতেছে। H. D Vries জোরের সঙ্গে বলিয়াছেন যে এরূপ নূতনের আবির্ভাব হয় ও তাহা সন্তানে বর্ত্তে। তাঁহাদিগের মতে সৃষ্টিটা এখন নিত্যকর্ম্মের মধ্যে নয়, নৈমিত্তিক মাত্র। কে জানে পণ্ডিতেরা যাহা ধরিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার লক্ষ গুণ বেশী তাঁহাদের দৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে না। বার্গসোঁ বলেন এই সকল পরিবর্ত্তনের মূলে ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক অবস্থানিচয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য চেষ্টার অতীত এক শাসন শক্তি Directing principle, ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক্, আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। যাহা হউক, তাঁহাদের মত এই যে বীজকোষের প্রকৃতিতে যে সকল বাস্তব পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয় তাহা এইরূপ নূতন সৃষ্টি। তবে তাঁহাদের বিশ্বাস যে এরূপ বাস্তব পরিবর্ত্তন তুলনায় খুবই কম। যদিও কেহ কেহ পতঙ্গবিশেষের ডিম্বের উপর অতিরিক্ত তাপ ইত্যাদির প্রয়োগ করিয়া এবং বীজ গড়িবার পূর্ব্বে পুষ্পের মধ্যে ঔষধাদি প্রবেশ করাইয়া এই বাস্তব পরিবর্ত্তন সংঘটন করাইয়াছেন। এই পরিবর্ত্তন দুই দিকে হইতে পারে—হয় কোন নূতন গুণের আবির্ভাব, না হয় কোন পুরাতন প্রকৃতির তিরোধান। নদী চলিতে চলিতে যেমন মরুভূমিতে অদৃশ্য হইয়া যাইতে পারে, তেমনই পরম্পরাগত কোন কোন বিশেষ প্রকৃতি কোন পুরুষে আসিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল। আবার যদি এই রূপে পূর্ব্বে লুপ্ত কোন গুণ কোন উত্তর পুরুষে আসিয়া আবির্ভূত হয় তবে তাকে বলে পুনরাবর্ত্তন (Reversion) কোন গুণ বহু পুরুষ পর্য্যন্ত অন্তর্হিত থাকিয়া হঠাৎ এক পুরুষে আত্মপ্রকাশ করে। (Atavism, much better termed delayed inheritance.)*

পশুব্যবসায়ীদের মধ্যে এই সংস্কার আছে, যদি একবার অন্য জাতীয় যেমন দোআঁশলা কুকুরের দ্বারা কোন ভাল কুকুরীর সন্তান উৎপাদন করান যায়, তবে স্বজাতি দ্বারা উৎপাদিত সন্তানও পরে দোআঁশলাই হইয়া যায়। আর তার উন্নয়নের সম্ভাবনা থাকে না। এরূপ বিশ্বাসও দেখা যায় যে গর্ভিণীর গর্ভাবস্থায় কোন গুরুতর মানসিক বৈকল্য উপস্থিত হইলে তার ফল সন্তানে বর্ত্তে। কোন গর্ভিণী সর্প দেখিয়া ভয় পাওয়ায় সন্তান পৃষ্ঠে সর্প চিহ্ন লইয়া জন্মিয়াছিল। শুনিয়াছি গর্ভাবস্থায় সন্ন্যাসীর প্রভাব পড়িয়াছিল বলিয়া সন্তানের

* Dr, Daivd B. Hart in his Evolution and Heredity.

প্রব্রজ্যার দিকে ঝোঁক হইয়া ছিল। সত্য হইলেও এসব যে কার্য্যকারণসম্বন্ধবিরহিত একত্রাবস্থিত ঘটনা (Coincidence) নয়, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই সকল বিষয় সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। সন্তানের মনের উপর গর্ভবতীর প্রবল মানসিক ভাব যে কার্য্য করিতে পারে না, তাহা নহে। কিন্তু সত্য বলিয়া গ্রহণ করার জন্য যতটা সতর্কতাপূর্ণ অনুসন্ধান ও পরীক্ষা প্রয়োজন তাহা এ বিষয়ে কখন হয় নাই।

উপার্জ্জিত তত্ত্বের উত্তরাধিকার

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে উপার্জ্জিত তত্ত্বের উত্তরাধিকার লইয়া বংশানুক্রমবিজ্ঞানে তুমুল ঝড়ের উৎপত্তি হইয়াছে। অথচ তার অর্দ্ধেক হুটোপাটি ভুল বুঝার (Misunderstanding) ফল। ব্যক্তির জীবদ্দশায় তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে পরিবর্ত্তন, তা সন্তানে বর্ত্তে কি না ইহাই হইল প্রশ্ন। কিন্তু শরীরের মধ্য দিয়া যদি বীজ কোষ প্রভাবিত হয় তবে তাহা সন্তান প্রাপ্ত হইলে, এ প্রশ্নের কি আসিয়া যায়। এ দুই প্রশ্ন নিয়াই কিন্তু ঝড়ের উৎপত্তি! একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। ঘোড় দৌড়ের ঘোড়া দৌড় শিখিবার পূর্ব্বে সন্তান উৎপাদন করিল। পরবর্ত্তী সন্তানগুলি কি পূর্ব্বের গুলি অপেক্ষা ভাল দৌড় শিখিবে? কেহ বলেন, হাঁ; কেহ বলেন, না। স্পেনসার উপার্জ্জিত তত্ত্বের উত্তরাধিকারে বিশ্বাসী, বিশ্ম্যান নহেন। স্পেন্সার বলিয়াছেন যে তাঁর হাত ছোট, কেন না, বাপ ঠাকুরদাদা ছিলেন স্কুল মাষ্টার, হাতের পরিচালনা ছিল না। ঐরূপে প্রশ্নের মীমাংসা হইবে না। উপার্জ্জিত তত্ত্ব (Acquired character) কি তা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে—

প্রথমতঃ, উপার্জ্জিত তত্ত্ব ব্যক্তির জীবদ্দশায় শারীরিক পরিবর্ত্তন। জাতির জীবনে যে পরিবর্ত্তন তাহা এখানে ধরা হইবে না। বন্য কুক্কুটের বংশধর আমাদের রান্নাঘরের মুর্গী বেশী ডিম দেয়, জংলা আমের পুত্র আমাদের বাগানের ল্যাংরা বেশী রসাল—সুতরাং উপার্জ্জিত তত্ত্ব সন্তানে না আসিবে কেন? এইখানে অলক্ষিতে গোল বাঁধিয়া গেল। কেন না, গৃহপালিত কুক্কুট আর উদ্যানের আমের যে বিশেষগুণ, তাহা ব্যক্তিগত জীবনের উপার্জ্জন নহে।

দ্বিতীয়তঃ কোন একটা পরিবর্ত্তনকে উপার্জ্জিত তত্ত্ব বলিতে হইলে দেখাইতে হইবে যে এই পরিবর্ত্তনোপযোগী বিশেষ কিছু ঘটনা ঐ ব্যক্তির জীবনে ঘটিয়াছে, যাহা কিয়ৎপরিমাণে অসাধারণ। অল্প বয়সেই একজনের মাথার চুল পাকিয়া গেল। দেখা গেল তার সন্তানদেরও ঐ দশা। এই বিশেষত্ব যে জন্মগত নয় কিন্তু উপার্জ্জিত, তা এখনই বলা চলিবে না। যদি দেখা যায় যে ইতিমধ্যে তার গুরুতর পীড়া হইয়াছিল, তবেই coincidence না হইলে তার সন্তানদের পক্ষে চুলের অকালপক্কতা উপার্জ্জিত তত্ত্ব হইবে। অথবা সন্তান মাতৃগর্ভ হইতে মায়ের উপার্জ্জিত রোগ লইয়া জন্মগ্রহণ করিল। ঐ রোগ মাতৃগর্ভে অবস্থানকালের ছোঁয়াচ (contagion) নয় তাহা প্রমাণিত না হইলে উত্তরাধিকার বলা চলিবে চলিবে না।

তৃতীয়তঃ উপার্জ্জিত তত্ত্ব শরীরের পরিবর্ত্তন, সোজাসুজি বীজকোষের পরিবর্ত্তন নয়। এইটাই প্রধান কথা, ইহা লইয়া যত গোল। কেন না, বুঝা সহজ নয়। অতিরিক্ত উত্তাপে যে পতঙ্গবিশেষের গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধন করা যায় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু এই

পরিবর্ত্তন বীজকোষের, শরীরের নয়। সুতরাং এ পরিবর্ত্তন উপার্জ্জিত নহে। অবশ্য, কোনো ক্রিয়া শারীরিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বীজকোষও পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। কিন্তু উপার্জ্জিত তত্ত্বের উত্তরাধিকার সাব্যস্ত করিতে হইলে দেখাইতে হইবে যে বীজকোষের পরিবর্ত্তন শারীরিক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া হইয়াছে, সাক্ষাৎভাবে উক্ত ক্রিয়ার ফল নহে। ঘোর মাতালের বীজকোষ দূষিত হইয়া সন্তান দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হইতে পারে। কিন্তু উপার্জ্জিত তত্ত্বের উত্তরাধিকার প্রমাণ করিতে হইলে দেখাইতে হইবে যে পিতার নষ্ট পরিপাকশক্তি ও রক্ত-নাশাও সন্তানে বর্ত্তিয়াছে। প্রকৃত প্রশ্ন এই যে তাহার বিভিন্ন অংশের সঙ্গে বীজকোষের কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে কি না এবং কোন অবয়বের উপর বাহিরের শক্তির কার্য্য বীজকোষে প্রতিফলিত হয় কি না—যাহাতে সন্তান পিতামাতার স্বোর্জ্জিত পরিবর্ত্তনের অধিকারী হইতে পারে। হাতখানা কাটাগেল—বীজকোষের সঙ্গে এই ঘটনার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। ইহার ফল যদি কোন রকমে বীজকোষে যাইয়া উপস্থিত না হয়, তবে সন্তান ইহার ভাগী হইতে পারে না। কেন না, বীজকোষ হইতেই সন্তানের উৎপত্তি। ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব। এ সম্বন্ধে সকল কথা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে চলে না। তবে কেহই এ কথা স্বীকার করেন না যে সকল উপার্জ্জিত পরিবর্ত্তনই সন্তান লাভ করে। তাহা হইলে চীনা রমণীর পা ছোট করিবার জন্য বংশ পরম্পরায় শৈশব হইতে লোহার জুতা ব্যবহার করিতে হইত না এবং সভ্য জগতে সন্তানের লেখা পড়া শিক্ষার জন্য এত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত না। তবে একটা ভাবপক্ষীয় দৃষ্টান্তেই কেল্লা ফতে। তাই পণ্ডিত মহলে এই বিষয় হইয়া বেশ গজ কচ্ছপের যুদ্ধ চলিতেছে। একজন দৃষ্টান্ত দিলেন, এক ষাঁড়ের, গোয়ালঘরের দরজা পড়িয়া, ল্যাজ ছিঁড়িয়াছিল। ছিঁড়ে না কেন? উহার ন্যাজে গুরুতর দোষ ছিল, তাই হঠাৎ ছিঁড়িয়া গেল। কে জানে সে দোষ ইতিপূর্ব্বেই বীজ কোষকে আক্রমণ ক রে নাই। সুতরাং ন্যাজ না ছিঁড়িলেও সন্তান যে লাঙ্গুলহীন হইত না, তাহার তো কোন প্রমান নাই! আর সহস্র সহস্র গরুর লাঙ্গুল ছিঁড়িয়াছে, তাদের সন্তান লাঙ্গুলহীন হয় নাই! এইরূপে সকল ঘটনাই অপর পক্ষ উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন। তাঁহারা বলেন বিরুদ্ধ পক্ষের দৃষ্টান্ত এত কম, তাতে অন্যরকম ব্যাখ্যাও যে না চলে তাও নয়। তবে কেন একটা নূতন নিয়ম স্বীকার করিব, যাহা গৃহীত জনন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধ। তবে ইঁহাদের শেষ মীমাংসা এই, যে এমন কোন খাঁটি প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, যাহাতে বলা যায়, উপার্জ্জিততত্ত্ব সন্তান লাভ করে। কিন্তু এরূপ হইতেই পারে না বলাটা নিতান্ত গোড়ামি, বিজ্ঞানসম্মত নহে।

সুপ্রজনন বিদ্যা।
Eugenies

আমরা এতক্ষণ যাহা আলোচনা করিলাম তাহাতে দেখা যাইবে যে মানুষ যদি জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনায় নিযুক্ত হয়, তবে তাহাতে যে বিস্তর আনন্দ লাভ করে তাহা নহে, সে জ্ঞান কাজে খাটাইয়া কার্য্যগত জীবনেও প্রচুর উপকার লাভ করিতে পারে। আমরা যে বিজ্ঞানের আলোচনা করিলাম, তাহার সাহায্যে জীব ও উদ্ভিদ জগতের অনেক উন্নতি সাধিত হইতে পারে। কিন্তু মানুষ কি কেবল আপনার উদর পূর্ত্তি লইয়াই ব্যস্ত থাকিবে, অন্য উন্নতির চেষ্টা করিবে না? মানুষের উপর প্রাকৃতিক ও সামাজিক আবেষ্টনের ক্ষমতা অসীম। যাহা বংশানুক্রম বলিয়া মনে হয় তাহা যে

শিক্ষা ও অনুকরণের ফল। শিক্ষার ব্যবস্থার উন্নয়নে মানুষ আপনার জীবনে যুগান্তর আনয়ন করিতে সমর্থ। সংস্কারকগণ দেখিতে পাইবেন তাঁহাদের সংস্কারের চেষ্টা স্বপ্ন নহে। বরং যাহারা অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত, তাহারাই স্বপ্ন দেখিতেছে। বংশানুক্রমের নিয়ম সকলকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতেছে, যে যাহাদিগকে আজ শূদ্র বলিয়া পদদলিত করিয়া রাখিয়াছ, তাহাদের রাস্তা খুলিয়া দাও, পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি বিধান কর, দেখিবে যে সকল গুণের অগ্রবর্ত্তিতায় (Dominance) তুমি বড়, যে সকল গুণ পশ্চাদগত হওয়ায় তাহারা ছোট, সেগুলি তাহাদের মধ্যেও অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাহাদের দুর্দ্দশার অপনোদন করিবে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

ব্যর্থ

আমার বঞ্চিত আমি ব্যর্থ অতীতের দ্বারে আমারে টানিছে অহরহ ;
একি দুর্নিবার অন্ধ আকুল বেদনা অসহায় !
আমারে ফিরাতে চাহে। হাহাকার একি দুর্ব্বিষহ !
চলিতে সমুখপানে, নয়ন পিছনে আজি বারে বারে সুধু ফিরে চায়,
যত বলি " যাও যাও, ফিরে যাও, ছিন্ন কর, স্নেহবাহু কর তব লোল ;"
দাঁড়াবার অবসর কোথা হায় !—অপূর্ণ সাধনা—
কোথা শক্তি ! শূন্য সব ! স্মৃতি সুধু তোলে কলরোল
" এস এস ফিরে এস, পূর্ণ কর ব্যর্থ আরাধনা।"

২

নির্ম্মম নিবিড় সন্ধ্যা শূন্য জীবনের পরে আসিছে ঘনায়ে আজি হায়
নিষ্ঠুর নিয়তি সম ;—ফিরিবার নাহিরে উপায়।
পলে পলে ব্যর্থতার তীব্র অন্ধ বেদনা পীড়নে,
নিষ্পেষিয়া মর্ম্মতল বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরে মূক অগোচরে সঙ্গোপনে।

সঙ্গণিকা

কয়েক বৎসর যাবৎ মাসিক সাপ্তাহিক দৈনিক প্রায় সকল রকম কাগজই নারী নিগ্রহ, নারী নির্য্যাতন, নারীসমস্যার প্রশ্নে ছাইয়া গিয়াছে। সমস্যাটী বাস্তবিকই বিশেষ জটিলতা পূর্ণ। সম্প্রতি উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে নারীহরণ বা নারীনির্য্যাতনের খবর প্রায় প্রত্যহই কাগজে প্রকাশিত হইতেছে। কলিকাতায় সম্প্রতি ইহার প্রতিকারকল্পে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। আমরা ইহার সাফল্য কামনা করি।

সংবাদ পত্র হইতে যতদুর জানা যায়, নির্য্যাতিতা বা অপহৃতা রমণী প্রায়ই হিন্দু, এবং নির্য্যাতন বা অপহরণকারী প্রায়ই মুসলমান। সম্ভবতঃ ইহা দেখিয়া কোথাও কোথাও ইহা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। "ছোলতান" পত্রিকা মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই প্রতিবাদ সঙ্গত অর্থাৎ এই অত্যাচার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক নয় বলিয়াই মনে হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় প্রবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করে। এ ক্ষেত্রে তাহাই কারণ, সাম্প্রদায়িকতা নহে। কখনো কখনো পরাক্রান্ত দুশ্চরিত্র হিন্দু জমিদার দ্বারাও এরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানই মুসলমানপ্রধান। সাধারণতঃ সাহস ও শারীরিক বলে মুসলমান হিন্দু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এবিষয়ে পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দুরা মুসলমানদের গোঁয়ার বলিয়া খানিকটা ভয়ও করে। ইহা একটি কারণ, এবং হিন্দুনারীকে একবার বাড়ীর বাহিরে আনিলে সমাজ আর তাহাকে গ্রহণ করিবে না এবং নির্য্যাতনকারীর শাস্তিবিধানের জন্য উদ্‌যোগী হইবে না ইহাতেও মন্দলোকে অত্যাচার করিতে সাহস পায়।

কিন্তু এ বিষয়ে নারীরও করণীয় আছে। আত্মশ্রদ্ধায় সবল হইয়া নারীত্বের গৌরব রক্ষা করিতে হইবে। মানসিক তেজে তেজস্বিনী হইয়া বাধা প্রদান করিলে, অতি দুর্ব্বৃত্তের পক্ষেও অত্যাচার করা সহজ-সম্ভব হইতে পারে না। কেহ কেহ বলেন শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্যই নারী বাধা প্রদান করিতে অসমর্থ হয়। কিন্তু সকল জায়গায় না হইলেও বহু জায়গায়ই মানসিক তেজ ও শক্তির নিকট অসৎ লোক ভয় পাইয়া থাকে। ইহা কবিত্ব নয়, অতি সত্য কথা। নারীদের আত্মসম্ভ্রম রক্ষার্থে মানসিক তেজ ও সাহসে শক্তিমতী হওয়া চাই-ই, পূর্ব্বকালের রাজপুত মহিলাদের মতন অস্ত্র সঙ্গে রাখার পদ্ধতি প্রচলিত করিতে পারিলে বোধ হয় মনে সাহস আসিবে।

এই সকল অত্যাচারী লোক সাধারণতঃ কাপুরুষ হইয়া থাকে; দু'চার জায়গায় নির্য্যাতনকারী অস্ত্রাঘাতে আহত এমন কি নিহতও হইয়াছে, একথা জানিলে দুর্ব্বৃত্তেরা পুনরায় এরূপ কাজে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইবে না। মহাত্মা গান্ধী ইয়ং ইণ্ডিয়াতে এসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা খুব সমীচীন বলিয়া মনে হয়। তিনি লিখিয়াছেন "নারীহরণ ঘটিত ব্যাপারসমূহকে অনেকে সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। হয়ত অনেকেই অথবা সকলেই ইহা আন্তরিক বিশ্বাস করেন। কিন্তু এব্যাপারে

অপরাধী অধিকাংশ স্থলেই মুসলমান এবং নির্য্যাতিতা নারী হিন্দু হইলেও, কোন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফলে যে এইরূপ হইতেছে তাহা আমাদের মনে হয় না। বস্তুবিকও যদি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফলে এই সকল অত্যাচার ঘটিয়া থাকে তাহা হইলেও স্পষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে সে কথা প্রচার করা উচিত নয়। এমনও হইতে পারে যে যাহারা এই সকল অনাচারের কর্ত্তা, উহারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল—যদিও তাহা সত্য বলিয়া আমার মনে হয় না—তাহা হইলেও সে জন্য সম্প্রদায় হিসাবে সমগ্র মুসলমান সমাজকে দায়ী করা বা দোষারোপ করা অন্যায়। মুসলমান প্রধান দেশে আমার বাস, এবং আমার বন্ধুগণের মধ্যে অনেক মুসলমান আছেন, কিন্তু আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস অথবা সামাজিক সংস্কার লইয়া উহাদের সহিত কোনরূপ বিরোধ বা মনোমালিন্যের কারণ এ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই আর কখনও যে হইবে তাহাও আমি সম্ভবপর মনে করি না। অতি সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানও যে নারী-নির্য্যাতনকে উপেক্ষার চক্ষে দেখেন, তাহা কখনও দেখিয়াছি মনে পড়ে না। এই মুসলমান সম্প্রদায়েরই একজন নবাব অসহায়া নারীর সতীত্ব হরণের অপরাধে নিজের একমাত্র পুত্রের শিরচ্ছেদ করিয়া ছিলেন। প্রবল জাতীয়সংস্কার ভিন্ন উহা কখনও সম্ভবপর হইতনা। ইংরাজ রাজত্বে এইরূপ নিরক্ষেপ বিচারের দৃষ্টান্ত কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। বস্তুতঃ মন্দলোক সকল সম্প্রদায়েই আছে এবং দুর্ব্বল পাইলেই তাহাদের উপর অত্যাচার করিবে। ইংরাজনারীর উপর অত্যাচার হয় না কারণ উহার পশ্চাতে এতবড় শক্তিশালী একটী শাসনতন্ত্র আছে। ইংরাজ নারীর উপর অত্যাচার উহারা কখনও বরদাস্ত করিবে না। আমরাও যদি নারীর উপর অত্যাচার বন্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হই তাহাহইলে একদিনেই এই সকল অত্যাচার বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

"এ সম্পর্কে আমার একটী দৃষ্টান্ত মনে পড়িল। কোন গ্রামে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ রূপবতী যুবতী পত্নী লইয়া বাস করিতেন। সেই গ্রামেই একজন পরাক্রান্ত মুসলমান জমিদারের বাস। জমিদার একদিন রাত্রে লোকজন পাঠাইয়া যুবতীকে অপহরণ করিলেন। কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণের নিকট প্রস্তাব আসিল, তুমি গরীব, তুমি অমন রূপবতী পত্নীর মর্য্যাদা রক্ষা করিবে কিরূপে? আমি তোমায় যথেষ্ট জায়গাজমি দিব, সংসারে তোমার কোন অভাব থাকিবে না, তুমি এবিষয় লইয়া আর নাড়া চাড়া করিওনা, এইখানেই ব্যাপারটী শেষ হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মপত্নী বিনিময়ে স্বীকৃত হইয়া নিজের সংসারের অভাব দূর করিলেন। আর ব্রাহ্মণীরও যে জীবনে বৈধ স্বামীর বিচ্ছেদ বিশেষ অসহনীয় হইয়া উঠিয়া ছিল তাহারও কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। আমাদের ব্যক্তিগত চরিত্রের মূলেই যে ব্যাধি রহিয়াছে, এই ব্যাধি দূর না করিতে পারিলে এই পাপেরও প্রতিকারের আশা সুদূর পরাহত।

"আমি নিম্নে আরও দুইটী উদাহরণ দিলাম। আমাদের মা বোনেরা উহা হইতে নিজেদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত গ্রহণ করিতে পারেন। কামুক লোকেরা সাধারণতঃ সাহসের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ নয়। তবে অবস্থা বিশেষে উহারা এতদূর মরিয়া হইয়া উঠিতে

পারে যে ক্ষেত্রে উহাদের অনুজ্ঞান লুপ্ত হয়। অন্য কোন প্রতিকারের উপায় না থাকিলে সে অবস্থায় প্রতিকারের একমাত্র উপায় হত্যা করা। স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম রক্ষার জন্য এই চরম উপায় অবলম্বন অহিংসার বিরোধী নয়, বরং ইহা পরম করুণারই কাজ। অহিংসা অথবা নৈতিকনিয়মেরও উহা বিরোধী নয়। বিপদে পড়িলে আমাদের মা বোনেরা যেন একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন। যাহারা অসদিচ্ছাপ্রণোদিত উহারা কখনও নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হইবে না, এবং এই সম্ভাবনাই উহাদিগকে অত্যাচার হইতে বিরত রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। উপায় আমি বলিয়া দিলাম, এখন প্রয়োগ মায়েদের হাতে।

"আমি উপরে যে দৃষ্টান্ত দুইটীর উল্লেখ করিয়াছিলাম উহাদের একটী ঘটিয়াছিল পাঞ্জাবে। কোন রেলওয়ে লাইনে একটী ইংরেজ জনৈক সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমান স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করে। স্ত্রীলোকটী লজ্জায়, অপমানে, ক্ষোভে আত্মহত্যা করেন।

"দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটী আধুনিক ; চরমনাইরে গতবৎসর ঘটিয়াছিল। জনৈক পুলিস কনষ্টেবল একটী মুসলমান রমণীর ধর্ম্মনাশে উদ্যত হইলে রমণী উহাকে বঁটি লইয়া তাড়া করেন, তখন সে পলাইয়া যায়। মালক্ষ্মীগণ আশা করি এই দৃষ্টান্তটী মনে রাখিবেন। ইহাতে অনেক সময় উঁহাদের সম্মান রক্ষা হইবে।

"আর একটী কথা আছে। দুর্ব্বৃত্তের বশ্যতা কেহ কখনও ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বীকার করিবেন না। ইহাতে হয়ত অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু তাহাও সহ্য করিতে হইবে। যে বিষয়ের মূল্য যত অধিক উহার জন্য তত অধিক ত্যাগও স্বীকার করিতে হয়।" তরুণভারত।

লাঞ্ছিতা নারীদের রক্ষার জন্য যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে উহার সাফল্য কামনা করি। আশা করি সকলেই তাহা করিবেন। কিন্তু এই আন্দোলনে যেন সম্প্রদায়বিশেষের আন্দোলন না হয়, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেই নিজস্ব জ্ঞানে ইহাতে আন্তরিক ভাবে যোগ দিবেন আমরা এই আশা করি। এইখানে আর একটী প্রশ্ন রহিয়াছে ; নির্য্যাতিতা নারীগণ সমাজে স্থান পাইবেন কিনা? এ প্রশ্নও অনেক স্থানে নির্য্যাতনের সহায়ক হয়। সমাজের ইহা বিশেষ চিন্তা ও সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করা উচিত।

আহমদাবাদে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে স্বরাজ্যদলের রাজনৈতিক কৌশলের সহিত মহাত্মা গান্ধীর সরল অকপট আদর্শের সংঘর্ষ হইয়াছিল। অবশ্য ভোট গণনায় তিনি জয়ী হইয়াছেন, কিন্তু দেশ তাঁহার উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে নাই ইহা বুঝিতে পারিয়া, ভোটগণনায় জয়ী হইয়াও, তিনি নিজেকে পরাজিত মনে করিতেছেন ও তাহা অকপটভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতিদিন কিছু না কিছু সময় চরকা কাটিয়া সুতা

প্রস্তুত করিতে হইবে, নতুবা নিখিল-ভারত-কংগ্রেস কমিটির সভ্যশ্রেণীভুক্ত থাকিতে পারা যাইবে না. এরূপ আদর্শ আপাতফলাকাঙ্ক্ষী কাহারও নিকট আদরণীয় হইতে পারে না; কিন্তু মহাত্মার এই নির্দ্দেশের মধ্যে যে মহান ভাব নিহিত ছিল, তাহা স্বরাজ্যদল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই বলিয়া মনে হয়। একটা বড় কাজে সফলতা লাভ করিতে হইলে, দিনের মধ্যে অন্ততঃ কিছুক্ষণ সেই ভাবে মগ্ন হইয়া থাকিতে হইবে, অন্য কাজ পরিত্যাগ করিয়া অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য একটী তীব্র আকাঙ্ক্ষা মনে জাগরূক রাখিতে হইবে, এ অতি সত্য আদর্শ। গ্রেটবৃটেনের নিকট আমাদের দাসত্ব শুধু রাজনৈতিক নহে, কিন্তু প্রধানত: Industrial (শিল্পবিষয়ক), এই ভাবটা মনের মধ্যে দীপ্তভাবে জাগাইয়া না রাখিলে চলিবে না। মহাত্মা তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী কয়েদের সময় এই চিন্তাই করিতেছিলেন, তাই কারাগার হইতে বাহির হইয়া তিনি যখন দেখিলেন যে দেশে গঠনমূলক কার্য্য আশানুরূপ চলিতেছে না তখন এই আদর্শ দেশের নিকট উপস্থিত করিলেন। চরকা শুধু চরকার সুতার জন্য নহে, চরকা মহাত্মার নিকট যে ideal প্রচার করে ভারতের প্রত্যেক কর্ম্মীর নিকট সেই ideal প্রচার করুক এবং প্রত্যেক কর্ম্মীর হৃদয়ে সেই ভাব বদ্ধমূল হউক, ইহাই মহাত্মার আদর্শ। এই ব্রত ছয়মাস পালন করিলে প্রত্যেক কর্ম্মীর মনে, স্বদেশজাত পণ্যের প্রতি এমন একটী গভীর ভালবাসা আসিবে, যাহাতে দেশে স্বরাজের একটা তীব্র সজাগ ভাব ও প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরূক হইবে। মহাত্মার এই ভাবটা অবহেলার সহিত উড়াইয়া দেওয়ার জিনিষ নয়।

বাক্‌সর্ব্বস্ব বাঙ্গালী বলিয়া আমাদের একটী বিশেষ অখ্যাতি আছে। চরকার সুতা কাটার প্রস্তাব গ্রহণ ও পালন করিয়া জনসাধারণকে তাহা করিতে উৎসাহিত করিলে অন্ততঃ একটী বিষয়ে এ অখ্যাতি দূর হইবার সম্ভাবনা; যদি নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর প্রতি সভ্য প্রতিদিন বাড়ীতে আধ ঘণ্টা সুতা কাটিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে দেশে কি বিপুল একটা সাড়া পড়িয়া যাইবে ভাবিয়াছেন কি? সেই দিক হইতে এ কথাটী আমরা একবার ভাবিয়াও দেখিতেছি না। উদাহরণস্বরূপ এই কথাটী বলিতেছি, কেহ ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করিবেন না; যদি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় অসংখ্য কার্য্য থাকা সত্ত্বেও প্রতিদিন আধঘণ্টা সুতা কাটেন, তাহা হইলে তাঁহার পরিবারের প্রত্যেকে ক্রমে ক্রমে আপনা হইতে একাজে প্রবৃত্ত হইবেন। কাহাকেও বলিবারও প্রয়োজন হইবে না। একটী সম্ভ্রান্ত পরিবারের কর্ত্তা—কর্ম্ম বহুলতায় যিনি অতিমাত্রায় ব্যস্ত—তিনিও নিষ্ঠা সহকারে আধঘণ্টা সুতা কাটিতেছেন, ইহা দেখিলে তাঁহার আত্মীয় পরিজন প্রতিবেশী ভৃত্য সকলের ভিতরই চরকার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিবে; স্বরাজ্যদল দেখিতে পাইবেন কত অল্পদিনে দেশ গঠনমূলক কার্য্যের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। মফঃস্বলে সর্ব্বত্রই অশিক্ষিত লোকের কংগ্রেসের প্রতি একটী গৌরবের ও বিশ্বাসের ভাব আছে। সমস্ত শিক্ষিত অশিক্ষিত পুরুষ ও নারীকে এই একটী কাজে—যাহা স্বরাজলাভের অন্যতম উপায় এবং যাহা ব্যক্তিগত হিসাবে প্রত্যেকের নিজের জীবনকে বিকশিত করিবার একটী উপায়—যুক্ত করিতে পারিলে তাহা জাতীয়

একত্ববোধকে জাগ্রত করিতে বিশেষ সাহায্য করিবে। পূর্ব্বে দেশে চরকার বহু প্রচলন ছিল এখন প্রতিদিন অনেকটা সময় বসিয়া পরনিন্দায় কাটাইতে পারি কিন্তু তবুও চরকা কাটিতে পারি না, মনের ভাব এমনিই অলস হইয়া গিয়াছে। এই আরামপ্রিয়তা এই শ্রমবিমুখতা হইতে দেশকে ফিরাইতে হইলে, প্রথমে দেশের বড় বড় নেতাকে এই কাজের গৌরব দেখাইয়া দিতে হইবে। তাহাতে তাঁহাদের অনেক অসুবিধা ও কষ্ট হইতে পারে, কিন্তু এই কষ্ট ও অসুবিধার ফল কত বেশী হইবে তাহা ভাবিয়া দেখিলে আর এ কষ্ট ও অসুবিধা স্বীকার করিয়া লইতে আপত্তি থাকিতে পারে না। দেশের জন্য তাঁহারা কারাবরণ করিয়াছেন এবং করিতে প্রস্তুত আছেন, দেশের জন্য তাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন। দেশের জন্য এখন চরকা কাটিতে অল্প কিছু সময় ও শক্তি দান করুন, দেখিবেন, তাহা বৃথায় যাইবেনা। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে সমগ্র দেশ চরকা গ্রহণ করিবে। চরকা বুদ্ধাদের একচেটিয়া, ইহার উপর এই যে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব, তাহা দূর করিয়া দেশকে স্বরাজের দিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া দিতে পারিবেন। কেহ বলিতে পারেন, চরকা সমগ্র দেশের কাপড়ের অভাব মোচন করিতে পারে না। মিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারিবে না। উত্তরে বলা যায় যে পল্লীগ্রামে প্রতি গৃহে কার্পাস গাছ হইলে তাহার তুলা হইতে নিজে সুতা কাটিয়া কাপড় বুনিলে বা বুনাইয়া লইলেও নগদ খরচ মিলের কাপড়ের দাম অপেক্ষা কম পড়িয়া থাকে; ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। কিন্তু অধিকাংশ জায়গায় ইহা অবজ্ঞাত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সম্প্রতি মফঃস্বলে গিয়া আমরা দেখিয়াছি সেখানকার কোন আশ্রমের ছেলেরা বাড়ী বাড়ী কার্পাস বীজ ও চরকা দান করিয়া বেড়ান, কিন্তু অধিকাংশ লোক তাহা গ্রহণ করিতে চাহেন না। ছেলেরা বাড়ীর স্ত্রীলোকদের কাছে গিয়া অনুনয় করিয়াছেন, "বীজ দিতেছি গাছ লাগাইবেন তুলা দিতেছি অবসর সময় সুতা কাটিয়া আমাদের দিলে আমরা কাপড় তৈয়ার করাইয়া দিব।" অধিকাংশ জায়গায় তাঁহারা বিফলমনোরথ হইয়া থাকেন। ইহার কারণ আর কিছু নয়, চরকার উপর বিশ্বাসের অভাব। কংগ্রেসের ও স্বরাজ্যদলের শিক্ষিত সম্মানিত নেতাগণ চরকা কাটিতেছেন দেখিলে ইহা পল্লীতে পল্লীতে অতি সহজে ছাইয়া যাইবে।

একটু সময় ও শক্তি খাটাইয়া অন্ততঃ একটী বিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে পারি, নিজের কাপড় নিজে যোগাইতে পারি, ইহা জানিয়াও শুধু কর্ম্মের গৌরব বোধ না থাকাতে তাহা করি না। অন্ততঃ একটী বিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে পারিলে, নিজের কাজ নিজে করিতে পারিলে ও নিজের অভাব নিজে মোচন করিতে পারিলে আত্মমর্য্যাদা ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়া উঠিবার সহায়তা হয়।

আর একটা কথা। স্বরাজ্য দল বলিয়াছেন বাধ্যবাধ্যকতার কথা থাকিলে তাঁহারা কোন জিনিষ গ্রহণ করিতে পারেন না সেইজন্য এই গঠনমূলক কাজটী গ্রহণ করেন নাই ও করিতে পারেন না। পরস্পরের উপর বিশ্বাস থাকিলে বাধ্যবাধকতা তিক্ত বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক মহাত্মা গান্ধি এসব দেখিয়া ও শুনিয়া তাঁহার প্রস্তাব হইতে শাস্তিমূলক অংশটী বাদ দিয়াছেন। কিন্তু সুতাকাটা চাই-ই, ইহা প্রত্যেক সভ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। এবিষয়ে স্বরাজ্যদল মন দিলে দেশের প্রকৃত উপকার হইবে।

আহমদাবাদ Conferenceএর পর মহাত্মা মর্ম্ম বেদনায় বিদ্ধ হইয়া মনের আবেগে অশ্রুপাত করিয়াছেন। তাঁহার নিজের প্রভুত্ব দেশে কমিল কি বাড়িল, তাহাতে তাঁহার কিছু আসে যায় না। কিন্তু তাঁহার সহকর্ম্মীদের নিকট দেশসেবার আদর্শ নাগপুর হইতে সিরাজগঞ্জে ও পরে আহমদাবাদে কতদূর নামিয়া গিয়াছে তাহা দেখিয়া কঠোর তপস্বী আদর্শবাদী মহাত্মা স্বভাবতঃই বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। পারেনও না।

*　*　*　*

সিরাজগঞ্জের গোপীনাথসাহার সংক্রান্ত প্রস্তাবের পক্ষে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অনেকেই ভোট দিয়াছিলেন। অহিংসনীতির আদর্শ সমাদৃত হইতেছে না ইহা মহাত্মাকে অত্যন্ত ক্লেশ দিয়াছে। তবে যাঁহারা এ বিষয়ে মহাত্মার বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন তাঁহারা অনেকেই Anglo Indian কাগজওয়ালাদিগকে একটা শক্ত জবাব দেওয়ার জন্য এইভাবে ভোট দিয়াছিলেন। দেশবন্ধু দাশ মহাশয় বলিয়াছেন যে তিনি মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব ও স্বরাজদলের প্রস্তাবের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন না। এই কথাটী আমরা কোন মতেই বুঝিতে পারিতেছি না মহাত্মার প্রস্তাবের মূল কথা, গোপীনাথের উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, হত্যাকে কোন মতেই সমর্থন করা যাইতে পারে না, দেশের উপকারের জন্যও না। আর স্বরাজ্যদল বলিতেছেন, হত্যা সত্বেও উদ্দেশ্য যদি মহৎ হইয়া থাকে, তবে সেই উদ্দেশ্যকে সম্মান করিতে হইবে। এই উভয়ের মধ্যে এরূপ আকাশ পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে যে দাশ মহাশয় কিরূপে উভয় প্রস্তাবকে একার্থজ্ঞাপক মনে করেন, বোঝা গেলনা। তবে, একই কথা বড় গলায় জোর করিয়া অনেকবার বলিতে পারিলে লোকে শেষে উহা বিশ্বাসও করিতে পারে, ইহা একটী প্রকাণ্ড রাজনৈতিক চাল ; যদি এই চাল অবলম্বন করিয়া দেশকে তাঁহার অভীপ্সিত পথে চালাইতে চান তবে তাঁহার চালের প্রশংসা করিতে হয়। সকলেই জানেন বারে বারে ও দল বাঁধিয়া বলিতে জানিলে কালোকেও সাদা করা যায়।

*　*　*　*

আহমাদাবাদের ফলে এখন কংগ্রেসে দুই দল হইয়া দাঁড়াইল, অন্যান্য প্রদেশে কি হয় বলা যায় না ; তবে বঙ্গদেশে স্বরাজ্যদলেরই প্রাধান্য থাকিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্বরাজ্যদল যেভাবে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের কর্ম্মপটুতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

বাংলা গবর্ণমেন্টের সঙ্গে স্বরাজ্যদলের যেরূপ পর পর যুদ্ধ (running fight) চলিয়াছে, তাহাতে গবর্ণমেন্টকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইয়াছে। গত কাউন্সিলের অধিবেশনে মন্ত্রীদের বেতন নামঞ্জুর হওয়া সত্বেও গবর্ণমেন্ট যেরূপ ভাবে Reform Actএর মূলনীতিকে (spirit) পদদলিত করিয়া সেই মন্ত্রীদিগকে পদে বাহাল রাখিয়াছেন এবং তাহাদিগকে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার কিছু প্রায়শ্চিত্ত জষ্টিস সি, সি, ঘোষের কোর্টে হইয়া গিয়াছিল। হাইকোর্টের একজন মহামান্য জজ মনে করেন যে গবর্ণমেন্ট আইনবিরুদ্ধ কাজ করিয়াছেন। ইহাতে গবর্ণমেন্টের প্রেষ্টিজ যে কোথায় অবলুণ্ঠিত

হইল, তাহা গবর্ণমেন্ট ভাবিয়াছেন কি? গবর্ণমেন্টপক্ষীয়েরা বলিতেছেন, এই বিষয়ে হাইকোর্টের বিচার করিবার কোন ক্ষমতা নাই; যদি তাই-ই হয় তবে এ বিষয়ে আইনের ঠিক অর্থ জানিবার জন্য Advocate Generalএর মত লওয়া হইয়াছিল কেন? দেখা যায়, আইনের ঠিক অর্থ কি সে বিষয়ে গবর্ণর বাহাদুরেরই কিছু সন্দেহ ছিল; তবে তিনি বিলাতে সলিসিটার জেনারেলের মত আনাইলেন না কেন? লর্ড রোনাল্ডসের সময় ঠিক এরূপ বিষয়ে এডভোকেট জেনারেলের মতের বিরুদ্ধে সলিসিটার জেনারেল মত দিয়াছিলেন এবং সলিসিটার জেনারেলের মতই প্রবল হইয়াছিল। এ অবস্থায় যদি এডভোকেট জেনারেলের মতের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের জজের মত গ্রহণ করা হয় তবে দোষ কোথায়? Executive গবর্ণমেন্ট যদি ব্যবস্থাপক সভায় নিয়মাবলী যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করিতে পারেন, তবে হাইকোর্ট সে বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়া আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন না কেন?

* * * * * *

মিঃ জষ্টিস ঘোষের বিচারের পর যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, ও আপীল কোর্টে মোকদ্দমা চলিবার পর গভর্ণমেন্ট যে ভাবে নূতন নিয়ম জারী করিয়া সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—তাহাতে, গভর্ণমেন্ট জষ্টিস ঘোষের বিচার ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। যদি পুরাতন নিয়ম অনুসারে প্রেসিডেন্টের কাজ যুক্তিসঙ্গত হইয়া থাকে, তবে তাহার বিচার আপীল কোর্টে নিষ্পত্তি হইবার আগেই গভর্ণমেন্ট নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতেন না। এই ভাবে শেষ মুহূর্ত্তে নিয়ম করাতে গভর্ণমেন্ট মোকদ্দমার হাঙ্গাম ও বিচারের ফলাফলের অনিশ্চিততার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে গভর্ণমেন্ট কিংবা মন্ত্রীদিগের কতদূর মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইয়াছে আমরা জানি না। মন্ত্রীদিগের উপর অনাস্থা (No confidence) প্রকাশের পরেও তাঁহাদিগকে বাহাল রাখিবার জন্য গভর্ণমেন্টের দরদ দেখিয়া সন্দেহ হয় যে তাঁহারা Reform Act অনুসারে জনসাধারণের লোক (member responsible to the people), না গভর্ণমেন্টেরই অন্যতম কর্ম্মচারী? যে দায়িত্ব (Responsibility) প্রবর্ত্তন করিবার জন্য মন্ত্রী পদের উৎপত্তি তাহার সার্থকতা কোথায়?

* * * * * *

২৬শে আগষ্ট আবার কাউন্সিলের বৈঠক বসিবে। সম্ভবতঃ তাহাতে আবার মন্ত্রীদের বেতন Supplementary বজেট হিসাবে পেশ হইবে। একবার সেই বজেট স্বরাজ্য ও ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্টদল নামঞ্জুর করিয়াছেন। বিগত ঘটনাবলী বিচার করিলে নিশ্চিতই আশা হয় যে এবারেও বজেট পাশ হইবে না। তাহা হইলে গভর্ণমেন্ট কি করিবেন? বাঙ্গালাদেশে এইবারে Dyarchyর শেষ পরীক্ষা হইবে। এই উপলক্ষে আগামী কাউন্সিলের উপর অনেক কিছু নির্ভর করিতেছে। যে উদ্দেশ্য লইয়া স্বরাজ্য পার্টি কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়াছেন, এ বার তাহারই শেষ মীমাংসা হইবে। যদি গভর্ণমেন্ট কাউন্সিল হইতে বজেট পাশ করাইতে পারেন, তবে মন্ত্রীদিগের বাহাল থাকিবার আর কোন বাধা থাকিবে না। যদি না পারেন, তবে প্রশ্ন উঠিবে এমন কেহ আছেন কি না, যাঁহারা মন্ত্রীপদ পূর্ণ করিতে পারেন ও যাঁহাদের উপর কাউন্সিলের আস্থা আছে। সমস্ত ঘটনা আলোচনা করিলে তাহার সম্ভাবনা নাই বলিয়াই মনে হয়। গত ২৫শে জুলাইএর Forward পত্রিকায় মিঃ দাশ যে ইস্তাহার জারি করিয়াছেন তাহাতে তিনি Dyarchy is Dead বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাহাতে স্বরাজ্য পার্টির অভিপ্রায় পরিষ্কার বোঝা গিয়াছে। তখন গভর্ণমেন্টকে বিচার করিতে হইবে যে বাংলা দেশে মন্ত্রীত্ব থাকিবে কিনা। এবারে সেই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। বড় লাটের সঙ্গে এই বিষয় নিয়াই প্রাদেশিক গভর্ণরদের বৈঠক বসিতেছে। এবারে তাহার মীমাংসা হইবে। আগামী কাউন্সিলে বাংলার প্রতিনিধিগণ যাহা করেন, তাহার উপর সমস্ত নির্ভর করিতেছে।

শ্রীফুল্লনলিনী রায়চৌধুরী সম্পাদিত

ক্যালকাটা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,—৬৫ নং সার্পেণ্টাইন লেন, কলিকাতা হইতে

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচী

ক্যালকাটা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,—৬৫ নং সার্পেণ্টাইন লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত এম্ এ কাব্যতীর্থ

প্রণীত

১। বিবেকানন্দচরিত ... ... ।/০

"Received with many, many thanks the brochure— Vivekananda Charita. It is so very interesting that I read the whole of it at a stretch....................The style of the work from start to finish is pure, elegant and vigorous......................Your review on the assets of Vivekananda in the last chapter of the book is highly laudable and instructive."—

From the Raja Bahadur, Feudatory State of Hindol.

২। আরোগ্য-দিগ্দর্শন

বা মহাত্মাগান্ধীর মূল গুজরাতী

স্বাস্থ্যনীতি পুস্তকের বঙ্গানুবাদ ॥০

"Prof. Sen in his lucid style has made the Bengali edition all the more interesting."—Amrita Bazar Patrika, March 25, 1923.

"বইখানির ভিতর সহজ ব্যবস্থাও এমন অনেক আছে যাহা সহজেই অনুসৃত হইতে পারে এবং দেহের ও মনের পুষ্টিসাধনের পক্ষে যাহাদের উপযোগিতাও কম নহে। .... আরোগ্য-দিগ্দর্শনের অনুবাদকের ভাষা ভাল—বেশ সহজ এবং প্রাঞ্জল, মোটেই অনুবাদের মত মনে হয় না।" প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২৯।

প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব,

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, অথবা বিচিত্রা প্রেস, ৩১নং ব্রজনাথ দত্তের লেন, কলিকাতা।

পোলাও মূল্য ১।০

সুকবি বেনোয়ারীলাল প্রণীত। অর্দ্ধশিক্ষিতের জন্য ইহা নহে প্রাপ্তিস্থান কলিকাতা মৃজাপুর লেন Universal Book Depot ও গাইবান্ধায় আমার নিকট। বঙ্গবাণী জড়িমাজড়িত ভাষায় গাল দিয়াছেন। বঙ্গবাণী হইতে মুক্ত দীনেশ অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক অক্ষয় বলেন "লোকে এখন পোলাও চায় না এখন লোক চায় চানাচুর্‌র্‌র্" বঙ্গবাণী, মানসী ও বঙ্গবাসীতে তিনজন সাহিত্যরথ ইহার সৌন্দর্য্যবিশ্লেষণ করিয়াছেন।

শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ গোস্বামী।

গাইবান্ধা।

নব্যভারত

ংশ ভাদ্র, ১৩৩১ [৫ম সংখ্যা

চীন ও জাপানে ভারতের বাণী

আমাকে অনেকে অনুরোধ করেছেন যে আপনাদের কাছে চীন ও জাপান ভ্রমণের বিবরণ কিছু বল্‌তে হবে। এইজন্যই আমার বন্ধুরা এই সভা আহ্বান করেছেন। আমি যে ঠিক এ সভায় বক্তৃতা দেবার জন্য প্রস্তুত, এ কথা স্বীকার করতে পারিনে। আমার মন প্রস্তুত হয় নি; তার কারণ প্রথমতঃ এই যে, চীন ও জাপানে যে কাজে আমি আহূত হয়েছিলেম, তাতে নিজে বিশেষভাবে ব্যাপৃত থাকায় চারিদিকের সমস্ত অবস্থা দেখ্‌বার অবকাশ আমার হয়নি। আমার সঙ্গী বন্ধুরা যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিলেন—সে দেশ ও সে দেশের লোকের সঙ্গে পরিচয় বিস্তারিত করবার তাঁদের যথেষ্ট সময় ছিল। আমাকে আমার বিশেষ কাজে ব্যাপৃত থাকৃতে হওয়ায়, আমি ভাল করে সেখানকার দর্শনীয় সমস্ত দেখেছি একথা বল্‌তে পারিনে। সে দেশের সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশে তাদের অন্তরের কথা জান্‌বার সুযোগ আমি পাইনি। আমার পক্ষে আমার কর্ত্তব্য পালনই দুরূহ ছিল। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আপনাদের মধ্যে অনেকে আজকের দিনে আমার ভ্রমণ বিবরণ শুনতে উৎসুক হয়ে এসেছেন মনের ভিতরে একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। এ কথা আমি বুঝতে পারছি যে আমার এ ভ্রমণের ভিতরে আমাদের ভারতবর্ষের কোন গৌরবের কথা আছে কি না সেইটাই আপনারা শুনতে উৎসুক। কেউ কেউ বোধ হয় ভাব্‌ছেন যে এসিয়ার নানা দেশকে এক করতে পারলে আমাদের শক্তিবৃদ্ধি হতে পারে—সে প্রয়োজনে আমার ভ্রমণ কোন সহায়তা করেছে কি না একথা আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আমি বলতে চাই, এরকম কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি যাইনি। স্বদেশের গৌরব প্রখ্যাত করবার জন্য অন্য দেশে যাবার কোন প্রয়োজন আছে এ আমি মনে করিনে। আমি যা বলব তা' হয়ত আপনাদের ইচ্ছার সঙ্গে মিলবে না।

আমি বল্‌ছিলাম স্বদেশের বিশেষ কোন গৌরব ঘোষণা করবার জন্য, অন্যদেশে গিয়ে ভারতের জয়কীর্ত্তনের জন্য আমি চীনে যাইনি। যাঁরা আমাকে

ডেকেছিলেন, আমার প্রতি তাঁদের একটা শ্রদ্ধা ছিল; মানুষের কাছে মানুষ যেমন সাহায্য পায় তেম্‌নি সাহায্য চেয়ে তাঁরা আমাকে ডেকেছিলেন। আমিও সহজ মানুষের মত সে দেশে গিয়েছিলেম। ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে এসিয়াকে একত্র করবার জন্য আমি যাইনি। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সহজ সম্বন্ধ তেমনি ভাবে গিয়েছিলেম। সেইজন্য তাঁরাও আমাকে সহজে গ্রহণ করেছেন। Propaganda বা প্রচারের উদ্দেশ্য মনে নিয়ে গেলে সহজ সম্বন্ধ স্থাপনের পক্ষে তা' অন্তরায় হ'ত; প্রচারের ইচ্ছ মাত্র আমার ছিল না।

চীন সম্বন্ধে আমার বহুদিনকার একটি কল্পনা ছিল। সর্ব্বপ্রাচীন সভ্যতা রয়েছে চীনদেশে। সেই সুপ্রাচীন সভ্যতার প্রাণশক্তির স্থান কোথায় তা আমি জান্‌তে চেয়েছিলেম। যে কোন দেশেই মনুষ্যত্ব আপনার প্রাণকে জয়ী করেছে—বর্ব্বরতার মধ্যে দিয়ে নয়—সে দেশের মানুষের একটা গৌরব আছে, তাদের সভ্যতার একটি শক্তি আছে। যুগযুগান্তরের বিপ্লব বিরোধ অগ্রাহ্য করে চৈনিক সভ্যতা যে আপনার বিপুল প্রাণকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে এ একটা দেখ্‌বার জিনিষ। যেমন তীর্থে দেবতাকে অনুভব করা যায় ভক্তির সাহায্যে, তেমনি শ্রদ্ধার ভিতর দিয়েই একটা জাতির বিরাট সঞ্জীবনী শক্তিকে অনুভব করা যায়। তার বেদী, তার মন্দির দেখে আমি ধন্য হব এই আমার মনের ইচ্ছা ছিল। আমি সে দেশকে কিছু দেব একথা আমার মনে ছিল না।

এই নূতন দেশে যাওয়ার একটা বাধা আছে। এর ভিতরে বহু যুগযুগান্তরের প্রবাহিত প্রাণধারা বিচিত্রভাবে কাজ করচে, কত বাধা বিকৃতির ভিতর দিয়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে সাহিত্যে, কাব্যে, চিত্রে, ধর্ম্মে ও সমাজে। কিন্তু কত বড় একটা পর্দ্দা রয়েছে আমাদের মাঝখানে—ভাষা ভিন্ন, প্রকৃতি ভিন্ন, চেহারাও ভিন্ন। সমস্ত প্রাচীন আচার ব্যবহার অতিক্রম করে জাতির অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে—এই ছিল আমার সঙ্কল্প। এর একমাত্র উপায় ছিল অন্তরের ভিতরে শ্রদ্ধা নিয়ে নত হয়ে যাওয়া। মাথা তুলে গেছে মিশনরীরা, বলেছে, 'আমরা তোমাদের চেয়ে উঁচুতে আছি, তোমাদের কিছু দিতে এসেছি।' অন্য দেশের লোককে এ রকম অপমান করার অধিকার কারো নেই। কোন বিষয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠতা বা গৌরব থাকলেও যে জাতি যুগযুগান্তরের বিরুদ্ধতা বহন করে আজ পর্য্যন্ত সজীব রয়েছে, তার মাহাত্ম্য ভক্তির যোগ্য, তার ভিতরে একটি দৈবীশক্তি আছে। ভগবান কিরূপে তাঁর বহুধা শক্তি বহুবিস্তৃত করেছেন তা দেখ্‌তে পেলে জগতের একটা বিশেষ সত্য উদ্ঘাটিত হবে। কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য থাকলে কেউ কখনো কোন জাতির অন্তরের মধ্যে প্রবেশ পারবেন না। আমি নত হয়ে সহজ মানুষের মত গিয়েছিলেম; গিয়ে সেখানকার বন্ধুদের আতিথ্য দেখে আমি বিগলিত হলেম। তাদের আমি বল্‌লেম, 'তোমরা আমাকে দার্শনিক মনে করেচ, Prophet বা ঋষি মনে করেচ; দেশবিদেশে আমার এ মিথ্যা বর্ণনার জন্য আমি লজ্জিত; আমার কাছে তোমরা কিছু প্রত্যাশা কোরো না। শুধু কবিরূপে আমি তোমাদের নিকট আস্‌তে চাই; বেদীতে আরোহণ করে উপদেশ দিতে আমি চাই নে।' তারা বল্‌লে, 'তুমি ভারতের লোক, তত্ত্বজ্ঞানের বোঝা ঘাড়ে করে তুমি এনেছ।' আমি বল্‌লেম,

'আমি কিছুই জানিনে। প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে হৃদয় দিয়ে প্রবেশ করবার পাথেয় ভগবান আমাকে দিয়েছিলেন। তাতে যদি না হয় তবে আমার আর কোন সম্বল নেই'। এর পূর্ব্বে পশ্চিম থেকে অনেক বড় বড় তত্ত্বজ্ঞানী শিক্ষক নিমন্ত্রিত হয়ে চীনদেশে গিয়েছিলেন। তাঁরা সব চিন্তাশীল লোক—Bertrand Russell, Dewey—তাঁরা তাঁদের নানারকম জ্ঞানের অর্ঘ্য আহরণ করে চীনের যুবকদের উপর গুরুগিরি করে এসেছেন, স্কুলের চেয়ারে বসে। যে কথা তাঁরা ভাল মনে করেন তা বলেছেন, অনেক রহস্যময় কথাও বলেছেন। আমি যখন চীনে নিমন্ত্রিত হলেম তখন আমার মনের ভিতরে একটা ভাবনা হল যে সেই আসনে বসে আমি তাদের কি দেব। আমি বল্‌লেম, 'আমার কাছ থেকে কিছু নিতে হলে এগিয়ে এসে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করতে হবে। এম্‌নি করেই কবির সঙ্গে মাল্যবিনিময় হয়। আমি ভারতের তত্ত্বজ্ঞান ও ঋষিদের বাণী কিছুই দিতে পারব না।' তারা একথা স্বীকার করে নিল, খুসীও হল। তাদেরও যেন একটা ভাবনা চলে গেল। তারা যদি মনে করে যে তাদের মধ্যে একজন অতি-মানুষ ঋষি গভীর জ্ঞান নিয়ে এসেচেন, তা'হলে সহজে তারা স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে না। তাঁর সাম্‌নে হাস্‌তে, কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে, তাঁর ঘরে আস্‌তে তাদের ভয় হয়। কাজেই আমার কথা শুনে তারা যেন বাঁচলে, বল্‌লে, 'তুমি আমাদের আপনার লোক'। আমি বল্‌লেম, 'আপনার লোক হয়েই আমি তোমাদের মাঝে থাক্‌ব। তোমরা যদি আমাকে শুধু ভারতের কবিরূপে না দেখে, চীন জাপানের কবিরূপে, এসিয়ার কবিরূপে দেখতে পাও, তবে আমি তাই সবচেয়ে বড় পুরস্কার বলে মনে করব। গুরুগিরি করতে আমি আসিনি, সে আমি পারব না।'

আজকে আমার এই ভূমিকায় যা বল্‌লাম সে কথা মনে রেখেই আমি কাজ করেচি। চীনের অল্পবয়স্ক যুবকেরা আমাকে তাদের বয়স্য বলে জেনেছে। তারা খবর পায়নি যে ৬৩ বছর আমার উপর দিয়ে গিয়েছে। অতি সহজে তারা আমাকে ভালোবেসেচে—যথার্থ অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে। মাষ্টার বলে আমাকে জানেনি। সেইটেই হচ্চে আমার সবচেয়ে বড় সফলতা। যারা আমাকে ডেকেছিল তারা বলেছিল যে সেখানে আমাকে বক্তৃতা দিতে হবে। আমি দেশে থাকার সময় ভেবেছিলুম যে কয়েকটা বক্তৃতা লিখে প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে। সে বিষয়ে আমার মনে একটা সঙ্কোচ ও উদ্বেগ ছিল। কিন্তু যাবার পূর্ব্বে এমন একটা মুস্কিলে পড়েছিলেম যে কিছুতেই আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মন স্থির করতে পারলেম না। আমার পক্ষে একটা দুরূহ অন্তরায় হয়েছিল,—আপনারা হয়তো শুনে হাস্‌বেন—যে তখন প্রতিদিনই একটা গানের নেশা আমাকে পেয়ে বস্‌ত। সেই গানের বোঝা আমাকে পিছিয়ে দিচ্ছিল ক্রমাগত। জাহাজে উঠে ভাব্‌লুম, না, আর দেরী নয়। সমুদ্রযাত্রার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন জাহাজের ক্যাবিনে বসে কোন কিছু রচনা করা একরূপ অসম্ভব। কিন্তু সে কৃচ্ছ্রসাধনও আমি করেচি। জাহাজে আমি কিছু লিখে নিলেম।

প্রথম যেখানে আমি নাব্‌লুম, সে হচ্চে রেঙ্গুন। রেঙ্গুন ব্রহ্মদেশে নেই—সেখানে আর সব লোক আছে, নেই শুধু ব্রহ্মদেশের লোক অনেক চীনবাসী সেখানে আছে।

রেঙ্গুনপ্রবাসী ভারতীয়েরা উচ্চকলস্বরে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন—অবশ্য তাঁরা না করলেও কোন ক্ষতি ছিল না, কেননা, আমি তখন ঠিক তাঁদের অতিথি নই। কিন্তু চীনের লোকেরা যখন আমাকে আমন্ত্রণ করে অভ্যর্থনা করলেন তখন আমি মনে তৃপ্তিলাভ করলুম। সেই আমার চীনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। রেঙ্গুনে একটা চীনা বিদ্যালয় আছে—তার যাঁরা অধ্যক্ষ তাঁরা আমাকে সম্বর্দ্ধনার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তাতে আমি বড় আনন্দ পেয়েছিলেম, সেখানে সহজ আত্মীয়তার প্রথম স্বাদ লাভ করেছিলেম। তাঁরা আমাকে ডেকে, চা খাইয়ে, আদর করে বল্লেন, 'চীনের প্রতি তোমার যা বক্তব্য তা আমাদের বল। কেননা সেখানকার অনেকেই ইংরেজী জানে না। আমরা অনুবাদ করে পাঠিয়ে দেব।' আমি দেশবিদেশে অনেক জায়গায় বক্তৃতা করতে গিয়েছি, সম্মানও পেয়েছি। কিন্তু একটি কারণে চীন আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। আমি জান্‌তেম যে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সংস্পর্শ তা' আমি পাব। আমার কাছে প্রাচ্যদেশের নিমন্ত্রণই সত্য আতিথ্য। এখানে শুধু করতালি নয়, শুধু আর্থিক পুরস্কার নয়, নিমন্ত্রণকর্ত্তার হৃদ্যতা লাভ করব। আমি তাদের বল্লেম, 'তোমরা যারা আমার শ্রোতা ও সম্মানকর্ত্তা তাদের আমি জানাচ্ছি—মানুষ আপনার ঘরে আদর অভ্যর্থনা পেয়ে থাকে, তিক্ত ব্যবহারও যে না পায় তা নয়; কিন্তু যাদের সঙ্গে জাতিগত যোগ নেই, ভাবে ভাষায় যারা পৃথক, সেখানকার আত্মীয়তার অমৃতধারা উৎসারিত হয় মনুষ্যত্বের উৎস থেকে। সর্ব্ববিধ কুহেলিকা ভেদ করে মনুষ্যত্বের এই স্বাভাবিক অন্তর্নিহিত জ্যোতি যে ভোগ করতে পারে সে ধন্য। আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এই যে, যারা পরদেশবাসী, ভিন্নভাষাভাষী, তারা যেন আমাকে তাদের আপনার লোক বলে জানে, তাদের হৃদ্যতা যেন আমি লাভ করতে পারি। এর চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই, এইটুকু পেতেই আমি যাচ্ছি।' আমার কথায় তারা খুসী হ'ল।

তারপর এই ব্রহ্মদেশের চীন সমাজের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা মালয়-উপদ্বীপে উপনীত হলেম। সেখানে কতকটা স্বদেশবাসীদের সঙ্গেই আমার মিলন হয়েছিল। আমি অনেক দেশে ভ্রমণ করেছি, কিন্তু মালয়ে একটা খুব আশ্চর্য্য জিনিষ দেখেছিলেম যা আমাকে খুব আনন্দ দিয়েছে। ঐখানে একটা 'ঘাট', সেখান থেকে চীন, জাপান, জাভা অষ্ট্রেলিয়ায় আনাগোনা চলে। কাজেই ওখানে নানাজাতের সমাবেশ আছে। কিন্তু সেখানে পরস্পরের মধ্যে কোনপ্রকার বিদ্বেষবুদ্ধি জাগেনি। সেখানে য়ুরোপীয়দের মধ্যেও একটা নম্রতা আছে ও সে-দেশবাসীদের প্রতি তাদের কোন বিরুদ্ধভাব নেই। একটা ভাব্‌বার কথা আছে। চীনদেশ হতে বহু শ্রমজীবী এসে সমস্ত মালয় অধিকার করেছে। মালয়বাসীরা পরিশ্রমবিমুখ—এতে তাদের দোষ নেই; তারা অর্থের জন্য মাথা বিকোয় নি, অল্পেই তারা সন্তুষ্ট। অর্থের জন্য যারা মালয় উপদ্বীপে যায় তারা এদের উপর বড় রাগ করে, বলে যে তারা শ্রমবিমুখ, এদের দ্বারা তেমন আয় হয় না। ওখানে দু'দল লোক কাজ করে—চীনের লোক ও ভারতের লোক। ভারতীয়েরা অধিকাংশই সব মাদ্রাজী ও পাঞ্জাবী শিখ। চীনেরা সব দক্ষিণ চীনের—ক্যান্টনীজ। দেখা যায় যে এমন চীনের লোক সেখানে নেই যে কোন হীন কর্ম্ম করে সমাজে নীচু হয়ে আছে। তারা দরিদ্র অবস্থায় ঘর ছেড়ে বিদেশে এসে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, জমি কিনেছে,

রবারের চাষ করেছে, ঐশ্বর্য্যের যা চিহ্ন—গাড়ী জুড়ী সব করেছে। কিন্তু এসেছিল তারা অকিঞ্চন ভাবে।

এই এক চেহারা। আর একদিকে মাদ্রাজীরা, তারা সেখানে কুলি হিসাবে ভারতের পরিচয় দিয়েছে; তাই সবার অবজ্ঞাভাজন। ৭০ সেণ্ট দিন-মজুরী নিয়ে যে খাটে সে ৪০ সেণ্ট পায়, আর ৩০ সেণ্ট নিয়ে যায় কুলী-সর্দ্দারেরা, তাদের নিজেদের দেশের লোক। কুলিরা চিরজীবন খেটেই মরে, এমন উদ্বৃত্ত তাদের থাকে না যাতে তারা স্বাতন্ত্র্য লাভ করতে পারে বা ছেলেদের শিক্ষা দিতে পারে। এজন্য পুরুষানুক্রমে তারা দাস্যবৃত্তিতে বদ্ধ। আমার বন্ধু Andrews সাহেব এদের দুর্দ্দশা দূর করবার অভিপ্রায়ে এখন মালয়দ্বীপে আছেন, তিনি হয়তো মালয়ের মহাজনদের গাল দেবেন। এ-রকম গাল দিতে ভালোও লাগে, কিন্তু গাল দিয়ে কোন লাভ নেই। ধনিকদের দয়াদাক্ষিণ্য শেখালেও এদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হবে না। চিরদিন কৃপার ভিখারী হয়েই এরা থাকবে—সেও কম হীনতা নয়। এরা পরস্পরকে সাহায্য না করে পরস্পরকে শোষণ করতেই ব্যস্ত থাকে। দুদিক থেকে এরা শোষিত হয়, এক উপর থেকে, আর নিজেদের ভিতর থেকে। একত্র হতে না পারলে বিধাতাও এদের বাঁচাতে পারবেন না, চিরদিন কুলি থেকে তারা ভারতের পরিচয় কলুষিত করবে। তারপর শিখেরা। তারা গিয়েছে রাজশক্তির পিছনে পিছনে—দলন করবার হেয় কাজ ছিল তাদের উপর। দাস্যবৃত্তির সঙ্গে ক্ষমতার অভিমানের মত, ধার-করা প্রভুত্ব নিয়ে শক্তির অপব্যবহারের মত, বিষময় বীভৎস জিনিস আর নেই। এদের চেয়ে কুলিরাও বরং ভালো। ভারতবাসীর এই পরিচয় বিদেশে। চীনেরা শিখদের যেমন ঘৃণা করে এমন আর কাউকে নয়—শিখ কনেষ্টবলরা চীনেদের টিকি ধরে অনবরত লাথি মেরেছে, যা ইংরেজ কনেষ্টবলরাও করেনি। আমার হৃদয়ে এ' যা বিদ্ধ হয়েছিল সে আর কি বল্‌ব—কত বড় কলঙ্ক এতে! ওখানকার গুরুদ্বারেতে শিখদের আমি বল্‌লেম, 'তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ভারতের সঙ্গে চীনকে নাড়ীর সম্বন্ধে বেঁধেছিলেন, রাষ্ট্রীয়সূত্রে নয়। প্রেমের ঐশ্বর্য্য ছড়িয়ে দেবার জন্যে তাঁরা মরু সমুদ্র পার হয়ে চীন জাপানে গিয়েছিলেন। তাঁদের মুখে তোমরা লজ্জা দিলে। গুরুদ্বার কিসের জন্য? নানকের প্রেমের মন্ত্রে এর প্রতিষ্ঠা। গুরুদ্বারে যদি সে বাণী তোমরা বহন করে না আন, তা' হলে সবই বৃথা। সব আপনার লোককে তোমরা অপমান করে গেলে, এসিয়াবাসীর সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে দিলে।' একথা আমি তাদের বলেছি।

দুদিকে দুঃখ—প্রভুশক্তি দাসকে অবলম্বন করে আপনার বীভৎসতা প্রকাশ করছে; আর একদল কুলিরূপে আপনার সব মহিমা লুপ্ত করেছে। দুদিক থেকে এই দুই অন্ধকার ভারতবর্ষ বিদেশে প্রেরণ করছে। চীনেতে কিন্তু ভারতবাসীদের দাসভাবেতেও থাকবার যো নেই। চীনেদের সঙ্গে কৌশল বা শ্রমের প্রতিযোগিতায় কেউ পেরে উঠবে না। ওদের সনাতন ধর্ম্ম ও শিক্ষার ফলে এরা একান্ত শ্রমিক, এদের মত কর্ম্মনিষ্ঠ জাত্ জগতে নেই। এজন্যই আমেরিকায় চীনবাসীদের যেতে দেয় না—না যেতে দেওয়ার কারণ এ নয় যে ওদের বাঁকা চোখ বা চ্যাপ্টা নাক—ওদের সকলে ভয় করে। ওরা যথেষ্ট পরিশ্রম করতে ও অল্পব্যয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারে। যে কেউ একবার চীনের ধারে

গিয়েছেন হংকংয়ে বা সাংহাইয়ে, তিনি দেখেছেন এমন অসামান্ত নিয়ত কাজের অভ্যাস কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। জাতির এ একটা মস্ত সম্পদ। কিন্তু একটু সন্দেহও হয় মনে; যে কোন জাতি তার একটা বিশেষত্বকে অতি মাত্রায় প্রবল করে তোলে, তাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব থাকে ও তারা অন্য সকলের ব্যবহারে লাগে। যেমন মানুষ কেরোসিনের খনির দিকে ঝোঁকে, তার ভিতর যে স্বাভাবিক শক্তি আছে তা' কাজে লাগাবার জন্য। সব ধনিক চীনে যায় তার resources—প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য—গ্রহণ করে ভোগ করবার জন্য। য়ুরোপ ও আমেরিকার সব জায়গায় শ্রমিকের দাবী বেশী, তারা অবসর চায় ও মানুষের যা প্রয়োজন সেখানে তার দাবী মিটাতে হয়। চীনেতে মানুষ একটা বিশেষ শক্তি-রূপে প্রকাশমান, যেমন তেল, কয়লা ইত্যাদির মত। শ্রমশক্তি সেখানে বহুদিন থেকে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। এটা ধনিকদের কাছে একটা লোভনীয় জিনিষ। যেমন ধরুন ভারতের গুর্খারা; তারা মানুষ মারার প্রবৃত্তি ও কৌশল চর্চ্চা করে মনুষ্যঘাতকরূপে বিশেষত্ব লাভ করেছে, সেই জন্য ওদের এই দুর্দ্দশা। অন্যেরা ওদের শক্তিকে বারুদ ও ইস্পাতের মত ব্যবহার করে—তৈরী করা মাল। ওরা আবার বড়াই করে 'আমরা লড়াই করি, মানুষ মারি, বাঙ্গালী কেবল কলম পিষে।' ওদের কোন বিচার নেই, যেখানেই লড়াই হোক কামান বন্দুকের মত ওরা মানুষ মারে। যারা মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করে একটা কোন বিশেষ গুণকে বিকশিত করে তারা একটি লোভের সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায়—যেমন মৌমাছিরা যে মধু সঞ্চয় করে তা আমরা নিই। এ-জন্য যারা প্রয়োজনের অধিক সঞ্চয় করে তারা চোরকে প্রশ্রয় দেয়। অন্য সব দেশের লোক এসে চীনদের শ্রমশক্তিকে কসে দোহন করছে। তারা পয়সা পায় বটে, কিন্তু তা' তাদের মনুষ্যত্বকে বিক্রী করে'। চীন-সমাজতন্ত্র পল্লীতে পল্লীতে ব্যাপ্ত। বিদেশীরা পল্লী থেকে শিকড় তুলে চীনেদের সহরে এনে তাদের দাসত্বে নিয়োগ করচে; মালয়দের কিন্তু তা পারে নি। আমি অবশ্য সবাইকে মালয়ীদের মত অলস হতে বলছি নে। তবে এর মধ্যেও একটা জিত আছে। মালয়ীরা অল্পে সন্তুষ্ট, অবশ্য এজন্য তাদের মধ্যে দৈন্য ও অসম্পূর্ণতা আছে। কিন্তু মালয়ে যারা রবারের চাষ করে বড় হতে আসে, তারা মালয়ীদের ব্যবহারে লাগতে পারেনা। মাদ্রাজীরা এই কাজে তাদের মনুষ্যত্ব উৎসর্গ করেছে। যদিও আমার প্রশংসা করবার ইচ্ছা হয়েছিল তবু আমি চীনবন্ধুদের বলেছি যে একটা জাত্‌কে একান্তভাবে এত পরিমাণে হাতের কাজে গড়ে তোলাটা ভালো নয়।

হংকংয়ে চীনবন্ধুরা কেউ আসেননি। রেঙ্গুন যেমন ব্রহ্মদেশে নেই, হংকং তেমন চীনদেশে নেই—সেখানে গৃহকর্ত্তা চীনেরা নয়। সান-ইয়েৎ-সেনের নিকট হতে একজন দূত আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি বল্লেন—'আপনি দেশবিদেশে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। চীনদেশে আপনার আলাপ করবার উপযুক্ত লোক—ডাঃ সান-ইয়েৎ-সেন। তাঁর সঙ্গে আপনি চীনের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করুন।" আমার তখন সময় ছিলনা, আমি অন্যত্র প্রতিশ্রুতিতে বদ্ধ ছিলাম, পিকিংয়ে আমার চীনা বন্ধুরা আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমি বলে দিলুম, 'হয়তো ফেরবার পথে দেখা হবে।' সাংহাইয়ে গিয়ে দেখি বন্ধুরা ডকে দাঁড়িয়ে। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন যিনি

পরে আমার ইংরেজী বক্তৃতা চীনভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর সৌম্যমূর্ত্তি, দীর্ঘদেহ, শুভ্রবর্ণ চীনবেশ আমাকে আশ্চর্য্য করেছিল; তাঁর শ্রী ও সৌহার্দ্দ্যে আমি মুগ্ধ হয়েছিলেম। তিনি সর্ব্বদাই আমার সাহচর্য্য করেছেন। আমার বক্তৃতা ব্যাখ্যা করে দেবার ভার তাঁর উপরে ছিল। কিরকম অভ্যর্থনা সেখানে পেয়েছিলেম তা আমি বল্‌তে চাইনে, আমার সঙ্গে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা বলবেন। তবে এইটুকু বল্‌ব যে—আমাকে তারা ডেকেছিল আমার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ছিল বলে, আমি যে আহূত অতিথি একথা তারা ভোলেনি, অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করেছে। হৃদ্যতার এই ঐশ্বর্য্য, প্রাচুর্য্য অতি মনোরম জিনিষ। আমেরিকার লোকেরাও আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে, সম্মান করেছে, কিন্তু আতিথ্যের হৃদ্যতা, মানুষ যে আমাকে মানুষের ঘরে ডেকেছে এ আমি তাদের দেশে সে পরিমাণে অনুভব করিনি। ব্যক্তিবিশেষের কাছে আদর অভ্যর্থনা পেয়েছি বটে। সাধারণের কাছ থেকে পেয়েছি আমার বক্তৃতার আর্থিক মূল্য। চীন ও জাপানের লোকেরা ভাল ইংরাজী বোঝে না, সাহিত্যক্ষেত্রে আমার প্রতিষ্ঠার কথা তারা বিশেষ জানেনা, শুধু জানে যে ভারতের অতিথি এসেছেন। আমি তাদের কাছে মানুষ হিসাবে মানুষের আদর পেয়েছি। আমার সঙ্গে অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন, চিত্রীবর নন্দলাল বসু, ঐতিহাসিক কালিদাস নাগ গিয়েছিলেন —তাঁরা তো বরযাত্রীদের মত আহার অভ্যর্থনা আদর আপ্যায়ন লাভ করেছেন। কোথাও যেতে হলে তাঁদের গাড়ীভাড়া লাগেনি। সঙ্গে সৈন্যদল থাক্‌ত তাঁদের রক্ষার জন্য, রাত্রে ষ্টেশনে ষ্টেশনে সৈন্যাধ্যক্ষ এসে খবর নিতেন; তাঁদের কেউ কেউ তো সৈন্যদের দেখে ভীতই হয়ে পড়তেন। গভর্ণররা আমাদের খবর নিয়েছেন, আমন্ত্রণ করেছেন। চীনেদের আত্মীয়তার আকর্ষণ আমার হৃদয়কে মুগ্ধ করেছে। আমি ভেবেছিলুম যা লিখে নিয়েছি তাই পড়বো, কিন্তু দেখলুম ফল হবে না, এরা বুঝবেনা। তাদের অত দায় নেই যে ইংরেজী না জান্‌লে জাত হারাবে, ইংরেজী জানে না বলে আপনার প্রতি অবজ্ঞাও তাদের নেই। অল্প লোকেই ইংরাজী জানে। খুব সরলভাবে বল্‌লেও ওরা বুঝে কি না সন্দেহ। আমারও ইংরেজীর সম্বল অল্প, কাজেই আমার কাজ খুব সোজা হয়ে গেল।

আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ শুনে খুসী হবেন সেখানেও আমাকে আক্রমণ করেছে, নিছক সম্মান আমি পাইনি। একদল—অবশ্য আমার তরফ থেকেও বলবার আছে যে তারা দলে খুব ভারী নয়—বলেছে যে এ লোকটা এসেছে আমাদের মাথা খারাপ করবার জন্য। ভারত আমাদের যা দিয়েছে তাতে আমাদের ক্ষতিই হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম্ম আমাদের হিংস্র প্রকৃতি কমিয়ে দিয়েছে। এই ভারতীয় কবি আমাদের মাথা খারাপ করে দেবে। এই দল কম্যুনিষ্ট, সোভিয়েটের সাহায্যপ্রাপ্ত। আমি যেখানে বক্তৃতা করেছি সেখানে এরা আমার বিরুদ্ধে ৫টা points দিয়ে হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে বিলি করেছে—কেন রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শোনা উচিত নয় তার কারণসূচী। ৫টা 'পয়েণ্টের' মধ্যে একটা ছিল যে আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, তারপর materialism এর উপর আমার

খুব অশ্রদ্ধা, প্রাচীন সভ্যতার প্রতি আমার অত্যন্ত সম্মান বোধ। বাকী দুটো আমি ভুলে গিয়েছি। কিন্তু এরা বা আর যারা আমার বিরুদ্ধবাদী ছিল তারা কেউই আমাকে অসম্মানসূচক কিছু বলেনি। তারা বলেছে,—'তোমাকে আমরা সম্মান করি, তোমার প্রতি আতিথ্যের বিরুদ্ধে আমরা কিছুই বলব না; আমরা শুধু আমাদের মত প্রকাশ করছি। ব্যক্তিগতভাবে তোমার সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই'। তারা খুব বিচলিত হলেও কখনো আমাকে কটুকথা বলে নি। এই ব্যাপারটি অনভ্যাসবশতঃ আমাকে বিচলিত করেছে; চীনে ও জাপানে আমি দেখেছি যে তাদের ভদ্রতার সাধনা বহুযুগের ভিতর দিয়ে মর্ম্মগত হয়ে গেছে। এই সভ্যতা তাদের আদিম প্রকৃতিকে সংযত করেছে। এ সাধনা বহুযুগের ও সর্ব্বব্যাপী। উন্নতি অনেক প্রকারের হতে পারে; যেমন রেলগাড়ী ঘণ্টায় ৬০ মাইল যায়, ব্যোমযান আকাশে উড়ে—কিন্তু সভ্যতা তা নয়। যে শিক্ষা ও সাধনায় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে সত্য ও সুন্দর করে তোলে তাই যথার্থ সভ্যতা। এর পরিচয় যেমন পেয়েছি এই সুপ্রাচীন জাতির মধ্যে, এমন আর কোথাও নয়।

সাংসির গভর্ণর আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি আমার কথা সব শুনে খুব আনন্দ লাভ করলেন। আমি বল্লেম, 'আমি আপনাদের সঙ্গে যোগ রাখতে চাই বিদ্যার দিক থেকে। ভারতের যে বিদ্যা চীন ভাষার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে তা লাভ করবার জন্য ভারতের সাধকদের চীনে আসা দরকার, আপনাদের দেশ থেকেও ভারতে যাওয়া দরকার।' তাঁদের অনেকেই প্রস্তুত আছেন। আমি আমার মাতৃভূমির পক্ষ থেকে তাঁদের আহ্বান করেছি, যেমন আতিথ্য আমি পেয়েছি তেমন আতিথ্য তাঁদের দেব বলে প্রতিশ্রুত হয়েছি। কিন্তু এখানে আমি একা গৃহকর্ত্তা নই, এতে সবার হাত আছে। আমি আপনাদের সেবা দাবী করব, তা আপনারা স্বীকার করুন আর নাই করুন। যাহোক আমি গভর্ণর মহাশয়কে বল্লেম, 'আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে আপনাদের পল্লীবাসীদের মধ্যে আমাদের পল্লীবাসীরা এসে কিছুকাল যাপন করবেন। আবার আপনাদেরও কৃষিজীবীরা আমাদের দেশে গিয়ে কাজ করবেন, এই বিনিময় আমি চাই।" তিনি আমাকে নদীর ধারে চমৎকার একখণ্ড জায়গা দেখিয়ে বল্লেন যে 'আমি এখানে একটি আশ্রম করে দেব—সেখানে আমাদের চীনেরা কাজ করবে, আপনাদের পল্লীবাসীরাও এলেই স্থান পাবে'। এই যোগই সবচেয়ে বড় যোগ হবে। এটা পূর্ণ করতে হলে সে দেশে যাতায়াত করতে হবে। Pan-Asiatic nightmare আমার নেই। Pan শব্দটি আমার কাছে ভয়ের শব্দ, অবাস্তব শব্দ। সত্যিকার Unit হলে এর একটা অর্থ আছে, কিন্তু দড়ির যোগ নিরর্থক। মানুষ যদি মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতে পারে তবেই পূর্ণফল পাওয়া যায়। স্বার্থের গন্ধ থাকলে ফল বিকৃত হবে। চীনদেশে যাদের কাছে গিয়েছি—তারা হৃদয় দিয়েছে, কাছে এসেছে। রাস্তা হয়েচে, তারা আসবে, যদি আমরা না বলি যে দরজা বন্ধ, আমরা নিজের কাজে ব্যস্ত আছি', তা' হলেও আসবে। আত্মীয়ভাবে তারা আসবে—সৈনিক, বণিক বা মিশনারী হয়ে নয়। তাদের সঙ্গে আমাদের দান প্রতিদান হবে। এই সত্য সম্বন্ধ,

interdependence ; ভারতের একটা বড় কর্ত্তব্য, ঋণ রয়েছে ; এসিয়ার যে শ্রেষ্ঠ বাণী, বিশ্বমৈত্রী, তা' ভারতকে প্রকাশ করতে হবে। আমরা তার অনেক ব্যাঘাত করেছি। এই বাণীর পথ যে প্রস্তুত আছে তা আমাদের গুণে নয়, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের তপস্যার ফলে—যেমন ভগীরথের তপস্যার ফলে গঙ্গা নেমে এসেছিলেন। চীন জাপানে ভারতের আত্মীয়তার পথ প্রশস্ত আছে, এখনো লুপ্ত হয়নি, যেমন ভগীরথের গঙ্গার ধারা এখনো লুপ্ত হয়নি। সেই শ্রেষ্ঠ বাণী যা প্রাচীন ভারত নানা বাক্যে, অমর ছন্দে ঘোষণা করেছে, তা' সমস্ত এসিয়ার কণ্ঠে ভারতকেই ঘোষণা করতে হবে। এ কর্ত্তব্যের প্রতি যেন আমাদের শ্রদ্ধা থাকে, সাহস থাকে। এ আমাদের খুব বড় সম্পদ, রাষ্ট্রীয় শক্তির চেয়ে ন্যূন নয়। আমাদের পূর্ব্বতন সাম্রাজ্যের গৌরব নেই, কিন্তু এই খ্যাতি চিরজীবী হয়ে আছে। যখন দেখি ইয়াংসী নদীর ধারে বসে ভক্ত বুদ্ধদেবের উদ্দেশে বারবার নমস্কার করছে, যখন দেখি জাপানের পল্লীতে পল্লীতে বুদ্ধের বাণী মন্দিরের ঘণ্টারবের সঙ্গে মিশে আকাশ বাতাসকে পবিত্র করছে, জাপানের হৃদয়ভূমিকে উর্ব্বরা করছে, তখন আমাদের কি তৃপ্তি, কি গৌরব! বুদ্ধদেবের সেই বাণী জাপানের সমস্ত শক্তি, সমস্ত বীর্য্যের কারণ ; তারা যে যুদ্ধবিগ্রহ করছে তার পিছনেও সেই বাণী রয়েছে একথা তারা স্বীকার করেছে ভারতের কাছে, যে ভারতের সব গৌরব আজ লুপ্ত। গর্ব্বোদ্ধত জাপান বারবার বলেছে তাদের সমস্ত সফলতার পিছনে সেই শক্তি রয়েছে যে শক্তি একদিন ভারতবর্ষ থেকে এসেছিল। তাদের সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৈনিক কাজের মধ্যেও বুদ্ধদেবের শিক্ষা আছে। তাদের কাছে এ শুধু ধ্যানপরায়ণ ধর্ম্ম নয়—ভক্তিতে সরস, জ্ঞানেতে উজ্জ্বল এই ধর্ম্ম তাদের ভিতর কাজ করছে।

জাপানে একজনের কাছে একটা চমৎকার কথা শুনেছিলেম। এই ভদ্রলোকটি কোন প্রকার য়ুরোপীয় জ্ঞান লাভ করেন নি। তিনি বল্লেন, 'বৌদ্ধধর্ম্ম থেকে আমরা একটা মস্ত জিনিষ পেয়েছি'। তাঁর চাষব্যবসায়ী হতে, পল্লীজীবনের পূর্ণতা সাধন করতে বড় ইচ্ছা। তিনি বল্লেন, 'বৌদ্ধধর্ম্ম থেকে আমাদের একটা মস্ত শিক্ষা হয়েছে যে যদি কিছু লাভ করতে হয় তবে সে প্রেমের দ্বারা। প্রেম একটা Law, not a subjective state of mind ; জমি থেকে আমরা ফসল আদায় করি, কিন্তু যদি জমিকে ভালবাসতে পারি তবে সে আরও বেশী দেবে। এই জমিকে ভালবাসার কল্পনা আমরা তোমাদের কাছে শিখেছি। ভালোবাসাই প্রাপ্তির উপায় একথা আর কেউ বলেনি—বলে থাকে exploitationই প্রাপ্তির উপায়। পুরোপুরি পাই আমরা মৈত্রী দিয়ে।'

জমিকে ভালোবাস্‌লে বেশী দেয় একথা শুনে আমার মনে হল—মরেনি তো, বৌদ্ধধর্ম্ম এদের মধ্যে মরেনি। ধর্ম্মের কথা কর্ম্মের রাজ্যে যে এত গভীর করে বল্‌তে পারে সে কত পেয়েছে, বুঝেছে চাষ করতে গেলে ভালোবাস্‌তে হয়। জাপান আজ বারবার বল্‌ছে, 'ভুল করেছি, সত্যকে আমরা দেখিনি। ভারতবর্ষ, তুমি এস, সত্যকে দেখিয়ে দাও'—একথা বল্‌ছে ভারতকে, যে ভারত সত্য বিস্মৃত হয়েছে। বলেছে, 'তোমরা না হলে অন্য কেউ চীন ও জাপানকে সত্য দান করতে পারবে না, তারা পশ্চিমের বিদ্যা নিয়ে বারবার মুগ্ধ হবে'।

চীনের একজন পণ্ডিতবন্ধু বলেছেন—'চীন তুমি ভুলেছ যে ভারতবর্ষ তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা। একথা মনে করিয়ে দেবার জন্য ভারতের কবি এসেছেন'। তিনি তাঁদের শাস্ত্র থেকে দেখিয়েছেন চীন কত বিষয়ে ভারতের কাছে ঋণী। কিন্তু শাস্ত্র থেকে স্মরণ করালেও মানুষের মন অনেক সময় সায় দেয় না। সময় কি হয়নি যে মৈত্রী দিয়ে আমরা স্মরণ করিয়ে দেব? একথা কি আমরা কেউ বল্‌তে পারবো না যে আমরা সেই Ideal ভারতবর্ষের লোক, ভূগোলের ভারতবর্ষের নয়? ওরা মনে করে যে সেই ভারত এখনো সজীব আছে; ওরা বলেছে, তোমাদের মন্দিরে ঢুকে ধর্ম্মরত্নের দাবী করব, তারা জানেনা যে দ্বার থেকে তাড়া খেয়ে আস্‌বে। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনকে যখন তারা বলেছে যে তোমাদের মন্দিরে গিয়ে দেখ্‌ব কি সঞ্চিত আছে তখন তিনি লজ্জিত হয়ে চুপ করে ছিলেন। ভারতের দেবতা যেখানে, সেখানে পৃথিবীর লোকের ও ভারতবর্ষের অধিকাংশের স্থান নেইতো। কিন্তু ভারতের গৌরব কি প্রচ্ছন্ন হয়ে থাক্‌বে? রাষ্ট্রীয় শক্তির জন্য চেষ্টা হবেনা, সে কথা আমি বলছি নে, সে শক্তির প্রয়োজন আছে; কিন্তু যে সম্পদ বিশ্বকে দেবার সেই তো যথার্থ শক্তি, যথার্থ ঐশ্বর্য্য। এর গৌরব একদিন ভারতের ছিল, আর কি সে গৌরব হবে না? আমরা বল্‌ব—'আমাদের মাতার ভাণ্ডারে যে অন্ন আছে তা আমরা পরিবেশন করব—তোমরা এস, এস, এস'।

একটা খবর আপনাদের দিতে ভুলে গিয়েছি, সেটিতে হয়তো আপনারা সুখী হবেন। চীনদেশের লোকেরা এবার আমার জন্মোৎসব করে নতুন নাম দিয়েছে। তারা বলেছে, এবার যখন তোমার Chinese birth, তখন চৈনিক নাম নিয়ে তোমাকে আমাদের হতে হবে। সে নামের শিলমোহরও আমি এনেছি। তার অর্থ বিচিত্র, উচ্চারণ চৈনিক রকমের; 'ছোঃ-ছিন-তান্‌'। 'ছো' মানে প্রভাতের আলো, 'ছিন' বজ্র বা ইন্দ্র, 'তান্‌' হচ্ছে ভারতীয়, ভারতীয় ইন্দ্র, ভারতীয় বজ্র। সে দিন বিশেষ উৎসব হয়েছিল। আমাকে শিশুর মত নববস্ত্রে সাজিয়েছিল; শিশুর খাদ্য পানীয়ও আমি পেয়েছিলেম। চীনবাসীরা সব প্রাকৃতিক ব্যাপারে একটা ধর্ম্মনৈতিক ভাব আরোপ করে থাকেন। যেমন বাঁশগাছকে তারা সরল ও ধার্ম্মিক বলেন। ছেলেদের জন্মকালে বলা হয়, এ যেন পাইন গাছের মত চিরজীবী হয়, তার মত ঊর্দ্ধে উঠ্‌তে পারে। তারা আমাকেও বলেছে, আমি যেন ভাল হই, দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হই, চিরজীবী হই। আমাদের দেশের মত সেখানেও আনন্দোৎসব, নৃত্যগীত হয়েছিল, মেয়েরাও এসেছিলেন। এম্‌নি করে এবার চীনে আমার জন্মদিন নামকরণ হয়েছে। দৈবক্রমে আমার যে নাম তার অর্থ সূর্য্য। সূর্য্যের প্রতিদিন নব জন্ম হয়, এক দিগন্ত হতে অন্য দিগন্তে। তেম্‌নি আমি যদি চক্রে চক্রে নানা দেশে নব নব জন্ম লাভ করে' নব নব নাম পেতে পারি, তবেই আমার নাম ও জীবন সার্থক।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে প্রদত্তবক্তৃতা। শ্রীযুক্ত সুধেন্দুরঞ্জন রায় এম এ অনুলিখিত।

অজন্তা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পাহাড়টীর তলদেশেই নদী ; সেইজন্য গুহাগুলি খনন করা হইয়াছে পাহাড়ের ঠিক মধ্যভাগে। পাহাড়ের আকৃতি অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় বক্র। নদীর অপর পারের পাহাড়ের তলায় বসিয়া এই গুহাগুলি দেখিতে অতি মনোরম। বিশাল কৃষ্ণবর্ণ পাহাড়, তাহার মধ্যভাগে পায়রার খোপের ন্যায় ছোট ছোট গুহা পাহাড়ের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে। গুহার ভিতরে যাইয়া দেখা অপেক্ষা বাহির হইতে দেখাই যেন অধিক আনন্দজনক। মনে হয় যেন কোন এক সুবৃহৎ কলেজগৃহের ছোট ছোট জানালা ও দরজাগুলি দূর হইতে দেখিতে পাইতেছি। প্রকৃত পক্ষে ইহা একদিন এক সুবৃহৎ বিদ্যাপীঠই ছিল। ভারতের নানা প্রদেশ হইতে এবং বহু দেশ বিদেশ হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বৌদ্ধ ছাত্রগণ এখানে অধ্যয়ন করিতে আসিত ; অনেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এখানে যাবজ্জীবন বাস করিতেন ; ইহা তাঁহাদের একপ্রকার বিশ্রাম স্থল ছিল। বৎসরের অধিকাংশ সময়ই তাঁহারা নানাস্থানে যাইয়া নরনারীর সেবায়, তাহাদের অনেক হিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন ; ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া কয়েকমাসের জন্য এখানে আসিয়া বিশ্রাম করিতেন। সাধনায় ও অধ্যাপনায় কয়েকমাস অতিবাহিত করিয়া আবার সর্ব্বপ্রাণীর সেবায় বাহির হইতেন—ইহাই ছিল তাঁহাদের প্রধান কাজ। এই সকল মহামানবের এবং তাঁহাদের ছাত্রদের সমাগমে এই স্থান একদিন কেমনই না জীবন্ত ও পবিত্র ছিল, কিন্তু আজ সব পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, আজ আর ভিক্ষু সন্ন্যাসী নাই, আজ আছে পিক্‌নিক পার্টির দল—ইহাকেই বলে কালের মহা পরিবর্ত্তন।

খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে গুহাগুলির খনন কার্য্য আরম্ভ হয় এবং শেষ হয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে। এখানে ২৮ টি গুহা আছে ; কিন্তু কোন গুহাটী যে সর্ব্ব প্রথম খনন করা হয়, তাহা কেহই সঠিক বলিতে পারে না ; তবে কয়েকটী গুহা যে অন্যান্য গুহা অপেক্ষা প্রাচীনতর তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। কয়েকটী গুহা সম্পূর্ণ করা হয়—ছাত্রে, অধ্যাপকে ও ভিক্ষুতে তাহা পূর্ণ হইয়া যায়। আরও অধিক স্থানের প্রয়োজন হয়, তখন আরও নূতন তন গুহা খনন করা হইতে থাকে, এই প্রকারে ২৮ টী গুহা খনন করা হইয়াছে এবং তাহাতে স আট শত বৎসর লাগিয়াছে। কিন্তু সব গুহাগুলি সম্পূর্ণ হয় নাই ; কতকগুলি গুহা আ সেগুলি অর্দ্ধেক বা কিঞ্চিৎ মাত্র খনন করা হইয়াছে ; আরম্ভ হইয়াছিল কিন্তু শেষ হয় নাই। ন যে শেষ হইল না, কে যে শিল্পীর হাত চাপিয়া ধরিল, কেহই তাহা সঠিক বলিতে পারে না তবে অনুমান করা যায়, কিন্তু অনুমান অনুমান মাত্র। এই অসম্পূর্ণ গুহাগুলি দেখিলে ম যেন কিছু পূর্ব্বেও বুঝি কাজ চলিতেছিল—হঠাৎ কি জানি কেন খনন কার্য্য অসমাপ্ত রা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

কি ধৈ সহিষ্ণুতা, কি অধ্যবসায়ের সহিত তাহারা কাজ করিয়াছে, একথা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, তাহারা কেবল য়াছে, পাহাড় কাটিয়া স্তম্ভ, চৈত্য, হলঘর, ছোট ছোট কুঠরী

করিয়াছে, কি অমানুষিক অসাধারণ শক্তি ব্যয় করিয়া তাহারা পাহাড় ভেদ করিয়া পাহাড়ের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। ছোট হউক, বড় হউক, প্রত্যেক গুহার প্ল্যান প্রায় এক ধরণের। মধ্যে প্রকাণ্ড হল, তাহার দুই পার্শ্বে সারি সারি ছোট ছোট কুঠরী; কোন কুঠরীতে একজন, কোন কুঠরীতে বা দুইজন লোকের থাকিবার স্থান আছে। পাহাড় কাটিয়াই তাহাদের শয্যাসন প্রস্তুত করা হইয়াছে; আসনের একদিক একটু উঁচু করিয়া বালিসের মতন করা হইয়াছে, অবশ্যই সে বালিসও পাথরের। হলঘরের দুইপার্শ্বে কুঠরী এবং সম্মুখে চৈত্য; সে চৈত্যও পাহাড় কাটিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে। চৈত্যের ভিতরে গৌতম বুদ্ধের পবিত্রদেহের অংশ রক্ষিত আছে। মাত্র একদিক দিয়া আলো ও বাতাস আসিতেছে— —গুহার মুখের দিক দিয়া। তাহা সম্পূর্ণ খোলা, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া যে আলো বাতাস আসে তাহা যথেষ্ট নহে; হল গৃহটি আলোকিত হয় বটে, কিন্তু দুই পার্শ্বের ছোট ছোট কুঠরীগুলি তেমন আলো বাতাস পায় না। গুহার যতই ভিতরে যাওয়া যায়, অন্ধকার ততই গভীর হইয়া আসে। কতকগুলি গুহা আছে, সেগুলি আবার দ্বিতল; তাহা দেখিয়া ইঞ্জিনিয়ারের অদ্ভুত সাহস ও অসাধারণ বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

ভাস্কর্য্য ক্রিয়া যাহা দেখিলাম তাহার সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব; পাহাড় কাটিয়া পাথরের উপর যে সব কারুকার্য্য করা হইয়াছে সে সব ভাস্কর্য্য ক্রিয়া; ইহাকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—রূপাত্মক (decorative) এবং ভাবাত্মক (Expressive); স্তম্ভের উপর কিম্বা দ্বারের উপর যে সব কারুকার্য্য করা হইয়াছে, তাহা রূপাত্মক বা decorative art; ইহার উদ্দেশ্য ঘরের কিম্বা দ্বারের শোভাবর্দ্ধন করা। আঁকা বাঁকা লাইন কিম্বা ত্রিকোণ চতুষ্কোণ রেখাদ্বারা যে মনোরম রেখাচিত্র (figure) অঙ্কিত করা হয় তাহাকে decorative art বলে; এই প্রকার আর্টের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ আগ্রায় এতমদ্দৌল্লা ও তাজমহল। এতমদদৌল্লায় মার্ব্বেল পাথর কাটিয়া রেখার যে ভঙ্গিমা ও চাতুর্য্য দেখান হইয়াছে অন্য কোথাও তাহার তুলনা নাই; তাজমহলে মার্ব্বেল পাথর খুদিয়া লতা পাতা ফল ফুলের যে অদ্ভুত সৌন্দর্য্য দেখান হইয়াছে তাহার তুলনা পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই; চিত্রের এই ফুলে ও পাতায় এমন এক মধুর ভাব ও কমনীয়তা দেখা যায়, যাহা আমরা সহজে সত্যকারের ফুলে ফলে দেখিতে পাই না। তাহা দেখিতে শিল্পীর চক্ষু ও কবি[র] ভাব চাই; কবি ও শিল্পী যাহা দেখিতে পায়, আমরা সহজে তাহা দেখিতে পাই না। তাহাদের আর্টের উদ্দেশ্যই এই যে তাহারা যাহা দেখিয়াছে তাহাই আমাদের স[ম্মুখে] প্রকট[ি]ত করিবে। তাজমহলের লতা ও ফুলগুলি দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়ি, কত লতা ও কত ফুল দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাতে সে হাসি, সে ভাব, সে কম[নীয়তা] কখন লক্ষ্য করি নাই যাহা তাজমহলের ফুলে ফুলে লতায় লতায় স্পষ্টভা[বে ফুটি]য়াছে। এই-খানেই প্রকৃত Art এবং ফটোগ্রাফির প্রভেদ, বাগানের ফুলে [দে]খি ফটোগ্রাফির ফুলেও ঠিক তাহাই দেখি, নূতন কিছুই দেখিতে পাই না; [শি]ল্পী বা কবি যে ফুল রচনা করে তাহাতে এমন এক নূতন কিছু দেখিতে পা[ই] সত্যকারের ফুলে সহজে আমাদের চোখে পড়ে না।

তাজমহল বা এতমদদ্দৌলার ভাস্কর্য্যের সহিত অজন্তার ভাস্কর্য্যের তুলনা হয় না, তাজমহল বা এতমদদ্দৌলা মোগল art এর উন্নতির চরম সীমা, তাহার সহিত তুলনা করিলে অজন্তার প্রতি অন্যায় করা হয়, কিন্তু তবুও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে art হিসাবে অজন্তার ভাস্কর্য্য-ক্রিয়া নিতান্ত নগণ্য নহে। পাথরের স্তম্ভের উপরে রেখার যে সব কারুকার্য্য করা হইয়াছে তাহা সত্যই মনোমুগ্ধকর, তাহার এক বিশেষ মূল্য আছে।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহা ভাস্কর্য্য-ক্রিয়ার এক বিভাগের কথা—রূপাত্মকশিল্প। এখন ইহার অন্য এক বিভাগের কথা কিছু বলিব, যাহাকে আমি ভাবাত্মক শিল্প বলিয়াছি। নরনারী কি দেবদেবী বা পরীমূর্ত্তি গড়িয়া তাহার মধ্য দিয়া যে ভাব প্রকাশের চেষ্টা করা হয় তাহাকে expressive art বলে। এই বিষয়ের কথা আলোচনা করিতে হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে art-জগতে অজন্তার কোন স্থান নাই (মনে রাখিতে হইবে আমি এখন পর্য্যন্ত কেবল sculpture বা ভাস্কর্য্যের কথা বলিতেছি—painting বা চিত্রের কথা পরে বলিব) যতগুলি বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিলাম, তাহাদের মধ্যে কেবল একটীমাত্র আমার নিকট কিছু সুন্দর বলিয়া মনে হইল। art হিসাবে অন্যান্যগুলির কোন মূল্য নাই, ইহাই আমার বিশ্বাস। কয়েকটী দেবদেবীমূর্ত্তিও আছে—কিন্তু এই পাথরের মূর্ত্তিগুলি পাথরের ন্যায় নিৰ্জ্জীব বসিয়া আছে, চোখে মুখে ভাবের কোন সমাবেশ নাই, ভাব প্রকাশের জন্য বোধ হয় চেষ্টা করা হইয়াছিল—কিন্তু পাথরের ভিতর দিয়া তাহা ফুটিয়া উঠে নাই; পাথর ভেদ করিয়া ভাব বাহিরে আসিতে পারে নাই, কঠিন পাথরের মধ্যে চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। যাহারা পাহাড় কাটিয়া এইসব অদ্ভুত গুহাগুলি সৃষ্টি করিতে পারিল, তাহারা এই মূর্ত্তিগুলির উপর কেন যে একটু ভাবের ছিটা দিতে পারিল না, তাহা বুঝিতে পারি না। যাহারা চিত্রে ভাবপ্রকাশের লীলাখেলা করিয়া এক স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে—যাহা দেখিয়া আজ সমস্ত জগৎ বিস্ময়ে স্তম্ভিত,—ভাস্কর্য্যে তাহাদের এই অকৃতকার্য্যতার কথা মনে করিলে অত্যন্ত দুঃখ হয়।

ভাস্কর্য্য-বিদ্যার জন্য অজন্তা বিখ্যাত নহে, অজন্তা বিখ্যাত চিত্রের জন্য। অজন্তার চিত্রের কথা কিছু বলিয়াই এ প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। সব গুহাতে চিত্র নাই, মাত্র ১৪টী গুহাতে চিত্র আছে। ভাস্কর্য্যের ন্যায় চিত্রেরও দুইটী দিক আছে—রূপাত্মক এবং ও...ত্মক রূপাত্মক চিত্র দেখি স্তম্ভে ও ছাদের তলদেশে (ceiling) এবং ভাবাত্মক চিত্র দেখি গুহার ভিতরে হলগৃহের চারিদিকের দেওয়ালে ছাতের তলদেশ যে কি প্রকা...ত চিত্রে কত রঙ্গে শোভিত করা হইয়াছে; তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব। কোন স্থলে ফু...ন স্থলে পাতা, কোথাও বা লতা, কোথাও বা পাখী, কোথাও বা সরোবরে মরালের ... ও বক্রগ্রীবা, সমস্ত গুহাটীকে যেন একটী ছবির বই করিয়া রাখিয়াছে কোথাও গো... কোথাও ত্রিভুজাকার, কোথাও চতুর্ভুজাকার রেখাচিত্র, কত ফুলে, কত মরালে কত ভা... তাহা চিত্রিত আছে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। কোন ফুলটী সম্পূর্ণ ফুটিয়া... ফুলটী আধ আধ ফুটিয়াছে, আর কোনটী বা ফুটিয়াও ফুটে নাই—কুঁড়ির মধ্য হইতে ...হির হইতেছে মাত্র। কোথাও মরাল খেলিতেছে, কোথাও

ভাসিতেছে, কোথাও বা স্থির বসিয়া আছে—বিভিন্নতার (variety) এক অদ্ভুত সমাবেশ, কিন্তু এই বিভিন্নতার মধ্যে যে এক মিল (Harmony) আছে এবং ইহা যে কি পরিমাণে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। যেখানে যাহা যে পরিমাণে (proportion) যে ভাবে প্রয়োজন তাহা সেইখানে ঠিক সেই পরিমাণে ও সেই ভাবে দেওয়া হইয়াছে। অসংখ্য বিভিন্নতার মধ্যে যে অদ্ভুত মিল রাখা হইয়াছে, তাহা চোখের যে কতদূর তৃপ্তিদায়ক বুঝিতে পারি তখন যখন অনেকক্ষণ এই চিত্রগুলির দিকে তাকাইয়া থাকিয়াও কোন প্রকার ক্লান্তি বা অবসাদ অনুভব করি না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় বেদনা হইয়া যায়, আমরা মেজের উপর শুইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া ছাদের এই চিত্রগুলি অবলোকন করিয়াছি, চোখে এক মুহূর্ত্তের জন্যও শ্রান্তি বোধ করি নাই। যে চিত্রগুলি দাঁড়াইয়া দেখাই এত কঠিন, সে চিত্রগুলি ছাদের তলদেশে এত সুন্দর এত মনোরম এত নিখুঁত ভাবে কি করিয়া যে তাহারা অঙ্কিত করিল, ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। আজকাল মেয়েদের শাড়ীর উপর এবং পুস্তকের কভারে কত প্রকার রেখাচিত্র (design) দেখি, কিন্তু তাহাদের একটীরও অজন্তার এই রেখাচিত্রগুলির সহিত তুলনা হয় কিনা সন্দেহ। অজন্তার এই চিত্রগুলি নকল করিয়া সাড়ীতে বা পুস্তকের কভারে অঙ্কিত করিয়া দিলে সাড়ীর ও পুস্তকের সৌন্দর্য্য যে শতগুণে বৃদ্ধি পায়, তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং তখন এই সাড়ী ও পুস্তকগুলি যে কিপ্রকার রুচির পরিচয় প্রদান করিবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

এখন ভাবাত্মক ছবিগুলির কথা কিছু বলিব। দেওয়ালের গাত্রে অঙ্কিত এই চিত্রগুলি বুদ্ধদেবের জন্ম কর্ম্ম ও মৃত্যুর ঘটনাগুলি উজ্জ্বলভাবে চোখের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছে। জাতক হইতে এই সমস্ত গল্প সংগৃহীত হইয়াছে। এই গল্পগুলি চিত্রে যে কি সুন্দর আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না যাঁহারা কখনও এই চিত্রগুলি দেখেন নাই। কত যে চিত্র আছে তাহার সংখ্যা নাই—অজন্তা এক সুবৃহৎ Picture Gallery; গুহার ভিতরে, দেওয়ালে উপরে, নীচে, প্রত্যেক যায়গায় চিত্র অঙ্কিত আছে; এমত স্থান নাই, যেখানে চিত্র নাই; বুদ্ধদেবের ঘটনাবহুল জীবনের কত ঘটনাই যে অঙ্কিত আছে কে তাহার হিসাব করিবে? জরা, রোগ ও মৃত্যু দেখিয়া তিনি কিরূপ ব্যাকুল হইলেন. কিরূপে তিনি তাঁহার
নিদ্রিত পত্নী পুত্রের নিকট হইতে বিদায় লইলেন, কেমন করিয়া তিনি সংসার ত্যাগ করিলেন
কোথায় তিনি অশ্বে আরোহণ করিলেন, কোন্ বৃক্ষতলে তিনি মহাসমাধিতে বসিলেন,মায়া-
গণ কি ভাবে প্রলুব্ধ করিল. তাঁহার জীবনের প্রত্যেক ঘটনাই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনো
অঙ্কিত রহিয়াছে। কোথাও তিনি শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, কোথাও তিনি
হস্তে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। এক চিত্রে দেখিলাম তিনি কমণ্ডলু হস্তে ভি
তাঁহার পত্নীর নিকট। কি মহান, কি পবিত্র যে মুখের ভাব, চোখ হইতে
যেন ঝরিয়া পড়িতেছে। পত্নীর মুখের উপর যে ভাবের সমাবেশ
করা অসম্ভব। তিনি তাঁহার পুত্রকে অগ্রে ধরিয়া যেন মিনতি
আর কি দিব? আমার সবই তুমি গ্রহণ কর, আমার
তুমি তোমার পদতলে স্থান দেও," ছেলেটির ঠোঁটের

চিত্রে
ক্ষাপাত্র
রিতেছেন,
করুণার ঝরণা
তাহা বিশ্লেষণ
বলিতেছেন, "আমি
ও আর আমাকেও
ধন করিয়া যে লাল রংটুকু

দেওয়া লইয়াছে, যেন লাল ঠোঁটটুকু হাসিয়া হাসিয়া অভিমানভরে বলিতেছে "তুমি ত আমারই বাবা", ছেলেটির এই মুখের হাসিটুকু কি মধুর! এক স্বর্গীয় ভাব তাহার সমস্ত মুখের উপর ছড়াইয়া আছে। আর একটির চিত্রের নাম বোধিসত্ত্ব—বুদ্ধদেবের এক মহাপবিত্র প্রতিমূর্ত্তি। পৃথিবীর সমস্ত ব্যথা বেদনার কথা তিনি যেন শুনিয়াছেন, করুণায় ও সমবেদনায় তাঁহার হৃদয় যেন গলিয়া পড়িতেছে; কি এক শান্তি ও সান্ত্বনার বাণী তাঁহার শ্রীমুখে রহিয়াছে। তাঁহার মাথার মুকুটটী এক অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ; রেখাগুলি কতভাবে আঁকিয়া বাঁকিয়া যে এদিক ওদিক গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। মুকুটটী কেমন ধীরে ভক্তিভরে তাঁহার মাথায় সংলগ্ন আছে।

প্রায় প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষের মাথায় মুকুট দেখিলাম। এত মুকুট, কিন্তু কোন মুকুটই অন্য এক মুকুটের অনুকরণ নহে, প্রত্যেক মুকুটই বিভিন্ন। কত বৎসর ধরিয়া কত ছাত্র মিলিয়া যে এই সব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে—কে আজ গণনা করিবে? কাগজের উপর পেন্সিল দিয়া রবার ঘসিয়া এই চিত্র অঙ্কন করা হয় নাই, দেওয়ালের উপর গোবর লেপিয়া এই স্বপ্ন রাজ্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। গোবর শুকান মাত্রই তুলির দ্বারা নানারঙ্গে নানাজনে নানাচিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। অতীতের অবহেলায় ও সময়ের আক্রমণে অনেক চিত্রই আজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, plaster ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অনেক রং মলিন হইয়াছে। কিন্তু অনেক রং যে এখনও এতাদৃশ উজ্জ্বল আছে—তাহাই আশ্চর্য্য ব্যাপার। যখন দেওয়ালে ও স্তম্ভে সমস্ত চিত্রই সম্পূর্ণ আকারে ছিল, রংগুলি জীবন্তভাবে চিত্রগুলির শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল—তখন কি এক মায়ারাজ্যই না এখানে সংস্থাপিত ছিল। স্বর্গ হইতে যেন এক রঙীন চিত্র অজন্তায় অবতীর্ণ হইয়াছিল।

শ্রীইন্দুভূষণ মজুমদার।

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস।

তৃতীয় অধ্যায়।

ইউরোপীয় সভ্যতার মূল উপাদান কি কি, এবং রোমীয় সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এই সভ্যতার জন্মকাল হইতেই যে এই সকল উপাদানের অস্তিত্ব ও ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। এই উপাদানগুলি কিরূপ বিচিত্রধর্ম্মী ও পরস্পরবিরোধী পূর্ব্ব হইতেই তাহার একটু আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছি, এবং এটাও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে এই সকল পরস্পরবিরোধী মূল তত্ত্বের মধ্যে কোনটিই ইউরোপীয় সমাজে একাধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই, কোন একটি তত্ত্ব অপর তত্ত্বগুলিকে পরাজিত বা বিদূরিত করিতে পারে নাই। আমরা দেখিয়াছি যে ইহাই ইউরোপীয় সভ্যতার বিশিষ্ট

লক্ষণ। এখন আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে এই সভ্যতার শৈশব যুগের ইতিহাস, অর্থাৎ ইউরোপীয় ইতিহাসের বর্ব্বর যুগ বলিয়া যাহা সাধারণতঃ অভিহিত হয় সেই যুগের ইতিহাস।

এই যুগের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই এমন একটি ব্যাপার চোখে পড়ে, যাহা আমাদের পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের বিরোধী বলিয়া মনে হয়। আধুনিক ইউরোপের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিকগণ যে সকল মত ও ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন, সেগুলি আলোচনা করিলে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। যাঁহারা রাজতন্ত্রবাদী তাঁহারা বলেন মূলে রাজতন্ত্রেরই ইউরোপীয় সমাজে একাধিপত্য ছিল, অন্যান্য বিরোধী তত্ত্ব পরে আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। যাঁহারা যাজকতন্ত্রবাদী বা অভিজাততন্ত্রবাদী বা গণতন্ত্রবাদী, তাঁহারাও স্ব স্ব শাসনতন্ত্রের পক্ষ হইতে ঠিক ঐরূপ দাবীই করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় সভ্যতার অভ্যুত্থানপ্রণালী বুঝাইতে যে কেহ চেষ্টা করিয়াছেন সকলেই প্রমাণ করিতে চান যে পরে যতই বিরোধ বৈচিত্র্য আসিয়া পড়ুক না কেন, মূলে কিন্তু একটি মাত্র শাসননীতির একাধিপত্য ছিল—কাহারও মতে সেটি রাজতন্ত্র, কাহারও মতে যাজকতন্ত্র, কাহারও মতে অভিজাততন্ত্র, কাহারও বা মতে গণতন্ত্র।

বুলাঁভিয়ে (Boulainvilliers) প্রমুখ এক সম্প্রদায়ের সমাজতত্ত্ববিদ্ আছেন যাঁহারা ফিউডালিজম্‌কেই ইউরোপীয় সমাজের একমাত্র মূলতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চান। তাঁহারা বলিতে চান যে রোমীয় সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর বিজেতৃ জাতির হস্তেই, অর্থাৎ পরবর্ত্তী কালের টিউটন অভিজাতবর্গের হস্তেই সমস্ত অধিকার ও শক্তি আসিয়া পড়ে; সমস্ত ইউরোপীয় সমাজ তাহাদেরই অধিকারভুক্ত হয়; এবং পরে রাজবর্গ ও প্রজাবর্গ আসিয়া তাহাদের হাত হইতে তাহাদের ন্যায্য অধিকার ছিনাইয়া লয়। অভিজাততন্ত্রই হইতেছে ইউরোপীয় সমাজের আদিম ও যথার্থ স্বরূপ।

এই সম্প্রদায়ের পার্শ্বেই আর এক সম্প্রদায় দেখা যায়, যাঁহারা রাজতন্ত্রবাদী,—যথা আবে দ্যুবো (Abbe Dubos)। তাঁহারা বলেন ইউরোপীয় সমাজে রাজগণেরই ন্যায্য অধিকার। টিউটন অর্থাৎ জর্ম্মান রাজগণ প্রাচীন রোমীয় সম্রাটগণের সমস্ত অধিকারই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন। গল্ (Gaul) প্রভৃতি প্রাচীন জাতিগণ তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া বসাইয়াছেন। তাঁহারাই একমাত্র ন্যায্য অধিকার সূত্রে রাজ্যশাসন করিয়াছেন। অভিজাতবর্গ যাহা কিছু আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা রাজবর্গের ন্যায্য অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াই করিয়াছিলেন।

আর এক সম্প্রদায়ের সমাজতত্ত্ববিদ্ আছেন যাঁহাদিগকে গণতন্ত্রবাদী বা প্রজাতন্ত্রবাদী বলা যাইতে পারে। আবে দ্য মাব্লীর (Abbe de Mably) গ্রন্থাবলী পাঠ করুন, দেখিবেন তাঁহার মতে পঞ্চমশতাব্দী হইতে সমাজের শাসন ও কর্ত্তৃত্ব ভার জনসংঘের হাতে আসিয়াছে, স্বাধীন প্রজাবর্গ স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে সম্মিলিত হইয়া যে প্রজাতন্ত্র গণসংঘ গড়িয়া তুলিলেন তাহারই হাতে সমস্ত অধিকার আসিয়া পড়িল। পরবর্ত্তীকালে অভিজাতবর্গ ও রাজবর্গ প্রজাসংঘের এই আদিম স্বাতন্ত্র্য কাড়িয়া লইয়া নিজ নিজ অধিকার ও সম্পদ্ বাড়াইয়া

লইয়াছেন। ইহাদের আক্রমণ হইতে প্রজাসংঘ আত্মরক্ষা করিতে পারিল না বটে, কিন্তু এটা সত্য যে মূলে সমাজশাসনব্যাপারে প্রজাসংঘেরই কর্ত্তৃত্বাধিকার ছিল।

এই ত গেল তিন পক্ষের দাবী। কিন্তু ইঁহাদের সকলের দাবী ছাড়াইয়া আর একটি শক্তি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে,—সেটি হইতেছে খৃষ্টীয় যাজকতন্ত্র বা চর্চ্ (church)। এই শক্তির তরফ হইতে দাবী করা হয় যে চর্চের অধিকার ভগবদ্দত্ত অধিকার; ভগবদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য চর্চ্চের আবির্ভাব; চর্চ্চের চেষ্টাতেই ইউরোপে সভ্যতা ও সত্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; সুতরাং ইউরোপীয় সমাজ শাসনে চর্চ্চেরই ন্যায্য অধিকার, চর্চ্চই ইউরোপীয় জগতের একমাত্র সম্রাজ্ঞী।

এখন দেখুন আমাদের কি অবস্থা দাঁড়াইল। আমরা মনে করিয়াছিলাম ইউরোপের ইতিহাসে কোন একটি শক্তি অপরাপর শক্তিকে সম্পূর্ণ পরাভব করিয়া একেশ্বরভাবে যে কখনও কর্ত্তৃত্ব করে নাই একথাটা বেশ প্রমাণ করিয়া দিয়াছি; এই সকল বিরুদ্ধ শক্তি যে বরাবর পাশাপাশি কাজ করিয়াছে, কখনও বা পরস্পর বিরোধ করিয়াছে, কখনও পরস্পরের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, কখনও বা পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়া লইয়াছে, এই কথাটাই যেন পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি। অথচ দেখুন এই প্রথম পদক্ষেপেই একটা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধমত দেখা যাইতেছে যে ইউরোপীয় সভ্যতার শৈশবযুগেই, বর্ব্বর ইউরোপের মধ্যভাগেই এই সকল বিরুদ্ধশক্তির মধ্যে একটিমাত্র—সে রাজশক্তিই হউক বা প্রজাশক্তিই হউক, অভিজাতশক্তিই হউক বা যাজকশক্তিই হউক—ইহাদের মধ্যে একটি মাত্র শক্তিই সমাজে একাধিপত্য করিত। এবং শুধু একটিমাত্র দেশে নয়, ইউরোপের সকল দেশেই ভিন্ন ভিন্ন যুগে এই সকল বিরুদ্ধ শক্তি এই একাধিপত্যের দাবী করিয়া আসিয়াছে। যে সকল পরস্পরবিরোধী ঐতিহাসিক মতবাদের উল্লেখ করিলাম সেগুলি সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিকের পক্ষে এই ব্যাপারের মধ্যে কয়েকটি মূল্যবান্ তথ্য নিহিত আছে। আধুনিক ইউরোপের আদিম যুগে স্ব স্ব অধিকার সম্পূর্ণ ও অখণ্ড ছিল বলিয়া এই যে বিভিন্ন শক্তি পরস্পরবিরোধী দাবী উপস্থিত করিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দুইটী মূল্যবান তথ্য উদ্ধার করিতে পারেন। প্রথমটি হইতেছে শাসনক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকারতত্ত্ব; অর্থাৎ যে কোন শাসনশক্তি সমাজের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে, তাহার কর্ত্তৃত্ব করিবার কোন আইনসঙ্গত অধিকার আছে কি না তাহার বিচার। শাসনাধিকার লইয়া এই যে বৈধাবৈধ বিচার, এরূপ বিচারের আবশ্যকতা আছে বলিয়া যে ধারণা তাহা ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া আছে। দ্বিতীয় তথ্যটি হইতেছে বর্ব্বর ইউরোপের সামাজিক অবস্থার যথার্থ স্বরূপ ও বিশিষ্ট প্রকৃতি।

এখন দেখা যাক পূর্ব্বোক্ত ঐ বিরোধের মধ্য হইতে এই তথ্য দুইটি কিরূপে বাহির করা যায়।

এই যে যাজকতন্ত্র, রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র, এই সকল বিভিন্ন শক্তি—প্রত্যেকেই দাবী করিতেছে যে সর্ব্বপ্রথমে সমাজশাসনে তাহারই অখণ্ড অধিকার ছিল, ইহা দ্বারা তাহারা বাস্তবিকপক্ষে কি দাবী করিতেছে? তাহারা প্রত্যেকেই কি দাবী করিতেছে

না যে সমাজশাসনে একমাত্র তাহারই বৈধ অধিকার ? রাজনৈতিকক্ষেত্রে প্রাচীনত্বের উপরই ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত—কে কতদিন ধরিয়া অধিকার ভোগ করিয়াছে তাহারই দ্বারা তাহার অধিকারের ন্যায্যতা বিচার হয়। আপেক্ষিক প্রাচীনত্বের দোহাই দিয়াই বিভিন্ন পক্ষ স্ব স্ব অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করে, স্ব স্ব শক্তির বৈধতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে। লক্ষ্য করিবেন যে এই চেষ্টা কেবল একপক্ষে আবদ্ধ নহে, সকল বিরুদ্ধ শক্তিরই ঐ এক চেষ্টা, সমাজ-শাসনে আমারই যে একমাত্র ন্যায্য অধিকার, সকল পক্ষই ইহা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত। বর্ত্তমান-কালে আমরা মনে করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি যে রাজশক্তিই কেবল ন্যায্য অধিকারের দাবী করেন। বাস্তবিক এটা আমাদের ভুল ; সকল প্রকার শাসন পদ্ধতির এই অধিকারবৈধতার দাবী রহিয়াছে। আমরা ইতিমধ্যেই দেখিয়াছি যে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রত্যেক অঙ্গই এই দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। ইউরোপের পরবর্ত্তী ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন প্রকৃতির সমাজব্যবস্থা ও শাসনতন্ত্রের মূলে এইরূপ একটা ন্যায্য অধিকারের দাবী রহিয়াছে। ইটালী ও সুইট্জার্‌ল্যাণ্ডের অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র, সান্‌মারিনোর সাধারণ তন্ত্র, ও ইউরোপের বড় বড় রাজতন্ত্র, সকলেই স্ব স্ব দেশে স্ব স্ব শাসনশক্তিকে একমাত্র ন্যায্য অধিকারী বলিয়া প্রচার করিয়া আসিয়াছেন, এবং সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক ন্যায্য অধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছেন। সকলেই স্ব স্ব শাসন পদ্ধতির প্রাচীনত্ব ও সনাতনত্বের উপর নিজ নিজ অধিকারের ন্যায্যত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ইউরোপ ছাড়িয়া অন্যান্য দেশের ও অন্যান্য যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলেও এই তথ্যের সন্ধান পাইবেন। এমন কোন দেশ নাই, এমন কোন যুগ নাই যাহাতে কোন না কোন প্রকারের সমাজব্যবস্থা বা শাসনতন্ত্র নাই ; এবং এমন কোন শাসনতন্ত্র নাই যাহার মূলে প্রাচীনত্ব বা সনাতনত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এই বৈধ অধিকারের দাবী নাই।

এই যে বৈধ অধিকারতত্ত্ব ইহার তাৎপর্য্য কি ? ইহার উপাদানই বা কি কি ? কিরূপেই বা এই তত্ত্ব ইউরোপীয় সভ্যতায় প্রবেশ লাভ করিল ?

সমস্ত শাসন শক্তির মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় বাহুবল ব্যতিরেকে কোন শক্তির প্রতিষ্ঠা হয় নাই। আমি এ বলিতে চাই না যে কেবল মাত্র বাহুবলেই তাহাদের উদ্ভব ; বাহুবল ছাড়া অন্য কোন অধিকার যদি তাহাদের না থাকিত তাহা হইলেও যে তাহারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত এ কথা আমি বলিব না। বাহুবলের দাবী ছাড়া অন্যান্য দাবীরও যে আবশ্যকতা ছিল তাহা ত স্পষ্টই দেখা যায়। সমাজের প্রয়োজন অনুসারে, সমাজ প্রচলিত রীতিনীতি মতামত প্রভৃতির অবস্থা অনুসারেই এক একটি শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু এটাও লক্ষ্য না করিয়া থাকা যায় না যে জগতে যত প্রকার শাসনতন্ত্র আছে, সে রাজতন্ত্রই হউক বা প্রজাতন্ত্রই হউক, সকলেই মূল কিছু না কিছু পরিমাণে বাহুবলের সংস্পর্শে কলঙ্কিত ;

অথচ কোন শাসন শক্তিই স্বীকার করিবে না যে বাহুবলেই তাহার উদ্ভব। শক্তিদ্বারা, বাহুবলের দ্বারা যে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না, বাহুবল একমাত্র সম্বল হইলে যে শাসনাধিকার জন্মাইতেই পারে না, একথা জগতের সমস্ত শাসন তন্ত্রই সহজসংস্কারবশে অবগত আছেন। এই জন্যই প্রাচীন কালের ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া যখন দেখিতে পাই নানা প্রতিদ্বন্দ্বী

শক্তির সংঘর্ষ চলিতেছে, সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা বিধ্বস্ত করিয়া পরস্পরের বলপরীক্ষা চলিতেছে, তখন দেখি প্রত্যেক পক্ষের তরফ হইতে একই দাবী উঠিতেছে "আমিই প্রাচীন, আমিই সনাতন; এখন একটা বাহুবলের দ্বন্দ্বপরীক্ষা চলিতেছে বটে, কিন্তু মূলে আমার প্রতিষ্ঠা বাহুবলের উপর নহে; অন্য দাবীর বলে, অন্য অধিকার সূত্রে আমার প্রতিষ্ঠা; এখন যে অশান্তি বিগ্রহের মধ্যে আমাকে লিপ্ত দেখিতেছ, ইহার পূর্ব্বে সমাজ আমারই দখলে ছিল; আমারই অধিকার ন্যায়সঙ্গত অধিকার; এখনই কেবল এই সকল প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়া আমার ন্যায্য অধিকার লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়াছে।"

ইহা হইতেই প্রমাণ হইতেছে যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈধ অধিকারতত্ত্ব শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহার প্রতিষ্ঠা অন্যত্র। বাস্তবিক পক্ষে এই যে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি অন্ততঃ তত্ত্বের হিসাবে বাহুবলের দাবী অস্বীকার করিতেছে, ইহার তাৎপর্য্য কি? তাহারা নিজেরাই ঘোষণা করিতেছে যে রাজনৈতিক অধিকারতত্ত্বের মূল বাহুবল নয়, অন্যত্র; যুক্তি ও ন্যায় ধর্ম্মের উপরই ইহার প্রতিষ্ঠা; এবং সকলেই নিজ নিজ শক্তি যে যুক্তিমূলক, ন্যায়মূলক তাহাই প্রচার করিতে চাহিতেছে। তাহাদের প্রতিষ্ঠা যে কেবল বাহুবলে একথা কেহ মনে করে ইহা চান না বলিয়াই তাঁহারা প্রাচীনত্বের দোহাই দিয়া অন্য ভিত্তির উপর তাঁহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে চান। অতএব শাসনাধিকারবৈধতার প্রথম লক্ষণ দাঁড়াইল এই যে এ বৈধতা বাহুবলের দাবী অস্বীকার করে এবং শুধু নৈতিক শক্তির দাবী, যুক্তি ও ন্যায় ধর্ম্মের দাবীই গ্রাহ্য করে। এই শেষোক্ত মূল হইতেই অধিকারবৈধতাতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ। কিন্তু এই বিকাশসাধনে প্রাচীনত্ব ও দীর্ঘকালব্যাপ্তি সহায়তা করিয়াছে। কিরূপে করিয়াছে তাহা এবার দেখা যাউক।

কার্য্যতঃ বাহুবলের সাহায্যেই সর্ব্বপ্রকার শাসনতন্ত্র ও সমাজব্যবস্থার জন্ম হয়। তৎপর সময় যত অতীত হইতে থাকে, ততই কালের ধর্ম্মে বাহুবলের, বাহুশক্তির ক্রিয়াকলাপ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, সংস্কৃত ও সংশোধিত হইতে থাকে। সমাজ অনেক দিন ধরিয়া টিকিয়া থাকার দরুণই, সমাজ মানুষ লইয়া গঠিত বলিয়াই এই পরিবর্ত্তন, এই সংস্কার সাধিত হয়। মানুষ নিজের অন্তরের মধ্যেই শৃঙ্খলা, যুক্তি ও ন্যায়ধর্ম্ম বিষয়ে কতগুলি ধারণা পোষণ করিয়া থাকে; সে সেই ধারণাগুলি নিজের জীবনে ও সামাজিক জীবনে অনুপ্রবিষ্ট করাইতে চায়। সে অবিরামভাবে এই কার্য্যসাধনে নিরত; এবং যে সমাজের মধ্যে তাহার কার্য্যক্ষেত্র, সে সমাজ যদি টিকিয়া যায়, আকস্মিক বিপ্লব বা অন্য কোন কারণে সামাজিক জীবনের গতিপ্রবাহ যদি খণ্ডিত না হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার চেষ্টার ফলও কিছু ফলে। মানুষ তখন যে সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে নিজের জীবন যাপন করে, সেই সামাজিক ব্যবস্থাকেই যুক্তিমূলক, নীতিমূলক ও ন্যায্য অধিকারমূলক মনে করিয়া লয়।

মানুষের চেষ্টা ছাড়া বিধাতারও এমন একটি বিধান আছে যাহাতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শৃঙ্খলা, যুক্তিযুক্ততা ও ন্যায়ধর্ম্ম ব্যতিরেকে কোন সমাজই টিকিয়া থাকিতে পারে না। এ বিধানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হওয়া অসম্ভব, প্রাকৃতিক জগৎ যেরূপ বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এও সেইরূপ বিধান। কোন একটা সমাজ যদি অনেক দিন ধরিয়া টিকিয়া থাকে,

তাহা হইতেই আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে সে সমাজ একেবারে বুদ্ধিবিচারবর্জ্জিত বা ধর্ম্মবর্জ্জিত নহে, যে বিচারবুদ্ধি, সত্যদৃষ্টি ও ন্যায়বোধ সমাজকে জীবনশক্তি দান করিতে একমাত্র সমর্থ, তাহা হইতে সে সমাজ একেবারে বঞ্চিত হয় নাই। উপরন্তু যদি দেখা যায় যে ঐ সমাজ ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছে, ক্রমশঃ পুষ্টি ও শক্তিলাভ করিতেছে, তাহার শাসন, তাহার ব্যবস্থা দিনে দিনে অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে সে অধিকতর পরিমাণে বিচারবুদ্ধি, ন্যায়বোধ ও যথার্থ অধিকার অর্জ্জন করিয়া চলিয়াছে বলিয়াই তাহার এই উন্নতি।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে জগদ্ব্যাপারের মধ্যেই, এবং জগদ্ব্যাপার হইতে মানুষের মনের মধ্যে এই বৈধ অধিকারতত্ত্ব অনুস্যূত রহিয়াছে। এই তত্ত্বের মূল প্রতিষ্ঠা ও প্রথম উদ্ভব, অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে, ধর্ম্মবোধ, বিচার বুদ্ধি ও সত্যদৃষ্টি হইতে; পরে কালব্যাপ্তিতে ইহার পুষ্টি হয়, কারণ দীর্ঘকালস্থায়িত্বের দ্বারা ইহাই কতকটা পরিমাণে প্রতিপন্ন হয় যে বাস্তবঘটনার মধ্যে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, বাহ্যজগতের মধ্যে যথার্থ বৈধ অধিকারতত্ত্ব প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আমরা যে যুগের ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইতেছি, সে যুগে দেখিব রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, গণতন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের শৈশবশয্যার উপরে পশুশক্তি ও মিথ্যাচার আপন আপন ছায়া বিস্তার করিয়া আছে; সর্ব্বত্রই দেখিবেন পশুশক্তি ও মিথ্যাচার অল্পে অল্পে কালের নিয়োগে সংযত হইয়া উঠিতেছে, ন্যায্য অধিকার ও সত্যবোধ ক্রমশঃ সভ্যতার মধ্যে তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া বসিতেছে। সমাজব্যবস্থার মধ্যে এই যে ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা, ইহা হইতেই ধাপে ধাপে শাসন ক্ষেত্রে বৈধ অধিকারের ধারণা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে; এইরূপেই আধুনিক সভ্যতার মধ্যে এই ধারণা, এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

অতএব যখন বিভিন্ন সময়ে ন্যায়-ধর্ম্মনিরপেক্ষ স্বেচ্ছাতন্ত্র শক্তির পক্ষ হইতে এই বৈধ অধিকার তত্ত্বের দোহাই দিবার চেষ্টা হইয়াছে তখন এই তত্ত্বটিকে ইহার প্রকৃত মূল হইতে বিকৃত করা হইয়াছে। স্বেচ্ছাতন্ত্রের ধ্বজা হওয়া দূরে থাকুক, ন্যায় ও সত্যের নামেই এই তত্ত্বটি জগতে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। এ তত্ত্ব কখনও একপক্ষপাতী হইতে পারে না; ইহা কাহারও একচেটীয়া সম্পত্তি হইতে পারে না; যেখানেই সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা সেখানেই এই তত্ত্বের উদ্ভব হয়। ইহা স্বাধীনতার পক্ষেও প্রযোজ্য, শক্তির পক্ষেও প্রযোজ্য, ইহা ব্যক্তিবিশেষের অধিকারও বিচার করিতে পারে, সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের বিচার করিতে পারে। আমরা যত অগ্রসর হইব তত দেখিব নানা বিভিন্ন প্রকৃতির পরস্পরবিরোধী সমাজব্যবস্থার মধ্যে এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

রাজতন্ত্রের মধ্যেও ইহার যেরূপ প্রতিষ্ঠা, মধ্যযুগের ভূস্বামীতন্ত্রের মধ্যে, ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর পৌরতন্ত্রের মধ্যে এবং ইটালীর জনতন্ত্রের মধ্যেও ইহার সেইরূপ প্রতিষ্ঠা দেখা যায়। আধুনিক সভ্যতার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এই তত্ত্বটি বিস্তৃত হইয়া তাহাদিগকে একটি বিশিষ্ট প্রকৃতি দান করিয়াছে, এবং আধুনিক সভ্যতার ইতিহাস বুঝিতে তত্ত্বটি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

এই ত গেল প্রথম তত্ত্ব। আধুনিক সভ্যতার নানা বিরুদ্ধ উপাদানের তরফে একই কালে যে প্রাচীনত্বের দাবী, তাহা হইতে আর একটি দ্বিতীয় তথ্য যে উদ্ধার করা যায় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এখন সেইটির আলোচনা করা যাউক। সে তথ্যটি হইতেছে ইউরোপের বর্ব্বরযুগের যথার্থ প্রকৃতি। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রত্যেক অঙ্গই দাবী করিয়া থাকে যে এই যুগে সমগ্র ইউরোপে তাহারই একমাত্র অধিকার ছিল; সুতরাং এটা নিশ্চয় যে এযুগে কাহারও একাধিপত্য ছিল না। জগতে কখনও যদি একমাত্র সমাজব্যবস্থার প্রাধান্য থাকে তাহা হইলে সেটাকে চিনিয়া লওয়া তত কঠিন হয় না। দশম শতাব্দীতে আসিয়া দ্বিধাশূন্য হইয়া বলিতে পারি যে এ যুগে ভূস্বামীতন্ত্রের প্রাধান্য, সপ্তদশ শতাব্দীতে যে রাজতন্ত্রের প্রাধান্য, একথা জোর করিয়া বলিতে আমাদের কোন সঙ্কোচ হইবে না, ফ্লাণ্ডার্সের পৌরতন্ত্র বা ভারতীয় জনতন্ত্ররাষ্ট্রগুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমরা তৎক্ষণাৎ বলিতে পারি যে ইহাদের মধ্যে প্রজাতন্ত্রতত্ত্বের আধিপত্য। যেখানে বাস্তবিকপক্ষে সমাজে কোন বিশেষ শক্তির আধিপত্য বা প্রাধান্য আছে, তাহা বুঝিতে কোন ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই।

অতএব ইউরোপীয় সভ্যতার উৎপত্তিকালে কাহার প্রাধান্য ছিল এই লইয়া বিভিন্ন শাসনতন্ত্রের মধ্যে যে কলহ তাহা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে তাহারা সকলেই এককালে পাশাপাশি বর্ত্তমান ছিল, এবং কোন শাসনতন্ত্রেরই প্রাধান্য এতটা ব্যাপক ছিল না যে তদ্দারা সেই সমাজের নামকরণ বা আকৃতিপরিচয় হইতে পারে। (ক্রমশঃ)

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত এবং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

ব্যাঘ্রধর্ম্ম

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আমাদের দেশে স্বরাজ, স্বায়ত্তশাসন বা হোমরুল বিষয়ে বিস্তর আলোচনা আন্দোলন প্রভৃতি হইতে থাকায় আমাদের ভাগ্যবিধাতারা এই সম্বন্ধে একটা না একটা মতামত না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উদারভাবে আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি গভীর সহানুভূতি এবং অনুগ্রহ জানাইয়াছেন, তবে কিনা এইটুকু পুনশ্চ দিয়াছেন যে ওসব বিষয় তাড়াতাড়ি অথবা রাতারাতি হইবার বিষয় নয়। আর অপর একদল, যাঁহারা কথায় অত মার প্যাঁচ বোঝেন না, অথবা বুঝিলেও ঠিক ব্রাকেটের মধ্যে পদাঘাত করাটা পছন্দ করেন না পরন্তু তদপেক্ষা সুস্পষ্টভাবে পদাঘাত করা বাঞ্ছনীয় মনে করেন, তাঁহারা খোলাখুলিই বলিয়াছেন যে এই সমস্ত আমাদের দাবী দাওয়া বাতুলের প্রলাপ মাত্র, শুধু তাহাই নয়, একান্ত অসঙ্গত ও অপ্রাসঙ্গিক, কারণ ভারতবর্ষ তাঁহারা অসিবলে জয় করিয়াছেন এবং অসিবলেই তাহা রাখিবার সঙ্কল্প রাখেন; এবং এ সম্বন্ধে যাহারা কোন কথা বলিতে বা প্রতিবাদ করিতে আসে তাহাদিগকে

ব্রিটিশসিংহের tiger qualities অথবা ব্যাঘ্রধর্ম্ম প্রদর্শনদ্বারা সায়েস্তা রাখিতে হইবে। (কথাটা একটু জীববিজ্ঞানের বিরোধী হইল পাঠক মাপ করিবেন।)

আমরা অবশ্য তাহাতে অত্যন্তই বিরক্ত হইয়া থাকি, অপমান যে হইল সে জন্য অবশ্য ততটা নয়, কারণ সেটা উভয়েরই প্রায় সমান ; তবে অপমান করিতে হইলেও সেটা ভদ্রভাবে করাই বাঞ্ছনীয়, স্পষ্টতঃ দাঁতখিচুনীটা পরম অভব্য বলিয়া মনে হয়। মহানুভব উদার-হৃদয় মার্জ্জিতরুচি ভারতবন্ধুগণ একবাক্যে এরূপ অভদ্রতার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া থাকেন কিন্তু স্থির ভাবে ভাবিয়া দেখিতে গেলে কি মনে হয় না যে শেষের জবাবটি কিছু কড়া রকমের হইলেও সেইটার ভিতরই সারবত্তা বেশী ? "ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" এই ভদ্রজনোচিত উপদেশের ইহা বিরোধী হইতে পারে, কিন্তু হিতকারিত্ব ও মনোহারিত্ব এই দুটী গুণের শেষোক্তটির কিছু অভাব থাকা সত্ত্বেও প্রথমোক্তটির অভাব যদি না থাকে তবে ইহাকে গ্রহণ করা সম্বন্ধে বোধ হয় কাহারও বিশেষ মতভেদ হইবে না।

সত্য কথা বলিতে গেলে, শুধু ইংরাজ কর্ত্তৃক ভারতাধিকার নয়, প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া এই অর্ব্বাচীন বিংশশতাব্দীর মহাসমর পর্য্যন্ত, সকল দেশের ইতিহাসেই কি আমরা দেখিতে পাই না যে tiger-qualities বা ব্যাঘ্রধর্ম্মের সদ্ভাব অসদ্ভাবের উপরই জয় পরাজয় নির্ভর করিয়াছে ? একথায় সায় দিতে আমাদের সহসা প্রবৃত্তি হয় না। ইংরাজিতে একটা প্রবচন আছে "Wish is father to the thought"। সেই প্রবচনানু-যায়ী আমাদের ইহাই প্রমাণ করিতে ইচ্ছা হয় যে যখনই কোন সভ্যতা অপর কোন সভ্যতাকে, কোন জাতি অপর কোন জাতিকে গ্রাস করিয়াছে এবং অল্পাধিকপরিমাণে তাহার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে, তখন পূর্ব্বোক্ত সভ্যতার উৎকর্ষই সেই জয় অথবা সেই সফলতার কারণ। আপাতদৃষ্টিতে কোন কোন দৃষ্টান্ত এই মতকে সমর্থনও করে। প্রথমেই আমরা হয়ত বলিব যে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় যে আদিম অধিবাসিগণ ছিল এবং যাহাদিগের বংশধরগণ আজকাল zoological specimen হিসাবে কথঞ্চিৎ পরিমাণে জীবনধারণ করিয়া আছে, তাহারা উচ্চতর, উন্নততরসভ্যতাবিশিষ্ট শ্বেতকায় উপনিবেশিকগণের সংঘর্ষে আসিয়া উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে ; উচ্চতর সভ্যতার সঙ্গে নিম্নতর সভ্যতার সংঘাত ঘটিলেই কথামালা বর্ণিত কাংস্য পাত্র ও মৃন্ময় পাত্র বিষয়ক গল্প অনুসারে শেষোক্তটির বিনাশ অনিবার্য্য। অষ্ট্রেলিয়ার Bushmenদিগের সম্বন্ধেও বোধ হয় একই কথা বলা হইবে।

এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। সাধারণতঃ যে অর্থে আমরা সভ্যতাকে উচ্চ বা নীচ আখ্যায় অভিহিত করি তাহা কোন্ লক্ষণ বিচার করিয়া ? আমার ত মনে হয় যে জাতি বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, ধর্ম্মনিষ্ঠতায়, সামাজিক আচারব্যবহারে আদর আপ্যায়নে, এক কথায় বলিতে গেলে জীবনের কমনীয়তায় ও মাধুর্য্যে অপর কোন জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর তাহাকেই আমরা সভ্যতর বলিয়া মনে করিয়া থাকি। এভাবটা আমাদের মনে এতই দৃঢ়বদ্ধ, যে সভ্য বলিলে আমরা ভব্যই বুঝিয়া থাকি। সুতরাং যে সভ্যতা যে পরিমাণে নম্রতা, বিনয়, ভব্যতা, ধর্ম্মশীলতার পরিপুষ্টি সাধনে সহায়তা করে, সে সভ্যতা সেই পরিমাণে উচ্চ। এ ধারণা ঠিক কিনা সে তর্ক এখন করিতে চাই না, কিন্তু ইহাই মোটামুটিভাবে

আমাদের সাধারণ ধারণা। তাহাই যদি হয় তবে এই প্রশ্ন তুলিতে আমরা বাধ্য যে, যে সব গুণকে আমরা বিশেষভাবে সভ্যতার লক্ষণ মনে করিয়া থাকি সেই সব গুণের প্রাচুর্য্য হেতুই কি অষ্ট্রেলিয়া অথবা আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিক আদিম অধিবাসিগণের ধ্বংস সাধন করিয়াছে? Pizarro অথবা Cortesএর অনুবর্ত্তী স্পানিয়ার্ডগণের অথবা Botany Bayতে নির্ব্বাসিত কয়েদীদিগের ধর্ম্মনীতি ও সভ্যতা কি এতই উঁচুদরের ছিল যাহার দরুণ দুই এক শতাব্দীর ভিতরেই সেই দেশের আদিম অধিবাসিগণ একেবারে লুপ্তপ্রায় হইয়া গেল? এতবড় অসম্ভব কথা বোধ করি কেহ বলিবেন না। কোন কোন গুণে তাহারা যে শ্রেষ্ঠতর ও দুর্দ্ধর্ষতর ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেগুলি আমরা যাহাকে সভ্যতা আখ্যা দিই তাহা নহে, সেগুলি হইল সেই tiger qualities।

এগুলি ত গেল প্রতিপক্ষের দৃষ্টান্ত; স্বপক্ষে দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্য আর বেশী হাতড়াইয়া বোধ হয় বেড়াইতে হয় না, কারণ "যে দিকে ফিরাই আঁখি" সে দিকেই তাই দেখি। স্যাক্সন ও দিনেমার জলদস্যুদিগের হাতে প্রাচীন ব্রিটনের দুর্দ্দশা, মহম্মদঘোরী ও সুলতান মামুদের হাতে হিন্দু ভারতের লাঞ্ছনা, অষ্ট্রগথ, ভিসিগথ, সুয়েভা, আলেমান প্রভৃতি বর্ব্বর জাতিদিগের প্রকোপে বিশাল রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংস, এই সমস্ত ঘটনা স্পষ্টতঃই দেখাইয়া দিতেছে যে ব্যাঘ্রধর্ম্মই সেরা ধর্ম্ম, অন্ততঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে।

এই সমস্ত দৃষ্টান্তে ও উদাহরণে, বিশেষতঃ এই সিদ্ধান্তে আমাদের মানবোচিত আত্মাভিমানে কিছু আঘাত লাগে, তাহা স্বীকার করি। আমরা মানুষ ও অ-মানুষ জন্তুদিগের মধ্যে এমন একটা সুদূর পার্থক্য ও অভিমানের প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছি, যে কোন বিষয়েই জন্তুর সামিল হওয়াই যেন মস্ত একটা লজ্জার কথা। "পশু" অথবা "জন্তু" বলিয়া কাহাকেও অভিভাষণ করিলে মানহানির মোকদ্দমা আশঙ্কা করা হইতে পারে। কিন্তু পশুত্বকে বর্জ্জনীয়ের কোটায় ফেলিয়া আর বোধ হয় জীবনাতিপাত চলিতেছেনা। মানবসুলভ গর্ব্ব ও মত্ততা ছাড়িয়া স্থির ধীরভাবে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকের চক্ষে দেখিলে আমরা কি দেখিতে পাই? জগতে জীবনসংগ্রামে টিঁকিয়া থাকিতে হইলে অভাব পূরণ করিতে হইবে, প্রয়োজনানুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে, নীতি বা ধর্ম্মের কোন বালাই থাকিবে না, বাধাবন্ধহীন দ্বিধালেশহীন শক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে, ইহার অধিক বিচারবিতর্কের প্রয়োজন নাই। ইহাকেই ব্যাঘ্রধর্ম্মের মোটামুটি সংজ্ঞাভাবে গ্রহণ করিলে চলিতে পারে।

যদিও মানুষ নিজেকে বড় মনে করে এবং নিজেকে পশুভাবাপন্ন মনে করিতে অত্যন্ত ঘৃণা বোধ করে, তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যেখানেই মানুষ এই শার্দ্দুল প্রকৃতির সমধিক বিকাশ দেখিতে পায় সেই খানেই সে সভয় ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া থাকে। যেখানে লোকে দেখে যে একটা লোক সহস্র বাধাবিঘ্ন পায়ে ঠেলিয়া সহস্র বিপত্তিকে উপেক্ষা করিয়া বিরুদ্ধ শক্তিকে পদদলিত করিয়া আপন সংকল্প সিদ্ধ করিয়াছে, আপনার বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছে, তখনই তাহাকে বীর বলিয়া তাহার পদতলে প্রণত হইয়া পড়ে। তাহার কার্য্যাবলী ধর্ম্মানুমোদিত না হইতে পারে, নীতিপুস্তকের চতুঃসীমানার মধ্যেও তাহা না পড়িতে

পারে, কিন্তু যদি তাহার বীর্য্য, ধৈর্য্য, সাহস, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রভৃতির গুণে সে জগতের ইতিহাসে সাফল্য লাভ করিতে পারে, তাহা হইলেই সে Great পদবাচ্য হইয়া থাকে। যাহা কিছু বৃহৎ, যাহা কিছু প্রবল, যাহা কিছু ভয়ঙ্কর, তাহাই যেন মানবের অন্তর্নিহিত যে পাশবতা, যে নগ্ন শক্তিপ্রিয়তা রহিয়াছে, তাহাতে ইন্ধন প্রয়োগ করে। সেইজন্যই মানবের ভাষাতেও নরশ্রেষ্ঠের অপর নাম নরশার্দ্দূল। এই আখ্যাতেই মানুষের অন্তঃস্থিত আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণা কোন্ দিকে তাহা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হইতেছে। এবং আমরা সচরাচর যাহাকে পুরুষত্ব বা পৌরুষ নামে অভিহিত করিয়া থাকি, তাহাও বোধ করি এই tiger qualitiesদিগের সমাবেশের কাছাকাছি একটা কিছু জিনিষ হইবে। সুতরাং দেখিতে পাইতেছি যে, অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা হইলেও, ব্যাঘ্রধর্ম্মই প্রকৃত মনুষ্যত্ব, অন্ততঃ সাধারণতঃ আমরা যাহাকে মনুষ্যত্ব বলিয়া থাকি। জানিনা বৃহল্লাঙ্গূল মহাশয় আপত্তি করিবেন কিনা; কারণ তিনি বলিতে পারেন যে ক্ষীণজীবী মনুজের সহিত মহাপ্রাণ বৃহল্লাঙ্গূল সম্প্রদায়কে একধর্ম্মাক্রান্ত করা অত্যন্ত ধৃষ্টতার কার্য্য; তবে অবশ্য যখন আমরা মহাপ্রাণ সম্প্রদায়কে আমাদের ক্ষীণজীবী সমাজের আদর্শরূপে ধরিয়াছি, তখন তিনি আমাদের মার্জ্জনা করিলেও করিতে পারেন।

রহস্য ছাড়িয়া গম্ভীর ভাবে ভাবিতে গেলেও কথাটা কতক পরিমাণে হেঁয়ালীর মত শুনায়। কোথায় মানুষকে প্রাণিজগতের অত্যুচ্চে স্থান দিব, না একেবারে মানুষের আদর্শ, মানবের পুরুষত্বের আধার হইল tiger qualities? কিন্তু কথাটাতে এতটা চমকিত হইবার বিশেষ কারণ নাই। মানুষের যে শক্তিমত্তা, শক্তিপ্রিয়তা, শক্তির উপাসনাকে আমরা মোটামুটীভাবে ব্যাঘ্রধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছি, বাস্তবিক কি তাহা মানবের চরিত্রের সর্ব্ববিধ দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার ভিত্তি নয়? আমার ত মনে হয় যে জীবনের কিংবা চরিত্রের কোমলতা, নমনীয়তা, মাধুর্য্যই বড় জিনিষ নয়, তদপেক্ষা পাকা জিনিষ হইতেছে, সাহস ও স্বাধীনতা।

এক কথায় বীরত্বই মনুষ্যত্বের ভিত্তি। বীরত্বের মধ্যে অনেক সময়ে নৃশংসতা, নির্ম্মমতা ও নিষ্ঠুরতা আসিয়া পড়ে বটে, কিন্তু একথাও অবশ্যস্বীকার্য্য যে এই বীরত্ব হইতেই এ জগতের সকল বড় আন্দোলন, সকল বড় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, সকল বড় মহৎ কার্য্যের উৎপত্তি। ভিতরের মজ্জাগত এই যে শক্তি অথবা Energy ইহা যখন ধ্বংসের কার্য্যে প্রযুক্ত হয় তখন বিভীষিকা উৎপাদন করে বটে, কিন্তু এই শক্তিই যখন জগতের মঙ্গলের জন্য, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্য, মনুষ্যের আশা আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য নিয়োজিত হয়, তখন তাহারও অভাবনীয় ফলোপধায়কতা দেখিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত হইতে হয়। সকল সময়ে এই শক্তির প্রয়োজনের সার্থকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ থাকা যায় না, তথাপি সেই নিরর্থক শক্তির অপব্যয়ও আমাদিগের মনের উপর একটা ভয়ঙ্কর আকর্ষণ বিস্তার করিয়া থাকে। য়ুরোপের ইতিহাসে আমরা এই যে একটা জিনিষের পরিচয় পাই, এই যে একটা উদ্দাম শক্তিলিপ্সার ও শক্তিক্ষয়ের দৃষ্টান্ত দেখি, যতই কেননা নিরীহ সত্ত্বগুণোপেত আমরা তাহাকে অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিতে পারি না।

পেরু কিংবা ক্যালিফর্ণিয়ার সুবর্ণ খনির লোভে মানুষ কিপ্রকারে সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়াও দলে দলে মরুপথে ছুটিতে পারে তাহা বরং কতকটা আমরা বুঝিতে পারি; কিন্তু মধ্য আফ্রিকার শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যের ভিতরে, অথবা উত্তরমেরু কিংবা দক্ষিণ মেরুর চিরতুষারাবৃত মরুতটে অথবা দুর্জ্জয় হিমগিরির উচ্চতম শিখরদেশে, শুদ্ধমাত্র ভৌগোলিক কৌতূহল চরিতার্থ করিতে মানুষ কি করিয়া জীবন পণ করিতে পারে তাহা আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে সুচারুভাবে বিমান চালনের কৌশল আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত কত শত লোক যে প্রাণ দান করিল, তাহা ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। কিন্তু প্রতীচ্যের এই উদ্যমের, উৎসাহের, প্রচেষ্টার যেন আর বিরাম নাই। বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, কলায়, কৌশলে, বাণিজ্যে, এক কথায় বলিতে জীবনের প্রায় সর্ব্ববিভাগেই এই শক্তি, এই উদ্যম নব নব পন্থার আবিষ্কার সাধন করিতেছে। আমরা অবশ্য এই প্রতীচ্য শক্তিউপাসনাকে Romano-Gothic বর্ব্বরতার প্রত্যক্ষ নিদর্শন বলিয়া মনে করি; এবং ইহা ভাবিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হই যে তবু যাহা হউক সুসভ্য খৃষ্টীয় ধর্ম্ম এই বর্ব্বরতার রাশ কতকটা টানিয়া ধরিয়াছে, নতুবা পৃথিবীতে অন্যান্য জাতির বাস করা অসম্ভব হইত। একথা আমিও অস্বীকার করি না। আমারও মনে হয় যে শান্তরসাস্পদ মৈত্রীমূলক খৃষ্টধর্ম্মের শীতল প্রলেপে য়ুরোপীয় বর্ব্বরতার প্রকুপিত বায়ুকে কথঞ্চিৎ প্রশমিত রাখিয়াছে, কিন্তু তথাপি এই দুইটী জিনিষ, এই বর্ব্বরতা ও এই বীরত্ব, এই নৃশংসতা ও এই নিঃশঙ্কতা একই কারণ হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। যে বেলজিয়ম কঙ্গোতে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে, এবং যে বেলজিয়ম স্বদেশে নির্ভীকভাবে অমানুষিক অত্যাচার সহিয়াছে, তাহা একই বেলজিয়ম বলিয়া মনে হয়। খৃষ্টধর্ম্ম জগতের প্রভূত উপকার করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐ রোমানোগথিক বংশের আদিম মৌলিক বর্ব্বরতা না থাকিলে বর্ত্তমান জগৎ বিংশ শতাব্দীর জগৎ হইয়া উঠিত কিনা সেবিষয়ে সন্দেহ আছে। অনিগ্রহত্রাস বিনীতসত্ত্ব ভারতীয় তপোবনের প্রাচীন সাধনার উত্তরাধিকারী আমাদিগের হয়ত মনে হইতে পারে যে বিংশ শতাব্দীর জগতে এমন কোন মাধুর্য্য নাই যাহা না হইলে আমাদের চলিত না; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর জগৎ ত আমাদের সেই অভিমানের জন্য নিজেকে কিছুমাত্র দূরে রাখিয়া চলিতেছে না, আমাদের সমস্ত বাধা নিষেধ আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া হুড়মুড় করিয়া আসিয়া আমাদের কাঁধের উপর চাপিয়া বসিয়াছে।

এখন সুতরাং প্রধান প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে যে আমাদিগের খৃষ্টধর্ম্ম অথবা বৈষ্ণবধর্ম্মে কাষ চলিবে কিনা। যতদূর দেখা যায় তাহাতে ত মনে হয় যে "একগালে চড় দিলে অন্য গাল পাতিয়া দিতে হইবে" এই ধর্ম্মের অনুশীলন করিলে কাল হইতে কালান্তরে এবং দেশ হইতে দেশান্তরে দুই গালেই কেবল মুহুর্মুহুঃ চড়ই খাইতে হইবে। "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা অমানিনা মানদেন" হরি সদা কীর্ত্তনীয় কিনা সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার অবস্থা যে বিশেষ লোভনীয় হইয়া উঠিবে না ইহাতে কোন সংশয় নাই, পরন্তু ইহাই স্থির-নিশ্চিত বলিয়া বোধ হয় যে

তৃণের ন্যায় সুনীচ হইয়াই চিরকাল কাটাইতে হইবে, ইহা হইতে উচ্চে উঠিবার দুরভিসন্ধি দুঃসাহস বলিয়াই পরিগণিত হইবে। এই প্রেমের ধর্ম্ম, ত্যাগের ধর্ম্ম, দীনতার ধর্ম্মকে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তির পথে অন্তরায় বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় যে দেশে এক শতাব্দী পূর্ব্বেও "Entbehren sollst du sollst entbehren" (ত্যাগ কর, তোমাকে ত্যাগ করিতেই হইবে) এই মন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছিল আজ সে দেশ Uebermensch (অতিমানুষ) এর আদর্শে আচ্ছন্ন হইয়া weltmacht এরজন্য তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে। ভাবিয়া দেখিলে বিস্ময়ের বিষয় এই যে দেশে বাই-বেলের ধর্ম্ম প্রচারিত সে দেশ হইল শক্তিলিপ্সু, আর যে দেশে গীতাধর্ম্মের প্রচার সেই দেশ হইল শান্তিপ্রিয়। কিমাশ্চর্যামতঃপরম্।

বাস্তবিক কি দীনতার ধর্ম্ম, অনুশোচনার ধর্ম্ম, আত্মগ্লানির ধর্ম্ম মানুষের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মকে জাগরিত করে, না স্বাধীনতা, প্রতিষ্ঠা এবং আত্মপ্রত্যয়ের ধর্ম্ম মানবজীবনকে পূর্ণ পরিণতি প্রদান করে? অন্ততঃ একথাও স্বতঃই মনে উদিত হয় যে নিয়ত নিজের দোষ ত্রুটির আলোচনা করিলে, আত্মবোধের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষায় নিয়োজিত থাকিলে মনের কি একরকম অস্বাভাবিক অবস্থা হয় যাহা সুস্থ সবল জীবন যাপনের পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে। স্বভাবতঃ মানুষ নিজে নিজের উপর প্রত্যয়শীল এবং নির্ভরশীল, এবং সেই নির্ভরের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া দেওয়াই সহজ ধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়। আলাপে ব্যবহারে, কথায় এবং চিন্তাতেও সব সময়ে নিজেকে দীনহীন এবং খাটো বলিয়া জ্ঞান করিতে করিতে বাস্তবিকই মানুষের চরিত্র যেন নিস্তেজ ও খাটো হইয়া আসে। সুতরাং মানুষের শক্তির পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে হইলে এ পথ প্রকৃত পথ নহে। নেতা কিংবা চালক কখনও এ পদার্থে নির্ম্মিত হইতে পারে না। সাঙ্গোপাঙ্গ পারিষদ অনুচর প্রভৃতি বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইলে বোধ হয় ততটা ক্ষতির সম্ভাবনা নাই; কিন্তু তৃণাদপি সুনীচেন একজন নেতাদ্বারা যে কিরূপে বিজয় লাভ করা যায়, তাহা আমাদের ধারণার অতীত। নেতার ধর্ম্মকে আমরা যদি ব্যাঘ্রধর্ম্ম নামে আখ্যাত করি, নীতের ধর্ম্মকে আমরা সেই অনুসারে মেষধর্ম্ম নাম দিতে পারি। নৈয়ায়িকের গড্ডালিকা প্রবাহ ন্যায়েরও ভরসা করি এখানে কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

কবি গাহিয়া গিয়াছেন "মানুষ আমরা, নহিত মেষ" কেহ কেহ আবার কমাটীকে একটু খানি সরাইয়া দিয়া বলিতে চাহেন "মানুষ আমরা নহিত, মেষ।" ইহার কোন্ পদবিন্যাসটি যে যথার্থ তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদের সম্ভাবনা। আমার ত মনে হয় শেষোক্ত বিন্যাসটিই মোটামুটি সত্য, প্রথমটি আদর্শ মাত্র। খালি যে মনের দুঃখে আমাদের দেশ সম্বন্ধেই এবংবিধ করুণ কথা বলিতেছি তাহা নহে, বস্তুতঃই সকল দেশেই মানুষ জাতীয় লোকের অভাব, কিন্তু মেষজাতীয় লোকের অন্ত নাই। রবি বাবুর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে তাহারাই পনের আনা। তাহারা গতানুগতিক, তাহারা নীত হয়, চালিত হয়, চালাইবার ক্ষমতা কদাচ তাহাদের হয় না। ইহা লক্ষ্য করিয়াই Nietzsche ইহাদের অবলম্বিত নীতিকে Slave morality আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। তবে সৌভাগ্যবশতঃ একথাও সত্য যে এই মেষসুলভ নিরীহ নিস্পন্দ জীবনযাত্রা জীবনকে একেবারে অসাড় করিয়া ফেলে

বলিয়া সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে শার্দ্দূলবিক্রীড়িতচ্ছন্দে জীবনটাকে তরঙ্গিত করিবার অভিলাষ করেন; এবং নিজের জীবনে সে শুভ মুহূর্ত্ত যদি কখনও নাও আসে, তবে অন্ততঃ অন্য কাহারও জীবনসঙ্গীতের রুদ্রতাল অনুভব করিয়া হৃদয় পরিতৃপ্ত করেন। এই প্রেরণা যাহার মধ্যে যত বেশী তাহার জীবনের বৈচিত্র্য, মনুষ্যত্বের বিকাশ সেই পরিমাণে বেশী। এই প্রেরণাই মানুষকে অনাদিকাল হইতে বিপদের দিকে, অনাগত ভবিষ্যতের অজ্ঞেয় ভীষণতার দিকে দুর্নিবার ভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকে। রণবাদ্যের মোহ, সংগ্রামের মত্ততা এই প্রেরণা হইতেই উদ্ভূত। শত যুক্তি তর্ক বিরুদ্ধে থাকা সত্ত্বেও, সহস্র অসুবিধা ক্ষতি উৎপীড়ন স্পষ্ট প্রতীয়মান হওয়া সত্ত্বেও, এই জন্যই মানব হৃদয়ে সমরসাধ এত দুরপনেয়। ধীর স্থির সদ্বিবেচক জ্ঞানিগণ এইজন্য এত Hague Tribunal করিয়াও সমরনিবৃত্তি করিতে পারিতেছেন না। আর সম্পূর্ণরূপে সমরনিবৃত্তি হওয়া সম্ভবপর হইলেও সেটা মানব সমাজের পক্ষে উচিত হইবে কিনা সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ। শুধু একঘেয়ে একটানা টাকা—আনা—পাই সংক্রান্ত ব্যবসায় কারবার চিরদিন নিয়মিত ভাবে করিতে হইলে ত জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিবে। সমস্ত ভূভাগ latitude longitudeএ একেবারে নিশ্চিত ভাবে স্থিরীকৃত হইয়া লূতাতন্তুর ন্যায় রেলজালে আবৃত হইলে ব্যবসাদারের সুবিধা হইবে একথা নিশ্চয়, কিন্তু অকেজো পর্য্যটকের ভ্রমণানন্দ চিরকালের মত অন্তর্হিত হইবে।

আর একথাও ত বুঝিতে পারি না কেনই বা সমরে শ্রেষ্ঠতায় জাতির শ্রেষ্ঠতা নির্ণীত হইবে না। সমস্ত প্রাণিজগতের ভিতরে যে জীবনসংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে, তাহা ত শুধু সমরনিপুণতারই পরীক্ষাক্ষেত্র বলিয়াই মনে হয়; আধ্যাত্মিকতার চিহ্নমাত্র ত তাহাতে দেখিতে পাই না। শুধু জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষের সময়েই দয়াধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়া অযথা গোল পাকাইয়া তুলিবে? এত ত বড় অন্যায় আবদার। শক্তির পরীক্ষাই ত শেষ পরীক্ষা। যখন একটা জাতি আর একটা জাতি কর্তৃক পরাস্ত হইল, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে প্রথমোক্ত জাতি জীবন যুদ্ধোপযোগী উপকরণাদিতে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল; সে জাতির বংশের ধারা অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ। Weismannএর সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয় যে অর্জ্জিতগুণ সন্তানে অর্শে না, তাহা হইলে ত ঐ দুর্ব্বল জাতিকে বারবার শিক্ষা দীক্ষাদির দ্বারা সতেজ করিয়াও কোন স্থায়ী উপকার সাধিত হইবে না, কেবল লাভের মধ্যে ঐ দুর্ব্বল জাতির বংশবৃদ্ধি সমস্ত মানব জাতিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে। ইহাতেই কি humanityর উপকার সাধিত হইবে? আচার্য্য Huxley একবার Romanes Lecterеএ বলিয়াছিলেন বটে যে যুদ্ধে পারদর্শিতার সহিত উন্নত সভ্যতার কোন সম্পর্ক নাই, অর্থাৎ Survival of the fittest মন্ত্রের fittest সব সময়ে best নহে। সভ্যতার সাধারণ ধারণা—যাহা প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমরা দেখিয়াছি তদনুসারে ইহা সত্য হইতে পারে। কিন্তু যে best survive করিবেনা তাহাকে best বলিয়া আমরা অনর্থক আমাদের মনঃকষ্ট বাড়াই কেন? সেই best প্লেটোর archetype এর স্বর্গরাজ্যে স্বচ্ছন্দ ভাবে বসবাস করিতে পারে, কিন্তু এ মরজগতে তাহাকেই আমরা best বলিব, যাহা টিঁকিয়া থাকিতে পারে। এতদ্ভিন্ন সভ্যতার উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারের

অপর কোন কষ্টিপাথর নাই। সমরবাদের মূল সত্য এই খানেই। Might is right। পশুধর্ম্ম বলিয়া নাসিকাকুঞ্চন করিলে কোনই লাভ নাই mightই হইতেছে rightএর একমাত্র প্রমাণ।

এই শক্তির উপাসনা মানুষের শত ছলনা, শত আত্মপ্রতারণা সত্ত্বেও মানুষের হৃদয়ের সামগ্রী। সর্ব্বগ্রাসী শক্তির রুদ্র জ্বালা মানবমনকে অভিভূত করে, তথাকথিত ধর্ম্মবুদ্ধি মানুষের অন্তরতম শক্তিপূজাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না; এবং মানুষ নিজেও অপ্রতিহত শক্তি লাভ একান্ত ভাবে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। মানুষ তাহার শ্রেষ্ঠ পরিণতি এই ভাবেই লাভ করে। যখন মানুষ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তখন এই কথাটাই তাহাকে শোনাইবার যে দুর্ব্বলতা তাহার জন্য নহে, সে বিশ্বশক্তির আধার, তাহাকে জয়ী হইতে হইবে। সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে শক্তি সাধনাই তাহার করিতে হইবে।

গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ এই মন্ত্রই দান করিয়া গিয়াছেন

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ *

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

পুস্তক পরিচয়

ঋগ্বেদ—বেদমাতা গ্রন্থাবলী। শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

এখন বুঝিতেছি বইখানির আলোচনার ভার লওয়া আমার বুদ্ধির কাজ হয় নাই। প্রীতির অনুরোধে প্রীতির উত্তর দিতে যে এমন বিষম বুদ্ধির দায়সংযোগ, তা স্থূলচক্ষু আগে দেখিতে পায় নাই। বাদপ্রতিবাদের সোজাসোজি ব্যাপার এক বস্তু, আর গুণীর গুণমর্য্যাদা শিরোধার্য্য করিয়া সন্তর্পণে যে প্রতিবাদ সে বস্তু আর। ফলতঃ এই বইখানি যে আত্মপ্রত্যয় হইতে লিখিত তাহা এক সরল সজ্জন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন কৃতবিদ্য ব্যক্তিতেই সম্ভব, সুতরাং ইহাতে আমাদের মতন অজ্ঞ প্রত্যয়াবলম্বী লোকের নীরব থাকাই সঙ্গত মনে হয়। একেত এই সঙ্গতি লঙ্ঘনের ত্রুটী, তাহাতে গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত মহাশয়ের অপ্রীতি-সম্ভাবিত বিষয়ে আমাদের হস্তক্ষেপ, এই উভয় কারণে আগেই আমরা গ্রন্থকার মহাশয়ের ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

এখনকার দিনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বেদানুশীলনে যিনি জীবন যাপন করেন, তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। যিনি স্বাধীনভাবে বেদালোচনা করিয়া এটুকু অন্ততঃ বুঝিয়াছেন যে বেদ কোরাণ বস্তুতঃ এক, আজকাল তিনি তো সকলেরই সম্মানার্হ। ব্রাহ্মণ ভট্টাচার্য্য নহেন, উপাধি কি জাতীয় গৌরবের প্রত্যাশা রাখেন না, অথচ সত্যানুসন্ধানে যিনি

* এই প্রবন্ধটী বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে লিখিত; এবং শক্তির আদর্শের সপক্ষে একটা extrema tatement প্রকাশ করিবার নিমিত্তই লিখিত। ইতি লেখক।

ঋক্-সকলের শরণাপন্ন তিনি সকলেরই শ্রদ্ধাকর্ষণ করিবেন। তাঁহার কোন সিদ্ধান্ত যদি আমাদিগের ভুল মনে হয়, তবে তাহাও আমাদের আদরের ; কেননা এ ভুল তাঁহার সত্যানুসন্ধানেরই অন্তর্গত।

শাস্ত্রের একটী প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, "নানুসন্ধেঃ পরাপূজা"—অনুসন্ধান অপেক্ষা প্রকৃষ্ট পূজা আর নাই। বস্তু সাক্ষাৎকারের পরে বস্তু-পূজার আপ্তোক্তিকেই আমরা ঋক্ বলিয়া জানি, আর গ্রন্থকার মহাশয় যে বলিয়াছেন—"বেদা অনন্তাঃ"—তাহাও অবশ্য আমাদের শত শতবার স্বীকার্য্য, কিন্তু এইটুকু বলিলেই যে যথেষ্ট তাহা নহে। আমরা বলিতে চাই যে প্রত্যেক ঋক্ অনন্ত। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌ধৃত এই ঋক্‌ই তাহার প্রমাণ—

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
য ইত্তদ্ বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥

ঋকের বিভক্তিরহিত বা বিভাগবিবর্জ্জিত যে ব্যোম বা আকাশ, তাহা এক পরম অক্ষরে যথায় দেবগণ অধিবিশ্বে অর্থাৎ বিশ্বাধিক্যে আসীন থাকিতেন। যিনি তাহা না জানেন ঋক্ লইয়া তিনি কী করিবেন? যাঁহারা পাইয়া (ইৎ) তাহা জানিতেছেন ইহাঁদিগকে তাঁহারাই সমাস অর্থাৎ এক পদস্থ করেন।

এই তো ঐ ঋকের অনুবাদ, কিন্তু বুঝিতে গেলেই যে আমাদিগকে গোলমালে পড়িতে হয়। ঐ যে ব্যোম যাহাতে বিভক্তি বা বিভাগ নাই তাহা ত সুতরাং অনন্ত ও অখণ্ড। কিন্তু যাহা অখণ্ড ও অনন্ত তাহাতে বহু দেবতার সমাবেশই বা কি করিয়া হইতে পারে? খণ্ডরূপে দেবতাপদের অবতারণাই বা করি কিরূপে? অদিতির, অখণ্ডনীয়ার, সন্তান যে দেবতা তিনি স্বয়ং অখণ্ড বা অনন্ত ; সুতরাং একটি মাত্র অনন্তে বহু অনন্তের সমাবেশ ; এই কি উহার সদুত্তর? "অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্" বলিয়া উপনিষদ প্রমাণে যে আমরা মনে মনে ক্ষুদ্র এক অনন্ত এবং বৃহৎ এক অনন্ত, এই দ্বিবিধ অনন্তের ধারণা করিয়া বসি তাহা কি যুক্তিসঙ্গত ; অনন্তের ধারণাই আমাদের নাই, সুতরাং তাহার আবার প্রাপ্তি কিরূপ? "ইৎ" বলিতে ই ত গতি বা প্রাপ্তি, কিন্তু এই প্রাপ্তি কিসের? হয় বা কা'র।

অনন্ত বলিতে এক ; না, এক বলিতে অনন্ত? একে, একের পর্য্যায় দুই তিন চারি আদি সংখ্যা স্বতঃই চিত্তে উপস্থিত হয়, এবং এই সংখ্যার চরম বা শেষাবয়বেও শেষে অসংখ্যকে আনিয়া দাঁড় করাইতে হয়। এই অসংখ্যে ও অনন্তে বরং সজাতীয়। একে অনন্তে সমভাব কিসে? তারপর, একের আবার যে সব ভাগ, এই ভাগের শেষ ফলেও পাই সেই অনন্ত। যেমন ক্ষুদ্র বৃহৎ পরিমাণে, তেমনি অল্প বিস্তর সংখ্যায়, শেষে সেই অনন্ত। আবার যেহেতু শেষের শেষ অসম্ভব, অতএব শেষই অশেষ অনন্ত। ফলতঃ ইহাই যদি হয়, তবে, একে আর অনন্তে সম্বন্ধই ত নাই ; তবে অনন্তে একের ভাব মনে আসে কেন? এ সব কথা আসিবে পরে যথাক্ষেত্রে। এখন যে ঋকটি তুলিয়াছি, তাহাই বুঝি।

ঋগ্বর্ণের পরমাকাশই বলি, আর পূজার আপ্তোক্তির পরমাকাশই বলি, তাহাতে তেমন কিছু আসে যায় না, কিন্তু ঐ যে বলিয়াছেন বিশ্বাধিক্যে, উহাই আসল কথা। বিশ্বাধিক্যে, বিশ্বাতিরেকে, আর এক বিশ্বে, ইহাই মনে রাখিবার কথা। এই বিশ্বের কোনো আকাশ তা' নয়; কোথা সেই বিশ্ব, যার অন্তরীক্ষে অনন্তরূপী অমরগণ উপবিষ্ট রহিয়াছেন? যাহাতে তাঁহারা, তাহা ত পরম হইবেই; কিন্তু এই পরম বলিলে যে শ্রেষ্ঠ পরিমাণ, তাহার সাদৃশ্য এখানকার এই সকল নামরূপের কোথায়? অনন্ত-সম্ভাবিত পরিমাণ বা পরিমাণরাহিত্য সেই বিশ্বাতিরেকের অনন্ত অতিদেশেই সম্ভব; এখানে এদেশে তাহার তুলনা দিতেই বা কী আছে? এখন এই ঋক্ স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে, সে সকলের পরিচয় যিনি না পাইয়াছেন, ঋকে তাঁর কি দরকার? অতঃপর এই ঋকের শেষাংশটুকুর যে সহজ অর্থ, তাহা ক্রমশঃ পরে করিলেই চলিবে।

মানে, ঐ যে আপ্তোক্তি বলিয়া গিয়াছি, তার সোজা অর্থ আগে হওয়া চাই। আপ্তের উক্তি, আপ্তোক্তি; কিন্তু আপ্ত কার নাম? আপ প্রাপণে, সুতরাং আপ্ত বলিতেই প্রাপ্ত। প্রাপ্তের উক্তিই আপ্তোক্তি। প্রাপ্তির পরে যে পূজা বা পূজার উক্তি, তাহাই ঋক্ বা ঋকের অক্ষর। ঋষি যাঁহাকে পাইয়াছেন, এবং পাইয়া যাহা করিয়াছেন, ঐ ঋক্‌শেষাংশে তাহাই সুব্যক্ত। পাইতেছেন অমৃত, যৎ প্রসাদে দেবতারা অমর, যৎপ্রসাদে মৃতও জীবন্ত হইয়া থাকে; ঋষি পাইয়াছেন তাঁহাকে। তখন কী করিতেছেন, না, ইহজগতের যেখানে যা আছে, সব গুটাইয়া অঞ্জলি ভরিয়া সেই অমৃতের চরণেই অর্পণ করিতেছেন; অথবা সেই অমৃত কলসেই নিক্ষেপ করিতেছেন; সবই এক কথা। ইঁহার কথা আবার আমাদিগকে তুলিতে হইবে।

এইত ঋক্, তার পর? তার পরে বেদ; এই উভয়ে পদের যোগে ঋগ্বেদ। এই বেদ কার নাম? বোধ হয় গ্রন্থকার মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন যে, বেদেই নাই বেদ কার নাম। পরেকার শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন বটে যে, "ন বেদোবেদ ইত্যাহুর্বেদব্রহ্মসনাতনম্"। কিন্তু তত্রাচ বেদ পদটির আসল অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা চাই; নহিলে বেদের যা গাম্ভীর্য্য, কিছুই বুঝা যায় না। বিদ ধাতু সিদ্ধ বেদ পদে বেদন বা অনুভবাত্মক জ্ঞান যে নহে, তা বলিতেছি না, কিন্তু অপৌরুষেয় বাক্যের শ্রুতিমূলক যে জ্ঞান, তাহাই এই বেদ পদের মুখ্য ও চিরপ্রসিদ্ধ অর্থ। শ্রুতিতে ঐ অপৌরুষেয় বাক্য শ্রুত না হইলে তাহা শ্রুতি মধ্যে গণ্য নহে, এবং তাই শ্রুতি বলিতেই বেদ ও বেদ বলিতেই শ্রুতি। সময়ে তাই শ্রুত ও শ্রুতি একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই যে জাত হইয়া মাত্র ব্রাহ্মণ শিশুর কর্ণবেধের প্রথা এখনো বিদ্যমান, তার মূলেই ত এই কথা; পরন্তু সে কথা এখন থাক।

এই যে উপনিষদ্বাক্য—আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ—ইহাতে কী বুঝিব? এখানে দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য ও নিদিধ্যাসিতব্যের অন্তর্গত দর্শন শ্রবণ ও নিদিধ্যাসন, এই তিনটি পদের প্রত্যেকটিকেই প্রাধান্য না দিয়া, যদি কেবল মন্তব্যের মননকেই ধর্ত্তব্য বলি, এবং দ্রষ্টব্য-শ্রোতব্যের দর্শন-শ্রবণকে মানস-দর্শন ও মানস-শ্রবণ এবং নিদিধ্যাসনকে যদি মানস-বিচার বলিয়া নিষ্পত্তি করি, তবে কি তাতে সত্যের এক মস্ত ব্যত্যয় করিয়া বসি

না? "বা" পদের মুখ্যার্থে বিকল্প, বিবিধকল্প, অর্থাৎ যে বিবিধ বিধি, তাহা ত্যাগ করিলাম কেন? অথবা নিদিধ্যাসন বলিতে যে চিত্তের অভিনিবেশ, অর্থাৎ অন্তঃকরণের আসক্তি, তাহাই বা না মানিলাম কেন? এ ত সোজা কথা না দেখিলে, না শুনিলে, মনে আসক্তি কি হয়? অথচ এই সোজা কথাকে বাঁকা করি কেন?

করি কেন, তাই বলি। শ্রুতি উপনিষদ গীতা পুরাণাদি সকল শাস্ত্রে এই আত্মার অনেক রকম বিপরীত লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। এই যেমন কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন, "বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না যায়," পরে বলিতেছেন:—"অপানি-শ্রুতি বর্জ্জে প্রাকৃত পাণি চরণ। পুন কহে, শীঘ্র চলে, করে সর্ব্ব গ্রহণ।"— এই রকমের বিপরীত সব উক্তির ভিতর দিয়া আমাদের শাস্ত্র আত্মার পরিচয় দান করিয়াছেন। শাস্ত্র কখন বলিয়াছেন, ইনিই সমস্ত: আবার বলিয়াছেন, ইনি এই সমস্ত হইতে ভিন্ন; কখন বলিয়াছেন বড়ই কাছে, আবার কখন বলিয়াছেন এমন দূর আর নাই; কখন বলিয়াছেন ইনি অটল অচল, আবার বলিয়াছেন সদাই সচঞ্চল। এইমত হাঁ-না রকমের বিষম বিরুদ্ধোক্তি শাস্ত্রে যে কতই আছে, তাহার অন্ত নাই বলিলেও মনে হয় অত্যুক্তি হয় না। পরন্তু, তবুত এ সকল কথা লোকের মনোমুগ্ধকর! মনুষ্যহৃদয় চাহে এই মত এক বস্তু, যা অনন্ত রকমে অনন্ত হইলেও তাহার ইহ-পর কালের একমাত্র ভরসার স্থল। হৃদয় যাহা অনবরত চায়, অথচ প্রত্যক্ষে যাহাকে না পায়, তাহার অস্তিত্ব যুক্তিতেও অন্তত: যদি মিলাইয়া লইতে পারে, তবে তাহাতেও স্বভাবতঃ মানব হৃদয় তৃপ্তি পাইয়া থাকে। ফলতঃ এই যে তৃপ্তিলাভ, এই জন্যই যুক্তিমার্গে আত্মান্বেষণে সহজেই প্রবৃত্তির উদয় হইয়া থাকে। শাস্ত্র হাজার বলুন যে, সেই আত্মা দেবতাদেরও দুর্ল্লভ, মননে তাঁহাকে পাওয়া যায় না; হাজার বলুন যে, আত্মা মনো-বুদ্ধির অগোচর; হাজার বলুন আত্মা স্বপ্রকাশ; তিনিই সকলকে প্রকাশ করেন, তাঁহাকে প্রকাশ করিবার কেহই নাই; তবু মননশীল পণ্ডিত তাঁহার মনন দ্বারা আত্মনির্ণয়ে যত্নবান না হইয়া থাকিতে পারেন না। মননে মননই যেন প্রত্যক্ষ, আর বিশ্বসংসার আদি সমস্তই পরোক্ষ। মননশীলের নিকট মন ও তাঁহার অস্মিতা প্রত্যক্ষবৎ। যদিও এই দুইটি নিরাকার, তত্রাচ এই নিরাকার অস্মিতা ক্ষেত্রে নিরাকার মনের চরকা বসাইলে নিরাকার স্তোভ-সূত্র রাশি রাশি অনর্গল নির্গত হইতে থাকে। সমস্তই নিরাকার অথচ মনে হয় ঠিক প্রত্যক্ষ! অহংজ্ঞান ও মনন, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অপেক্ষা কি কোন অংশে তাঁহার নিকট কম! কিছুতেই নহে। অতএব আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে মননশীল পণ্ডিত ব্যক্তির মীমাংসাই এই:—"স্বরূপাব্যবধানাভ্যাং জ্ঞানালোক স্বভাবতঃ। অন্যজ্ঞানানপেক্ষত্বাৎ জ্ঞাতৈশ্চৈব সদা ময়া॥" গ্রন্থকার মহাশয় মনে করেন, ইহাই বেদের চাবি। উক্তিটি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের হস্তামলক হইতে উদ্ধৃত। আচার্য্য দেব স্বয়ং বেদাধ্যয়ন করেন নাই, এই নিষ্পত্তি গ্রন্থকার মহাশয় নিজেই করিয়াছেন; অথচ সেই বেদের চাবি তিনি যে ঐ আচার্য্যদেবেরই দু'একটি উক্তি হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্য! এখানে আচার্য্যদেব বলিতেছেন যে, স্বরূপ ও অব্যবধান, এই হেতুদ্বয় বশতঃ, এবং জ্ঞানালোকের স্বভাবক্রমে, এবং অন্যজ্ঞানের অপেক্ষা না থাকায়, (আত্মা) মৎকর্ত্তৃক সর্ব্বদাই জ্ঞাত। ইহা হইতে এই বুঝিতে হয় যে, আত্মরূপে ব্যবধান নাই, কেননা

তিনি যে সর্ব্বদাই স্বপ্রকাশ, আর স্বাভাবিক জ্ঞানে অন্য জ্ঞানের অপেক্ষা নাই; সুতরাং সকল সময় সে জ্ঞান ত আমার জ্ঞাতই রহিয়াছে—মোট কথা, অজ্ঞান এবং অন্যজ্ঞান না থাকিলেই হইল, এবং তাহা হইলে আমার স্বরূপ যে আত্মা, সে জ্ঞান ত আমার আছে। ইহাতে আমারই খাঁটি জ্ঞান রক্ষা করিতে, আমারই অজ্ঞানকে ও আমারই অন্যজ্ঞানকে সরাইয়া দিতে আমারই উদ্যম; ইহাই বাছিয়া পাই। আমি, আমি আর আমি; অথবা আমার, আমার, আর আমার! যদি বলা যায়, না, আমা'ছাড়া ঐ যে জ্ঞান তাওত আছে তবে বলিতে হয়—ভাল, আমি ও আমার জ্ঞান কি পৃথক? পৃথক যদি ত, পৃথক বস্তু কই? এবার উত্তর আসিবে—কেন? ঐ যে জ্ঞান, ঐ জ্ঞানইত স্বয়ং বস্তু। এ মত বস্তুতত্ত্বের আসল কথা সুতরাং একা অহংজ্ঞান বা অস্মিতা ব্যতিরেকে অপর কিছুই নহে।

এইরূপে যিনি কেবল মননশীল, তিনি আপনার ভাবে আপনাকে এই বিশ্বে আরোপ করিতে পারেন; এবং বিশ্বের মহিমাও আপনাতে আরোপ করিয়া, অধ্যাসে আপনার ভিতরেই এক ছোট আমি ও আর এক বড় আমি গড়িয়া তুলিয়া, খাঁটি অদ্বৈতের দ্বৈতাদ্বৈতের ভজনাদিও গাহিতে পারেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার নিকট আমাদের নিবেদন এই যে মানস দর্শন মানস শ্রবণ কি মানসপ্রত্যক্ষের কথা না লিখিয়া, তাহাকে সাদা কথায় না হয় অনুমান বলিয়াই লিখিবেন। প্রত্যক্ষ বলিতে সাক্ষাৎ, সম্মুখে মূর্ত্তিমান, ও ইন্দ্রিয় জন্য যে জ্ঞান; আর মনে দর্শন শ্রবণ যাহা হয়, তাহা হয় স্মৃতি, না হয় অনুমান। এই উপলক্ষে গ্রন্থকার মহাশয় "কারণাদনন্যত্বং কার্য্যস্য" কার্য্য কারণের একত্বজ্ঞাপক যে শঙ্কর বচন উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাও কি অনুমান নহে? অনুমানের অনায়াসত্বে কি কখনও তাহার প্রত্যক্ষত্ব, কি তাহার চক্ষুগোচরত্ব, সাধিত হইতে পারে? চর্ম্মচক্ষুর দর্শনক্রিয়া যখন স্বপ্নদশায় মনশ্চক্ষুদ্বারায় সম্পাদিত হয়, তখন অবশ্য মনই চক্ষুর ইন্দ্রিয়; কিন্তু আশ্চর্য্য! জাগ্রদ্দশাকেও কি সেই স্বপ্নদশায় পরিণত করা চাই? পরন্তু ইহাত তাহাও নহে। স্বপ্নের যে মানস-দর্শন, কি মানস শ্রবণ, কি মানস-সাক্ষাৎকার, তাহাও মূর্ত্তিমান ও সাকার। এখানে কিন্তু যা, তার যে সমস্তই অমূর্ত্ত নিরাকার! অথচ বলা চাই যে তাহা বস্তু—এমন বস্তু যে তাহা মনেই প্রত্যক্ষ হয়! প্রত্যক্ষানুমানের এমন খিচুড়ি বা বিষমবিভ্রম, অতিরিক্ত মননমাত্রাতেই হইয়া থাকে।

নিরাকারের বিস্তর মহিমা গ্রন্থখানির অনেক জায়গায় উক্ত হইয়াছে; অথচ সে সকল স্থলে আমরাত সাকারব্যতিরেকে আর কিছুই খুঁজিয়া পাই নাই। অরণিনিহিত নিরাকার অগ্নির সাকারত্ব সম্পাদন তাহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল এবং হোমাদিপ্রকারে সাকার অগ্নির নিরাকারত্বনিষ্পাদনও তাহাই। কিন্তু সাকার শক্তি ও সাকার কণা ব্যতিরেকে আমরা ত ইহাতে আর কিছুই পাই নাই। শরীরের বলে যে ঘর্ষণ, ও সেই ঘর্ষণে কাষ্ঠ রেণুর যে শিথিলতা ও বিশ্লেষণ, এবং ঐ বিশ্লিষ্ট রেণুতে বায়বাংশের সংযোগে অগ্ন্যুৎপাদন; ইহার কোন্‌টি নিরাকার! আমরা ত সাকারের পরিণামে প্রকারান্তরে সাকার হইতেই যেমন বরাবর দেখিয়া শুনিয়া আসিতেছি, তাহার কিছু মাত্র ব্যত্যয় এ ক্ষেত্রে হয় নাই বলিয়াই বুঝিতেছি।

আমরা সাকারবাদী। * সুতরাং আমরা গ্রন্থকার মহাশয়ের নিরাকারবাদের অযথা সম্মান প্রদর্শনে প্রস্তুত নহি। চূড়ান্ত সাকারবাদের সপক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তার দৃষ্টান্তই বরং দেখাইতে চাই। অসংখ্য সৃষ্টিকর্ত্তাকে ডাকিয়া আনিয়া ভগবান আমাদের চতুর্ম্মুখ সৃষ্টিকর্ত্তাকে দেখাইয়াছিলেন বলিয়া তথায় বর্ণিত হইয়াছে। অনন্ত সৃষ্টির অসংখ্য সৃষ্টিকর্ত্তাকে দেখিয়া বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া আমাদের চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা তখন ভগবানের যে স্তব করিয়াছিলেন, তাঁহাতেই ত সাকারবাদের অগাধ গাম্ভীর্য্য প্রকাশিত! নূতন কিছু আমাদের এ বিষয়ে বলিতে যাওয়া যেন ধৃষ্টতা বলিয়াই মনে হয়।

এখন জিজ্ঞাস্য, গোড়ায় যে শ্রুতি তুলিয়াছি, তাহাতে অধিবিশ্ব বলিতে যে অতিরিক্ত বিশ্বের উল্লেখ আছে, যেখানে দেবতাগণ নিষণ্ণ রহিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, সেই বিশ্ব কি ঐ অসংখ্য সাকার বিশ্বের অতিরিক্ত, না—উহারই অন্তর্ভুক্ত? উত্তরে বলিব অন্তর্ভুক্ত; পরন্তু প্রকারতঃ উহা অপর সকলের যে অতিরিক্ত, ইহাই সদুত্তর: যে বিশ্বে প্রত্যেক অনন্ত মূর্ত্তি দেবতা একেরই বশবর্ত্তী, একের একতার একভাবাপন্ন, সুতরাং যেখানে এক ব্যতিরেকে দুই নাই, উহা তাহাই। ব্রহ্মসূত্রের নির্দ্দেশ মত "বিভাগঃ শতবৎ" শতবৎ বিভাগ যেখানে, উহা তাহাই। "শত" পদ যেমন একবচনান্ত, তেমনি যেখানকার কোটি কোটি বিভাগ সর্ব্বদা ঐ এক বচনেই পর্য্যাপ্ত, এই অতিরিক্ত বিশ্ব সেই খানে—অতীন্দ্রিয়, অচিন্ত্য, অথচ সাকার! "প্রকৃতিভ্য পরং যত্তু, তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্" সৃষ্টির সকল পদার্থ হইতে যাহা ভিন্ন, তাহাই অচিন্ত্য। এই ত অচিন্ত্য, আর অতীন্দ্রিয়? অতি-ইন্দ্রিয় যা' অতীন্দ্রিয় তাই; যেমন—অতিবায়ু, অতিপথ, অতিবান, অতিমানুষ, ইত্যাদি অসাধারণ অলৌকিক যে ইন্দ্রিয়, তাহাই অতীন্দ্রিয়।

বেদে ইন্দ্রিয়গণ দেবতা। যেহেতু সকল ইন্দ্রিয়ের প্রকৃত রূপ ঐ অধি-বিশ্বে, ঐ বিশ্বাধিক্যে, বা অতীন্দ্রিয়ে; অতএব প্রকৃতরূপে যাহারা যে বস্তু তাহাই বেদ বলিয়াছেন; অর্থাৎ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই স্বভাবতঃ স্বরূপতঃ সত্যই দেবতা। এখন এই যে দেবতাগণ, ইঁহারা যে একের বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়া থাকেন, বেদ কি তাঁহাকেও নির্দ্দেশ করেন নাই? ইনিই একেশ্বর।

ইনিই ত হৃষীকেশ; কেন না হৃষীক বলিতেই ত ইন্দ্রিয়; সুতরাং ইনিই মহেশ্বর, সর্ব্বেশ্বর পরমেশ্বর ও পুরুষোত্তম।

কখনো বা কোন কারণে এক বা একাধিক অতীন্দ্রিয়ের প্রকাশ যদি বা সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু সকল শাস্ত্র একবাক্যে ইহাই উপদেশ দিয়াছেন যে, ঐ যে এক, ইনি স্বপ্রকাশ; ; অর্থাৎ কেহই ইহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহেন। ইঁহার যে স্বপ্রকাশ নাম তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। স্পষ্টাক্ষরে উপনিষদই তাহা না কোন্ বলিয়াছেন? এইত বলিতেছেন—

* ইন্দ্রিয়গম্য হইলেই সাকার বলিয়া থাকি। ইন্দ্রিয়ের আদ্যন্ত না পাইলে সাকারের আদ্যন্ত পাওয়া অসম্ভব। সাকারবাদের মূল মর্ম্ম-কথাই এই।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষআত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্॥

প্রবচন দ্বারা এই আত্মা লভ্য নহেন। বহুশ্রুত হইলে, এবং মেধা থাকিলেও, ইনি লভ্য নহেন। যাঁহাকে ইনি বরণ করিতেছেন, তৎকর্ত্তৃকই ইনি লভ্য—এই আত্মা তাঁহার স্বকীয়া তনুকেই বরণ করিতেছেন।

অনেক কথাই বলিবার ইচ্ছা ছিল। বলিবার সময়ও নাই, এবং শরীরের সামর্থ্যও নাই। এই আত্মাই যে হৃষীকেশ, এবং ইনিই যে মহেশ্বর পুরুষোত্তম, এবং এই আত্মজ্ঞানই যে বড়ই গূঢ় বা গুহ্য, তাহারই কেবল প্রমাণোদ্ধার পূর্ব্বক আমরা এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করি। সর্ব্বত্র সমস্ত বেদ কেবল মাত্র যাঁহাকে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, সে বিষয়ে স্বয়ং ভগবান ইহা বলিতেছেন

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে, ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি, কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্বন্যঃ, পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য, বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহ মক্ষরাদপিচোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ, প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥
যো মামেবমসম্মূঢ়ো, জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং, সর্ব্বভাবেন ভারত॥
ইতিগুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান স্যাৎ, কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥

লোকতঃ পুরুষ বলিতে দুই—ক্ষর এবং অক্ষর জন্তু মাত্রই ক্ষর, এবং যিনি কূটস্থ তিনি অক্ষর পদ বাচ্য। তিনি পরন্তু অন্য, যিনি উত্তম পুরুষ; এবং যিনি পরমাত্মা বলিয়াও বর্ণিত হইয়া থাকেন। ত্রিজগতে প্রবেশ পূর্ব্বক অব্যয় ঈশ্বর হইয়া ইনিই বিশেষ রূপকে ভরণ করিতেছেন। যেহেতু ক্ষরের অতীত, এবং অক্ষর অপেক্ষা উত্তম; অতএব আমিই লোকে এবং বেদে পুরুষোত্তমরূপে প্রকাশিত রহিয়াছি। অসম্মূঢ় থাকিয়া যিনি আমাকেই পুরুষোত্তম জানিতেছেন, তিনি সর্ব্ববেত্তা হইয়া আমাকে সর্ব্বভাবসহকারেই হে ভারত, ভজনা করিতেছেন। হে অনঘ, এই গুহ্যতম শাস্ত্র মৎকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইল। ইহা বুঝিলে হে ভারত তিনি বুদ্ধিমান এবং কৃতকৃত্যও হইয়া থাকেন।

কৃতকৃত্যতা অবশ্য এই বোধের ভিতর, কিন্তু একে ত সেই বোধই গুহ্যতম, তারপর, সেই বোধ তিনি স্বয়ং না দিলেই বা দিতে পারে কে? স্বপ্রকাশ হইয়া তিনিই যাঁহাকে বরণ করেন, তাঁহারই সেই বোধ; এবং তিনিই ঋষি। এই স্বপ্রকাশ পরমধন স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে যে অপরূপ অপৌরুষেয় অভ্রান্ত সদ্বাক্য শুনাইয়া থাকেন, তাহাই সাক্ষাৎ বেদ। এই মত এই সাক্ষাৎ বেদ ও বেদস্বামীর মর্ম্ম যিনি অবগত হন, তিনি যে তদানুষঙ্গিক নিজ জীবনের কৃতকৃত্যতা লাভ করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি?

যা'র যা'! কল্পনায় রাজা হওয়া যায় না। বক্তৃতায় জন্মান্ধ এই যে জগচ্চিত্র তাহাকে কদাচই দেখিতে পায় না। বিনা প্রসবে কোন নারী পুত্র মুখ দর্শন করিতে চাহে? খেলাঘরেই কি সংসার ভোগের একশেষ?

ঋষিমুখনিঃসৃত পুরুষোত্তমদর্শনের ঋক্‌নিদর্শন একটিই না হয় দি। উচ্ছ্বাসপূর্ণ সেই ঋকটি এই :—

ঋতেণ ঋতমপিহিতং ধ্রুবং
বাং সূর্য্যস্য যত্র বিমুচং ত্যশ্বান্।
দশশতা সহতস্থু স্তদেকং
দেবানাং শ্রেষ্ঠং বপুষামপশ্যং।

(ঋগ্বেদ সংহিতা ৫ম, ৬২সু, ১)

সূর্য্যাশ্বগণকে যথায় (তিনি) তোমাদের উভয়ের দিকে বিমুক্ত করিতেছেন, তথায় ছিল দশশত (অ) অনুকম্পার সঙ্গ বিদ্যমান: দেবগণের বপুসমূহের শ্রেষ্ঠ সেই একেকে দেখিয়াছে।

বপুষ্মান্ দেবতার চাক্ষুষ দর্শনের ইহাই চূড়ান্ত সাক্ষ্যদান! বিশ্বাস হবার হয় ত ইহাই যথেষ্ট। কোথাকার কথা কিন্তু ঐ? গীতা মুখবন্ধের উপক্রমেই ভগবান বলিতেছেন ;—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো, না ভাবো বিদ্যতে সতঃ
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্ত স্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ

অসতের উৎপত্তি নাই। সৎ উৎপত্তিরহিত নহেন। এই যে উভয় এই উভয়ের অন্ত, শেষাবয়ব, তত্ত্বাদর্শিগণ কর্তৃক দৃষ্ট হয়।

ঐ যে শ্রেষ্ঠ এক, উনিই এই শেষ অবয়ব। অন্ত ও অনন্ত শেষ ও অশেষ ঐ একে, মহেশে! ভাবাভাব সন্ধ্যার শাশ্বত অমৃতময় পুরুষ উনিই! আর "ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম" (ঋগ্বেদ, ১ম, ১৬৪, ৩৫) এই ব্রহ্মা যিনি বাক্যের পরম ব্যোম, ইনিই কি উনি ন'ন?

উনিই ইনি—বাক্যের পরম আশ্রয়: যেখানে সকল বাক্যের লয় ও উদয় যুগপৎ সঞ্চারিত হইতেছে। অতএব ঐ যিনি পুরুষোত্তম এবং যিনি ব্রহ্মা, এতদুভয়ে ভেদকল্পনা একেবারেই নিষিদ্ধ। গ্রন্থকার মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন যে "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদংতি" বলিয়া যে ঋক্, সেই ঋগনুসারে একই সতের ভিন্ন ভিন্ন নাম ; কিন্তু ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঋকের উল্লেখ করিয়া মনুষ্য বাক্যকে তুরীয় বলিতে তাহাকে নিম্নাসন না দিয়া যে উচ্চাসনে বসাইয়াছেন, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। তুরীয় পদের একমাত্র অর্থ চতুর্থ। ঊর্দ্ধাভিমুখে এই তুরীয় পদে "শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে" বলিয়া বেদান্তসার যেমন ধরিয়াছেন ব্রহ্ম ; নিম্নাভিমুখে এই তুরীয় পদই তেমনি নিম্নতম যে চতুর্থ, তাহাই মানিয়া লইতে হইবে ; তা' নহিলে তুরীয় বর্ণ বলিতে কেবল মাত্র শূদ্রকেই বা বুঝিতে হয় কেন? এই যেমন বর্ণে, তাই তেমনি বাক্যে। চতুষ্পদ বাক্যের নিম্নতম চতুর্থপদকেই তুরীয় পদ বলাই এস্থলে সঙ্গত। যথা ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত অর্থই যথার্থ। ঋক্‌টি ধরিলেই তাহা প্রতীয়মান হইয়া থাকে, যথা——

"চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি তানি বিদু র্ব্রাহ্মণ যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা, তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদংতি॥"

(ঋগ্বেদসংহিতা ১ম, ১৬৪। ৪৫)

বাক্, বাক্য, পরিমিতা। (ইহার) চারিটি পদ। যাঁহারা মনীষি ব্রাহ্মণ, (তাঁহারা) সেই সকল জানিতেছেন। তিনটী গুহানিহিতা ও ইঙ্গিতশূন্যা। তুরীয়ে, চতুর্থে, মনুষ্যেরা কথা কহে।

এখানে তুরীয় পদের ব্রহ্ম অর্থ অসংলগ্ন, সুতরাং এই পদের অপর এক অর্থ যে নিম্নতম চতুর্থ, তাহাই সঙ্গত। গুহানিহিত, গুহাতে স্থাপিত, গুপ্ত বা গূঢ় যে তিন পদ, তাহার উৎকর্ষাপকর্ষ সম্বন্ধে যদি এখনও কোন সন্দেহ থাকে, তবে এই নিম্নলিখিত ঋকেই তার নিরাকরণ হইয়া যাইবে।

"ত্রিস্রোবাচ ঈরয়তি প্রবহ্নি
ঋতস্য ধীতিং ব্রহ্মণো মনীষাং।
গাবো যংতি গোপতিং পৃচ্ছমানাঃ
সোমং যংতি মতয়ো বাবশানাঃ॥"

(ঋগ্বেদ সংহিতা ৯ম ৯৭।৩৪)

ঋত, সত্ত্ব, ব্রহ্মের যে ধীতি, পিপাসা, তাহা মনের ঈশা অর্থাৎ লাঙ্গল দণ্ড। প্রবহ্নি, শ্রেষ্ঠাগ্নি, তাহাতে বাক্ ত্রয়ীকে প্রেরণ করিতেছেন। গাভীগণ গোপতির দিকে যাইতেছে। শানিতমতি জিজ্ঞাসুগণ সোমের দিকে যাইতেছেন।

দ্বিজদাস বাবু জিজ্ঞাসু, অতএব অবশ্যই তিনি নমস্য। সারের সার কথা কিন্তু এই যে, প্রকৃত কর্ণবেধসহকারে নূতন কর্ণ নহিলে ঐমত সব ঋকের যে অপূর্ব্ব সত্য তত্ত্বমাধুর্য্য রহিয়াছে, তাহা আদৌ আমাদের ভোগে আসিবার নহে। প্রাকৃত বোধে অপ্রাকৃত বস্তুর আলোচনা করিতে গেলেই বিসদৃশ টীকাটিপ্পনীর উদয় অবশ্যম্ভাবী। ঋষিগণ বর্ণজ্ঞানরহিত ছিলেন ও লিখিতে জানিতেন না বলিয়া যে এই গ্রন্থের বহুল সমর্থন দেখিতে পাই, কিংবা পূর্ব্বে অপরাপর গ্রন্থে যে দেখিয়াছি যে, এক ঈশ্বরের ব্যক্তিভাব ঋষিগণের মধ্যে বড়ই অস্ফুটরকমের ছিল, তা' সমস্তইত ঐ মত টীকাটিপ্পনীর ফলে উঠিবেই উঠিবে। আর ইহাতে আশ্চর্য্যই বা কি আছে? আশ্চর্য্য কিন্তু এই যে, যা' প্রকৃত আশ্চর্য্য তাতেই কাহারো আশ্চর্য্য নাই। যিনি স্বয়ং ভগবান, তিনি বলিতেছেন :—

"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং,
আশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্য।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি,
শ্রুত্বাহপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥"

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

যিনি আশ্চর্য্যবৎ দেখিতে বলিতে ও শুনিতে, এমন আশ্চর্য্য যে হাজার শুনিলেও টের পায় না কেহ, তিনি কেমন, এমন যিনি, তাঁর কথায় লোকে এখন না চম্‌কায় কেন? কোন্ অধিকারে লোকে এখন হস্তামলকের দোহাই দেয়? জানি না—কিন্তু অধঃপতনের গোড়াইত এই।

স্বাধ্যায়ার্থী

স্বর্গীয় আশুতোষ

অনেক দিনের কথা, বোধ হয় ১৮৮২ কি ১৮৮৩ সালে হবে, কোন রাজকার্য্যের জন্য আমাকে ৺রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অতিথি হ'তে হয়েছিল। সেদিন তাঁর বাড়ীতে কেউ ছিলেন না। আমাকে অনেক বেলা পর্য্যন্ত সেখানে থাকতে হল, কেননা কাজটি গুরুতর ছিল। বেলা অনেক হয়ে গেল দেখে রাধিকাবাবু বল্লেন, তাইত আপনাকে খাইয়ে না দিলে হয় না, আমার দাদার বাড়ীতে চলুন। সেখানে এসে একটী ছেলেকে ডেকে বল্লেন, এঁকে এখানে খাইয়ে দেবে। বলামাত্র ছেলেটি একটী আলমারীর drawer খুল্ল, একখানা সাদা কাপড় ও পরিস্কার তোয়ালে বের করে নিয়ে "আসুন" বলে স্নানের ঘর দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল। রাধিকাবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, ছেলেটী কে? বল্লেন আমার ভাইয়ের ছেলে, নাম আশুতোষ, ভাল পাশ করেছে। এই ছেলেটী universityতে first হয়েছিল, আমরা শুনেছিলাম। আমি দেখলাম বড় মানুষের ছেলে হয়েও কাপড় গামছা গুছিয়ে রাখে, অতিথি এলে কি রকম ভাবে সম্মান করতে হয় জানে, ইউনিভারসিটীর ছেলেদের মধ্যে এরূপ প্রায় পাওয়া যায় না। রাধিকাবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম একে বিলেত পাঠাবেন নাকি? তিনি বল্লেন—বিলেত পাঠাবার মত নাই; যদি হতে হয় এই দেশেই হবে। সেই হতে আশুতোষের প্রতি আমার আন্তরিক আকর্ষণ হল। ক্রমে আমরা দুই জনে Asiatic societyর member হই ১৮৮৫ সালের জানুয়ারীতে। সেই থেকে আমরা দুই জনে একত্রে অনেক সময় সাহিত্যিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি।

১৮৮৮ সালে আশুতোষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্র, চারিদিকে তাঁর নাম হয়েছে; এমন ছেলে University থেকে আর বেরোয়নি, ইলবার্ট সাহেব তাঁর উচ্চ প্রশংসা করেছেন। ক্রমে তাঁর চেষ্টা হল—Universityতে ঢুকবার। কিন্তু প্রথমে হ'ল না, হ'ল আমার। তিনি ছাড়বার পাত্র নন, ইল্‌বার্ট সাহেব ইজিপ্টের Finance Commissioner হয়ে ছিলেন, সেখান থেকে পত্র আসতে আশু বাবু ১৮৮৯ সালে Fellow হন। তখন এসে আমাকে বলেন —আপনি কেন Fellow হয়েছেন, জানেন? I knocked and you entered আমি হই নি বলে আপনি হয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এখন তুমি কি করবে? তিনি বল্লেন—university উদ্ধার করব। "কি করে?" "Universityর নাম কলকাতা University না রেখে ঢাকা University রাখা উচিত।" কারণ সে সময় পূর্ব্ববঙ্গের শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ ও শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু Syndicateএর মেম্বর ছিলেন এবং P. K. Ray Registrar ছিলেন। কথা হল, পূর্ব্ববঙ্গ united,

গত ১লা আষাঢ় ১৩৩১ রবিবার স্যার আশুতোষের মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থ আহূত বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা।

পশ্চিমবঙ্গ united নয়; তিনি বল্লেন, পশ্চিমবঙ্গকে united করতে হবে। সে বিষয়ে আমার সহায়তা চাইলেন। আমি বল্লাম এ হতে পারে না, এর মধ্যে এমন লোক আছে, যারা নিজের জন্য সব করবে, পরের জন্য কিছুই করবে না। তার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি করে united করবে? তিনি বল্লেন, প্রথমেই আপনাকে syndicateএ ঢুকতে হবে। আমি বল্লাম আমি যাব না, আপনি যান। সে বৎসর আমরা তাঁকে syndicateএ ঢুকিয়ে দিই, তখন তাঁর পক্ষে অনেকের ভোট হওয়া চাই, ভোট সংগ্রহের ভার অনেকটা আমার উপর পড়ল। আশুবাবু নিজেও canvass করতে গেলেন। আমি নিজে যে কয়জনের ভোট সংগ্রহকরি তাঁদের নাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কানাইলাল দে, রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ব্রহ্মমোহন মল্লিক প্রভৃতি ১২ জন। এঁদের মধ্যে engineer একজন ছিলেন। আশু বাবু ঢুকলেন। প্রথম চেষ্টা হল western Bengalকে unite করার। প্রথম বৎসরে unity হল না। দুই তিন বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ মিলিত হল, সকলে আশুতোষের admirer হলেন। তখন পূর্ব্ববঙ্গ দেখলেন মুখে ঝগড়া করে কিছু হবে না, তাঁরাও মিলে গেলেন। এই সময় আশুবাবুর খুব একটা crisis আসল, আনন্দ মোহন বাবুর ছেলেকে Griffith সাহেব অপমানিত করেছিলেন। আশুবাবুকে সে অপমানের প্রতিবিধানের চেষ্টা করতে হল। সে জন্য Griffith সাহেবকে Registarএর পদ ত্যাগ করতে হয়। সুতরাং পশ্চিম এবং পূর্ব্ববঙ্গ মিশে গেল। তখন Education Departmentএর চক্ষু ফুটল। আশুতোষ অতি ভয়ঙ্কর লোক, কারুকে মানেন না, এঁকে Syndicateহতে তাড়াতে হবে। তখন Sir Alfred Croft ছিলেন Director of Public Instruction, তেমন মাথাওয়ালা লোক বাংলার আসেন নি। তিনি সমস্ত লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণরদের unpaid minister ছিলেন। যাঁরা senateএর সভ্য ছিলেন তাঁদের Croft চিঠি লিখে পাঠালেন কাকে ভোট দিতে হবে, খবরের কাগজে তা নিয়ে হাঙ্গামা হল, আশুতোষ তার বিরুদ্ধে agitation করালেন, কিন্তু কিছু হল না। সে বার আশুতোষ syndic হতে পারেন নাই, তাঁর জীবনে সেই একবার elected হতে পারেন নি। তিনি দুঃখিত হলেন, তাঁর মুখের ভাব দেখে গুরুদাস বাবু Dais থেকে নেমে এসে বল্লেন দুঃখিত হবার কারণ নেই, এই রকম হয়ে থাকে কখনও ফল হয় কখনও হয় না। আমি তখন তাঁকে বল্লাম "Sir A. Croft আসছে বছর চলে যাবেন, বুড়া বয়সে গুরুভার বহন করতে পারবেন না, তারপর Senateএর কাজ যেমন চলছিল তেমনি চলবে। যা বল্লাম তাই হল, Croft সাহেব পর বৎসর দেশে চলে গেলেন। আশুতোষ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হলেন, ইউনিভার্সিটীতে তিনি যা করেন, তাই হয়। সাহেবরা অত্যন্ত opposition করেও বড় কিছু করে উঠতে পারেন না। তার পর যখন দেখলেন কোন রকমে এর সঙ্গে এঁটে ওঠা যায় না, তখন ভাবলেন আইন বদলিয়ে দেওয়া যাক। সুতরাং একটা commission বসাতে হবে। তার পর Lord Curzon commission বসালেন, আশুতোষকে commissionএ নেওয়া হল না। কিন্তু কথা হল বাংলায় যখন commission আসবে, তখন তিনি member হবেন, বাংলার বাইরে হবেন না। সে ভাবে আশুতোষ বসলেন। তখন universityকে officialise করবার যে কিছু চেষ্টা সব হয়েছিল। একমাত্র গুরুদাস বাবু note of dissent

লিখেছিলেন, বাকী সমস্ত সভ্য officialise করবার পক্ষে ছিলেন, তাই হয়ে গেল। আশুতোষ দুঃখিত হলেন। কিন্তু এমনি কর্ম্মক্ষেত্র, এমনি অদৃষ্টের বিড়ম্বনা, নূতন আইন চালাবার ভার সম্পূর্ণরূপে আশুতোষের উপর পড়ল। ভিতরে কি হল জানিনা, কিন্তু যে Lord Curzon তাঁকে তাড়াবার চেষ্টা করেছিলেন, আইন করলেন commission করলেন তাঁ হইতেই তিনি ইউনিভার্সিটীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হলেন। তার পর Lord Mintoকে চিঠি লিখলেন, একেই vice chancellor কর। যতদিন Lord Minto ছিলেন, আশুতোষের vice chancellorএর পদ অব্যাহত ছিল। Lord Hardingeএর সময় তাকে সরাবার চেষ্টা হয়েছিল, দু তিন বৎসর কিছুই করে উঠতে পারেন নি, তার পর সরিয়ে দিলেন। ক্রমে ক্রমে সর্ব্বাধিকারী, Sanderson সাহেব, ডাক্তার নীলরতন সরকার vice chancellor পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন, কাজে গোলমাল হতে লাগল, Lord Ronaldshay দেখলেন, গোলমালে কাজ হবে না, তিনি সমস্ত ভার আশুতোষের উপর ন্যস্ত করলেন, তখন থেকে গোলযোগ আরম্ভ হল, তিনি যে সকল প্রকাণ্ড ব্যাপার করেছিলেন, নিজে আট নয় বৎসর vice chancellorএর পদে থেকে যে Scheme তৈরী করেছিলেন তা চালাবার ভার তাঁর উপর পড়ল, কিন্তু টাকা নেই, গোড়া থেকে টাকা দাও, টাকা দাও। যে টাকা দেবে তার সঙ্গে ঝগড়া হবেই, India Govtএর সঙ্গে ঝগড়া হল হল, India Govt হাল ছেড়ে দিলেন। সে ভার Bengal Govtএর হাতে পড়ল, Bengal Govt গোড়াতেই দেউলে, আশুতোষও টাকা ছাড়বেন না, সে ঝগড়া এসে পড়ল Lord Lyttonএর ঘাড়ে, তিনি কি করেন? পরস্পর গালমন্দ হয়ে নিষ্পত্তি হয়ে গেল, আরেক জনকে vice chancellor করা হল। কিন্তু তাঁকেও আশুতোষের হাতে পড়তে হল, আশুতোষ ছাড়া কাজ করা যায়না, ও দিকে টাকা নাই, budgetএর কর্ত্তা বল্লেন টাকা কোথায় পাব? আশুতোষ বল্লেন Govt দিতে বাধ্য, দেবেন না কেন? এই করতে করতে তিনি স্বর্গারোহন করলেন। এখন universityর কি অবস্থা হবে কেউ বলতে পারে না। আশুতোষ অশ্বত্থ গাছের মত ছিলেন। সে গাছের আওতায় আর আর যত গাছ ছিল সব শুকিয়ে গেছে। ৩৷৷ লাখ টাকার deficit budget, কি করে এ টাকা পূরণ হবে? অনেকের সঙ্গে কথা কয়েছি, সকলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ছেন। আশুতোষের university career আমি যতদূর জানি, বল্লাম।

দ্বিতীয় কথা—তাঁর সঙ্গে আমাদের সাহিত্য পরিষদের সম্বন্ধ। সাহিত্য পরিষদ অনেক দিন থেকে আশুতোষকে এখানে নিয়ে আস্তে চেষ্টা করেছে, তিনি কখনও আসেন নি, তাঁকে সহকারী সভাপতি করা হয়েছে, আমি তাঁহার বাড়ীতে গিয়েছি, এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি বলতেন, শাস্ত্রী মহাশয়, আমাকে কেন সহকারী সভাপতি করেছেন? আমার university ছেড়ে আসবার যো নেই, আপনি আছেন, আমাকে কি করতে হবে বলুন? আর আপনি অনুগ্রহ করে আমার একটা কাজ করবেন, আমাকে বাংলা বইএর একটা Library করে দেবেন। আমি সময় সময় বই পেলে বলতাম, লম্বা লিষ্ট করে দিতাম, বাংলার প্রতি গোড়া থেকে তাঁর অনুরক্তি ছিল সন্দেহ নাই। সে অনুরক্তির

পরিচয় তিনবার পেয়েছি। প্রথম ১৮৯১ সালে, তখন বঙ্কিমবাবু ছিলেন, চেষ্টা করলেন universityতে বাংলা ঢোকাতে হবে। ইংরেজী, সংস্কৃত আছে, বাংলা নেই কেন? তার জন্য উদ্যোগ হল, সভা হল। বাংলা পশ্চিম এমন element ছিলেন, যাঁরা দাঁত আর মুখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগলেন। আমরা পারলাম না। তখন Sir Gurudas vice chancellor ছিলেন, তিনি যা বলেছিলেন সব ছাপা নেই। আমি সমস্ত শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, এমন দিন আসবে যে দিন সমস্ত পরীক্ষা entrance, I. A., B. A. বাংলায় দিতে পারা যাবে এই বলে বাংলাভাষার গুণ গান করলেন। সেবার entrance examinationএ বাংলায় প্রবন্ধ লেখবার অনুমতি হল। তার জন্য স্বতন্ত্র certificate দেওয়া হত। দ্বিতীয়বার আমি উপস্থিত ছিলাম না, তখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বেশী করে বাংলা প্রচলন করতে চেষ্টা করেন ১৮৯৬।৯৭ সালে। আশুতোষকে এ বিষয়ে বেশী উদ্যোগী করবার জন্য তিনিই resolution move করবেন এইরূপ স্থির হয়। ১৮৯৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্গারোহন করেন, ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে Universityতে B. A. পর্য্যন্ত বাংলা উঠল। যখন নূতন আইন মতে Universityর কার্য্য আরম্ভ হল, তখন ঠিক হল history, mathemetics এ সব বাংলায় হবে। সাহিত্য পরিষদ এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এখন M. A. পর্য্যন্ত বাংলা হয়েছে। দেখাদেখি ঢাকা Universityতেও বাংলা হয়েছে।

আশুতোষ সাহিত্য পরিষদের কার্য্যে সাক্ষাৎ ভাবে যোগ দিতে পারেন নি, এ জন্য মনে করবেন না সাহিত্য পরিষদের উপর তাঁর অশ্রদ্ধা ছিল, একে তিনি অবজ্ঞা করতেন; তা তিনি করতেন না। তিনি যখন মায়ের নামে medal দিয়েছিলেন, তখন সেই কমিটীতে সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধি থাকবে এই ব্যবস্থা করেছিলেন, সুতরাং পরিষদকে তাঁর নিজের মনে করতেন। তিনি মাকে কি রকম ভক্তি করতেন, তা জগৎ-বিদিত। তাঁকে বিলেতে নেওয়ার চেষ্টা করবার সময় Lord Curzon বলেছিলেন—By my command you go to your mother and tell her that I command her to allow you go to England, আশুতোষ উত্তর দিয়েছিলেন—viceroyএর আমার মাকে হুকুম দিবার ক্ষমতা নেই।

সাহিত্য পরিষদের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। নিজের কন্যার নামে—যে কন্যার বিধবা বিবাহ নিয়ে তুমুল আন্দোলন হয়েছিল, ঝগড়া বিবাদ হয়েছিল সে কন্যা যখন মারা যায় তখন তার নামে কমলা Reader-ship স্থাপিত হল। মায়ের নামের মেডেলের কমিটীতে যেমন সাহিত্য পারিষদের প্রতিনিধি নিয়েছিলেন, প্রিয়তমা কন্যার নামের মেডেলের কমিটিতেও সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধি নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি যে সাহিত্য পরিষদকে কত অন্তরের সহিত ভাল বাসতেন তা বলে শেষ করা যায় না।

যে উদ্দেশ্যে সাহিত্য পরিষদের সৃষ্টি সে উদ্দেশ্য চিরকাল মনে করে রেখেছিলেন। সুবিধা হলেই সাহায্য করতেন, অনেক সময় সাহিত্য পরিষদের কথা শুনে কাজ করতেন, সুতরাং সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল, সে কেবল কর্ম্ম ক্ষেত্রের সম্বন্ধ তা নয়, হৃদয়ের সম্বন্ধ।

আর একটা কথা বলি। না বল্লেই ভাল হত, সেটা ব্যক্তিগত কথা। প্রচার ছিল আমার সঙ্গে তাঁর অহিনকুলতা ছিল। কিন্তু কথাটা পুরো সত্য নয়। প্রথমে তাঁর সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। তার একটা লক্ষণ এই ছেলে পুলে তাঁরও হয়েছে, আমারও হয়েছে, আমার ছেলেদের নামের শেষে "তোষ", আর তাঁর ছেলেদের নামের শেষে "প্রসাদ"। একটা কি মনে করেন শুধু accident? তা নয়। আমাদের পরস্পরের প্রতি অস্ফুট অব্যক্ত অথচ গভীর প্রীতি ছিল। তবু বলব তাঁর সঙ্গে অহিনকুলতা হয়েছে; এমন কোন্ কোন কাজ ছিল, তিনি বলেছেন, ভাল হবে, আমি বলেছি, ক্ষতি হবে। সুতরাং ঝগড়া এক আধটু হবেই। যদি একজন ক্রমাগত তাঁর বিরুদ্ধে যায় তাকে সরিয়ে দেবেনই, তা না করলে কাজ করা যায় না। তাই আমাকে সরিয়ে দিয়েছেন সেই জন্য তাঁকে admire করি; তাঁর কাজের ভিতর ঢুকে যদি সর্ব্বদা তাঁকে oppose করতাম, তা'হলে তিনি অত কাজ করতে পারতেন না। তার পর আরেকটা কথা। তাঁর মৃত্যুর মাস খানেক আগে এসিয়াটীক সোসাইটী কমলা Lectureship কমিটীতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করবেন, Anandale সাহেব বল্লেন, কমিটীতে এসিয়াটীক সোসাইটীর পক্ষে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় থাকবেন। আশুতোষের supporters যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বল্লেন, "সে হবে না, হবে না। Sir Asutosh অত্যন্ত বিরক্ত হবেন," একথা শুনে আমাদের chairman sir রাজেন্দ্র বল্লেন, "এ সব কি কথা? ভার দিয়েছেন তোমরা করবে, আমরা যাঁকে মনোনীত করি তিনিই হবেন, আশুতোষ বিরক্ত হবেন সে কি কথা?" আমি যখন ঢাকা থেকে ফিরে এলাম, Secretary বল্লেন Sir Asutoshকে এই সমস্ত কথা বলেছিলাম। তিনি বলেছেন no better selection could be made। সুতরাং কোথায় অহিনকুলতা। Political ক্ষেত্রে ঝগড়া করি, যে প্রবল হয় সে দুর্ব্বলকে সরিয়ে দেয়, তা না হলে কাজ হয় না। হৃদয়ের ভাব ছেলেদের নামে প্রকাশ, কমলা Lectureshipএর প্রতিনিধি নিয়োগে প্রকাশ।

আশুতোষের মৃত্যুতে বাংলাশুদ্ধ লোক যেমন দুঃখিত, আমি তার থেকে এক বিন্দু কম দুঃখিত হই নি। ২৬শে মে বাড়ীতে একটা কাজকর্ম্ম ছিল, করে যখন বেরিয়ে এলুম, একটি ছোকরা এসে বল্ল, সতীশ বাবুর কাছে telephone এসেছে, তিনি বল্লেন আশুতোষ মুখার্জ্জি dead। আমি অবাক হয়ে রইলাম, তেল মাখছিলাম, হাত মাথা থেকে উঠলনা, যেমন ছিল তেমনি রইল। আশুমুখার্জ্জি যেমনটী গিয়েছে তেমনটী আর হবে না, আস্তে আস্তে গঙ্গা স্নান করতে গেলাম। চোখের জল সকলের পড়ছে, আমারও পড়ছে।

আশুতোষ সম্বন্ধে নিজের personal experience বল্লাম, বক্তৃতা করবার ক্ষমতা নাই, plain facts বল্লাম, আর কিছু বলব না আমাকে মাপ করুন

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

(৯)

'মৃণালিনীর' পাঁচ ও ছয় বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্রের দুইখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস—'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪) ও 'রাধারাণী' (১৮৭৫) প্রকাশিত হয়। এই দুইখানি অনেকটা আধুনিক ছোট গল্পের অনুরূপ—উপন্যাসের বিস্তৃতি বা প্রগাঢ়তা ইহাদের নাই। বিশেষতঃ ইহাদের প্রধান আকর্ষণ ঘটনা-বৈচিত্র্যে, চরিত্র চিত্রণে নহে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যেমন অনেক সময় অনেক অসাধারণ, অপ্রত্যাশিত ঘটনার আবির্ভাব হয়, সৌভাগ্যলক্ষ্মীর অযাচিত অনুগ্রহলাভ হয়, এই উপন্যাস দুইখানিও সেইরূপ আশাতীত শুভাদৃষ্টের, বিস্ময়কর মিলের (coincidence) কাহিনী। 'যুগলাঙ্গুরীয়' ও 'রাধারাণী' ঠিক একই জাতীয় উপন্যাস; প্রভেদের মধ্যে এই যে প্রথমখানি অতীত যুগের কাহিনী, ও দ্বিতীয়টী ঘটনাকালসম্বন্ধে সম্পূর্ণ আধুনিক। কিন্তু এই প্রভেদ কেবল নাম মাত্র; 'যুগলাঙ্গুরীয়'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস মনে করিবার কোন কারণ নাই; কোনরূপ ঐতিহাসিকতার ক্ষীণ আভাস মাত্রও ইহাতে নাই। তবে উপন্যাসের নায়ক নায়িকাকে অতীত যুগের শ্রেষ্ঠী বণিক-সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া বঙ্কিম তাহাদের প্রেম কাহিনীকে কতকটা স্বাভাবিকতা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ও আধুনিক যুগের সন্দেহপ্রবণতা ও অবিশ্বাস হইতে রক্ষা পাইতে চাহিয়াছেন। হিরণ্ময়ী-পুরন্দরের প্রেমে যা কিছু অসামাজিকতা বা অসাধারণত্ব আছে, তাহা সুদূর অতীতের আশ্রয় লাভ করিয়া অনেকটা আমাদের চক্ষু এড়াইতে সক্ষম হইয়াছে।

'রাধারাণী'তে এই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মাত্রা পূর্ণভাবেই অনুভব করা যায়। 'রাধারাণীর' প্রেম সম্পূর্ণ আধুনিক যুগের বলিয়া, ইহার স্বাভাবিকতা ও সুসঙ্গতি রক্ষা করিতে লেখককে অনেকখানি বেগ পাইতে হইয়াছে। রাধারাণীর সহিত রুক্মিণীকুমারের বোঝা-পড়া দীর্ঘ চারি অধ্যায় ধরিয়া চালাইতে হইয়াছে, এবং এই চারি অধ্যায়ের মধ্যে লেখক পদে পদে একটা অস্বাভাবিক বাধা অনুভব করিয়াছেন, ও নানাবিধ কৈফিয়তের দ্বারা তাহা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তথাপি বঙ্কিমের সহজ প্রতিভা এই সমস্ত বাধা বিঘ্নের দ্বারা প্রতিহত হইয়াও তাহাদের উপর আংশিক বিজয় লাভ করিতে পারিয়াছে। বঙ্কিমের ক্ষমতার প্রধান পরিচয় এই যে তিনি এই একটা ছেলেমানুষী গল্পের মধ্য দিয়াও—যেখানে গভীর চরিত্র চিত্রণের কোন অবসর নাই—সেখানেও একটা মধুর ও গভীর রস সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন, এবং বর্ণনীয় বিষয়ের সমস্ত অসঙ্গতি কাটাইয়াও যে সমাধানে উপনীত হইয়াছেন, তাহা আমাদের চক্ষে বিসদৃশ বলিয়া ঠেকে না। অতিক্রান্ত বাধা ও গভীর-রস-সঞ্চারের ক্ষমতার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে 'রাধারাণী' 'যুগলাঙ্গুরীয়' অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।

'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস সমূহের মধ্যে অন্যতম। ইহাতে আমাদের পারিবারিক জীবনের সহিত বৃহত্তর রাজনৈতিক জগতের একটী সুন্দর সম্মিলন সংশোধিত হইয়াছে। সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে আদর্শ, তাহার দিকে চন্দ্রশেখরই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অগ্রসর হইয়াছে। আবার ইতিহাসের বৃহত্তর ধারার সহিত আমাদের ক্ষুদ্র গার্হস্থ্য জীবনের সংযোগ বেশ স্বাভাবিকভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে। যদি কখনও রাজনৈতিক

জগতের প্রবল প্রবাহ আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া থাকে, ও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে একটা বিক্ষোভ সৃজন করিয়া থাকে, তবে তাহা অরাজকতা ও জাতীয় ভাগ্যবিপর্য্যয়ের যুগগুলিতে। চন্দ্রশেখরে এইরূপ একটা যুগ-পরিবর্ত্তনের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। তখন বঙ্গে মুসলমান-রাজত্ব ধ্বংসোন্মুখ, ও ইংরেজ বণিকগণ অর্থোপার্জ্জনের মোহে মুগ্ধ হইয়া সাম্রাজ্য স্থাপন অপেক্ষা প্রজা-শোষণের দিকেই অধিকতর মনোযোগী ছিল। এই আধুনিক যুগের ইতিহাস দুর্গেশনন্দিনী বা মৃণালিনীর ঐতিহাসিক অংশের মত একেবারে শূন্যগর্ভ ও কল্পনাসর্ব্বস্ব হয় নাই। ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রথম পত্তন এই সে দিনের কথা; বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের যুগের সহিত তাহার মাত্র শতবর্ষব্যবধান; খুব নিকট অতীতের ব্যাপার বলিয়া সে যুগের স্মৃতি বাঙ্গালীর মনে উজ্জ্বল হইয়াই জাগরূক ছিল; বিশেষতঃ ইংরেজ তাহার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার মুখ্য ঘটনাগুলিকে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতে দেয় নাই। সুতরাং চন্দ্রশেখরের ঐতিহাসিক চিত্রগুলিতে তথ্যের অপেক্ষাকৃত ঘনসন্নিবেশ হইয়াছে; সেই যুগের একটা মোটামুটি ব্যাপক ধারণা করিতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় না। নবাগত ইংরেজ শাসকদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা, দুঃসাহসিকতা ও সর্ব্বপ্রকার নৈতিক সঙ্কোচহীনতার চিত্রটী উপন্যাসে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ দেশবাসীদের সহিত তাহাদের সম্পর্কটী একটা অপরিচয়ের রহস্যমণ্ডিত হইয়া এক বিচিত্র রোমান্সের বিষয়ীভূত হইয়াছে।

'চন্দ্রশেখরের' রোমান্স প্রধানতঃ এই সর্ব্বব্যাপী অরাজকতা ও কেন্দ্র-শক্তির শিথিলতা হইতে উদ্ভূত। ইহা আমাদের বাঙ্গালী জীবনের উপর রোমান্সের বৈচিত্র্য আনয়নের বেশ বৈধ ও সঙ্গত উপায় বলিয়াই মনে হয়। অরাজকতা, প্রবল বৈদেশিক শক্তির অভিভব অনেক সময় আমাদের শান্ত, অন্তর্জগতের গভীর-ঘাত-প্রতিঘাত-শূন্য, বাহিরের-সহিত-সম্পর্কবর্জ্জিত, স্রোতোহীন পারিবারিক জীবনের উপর অতর্কিত দৈব বিপ্লবের মত আসিয়া পড়ে, এবং ইহাতে একটা অননুভূতপূর্ব্ব গতিবেগ ও বৈচিত্র্য সঞ্চার করে। আমাদের অন্তঃপুরের ব্রীড়াসঙ্কুচিত ফুলটীকে বাহিরের প্রবল ও পঙ্কিল বন্যায় ভাসাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু এই জাতীয় রোমান্স প্রায়ই বিশেষ গাঢ় ও গভীর হয় না; এই বৈদেশিক শত্রুর অভিভবে আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে যে বিক্ষোভ জাগিয়া উঠে, তাহাতে অন্তর্বিপ্লবের কোন গূঢ় সৌন্দর্য্য থাকে না, কেবল একটা বাহ্য ঘটনাবৈচিত্র্য থাকে মাত্র; আর অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের সংঘর্ষে, যেখানে একপক্ষ কেবল পাইবার লোভে আক্রমণ করিতেছে, ও অপর পক্ষ ব্যাকুল দুর্ব্বল ভাবে অপ্রতিবিধেয় শক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার বৃথা চেষ্টা করিতেছে, সেখানে আমাদের মনে বিচিত্র সৌন্দর্য্যবোধ অপেক্ষা করুণরসেরই সমধিক উদ্রেক হইয়া থাকে, সমবেদনার অশ্রুজলে রোমান্সের সৌন্দর্য্য কোথায় ভাসিয়া চলিয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক অনেক লেখকই এই শ্রেণীর জাতীয় কাহিনীকে তাঁহাদের উপন্যাসের বিষয়বস্তু করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা কেহই ইহার স্বাভাবিক করুণরসপ্রবণতাকে অতিক্রম করিয়া ইহার মধ্যে রোমান্সের বিচিত্র সৌন্দর্য্য সৃজন করিতে পারেন নাই; তাঁহারা কেহই বঙ্কিমের কল্পনা-সম্পদ, গূঢ় কলা-কৌশল, ও মানব মনের সহিত গভীর পরিচয়ের অধিকারী ছিলেন না।

বঙ্কিম তাঁহার সমসাময়িক লেখকদের অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠ, 'চন্দ্রশেখরে'র সহিত ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'ফুলজানি' উপন্যাসের তুলনা করিলেই, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। রথচক্রতলে নিষ্পেষিত একটী ক্ষুদ্র, সুন্দর প্রজাপতি দেখিলে আমাদের মনে যে ভাব হয়, শ্রীশচন্দ্রের উপন্যাসখানিও অনেকটা সেইরূপ ভাবেরই উদ্রেক করে, পাঠকের মনকে একটী অবিমিশ্র কারুণ্য-রসে ভরিয়া তোলে। কিন্তু তাহার মধ্যে অন্য কোন উচ্চতর কলা-কৌশলের নিদর্শন পাই না। ফুলজানি-উপন্যাসের সরলা স্নেহময়ী নায়িকার উপর যে কেন একটা এরূপ নির্ম্মম বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাহার এক ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ছাড়া অপর কোনরূপ ব্যাখ্যা আমরা খুঁজিয়া পাই না, তাহার নিজ চরিত্রে এরূপ ভীষণ পরিণামের কোন বীজ লুকাইয়াছিল বলিয়া লেখক আমাদিগকে দেখান নাই। প্রতিকূল-দৈব-পীড়িতা নায়িকা বাণ-বিদ্ধা হরিণীর মত নিতান্ত অকারণেই আমাদের সম্মুখে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ে।

বঙ্কিমের প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিনি শৈবলিনীকে চক্রপিষ্ট পতঙ্গের মত কেবল বাহ্য-শক্তিনিপীড়িত করিয়াই দেখান নাই। যে প্রলয় ঝটিকা তাহাকে তাহার শান্ত গৃহকোণ ও সুরক্ষিত সমাজ-জীবন হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছে, তাহার প্রকৃত জন্ম তাহার নিজ অশান্ত হৃদয় তলে। লরেন্স ফষ্টরের সহিত তাহার সম্পর্ক অত্যাচারিত-অত্যাচারীর সম্পর্কের ন্যায় নহে। বিদ্যুৎ-শিখা যেমন মেঘের আশ্রয়ে থাকিয়া আত্মপ্রকাশ করে, সেইরূপ শৈবলিনীর অন্তর্গূঢ় জ্বালাময়ী প্রবৃত্তি ফষ্টরের রূপমোহ ও দুঃসাহসিকতাকে অবলম্বন করিয়া বাহিরে আসিয়াছে ও দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ঘটনাচক্রের যে পরিণতি হইয়াছে তাহাতে উভয়েরই দায়িত্ব আছে। যে অগ্নি জ্বলিয়াছে, তাহাতে উভয়েই ইন্ধন যোগাইয়াছে। শৈবলিনীর মনে গূঢ় পাপের অঙ্কুর না থাকিলে শুধু ফষ্টরের পাপ ইচ্ছা ও প্রবল আগ্রহ তাহাকে গৃহাশ্রয় হইতে আকর্ষণ করিতে পারিত না; আবার ফষ্টরের দুঃসাহসিকতার অপ্রত্যাশিত আশ্রয় না পাইলে শৈবলিনীর মনের গোপন পাপ অন্তরেই চাপা থাকিত, প্রকাশ্য বিদ্রোহের অগ্নিশিখায় জ্বলিয়া উঠিত না। সুতরাং শৈবলিনীর কাহিনীটী সাধারণ অত্যাচারের কাহিনী অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন, ও ইহার মানসিক সম্পর্ক ও প্রতিক্রিয়াগুলি অনেক অধিক সূক্ষ্ম ও গভীর ভাবে আলোচিত হইয়াছে। আর বিশেষতঃ শৈবলিনী ও ফষ্টরের মধ্যে কে যে অত্যাচারী ও কে অত্যাচারিত তাহা বলা কঠিন; ফষ্টর বলপ্রয়োগ করিয়া শৈবলিনীকে লইয়া গেলেও শৈবলিনীর ইচ্ছাশক্তি ফষ্টরের উপর জয় লাভ করিয়াছে; সে এমন কি ফষ্টরকে নিজ গূঢ়তর অভিসন্ধির উপায়স্বরূপ ব্যবহার করিতে চাহিয়াছে। এবং এক অপ্রত্যাশিত দিক্ হইতে বাধা না আসিলে শৈবলিনী তাহার দ্বারা নিজ মনোরথ-সিদ্ধির পথ পরিষ্কার করিয়া লইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আরও অনেক দিক দিয়া চন্দ্রশেখর, সাধারণ ঔপন্যাসিকের অত্যাচারকাহিনী হইতে বিভিন্ন। যেমন শৈবলিনীর বিপদ তাহার অন্তরস্থ দুর্ব্বলতার ফল, সেইরূপ তাহার পরিণতিও একটা গুরুতর অন্তর্বিপ্লব ও প্রায়শ্চিত্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য উপন্যাসে মৃত্যু যে সুলভ সমাধানের পথ দেখাইয়া দেয়, বঙ্কিমের প্রতিভা তাহা গ্রহণ করে নাই। শৈবলিনীর উৎকট প্রায়শ্চিত্তের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, সাধারণ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিক্ দিয়া

তাহার মূল্য কত বলা সুকঠিন ; সাধারণ মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা এ ক্ষেত্রে পর্য্যাপ্ত হইবে কি না তাহাও বলা দুরূহ, এত বড় একটা যুগান্তরকারী, বিপ্লবপূর্ণ অনুভূতির জন্য শৈবলিনীর চিত্ত ক্ষেত্র ঠিক প্রস্তুত ছিল কি না তাহাও সন্দেহের বিষয়ে ; হয়ত বঙ্কিম যেরূপ অচিন্তনীয় দ্রুত গতিতে অসাধারণ আবেষ্টনের মধ্যেও এই মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন, তাহা মানব হৃদয়ের ধীর বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা অপেক্ষা যাদুবিদ্যারই অধিক অনুরূপ হইতে পারে ; কিন্তু সমস্ত দৃশ্যটীর মধ্যে যে অপরূপ কল্পনাসমৃদ্ধির ও আশ্চর্য্য কবিজনোচিত অন্তর্দৃষ্টির (poetic vision) পরিচয় পাই, তাহা গদ্যসাহিত্যে তুলনারহিত। তাহা মিল্‌টন ও দান্তের নরকবর্ণনার সহিতও প্রতিযোগিতার স্পর্দ্ধা করিতে পারে। বঙ্কিম এখানে কবির বিশেষ অধিকার দাবী করিয়া, ঔপন্যাসিকের যে কর্ত্তব্য,—মন্থর পর্য্যবেক্ষণ ও তত্ত্ব বিশ্লেষণ, অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত কার্য্য কারণের শৃঙ্খল-রচনা—তাহা হইতে নিজকে অব্যাহতি দিয়াছেন ; এবং প্রতিভার বিদ্যুৎ-শিখার সম্মুখে সমালোচকের চক্ষুও তাহার বিচার-বুদ্ধি পরিচালনা করিতে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসঙ্গতির ত্রুটি ধরিতে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

'চন্দ্রশেখরের' রোমান্স প্রধানতঃ এই কারণ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার মধ্যে চমকপ্রদ সংঘটনের অভাব নাই। ফষ্টরের নৌকা হইতে শৈবলিনীর উদ্ধার, ও শৈবলিনীর প্রত্যুপকার, গঙ্গা-বক্ষে প্রতাপ-শৈবলিনীর স্মরণীয় সন্তরণ, মুসলমান কর্ত্তৃক আমিয়টের নৌকা আক্রমণ ও ইংরেজদের মৃত্যুভয়হীন বীরত্বের প্রকাশ—এই সমস্ত বিবরণের গল্প হিসাবে আকর্ষণী শক্তি বড় কম নহে। মোটের উপর বঙ্কিম এই সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনায় ও রাজনৈতিক জটিলতাজালের বিবৃতিতে বেশ দক্ষতাই দেখাইয়াছেন, কোথাও অর্ব্বাচীনের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন নাই—যুদ্ধের প্রত্যক্ষজ্ঞানরহিত বাঙ্গালী লেখকের পক্ষে ইহা অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। অবশ্য এ বিষয়ে বঙ্কিম যে একেবারে ভ্রমপ্রমাদশূন্য, তাহা বলা যায় না ; বিশেষতঃ শৈবলিনীর দ্বারা প্রতাপের উদ্ধার-ব্যাপার যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, পাঠকের মনে সে বিশ্বাস নাও হইতে পারে। প্রতাপের দ্বারা শৈবলিনীর উদ্ধার, প্রথম ঘটনা বলিয়া এবং ইংরেজদের পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত বলিয়া বরং বিশ্বাসযোগ্য বটে, কিন্তু অল্প কয়েক দিনের মধ্যে একই চাতুরীর পুনরাবৃত্তি আমাদের বিশ্বাসপ্রবণতায় একটু রূঢ় রকমেরই আঘাত দেয়। বিশে-ষতঃ ইংরেজ নৌকার পশ্চাদ্ধাবনের আসন্ন সম্ভাবনার মধ্যে প্রতাপ শৈবলিনীর গঙ্গা-বক্ষে স্বচ্ছন্দ-বিহার ও তাহাদের জীবনের প্রধান সমস্যার সমাধান-চেষ্টা একটু অসাময়িক বলিয়াই বোধ হয়। আবার উপন্যাস মধ্যে রমানন্দ স্বামীর ন্যায় অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের অবতারণা এবং শৈবলিনীর সম্বন্ধে তাঁহার সদা-সতর্ক দৃষ্টি ও অভ্রান্ত ব্যবস্থা আমাদের বিশ্বাসকে বিদ্রোহোন্মুখ করিয়া তোলে। কিন্তু এই বাস্তবতাপ্রিয় যুগের কঠোর পরীক্ষায় বঙ্কিম সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হইতে না পারিলেও মোটের উপর তাঁহার ঘটনা-সমাবেশ-কৌশল খুব উচ্চ প্রশংসার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমের ঘটনা-সমাবেশ-কৌশলের চরম বিকাশ শৈবলিনী-কাহিনীর সহিত দলনী-উপাখ্যানের গ্রন্থনে। এই দুইটী করুণ, বিষাদময় কাহিনী একসূত্রে গাঁথিয়া বঙ্কিম যে কি আশ্চর্য্য গঠন কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন, উপন্যাস খানির ভাবগৌরব ও সার্থকতা কতখানি

বাড়াইয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময়মগ্ন হইতে হয়। যে রাজনৈতিক ঝটিকা দরিদ্র গৃহস্থ গৃহের পূর্ব্ব হইতে শিথিলিত-মূল লতাটীকে সহজেই উড়াইয়া আনিয়াছে, তাহা নবাবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রেয়সী মহিষীকে সমস্ত সম্ভ্রম গৌরবের মাঝখান হইতে টানিয়া আনিয়া একেবারে সর্ব্বনাশের অতল গহ্বরের শিরোদেশে উপস্থাপিত করিয়াছে। শৈবলিনীর ন্যায় দলনীও প্রথমে ভ্রান্তি দ্বারা বাহিরের সর্ব্বনাশকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে, অসাবধান মক্ষিকার ন্যায় রাজনৈতিক উর্ণনাভ জালের সহস্র বন্ধনে আপনাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে। দলনী-জীবনের ট্রাজেডি ও ইহার অপ্রতিবিধেয় নির্ম্মম শক্তি ক্রূর দৈবের নিষ্ঠুর পরিহাসের মতই আমাদিগকে একটা গভীর ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলে। ইহা আমাদিগকে স্বতঃই মেটারলিঙ্কের "Luck" নামক প্রবন্ধের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, এবং ঐ প্রবন্ধে তিনি নিরীহ, নির্দ্দোষ ব্যক্তির উপর ক্রুদ্ধ নিয়তির অত্যাচারের যে সমস্ত রোমাঞ্চকর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একটা প্রধান স্থান লাভ করে। দলনী স্বামীর অমঙ্গল সম্ভাবনায় ভীত হইয়া একবার দুর্গের বাহিরে পা দিয়াই প্রতিকূল দৈবরূপ যে দুরন্ত দানবকে জাগাইয়া তুলিল, তাহার ক্ষমাহীন হিংসা তাহাকে মৃত্যুপর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছে। সে বিপদ্ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে যতই চেষ্টা করিয়াছে, ততই সাংঘাতিক ভাবে নিয়তির দুশ্ছেদ্য জালে আপনাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে। যে কেহ তাহার আনুকূল্য করিতে চেষ্টা করিয়াছে, সে-ই তাহার হিতৈষণাদ্বারা তাহাকে সর্ব্বনাশের অতল পঙ্কে আরও গভীর ভাবেই ডুবাইয়া দিয়াছে। যে কাল নিশীথে গুরগন খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় দলনীর দুর্গপ্রবেশপথ রুদ্ধ হইল, সেই রাত্রে সন্ন্যাসীবেশী চন্দ্রশেখর তাহার সহায়তা করিতে গিয়া তাহাকে সর্ব্বনাশের পথে আর এক পদ অগ্রসরই করিয়া দিলেন। আশ্রয়ব্যপদেশে তাহাকে সমস্ত রাজধানীর মধ্যে এমন একটী বাটীতে লইয়া গেলেন, যেখানে সর্ব্বনাশ তাহার কৃষ্ণ চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়া গিয়াছে, যেখানে বিপদ নূতন জাল পাতিয়া তাহার প্রতীক্ষাতেই বসিয়া আছে। সেই রাত্রেরই শেষ ভাগে একটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভ্রান্তির বশে দলনী অতল গহ্বরের দিকে আর এক ধাপ নীচে নামিয়া গেল, শৈবলিনীভ্রমে ইংরেজ তাহাকে বন্দিনী করিয়া লইয়া গেল, ও নবাবের আগতপ্রায় ক্ষমার সীমানার বাহিরে, আসন্ন উদ্ধারের স্পর্শ হইতে দূরে ফেলিয়া দিল। মহম্মদ তকির অনবধানতা, ও দলনীর বিরুদ্ধে তাহার মিথ্যা অভিযোগ সৃজন, দলনীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ফষ্টর কর্ত্তৃক তাহার পরিত্যাগ, কুলসমের সহিত বিচ্ছেদ, ব্রহ্মচারীর নিষেধসত্ত্বেও মুঙ্গেরযাত্রায় কৃত সঙ্কল্পতা—ঘটনার প্রত্যেক পদক্ষেপই দলনীর গলদেশে নিয়তির যে রজ্জু ঝুলিতেছিল, তাহার বন্ধন দৃঢ়তর করিয়া দিয়াছে; শেষে নিয়তি যে বিষপাত্র পূর্ণ করিয়া তাহার ওষ্ঠে তুলিয়া দিল তাহাতে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য রসের অমৃত সঞ্চার করিয়া দলনী তাহা পান করিল, এবং অদৃষ্টের অবিচ্ছিন্ন পীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভ করিল।

এই অসাধারণ অদৃষ্ট-মন্থনে এক দিকে যেমন বিপদের হলাহল ফেনাইয়া উঠিয়াছে, তেমনি আর এক দিকে অন্তরের আলোড়নে ভাবের অমৃত বিষকে ছাপাইয়া বাহিরে আসিয়াছে। বাহিরের বিপদ্ সংঘাতের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরেও একটা গভীর আলোড়ন চলিয়াছে, এবং হৃদয়ের

গভীর বৃত্তি ও ভাবসমূহ আশ্চর্য্য সমৃদ্ধির সহিত অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ যে অধ্যায়ে (ষষ্ঠ খণ্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদ) কুলসমের তিক্ত-তীব্র সত্য ভাষণে নবাবের দলনী বিষয়ে ভ্রান্তি নিরাস হইল, তাহাতে মীরকাসেমের অসহ্য মনোপীড়া ও নিস্ফল অনুতাপ গৈরিক অগ্নি-স্রাবের ন্যায়ই আমাদিগকে দগ্ধ করে। অন্যান্য তীব্রভাবপূর্ণ দৃশ্যের মধ্যে সুষুপ্তা শৈবলিনীর সম্মুখে বসিয়া চন্দ্রশেখরের খেদপূর্ণ চিন্তা, ইংরেজ হস্ত হইতে উদ্ধারের পর শৈবলিনীর সহিত প্রতাপের অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ, শৈবলিনী ও প্রতাপের গঙ্গা-সন্তরণ, দলনীর বিষপান, প্রতাপের মৃত্যুকালে আজীবন-রুদ্ধ প্রেমের জ্বালাময় অভিব্যক্তি এবং সর্ব্বোপরি বিরাট কল্পনার দ্বারা মহিমান্বিত শৈবলিনীর উৎকট প্রায়শ্চিত্তের বিবরণ আমাদের মনের মধ্যে সুগভীর রেখায় কাটিয়া বসে, ও বিচিত্র-ভাব-নিলয় এই মানব হৃদয় ও গূঢ় রহস্যাবৃত এই মানব জীবনের প্রতি একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলে। অবশ্য ভাষা ও উপযোগিতার দিক্ দিয়া এই সমস্ত দৃশ্যই যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই, তাহার আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি। দুই একটা দৃশ্যে রোমান্সের অতি গাঢ় বর্ণোচ্ছ্বাস, বাস্তব জীবনের ধূসর বর্ণের সহিত তুলনায় একটা অতি প্রবল অসঙ্গত বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছে। আর ভাষার দিক্ দিয়াও, বিশেষতঃ কথোপকথনের সময়, একটা আলঙ্কারিক শব্দাড়ম্বর সময় সময় বাস্তবতার স্তরটীকে ঢাকিয়া ফেলে, পুষ্পাভরণপ্রাচুর্য্যে মৃত্তিকার রস ও গন্ধ অন্তরালে পড়িয়া যায়। বঙ্কিমের যুগে বাস্তব জীবনের ভাষা সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ-লাভ করে নাই; করিলেও আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের ভাষা ভাবের এত উচ্চগ্রামে বাঁধা চলিত কি না সন্দেহ। সে যাহাই হউক, মোটের উপর কতকগুলি দৃশ্য কতকটা ভাষা-গত অতিরঞ্জনের জন্য, আদর্শ সৌন্দর্য্য হইতে কিঞ্চিন্মাত্র ভ্রষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কথোপকথনের দিকে যাহা হউক, বর্ণনা ও ব্যঞ্জনায় এই ভাব-সমৃদ্ধ, অর্থগৌরবপূর্ণ ভাষা একটা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সার্থকতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। নিদ্রিতা শৈবলিনীর সৌন্দর্য্য-বর্ণনা, প্রতারণাশীল প্রভাত-বায়ুর বিপদ-গর্ভ ক্রীড়াশীলতা, শৈবলিনীর পর্ব্বতারোহণের পর প্রকৃতির ভয়ানক বিপ্লব, ও মানুষের সুখে-দুঃখে তাহার নির্ম্মম উদাসীনতারবর্ণনা, এবং প্রায়শ্চিত্তের দৃশ্যগুলি বঙ্কিমের ভাষার চরম গৌরব স্থল।

চরিত্রাঙ্কণের দিক্ দিয়া এক শৈবলিনীর চরিত্রেই অনেকটা জটিলতা আছে; তাহারই অন্তরের গভীর তলদেশ পর্য্যন্ত বঙ্কিম আপনার তীব্রদৃষ্টি চালাইয়াছেন। অন্যান্য সমস্ত চরিত্র গুলিই অপেক্ষাকৃত সরল; তাহারা সম্পূর্ণ বাস্তব ও জীবন্ত হইলেও, তাহাদের মধ্যে অধিক গভীরতা নাই, দুই একটি প্রাথমিক প্রবৃত্তি বা গুণেরই প্রাধান্য আছে। সুতরাং এক শৈবলিনী চরিত্রেরই একটু বিস্তৃত সমালোচনা প্রয়োজন, ও তাহার গ্রন্থিবহুল জীবনসূত্রকে টানিয়া সোজা করিবার চেষ্টা করা উচিত। বঙ্কিম অতি সুকৌশলে শৈবলিনীর অধঃপতনের ক্রমবিকাশটি চিত্রিত করিয়াছেন। প্রথম যৌবনে প্রতাপ শৈবলিনীর মধ্যে যে ব্যর্থপ্রণয়জ্বালা নিবারণের জন্য ডুবিয়া মরিবার পরামর্শ হয়, তাহাতেই শৈবলিনীর স্বার্থপরতা ও চরিত্র দৌর্ব্বল্যের প্রথম বীজ দেখা দেয়। প্রতাপ নিজ প্রতিজ্ঞানুযায়ী ডুবিয়াছিল, কিন্তু শৈবলিনী শেষ পর্য্যন্ত ঠিক থাকিতে পারিল না, প্রাণের মায়া তাহার প্রণয়াবেগকে হঠাইয়া দিল। এই অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতার বীজটাই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে ক্রম বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে এক গুরুতর পদস্খলনের দিকে লইয়া গিয়াছে। তাহার পরই চন্দ্রশেখরের সহিত বিবাহ। বিবাহের আট বৎসর পরে ভীম পুষ্করিণীর জলমধ্যে এই অমঙ্গলের বীজে আবার বারি-সিঞ্চন হইল, অন্তরস্থ পাপ প্রবল ও সতেজ হইয়া উঠিল। শৈবলিনীর বিবাহিত জীবনের এই আটবৎসরের ইতিহাস আমরা প্রত্যক্ষভাবে পাই না—তবে চন্দ্রশেখরের আক্ষেপোক্তিতে তাহার একটি সহানুভূতিপূর্ণ চিত্রের আভাস পাই; চন্দ্রশেখরের বিষয়-বিমুখ পাঠনিরত চিত্তবৃত্তিতে শৈবলিনী তাহার প্রণয়তৃষ্ণা নিবারণের বিশেষ সুযোগ পায় নাই। তারপর শৈবলিনীর মানস পাপ বাহিরে প্রকাশ পাইল—ফষ্টর ডাকাইতি করিয়া তাহাকে সমাজ-বক্ষ ও গার্হস্থ্য জীবন হইতে ছিনাইয়া

লইয়া গেল। এইখানে বঙ্কিম একটি অভিনব প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন—তিনি শৈবলিনীর গোপন অভিপ্রায় সম্বন্ধে আমাদের নিকট কোন স্পষ্ট উক্তি করেন নাই,তাহার পাপের কাহিনীটি ধীরে ধীরে যবনিকার অন্তরাল হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছেন। যেমন বাস্তব জীবনে ধীরে ধীরে পাপের আবিষ্কার হয়, অনুমান, সন্দেহ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আভাস শেষে নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হয়. শৈবলিনীর ক্ষেত্রে ঠিক তাহাই হইয়াছে; বঙ্কিম এখানে বাস্তব জীবনের অনুগামী হইয়াছেন। সুন্দরীর সহিত বাড়ী ফিরিতে অস্বীকার করণে তাহার পাপের প্রথম সন্দেহ পাঠকের মনে উদিত হয়, পরে প্রতাপের নিকট শৈবলিনীর স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে আমাদের সন্দেহ দৃঢ় প্রতীতিতে পরিণত হয়। কিন্তু শৈবলিনীর যুক্তিধারাটী ঠিক আমাদের মনে লাগে না—ফষ্টরের সহিত কুলত্যাগ করিয়া গেলে প্রতাপের প্রণয়লাভ যে কি প্রকারে সুলভ হইবে, তাহা দুর্ব্বোধ্য বলিয়াই মনে হয়। পুরন্দর-পুরের কুঠির বাতায়নে জাল পাতিয়া প্রতাপ পক্ষীকে ধরার বিশেষ কি সুবিধা ছিল জানি না, কিন্তু এখানে শৈবলিনী প্রতাপের চরিত্র সম্বন্ধে যে একটা প্রকাণ্ড হিসাব-ভুল করিয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত; বোধ হয় সেই প্রণয়মূঢ়া ভাবিয়া ছিল যে সামাজিকব্যবধানই তাহার প্রতাপলাভের পথে প্রধান অন্তরায়। প্রতাপের ইংরেজ-হস্তে বন্দী হইবার পরও এই ভ্রমের নেশা তাহাকে ছাড়ে নাই—সে নবাবের নিকট দরবার করিয়া রূপসীর বিরুদ্ধে প্রতাপ-লাভের ডিক্রী পাইবার অসম্ভব আশাও মনে মনে পোষণ করিতেছিল। মজ্জমান ব্যক্তির তৃণখণ্ডকে ধরিয়া ভাসিবার চেষ্টার মত শৈবলিনীর প্রতাপ লাভের এই অসম্ভব আশার মধ্যে একটা pathos—সকরুণ দিক্—আছে। প্রতাপের উদ্ধারের জন্য তাহার যে সমস্ত দুঃসাহসিক চেষ্টা,তাহারাও তাহার প্রণয়াকর্ষণের তীব্রতার পরিচয় দেয়। তার পর সব শেষ—দীর্ঘকালসঞ্চিত সুখস্বপ্ন এক মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া গেল, নিদারুণ বজ্রাঘাতে আশারচিত প্রণয়সৌধ ধূলিসাৎ হইয়া গেল। এই পর্য্যন্ত শৈবলিনী-চরিত্রের বিশ্লেষণ চলে। তাহার পর সে মর্ত্ত্যলোকের অনেক উর্দ্ধে এক অভিনব অনুভূতির রাজ্যে বিশ্লেষণের সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত প্রচণ্ড অনুভূতির ফলে ও ক্ষণস্থায়ী উন্মত্ততার অন্তরালে শৈবলিনীর মনের রাজ্যে একটা যুগান্তর সংঘটিত হইয়া গেল—তাহার মর্ম্মস্থান হইতে প্রতাপের প্রতি অনুরাগের মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইল, এবং শৈবলিনী প্রকৃত পক্ষে নবজীবন লাভ করিল। কিন্তু এই শেষের দিকের শৈবলিনী আর সমালোচকের বিশ্লেষণের বস্তু নহে, খুব উচ্চাঙ্গের কবিকল্পনার অনুভূতির বিষয়।

'চন্দ্রশেখরে' বঙ্কিম যে নূতন কৃতিত্ব ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। গার্হস্থ্য জীবনের উপর রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাব এখানে বেশ সুন্দর ভাবেই দেখান হইতেছে। বিচিত্র রোমাঞ্চকর ন্যায় একটী জটীল স্ত্রী চরিত্রের সৃষ্টি ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপন্যাসের মধ্যে এক 'মৃণালিনী'তে মনোরমার চরিত্র অনেকটা জটীল ও রহস্যময় বটে, কিন্তু মনোরমা মুখ্যত কল্পনা-রাজ্যের জীব, শৈবলিনী একেবারে আমাদের বাস্তব জগতের প্রতিবেশিনী। সকলের শেষে বঙ্কিম রোমান্সের বর্ণোচ্ছ্বাস গাঢ়তর করিয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত বিরলবর্ণ জগৎকে একেবারে লুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। কবি আসিয়া ঔপন্যাসিকের হস্ত হইতে লেখনী কাড়িয়া লইয়াছেন। চন্দ্রশেখরের কল্পনাশক্তি সমৃদ্ধি ও সুসঙ্গতি আমরা উপভোগ করি বটে, ইহার কলাসৌন্দর্য্য আমাদিগকে একবারে মুগ্ধ করিয়া দেয়; কিন্তু উপন্যাসক্ষেত্রে কবিত্বের এই অনধিকারপ্রবেশে যে ভবিষ্যৎ বিপদের বীজ নিহিত আছে ইহাও অনুভব করি। 'চন্দ্রশেখর' 'আনন্দমঠের' বাস্তব-সম্পর্কহীন আদর্শবাদের ও 'দেবী-চৌধুরাণীর' অনুশীলন-তত্ত্ব-প্রিয়তার অগ্রদূত।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নারীর কর্ত্তব্য

এই যে দেশে এত সভা সমিতি, এত আলোচনা চলিতেছে, ইহাতে কোন কাজ হয় না কেন? একমাত্র নারী শিক্ষার অভাবই ইহার মূল। আমরা ভারতবর্ষের, তথা বঙ্গদেশের নারীগণ সর্ব্বপ্রকারেই পশ্চাতে পড়িয়া আছি। এতদিন নারী জাতির যেন কোন অস্তিত্বই ছিল না। এখন মাঝে মাঝে দুইচারি জন মহিলা কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতেছেন। কর্ম্ম পথে চলিতে বিদ্যা ও সৎসাহস রূপ পাথেয় দরকার। যে দেশে শতকরা প্রায় ৫ জন পুরুষ শিক্ষিত এবং নারীরা ২শতে ১জন মাত্র শিক্ষিত তথায় আর আশা ভরসা কোথায়? যে কয়টি মহিলার প্রাণের সাড়া পাওয়া গিয়াছে, তাঁহারা সকলেই অল্প বিস্তর লেখা পড়া জানেন। এই জন্য আমাদের সর্ব্ব প্রযত্নে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি মনোযোগী হইতে হইবে। প্রত্যেক মাতা ও অভিভাবিকাকে কন্যার সৎশিক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমাদের দেশে হিন্দু মেয়েদের অত্যন্ত অনাদর। বোধ হয় পণপ্রথা ও পরমুখাপেক্ষিতাই তাহার প্রধান কারণ। মেয়ের বিবাহ দিতেই হইবে, তাহার জন্য যত টাকাই লাগুক, আর যত লাঞ্ছনাই হোক, এই যে মনোভাব ইহাতেই এদেশের মেয়েদের এত অবনতি। বিবাহের প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া উহাই জীবনের চরম ও পরম কর্ত্তব্য নয়। যেমন ছেলেদের বেলায় অগ্রে শিক্ষা পরে প্রয়োজন অনুসারে বিবাহের ব্যবস্থা আছে, মেয়েদেরও ঠিক সেই ব্যবস্থা করা দরকার। যদি প্রত্যেক পিতা মাতা কন্যাকে সর্ব্ব প্রকারে সুশিক্ষিতা করিয়া ব্রাহ্মচর্য্যব্রতে ব্রতী করেন এবং যাহাতে তাহারা নির্ভীক, স্বাবলম্বী ও আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়, এরূপ শিক্ষা দেন, তবে এদেশের অনেক সমস্যার সমাধান হয়। বিবাহে তাহাদিগকে বাধ্য না করিয়া যদি রুচি অনুসারে বিবাহিতা বা অবিবাহিতা থাকিয়া নানা প্রকার মঙ্গল কর্ম্মের সুযোগ তাহাদের দেওয়া যায়, তবে তাহাদেরও মঙ্গল হয়। দেশও অনেক অগ্রসর হইয়া যায়। এখন মেয়ে অবিবাহিতা রাখার কল্পনাতেই হয়ত অনেকে শিহরিয়া উঠিবেন। কিন্তু ভয়ের কোন কারণ নাই, মেয়ের জন্য পাত্র প্রয়োজন, ইহা মনে না করিয়া কন্যার পিতাগণ যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া কেহবা সুপাত্রে, কেহবা অসঙ্গতি হেতু অপাত্রে মেয়েদের বিবাহ দিতেছেন, অথচ তাহাদের অধিকাংশই যদি বিধবা হয়, তবে কেহ শিহরিয়াও উঠেন না, জাতি ও সমাজের ভয়ও থাকে না। এই কুসংস্কার দূর করিয়া সকলে একমত হইয়া কিছুদিন বিবাহ বন্ধ রাখিলেই অথবা বিলম্বে নিষ্পন্ন করিলেই মেয়েদের আদর বোধগম্য হয়। অনেক সংসারে পুত্রকন্যার লালন পালনে এমন পার্থক্য দেখা যায় যে প্রাণে বেদনা অনুভব না করিয়া থাকা যায় না। বাল্যকাল হইতে অবজ্ঞা অশ্রদ্ধায় পালিত হইতে হইতে মেয়েদের আত্ম সম্মান ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাস বোধ জন্মেনা। তাহারাও যে মানুষ, জগতের প্রত্যেক কল্যাণ কর্ম্মেই যে তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও সুমহান কর্ত্তব্য আছে তাহা তাহারা চিন্তা করিতেই শেখেনা। নারী শক্তি বিশ্বশক্তির অর্দ্ধাংশ, এই এক অংশ যদি বিশ্বজনীন কর্ম্মে অনধিকারী হয়, তবে ঐ শক্তি পক্ষাঘাতগ্রস্ত দেহের ন্যায় অবশ হইয়া পড়ে। এত যে অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস কনফারেন্সের অধিবেশন সর্ব্বদাই হইতেছে, অথচ দেশ আশানুরূপ অগ্রসর হইতেছে না, তাহার মূল কারণ কেহই চিন্তা করেন না। দেশের কাজ ত

বহু দূরের কথা,—যে দেশের নারীরা নিজে নিজকে রক্ষা করিতে অক্ষম, আজ দিকে দিকে নারীদের প্রতি অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হইতেছে, যাহা স্মরণ করিলে নিজের জাতির দুর্দ্দশা ও অক্ষমতার জন্য প্রাণ গভীর লজ্জায় ও বেদনায় ভরিয়া যায়, তাহার প্রতীকারের উপায় আমরা নারীরা কি করিতেছি? এই বিষয়ের সর্ব্বত্রই আলোচনা হইতেছে। পুরুষেরা কোথাও বা মাতৃমঙ্গলসমিতি স্থাপন করিয়া, কোথাও বা আর্য্য সমাজীরা লাঞ্ছিতাদের বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া, ইহার প্রতিকারের উপায় করিতেছেন। ইহাতে কোন সুফল ফলিবে কি? আমার মনে হয় মাতৃমঙ্গলসমিতি নির্য্যাতিতা নারীদের স্বপক্ষে মামলা মোকদ্দমা করিয়া কিম্বা পুরুষ জাতি বিনিদ্রনয়নে নারীজাতিকে অহোরাত্র পাহারা দিয়া ইহার কোনই প্রতীকার করিতে পারিবেন না। সেই সত্য যুগ হইতে কলিযুগ পর্য্যন্ত জগতে পাশবিক ও আসুরিক শক্তির অপ্রতুল নাই, নারীর প্রতি অত্যাচারেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। যখন অসুরের অত্যাচারে দেবগণ লাঞ্ছিত ও পরাজিত হইয়া চণ্ডীর শরণাপন্ন হইলেন, তখন চণ্ডী আসিলেন। অসুরেরা তাঁহার প্রতিও অত্যাচারসমুদ্যত। তখন তিনি নিজের শক্তিতেই অসুর নিধন করিয়া স্বর্গ রাজ্য উদ্ধার করিলেন। আত্মরক্ষা ও দেশ রক্ষার জন্য ভারতীয় রমণীদের বীরত্বের কাহিনী গল্প নয়, অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আমরাও শক্তির অংশ, আবার সেই চণ্ডীর আরাধনা করিয়া ঘরে ঘরে সর্ব্বমঙ্গল কল্যাণী শক্তিশালিনী নারী গঠন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। মেয়েদের বাল্যকাল হইতে অন্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক বলবৃদ্ধি ও ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করা উচিত। প্রয়োজন হইলে তাহারা যাহাতে নিজকে ও অপরকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয়, তদ্রূপ শিক্ষা তাদের দেওয়া উচিত। জগতে পাশবিক বল কি, তদ্দ্বারা নারীরা কিরূপে বিপন্ন হয় এবং কিরূপেই বা আত্মরক্ষা করা যায় এসব বিষয়ের জ্ঞান গোড়াতে যদি তাহারা না পায় তবে কিরূপে তাহারা শক্তি ও সাহসসম্পন্না হইবে? এসব বিষয় পুরুষদের নিকট বলিয়া কোন ফল নাই, তাঁহাদের অধিকাংশই দাসমনোভাব দ্বারা চালিত। নিজেরাই আত্মরক্ষার অক্ষম এবং অস্ত্র ব্যবহারে অনধিকারী, তাঁহারা আবার তাঁহাদেরও অধীন নারীজাতিকে কি উপদেশ দিবেন? অনেকেরই স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ এত উচ্চ, যে "মেয়েদের কথা যেন কেহ শুনিতে পায় না, তাহাদের মুখ যেন কেহ দেখিতে পায় না" ইহাই তাঁহাদিগের আপনার মত। জগতে কোথায় কি হয় তাহা জানিতে পায় না, কোথাও যাইতে হইলে আগে পাছে রক্ষক বেষ্টিত করিয়া লইয়া যাইতে হয় এবং সে জন্যও পুরুষগণ তাহাদিগকে জীবন্ত লাগেজ ইত্যাদি বলিয়া সম্মানিত করেন। নিজেরা স্বাধীনতার স্বরূপ না জানিলে অন্যকেও তাহা দান করা যায় না। কেহ কেহ স্ত্রী স্বাধীনতার এমন বিকৃত অর্থ করেন যে শুনিলেও অশ্রদ্ধার উদয় হয়। কাজেই তাঁহাদের নিকট এসব আশা বৃথা। যদি বাস্তবিকই আমরা মেয়েরা জগৎসমক্ষে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চাই, নিজদের সম্মান ও জাতি ধর্ম্ম রক্ষা করিতে চাই, জগতের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান ও মঙ্গল কর্ম্মে যোগ দিবার আশা রাখি, তবে আর আমাদের পরমুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমানিচ এই নীতি বাক্যের অনুসরণ করিয়া নিজেদের কর্ম্মের পথ নিজেদেরই গঠন করিতে হইবে। আমাদের কন্যাভগিনীগণকে উচ্চ আদর্শে গড়িয়া তুলিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা পরিহার করিয়া কায়মনবাক্য প্রভৃতি সংযত করিয়া শারীরিক ও মানসিক বলে বলীয়ান হইয়া যাহাতে অসুরনাশিনী শক্তির ন্যায় সর্ব্ববিধ অমঙ্গলকেও দানবীয় শক্তিকে পদ দলিত করিতে পারি, শুধু বাক্যে নয় কার্য্যে পরিণত করিতে পারি, আমাদের সর্ব্বপ্রযত্নে সেই চেষ্টা করা উচিত। আমাদের শুভ ইচ্ছায় ঈশ্বর সহায় হইবেন।

শ্রীশ্যামমোহিনী দেবী

সূচী

ক্যালকাটা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,—৬৫ নং সার্পেন্টাইন লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নব্যভারত

দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড] আশ্বিন, ১৩৩১ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ

আজকের এই সভায় আমি যে কিছু বল্‌বো এতে আমার মন সায় দিচ্ছে না। আজ আমি এই কথা মনে করে এসেছি, অনতিকাল পরে আমি যে পাশ্চাত্যের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চলেছি, সে কাজে সকলের কাছ থেকে—তরুণ ছাত্রমণ্ডলীর কাছ থেকে—অনুমোদন ও অভিনন্দন লাভ করবো। এইরূপে শক্তিসঞ্চয় করে, পাথেয় নিয়ে ভারতের বাণী উদ্‌ঘাটন করবার কাজে আমি যাব। গিয়ে সেখানে বল্‌বো, আমি ভারতের তরুণমণ্ডলীর অভ্যর্থনা গ্রহণ করে এসেছি।

তবু জানি এখানে কিছু বল্‌তেই হবে—কিন্তু আমার মনে কিছুই সুস্পষ্ট নেই। মনে যা আপনি উপস্থিত হয় তাই তোমাদের শোনাব। যে দেশেই আমি গিয়েছি, সকল দেশেই আমাকে কিছু না কিছু বল্‌তে হয়েছে। এবং এটা আমার সৌভাগ্য যে সব জায়গায়ই অল্পবয়স্কেরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা, শুনে প্রীতিলাভ করেছে। মনে পড়ে আমি যখন আমেরিকায় গিয়েছিলাম, তখন সেখানে স্বাজাত্যাভিমান সম্বন্ধে আমার মত ব্যক্ত করেছিলাম। সে মত তখন প্রিয় ছিল না, পশ্চিম তা' গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। ইউরোপে তখন মহা যুদ্ধ চলছিল—স্বাজাত্যাভিমানের যা ফল। কিন্তু তার শেষ ফল তখনো দেখা দেয়নি। এসম্বন্ধে অনেক বাদপ্রতিবাদ হচ্ছিল, অনেকে অনেক সংশয় প্রকাশ করছিলেন। কিন্তু তরুণদের উৎসাহের কথা আমার মনে আছে। বোষ্টনে যখন আমি আমার বক্তৃতা পাঠ করেছিলাম, বক্তৃতা শেষ হওয়া মাত্র দুটি ছাত্র কম্পিত কলেবরে আমার হাত দুটি চেপে ধরে বল্লেন, "আজকে যা শুনলুম তা আর কারো কাছে শুনিনি; আপনার কথা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করেছে। আমাদের কর্ত্তব্য কি তা আপনার কাছে শুন্‌তে চাই।" সর্ব্বত্রই এইরূপ হয়েচে—তরুণেরা কখনও বিরুদ্ধাচরণ করেনি। গতবারে যখন ইউরোপে গিয়েছিলাম তখন সেখানে বার্লিনে, ষ্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে, ডেনমার্কে, সুইডেনে ছাত্রসমাজের কাছে আমার বল্‌বার সুযোগ হয়েছিল। তাদের সঙ্গে আমার যে চিত্তের যোগ হয়েছিল তাতে আমি একটা আনন্দের বার্ত্তা অনুভব করেছিলাম—ভেবেছিলাম এদের হৃদয় যদি আমি আকর্ষণ করতে পেরে থাকি, তাহলে আমার মধ্যে এখনো কিছু তারুণ্য রয়েচে, যদিচ আমার বয়স বড় কম নয়, নইলে সুরে সুর মিল্‌তো না। আমার মধ্যে কিছু নবীনতা আছে বলেই এ যোগ সম্ভব হয়েছিল। এমনতর ঘটনা মাঝে মাঝে হয়েচে।

আমি যখন অপেক্ষাকৃত অল্প-বয়স্ক ছিলুম, তখন কলিকাতায় ছাত্রমণ্ডলীর সঙ্গে আমার যোগ ছিল, তাদের সঙ্গে আমি খুব সহজে মিলতে পারতুম। আমি সে সময়ে যে সব কাব্য লিখছিলেম, তা নিয়ে তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে আলোচনা হতো। তখনকার নবীনেরা অবশ্য এখন সবাই প্রবীণ। যাহোক্, মাঝখানে যে একটা বিচ্ছেদ ঘটেনি তা বলতে পারিনে। এক সময়ে মনে করেছিলাম এ দেশে জরার হাওয়া বইছে, বলিচিহ্ন দেখা দিয়েছে—বড় বেদনার সঙ্গে অনুভব করেছিলাম, আমি যে সুরে যৌবনের জয়গান করতে চাই, সে সুর বাজ্‌চে না এদের অন্তরে। মৃতের গৌরবানুভূতি এদের চিত্ত অধিকার করে রেখেচে, এরা জীর্ণ হয়ে পড়েছে। আমি ভাব্‌লুম, সরে দাঁড়াই, এদের কাছে আমার বাণী পৌঁছবে না। এই উপলক্ষে একটা কথা বল্‌তে চাই—যা নিশ্চল, বর্ত্তমান জীবনপ্রবাহের সঙ্গে যার যোগ নেই, তাকে অন্তরের ভিতরে সঞ্চিত করে রাখ্‌বার মধ্যে একটা ব্যর্থতা আছে। মাদ্রাজে ছাত্রেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—অল্পকালমধ্যে বাংলা দেশ থেকে এমন অনেক লোক জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁরা তাঁদের প্রতিভার স্বকীয় মাহাত্ম্য দেখিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনুকরণ বা অনুবর্ত্তিতা নেই—স্বপ্রকাশ যে জ্যোতি তাই তাঁরা দেখিয়েছেন। কেন মাদ্রাজে আমরা সেরকম দেখ্‌তে পাইনে? এর উত্তর খুব সহজ নয়। আমার মনে যা এসেছিল তাই আমি তাদের বল্‌লুম। আমি বল্লুম, 'তোমাদের অতীত অত্যন্ত সুপ্রত্যক্ষরূপে তোমাদের সমস্ত চিত্তক্ষেত্র অধিকার করে বসে রয়েচে, তোমাদের কল্পনা আবৃত করে রেখেছে। প্রাচীনতার আড়াল ভেদ করে তোমরা বর্ত্তমানের স্বরূপ দেখ্‌তে পাচ্ছ না।' একজন শেঠী ৩৫ লক্ষ টাকা খরচ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন একটা মন্দির নির্ম্মাণের জন্য—তার গঠন হবে দুইহাজার বছর আগেকার প্রাচীন মন্দিরের গঠনের অবিকল অনুরূপ। নতুন করে কিছু গড়বার বা কিছু ভাব্‌বার সাহস তাদের আর নেই। পুরাতনের ভ্রুকুটি দিগন্ত আবৃত করে রেখেছে—এত বড় শাসন ঠেলে বর্ত্তমানের জয়গান তাদের জীবন থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌তে পারে না। পুনরাবৃত্তির চক্রপথে আবর্ত্তন করে করে তাদের নবোৎসাহ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আমাদের বাংলাদেশে সৌভাগ্যক্রমে প্রাচীন কীর্ত্তিসকল এমন করে সমস্ত ক্ষেত্র জুড়ে থাক্‌তে পারে না। বাংলাদেশ পলিমাটীর দেশ—এখানে জীবনের ফসল প্রতিবৎসর নতুন হয়ে, [illegible] হয়ে সফল হয়ে ওঠে। এখানে পুরাতন যা কিছু—কালের বিচারে জীবনে যার আর কোনই অধিকার নেই বলে সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে—তা সমস্ত জায়গা জুড়ে থাক্‌তে পারে না। সে সবই মাটিতে নিমগ্ন হয়ে গিয়েছে, বসুন্ধরা তাদের তাঁর অন্ধকার ভাণ্ডারে সরিয়ে নিয়েছেন—বলেছেন, জীবনের পথ অবরুদ্ধ করতে দেব না। নবজীবনের জয়পতাকা নিয়ে যারা ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, পুরাতনকালের আশ্চর্য্যকীর্ত্তি বা জয়স্তম্ভ তাদের বাধা দিতে পারবে না—এমন কথা বাংলাদেশের মাটি বলেছে। বাংলার নদী ক্রমাগত সব ধুয়ে মুছে নিচ্ছে, জীবনের ভগ্নাবশেষ সব সম্মার্জ্জিত করে ভাসিয়ে সমুদ্রের গর্ভে নিয়ে ফেল্‌ছে। এম্নি করেই সব পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। এখানকার আকাশ পুরাতনের অচলসঞ্চয়ে অবরুদ্ধ নয়। হয়তো এতে ক্ষতিও থাক্‌তে পারে, কিন্তু ক্ষতির চেয়ে লাভই বেশী। বাংলাদেশে নতুন একটা ভাব গ্রহণ করবার সাহস ও শক্তি আছে এবং আমরা তা বুঝিও সহজে। কেননা অভ্যাসের

জড়তার বাধা আমরা পাই না। এটা আমাদের গর্ব্বের বিষয়। নতুন ভাব গ্রহণ করা সম্বন্ধে বুদ্ধির দিক থেকে বাধা থাক্‌লে ক্ষতি নেই, কিন্তু জড় অভ্যাসের বাধা পাওয়া বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়। এই জড় অভ্যাসেব বাধা অন্য প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশে কম বলে আমি মনে করি। প্রাচীন ইতিহাসেও তাই। বাংলায় যত ধর্ম্মবিপ্লব হয়েছে তার মধ্যেও বাংলা নিজ মাহাত্ম্যের বিশিষ্ট প্রকাশ দেখিয়েছে। এখানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম, বৈষ্ণব ধর্ম্ম বাংলার যা বিশেষ রূপ, গৌড়ীয় রূপ, তাই প্রকাশ করেছে। আর একটা খুব বিস্ময়কর জিনিষ এখানে দেখা যায়—হিন্দুস্থানী গান বাংলায় আমোল পায়নি। এটা আমাদের দৈন্য হতে পারে। অনেক ওস্তাদ আসেন বটে গোয়ালিয়র হতে, পশ্চিম দেশ, দক্ষিণ দেশ হতে, যাঁরা আমাদের গান বাদ্য শেখাতে পারেন, কিন্তু আমরা সে সব গ্রহণ করিনি। কেননা আমাদের জীবনের স্রোতের সঙ্গে তা মেলে না। আকবর সার সভায় তানসেন যে গান গাইতেন সাম্রাজ্যমদগর্ব্বিত সম্রাটের কাছে তা উপভোগের জিনিষ হতে পারে, কিন্তু আমাদের আপনার হতে পারে না। তার মধ্যে যে কারুনৈপুণ্য ও আশ্চর্য্য শক্তিমত্তা আছে তাকে আমরা ত্যাগ করতে পারিনে, কিন্তু তাকে আমাদের সঙ্গে মিশ খাইয়ে নেওয়া কঠিন। অবশ্য নিজের দৈন্য নিয়ে বাংলাদেশ চুপ করে থাকেনি। বাংলা কি গান গায়নি? বাংলা এমন গান গাইলে যাকে আমরা বলি কীর্ত্তন। বাংলার সঙ্গীত সমস্ত প্রথা, সঙ্গীত সম্বন্ধীয় চিরাগত প্রথার নিগড় ছিন্ন করেছিল। দশকুশী, বিশকুশী, কত তালই বেরুল, হিন্দুস্থানী তালের সঙ্গে তার কোনই যোগ নেই! খোল একটা বেরুল যার সঙ্গে পাখোয়াজের কোন মিল নাই। কিন্তু কেউ বল্লে না, এটা গ্রাম্য বা অসাধু। একেবারে মেতে গেল সব,—নেচে কুঁদে হেসে ভাসিয়ে দিলে। কত বড় কথা! অন্য প্রদেশে তো এমন হয়নি। সেখানে হাজার বৎসর আগেকার পাথরে গাঁথা কীর্ত্তি সমূহ যেমন আকাশের আলোককে অবরুদ্ধ করে রেখেচে তেম্‌নি সঙ্গীত সম্বন্ধেও সজীব চেষ্টা প্রতিহত হয়েছে। বাংলা দেশের সাহস আছে—সে মানেনি চিরাগত প্রথাকে। সে বলেছে 'আমার গান আমি গাইব।' সাহিত্যেও তাই। এখানে হয়তো অত্যুক্তি করবার একটা ইচ্ছা হতে পারে, কেননা আমি নিজে সাহিত্যিক বলে গর্ব্বানুভব করতে পারি। ছন্দ ও ভাব সম্বন্ধে আমাদের গীতিকাব্য যে একটা স্বাতন্ত্র্য ও সাহসিকতা দেখিয়েছে, অন্য দেশে তা নেই। হয়তো আমার অজ্ঞতাবশতঃ আমি ভুল করেও থাক্‌তে পারি—কোন কোন হিন্দী-গান আমি শুনেছি যাতে আশ্চর্য্য গভীরতা ও কাব্যকলা আছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস আমাদের বৈষ্ণব কবিরা ছন্দ ও ভাব সম্বন্ধে খুব দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছেন। প্রচলিত শব্দ ভেঙ্গে চুরে বা একেবারে অগ্রাহ্য ক'রে, যাতে তাঁদের সঙ্গীত ধ্বনিত হয়, ভাবের স্রোত উদ্বেল হয়ে উঠে, তেমনি শব্দ তাঁরা তৈরী করেছেন। আমি তুলনা করে কিছু বল্‌বো না, কেননা আমি সকল প্রদেশের সাহিত্যের কথা জানিনে। কিন্তু গান সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই যে বাংলাদেশ আপনার গান আপনি গেয়েছে। ভারতবর্ষের অন্যত্র যা সম্পদ আছে তা আমরা নিশ্চয়ই গ্রহণ করবো, কিন্তু তুলনা দ্বারা মূল্যবানের যথার্থ মূল্য যাচাই করে নেব। সুতরাং হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শিক্ষা দেবার আমি পক্ষপাতী, কিন্তু একথা আমি বল্‌ব না যে

'যা হয়ে গেছে তা আর হবে না'। হয়তো সেটাই উৎকৃষ্ট মনে করে কিছুদিন তার অনুবর্ত্তিতা করতেও পারি, কিন্তু তা টিঁকবে না। তাকে নিজস্ব করে, জীবনের স্রোতের কলধ্বনির সঙ্গে সুর বেঁধে নিয়ে ব্যবহার করতে হবে, নইলে তা টিঁকবে না। আগেও হিন্দুস্থানী গানের চর্চ্চা হয়েছে বটে, কিন্তু তেমন করে নেয়নি। আমাদের দেশের সৌখীন ধনী লোকেরা হিন্দুস্থানী গায়কদের আহ্বান করে আনতেন, কিন্তু বাংলার হৃদয়ের অন্তঃপুরে সে গান প্রবেশ করেনি—যেমন বাউল আর কীর্ত্তন এদেশকে প্লাবিত করে দিয়েছিল। এইটেই বাংলার গৌরব। এই জন্যই মাঝখানে কিছুদিন আমি আঘাত পেয়েছিলাম, মনে করে ছিলাম, জরার কাছে নৈবেদ্য দেবার, যৌবনকে জরাসন্ধের কারাগারে নিবদ্ধ করবার একটা আকাঙ্ক্ষা আমাদের যুবকদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। জরা তাদের বেঁধে মেরেছিল। যাহোক, এখন আমার আশা হচ্ছে যে সময় এসেছে, সে বন্ধন ছিন্ন হয়েছে। কিন্তু আমি একথা খুব সাহস করে বলতে পারিনে, কেননা তোমাদের সঙ্গে আমার তেমন যোগ নেই। তোমরা প্রবীণের আসনে বসে বলেছ 'এর কথা শোনার যোগ্য নয়'—আমিও তাই ভয়ে ভয়ে সরেছিলুম। এখনো সে ভয় একবারে ঘোচেনি। আমি মনে করি বাঙ্গালীর পক্ষে এটা অস্বাভাবিক। এটা ঘটেছিল একটা reaction থেকে, একটা বিদ্রোহের দরুণ, যখন জল নির্ম্মল থাকতে পারে না। রাষ্ট্রীয় কারণে হোক কিংবা অন্য যে কোন কারণে হোক, এটা এসেছিল—বাংলার যুবকেরা বলেছিল, আমরা নতুনকে নেব না। কিন্তু আশা করছি সেটা কেটে গেছে। আর যদি কেটে গিয়ে না থাকে—আজ যখন আমি ঘাটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, ভারতের বাইরে থেকে আমার নিমন্ত্রণ এসেছে, তখন তোমাদের অভিনন্দন ত সত্য হতে পারে না। চীন জাপান থেকে আমাকে ডেকেছিল—কেন? এমন কথা তারা আমার কাছ থেকে শুনতে চেয়েছিল—যা কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর জিনিষ নয়, ভারতের কাছ থেকে তারা এমন কিছু প্রত্যাশা করেছিল যা বিশ্বজনীন—কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, যে সম্পত্তি নিয়ে লড়াই বা মোকদ্দমা করতে হয় বা যা রক্ষা করতে ভোজপুরী দরোয়ান রাখতে হয়, লোহার সিন্দুকে বন্ধ করে রাখতে হয়। যে জিনিষে সমস্ত মানুষের সমান দাবী থাকে, সেটা এর চেয়ে ঢের বড় জিনিষ। যখন আমি চীনে যাই তখন আমার দেশের লোক অনেকে ক্রূর হাসি হেসে বলেছিলেন, ইনি 'বিশ্ব' নিয়ে আছেন? 'বিশ্ব' কথাটা উচ্চারণ করা আমার দায় হয়েছে। যদি বক্তৃতা করতে করতে দৈবাৎ 'বিশ্ব' কথাটা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, তবে দেখতে পাই বার আনা লোকের মুখ হাস্যকুটিল হয়ে পড়েছে। মাসিক পত্রেও অনেক আলোচনা দেখতে পাই যদি আমি 'ভূমা,' 'বিশ্বমানব' বা Humanity এই কথাগুলো বলি। মহা মুস্কিল হয়েছে! 'Infinite' বল্লে তো কেউ হাসে না, 'ভূমা' বল্লে কেন হাসে? এখন যদি ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য আমাদের দেশে আসতেন তাহলে তাঁর যে কি রকম অভ্যর্থনা হতো জানিনে। কিন্তু উপায় নেই—আজকেও হয়তো আমাকে সে সব কথা বলতে হবে।

আজকে এই বিদায় আয়োজন কেন? আমি কি বিদেশে যাচ্ছি আমাদের আর্থিক দৈন্য, রাষ্ট্রীয় দৈন্য নিয়ে? আমাদের ক'খানা হাড় বেরিয়ে পড়িয়েছে, পিঠে ক'টা চাবুকের

দাগ আছে তাই দেখিয়ে তাদের দয়া ভিক্ষা করতে যাচ্ছি? ঘরের কথা, ঘরের কোঁদল নিয়ে আমি যাব? আর গেলে কি তারা খুসী হবে? এর মতো দীনতা আর নেই। কেন, এ ছাড়া কি আর কোন কথা নেই? এ সব কথা বল্লে কি কেউ আমাদের শ্রদ্ধা করবে? বাই-রের দৈন্যের সময়ই অন্তরের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করবার সুযোগ সব চেয়ে বেশী। চীন জাপান যদি আমার কণ্ঠে ভারতের বাণী শুনে থাকে সে তো উপনিষদের কথা। বিশ্ব, ভূমা এসব কথা, শুন্‌লে তারা তো হাসে না! এই টুকুই আমার সম্বল, আমার দ্বারা আর কিছু হবে না। ভারতবর্ষের সঙ্গে বিশ্বের যোগ—এটাকে যদি আপনারা অশ্রদ্ধেয় বা অনিষ্টজনক বলেন, তাহলে আমি বেকার, আমার জায়গা নেই কোথাও। আমি সেই যোগে বিশ্বাস করি। ভারতের সঙ্গে যেখানে বিশ্বের যোগ সেইখানেই ভারত শ্রেষ্ঠ, সেখানে তার কোন দৈন্য নেই। অনেকে বলেছেন, কি বল্‌বো আমরা, যতক্ষণ আমরা স্বাধীন না হই? আমি বলি, আমাদের এমন একটা মহিমা আছে যাতে আমরা সকলকে আহ্বান করতে পারি। এই বিশ্বাস নিয়ে আমি কাজ করে দেখেছি সবাই আনন্দলাভ করেছেন, কোথাও আমি ব্যর্থ হইনি। এটা আমার গর্ব্ব নয়! সুইডেনে আমি গিয়েছিলেম, খুব সমাদর পেয়েছি সেখানে। সেখানকার লোকেরা আমাকে বলেছিল, 'আমাদের একটা আভিজাত্য গৌরব আছে। নরওয়ের লোকেরা Democratic, কিন্তু আমরা aristocratic। খুব খ্যাতিসম্পন্ন কোন বিদেশীয় লোককেও আমরা এমন সমাদর করিনি। এমন ভাবে সমাদর করাটা আমাদের প্রথা বলে মনে করো না।' আমি বল্লুম, 'কেন? আমায় সম্বন্ধে তোমরা কি জান? আমি বাংলা কিছু লিখেছি বটে, কিন্তু সে সম্বন্ধে আমার দেশের লোকদের মতামত যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহ'লে, তোমাদের সঙ্গে মিলবে না। কি এমন কাজ করেছি, যাতে আমাকে এত সমাদর করছ?' তারা বলে-ছিল, 'আমরা অনুভব করেছি তুমি কোন সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে তোমার চিত্তকে বদ্ধ করে রাখনি। আমি বল্লুম, 'সে তো আমি নিজের বুদ্ধি থেকে কিছু করিনি। আমাদের দেশের ঋষিরা, বুদ্ধদেব, সকলেরই এই এক শিক্ষা—সকলকে আপনার মত করে যে জানে সে-ই সত্যকে জানে।' এর মধ্যে বুঝে দেখ্‌বার কথা আছে—এটা শুধু sentiment নয়, এটা intellectual, বুদ্ধির কথা। মানুষের সত্যরূপ কোথায়? সেইখানে যেখানে মানুষ সকল জীবের সঙ্গে একান্ত ভাবে আন্তরিক ঐক্য স্থাপন করেছে, সকলের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। এই কথাটা এমন জোরের সঙ্গে অন্য দেশে খুব কম লোকেই বলতে পেরেছে। আমি অবশ্য সব দেশের আধ্যাত্মিক ইতিহাস জানিনে। কিন্তু এটা আমি জেনেছি যে পৃথিবীতে যেখানে যত দুঃখ আছে সব কিছুর মূলে এই সত্যের বিরোধ। এই সত্যের বিরোধ যেখানে ঘটেছে সেইখানেই বিপ্লব। মানুষের সম্বন্ধ যেখানে বিচ্ছিন্ন, বাধাগ্রস্ত হয়েছে, সেইখানেই পীড়া। আজকের দিনে সব মানুষ ক্লিষ্ট হয়েছে—রব উঠেছে, শান্তি নেই, বসুন্ধরা পীড়িত হয়েছেন। এর একমাত্র কারণ মানুষ আপ-নার সত্যকে উপলব্ধি করলে না। তথ্য ঘটলো বটে, মানুষ বাইরে থেকে একত্র হলো—কিন্তু সত্যকে পাওয়া গেলনা, কাজেই একত্র হওয়াটা বিষম হয়ে উঠ্‌ল। কে কাকে মারবে, কাড়বে, কে কাকে দাসত্বের বন্ধনে জর্জ্জরিত করবে—এইটেই সবার লক্ষ্য হলো।

সত্যকে যদি আমরা গ্রহণ করতে না পারি তাহলে বিধাতা নিশ্চয় আমাদের শাস্তি

দেবেন। সত্যের অপলাপ করলে মানুষের নিষ্কৃতি নেই—তাকে patriotismই বল, আর nationalismই বল! সত্যের বিরোধ হলেই রক্তপাত হবে, মানুষের রিপু জয়ী হবে। যেখানেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্য সম্বন্ধের প্রতি বিদ্বেষ, অবজ্ঞা, অবমাননা হবে, সেইখানেই দুর্গতির আর সীমা থাকবে না।

ভারতবর্ষের এই সমস্যা। যতক্ষণ আমরা ঐক্যলাভ না করবো ততক্ষণ অন্য পথ দিয়ে কোন চেষ্টাই সফল হবে না। এবং যদি না সত্য সম্বন্ধে আমরা এক হই, তবে প্রয়োজনের সম্বন্ধে যে ঐক্য তা কখনো টিকবে না। এই অল্পদিনের অভিজ্ঞতার এটা আমার কাছে আরো সুস্পষ্ট হয়েছে।

আমাদের মধ্যে জাতীয় আত্মীয়তায় সম্বন্ধ যে কত শিথিল তার প্রমাণস্বরূপ একটা একটা কথা বল্‌ব। এই কিছুদিন আগে ইংলণ্ডের একজন মস্ত বীরপুরুষ লড়াই করে গেছেন—লর্ড কিচেনার। মনে করুন লর্ড কিচেনার যদি এদেশে জন্মাতেন আর আমাদের মধ্যে কেউ বল্‌তো, 'ওহে জান. কিচেনার অমুক যুদ্ধে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, বিশ্বাসঘাতকতা করে-ছিলেন.' তাহলে অনেকেই তা বিশ্বাস করত। সমস্ত জীবন দিয়ে যে যুদ্ধ করেছে তার নামে অতি ক্ষুদ্র একটা অপবাদ দিলেও আমাদের দেশের পনর আনা লোক খুব খুসী হয়েই তা বিশ্বাস বিশ্বাস করত। ইংলণ্ডে কেউ এমন অপমানের কথা বল্‌লে পরে অন্য সবাই তার টুঁটি ছিঁড়ে ফেল্‌ত। কেন? এর কারণ ঐক্য ও পরস্পরের প্রতি প্রীতির উপলব্ধি। সে দেশে যাঁরা মাননীয়, দেশবাসীরা তাঁদের শুধু উপাধি দিয়ে নয়, অন্তরের প্রীতি দিয়ে বন্দনা করে—সেখানে কেউ এমনতর অপবাদ দিতে সাহস করবে না। কিন্তু আমাদের বাংলা দেশে কেউ কোন মহৎ সম্মান লাভ করলে তাকে অপমান করেই অনেকে সুখ পায়। এর কারণ কি? যে ঐক্য বোধ হলে সমস্ত জাতির সম্মানের আধার যাঁরা, তাঁদের কেউ আঘাত করলে অন্তর পীড়িত ক্ষুব্ধ হয় সেই ঐক্য আমাদের মধ্যে নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ পরস্পরকে টানে সেটা আমাদের দেশে সত্য নয়—কাজেই এমন কোন অপবাদ নেই যা আমরা বিশ্বাস করিনে।

সমস্ত মানুষের জীবনক্ষেত্র আমাদের ক্ষেত্র। ইংল্যাণ্ডের, ফ্রান্সের বড় বড় পণ্ডিতেরা কামাস্কাট্‌কার কি ভাষা, মুণ্ডারা কি ভাষায় কথা বলে তা জানবার জন্যে প্রাণপাত করছেন। মানুষকে জানবার তাঁদের কি আশ্চর্য্য কৌতূহল! জ্ঞানের দিক থেকে অন্ততঃ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ স্থাপন আশ্চর্য্য রকম সফলতা লাভ করেছে, কেননা এই সম্বন্ধটা সত্য। একদিন যখন প্রথম ব্যাবিলোনিয়া, চীন, ভারতবর্ষ ইত্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়েছিল তখন হয়তো কেউ জানতেন না এদের মধ্যে মর্ম্মগত স্বাভাবিক সম্পর্ক আছে। কিন্তু তুলনামূলক আলোচনা যতই হচ্ছে ততই ধর্ম্মেকর্ম্মে গল্পে ব্যবহারে মানুষের পরস্পরের সঙ্গে নাড়ীর যোগ প্রকাশ হয়ে পড়চে।

এই সমস্ত জেনে আমাদের জ্ঞানের বন্ধন মুক্তি হলো! এইখানে ভূমা কথাটা বলবার ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু বল্‌লুম না। এতে আমরা জ্ঞানের যে অসীম ক্ষেত্র, একটা বিরাট ঐক্য-ক্ষেত্র আছে তার পরিচয় পেলুম। সেখানেই জ্ঞানের আসল ভিত্তি—সঙ্কীর্ণতার মধ্যে নয়।

তুলনামূলক আলোচনা—ছন্দ ভাষা, জ্ঞান বিজ্ঞান, ধর্ম্ম কাহিনী ইত্যাদি সম্বন্ধে—এটা এই বৈজ্ঞানিক যুগের একটা কত বড় জিনিষ! আমরা বল্‌ছি—'ও আমরা নেব না, ও বিদেশী জ্ঞান, ওর সঙ্গে আমাদের চিত্তের ভাসুর-ভাদ্রবৌয়ের সম্পর্ক, আমাদের আর ওদের জ্ঞান বিজ্ঞান ঔষধ সব আলাদা।' কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বলেছেন—'সত্য সেইখানে যেখানে মানুষ সবাইকে জেনেছে আত্মবৎ—আপনার মত।' যারা বলেছে 'আমরা এই তেত্রিশ কোটি ভগবানের বিশেষ সৃষ্টি, আমরা সাধারণ মানুষ নই', তারাই নীচে পড়ে যাবে। আমরা যে আজ দরিদ্র, অপমানিত তার কারণ আমরা সত্যভ্রষ্ট হয়েছি। মানুষের সম্বন্ধে জ্ঞানগত কৌতূহল, ভাবগত মিলন বা কর্ম্মগত ঐক্য—কোনটাই আমাদের নেই। আমরা বলি, 'তোমার সত্য একরকম বিশেষ সত্য, আমার সত্য অন্য রকম বিশেষ সত্য—তোমার মুক্তি হবে তোমার সত্য নিয়ে, আমার মুক্তি আমার সত্য নিয়ে।'

আমাদের সমস্ত দুর্গতির মূলে রয়েছে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ—আমাদের উগ্র সামাজিক অভ্যাসের ফল এ অদ্ভুত আত্মপরের ভেদবোধ! রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের বাইরে অন্য কোন কথা বলা যায় না। উপস্থিতের যে মূল্য নেই তা আমি বলি নে, কিন্তু তা চরম নয়! আমাদের চিত্তের দারিদ্র্য এত দূর হবে না! যতক্ষণ সেই সত্য জ্ঞানে কর্ম্মে ভাবে আমরা উপলব্ধি করতে না পারবো, ততদিন আমাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না। এই আমার বিশ্বাস, আর এই কথাটিই আমি আজকে বল্‌তে চেয়েছিলেম।

[স্পেন যাত্রার প্রাক্কালে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের অভিনন্দনের উত্তরে প্রদত্ত বক্তৃতা। শ্রীসুধেন্দুরঞ্জন রায় কর্ত্তৃক অনুলিখিত।]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

তৃতীয় অধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অতএব বর্ব্বর যুগের ইহাই হইল বিশিষ্ট প্রকৃতি। এ যুগে সভ্যতার সকল উপাদানই একত্র তাল পাকাইয়া আছে; সকল প্রকার শাসনতন্ত্রেরই অঙ্কুর অবস্থা; একটা বিশ্বব্যাপী অশান্তি ও সংঘর্ষ, যাহার মধ্যে বিরোধেরও কোন স্থায়িত্ব নাই, বাঁধাবাঁধি নাই। এই যুগের সামাজিক অবস্থা সকল দিক দিয়াই আলোচনা করিয়া দেখাইতে পারি যে কোথাও এমন একটি ব্যাপার, এমন একটি তত্ত্ব পাওয়া যায় না, যাহা সুপরিব্যাপ্ত বা সুপ্রতিষ্ঠিত। আমি কেবল দুইটি বিষয় আলোচনা করিয়া দেখাইব—(১) ব্যক্তি-বর্গের অবস্থা, (২) সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অবস্থা। তাহাতেই সমগ্র সমাজের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে।

এই যুগে আমরা চারি শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই—(১) স্বাধীন শ্রেণী, অর্থাৎ যাহারা

কোন উপরওয়ালা বা মুরুব্বির মুখাপেক্ষী নহে, যাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত, অন্য কোন ব্যক্তির সহিত বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ না হইয়া আপন আপন সম্পত্তি ভোগ করিত, আপন আপন জীবন নিয়ন্ত্রিত করিত। (২) আশ্রিতবর্গ বা প্রজাবর্গ,—ইহারা প্রথমে দলপতি বা সর্দ্দারদিগের সহিত অনুচরসম্বন্ধে আবদ্ধ ছিল, পরে, ভূস্বামী বা ঐরূপ কোন প্রধান ব্যক্তির সহিত প্রজা বা ভৃত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়, ভূমি বা অন্য কোন সম্পত্তির পরিবর্ত্তে তাহারা প্রভুর প্রয়োজনে শক্তিসামর্থ্য নিয়োগ করিতে বাধ্য হয়। (৩) স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ক্রীতদাসবর্গ। (৪) ক্রীতদাসবর্গ।

কিন্তু এই যে শ্রেণীবিভাগ করা গেল, এ বিভাগ কি স্থায়ী ও সুনির্দ্দিষ্ট ছিল? কোন ব্যক্তি কোন একটি শ্রেণীর গণ্ডীর মধ্যে একবার আসিলে সেই গণ্ডীর মধ্যেই কি চিরকাল আবদ্ধ থাকিয়া যাইত? এই বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে কি কোন শৃঙ্খলা বা স্থায়িত্ব ছিল? কিছুতেই নহে। প্রায়ই দেখিবেন স্বাধীন শ্রেণীর লোক স্ব স্ব সামাজিক পদমর্য্যাদা ও অধিকার পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে ভূমি বা অন্য কোন দান গ্রহণ করতঃ তাহার দাসত্ব অঙ্গীকার করিতেছে, ও এইরূপে আশ্রিতশ্রেণীর মধ্যে গিয়া পড়িতেছে। কোথাও বা আবার আশ্রিত শ্রেণীর লোক তাহাদের আশ্রয়দাতার সহিত সম্বন্ধচ্ছেদ করিয়া পুনরায় স্বাধীন শ্রেণীর মধ্যে পুনঃপ্রবেশের চেষ্টা করিতেছে। সর্ব্বত্রই দেখিবেন একটা সচলতা, শ্রেণী হইতে শ্রেণ্যন্তরে অবিরত যাতায়াত চলিতেছে; বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পর সম্বন্ধের কোন স্থিরতা নাই, কোন স্থায়িত্ব নাই; কোন লোক দীর্ঘকাল এক পদবীতে অবস্থান করিতেছে না, কোন পদবীর চিরকাল একমূল্য থাকিতেছে না।

ভূসম্পত্তির অবস্থাও ঐরূপ ছিল। আপনারা জানেন যে সেকালে দুই শ্রেণীর ভূসম্পত্তি ছিল—(১) সম্পূর্ণরূপে দায়শূন্য; (২) দায়বদ্ধ, অর্থাৎ যে ভূসম্পত্তির দরুণ কোন ঊর্দ্ধতন অধিকারীর সহিত একটা বাধ্যবাধকতা থাকে। আপনারা জানেন যে এই শেষোক্ত শ্রেণীর ভূসম্পত্তির মধ্যেও একটা সুস্পষ্ট ক্রমনির্দ্দেশের চেষ্টা কেহ কেহ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন এই সকল দায়বদ্ধ ভূসম্পত্তি প্রথমে কয়েকটি নির্দ্দিষ্টসংখ্যক বৎসরের জন্য বিলি করা হইত, পরে প্রজার জীবনকাল পর্য্যন্ত, এবং সর্ব্বশেষে সেগুলি বংশগত হইয়া পড়িল। বৃথা এ চেষ্টা! ভূমিস্বত্বের এই সকল প্রকারভেদ বিশৃঙ্খল ভাবে একই সময়ে বর্ত্তমান ছিল; আমরা একই সময়ে নির্দ্দিষ্টকালব্যাপী স্বত্ব, জীবনস্বত্ব, বংশপরম্পরাগত স্বত্ব, সকল প্রকার স্বত্বেরই অস্তিত্ব দেখিতে পাইব। ব্যক্তিবর্গের অবস্থার মধ্যেও যে স্থায়িত্ব ও স্থিরতার অভাব, ভূস্বত্বের অবস্থাতেও তাহাই। সকল দিকেই একটা বহুআয়াসসাধ্য বিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা যায়; গতিশীল যাযাবর জীবন যাত্রার পরিবর্ত্তে স্থায়ী সুস্থির জীবন প্রণালী প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইতেছে; মানুষে মানুষে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের পরিবর্ত্তে, মানবসম্বন্ধ ও সম্পত্তিগত সম্বন্ধ জড়াইয়া এক জটিল বৈষয়িক সম্বন্ধের উদ্ভব হইতেছে। এই সন্ধিক্ষণে সমস্তই বিশৃঙ্খল, সমস্তই অনির্দ্দিষ্ট, সমস্তই খণ্ডিত।

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও সেই এক অস্থিরতা, সেই এক গণ্ডগোল। তিন প্রকার শাসনপদ্ধতি একই কালে বর্ত্তমান ছিল—একদিকে রাজতন্ত্র; অপর দিকে অভিজাততন্ত্র;

অর্থাৎ ভূসম্পত্তি ও মানুষের মধ্যে পরস্পরাপেক্ষী সম্বন্ধ; এবং অন্য আর একদিকে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ একত্র সম্মিলিত স্বাধীন ব্যক্তিবর্গের মন্ত্রণাসভা। কোন পদ্ধতিরই সমাজে একান্ত অধিকার ছিল না; কোনটিই অন্যগুলির উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারে নাই। স্বাধীন জনতন্ত্রমূলক প্রতিষ্ঠানাদি ছিল, কিন্তু জনসম্মিলনীতে যে সব ব্যক্তির যোগ দেওয়া উচিত তাঁহারা প্রায়ই উপস্থিত হইতেন না। এমন কি রাজতন্ত্র, যাহা অপেক্ষা সরল ও সহজনির্দ্দিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠান আর হইতেই পারে না, সেই রাজতন্ত্রেরও তখন কোন স্থায়ী নির্দিষ্ট প্রকৃতি ছিল না; তাহা কতকপরিমাণে নির্ব্বাচনমূলক, কতকপরিমাণে বংশপরম্পরাগত ছিল। কখনও পুত্র পিতার উত্তরাধিকারী হইতেছেন, কখনও বা পরিবার মধ্যে যিনি যোগ্যতম তিনিই রাজপদের জন্য নির্ব্বাচিত হইতেছেন; কখনও বা আবার দূরবর্ত্তী কোন জ্ঞাতি বা কুটুম্ব, এমন কি সম্পূর্ণ বাহিরের লোকও নির্ব্বাচিত হইতেছেন। কোনও পদ্ধতিরই কোন প্রকার স্থিরতা নাই; সকল প্রতিষ্ঠানই, সকল প্রকার সমাজব্যবস্থাই পাশাপাশি রহিয়াছে, পরস্পরের সহিত মিশিয়া যাইতেছে এবং নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

রাষ্ট্রগঠনেও সেই পরিবর্ত্তনশীলতা, সেই উত্থানপতনবৈচিত্র্য; এক একটি রাষ্ট্র মাথা তুলিতেছে, আবার তলাইয়া যাইতেছে, কখনও বা রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মিলিয়া এক হইতেছে, কখনও বা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমাব্যবচ্ছেদ নাই, নির্দ্দিষ্ট শাসনতন্ত্র নাই, নির্দ্দিষ্ট প্রজাসংঘও নাই; আছে কেবল নানা অবস্থা, নানা নীতি, নানা তথ্য, নানা জাতি, নানা ভাষার এক অদ্ভুত অসামঞ্জস্য। এই হইল বর্ব্বর ইউরোপের প্রকৃত স্বরূপ।

এই অদ্ভুতযুগের আরম্ভই বা কবে, শেষই বা কবে? ইহার জন্মকাল সম্বন্ধে কোন গোল নাই; রোমীয় সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার আরম্ভ। কিন্তু এ যুগ শেষ হইল কবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমে দেখিতে হইবে এই বর্ব্বর যুগের সমাজের যে অবস্থা নির্দ্দেশ করা হইল কি কি কারণে সেই অবস্থার উদ্ভব।

আমার মনে হয় ইহার দুইটি প্রধান কারণ দেখিতে পাওয়া যায়; একটি বাস্তব কারণ, বাহ্য ঘটনার প্রতিঘাত হইতে তাহার উৎপত্তি; অপরটি নৈতিক, মানুষের অন্তর হইতেই তাহার উদ্ভব।

বাস্তব কারণটি হইতেছে বর্ব্বর আক্রমণের দীর্ঘকালব্যাপ্তি। পঞ্চমশতাব্দীতেই বর্ব্বর আক্রমণ শেষ হইয়া গেল, একথা মনে করা চলিবে না; এ মনে করিলে চলিবে না যে রোমীয় রাষ্ট্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ধ্বংসস্তূপের উপর বিভিন্ন বর্ব্বর রাজ্যগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, এবং যাহা কিছু গোলযোগ সঙ্গে সঙ্গে চুকিয়া গেল। রোমীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর বহুকাল পর্য্যন্ত এ ব্যাপার চলিয়াছিল; ইহার প্রমাণাবলী সুস্পষ্ট।

প্রথমেই ফ্র্যাঙ্ক্ রাজগণের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। তাঁহাদিগকে কেবলই রাইন নদীর অপরপারে অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহ চালাইতে হইয়াছিল; ক্লোটেয়ার ও ডাগোবের বারবার জার্ম্মানীতে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, রাইন নদীর পূর্ব্বতীরে টুরিঞ্জীয় (Thuringian), দিনেমার, স্যাক্সন প্রভৃতি যে সকল জাতির বাস ছিল তাহাদের সহিত অনবরত যুদ্ধ করিয়া-

ছিলেন। কেন করিয়াছিলেন? কারণ এই যে এই সকল জাতি রাইন নদী পার হইয়া পশ্চিমতীরে রোমসাম্রাজ্যের লুণ্ঠনে ভাগ বসাইতে চাহিয়াছিল। অপরদিকে ঐ সময়েই গল্-অধিবাসী ফ্র্যাঙ্কগণ যে বারবার ইটালী আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহারই বা অর্থ কি? তাঁহারা সুইজারলাণ্ড আক্রমণ করিয়াছিলেন, আল্পগিরিমালা উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, ইটালিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কি কারণে? কারণ এই যে উত্তরপূর্ব্বদিক হইতে নূতন নূতন জাতি তাহাদিগকে ঠেল দিতেছিল। তাঁহাদের যুদ্ধাভিযানের কারণ কেবল মাত্র লুণ্ঠনলোলুপতা নহে, প্রয়োজনের তাড়নাই তাহার কারণ। প্রথমাধিকৃত প্রদেশে তাহারা শান্তিতে বাস করিতে পাইল না বলিয়াই তাহারা অন্যত্র ভাগ্য পরীক্ষা করিতে যাত্রা করিল। এদিকে আবার একটি নূতন জার্ম্মান জাতির আবির্ভাব হইল, তাহারা ইটালীতে লম্বার্ড্-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল। গল প্রদেশে ফ্রাঙ্করাজবংশের পরিবর্ত্তন হইল, মেরোভিঞ্জীয়দের পরিবর্ত্তে কার্লোভিঞ্জীয় বংশের প্রতিষ্ঠা হইল। এখন ইহা ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে যে বাস্তবিকপক্ষে এই রাজ-বংশ-পরিবর্ত্তনের অর্থ গলে নূতন করিয়া একটি ফ্রাঙ্ক-আক্রমণ; এই আক্রমণের ফলে গলে প্রাচ্য ফ্রাঙ্কের পরিবর্ত্তে পাশ্চাত্যফ্রাঙ্কজাতি প্রতিষ্ঠিত হইল। এই পরিবর্ত্তনব্যাপার সমাপ্ত হইয়া গেল; কার্লোভিঞ্জীয় বংশই রাজ্য শাসন করিতে লাগিল। পরে শার্লমেনের আবির্ভাব। মেরোভিঞ্জীয়েরা যেরূপ টুরিঙ্গীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন, শার্লমেনও সেইরূপ স্যাক্সন দিগের বিরুদ্ধে, রাইন্‌নদীর পূর্ব্বতীরস্থ সমস্ত জার্ম্মান জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এখন এই সকল জার্ম্মান্ জাতির পশ্চাৎ কে তাড়া দিতেছে? এখন তাড়া দিতেছে ওবোট্রাইট্, বিল্‌ৎস্ (Wilzes), সোরাব (Sorabes), বোহীমিয় প্রভৃতি স্লাব্ জাতি। সমগ্র স্লাব্ জাতি ষষ্ঠ হইতে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত জার্ম্মান জাতিগুলির উপর চাপ দিতে লাগিল ও তাহাদিগকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে বাধ্য করিল। উত্তর-পূর্ব্ব দিকে সর্ব্বত্রই এই আক্রমণ ব্যাপার চলিতে লাগিল ও ইতিহাসের ঘটনাস্রোত নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিল।

দক্ষিণেও এইরূপ একটি ব্যাপার দেখা দিল—এই ব্যাপার, মুসলমান আরবের আবির্ভাব। জার্ম্মান্ ও স্লাব্‌গণ যখন রাইন্ ও ডানিউব নদীর তীর অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, আরবরা তখন ভূমধ্য সাগরের সমগ্র উপকূলভাগে তাহাদের বিজয়যাত্রা আরম্ভ করিল।

আরব-আক্রমণের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। ইহার মধ্যে দেশ-জিগীষা ও ধর্ম্মপ্রচারেচ্ছা এই উভয় ভাব সম্মিলিত ছিল। এ আক্রমণের উদ্দেশ্য এককালে দেশ জয় করা এবং ধর্ম্মপ্রচার করা। জার্ম্মান আক্রমণ ও আরব আক্রমণের মধ্যে অনেকটা প্রভেদ। খৃষ্টীয় জগতে ঐহিক ও পারত্রিক শাসনতন্ত্রের শক্তিকেন্দ্র বিভিন্ন, পরস্পর বিচ্ছিন্ন। যাঁহারা পারত্রিক শাসনতন্ত্রের পরিচালক, ধর্ম্মপ্রচারেচ্ছা যাঁহাদের মধ্যে প্রবল, তাঁহাদের সহিত দেশজিগীষু, ঐহিকতন্ত্রপরিচালকদিগের কোন সম্বন্ধ ছিল না। একই লোকের পক্ষে এই উভয় প্রকৃতির উত্তম অভিলাষ পোষণ করা সম্ভব ছিল না। জার্ম্মানরা যখন খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইল, তখন তাহারা তাহাদের পূর্ব্বতন রীতিনীতি, ভাব আদর্শ রুচি সমস্তই বজায় রাখিল; পূর্ব্বের ন্যায় তখনও তাহাদের জীবন পার্থিব বাসনা, পার্থিব আসক্তি দ্বারাই চালিত হইতে থাকিল। তাহারা খৃষ্টধর্ম্মী হইল বটে, কিন্তু মিশনরী হইল না। অপর

দিকে আরবেরা এককালে বিজেতা ও ধর্ম্ম প্রচারক। তাহারা একই হস্তে শস্ত্র ও শাস্ত্র ধারণ করিয়া আসিল। পরবর্ত্তী কালে এই শস্ত্র-শক্তি ও শাস্ত্র-শক্তির সম্মিলনে মুসলমান সভ্যতার পরিণতি শুভকর হয় নাই। মুসলমান সভ্যতার মধ্যে যে একটা জবরদস্তির ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলে এই ঐহিক-পারত্রিক শক্তির একত্র সম্মিলন, বাহ্য শাসনতন্ত্র ও নৈতিক শাসন-তন্ত্রের বিমিশ্রণ। আমার মনে হয় এই কারণেই মুসলমান সভ্যতা এখন সর্ব্বত্রই স্থাবর হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রথমাবস্থায় এ স্থাবরত্বের কোন লক্ষণই দেখা দেয় নাই। বরং উভয় শক্তির এই সম্মিলনের দরুণই আরব-আক্রমণের বেগ এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। নৈতিক উদ্যম ও ধর্ম্মবিশ্বাসের সহায়তা পাইয়া আরবদিগ্বিজয় অতি অল্পকাল মধ্যেই যে বিরাট মহিমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিল, জার্ম্মান আক্রমণের মধ্যে সে বিরাটত্ব, সে মহিমা ছিল না। আরব জাতির যে উৎসাহ উদ্যম, মানব মনের উপর যে প্রভাব, জার্ম্মানদিগের সে পরিমাণে উৎসাহ উদ্যম প্রভাব মোটেই ছিল না।

পঞ্চম হইতে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপের এই অবস্থা। দক্ষিণ হইতে আরবদিগের আক্রমণ, উত্তর হইতে জার্ম্মান ও শ্লাব জাতিসমূহের, এই উভয় আক্রমণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া ইউরোপের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যে নিয়ত বিপর্য্যস্ত বিশৃঙ্খল হইয়া থাকিবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। লোকসংঘ, জাতিসমূহ কেবলই স্থানচ্যুত হইতেছে, একে অপরের স্কন্ধে গিয়া পড়িতেছে; কোন কিছুই স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেছে না; চারিদিকে পুনরায় একটা যাযাবর চঞ্চল জীবনযাত্রা আরম্ভ হইল। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে এ বিষয়ে কিছু কিছু বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপের অন্য অন্য অংশ অপেক্ষা জার্ম্মানীতে এই বিশৃঙ্খলা কিছু অধিক ছিল, জার্ম্মানীই হইল এই চলাচলের মূলকেন্দ্র; আবার ইটালী অপেক্ষা ফ্রান্সের অবস্থা অধিক পরিমাণে বিক্ষুব্ধ। কিন্তু কোন স্থানেই সমাজ স্থিরতা লাভ করিতে পারে নাই, শৃঙ্খলা-স্থাপন করিতে পারে নাই—চারিদিকে বর্ব্বরতারই বিস্তার হইতে লাগিল।

এই ত গেল ইউরোপের তাৎকালীন অবস্থার কারণ, ঘটনাপরম্পরার আঘাতসম্ভূত কারণ। এখন আমি আধ্যাত্মিক কারণটির আলোচনা করিব; মানবমনের আভ্যন্তরিক অবস্থা হইতে এই কারণের উদ্ভব, বাহ্য কারণ অপেক্ষা ইহার প্রভাব কিছু কম নহে।

বাস্তবিক পক্ষে বাহ্য ঘটনা যাহাই হউক না কেন, মানুষ নিজেই নিজের জগৎ সৃষ্টি করে। মানুষের ধারণা, অনুভূতি, প্রবৃত্তি, বিচারবুদ্ধি অনুসারেই জগৎ নিয়ন্ত্রিত হয়, উন্নতি-শীল হয়; মানুষের অন্তর প্রকৃতি অনুসারেই সমাজের বাহ্য প্রতিকৃতি গঠিত হয়।

একটা স্থায়ী সুনিয়ন্ত্রিত সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইলে মানুষের কি চাই? অবশ্যই প্রথমে আবশ্যক যে সেই সমাজের উপযোগী, তাহার বিচিত্র সম্বন্ধের আলোচনায় প্রযোজ্য, কতকগুলি ধারণা ও সিদ্ধান্ত মানুষের মনে থাকিবে। এবং ইহাও আবশ্যক যে এই সকল ধারণা দুই এক জনের মনে আবদ্ধ না থাকিয়া সমাজভুক্ত অধিকাংশ লোকের মধ্যে প্রসারিত থাকিবে; এবং সর্ব্বশেষে আবশ্যক যে এই ধারণাগুলি কেবল বুদ্ধির কোঠায় আবদ্ধ থাকিবে না, মানুষের ইচ্ছাশক্তির উপর [illegible] চেষ্টার উপর প্রভাবশালী হইবে।

ইহা সুস্পষ্ট যে মানুষ যদি নিজ নিজ ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে কোন

বিষয়ের ধারণা করিতে অসমর্থ হয়; তাহাদের নিজ নিজ জীবনের গণ্ডীর মধ্যেই যদি তাহাদের চিন্তারাজ্যের সীমা বদ্ধ হয়, সকলেই যদি ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও কামনার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বসে; যদি সকলের মধ্যে এমন কতকগুলি সাধারণ ধারণা বা অনুভূতি না থাকে যাহা লইয়া তাহারা একত্র হইতে পারে; তাহা হইলে ইহা সুস্পষ্ট যে এরূপ লোক লইয়া কোন সমাজগঠন হইতেই পারে না: কারণ এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিই সমাজ মধ্যে এক একটি বিক্ষোভের বীজ, প্রলয়ের বীজ লইয়া প্রবেশ করিবে।

যেখানেই লোকসাধারণের মধ্যে ব্যক্তিসর্ব্বস্বতার প্রাধান্য, যেখানেই মানুষ নিজের চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা করে না, নিজের প্রবৃত্তি ভিন্ন অন্য কোন তত্ত্বের বশ্যতা স্বীকার করে না, সেখানেই তাহার পক্ষে সামাজিক জীবন এক প্রকার অসম্ভব। আমরা যে যুগের আলোচনা করিতেছি সে যুগের ইউরোপবিজেতৃগণের আধ্যাত্মিক অবস্থা কিন্তু ঠিক এইরূপ। আমি আমার পূর্ব্ব আখ্যানে বলিয়া আসিয়াছি যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভাব, মানব ব্যক্তিত্বের ধারণা ইউরোপ জার্ম্মান্‌দিগের নিকটই প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু অতিমাত্র বর্ব্বর ও অজ্ঞান অবস্থায় এই তত্ত্বটি সামাজিকতাবিহীন পশুধর্ম্মী স্বার্থপরতার রূপ ধারণ করে। পঞ্চম হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত জার্ম্মানদিগের মধ্যে এই ব্যক্তিতত্ত্বের এই পর্য্যন্তই অভিব্যক্তি হইয়াছিল। তাহারা কেবল নিজের স্বার্থ, নিজের প্রবৃত্তি, নিজের কামনাই গ্রাহ্য করিত; কেমন করিয়া তাহারা উন্নত সমাজবন্ধন দূরে থাক, কোন প্রকার নিয়ম সংযমের মধ্যে নিজকে আবদ্ধ করিবে? সমাজব্যবস্থার মধ্যে তাহাদিগকে প্রবেশ করাইবার জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছিল, তাহারা নিজেরাই অনেকবার প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু প্রবেশমাত্রেই তাহারা হয় কোন অসতর্ক ব্যবহারের দরুণ, না হয় কোন উদ্দামবাসনার উন্মাদনায়, না হয় বা নিজের নির্ব্বুদ্ধিতায় পুনরায় সমাজ পরিত্যাগ করিয়াছে। সমাজ বারবার গড়িয়া উঠিতে চেষ্টা করিয়াছে; বারবার মানুষের কার্য্যের ফলে, আধ্যাত্মিক উপাদানের অভাবে গঠনশীল সমাজ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে। ইউরোপের বর্ব্বর অবস্থার এইটিই প্রধান কারণ। যতদিন পর্য্যন্ত এই দুই কারণ বর্ত্তমান ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত ইউরোপের এই বর্ব্বর অবস্থা ছিল। এখন দেখা যাউক কখন ও কিরূপে এই অবস্থার অন্ত হইল।

ইউরোপ এই অবস্থা অতিক্রম করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া ছিল। মানুষ নিজের দোষেই এইরূপ দশাপ্রাপ্ত হইতে পারে সন্দেহ নাই, তথাপি সে অধিককাল এরূপ অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে চাহেনা—ইহাই মানুষের স্বভাব। সে যতই অশিষ্ট, অজ্ঞান, স্বার্থনিরত স্বকামপরায়ণ হউক না, তাহার অন্তরের মধ্যেই এমন একটা সহজ প্রেরণা ও সংস্কার আছে যাহার বলে সে জানিতে পারে ইহাতে তাহার জীবনের সাফল্য নাই, তাহার অন্যবিধ শক্তি আছে, তাহার নিয়তিও অন্যবিধ। অশান্তির মধ্যে, বিশৃঙ্খলার মধ্যে তাহার অন্তর হইতে শৃঙ্খলার জন্য, উন্নতির জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা উঠিতে থাকে, তাহাকে স্থির হইতে দেয় না। পাশবিকতা ও স্বার্থপরতার মধ্য হইতেই ন্যায়ের জন্য, দূরদর্শিতার জন্য, বিকাশ ও পুষ্টির জন্য তাহার একটা উদ্বেগ উপস্থিত হয়। বাহ্য জগৎ, সামাজিক জগৎ, অন্তর্জগৎ সর্ব্বত্রই সে সংস্কার ও উন্নতিসাধনের প্রেরণা অনুভব করে; এবং কোন্ অভাববোধের প্রেরণায় সে

প্রবৃত্ত হইতেছে তাহা না জানিয়াও সে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যদিও এই সকল বর্ব্বরজাতি সভ্যতা লাভ করিবার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম ও অযোগ্য ছিল, যদিও সভ্যতার মূলনীতিসূত্রের সহিত পরিচিত হওয়া মাত্রই ইহার প্রতি তাহাদের একটা বিদ্বেষ জন্মিয়া গেল, তথাপি ইহা সত্য যে ইহারা প্রাণে প্রাণে এই সভ্যতার জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিয়াছিল।

উপরন্তু ইহাও দেখিতে হইবে যে রোম সাম্রাজ্যের বিরাট শাসনতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ তখনও অনেক পরিমাণে রহিয়া গিয়াছিল। মানুষের চিত্তপটে, বিশেষতঃ পৌর পরিষদের সদস্য, বিশপ, যাজক প্রভৃতি রোমীয় জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট লোক শ্রেণীর চিত্তপটে সাম্রাজ্যের নাম, সেই বিশাল মহামহিমান্বিত সমাজের স্মৃতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছিল।

বর্ব্বরদিগের মধ্যেই এমন অনেকে ছিল যাহারা রোমসাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্য ও মহিমা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছে, তাহারা সাম্রাজ্যের সেনাভুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছে, আবার পরে সেই সাম্রাজ্য জয় করিয়াছে। রোমীয় সভ্যতার নামরূপের মহিমায় তাহাদের চিত্ত অভিভূত এবং অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে এই সভ্যতার অনুকরণ, পুনরুজ্জীবন ও সংরক্ষণের জন্য তাহারা আকাঙ্খা অনুভব করিতে লাগিল। পূর্ব্ববর্ণিত বর্ব্বর অবস্থা অতিক্রম করিবার পক্ষে এ কারণটিও তাহাদিগকে প্রেরণা দান করিয়াছিল।

এই দুই কারণ ব্যতীত একটি তৃতীয় কারণের কথা সকলেরই মনে হইবে; সেটি খৃষ্টীয় চর্চ বা যাজক সঙ্ঘ। খৃষ্টীয় চর্চ ছিল একটি সুনিয়ন্ত্রিত সুব্যবস্থিত সমাজতন্ত্র; ইহার নির্দ্দিষ্ট নীতিপদ্ধতি ছিল, বিধিবিধান ছিল, নিয়ম শাসন ছিল, আর ছিল স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য বিজেতৃবৃন্দের পরাজয় সাধনের জন্য একটা প্রবল আকাঙ্খা। এই যুগের খৃষ্টানদিগের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যাঁহারা নৈতিক ও রাজনৈতিক সকল বিষয়েই চিন্তা করিয়াছেন, সকল বিষয়েই যাঁহাদের সুদৃঢ় ধারণা ও মতামত ছিল, প্রবল মনোভাব ও আকাঙ্খা ছিল; এবং সেই সকল মতামত, সেই সকল ভাব প্রচার করিবার জন্য, বাস্তব রাজ্যে মুখ্য ভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য, শক্তিশালী করিবার জন্য সজীব আগ্রহ ও চেষ্টা ছিল। পঞ্চম ও দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে খৃষ্টীয় চর্চ যেমন চতুর্দ্দিকের সমাজে প্রভাববিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছে, সমস্ত জগতের উপর নিজের বিশিষ্ট ছাপ মারিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছে এরূপ কোন সমাজ বা সম্প্রদায় কোন কালেই করে নাই। এই চর্চ্চের ইতিহাস যখন বিশেষ ভাবে আলোচনা করা যাইবে তখন চর্চ যে কি কি কাজ করিয়াছে তাহা সমস্তই দেখিতে পাইব। বর্ব্বরতাকে স্বীয় শাসনের অধীনে আনিয়া তাহাকে সভ্য করিয়া তুলিবে এই উদ্দেশ্যে বর্ব্বরতাকে সে সকল দিক দিয়া আক্রমণ করিয়াছে।

সর্ব্বশেষে সভ্যতাবিকাশের এক চতুর্থ কারণ উল্লেখ করিব। এ কারণটির যথাযোগ্যরূপে মূল্য নিরূপণ করা অসম্ভব কিন্তু তাই বলিয়া ইহার যথার্থ্য, ইহার কার্য্যকারিতা কিছু কম নহে। এ কারণটি হইতেছে মহাপুরুষের আবির্ভাব। বিশেষ বিশেষ যুগে বিশেষ বিশেষ মহাপুরুষের কেন আবির্ভাব হয় এবং জগতের উন্নতিসাধনকল্পে তিনি ঠিক কি সহায়তা করিয়া যান তাহা কেহই বলিতে পারে না। সেটা বিধাতার এক রহস্য। কিন্তু মহাপুরুষ যে যুগে যুগে আসেন এবং জগতের উন্নতিও যে সাধন করেন সে সম্বন্ধে কোন

অনিশ্চয়তা নাই। এমন সব মানুষ আছেন, যাঁহাদের নিকট অরাজকতা ও সামাজিক অবনতির দৃশ্য অতীব পীড়াদায়ক, যাঁহাদের সমগ্র চিত্তবৃত্তি ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তাঁহাদের চক্ষে এটা একটা বিসদৃশ বীভৎস ব্যাপার রূপে প্রতীয়মান হয়; এবং এই অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন জন্য, ~~তাঁহাদের সম্মুখস্থ~~ জগতের মধ্যে একটা নিয়মশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য, তাঁহাকে একটা সার্ব্বজনীন, সুনিয়ত স্থায়ী প্রকৃতি দান করিবার জন্য তাঁহাদের অন্তরে একটা অদম্য আকাঙ্খা জাগিয়া উঠে। এইরূপে এক ভীষণ শক্তির উদ্ভব হয়; এ শক্তি অনেক সময় স্বেচ্ছাতন্ত্র হইতে পারে, সহস্র পাপ, সহস্র পদস্খলনে ইহার গতিপথ কলঙ্কিত হইতে পারে, কারণ এ শক্তি ত মানবশক্তি, মানবচরিত্রসুলভ দৌর্ব্বল্যের অতীত ইহা নহে; তথাপি স্বীকার করিতে হইবে এ একটা মহাশক্তি, এ শক্তির একটা গৌরব আছে, একটা কল্যাণকারিতা আছে, কারণ এ মানবজাতিকে মানব উদ্যমের দ্বারাই উন্নতির পথে, ভবিষ্যতের দিকে অনেকটা অগ্রসর করিয়া দেয়। *

(ক্রমশঃ)

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

মাধ্বদর্শন

ভারতবর্ষের দুইটি প্রধান দর্শন—অদ্বৈত ও বৈষ্ণব দর্শন। ভারতে এই উভয় দর্শনের খ্যাতি বরাবরই আছে।

অদ্বৈতদর্শনের মর্ম্ম 'তত্ত্বমসি' এবং 'ব্রহ্মনির্গুণ' এই দুই বাক্যে স্পষ্টীকৃত। অদ্বৈতদর্শন-মতে, কেবল ব্রহ্মই সত্য, আর সব মিথ্যা; জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এক, ইহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই; প্রভেদ-ভাব অবিদ্যা হইতেই হয়, জীব অবিদ্যামুক্ত হইলে, আপনার প্রকৃত স্বভাব জানিতে পারে এবং মুক্ত হয়। ব্রহ্মের নির্গুণত্ব, জগতের মিথ্যাত্ব, জীব ও ব্রহ্মের একত্ব, অবিদ্যার অনাদিত্ব এবং জগৎ-সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব অদ্বৈতদর্শন দৃঢ়ভাবে স্বীকার করে।

বৈষ্ণব-দর্শনের সিদ্ধান্ত এই যে, জীব এবং ব্রহ্ম পরস্পর হইতে বিভিন্ন; ব্রহ্ম এক প্রকৃতিক নহেন, বহুত্ব ব্রহ্মেরই ভিতর নিহিত;—জড়জগতের উপাদান এবং বহু জীব, ব্রহ্মেরই অংশরূপে ব্রহ্মেরই মধ্যে নিহিত; ব্রহ্ম নির্গুণ নহেন, তিনি গুণপূর্ণ; সৃষ্টি (বা জগৎ) সত্য, কিন্তু নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল; মায়া অচিন্তনীয় বা অপরিজ্ঞেয় নহে, মায়া ঈশ্বরেরই ইচ্ছা; ব্রহ্ম সত্য, সুতরাং ব্রহ্মের সহিত যাহার সম্বন্ধ, তাহাও সত্য; জগৎ ব্রহ্মেরই ইচ্ছার ফল, সুতরাং জগৎ সত্য।

অদ্বৈত ও বৈষ্ণব-দর্শন উভয়ই বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। উভয় শ্রেণীর দার্শনিকেরাই বেদান্তের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া নিজ নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। বেদান্তের যথার্থ তাৎ-

---

* শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত এবং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

পর্য্যন্ত কি এখন তাহাই জিজ্ঞাস্য। উপনিষদে এমন অনেক মন্ত্র আছে, যাহা দ্বারা অদ্বৈত বাদ সমর্থন করা যাইতে পারে, আবার এমন অনেক মন্ত্র আছে যাহা দ্বারা বৈষ্ণবমতও সমর্থন করা যায়। ব্রহ্মসূত্র বা ব্যাস-সূত্রের ভিত্তি এই সকল উপনিষদ্-মন্ত্রের উপর। ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা ব্যাস উপনিষদ্-মন্ত্র সকলের তাৎপর্য্য যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই সেই অনুসারে সূত্রগুলি রচনা করিয়াছিলেন। সূত্রগুলির যথার্থ তাৎপর্য্য কি তাহা বুঝিতে পারিলে, বাদরায়ণ শ্রুতিমন্ত্রসকলের তাৎপর্য্য কি বুঝিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র শ্রুতিরই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এই মতের বিরুদ্ধবাদী প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বাদরায়ণের সূত্রগুলি সাধারণ পাঠকের বোধগম্য নহে। ভাষ্যকারগণের ভাষ্যের সাহায্য ব্যতিরেকে সূত্রের অর্থ করিতে পারা যায় না। ভাষ্যকারগণের মধ্যে এক শ্রেণীর ভাষ্যকারেরা অদ্বৈত-মতাবলম্বী, এবং আর এক শ্রেণীর ভাষ্যকারেরা বৈষ্ণব দার্শনিক। সুতরাং শ্রুতির যে যথার্থ কি মত তাহা সাধারণের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন।

মাধ্বগণ বলেন, শ্রুতির যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিবার পক্ষে একটী প্রকৃষ্ট উপায় আছে। অষ্টাদশ পুরাণ ও ভগবদ্গীতায় শ্রুতির বড় সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু সমগ্র অষ্টাদশ পুরাণ ও ভগবদ্গীতা অদ্বৈতবাদ সমর্থন করে কি বৈষ্ণব দার্শনিকদিগের মত সমর্থন করে তাহা বিবেচ্য।

মানুষের সর্ব্বোচ্চ উদ্দেশ্য কি তাহারই অনুসন্ধানের দিকে দর্শন-শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। ধরিয়া লওয়া হয় মানুষের অবস্থা দুঃখজনক, অথবা মানুষের অবস্থা পরিবর্ত্তনশীল। দুঃখ এবং নিয়ত পরিবর্ত্তনের অবস্থা যাহাতে অতিক্রম করা যায় সেইদিকে সকল চেষ্টা নিয়োজিত করা চাই। দুঃখও আত্মার অভিপ্রেত নয়, পরিবর্ত্তনও নয়, অথচ আত্মাকে দুঃখ ও পরিবর্ত্তনের অধীন হইতে হয়। আত্মা দুঃখ এবং পরিবর্ত্তন চায় না, এই সকল হইতে মুক্ত হইতে চায়। কিন্তু দুঃখ এবং পরিবর্ত্তন হইতে কি করিয়া মুক্ত হওয়া যায়? দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে হইলে, পরিবর্ত্তনের হাত এড়াইতে হইলে, দুঃখ ও পরিবর্ত্তনের কারণ কি, এবং ইহারা কোন্ নিয়মের বশবর্ত্তী তাহা জানিতে হয়।

আমাদের সম্মুখে যে জগৎ তাহা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, আমরা যখন যে অবস্থার অধীন হই, তাহাও নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু আত্মার কোন সময় কোন পরিবর্ত্তন হয় না। পরিবর্ত্তন একদিকে যেমন সুখোৎপাদক আর একদিকে তেমনই দুঃখোৎপাদক পরিবর্ত্তনের হাত এড়াইতে পারিলে সুখদুঃখের হাত এড়াইতে পারা যায়। একশ্রেণীর দার্শনিকদিগের মত সুখদুঃখের হাত এড়ানই কাজ। কিন্তু আবার বলিতে পারা যায়, দুঃখ মানুষের প্রিয় নয়, সকল মানুষই সুখান্বেষী; যে পরিবর্ত্তন সুখপ্রদ সেই পরিবর্ত্তনের হাত এড়াইবার প্রয়োজন কি? অনেক দার্শনিকের মত এই যে, যাহাতে সুখ হয় তাহার চেষ্টায় কোন দোষ নাই, তাহা মঙ্গল-প্রদ। তাঁহাদের মত এই যে, দুঃখের সহিত যুদ্ধ করিয়া দুঃখকে পরাস্ত করিয়া, সুখ আনয়ন করাই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায়, পরিবর্ত্তন-জনিত সুখ ও দুঃখ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। সে স্থলে সেই সুখকে আলিঙ্গন করিলে,

দুঃখের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সুখকে আলিঙ্গন করা হয়। যাহার সহিত দুঃখের মোটেই সম্বন্ধ নাই, এমন যদি কোন সুখ থাকে, সেই সুখকে আলিঙ্গন করাই কাজ। আমরা জীবনে যত সুখের পরিচয় পাই, সবই পরিবর্ত্তনজনিত সুখ, দুঃখের সহিত তাহার বিশেষ সম্বন্ধ, সুতরাং তাহা পরমার্থ নহে। যদি সম্পূর্ণভাবে দুঃখ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে হয়, তাহা হইলে, এরূপ সুখের হাতও এড়াইবার চেষ্টা করিতে হয়।

দুঃখের হাত এড়ানই জীবনের উদ্দেশ্য। পরিবর্ত্তন সুখ এবং দুঃখের জনক। আমাদের যখনই এক অবস্থার পরিবর্ত্তে অন্য অবস্থা আসে, তখনই হয় সুখ না হয় দুঃখের অনুভব হয়, এবং এই সুখ এবং এই দুঃখ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, সুতরাং সুখই বা কি দুঃখই বা কি উভয়ই পরিত্যাজ্য। অতএব সুখদুঃখের মূলীভূত পরিবর্ত্তন আত্মার পক্ষে মঙ্গলপ্রদ নহে।

আত্মা যখন দুঃখ চায় না, তখন দুঃখের অতীত কোন অবস্থা আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা। দুঃখের সহিত যখন সুখের সম্বন্ধ তখন সুখের অবস্থাও আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা নহে। আমার স্বাভাবিক অবস্থা সুখদুঃখের অতীত এবং সকল পরিবর্ত্তনের অতীত। সাধারণ লোকে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, দার্শনিক ইহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করেন। আবার আমাদের ভারতবর্ষীয় দার্শনিকরা সকলের চেয়ে ভালরূপে ইহা হৃদয়ঙ্গম করেন।

আবার এমনও দেখা যায়, একজন যাহাকে দুঃখজনক মনে করে, আর এক জনের পক্ষে তাহা দুঃখ নহে। যখনই মানুষ কোন অবস্থাকে দুঃখপ্রদ বলিয়া জানে, তখনই তাহা তাহার দুঃখজনক হয়। দুঃখকে দুঃখ বলিয়া না জানিলে, দুঃখও অনেক সময় সুখজনক হয়। সাধারণ লোক যাহাকে সুখ বলিয়া মনে করে, দার্শনিক তাহাকে দুঃখ বলিয়াই জানে। দার্শনিক যাহা দুঃখ বলিয়া জানেন, সাধারণ লোক তাহাকে দুঃখ বলিয়া জানিতে না পারিয়া, তাহাই সুখকর বলিয়া মনে করে। সুখ এবং দুঃখ সবই মন লইয়া; যদি মনে করা যায়, সবই দুঃখ, আবার যদি মনে করা যায় সবই সুখ। তাই আর এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন, তাঁহাদের মত এই যে, বন্ধনই দুঃখের কারণ; প্রকৃত সুখ এবং দুঃখ বলিয়া কিছুই নাই। আমরা বিশেষ বিশেষ সংস্কারের অধীন হইয়া, কোন অবস্থাকে দুঃখজনক, এবং কোন অবস্থাকে সুখজনক মনে করি। সংস্কারের বন্ধন কাটিতে পারিলেই, এ সকল জ্বালা আর থাকে না।

অনেক দার্শনিকের মত এই যে, সুখকর এবং দুঃখকর অবস্থাপরম্পরাই এই জগৎ, এবং এই সকল অবস্থা মনেরই কল্পনাসম্ভূত। সুতরাং জগতের প্রকৃত সত্তা নাই, জগৎ সেই হিসাবে মিথ্যা। জগৎকে মিথ্যা বলিয়া জানিতে পারিলেই দুঃখের অবসান হয়।

শ্রীমধ্ব ও তাঁহার মতাবলম্বীরা বলেন—জগৎ মিথ্যা কল্পনা হইতে পারে, অথবা জগৎকে মিথ্যা বলিয়া ভাবিতে পারিলে, জগৎ বা সুখদুঃখের হাত এড়াইতে পারা যাইতে পারে, কিন্তু জগৎকে যদি মনের কল্পনা বলা যায়, তাহা হইলে জগৎকে মিথ্যা বলিয়া ভাবাও আর একটা মনের কল্পনা। যাঁহারা জগৎকে মিথ্যা বলিয়া ভাবিয়া দুঃখের হাত এড়াইতে চান, তাঁহারা কল্পনায় সুখী হইতে চান। বিশেষতঃ জোর করিয়া জগতের অস্তিত্ব যদি আমরা অস্বীকার করিতে যাই, তাহা হইলে জগতের কল্পনা

আরও জোর করিয়া আমাদের মনে উদিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কোন চিকিৎসক কোন রোগীকে বলেন, ঔষধ খাইবার সময় সর্পের চিন্তা করিও না, তাহা হইলে ঔষধ খাইবার সময় রোগীর মনে সর্পের চিন্তা আপনি আসিয়া উদিত হইবে। জগৎ নাই ভাবিতে গিয়া জগৎই মনে হইবে।

মায়াবাদীর উপর এইরূপ আক্রমণ সমীচীন নহে। মায়াবাদীর উদ্দেশ্য নহে যে, জগৎ নাই ভাবিয়া জগতের হাত এড়াইতে হইবে। মায়াবাদী ঠিক চোক বুজিয়া বিপদের হাত এড়াইতে বলেন না। জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংস্কারকে তাঁহারা চূর্ণ করিতে বলেন। সর্পের চিন্তা মনে উদিত হইলে কিছুই যায় আসে না; প্রকৃত সর্প আছে, এই বিশ্বাসই মনে ভয়ের উদ্রেক করে। যদি কাহারও মনে সংস্কার থাকে অমুক বৃক্ষে ভূত আছে, তাহাহইলে তাহাকে যদি বলা যায়, তুমি ঐ বৃক্ষের তলা দিয়া যাইবার সময়, ভূতের চিন্তা মনে আনিও না, তাহা হইলে তাহার প্রতি এই উপদেশ মঙ্গলপ্রদ হইবে না, কেননা সে ঐ গাছের তলা দিয়া যাইবার সময়, আপনা আপনিই ভূতের চিন্তা তাহার মনে উদিত হইবে, এবং সে ভয়ও পাইবে। পক্ষান্তরে ঐরূপ সংস্কারাপন্ন লোকের মন হইতে যদি ঐ ভ্রান্ত সংস্কার বিদূরিত করা হয়, তাহা হইলে তাহার মনে ভূতের চিন্তা উদিত হইলেও তাহার ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না। শুধু জগৎ নাই বলিয়া চিন্তা করিবার চেষ্টা করিলে চলিবে না। সে চেষ্টা যত করা যায়, ততই বিফল-মনোরথ হইতে হয়, অর্থাৎ ততই সে চিন্তা আরও জোর করিয়া মনে উদিত হয়। জগৎ আছে এই ভ্রান্ত সংস্কারকে বিচার বা যুক্তি দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিতে হইবে, তখন মনের যে অবস্থা হইবে, সেই অবস্থায় জগতের চিন্তা যতই মনে উদিত হউক না কেন, তাহাতে কিছুই ক্ষতি হয় না। জগতের অস্তিত্বের ধারণা আমরা কিছুতেই এড়াইতে পারি না। জগৎ আছে বলিয়া আমরা যে অনুভব করি, তাহা নিরর্থক নহে, নিশ্চয়ই তাহার মূলে কারণ আছে। জগৎ আছে বলিয়া অনুভব করার মূলে যে কারণ আছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। সেই কারণে জগৎ যে একেবারেই মিথ্যা তাহা বলা যাইতে পারে না। কোন যুক্তিই মায়াবাদীকে (idealist) তাহার গৃহ, শরীর, ক্ষুধা, খাদ্য প্রভৃতির চিন্তা হইতে বিরত করিতে পারে না। কিন্তু ইহাতেই মায়াবাদ ঠিক খণ্ডিত হয় না, কারণ, মায়াবাদী আপনার গৃহ, শরীর, ক্ষুধা, খাদ্য প্রভৃতির চিন্তারত থাকিতে পারেন, কিন্তু তিনি মনে মনে জানেন, ইহা মায়ারই ব্যাপার। কবেকার কি সংস্কার এখনও তাঁহার মনকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে; তাই একেবারে তিনি এসকল ভুলিতে পারিতেছেন না; কিন্তু ক্রমশঃ যত তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান হইতেছে, ততই তিনি এ সকলে আসক্তিশূন্য হইতেছেন। পরে একেবারে জগদ্ভ্রম বিদূরিত হইবে। দীর্ঘকাল গতিবিশিষ্ট রেলের গাড়ী চড়িয়া পরে যখন গাড়ী হইতে নামা যায়, তখনও যেন রেলের গাড়ী চড়িয়া যাইতেছি এরূপ মনে হইতে থাকে। সংস্কার একেবারে যায় না, অথচ তত্ত্বজ্ঞানী তাহাতে আসক্ত হয় না। আমরা অভ্যাসের বশে অনেক কাজ করিতে পারি, কিন্তু আমাদের আত্মা তাহাতে নির্লিপ্ত থাকিতে পারে। কি মায়াবাদী কি অন্য কেহ, জগতের চিরস্থায়িত্ব বিশ্বাস করিতে বাধ্য, এই সকলই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। জগৎ যে এখনই আছে, পূর্ব্বে ছিল না, বা পরে থকিবে না, এমন কেহ বিশ্বাস করে না। কোন

না কোন আকারে জগৎ পূর্ব্বেও ছিল, এবং পরেও থাকিবে, ইহাই সকলের বিশ্বাস। যদি তাহাই হয়, এবং আত্মা বলিয়া যদি অন্য কিছু থাকে, তাহা হইলে, এমন এক সূত্র আছে, যে সূত্রে জগতের সহিত আত্মার এমন এক সম্বন্ধ আছে যাহাতে জগৎ আত্মার সুখ দুঃখের মূলীভূত কারণ হয়। জগতের জীব যে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন হইয়া জাগতিক সুখ দুঃখের বশবর্ত্তী হয়, সেই প্রাকৃতিক নিয়ম এই সূত্রঘটিত। বস্তুতত্ত্ববাদীর এই কথার উত্তরে মায়াবাদী বলিবেন, এ সকলই আত্মার কল্পনা। আত্মা ভিন্ন আর কিছুই থাকিতে পারে না, যদি থাকে আত্মার সহিত কোন সূত্রে তাহার কোন সম্বন্ধ চিন্তা করা যাইতে পারে না। যাহা আত্মার অতিরিক্ত তাহা অনাত্মা,আলোকের সহিত অন্ধকারের যে সম্বন্ধ আত্মার সহিত অনাত্মার সেই সম্বন্ধ অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে কোন সম্বন্ধই নাই; তবে যে সম্বন্ধ কল্পনা করা যায়, তাহা মিথ্যা। সুতরাং জগৎ সম্বন্ধে আত্মার যে ধারণা তাহা মিথ্যা। কিন্তু মিথ্যা হইলেও এরূপ ধারণা হয়। সুতরাং ইহাকে মায়া ছাড়া আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। মায়াবাদী যুক্তিতে জগতের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পান না। তিনি যখন যুক্তি করিতে বসেন তখন দেখেন, জগৎ থাকিতে পারে না। কিন্তু জগৎ না থাকিলে জগৎ সম্বন্ধে সংস্কার কেমন করিয়া হইতে পারে, তাহারও কোন উত্তর তিনি যুক্তিতে পান না। জগৎ আছে, একথা তিনি বলিতে পারেন না; জগৎ নাই অথচ জগতের সংস্কার কেমন করিয়া হয়, একথাও বলিতে পারেন না। সুতরাং মায়াবাদের অবতারণা ছাড়া তাঁহার আর গত্যন্তর নাই। যখন 'জগৎ না থাকিলে জগতের সম্বন্ধে সংস্কার হইতে পারে না', এ কথার প্রতিবাদ তিনি করিতে পারেন না, তখন তাঁহাকে প্রমাণ স্বরূপ শ্রুতিবাক্যের সাহায্য লইতে বাধ্য হইতে হয়।

ঈশ্বরকে নির্গুণ বলা হয়। বেদান্তেও ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মকে বর্ণনা করিতে না পারিয়া উপনিষদ্‌ও ' নেতি ' ' নেতি ' বলিয়াছেন। ঈশ্বরকে কি বলিব তাহা ভাবিয়া ঠিক করা যায় না, যাহা কিছু বলিতে যাওয়া যায় তাহাই তিনি নহেন। তাই বলিয়া কি ব্রহ্ম বা ঈশ্বর কিছুই নহেন। শ্রীমধ্ব বলেন, ব্রহ্ম যে কিছুই নহেন তাহা হইতে পারে না। চরাচর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সবই গুণযুক্ত, কিন্তু ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হইয়াছে। নির্গুণ বলিয়া ব্রহ্ম যে একেবারে কিছুই নহেন তাহা হইতে পারে না। আমরা এমন কিছুরই অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারি না, যাহা একেবারে গুণাতীত। যে কোন বস্তু কল্পনা করা যাউক না কেন, তাহার কোন না কোন গুণ থাকিবেই। তবে ঈশ্বরকে কেমন করিয়া নির্গুণ বলা যাইতে পারে? নির্গুণ কিছুই থাকিতে পারে না, সুতরাং ঈশ্বরকে যদি নির্গুণ বলা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বর কিছুই নহেন, এই ধারণাই হওয়া সম্ভব। শ্রীমধ্ব সেই কারণেই ঈশ্বরকে নির্গুণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। অথচ উপনিষদ্ ও বেদান্তের কথাও মিথ্যা নহে। শাস্ত্র যেখানে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়াছেন, " নেতি " " নেতি " বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে শাস্ত্রের অন্য তাৎপর্য্য আছে। যদি তাহা না থাকিত তাহা হইলে শাস্ত্র যেখানে তাঁহাকে " সৎ " " চিৎ " "আনন্দ" বলিয়াছেন, সেখানে সেই শাস্ত্রবাক্যে কি বুঝিতে হইবে?

শাস্ত্র বলেন তিনি নির্গুণ, তিনি ' নেতি ' ' নেতি, ' আবার শাস্ত্র বলেন, তিনি সৎ চিৎ আনন্দ, তিনি নিত্য, এবং শাস্ত্র আরও অনেক বিশেষণে তাঁহাকে ভূষিত করেন। শাস্ত্রের

এই সকল বাক্য আপাততঃ পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহার কি কোন তাৎপর্য্য নাই ?

যাহা কিছু গুণমণ্ডিত তাহাই অনাত্মা, একমাত্র আত্মাই গুণাতীত। আত্মা যাহা অনুভব করে, যাহা কল্পনা করে, তাহাই গুণমণ্ডিত, কিন্তু যিনি অনুভব করেন, কল্পনা করেন, তাঁহাতে গুণের লেশমাত্র নাই। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলীভূত যিনি, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার অনুভূতি, যাঁহার কল্পনা, তিনি নির্গুণ। গুণমণ্ডিত বস্তুর গুণ প্রকৃতি হইতে জাত, এবং সেই প্রকৃতি ঈশ্বরেরই শক্তি। ঈশ্বর গুণকে সৃষ্টি করেন, এবং গুণের দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেন। কিন্তু জগৎ যেমন গুণের বাধ্য, তিনি গুণের বাধ্য নহেন। তবে সকল গুণের তিনি উৎস। যেখানে গুণ তাঁহার বাধ্য, অথচ গুণের তিনি বাধ্য নহেন, সেখানে তাঁহাকে গুণাতীত বলা যাইতে পারে। আত্মাই অনুভব করিতে পারে, আত্মাকে অনুভব করা যায় না, কারণ যাহাকে অনুভব করিতে হইবে, তাহাকে কোন না কোন রূপে গুণমণ্ডিত হইতে হইবে। আত্মাই দেখে, আত্মা দৃষ্ট হয় না। আত্মাই করে, আত্মা কৃত হয় না; আত্মাই চালায়, আত্মা চালিত হয় না। সুতরাং যাহা দেখা যায়, করা যায়, পরিচালিত হয়, আত্মা এই সকলের অতীত, সুতরাং বিশ্ব-সংসারে এমন কিছুই নাই, যাহা আত্মার সদৃশ বা তুলনার যোগ্য হইতে পারে, সুতরাং আত্মাকে বুঝিতে গিয়া নেতি নেতি করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। বাস্তবিক আত্মা ইহাও নহে, উহাও নহে, তাই বলিয়া, আত্মা যে কিছু নহে, তাহা নহে, আত্মা যাহা, আত্মা তাহাই, আর কিছু নহে। তিনি নিত্য শুদ্ধ—অতি নির্ম্মল, অথচ সকলেরই উদ্ভব-কর্ত্তা, সকলেরই পরিচালক ও দ্রষ্টা।

সংসার দুঃখের মূল। সংসার হইতে অব্যাহতি পাইলে, দুঃখের হাত এড়ান যায়। সংসারের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলে, সংসার হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। সংসারের সহিত সম্বন্ধের সূত্র মন। এই সূত্র বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলে, সংসারের সহিত আর সম্বন্ধ থাকে না। আমার সংসারের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে, সংসার থাকা না থাকা আমার কাছে সমান।

এখন কথা এই যে, সংসারের সহিত সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন করা যায় কি না। যদি বিচ্ছিন্ন করা না যায়, যদি বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে, সংসার মিথ্যা এমন কথা বলা চলে না। সংসার স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে; অথবা সংসার মনের সংস্কার-সম্ভূত হইতে পারে; অথবা সংসার আছে, কিন্তু সংসারের সহিত আত্মার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য এমনও হইতে পারে। যদি সংসার স্বতন্ত্রভাবে থাকে, এবং সংসারের সহিত সম্বন্ধ কোন কারণে হয়, তাহা হইলে, দুঃখের কারণ সংসারের সহিত সম্বন্ধ ঘুচাইতে পারিলে দুঃখ ঘুচিয়া যায়। সংসার যদি মনের সংস্কারসম্ভূত হয়, তাহা হইলে সে সংস্কারকে বদলাইতে পারিলে, দুঃখ আর থাকে না। কিন্তু সংসার যদি সত্য সত্যই থাকে, এবং সংসারের সহিত সম্বন্ধ এড়ান অসম্ভব হয়, তাহা হইলে সংসার-মুক্তি হইতে পারে না, সে অবস্থায় সংসারকে সুখের করিবার চেষ্টা করাই পরমার্থ-সিদ্ধির চেষ্টা।

সংসার-আত্মা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে আছে, এই মতকে দ্বৈতবাদ বলিতে হয়; সংসার

আত্মা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে না, আত্মারই অংশরূপে আছে, এই মতকে বিশিষ্টাদ্বৈত বলা হয়; আত্মাই আছে, সংসার বস্তুতঃ নাই, সংসার প্রতীয়মান এবং মায়া, এইরূপ মতই অদ্বৈতবাদ।

সংসার যদি আত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইত তাহা হইলে সংসারের অস্তিত্ব বোধগম্য হইতে পারিত না। যখন সংসারের অস্তিত্ব আমার বোধগম্য, তখন নিশ্চই জগতের সহিত আত্মার সম্বন্ধ আছে। সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈতমতই সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়।

মুক্তি সম্বন্ধে মাধ্বগণ বলিয়া থাকেন—

ত্যাগ, ভক্তি, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে জানা মুক্তির একমাত্র উপায়। ধ্যানের দ্বারা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে জানিতে হয়।

স্থূল সূক্ষ্ম সকল বস্তুকে ঠিক ভাবে জানিতে হইবে—অনুসন্ধান দ্বারা। অবহিতচিত্তে চিন্তা করিয়া বস্তুর বহিরভ্যন্তর অবগত হইবার চেষ্টাই ধ্যান।

চিন্তা, ধ্যান এবং ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার বা অপরোক্ষ হয়। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা না হইলে শুধু সাধনার দ্বারা তাহা হয় না। অপরোক্ষ লাভ হইলেই আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

শ্রুতি বলেন, "যখন ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হয়, তখন হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, সকল সংশয় বিদূরিত হয়, এবং কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।" কুম্ভকার যেমন কুম্ভকারের চাক ঘুরাইয়া দিয়া ছাড়িয়া দিলেও চাকটী ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ প্রারব্ধের অবশেষ যতকাল থাকে ততকালই অপরোক্ষিত জীবকে শরীর ধারণ করিতে হয়। "প্রারব্ধের অবসান হইয়া গেলে জীব একেবারে বিমুক্ত হয়, আর তাহাকে সংসারে ফিরিতে হয় না।" এইটী ব্রহ্ম সূত্রের শেষ সূত্র।

ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তী মুক্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। মুক্তি বলিতে কি বুঝায়? ন্যায়-মতে দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভই মুক্তি। অদ্বৈতমতে ব্যক্তিত্বের বিনাশ হইয়া ব্রহ্মে লীন হওয়াই জীবের মুক্তি। অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম নির্গুণ, সুতরাং সে অবস্থায় জীবও নির্গুণ হয়। সুতরাং সে অবস্থায় জীবের ইচ্ছা, বুদ্ধি, জ্ঞান, বা সুখদুঃখ-ভোগ কিছুই থাকে না। বৈষ্ণব দার্শনিকদিগের মত এই যে, জীবসকল নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে সম্পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয় এবং ঈশ্বরের সহিত একত্র আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। বৈষ্ণব দার্শনিকেরা জীবাত্মার একত্ব স্বীকার না করিয়া বহুত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে সকল জীব এক রূপও নয়, এক এক জীবের এক এক প্রকৃতি; জীবের প্রকৃতিতে যে কলুষ আছে, তাহার নাশ হইলে জীব বিশুদ্ধ হয়; বিশুদ্ধ জীব পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইলে, এবং ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার লাভ করিলে, জীবের আর দুঃখ থাকে না। তখন ঈশ্বরের সঙ্গ-লাভ করিয়া জীব অপার আনন্দে থাকে।

দ্বৈতবাদীর মতে জীবের বিনাশ হইতে পারে না। জীবের বিনাশ হয়, এই মত, তাঁহাদের মতে ভ্রমাত্মক। মুক্ত জীবের যে সুখ দুঃখের জ্ঞান থাকে না, তাঁহারা এই মতের

বিরোধী। তাঁহারা বলেন সুখ দুঃখের জ্ঞান না থাকিলে জীবের অবস্থা জড়ের অবস্থার ন্যায় হইয়া যায়। জীব ও জড়ে তাহা হইলে প্রভেদ কি? স্ফটিক যতই উজ্জ্বল হউক না কেন, ইহা খনিজ পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নয়। যদি মুক্ত জীব ব্রহ্মে মিশিয়া গিয়া ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়, তাহা হইলে সমুজ্জ্বল স্ফটিকেরই সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে, দ্বৈতবাদী এরূপ অবস্থা বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন না। সুতরাং তাঁহাদের মতে মুক্তি দুঃখাদির অবসান নহে, তাঁহাদের মতে মুক্তি, জ্ঞান পূর্ব্বক উপভোগের উপযোগী আনন্দ। মুক্তাত্মার আধ্যাত্মিক প্রকৃতি আনন্দময় ঈশ্বরের সঙ্গলাভে তাহার শাশ্বত আনন্দের উপভোগের সহায়তা করে।

জীব মুক্ত হইলে ঈশ্বরের সহিত এক বা সমান হয় না; অন্যান্য মুক্ত জীবেরও সহিত এক বা সমান হয় না। জীব ঈশ্বরের সহিত এক বা সমান পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও হইতে পারে না। ঈশ্বর হইতে জীব বিভিন্ন। সকল জীবই পরস্পর বিভিন্ন; এক জীব আর জীবের সহিত সমান বা এক হইতে পারে না। ব্রহ্মসূত্রের মতে ব্রহ্মের সহিত জীবের যখন যোগ হয়, তখন যে ব্রহ্মের সহিত জীবের কিছু মাত্র প্রভেদ থাকে না, এমন নহে। ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে যে, ব্রহ্মের সহিত জীবের যোগ হইলেও কতিপয় বিষয়ে ব্রহ্মের সহিত জীবের পার্থক্য থাকে। মুক্তাত্মারা ব্রহ্মের সহিত তাঁহাদের যোগ বুঝিতে পারেন, কিন্তু ব্রহ্মের সকল শক্তি ও সকল ভাব প্রাপ্ত হন না, এবং ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া এক'ও হইয়া যান না।

মানব-জীবনের সর্ব্বোচ্চ চরম উদ্দেশ্য কি? তাহাই অনুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি দার্শনিকের আছে।

মানব-জীবনের উদ্দেশ্য দুঃখ অতিক্রম করা। মানব-জীবন দুঃখময়, কি সুখময়, কি সুখদুঃখময়?

মানব সকল সময় এক অবস্থায় থাকে না। মানবের অবস্থার পরিবর্ত্তন প্রতিনিয়তই হইতেছে। পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা-পরম্পরার ভোগকর্ত্তা আত্মা। আত্মা নির্ব্বিকার এবং এবং নির্ব্বিশেষ। আত্মা নিত্য চৈতন্যময় এবং জ্ঞাতা। অবস্থা-পরম্পরা আত্মার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহাতেই আত্মার সুখ-দুঃখ ভোগ হয়। অবস্থা-পরম্পরা প্রকৃতির গুণসম্ভূত এবং গুণময়, আত্মা গুণাতীত, সুতরাং পরস্পরের আকাশ-পাতাল ভেদ। কিন্তু তথাপি যখন আত্মা অবস্থার বশবর্ত্তী হয়, তখন এই দুইয়ের মধ্যে সম্বন্ধ-সূত্র মানিয়া লইতে হয়। শঙ্করাচার্য্যের মতে বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে ঐরূপ প্রভেদ, সুতরাং বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, তথাপি যে সম্বন্ধ বোধ হয় তাহা ভ্রান্ত সংস্কার মাত্র। বিষয় ও বিষয়ী বলিয়া কিছুই নাই, আছে কেবল এক আত্মা। আত্মা বস্তুতঃ বিষয়ী নহে।

আত্মা চৈতন্যময় এবং জ্ঞানময়। যদি আত্মা জ্ঞানময় হয়, তাহা হইলে আত্মার জ্ঞানের বিষয় থাকা চাই। যদি আত্মার জ্ঞানের বিষয় না থাকে তাহা হইলে আত্মা জ্ঞানময় বা জ্ঞাতা হইতে পারে না। আত্মা জ্ঞানময় বা জ্ঞাতা না হইলে, আত্মা চৈতন্যময়ও হইতে পারে না।

যাহা জ্ঞানময় বা চৈতন্যময় নহে, তাহা কি? আমরা যাহাকে জ্ঞান ও চৈতন্য-বিরহিত মনে করি তাহাকে জড় বলিয়া থাকি। এখন জিজ্ঞাস্য, জড় বলিয়া বস্তুতঃ কিছু আছে কি না। আমরা বলিতে পারি, যাহা আমাদের জ্ঞানের বিষয় তাহাকেই আমরা জড় বলিয়া থাকি।

আত্মা জ্ঞাতা, সুতরাং আত্মার জ্ঞানের বিষয় আছে। জ্ঞাতা হইলেই জানিতে হইবে। কি জানিতে হইবে? যাহা কিছু জানিতে হইবে। আত্মার স্বভাবই কিছু না কিছু জানা। যাহা জানা যায় আমরা তাহার বস্তুগত পৃথক্ সত্তা অনুমান করি। আমাদের এই অনুমান যথার্থ হইতে পারে না। আত্মা যদি জ্ঞাতা হয় তাহা হইলে আত্মার যাহা জ্ঞানের বিষয়, তাহা আত্মারই অংশ, তাহা আত্মা হইতে পৃথক্ কিছুই নহে। আমরা তাহাকে পৃথক্ বলিয়া অনুমান ও অনুভব করি বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা আত্মা হইতে পৃথক্ নহে, তাহা আত্মারই অংশ। যদি তাহা অস্বীকার করা যায় তাহা হইলে বিশুদ্ধ আত্মাকে জ্ঞাতা বলা যাইতে পারে না।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আত্মার জ্ঞানের বিষয়, সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আত্মা হইতে পৃথক্ নহে। আত্মারই জ্ঞানের বিষয় রূপে—সুতরাং আত্মারই অংশরূপে পরিদৃশ্যমান জগতের আত্মার সহিত নিত্য সম্বন্ধ। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগতের কোন অংশ আত্মার জ্ঞানের বাহিরে থাকা সম্ভব নহে; তাহা হইলে আত্মারই জ্ঞানের অভ্যন্তরে সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগৎ বিদ্যমান; তাহা হইলে জগতের সকল অংশ আত্মা যুগপৎ জানিতেছে। আত্মা জগৎকে আংশিকভাবে কখনই জানিতে পারে না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে জগতের যে অংশ যখন আত্মার জ্ঞান-বহির্ভূত হইত তখন সেই অংশের বিদ্যমানতা আরম্ভ হইত। তাহা অচিন্তনীয়, সুতরাং জগতের সকল অংশই যুগপৎ আত্মার জ্ঞানের বিষয় হইতে বাধ্য। আমরা কিন্তু জগতের সকল অংশ যুগপৎ জানিতে পারি না, এবং যুগপৎ জানাও সম্ভব মনে করি না। সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে, আত্মার এমন এক অংশ আছে যাহা সমগ্র জগৎকে যুগপৎ জানিতেছে। আত্মার সেই অংশকে পরমাত্মা বলা হয়।

আমরা জানি, আত্মার জ্ঞানের বিষয় এই জগতের সামান্য একটি অংশ মাত্র যখন আমরা জানি, তখন তাহার অবশিষ্ট সকল অংশ আমাদের জ্ঞান-বহির্ভূত থাকে। জগতের যে অংশটুকু আমার জ্ঞান-বহির্ভূত থাকে, সে অংশটুকু সকল জ্ঞানের বাহিরে থাকিতে পারে না। একেবারে সকল জ্ঞানের বাহিরে থাকা, একেবারেই না থাকা। আমার জ্ঞানের বহির্ভূত যে টুকু, সে টুকুকে অপর কোন জ্ঞানের অন্তর্ভূত হইতে হইবে, নচেৎ তাহার একেবারে থাকা হয় না; সুতরাং আত্মার অভ্যন্তরে পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

(১০)

চন্দ্রশেখরের পরের উপন্যাসগুলির সম্বন্ধে কালানুক্রমিক পারম্পর্য্য লইয়া কতকটা সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। শচীশ বাবুর তালিকায় চন্দ্রশেখরের অব্যবহিত পরেই 'রাজসিংহ' (১৮৮২) ও তাহার পর ক্রমান্বয়ে 'আনন্দমঠ' (ডিসেম্বর ১৮৮২), 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪), ও সীতারাম (১৮৮৭) প্রকাশিত হয়। কিন্তু আমাদের আলোচনায় এই অন্বয় ঠিক অনুসরণ করার পক্ষে কিছু বাধা আছে। প্রথমতঃ রাজসিংহের প্রথম সংস্করণের সহিত বর্ত্তমান সংস্করণের (১৮৯৩) একেবারে মৌলিক ও গুরুতর প্রভেদ আছে। এবং এই শেষ সংস্করণ বঙ্কিমের অন্যান্য সমস্ত উপন্যাসের পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধেও বর্ত্তমান সংস্করণের রাজসিংহ অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাস হইতে অনেকটা বিভিন্ন; রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণের প্রারম্ভে যে বিজ্ঞাপন আছে, তাহাতে এই পার্থক্যের প্রকৃতি বুঝা যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্বরূপ সম্বন্ধে বঙ্কিমের নিজ অভিমত এই বিজ্ঞাপন ব্যক্ত হইয়াছে; বিশেষতঃ ঐতিহাসিক উপন্যাসের সহিত কাল্পনিকের সংমিশ্রণ সম্বন্ধে লেখকের মতামত বিশেষভাবেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইউরোপীয় সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শের সহিত বঙ্কিমের মতের কতখানি মিল আছে, তাহা রাজসিংহ আলোচনার সময় দেখা যাইবে। এখন এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বঙ্কিমের নিজের মতে রাজসিংহই তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস; তিনি লিখিয়াছেন "পরিশেষে বক্তব্য যে আমি পূর্ব্বে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারেনা। এই এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম। এ পর্য্যন্ত (ঐতিহাসিক ?) উপন্যাস-প্রণয়নে কোন লেখকই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমি যে পারি নাই, তাহা বলা বাহুল্য।" সুতরাং রাজসিংহকে বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসের চরমোৎকর্ষের উদাহরণ বলিয়া মনে করিলে, ইহাকে আনন্দমঠ, 'সীতারামের' পর আলোচনা করাই যুক্তিসঙ্গত, সেইজন্য আপাততঃ রাজসিংহকে বাদ দিয়া 'আনন্দমঠ' 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামের' আলোচনা আরম্ভ করাই সমীচীন হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে 'চন্দ্রশেখরে' যে কল্পনাতিশর্য্যের সূত্রপাত, তাহা 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'তে প্রকটতর হইয়াছে এবং বঙ্কিমকে অল্পবিস্তর ঔপন্যাসিক আদর্শ হইতে স্খলিত করিতেছে। বিশেষতঃ আনন্দমঠে এই কল্পনা-বিলাস বাস্তবতাকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'র বিস্তারিত পৃথক্ আলোচনার পূর্ব্বে তাহাদের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিলে ভাল হয়। উভয়েরই ঘটনা-কাল প্রায়ই এক—ইংরাজ-রাজত্বের প্রথম পতনের সময়; দেবী চৌধুরাণীর আখ্যায়িকা আনন্দমঠের কয়েক বৎসর পরে মাত্র। বঙ্কিমের অধিকাংশ রোমান্সের কাল এই ইংরাজ রাজত্বের প্রথম সূচনার সময়। বঙ্কিমের এই কাল নির্ব্বাচনের প্রধান হেতু এই যে এই যুগে ইতিহাসের

সহিত সাধারণ জীবনের সংযোগ ফুটাইয়া তোলা তাঁহার পক্ষে অধিক কষ্টসাধ্য ছিল না। 'দুর্গেশনন্দিনী' বা মৃণালিনীতে যে সুদূর অতীতের চিত্র তাঁহাকে আঁকিতে হইয়াছে, তাহাতে তথ্যের অতি ক্ষীণসন্নিবেশ কল্পনাসমৃদ্ধির দ্বারা পুরাইয়া লইতে হইয়াছে। কিন্তু চন্দ্রশেখর আনন্দমঠ বা দেবী চৌধুরাণীতে তিনি যে সমাজ চিত্র দিয়াছেন, তাহা প্রায় আধুনিক যুগের ; সুতরাং তাহাদের মধ্যে তথ্যের অপেক্ষাকৃত ঘন সন্নিবেশ হইয়াছে, ও সাধারণ জীবনের উপর ঐতিহাসিক প্রতিবেশের প্রভাব অনেকটা স্পষ্টভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এই দুইখানি উপন্যাসেই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার রন্ধ্রপথ দিয়াই আমাদের সাধারণ জীবনের উপর রোমান্সের অলৌকিকত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। তৃতীয়তঃ উভয় ক্ষেত্রেই বঙ্কিম এমন দুইটী ঐতিহাসিক আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা সেই যুগের পক্ষে অভাবনীয় ছিল ; আনন্দমঠের সত্যানন্দ ও দেবী চৌধুরাণীর ভবানী পাঠক উভয়েই এমন একই বিরাট আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, যাহা সে যুগের সামগ্রী বলিয়া আমরা কোন মতেই স্বীকার করিতে পারি না। যে দেশ-ভক্তি ও রাজনৈতিক আদর্শ ইংরেজ রাজত্বে শতবর্ষব্যাপী সাধনার ফল, তাহা বঙ্কিম অনায়াসে মুসলমান শাসনের শেষ যুগের বিকাশ বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ; অতীতের চিত্রপটে ভবিষ্যতের বর্ণতুলিকা বুলাইয়া আমাদের সহিত একটা প্রকাণ্ড ভোজ-বাজীর খেলা খেলিয়াছেন। ইহার ফলে দুই-খানি উপন্যাসই অল্প-বিস্তর অবাস্তবতা-দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে ঐতিহাসিক বিক্ষোভের যে রাজনৈতিক আদর্শের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার সহিত আমাদের প্রকৃত সমাজ জীবনের কোনও যোগ সূত্র দেখিতে পাই না। এই অবাস্তবতার ছায়া প্রায় সকল সময় সমালোচকের চোখই পড়িয়াছে ; এই দোষের প্রতি প্রায় সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই অপরাধের গুরুত্বের পরিমাণ, ইহার দ্বারা উপন্যাসোচিত সৌন্দর্য্যের কতটা হানি হইয়াছে, এ সম্বন্ধে সেরূপ সূক্ষ্ম আলোচনা হয় নাই। সুতরাং এই বিষয়েই বিচার করিলে আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণী উপন্যাস হিসাবে উৎকর্ষ স্থির করার সুবিধা হয়।

এই উপন্যাসদ্বয়ের পাঠকের মনে যে সন্দেহ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া দেখা দেয়, তাহা এই—সত্যানন্দ ও ভবানী পাঠক যেরূপ জ্বলন্ত দেশভক্তি, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠান-গঠন-কুশলতা দেখাইয়াছেন, তাহা সে যুগের কোন বাঙ্গালী পক্ষে সম্ভব ছিল কি না, এবং কোন ব্যক্তিবিশেষের এরূপ আশ্চর্য্য কল্পনা-প্রসার থাকিলেও তাহাকে একটা বাস্তব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার শক্তি রাজনীতি-শিক্ষাহীন, দেশাত্মবোধবর্জ্জিত বাঙ্গালীজাতির ছিল কি না। বর্ত্তমান অভিজ্ঞতার আলোকে এই সন্দেহ আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে ; এই শত-ব্যবধান-খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন জাতিকে একতাবন্ধনে বাঁধা, একই আদর্শে অনুপ্রাণিত করা কত সুকঠিন, তাহার সাক্ষ্য আমাদের আজিকার রাজনৈতিক প্রচেষ্টার প্রতি পৃষ্ঠায় লিখিত হইতেছে। বঙ্কিমের যুগে এই দুরূহ কাজের সম্পূর্ণ দুরূহতা উপলব্ধ হইয়াছিল কিনা সন্দেহ ; প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিকূল সাক্ষ্য তখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই ; আদর্শ ও বাস্তব, কল্পনা ও কার্য্যের মধ্যে যে প্রকাণ্ড ব্যবধান তাহার মাপ লওয়া হয় নাই ; তখন কল্পনার একটা প্রথম সতেজ স্ফূর্ত্তি, একটা প্রকাণ্ড অবাধ সাহস ছিল। সেই অবাধ কল্পনার বলে বঙ্কিম মুসলমান

রাজত্বের ধ্বংসের সময় যে একটা বিরাট্ রাজনৈতিক আদর্শের চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার দুঃসাহস আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলে। কিন্তু আমার মনে হয় যে বঙ্কিমের বিরুদ্ধে এই অবাস্তবতার অভিযোগ অন্ততঃ কতক পরিমাণেও অতিরঞ্জিত হইয়াছে; তাঁহার সপক্ষেও কতকগুলি কথা বলিবার আছে; অন্ততঃ এই অবাস্তবতার মধ্যে কতকগুলি প্রকৃতভাবের প্রেরণা ও বাস্তবসূত্র আছে। সম্পূর্ণ বিচার করিবার পূর্ব্বে এই বাস্তবসূত্রগুলির পরিচয় লওয়া আমাদের উচিত।

ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না যে ইংরেজ-রাজত্বে নিরবচ্ছিন্ন ও সুদীর্ঘ শান্তি ভোগ ও জ্ঞান-চর্চ্চার ফলে, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সহিত পরিচয় আমাদের অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, ও সমাজের ঐরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থা উজ্জ্বল বর্ণে কল্পনা করিবার শক্তিও আমাদের হ্রাস হইয়াছে। এখন অরাজকতা বস্তুটী আমাদের নিকট একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাপার মাত্র; উহা আমাদের মনে একটা সুস্পষ্ট ছবি আঁকিতে পারে না। অরাজকতা বলিলে কি বুঝায়, আমাদের সাধারণ, প্রাত্যহিক জীবনের উপর ইহার কিরূপ প্রভাব, উহা আমাদের মনের কোন গোপন অপরীক্ষিত গুণগুলিকে টানিয়া বাহির করিবে, আমাদের যে চিন্তাধারা এখন শান্ত জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহের চেষ্টাতেই ব্যাপৃত আছে তাহাকে কোন নূতন অপরিচিত প্রণালীতে প্রবাহিত করিবে, এই অবিচ্ছিন্ন শান্তির যুগে আমরা তাহার কোন স্পষ্ট ধারণা করিতে পারি না। বিশেষতঃ মুসলমান রাজত্ব ধ্বংসের সময় একটা বিরাট শূন্যতার যুগ; একটা পুরাতন সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, মুসলমান রাজ-কর্ম্মচারীবৃন্দ, কেন্দ্রশক্তির অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদের হাতে যে রাজশক্তি ন্যস্ত ছিল তাহা স্বার্থসিদ্ধি ও দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারের কাজে অপব্যবহার করিতেছে; দেশের আকাশ বাতাস একটা অবিশ্রান্ত কোলাহল ও কাতর আর্ত্তনাদে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে; অথচ এই ধ্বংস স্তূপের মাঝখানে কোথাও কোন নূতন শক্তি গড়িয়া উঠার কোন চিহ্নমাত্র দেখা যাইতেছে না। আবার ইহার উপর এই ধ্বংস-স্তূপের মধ্য দিয়া ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রলয় ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে; রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা যেটুকু বাকী রাখিয়াছিল, ইহা তাহাকে একেবারে নিঃশেষ করিয়াছে। অরাজকতার যুগেও মানুষের কতকগুলি প্রতিষ্ঠান অক্ষুণ্ণ থাকে; সামাজিক বন্ধন, পারিবারিক আকর্ষণ তাহাকে একতা সূত্রে গাঁথিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, তাহাকে সমস্ত বৃহত্তর সত্তা হইতে বাহির করিয়া একেবারে আত্মসর্ব্বস্ব হইতে দেয় না। কিন্তু ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাঙ্গলা দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে চূর্ণ করিয়া মানুষকে সমাজ ও পরিবারের আশ্রয় হইতে টানিয়া বাহির করিয়া, তাহার সমস্ত বৃহত্তর ঐক্যের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার বিচ্ছিন্ন অণু পরমাণুগুলিকে ধূলির সহিত মিশাইয়াছে, চারিদিকে বাতাসে উড়াইয়া দিয়াছে।

এই সর্ব্বব্যাপী-ধ্বংসের সময় জীবনের যে সমস্ত আকস্মিত ও অপ্রত্যাশিত বিকাশ সম্ভব, তাহাদিগকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের আদর্শে বিচার করিলে ঠিক হইবে না। যখন পুরাতন সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, যখন দুর্ভিক্ষদানবের তাড়ায় মানুষ চিরকালের সামাজিক ও পারিবারিক গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে তখন যে তাহাদের মনে অপ্রত্যাশিত ভাবের শিখা

জ্বলিয়া উঠিবে, তাহারা যে নানা প্রকার অভাবনীয় মিলনে সংঘবদ্ধ হইবে, ভাবিয়া দেখিলে তাহাতে খুব বেশী বিস্ময়ের কারণ নাই। যাহারা সমাজের সহজ নেতা, যাহাদের হাতে সমাজের বিচ্ছিন্ন শক্তির কিয়দংশ এখনও রহিয়া গিয়াছে, সেইরূপ ক্ষুদ্র জমিদার বা প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি যে এই সময় সর্ব্বব্যাপী অত্যাচার ও অরাজকতার স্রোত প্রতিরুদ্ধ করিতে উদ্যোগী হইবেন, তাহাও স্বাভাবিক। প্রথমতঃ হয়ত তাঁহাদের চেষ্টা কেবল আত্মরক্ষাপ্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত হইবে; পরে ধীরে ধীরে যেমন তাঁহাদের শক্তি সঞ্চয় হইবে,যেমন তাঁহারা বিরুদ্ধ শক্তির প্রকৃত বলনির্ণয়ে সক্ষম হইবেন, তেমনি তাঁহাদের আশা ও আকাঙ্খা ক্রমশঃ উচ্চতর পর্য্যায়ে পৌঁছিবে, তাঁহারা দেশের উপর নিজ আধিপত্য বিস্তারে মনোযোগী হইবেন, বিশৃঙ্খল উপাদানগুলিকে আবার নিয়ন্ত্রিত করিয়া একটা নূতন রাজ্য স্থাপনের কল্পনা রহিয়া রহিয়া তাঁহাদের মনের মধ্যে বিদ্যুৎ শিখার মত খেলিয়া যাইবে। এই প্রণালীতেই প্রত্যেক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার যুগে নূতন রাজ্য গড়িয়া উঠে; শিবাজী হইতে প্রতাপাদিত্য, সীতারামের রাজ্যস্থাপনের এই একই প্রক্রিয়া। সুতরাং এই সর্ব্বদেশসাধারণ প্রণালীর দ্বারা,আনন্দমঠের সন্তান সম্প্রদায় কি ভাবে গড়িয়া উঠিল, তাহার একরূপ সন্তোষ-জনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার পরেই যে বাধা মাথা তুলিয়া উঠে, তাহা দুরতিক্রমণীয় বলিয়াই মনে হয়। সন্তানসম্প্রদায় গঠনের মূলে যে আশ্চর্য্য দেশপ্রীতি, উন্নত আদর্শবাদ, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও প্রলোভনজয়ী নিঃস্বার্থতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সে কাল কেন, একালের আদর্শকেও অনেক দূর ছাড়াইয়া গিয়াছে। এইখানে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসোচিত বাস্তবতাকে অতিক্রম করিয়া আদর্শলোকের রাজ্যে উঠিয়াছে। তারপর সন্তান সম্প্রদায়ের কার্য্যকলাপ, উদ্যোগ আয়োজন প্রভৃতি বর্ণনা করিতে গিয়াও বঙ্কিম বাস্তবতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। সন্তানদের আনন্দকাননের ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে লেখক কোন কথাই বলেন নাই; তাহার অনতিদূরে মুসলমান শক্তির আশ্রয়স্থলস্বরূপ যে 'নগরের' কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও একটা নামধামহীন ছায়ার মত অশরীরি হইয়াছে; নগরের এত নিকটে একটা এত বড় বিরাট্ প্রতিষ্ঠান কি করিয়া গড়িয়া উঠিল, রাজ-শক্তির অগোচরে কিরূপে পুষ্টিলাভ ও শক্তি সঞ্চার করিল, ইতিহাসের দিক্ হইতে স্বাভাবিক এই সমস্ত প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাই না। একটা অসাধারণ আদর্শের জ্যোতিতে আমাদের চক্ষু ঝলসিয়া যায়; খুব নিকট হইতে সূক্ষ্মভাবে ইহাকে দেখিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না।

বঙ্কিম কিন্তু এই সন্তান সম্প্রদায়ের সহিত আরও কতকগুলি বাস্তবসূত্র জড়াইয়া কতকটা ত্রুটি সারিয়া লইয়াছেন। কেন্দ্রস্থ সন্তানসম্প্রদায় কি প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার কোনও ব্যাখ্যা দেন নাই বটে, কিন্তু তাহাদের সহিত দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণের কিরূপে সম্মিলন হইল, কিরূপ সহজে এই বুভুক্ষুদের দ্বারা তাহাদের দলপুষ্টি হইল, তাহা বেশ স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। যদি দীক্ষিত সন্তান-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে অদীক্ষিত জন-সাধারণ কি করিয়া আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিল তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। এবং এই সমস্ত সাধারণ সৈনিকদের যুদ্ধ বিগ্রহ যে লুঠ-তরাজেরই নামান্তর, তাহারা যে নায়কদের আদর্শবাদের বা গম্ভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই, কেবল লুঠের লোভে বা একটা সুলভ আস্ফালন প্রবৃত্তির চরিতার্থতার

জন্যই সন্তানদের সহিত মিশিয়াছিল, ইহা বঙ্কিমের বিবরণ হইতে আমরা বুঝিতে পারি। বঙ্কিম এতটুকু পর্য্যন্ত বাস্তবতার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। যখন ক্যাপ্টেন টমাসের সহিত প্রথম যুদ্ধজয়ের পর বিজয়ী সেনাপতিরা সত্যানন্দকে রাজধানী অধিকার ও বিজিত প্রদেশের শাসনের সুব্যবস্থা করিতে উপদেশ দিলেন, তখন ধীরানন্দ দেখাইলেন যে রাজ্যজয়ের জন্য কোন সৈনিক পাওয়া যাইবে না, সকলেই লুঠের জন্য বাহির হইয়া গিয়াছে, এবং এই লুঠই তাহাদের সন্তান-সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য, এই উপলক্ষে বঙ্কিম সন্তানদের প্রকৃত দুর্ব্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, কি অসার ভিত্তির উপর সন্তান-ধর্ম্মের আদর্শবাদের সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার উপর একটা চকিতের জন্য আলোকপাত করিয়াছেন। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং প্রায়ই অলক্ষিত ইঙ্গিতের দ্বারা লেখক বাস্তবতার দাবী রক্ষা করিতে ও প্রকৃত অবস্থার ধারণা দিতে একটা ক্ষণস্থায়ী চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

এই কল্পনাপ্রসূত সৌন্দর্য্যলোকের পশ্চাতে, এক স্থানে নগ্ন বাস্তবতার কঙ্কাল তাহার গাঢ় কৃষ্ণ করাল ছায়াপাত করিয়াছে। উপন্যাসের প্রথম তিনটী পরিচ্ছেদে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট মানবের যে দানবোচিত বিকাশ দেখিতে পাই, তাহাই সে যুগের আসল স্বরূপটী প্রকাশ করিতেছে; তাহার উপর কোন কল্পনার বর্ণোচ্ছ্বাস, কোন মহান্ আদর্শের জ্যোতিঃ পড়িয়া তাহার সহজ বীভৎসতাটিকে আবৃত করিতে চেষ্টা করে নাই। বাস্তবতার দিক্ দিয়া এই কয়েকটী অধ্যায় উপন্যাসের অন্যান্য সমস্ত অংশ হইতে বিভিন্ন; এখানে বঙ্কিমের আখ্যায়িকা আশ্চর্য্য দ্রুত গতিতে ছুটিয়া চলিয়া গিয়াছে; ভাষার মধ্যে একটা অসাধারণ শুষ্ক, কঠোর ব্যঞ্জনা-শক্তি, একটা অব্যক্ত ভীতি সঞ্চারের ক্ষমতা আসিয়া পড়িয়াছে। সন্তানধর্ম্মের জ্যোতির্ম্ময় আদর্শবাদের পশ্চাতে এই ভীষণ বাস্তব-জগতের ঈষৎ-প্রকাশ বঙ্কিমের শক্তির অন্য দিকেরও পরিচয় দান করে।

সন্তান-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ছাড়াও সন্তানদের কার্য্য-কলাপ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যেও সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কারণ আছে আমরা সহজেই মনে করি যে শিক্ষাহীন, উপকরণহীন, সেনাপত্য-বর্জ্জিত কতকগুলি বাঙ্গালী চাষার দল ইংরেজ-সেনাপতিচালিত দুইদল সিপাহীকে পরাজিত করিল, ইহা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয় কথা; ইহা কেবল একটা যুক্তিহীন স্বজাতিপ্রীতির উচ্ছ্বাস মাত্র; বাস্তব জগতে আমাদের হীনতা ও পরাজয়ের একটা সুলভ কলঙ্ক-ক্ষালন মাত্র। বাস্তবিক সময় সময় বঙ্কিমের ঘটনাবিন্যাস এরূপ সন্দেহ হইতে মুক্ত নয়। শান্তিকে দিয়া তিনি দুইবার দুইজন ইংরেজ সৈনিকের পরাজয় ঘটাইয়াছেন, একবার শান্তি গুলি করিতে উদ্যত কাপ্তেন টমাসের নিকট হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইয়াছে, আর একবার লিণ্ডলেকে অশ্ব হইতে ফেলিয়া দিয়া ইংরাজদের গোপন অভিসন্ধি সত্যানন্দকে যথাসময়ে জানাইয়া তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়াছে। এই দুইটী উদাহরণ কেবল একটা অযথা জাত্যাভিমানপ্রসূত বলিয়াই মনে হয়; ইহারা ইংরাজদিগকে বোকা বানাইয়া সন্তানদের বুদ্ধি ও কৌশলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের একটা নিতান্ত সুলভ উপায়স্বরূপই ব্যবহৃত হইয়াছে। তার পর আধুনিক যুদ্ধপ্রথায় শিক্ষিত ও আধুনিক যুদ্ধোপকরণ সমন্বিত ইংরাজের বিরুদ্ধে শিক্ষা-দীক্ষাহীন সন্তান সৈন্যকে জয়ী দেখাইয়া

যে তিনি একটা প্রবল অবিশ্বাসের অবসর দিয়াছেন, তাহা স্থানে স্থানে তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে; সময় সময় সত্যের অনুরোধে তাঁহাকে কামান বন্দুকের কাছে লাঠি বল্লম-ধারী সন্তান-সৈন্যের পরাজয়ের কথা লিখিতে হইয়াছে। তবে এখানেও বঙ্কিমের অপরাধ যত গুরুতর বলিয়া মনে হয়, বোধ হয় ঠিক তত নয়। তাঁহার প্রতি সন্দেহের মধ্যে আমাদের দাসসুলভ মনোবৃত্তি যেন অল্প উঁকি মারিতেছে। মনে করুন সন্তানদের এই বিজয় যদি ইংরাজের বিরুদ্ধে না হইয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে হইত, তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের অবিশ্বাসের মাত্রা এতদূর হইত না। বঙ্কিমের সপক্ষে বলিবার প্রধান কথা এই যে ঐ দুইটী জয়ই ঐতিহাসিক; ইংরাজ ঐতিহাসিকেরাই এই সন্ন্যাসীদের এই দুইটী জয়ের কথা এবং দুইজন ইংরাজ সেনাপতির প্রাণনাশের কথা স্বীকার করিয়াছেন। তবে অবশ্য যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা-গুলি—সন্তানসৈন্যের আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে অবিচলিতভাবে দাঁড়ান, ভবানন্দ জীবানন্দের প্রশংসনীয় সৈনাপত্য-কৌশল প্রভৃতি—সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কিন্তু তাহা হইলেও এই বিষয়ের সম্ভাবনীয়তার বিচার করিতে হইলে আমাদের তৎকালীন ইংরাজদের সম্বন্ধে দুই একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। আজকাল ইংরেজ শাসনাধীনে প্রায় দুইশতাব্দী বাস করার পর ইংরেজের বিরুদ্ধে সম্মুখ সংগ্রামে দাঁড়ান যেমন কল্পনা শক্তিরও অগোচর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইংরেজের সহিত প্রথম পরিচয়ের সময় অবশ্য তাহা হয় নাই; তখন ইংরাজ আধিপত্যের জন্য যুদ্ধ করিতে-ছিল, অথবা সাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনা বোধ হয় তখনও তাহার মনে উদিত হয় নাই। তখনও দেশবাসী ইংরেজের সহিত খণ্ড-যুদ্ধ করিতে একেবারে সঙ্কুচিত ছিল না; আর ইতিহাসেই লিখিতেছে যে একটা তুচ্ছ সন্ন্যাসীর দলও ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে দ্বিধা করে নাই। সে সময় ইংরাজ জাতির অসাধারণ শৌর্য্য ও গৌরবময় ইতিহাস বাঙ্গালীর প্রায় সম্পূর্ণ-ভাবেই অজ্ঞাত ছিল; তখনও সে নেপোলিয়ন-বা জার্ম্মাণ-বিজয়ীর যশোমুকুট পরিয়া আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয় নাই, তখনও তাহার নামের মহিমা আমাদের শারীরিক ও মানসিক তেজকে একেবারে অসাড় করিয়া দেয় নাই। মোট কথা এখন যাহা আমাদের কল্পনা করিতেও ভয় হয়, তখন তাহা কার্য্যে পরিণত করার দুঃসাহসেরও অভাব ছিল না। সুতরাং এ বিষয়ে বঙ্কিমের অপরাধের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম বলিয়াই মনে হয়; এবং যদি এ সম্বন্ধে আমাদের অবিশ্বাস উপন্যাসের রসোপভোগে বাধা দেয়, তাহা হইলে তাহার সম্পূর্ণ দোষ লেখকের নহে।

আনন্দমঠের বিরুদ্ধে যে প্রধান অভিযোগ—ইহার আখ্যান বস্তুর সহিত বঙ্গের প্রকৃত জীবনের কোন বাস্তব যোগ নাই—তাহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধেই এতক্ষণ আলোচনা হইল। এই অভিযোগের সাধারণ সত্যতা স্বীকার করিয়া, কোথায় কোথায় বাঙ্গালার বাস্তব জীবনের সহিত উপন্যাসের যোগসূত্র আছে, তাহার আলোচনা করিতে চেষ্টা করা গিয়াছে। দেবী চৌধুরাণীতে এই অভিযোগের কারণ কতকটা বর্ত্তমান আছে, কিন্তু আনন্দমঠের সহিত তুলনায় আমাদের অবিশ্বাসের হেতু অনেক কম। প্রথমতঃ ভবানী পাঠকের মধ্যে সত্যা-নন্দের ন্যায় একেবারে অবিমিশ্র আদর্শবাদ নাই; একটা বিশাল রাজ্যস্থাপনের কল্পনা তাঁহার মনে সেরূপ বদ্ধমূল হয় নাই; তাহার মধ্যে দস্যুদলপতির চিহ্ন অনেকটা স্ফুটতর; সন্ন্যাসীর

গৈরিক বসন বা সংস্কারকের আদর্শের জ্যোতি সেই চিহ্নকে একেবারে ঢাকিতে পারে নাই। সত্যানন্দের সহিত তুলনায় ভবানী পাঠকের উচ্চাভিলাষ অনেকটা সীমাবদ্ধ; সত্যানন্দের উদ্দেশ্য একটা নূতন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন, ও এই নবধর্ম্মের ভিত্তির উপর একটা নূতন রাজ্য গঠন, ভবানীর উদ্দেশ্য একটী স্ত্রীলোকের চরিত্রগঠনদ্বারা তাহাকে দস্যুদলের নেত্রীপদের উপযুক্ত করিয়া তোলা। জনসাধারণের ভক্তি উদ্রেক ও কল্পনাকে মুগ্ধ করিবার জন্য প্রত্যেক সংঘেরই এরূপ একটা রাজা রাণীর প্রয়োজন হয়। দেবী চৌধুরাণীর সৃষ্টি যেন একপ্রকার নূতন রকমের পৌত্তলিকতার প্রবর্ত্তন। সত্যানন্দ-ভবানীপাঠকের মধ্যে আর একটা মৌলিক প্রভেদ আছে; সত্যানন্দ তাঁহার সমস্ত ধর্ম্মাবরণের মধ্যে প্রধানতঃ একজন রাজনীতিজ্ঞ—politician। ভবানী তাঁহার সমস্ত দস্যুতা ও পরহিতব্রতের মধ্যে বাস্তবিক একজন শিক্ষক, গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্মকে বাস্তব জীবনে ফুটাইয়া তোলার উদ্যোগী। আনন্দমঠে দেশপ্রীতিই মুখ্য বস্তু, ধর্ম্ম অপ্রধান, দেবী চৌধুরাণীতে ধর্ম্মই প্রধান, দেশসেবা বা অত্যাচারের প্রতিরোধ একটা নামমাত্র উদ্দেশ্য মাত্র। সুতরাং দেবী চৌধুরাণীতে বাস্তবতার অংশ আনন্দমঠ অপেক্ষা অনেক বেশী; বাঙ্গালার বাস্তব জীবনের আবেষ্টনের মধ্যে উপন্যাসের অসাধারণ ঘটনাগুলি প্রবেশ করাইতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় না। আনন্দমঠে সত্যানন্দের গরীয়ান আদর্শটী বাদ দিলে আর কিছুই থাকে না, দেবী চৌধুরাণীতে প্রফুল্লের নিষ্কামধর্ম্মে দীক্ষার অংশ একেবারে বাদ দিলেও উপন্যাসের বিশেষ অঙ্গহানি হয় না।

এইবার 'আনন্দমঠ' ও 'দেবীচৌধুরাণীর' অন্যান্য দিক্ আলোচনা করা যাইতে পারে। 'আনন্দমঠ' সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে সহজেই অনুমান হইবে যে ইহা উপন্যাস অপেক্ষা বরং মহাকাব্যের লক্ষণান্বিত। বঙ্কিম এখানে কেবল উপন্যাসের বাহ্য আকৃতির ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র; উপন্যাসের ছাঁচে তাঁহার উচ্ছ্বাসিত দেশভক্তি, তাঁহার বিরাট্ রাজনৈতিক কল্পনা ঢালিয়াছেন মাত্র। বাস্তবিক আনন্দমঠের উপন্যাসোচিত গুণ যে খুব বেশী আছে তাহা বলা যায় না। অতীতের চিত্র আঁকিবার ছলে বঙ্কিম ভবিষ্যতের দিকে অর্থপূর্ণ অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিয়াছেন। আনন্দমঠের চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ বাস্তব নহে, তাহাদের এক পদ বাস্তবলোকে ও অপরপদ আদর্শলোকে স্থাপিত রহিয়াছে; বাস্তব ও রোমান্স—এই উভয়রূপ উপাদানের সংমিশ্রণে তাহারা গঠিত। ডিকেন্সের কতকগুলি চরিত্রের মত ইহারা একটা মধ্যলোকের অধিবাসী, আদর্শলোকের কল্পনা বাঙ্গালীর নাম ধরিয়া, বাঙ্গালীর সামাজিক ও পরিবারিক জীবনের মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে যতটুকু বাস্তবতার দাবী করিতে পারে, ইহারা ততটুকু বাস্তব। সত্যানন্দ, ভবানন্দ, জীবানন্দ সকলেরই ব্যক্তিত্ব একটা কুহেলিকা-মণ্ডিত; ভবানন্দ ও জীবানন্দের প্রলোভন, ব্রতভঙ্গ ও প্রায়শ্চিত্ত বাস্তব জীবনের সংঘাতের মত আমাদের মনের গভীর দেশে আঘাত করে না। বরং ভবানন্দের প্রলোভন ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব কতকটা অন্তর্দৃষ্টি ও ক্ষমতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে, কেননা এখানে অন্ততঃ একপক্ষ—কল্যাণী—বাস্তব-জগতের জীব। বাহিরের জগৎ হইতে যে তিনটী প্রাণী—মহেন্দ্র, কল্যাণী, ও শান্তি—সন্তান ধর্ম্মের অপার্থিব রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার মধ্যে মহেন্দ্র-কল্যাণী এই দুই জনই তাহাদের বাস্তবতা ও ব্যক্তি

স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। ইহাদের সহিত সন্তান-জগতের সম্পর্ক ও পরিচয় খুব অল্প দিনের ; ইহারা বাহির হইতে যে প্রকৃতি লইয়া এই জগতে পদার্পণ করিয়াছিল, সে প্রকৃতি বিশেষ রূপান্তরিত হয় নাই, চারিবৎসরব্যাপী একটা উজ্জ্বল স্বপ্ন ও অলৌকিক অনুভূতি হইতে জাগিয়া তাহারা আবার সেই পুরাতন, চিরপরিচিত বাস্তব জগতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। শান্তিকে সন্তান-রাজ্যের আকাশ-বাতাসের সহিত একাত্ম করিবার জন্য তাহার সমস্ত পূর্ব্ব জীবনকে বিকৃত ও একটা অপ্রকৃত বর্ণে রঞ্জিত করিতে হইয়াছে। তবে বঙ্কিমের কৃতিত্ব এই যে কোন চরিত্রই একেবারে অস্বাভাবিক বা অবিশ্বাস্য হয় নাই ; তাহাদের বাক্যে ও ব্যবহারে ও পরস্পরের সহিত সম্পর্কে একটা সুন্দর ঐক্য ও সুসঙ্গতি রক্ষিত হইয়াছে। লেখক যে আকাশ-বাতাস সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ বাস্তব না হউক, কোনরূপ আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতিদুষ্ট হয় নাই ইহা নিশ্চিত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে 'আনন্দমঠের' মধ্যে দুই একটী বাস্তব স্তরও আছে ; উপন্যাসের সাধারণ অবাস্তবতা হইতে এই দৃশ্যগুলিকে সহজেই পৃথক্ করা যায়। প্রথম চারিটী অধ্যায় এইরূপ একটী ভীষণ বাস্তবচিত্র ; আর এক নিমির চরিত্রেই এই খাঁটী বাস্তবতার সুরটী পাওয়া যায়। কিন্তু আনন্দমঠের প্রকৃত গৌরব বাস্তব উপন্যাস হিসাবে নহে। বাঙ্গলার পাঠক সমাজের উপর ইহা যে বদ্ধমূল আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহা এক ধর্ম্মগ্রন্থ ছাড়া অন্য কোন প্রকার সাহিত্যের ভাগ্যে ঘটে নাই। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, যে আনন্দমঠ আধুনিক বাঙ্গলার জন্মদান করিয়াছে, আধুনিক বাঙ্গালীর হৃদয় ও মনোবৃত্তি গঠিত করিয়াছে। যে দেশাত্মবোধ আজ প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর সাধারণ মানস-সম্পত্তি, বঙ্কিমই তাহার প্রথম অঙ্কুর রোপণ করিয়াছেন। ইউরোপের দেশপ্রীতি, বাঙ্গালার বিশেষ অবস্থার মধ্যে, বাঙ্গালীর বিশেষ পূজোপকরণের সাহায্যে, বাঙ্গালী হৃদয়ের ভক্তি চন্দন চর্চ্চিত করিয়া বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের এমন কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা নাই, যাহার প্রথম প্রেরণা এই আনন্দমঠ হইতে আসে নাই ; বাঙ্গালীর রাজনীতি-চর্চ্চার বৈশিষ্ট্য, রাজনৈতিক বক্তৃতায় ভাষা পর্য্যন্ত বঙ্কিমের কল্পনার বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। বঙ্কিম পৌত্তলিক বাঙ্গালীর মানস স্বর্গে এক নূতন দেবী প্রতিমা সৃষ্টি করিয়া স্থাপিত করিয়াছেন। বাঙ্গালীর হৃদয়ের ভক্তিকে এক নূতন পথে চালিত করিয়াছেন। পৃথিবীর যে কয়েক খানি যুগান্তরকারী গ্রন্থ আছে, আনন্দমঠ তাহার মধ্যে একটী প্রধান। স্থন অধিকার করে। "বন্দে-মাতরম্" আধুনিক বাঙ্গালীর বেদমন্ত্র। সেই জন্যই আনন্দমঠকে কেবল সাহিত্য হিসাবে বিচার করিলে ইহার সম্পূর্ণ মহিমা ও প্রভাব বুঝা যাইবে না। ইহার স্থান সাধারণ সাহিত্য-লোকের অনেক উর্দ্ধে।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গালীর খাদ্যবিচার

এবং শরীর সংরক্ষণে ও জাতিসংগঠনে তাহার উপযোগিতা নির্ণয়।

"খাদ্য বিচার" বলিলে কেহ যেন মনে করিবেন না আমাদের কি খাওয়া উচিত এবং কি না খাওয়া উচিত শুধু ইহারই আলোচনায় আমি এখানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। শরীরের রক্ষা ও পুষ্টিসাধনের জন্য কি কি প্রকারের কি অবস্থায় কি পরিমাণ খাদ্যের আবশ্যক তাহারই বিজ্ঞানসম্মত বিধি প্রদর্শন করা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য; এবং বাঙ্গালীর বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার সহিত এই আবশ্যকীয় খাদ্য বস্তুর উপভোগের সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে কিনা তাহাও ইহার আলোচ্য বিষয়।

খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণের সহিত ব্যক্তির ও জাতির স্বাস্থ্যের নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে অজ্ঞানতাবশতঃই হোক্ কিংবা অবহেলার দরুনই হোক্ অনেকেই এই বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করিতে অক্ষম! মেয়েরা ত মোটেই ইহার আবশ্যকতা দেখিতে পান না—স্ত্রী-শিক্ষার অভাবেরই ইহা এক বিষময় ফল;—এমন কি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পুরুষেরাও এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন না। তাহার ফল এই দাঁড়াইতেছে যে একে ত দেশের অধিকাংশ লোক অন্নসংস্থানের অভাবহেতু অনশন ও অর্দ্ধাশনে মৃতপ্রায়, এবং বাকী যাঁহাদের খাইবার সংস্থান রহিয়াছে তাঁহারাও খাদ্যাখাদ্যবিচারের জ্ঞানাভাবে হয় চিররোগী নয় ক্ষীণস্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছে।

আমাদের দেহখানি একটি রাসায়নিক যন্ত্র বিশেষ। ইহার রক্তমাংস, গঠন, শ্বাসপ্রশ্বাস পরিপাক প্রভৃতি বিবিধ প্রক্রিয়া, নানাবিধ গ্রন্থির নিঃসরণ ক্রিয়া ইত্যাদি রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগের পরিণামফল মাত্র। ভুক্তদ্রব্যই দেহের যাবতীয় শক্তির উৎপত্তির কারণ; অর্থাৎ আমাদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রকার শক্তির উৎপত্তির মূল আমাদের ভুক্ত আহারীয় বস্তু নিচয়। বৈজ্ঞানিকেরা এই কারণেই সর্ব্বদা মানবদেহকে বাষ্পপরিচালিত ইঞ্জিনের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। ইঞ্জিনের শক্তি যেরূপ বাষ্প হইতে এবং বাষ্প যেমন আবার জল হইতে কয়লার সাহায্যে উৎপন্ন হয়, ঠিক তদ্রূপ আমাদের যাবতীয় শক্তিও ভুক্ত-দ্রব্য হইতেই আমরা লাভ করিয়া থাকি। সুতরাং দেহটীকে একটী রাসায়নিক ইঞ্জিন বলিলেও চলে। ইঞ্জিনের খোরাক যেমন কয়লা, দেহের খোরাকও সেইরূপ যাবতীয় ভুক্ত পদার্থ। ইঞ্জিন হইতে শরীর যন্ত্রের তফাৎ এই যে প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের শরীরের ক্ষয় হইতেছে। এই ক্ষয়-পূরণের জন্যও আহারের প্রয়োজন। কাজেই এই ভুক্ত পদার্থের প্রকার ও পরিমাণ ভেদে যে দৈহিক শক্তির পরিমাণ ভেদ ঘটিবে ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। মোটের উপর শরীরের বৃদ্ধি, ক্ষয় নিবারণ ও শক্তি উৎপাদানের জন্য আহারের প্রয়োজন। অবশ্য প্রাপ্তবয়স্ক যুবকের পক্ষে প্রথমটার জন্য (পুষ্টির জন্য) খাদ্যের আবশ্যক হয় না।

কি কি প্রকারের কি পরিমাণ খাদ্য একটী সুস্থকায় যুবকের প্রয়োজন তাহা বহু

পরীক্ষার ফলে স্থিরীকৃত হইয়াছে। খাদ্যহিসাবে আমরা যে সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকি তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে।

১। শ্বেতসারপ্রধান, যথা—চাল, আটা, ময়দা, ভুট্টা গোলআলু ইত্যাদি।

২। আমিষজাতীয়, যথা—দাল, মাছ, মাংস, ডিম, দুগ্ধ ইত্যাদি।

৩। স্নেহজাতীয়, যথা—তৈল, ঘি, মাখন প্রভৃতি।

এতদ্ব্যতীত নানাবিধ শাক সব্জী, ফলমূল আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি যাহাদিগকে উক্ত কোন বিশেষ শ্রেণীতে অন্তর্ভুত করা যাইতে পারে না। মোটের উপর শরীর পোষণের জন্য তিন প্রকার উপাদানের নিতান্ত প্রয়োজন, প্রথম শ্বেতসার, দ্বিতীয় আমিষ বা প্রোটিড্, তৃতীয় স্নেহ বা চর্ব্বি। ইহাছাড়া অল্প পরিমাণে নানাবিধ উদ্ভিজ লবণেরও আবশ্যক। প্রত্যেক খাদ্য দ্রব্যেই এই তিনটীর একাধিক বর্ত্তমান থাকে, যে খাদ্য দ্রব্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে থাকে তাহাকে সেই জাতীয় খাদ্য বলা হয়। অর্থাৎ শ্বেতসার খাদ্যে শ্বেতসারের ভাগ, আমিষ জাতীয় খাদ্যে প্রোটিড্ বা আমিষের ভাগ এবং স্নেহ জাতীয় খাদ্যে স্নেহ বা চর্ব্বির ভাগই বেশী বর্ত্তমান থাকে। শাক সব্জি ও ফল মূল হইতে আমরা আমাদের আবশ্যকীয় উদ্ভিজ্জলবণ গ্রহণ করিয়া থাকি।

শ্বেতসার শরীরাভ্যন্তরে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্ত্তিত হইয়া দৈহিক তাপের সৃষ্টি করে; ইহাতেই শারীরিক পরিশ্রমের শক্তি জন্মিয়া থাকে। আমিষ বা প্রোটিড্ রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের ফলে রক্ত ও মাংসে পরিণত হয়। স্নেহ বা চর্ব্বি শরীরের চর্ব্বি উৎপাদনে ও চর্ব্বিবহুল গ্রন্থি বা কোষ নির্ম্মাণে ব্যয়িত হয়। এই চর্ব্বিই শরীরে সঞ্চিত তাপ শক্তির ভাণ্ডারস্বরূপ বর্ত্তমান থাকে। এই জন্যই দেখা যায় যাহাদের শরীর মেদবহুল তাহারা উপবাসেও বিশেষ ক্লান্ত হয় না। কারণ শরীর তখন তাহার সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে শক্তি ব্যয় করিতে থাকে। এই চর্ব্বির দরুণই লোক কষ্টসহিষ্ণু হইতে পারে। নানাবিধ উদ্ভিজ্জ লবণ শরীরের রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে। বিবিধ দেহগ্রন্থির ও দেহ যন্ত্রের জীবনীশক্তিপোষক স্রাবের এই উদ্ভিজ্জ লবণসমূহ একটী বিশিষ্ট উপাদান।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে পরীক্ষার ফলে কোন ব্যক্তির কত পরিমাণ কি প্রকার খাদ্য উপাদানের দরকার তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। মোটের উপর বলা যায় যে সুস্থকায় সবল মধ্যমাকারের পরিশ্রমী যুবকের পক্ষে প্রত্যহ নিম্নলিখিত পরিমাণে বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের আবশ্যক।

প্রোটিড্ বা আমিষ	৩½	আউন্স	বা	১¾ ছটাক।
স্নেহ বা চর্ব্বি	৩	আউন্স	বা	১½ ছটাক।
শ্বেতসার	১৪	আউন্স	বা	৭ ছটাক।

অবশ্য স্ত্রীপুরুষভেদে, সবলদুর্ব্বলভেদে, কৃশ ও স্থূলশরীরভেদে, পরিশ্রমী বা অলস ভেদে এবং দেশের জলবায়ুভেদে উপরোক্ত পরিমাণের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া পড়ে। গ্রীষ্মপ্রধানদেশে চর্ব্বির অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজন হয়। শারীরিক পরিশ্রমীর শ্বেতসারের এবং মানসিক পরিশ্রমীর আমিষের অপেক্ষাকৃত বেশী আবশ্যক হয়। কোন খাদ্যে কি

পরিমাণ খাদ্যউপাদান বর্ত্তমান, তাহা রাসায়নিক পরীক্ষায় নির্ণয় করা হইয়াছে। সুতরাং প্রাত্যহিক খাদ্য দ্রব্যের প্রকার ও পরিমাণ হইতে বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের মোট পরিমাণ সহজেই হিসাব করিয়া লওয়া যায়। নিম্নে বাঙ্গালীর সর্ব্বদা ব্যবহৃত কয়েকটী খাদ্য দ্রব্যে বিভিন্ন খাদ্যউপাদানের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা হইল।

	শ্বেতসার	আমিষ	স্নেহ	
চাল	৭৬	৬	·৪	(শতকরা)
দাল	৫২	২২	৩	„
মাছ	×	১৬	৫	„
ডিম	×	১২·৫	১২·১	„
মাংস	×	২০	৫	„

উপরোক্ত খাদ্যউপাদানের পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালী যুবকের প্রাত্যহিক শরীরপোষণোপযোগী নিতান্ত আবশ্যকীয় খাদ্যের একটী তালিকা এইখানে দেওয়া যাইতে পারে।

চাল	১৬ আউন্স	বা	৮ ছটাক
দাল	৪ আউন্স	বা	২ ছটাক
ঘি বা তেল	৩ আউন্স	বা	১½ ছটাক
মৎস্য	৪ আউন্স	বা	২ ছটাক
শাকসব্জি বা ফল	৬ আউন্স	বা	৩ ছটাক
দুধ	৮ আউন্স	বা	১ পোয়া

মাংস ও ডিম এই তালিকায় দেওয়া হয় নাই; কারণ সাধারণ হিন্দু গৃহস্থের বাড়ীতে এই দুইটীর ব্যবহার বিরল।

অবশ্য এই পরিমাণের কিঞ্চিৎ কম হইলেও আমাদের পক্ষে বিশেষ হানি হয় না, যেহেতু অধিকাংশ বাঙ্গালী যুবকের শরীরের ওজন তেমন বেশী নহে। সাধারণতঃ শারীরিক পরিশ্রমও আমাদের বিশেষ করিতে হয় না। তবে বেশী কমাইতে গেলেই শরীর পোষণের ব্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী। উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে যে শরীর কৃশ, রোগপ্রবণ ও কার্য্যাক্ষম হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। এই খানে খাদ্য সম্বন্ধে আর একটী নূতন তত্ত্বের উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। খাদ্যতত্ত্ববিষয়ক পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে উপরোক্ত তালিকা অনুসারে উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য উপাদান বিশেষ ভাবে পরিষ্কৃত করিয়া গ্রহণ করিলে যথোপযোগী পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ সত্ত্বেও শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না।

কাশিমির ফাঙ্ক (Casimir Funk), মেককোলাম (McKolum) ও ডেভিস (Davis) প্রমুখ খাদ্যতত্ত্ববিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষামূলক গবেষণার ফলে প্রমাণ করিয়াছেন যে সাধারণ প্রকৃতিজাত অকৃত্রিম ও অবিকৃত খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে এমন কতকগুলি উপাদান অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে অবস্থিত আছে, যাহাদের উপর প্রাণিগণের বা জীবের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে। এই সমস্ত সূক্ষ্ম উপাদানের প্রকৃতি সম্বন্ধে এখনও বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। তবে পরীক্ষার ফলে প্রমাণ হইয়াছে যে ইহারা সাধারণতঃ সতেজ ও পুষ্ট ফলে এবং শাক সব্জী ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু কোনরূপ কৃত্রিম প্রক্রিয়া প্রয়োগে, যেমন সিদ্ধ করিয়া, খোসা ছাড়াইয়া, বা শুকাইয়া লইয়া, শাক সব্জী বা ফল ইত্যাদিকে শোধিত করিবার চেষ্টা করিলে, উহাদের আভ্যন্তরীণ উপরোক্ত সূক্ষ্ম উপাদানের কার্য্যকরী শক্তির বিনাশ ঘাট, এই সমস্ত সূক্ষ্ম উপাদানকে Vitamine বা খাদ্যবীর্য্য বলা হইয়া থাকে।

এই পর্য্যন্ত মাত্র তিন প্রকার খাদ্যবীর্য্য পৃথক ভাবে আবিষ্কৃত ও তাহাদের প্রকৃতি

নির্ণীত হইয়াছে। তাহাদিগকে যথাক্রমে (১) স্কার্ভিনাশক "গ" (C) (২) স্নেহে দ্রবনীয় "ক" (A) ও (৩) জলে দ্রবনীয় খ (B) বলা হইয়া থাকে।

প্রথমটীর বা স্কার্ভিনাশক খাদ্যবীর্য্যের অভাবে বা হ্রাসে স্কার্ভি নামক রোগের উৎপত্তি হয়। যাবতীয় সতেজ ফলে ও শাকসব্জীতে ইহা পাওয়া যায়, সূর্য্যের কিরণে পক্ক বা উৎপন্ন দ্রব্যাদিতে ইহার প্রাচুর্য্য দেখা যায়, এই কারণে মাটীর অভ্যন্তরে উৎপন্ন মূলাদিতে ইহার পরিমাণ অত্যন্ত কম দেখিতে পাওয়া যায়।

পাতি ও কাগজী লেবুতে এই প্রকার খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। কাঁচা দুগ্ধেও ইহার প্রাচুর্য্য দেখা যায়; কিন্তু দুধকে সিদ্ধ করিলে বা বহুগুণ উত্তপ্ত করিয়া রাখিলে ইহার সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটে। সুতরাং আমরা সাধারণতঃ সেই প্রকার দুধ খাইয়া থাকি বা দুগ্ধজাত অন্য কোন পদার্থ খাদ্যরূপে গ্রহণ করি—উহাতে এই জাতীয় খাদ্যবীর্য্যের সম্পূর্ণ অভাব।

স্নেহদ্রবনীয় "ক" এই জাতীয় খাদ্যদ্রব্যের অভাবে নানাবিধ চক্ষুরোগের উৎপত্তি হয়, ইহারই অভাব "রিকেট" নামক রোগের মূল কারণ বলিয়া সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। দুধ মাখন ইত্যাদি প্রাণীজাত স্নেহ দ্রব্যে ও খাদ্যরূপে ব্যবহৃত নানাবিধ উদ্ভিজ্জের সবুজ পাতায় ইহা বর্ত্তমান আছে। কড় মৎস্যের তৈলে (codliver oil) ইহার প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা নানাবিধ স্নেহ দ্রব্যে দ্রবনীয়; কিন্তু জলে দ্রবনীয় নহে। সাধারণ উত্তাপে ইহার শক্তির হ্রাস হয় না।

জলে দ্রবনীয় "খ" এই জাতীয় খাদ্যবীর্য্য জলে বিশেষতঃ জল মিশ্রিত অম্লে সহজে দ্রবনীয়। ইহার অভাব ঘটিলে "বেরী বেরী" (Beri beri) ও অন্যান্য স্নায়বীয় রোগের উৎপত্তি হয়। তরুণ বয়স্ক প্রাণীর বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। নানাবিধ অকৃত্রিম ও অবিকৃত প্রাকৃতিক খাদ্য দ্রব্যে ইহা প্রচুর পরিমানে বর্ত্তমান আছে! যথা—শস্যাদি, ডিম ও জন্তুগণের স্থানবিশেষের মাংস। নানাবিধ দালের সর্ব্বাংশেই ইহা পাওয়া যায়। শস্যাদির বহিরাবরণেও ইহা বর্ত্তমান আছে। অধিক উত্তাপে ইহার শক্তি কথঞ্চিৎ বিনষ্ট হয়।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে শুধু বিবিধ খাদ্য উপাদানের পরিমাণ প্রয়োজনমত ঠিক থাকিলেই শরীরের বৃদ্ধি বা স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না। এই সব খাদ্য উপাদানের অকৃত্রিমতা, অবিকৃতি অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে স্বীয় প্রকৃতিগত খাদ্যবীর্য্যের অবস্থিতির উপর দেহের বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে। অতএব শরীর গঠন ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ত্রিবিধ খাদ্য উপাদানের যথাযথ পরিমাণের মত তাহাদের আভ্যন্তরীণ ত্রিবিধ খাদ্য বীর্য্যের পরিমাণও বিশেষ প্রয়োজনীয়। বিশেষজ্ঞগণ ইন্দুরের উপর পরীক্ষা করিয়া ইহা নিঃসংশয়ে স্থিরীকৃত করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে যদি এক দল ইন্দুরকে খাদ্যবীর্য্যহীন খাদ্য উপাদান দিয়া রাখা হয় এবং অপর একদলকে যদি খাদ্যবীর্য্যপূর্ণ সেই পরিমাণের খাদ্য উপাদান দিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে প্রথম দলের ইন্দুরগুলি অল্পদিনের মধ্যেই রুগ্ন হইয়া রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু অপর দলের স্বাস্থ্যের কোন ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায় না।

অতএব আমরা দেখিতে পাই যে রোগের আকর শুধু নানাবিধ রোগাণু microbes, bacilli, germsch নহে; খাদ্য দ্রব্যে খাদ্যবীর্য্যের অভাবও রোগের ও স্বাস্থ্যহানির প্রধান কারণ। আমরা আরও দেখিয়াছি যে খাদ্য দ্রব্যকে কৃত্রিম, বিকৃত, বিশেষভাবে শোধিত বা পরিষ্কৃত করিতে গেলেই খাদ্যবীর্য্যের বিনাশ ঘটে। ধনীলোকের পরিবারে প্রায় দেখা যায় যে প্রচুর পরিমাণের সারবান খাদ্যের ব্যবহার সত্বেও তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয় বা ক্ষীণ-স্বাস্থ্য লইয়া জীবন যাপন করে, কেন না ধনী লোকেরা প্রায়ই বড় বড় সহরে বাস করেন, এবং সহরের খাদ্যদ্রব্যেরই কৃত্রিমতা বেশী, তার উপর আবার রসনার পরিতৃপ্তির জন্য সহজ খাদ্যকে নানারূপে বিকৃত করিয়া তাঁহারা

ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাঁহাদের ছেলে মেয়ে খাদ্যবীর্য্যবহুল সদ্য গোদুগ্ধের পরিবর্ত্তে ঔষধির সাহায্যে রক্ষিত "Condensed" বা ঘনীভূত দুগ্ধ সেবন করে বা "Horlick's Milk" ইত্যাদি কৃত্রিম খাদ্যের উপর নির্ভর করিয়া চলে, তাহাদের যে স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে ইহা কিছুই অপ্রত্যাশিত নহে।

সহর বাসী লোককে প্রায়ই বলিতে শুনা যায় শরীরে কিছুই স্ফূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে না; কোন রোগ নাই অথচ শরীর বা মনের স্বাভাবিক ক্ষমতার প্রায়ই অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অনুসন্ধান করিলে প্রমাণ করা হইবে যে তাঁহাদের খাদ্যদ্রব্যে খাদ্য বীর্য্যের অভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। আধুনিক সভ্যতার ইহা একটী প্রধান অভিশাপ বা শাস্তি। মানবের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিদেবী তাহার দেহবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য রক্ষার আবশ্যকীয় খাদ্য দ্রব্যের বিধান করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু মানুষ তাহার রসনা তৃপ্তি বা উচ্চশিক্ষার দাম্ভিকতায় প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ বা আধিপত্য করিতে যাইয়া নানাবিধ অনর্থের সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছে। ইহাকেই বলে শক্তির বা মস্তিষ্কের অপব্যবহার।

অবশ্য আমাদের দেশের পল্লীবাসীদের খাদ্যদ্রব্যে খাদ্যবীর্য্যের বিশেষ অভাব ঘটিতে প্রায়ই দেখা যায় না। কারণ পল্লীবাসীরা সাধারণতঃ প্রকৃতিজাত সদ্য শাক সব্জী ও শস্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু অন্য দিকে দারিদ্র্যবশতঃ তাহাদের ভুক্ত পদার্থে ত্রিবিধ খাদ্য উপাদানের পরিমাণ উপরোক্ত তালিকানির্দ্দিষ্ট পরিমাণ হইতে অনেক কম দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি পল্লীগ্রামে যাহাকে সচ্ছল অবস্থা বলে এইরূপ অবস্থাপন্ন লোকেরও কোন বিশেষ বিশেষ খাদ্য উপাদানের পরিমাণ তালিকানির্দ্দিষ্ট আবশ্যকীয় পরিমাণের ½অংশেরও সমান কিনা সন্দেহ।

গত গ্রীষ্মাবকাশে গ্রামে থাকিয়া এই বিষয়ে কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা পাঠক-গণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রকাশ করিলাম। এই খানে অবশ্য বলিয়া রাখা আবশ্যক মনে করি যে আমাদের গ্রাম—যেখানে এই সব তথ্য সংগ্রহ হইয়াছে—তাহা জেলার মধ্যে একটী প্রধান ও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক ও অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী এবং কৃষক এই বাস করে, গ্রামের লোক সংখ্যা প্রায় ৪০০০ চারি হাজারের উপর। ইহাতে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় অবস্থিত আছে। সুতরাং এই গ্রামের অধিবাসীগণের অবস্থা জেলার অন্যান্য গ্রামের তুলনায় অনেকাংশে উন্নত। অতএব নিম্নে এই গ্রামে অধিবাসীগণের প্রাত্যহিক খাদ্য উপাদানের সেই পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে তাহা অপেক্ষাকৃত অনুন্নত হীনাবস্থাপন্ন অন্যান্য গ্রামের তুলনায় অনেকাংশে শ্রেয়।

নং	পরিবারে লোক সংখ্যা বয়স্ক বালকবালিকা	ব্যবসা ও মাসিক আয়	প্রাত্যহিক খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণ (সাপ্তাহিক গড় হইতে)	ভুক্ত খাদ্যে বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের ব্যক্তিগত পরিমাণ
১।	শ্রীঅ.. ...৮+৪=১২ (একজন স্কুলে পড়ে)	চাকুরী, ২৫০৲	মোটা চাল—১০ সের দাল—½ সের মাংস—১ ছটাক মাছ—৩ ছটাক শুটকী মাছ—৩ ছটাক ডিম—৩টি দুধ—১ সের তৈল—২ ছটাক শাক সব্জী—সাধারণ মুড়ী মুড়কী ইত্যাদি জলখাবার	শ্বেতসার—১১ ছটাক আমিষ—১·২৫ ছটাক স্নেহ—·৩৩ ছটাক

২। .....৯+৫=১৪ (দুই জন স্কুলে পড়ে) (প্রায়ই ধার করিয়া চলিতে হয়)	জমিশাসন, ১৯০৲	মোটা চাল—১২ সের দাল—৭ ছটাক মাছ—২ ,, শুকটী মাছ—২ ছটাক ডিম—৩ ছটাক দুধ—১ সের তৈল—২ ছটাক শাক সব্জী—সাধারণ জলখাবার—অতি সামান্য	শ্বেতসার—১১·১ ছটাক আমিষ—১·১ ছটাক স্নেহ—·২৫ ছটাক
৩। শ্রী......শর্ম্মা ৬+৫=১১ (১জন স্কুলে ও ২জন পাঠশালায় পড়ে)	তেজারতি ও যজমানি ১০০৲	মোটা চাল—৯ সের দাল—৩ ছটাক মাছ—২ ছটাক শুকটী মাছ—৯ ছটাক তৈল—১ ছটাক দুধ—½ সের শাকসব্জী	শ্বেতসার—১০·৫ ছটাক আমিষ—·৯৫ ছটাক স্নেহ—·১৪ ছটাক
৪। শ্রী......ভট্টাচার্য্য ৭+৫=১২ (২ জন স্কুলে ও ২ জন পাঠশালায় পড়ে)	দোকানদারী ১০০৲	মোটা চাল—৮ সের মাছ—৭ ছটাক শুকটী মাছ—১ ছটাক দাল—৭ ছটাক দুধ—½ সের শাকসব্জী	শ্বেতসার—৯ ছটাক আমিষ—১ ছটাক স্নেহ—·৮৩ ছটাক
৫। ...কৈবর্ত্ত ৯+৫=১৪ (২ জন পাঠশালায় পড়ে)	বাণিজ্য, ২০০৲	মোটা চাল—১২ সের দাল—৪ ছটাক মাছ—১২ ছটাক শুকটী মাছ—৩ছটাক ডিম—৩টি মাংস—৪ ছটাক তৈল—২ ছটাক তরকারী	শ্বেতসার—১১ ছটাক আমিষ—১·২৫ ছটাক স্নেহ—·২৫ ছটাক
৬। শ্রী......সদাগর ৭+১=৮ (মুসলমান)	কৃষি ও বাণিজ্য, ১০০৲	মোটাচাল—৮সের দাল—২ ছটাক মাছ—৬ " মাংস—৭ " শুকটীমাছ—১ " ডিম—৩ টি শাকসব্জী	শ্বেতসার :—১৩ ছটাক আমিষ :—১.৫ ছটাক স্নেহ :— .১৫ "
৭। শ্রী......আলী ৬+২=৮ (মুসলমান) (১জন স্কুলে পড়ে)	কৃষি ও ম ৭৫৲	মোটাচাল—৭ সের দাল—১ ছটাক তৈল—১ " মাছ—১ ,,	শ্বেতসার :—১১.২ ছটাক আমিষ :—১.০৪ " স্নেহ :—.১৯ "

	মাংস—২ ছটাক ডিম—১½ টি শুকটীমাছ—১ ছটাক শাকসব্জী	
৮। শ্রী. ....দাস ৬+৪=১০ চাকুরী, ৭০৲ (২জন স্কুলে পড়ে)	মোটাচাল—৭সের দাল—৩ ছটাক তৈল—½ ,, মাছ—২ ,, শুকটীমাছ—২ ,, দুধ—½সের শাকসব্জী	শ্বেতসার :—৯ ছটাক আমিষ :—.৯৪ ,, স্নেহ :—.১৪ ,,
৯। ....সেন ৯+৩=১২ চাকুরী ৮০৲ (১ জন স্কুলে পড়ে)	মোটা চাল—১০ সের দাল—৩ ছটাক মাছ—২ ছটাক শুকটী মাছ—১ ছটাক তৈল—১ ছটাক শাকসব্জী	শ্বেতসার—১০·৭ ছটাক আমিষ—·৯২৫ ছটাক স্নেহ—·১১৩ ছটাক
১০। শ্রী.....দে ৭+৪=১১ চাকরী ও কৃষি ৫০৲ (১ জন স্কুলে পড়ে)	মোটা চাল—৮ সের দাল—২ ছটাক মাছ—২ ছটাক শুকটী মাছ—১ ছটাক তৈল—১ ছটাক দুধ—½ সের তরকারী	শ্বেতসার—৯·৩ ছটাক আমিষ—·৮৬ ছটাক স্নেহ—·১৫ ছটাক
১১। শ্রী......শর্ম্মা ৮+৪=১২ চাকরী ও পৌরহিত্য ৪০৲	মোটা চাল—৮ সের দাল—২ ছটাক মাছ—২ ছটাক শুকটী মাছ—১ ছটাক তৈল—১ ছটাক শাক সব্জী	শ্বেতসার—৮·৪ ছটাক আমিষ—·৮১ ছটাক স্নেহ—·১২৫ ছটাক
১২। শ্রী......শর্ম্মা ৩+২=৫ চাকরী, ২৫৲	মোটা চাল—৫ সের দাল—২ ছটাক তৈল—¾ ছটাক শুকটী মাছ—১ ছটাক সাক সব্জী	শ্বেতসার—১২·৭৫ ছটাক আমিষ—১·১৫ ছটাক স্নেহ—·০৮ ছটাক
১৩। শ্রী......সেন ৩+১=৪ চাকরী ১০৲	মোটা চাল—৩½ সের দাল—২ ছটাক তৈল—¾ ছটাক শাক সব্জী	শ্বেতসার—১১·৩ ছটাক আমিষ—·৯৭৫ ছটাক স্নেহ—·০৭৫ ছটাক
১৪। শ্রী. দে ৬+১ ২০৲	মোটাচাল—৬ সের দাল—১ ছটাক	শ্বেতসার :—১০.৯৩ ছটাক আমিষ :—১ ছটাক

		মাছ—৩ ছটাক	স্নেহ :—.১১৪ ছটাক
		শুকটীমাছ—½ ছটাক	
		তৈল—¼ ,,	
		দুধ—৪ ,,	
		শাকসব্জী	
১৫। মিঞা ৫+২=৭ (মুসলমান)	কৃষি ও ১৫৲	মোটাচাল—৫½ সের	শ্বেতসার—১০.০৩ ছটাক
		দাল—১ ছটাক	আমিষ—৮৯৭ ছটাক
		মাছ—১ ছটাক	স্নেহ—·০৪৮ ছটাক
		শুকটী মাছ—½ ছটাক	
		তৈল—¼ ছটাক	
		শাক সব্জী	
১৬। মিঞা......৩+০=৩ (মুসলমান)	১০৲	মোটা চাল—২½ সের	শ্বেতসার—১০·৫৫ ছটাক
		শুকটী মাছ—½ ছটাক	আমিষ—·৯১ ছটাক
		শাক সব্‌জী	স্নেহ—·০৩৩ ,,
১৭। শ্রী......কৈবর্ত্ত ৩+১=৪	ফিরিওয়ালা ১৫৲	মোটা চাল—৩ সের	শ্বেতসার—৯·৬২৫ ছটাক
		দাল—১ ছটাক	আমিষ—·৯৫ ছটাক
		শুকটী মাছ—১ ছটাক	স্নেহ—·১১৭ ছটাক
		তৈল—¼ ছটাক	
		শাক সব্‌জী	
১৮। শ্রী..... দে ৪+৩=৭	কৃষি ও চাকরী ২৫৲	মোটা চাল—৫½ সের	শ্বেতসার—১০·০৯ ছটাক
		দাল—১ ছটাক	আমিষ—·৯০৫ ছটাক
		মাছ—১ ছটাক	স্নেহ—·০৭ ছটাক
		শুকটী মাছ—১ ছটাক	
		তৈল—¼ ছটাক	
		শাক সব্‌জী	
১৯। শ্রী......কৈবর্ত্ত ৫+১=	মৎস্য- ১৫৲	মোটা চাল—৫ সের	শ্বেতসার—১০·৬ ছটাক
		দাল—½ ছটাক	আমিষ—·৯৪৫ ছটাক
		শুকটী মাছ—১ ছটাক	স্নেহ—·০৮ ছটাক
		তৈল—¼ ছটাক	
		শাকসব্‌জী	

এতদ্ব্যতীত যাহাদের আয় ১০ টাকারও কম, যাহারা অন্যের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া চলে বা যাহারা ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবন যাপন করে, তাহাদের খাদ্যের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক মনে করিলাম না। পাঠকগণ নিজেই তাহা অনুমান করিতে পারিবেন।

(এক সের শুকটী মাছ ৪ সের মাছের সমান পুষ্টিকর, কিন্তু বড়ই দুষ্পাচ্য)

উপরোক্ত যে কয়টী বিভিন্নশ্রেণীর পরিবারের ব্যক্তিগত প্রাত্যহিক উপাদানের পরিমাণ হিসাব করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-নির্দ্দিষ্ট আবশ্যকীয় খাদ্য উপাদানের পরিমাণের তুলনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে—

(১) সকল শ্রেণীর লোকেরাই প্রয়োজনাতিরিক্ত শ্বেতসার গ্রহণ করিয়া থাকে।

(২) আমিষের পরিমাণ প্রায়ই সকল পরিবারেই বিজ্ঞান-নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ হইতে অনেক কম, দু'একটি সচ্ছল অবস্থাপন্ন পরিবার ভিন্ন অন্যান্য সর্ব্বত্রই আমিষের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের প্রায়ই অর্দ্ধেক বলা যাইতে পারে।

(৩) কি অবস্থাপন্ন কি দরিদ্র সকল পরিবারের খাদ্যেই স্নেহের পরিমাণ অত্যন্ত কম, অবস্থাপন্ন পরিবারেও ইহা নির্দিষ্ট পরিমাণের ১/৪ ভাগও নহে ; এবং দরিদ্র পরিবারে ইহা ১/১০ ভাগ হইতেও কম, অবশ্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্নেহের পরিমাণ কিছু কম হইলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না বটে কিন্তু বেশী অভাব ঘটিলে স্বাস্থ্য হানি অনিবার্য্য, বেশী পরিমাণে শ্বেতসার গ্রহণ করিয়া স্নেহের ন্যূনতা পূরণ করা যাইতে পারে বটে—কিন্তু তাহাও স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে, অধিক পরিমাণে শ্বেতসার গ্রহণের দরুণই বাঙ্গালীর খাদ্য পরিমাণবহুল ; ফলে পাকস্থলীর উপর অনাবশ্যক গুরুভার অর্পণহেতু উহার শক্তির হ্রাস ঘটে, বিশেষতঃ স্নেহ পদার্থটী শরীরে শক্তির সঞ্চয় করিয়া রাখে ; তাহাতে দেহের নানাবিধ রোগ প্রতিরোধের ও কষ্ট সহিষ্ণুতার শক্তি বাড়িয়া যায়।

খাদ্যদ্রব্যে এই দুইটী মূল্যবান উপাদানের (স্নেহ ও আমিষ্য) ন্যূনতাই বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ও বাঙ্গালী জাতীর শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সৌভাগ্যবশতঃ গ্রামবাসী বাঙ্গালীর খাদ্যে তাহাদের শাকসব্জীপ্রিয়তা ও মোটা চাউলের ব্যবহারের দরুণ খাদ্য বীর্য্যের অভাব বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং জাতীয় স্বাস্থ্যের অবনতির একমাত্র প্রধান কারণ, খাদ্যে স্নেহ ও আমিষের স্বল্পতা, ইহার মূলে যে অবশ্য যে উক্ত দুই প্রকার খাদ্যদ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা এবং বাঙ্গালী জাতির অপরিসীম দারিদ্র্য ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অবস্থাপন্ন সহরবাসী লোকদের মধ্যে খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে অজ্ঞতাই স্বাস্থ্যহানির মূল কারণ। অতিভোজনে ও গুরুভোজনে, খাদ্যে কৃত্রিমতা বশতঃ খাদ্য বীর্য্যের অভাবে তাহাদের স্বাস্থ্য হানি ঘটে, তবে এইরূপ লোকের সংখ্যা দেশে শতকরা ৫ জনও আছে কিনা সন্দেহ, কারণ দেশ অত্যন্ত দরিদ্র, এবং গ্রামবাসীর অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়, অর্থাভাবেই তাহারা নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণে অক্ষম, উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যাভাবেই আজ সমস্ত জাতি রুগ্ন, পীড়িত, অক্ষম ও পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে, দেহে বল নাই, মনে উৎসাহ নাই, মস্তিষ্কে চিন্তা করিবার ক্ষমতা নাই, এবং হৃদয়ে সাহস নাই, বাঙ্গালী ছাত্র স্কুল অতিক্রম করিয়া কলেজে প্রবেশ করিতে না করিতেই চশমা ধরিতেছে, হয়ত: আরো ১০।১৫ বৎসর পরে দেখিতে পাইব ভদ্র পরিবারের অধিকাংশ সন্তানই ক্ষীণদৃষ্টি লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, ইউরোপে লোকের জীবন কাল কাল গড়ে ৫০ ধরা যাইতে পারে, আমাদের ভারতবর্ষে তাহা ২০।২৫ এর বেশী হইবে কিনা সন্দেহ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাত্রদের যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা হইয়াছে তাহার বিবরণ পাঠে দেখা যায় যে শতকরা ১০ জন ছাত্রকেও সুস্থ বলা যাইতে পারে না, কাহারো চোখের দোষ, কাহারো কানের দোষ, কাহারো হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য, কাহারো ফুস্‌ফুসের দোষ ইত্যাদি নানাবিধ ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য বর্ত্তমান। এতদ্ব্যতীত অজীর্ণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের ত কথাই নাই, এই সব ভাবিতে গেলে আমরা যে মৃতপ্রায় জাতি ইহাতে সন্দেহ করিবার আর কোন কারণ থাকে না। ইউরোপ যেখানে বিজ্ঞান বলে বলীয়ান হইয়া নব নব দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত হইতেছে, হিমালয়ে আরোহণ, তুষারাবৃত মেরু প্রদেশ আবিস্কার বা বায়ু সমুদ্র বিমানপোতে বিজয় করিতে চেষ্টা করিতেছে—আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি হারাইয়া, গৃহের চতুষ্কোণের মধ্যে আবদ্ধ রহিয়া, "মলিন তাস সজোরে ভাঁজিয়া", পূর্ব্বপুরুষের দর্প করিয়া, প্রত্যহ ১০টা হইতে ৫টা আফিসে কলম পিষিয়া এবং নির্ব্বিবাদে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে কষ্টলব্ধ বেতনটী গ্রহণ করিয়া নিদ্রা, আলস্য ও কলহে কাল কাটানই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য স্থির করিয়াছি। এই প্রকার জীবনে না আছে শক্তি লব্ধ ভোগের রস আর না আছে ত্যাগের মহিমা। আমাদের ভোগের শক্তির অভাবকে যাঁহারা সংযম মনে করিয়া উচ্চাসন প্রদান করেন—তাঁহারা শুধু নিজকে প্রতারণা করিয়া নিজের দুর্ব্বলতা ডাকিতে চেষ্টা করিতেছেন। কারারুদ্ধ কয়েদী বা বনে নির্ব্বাসিত মানুষকে যদি সংযমী বলা যায় তবে আমাদিগকেও ত্যাগী বলা যাইতে পারে। এই

প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। দেশে এখন অনেকেই বলেন যে আমাদের বিলাসিতার দরুণই আমাদের দারিদ্র্য, সুতরাং সর্ব্বতোভাবে বিলাসিতা আমাদের বর্জ্জনীয়। বিলাস বর্জ্জন এবং সরল ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আনন্দে মগ্ন থাকাই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ, সন্দেহ নাই। সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি ও মনোবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিয়া জ্ঞানে আনন্দ লাভ করাও যে মনুষ্যত্ব বিকাশের একটী পরম পন্থা, ইহাও স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি নাই। তবে "বিলাস" শব্দটীর প্রকৃত অর্থ লইয়াই যত গোল যোগ। "বিলাস" শব্দের দ্বারা আমাদের বোঝা উচিত যাহা কিছু শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অনাবশ্যক বা প্রতিকূল, তাহাই "বিলাস", যাহারা অনশনে, অর্দ্ধাশনে বা অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় দিনাতিপাত করিতেছে তাহাদিগকে বিলাস বর্জ্জন বা ত্যাগের পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দেওয়া বৃথা। তাহাদের পক্ষে ত্যাগ আর আত্মহত্যা দুইই সমান। আমাদের দেশে শতকরা ৯০ জন লোকও দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পারে কিনা সন্দেহ, পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে শক্তিহীন হইয়া ম্যালেরিয়া ও যক্ষার কবলে তাহারা অহরহ আত্মসমর্পন করিতেছে। সে দিন ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় মহাশয় এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে আমাদের দেশে প্রতিঘণ্টায় ১২ জন করিয়া লোক যক্ষা রোগে জীবন দান করিতেছে। কেহ হিসাব করিলে দেখিতে পাইবেন যে ম্যালেরিয়ায় হয়ত মিনিটেই ১০।১২ জন করিয়া মরিতেছে। ইহার প্রধান কারণ যে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ইহাতে সন্দেহ নাই, এইরূপ অবস্থাপন্ন লোকের সম্মুখে ত্যাগের মহিমা কীর্ত্তন করা আর উপবাসে মৃত প্রায় লোকের সম্মুখে উপবাসের মহিমা বর্ণনা করা দুইই সমান। তবে একটী কথা অস্বীকার করা যায় না যে আমাদের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা অনেক সময় অনাবশ্যক সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের অনুবর্ত্তী হইয়া ও সভ্যতার আনুষঙ্গিক বাহ্যিক পোষাক পরিচ্ছদের মাত্রা রক্ষা করিতে যাইয়া নিজের ও স্ত্রীপুত্র কন্যার জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের সংস্থান করিতে পারেন না। পুত্রগণের উচ্চশিক্ষার ও মেয়েদের গান বাজনা ও ইংরাজী শিক্ষার এবং তাহাদের বর্ত্তমান সভ্যতানির্দ্দিষ্ট জামা, জুতা, কাপড়, ও শাড়ী ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে যাইয়া, স্ত্রীর অলঙ্কার ও কাপড়ের আবদার রক্ষা করিয়া, মেয়েদের বিবাহের জন্য টাকা জমাইয়া তাঁহাদের স্বল্প বেতনের যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহাতে পরিবারের সকলের জন্য আবশ্যকীয় পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই সভ্যতার আবদার বা দাবী রক্ষা করিতে যাইয়া, হয় তাহাদিগকে মহাজনের শরণাপন্ন হইতে হয়, নতুবা পেটের উপর বাণিজ্য করিতে হয়। ফলে পরিবারের সকলেই, রুগ্ন, স্বল্পআয়ু ও অক্ষম হইয়া পড়ে; এবং ডাক্তারের ও ঔষধের দাবী মিটাইতে যাইয়া আরো বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়েন, এই বুদ্ধি বিভ্রম না ঘুচিলে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্রলোকের আর কল্যাণ নাই।

আর যাহাদের ঘরে অর্থ অপ্রতুল নহে, তাঁহারা খাদ্যাখাদ্য বিচারে জ্ঞানাভাব বশতঃ অতি ভোজন, গুরু ভোজন ও কৃত্রিম ভোজনে রসনা তৃপ্তি করিতে যাইয়া নিজেদের ও পুত্র কন্যার স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন দিতেছেন, এই শ্রেণীর পক্ষে ত্যাগ ও সংযমের আদর্শের অনুকরণই এক মাত্র শ্রেয়ের পথ।

পরিশেষে এই মরণোন্মুখী জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে কি ব্যবস্থা ও প্রয়াস আমাদের করিতে হইবে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাষদিয়া এইখানে এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য যাহাতে দেশে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে তাহারই আয়োজন করা। এই জন্য গ্রামে গ্রামে সহযোগ বা সমবায় (Co-operative) প্রণালীতে কৃষি, গোপালন, মৎস্য ও পক্ষী পালনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহাতে অল্পব্যয়ে অকৃত্রিম দুধ, ঘি, ও মৎস্য ইত্যাদি পুষ্টিকর খাদ্য দ্রব্য সাধারণ লোকের ব্যবহারে আসিতে পারে এইরূপ ভাবে তাহাদের বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্য

তালিকাকে কথঞ্চিৎ ভাবে সংশোধিত করা আবশ্যক। দুবেলা অন্নের পরিবর্ত্তে যদি এক বেলা ভাত ও অন্য বেলা আটার রুটী খাইতে অভ্যাস করি, তাহা হইলে আমরা একই খরচে অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্যউপাদান পাইতে পারি। কারণ চাল অপেক্ষা গম বা আটা অনেক অনেক বেশী পুষ্টিকর। তৃতীয়তঃ যাঁহারা সহরবাসী ও অবস্থাপন্ন তাঁহারা কৃত্রিম বা রাসায়নিক উপায়ে রক্ষিত সর্ব্বপ্রকার খাদ্যদ্রব্য (preserved food) এবং হোটেলে (Restaurants) বা আশ্রম প্রভৃতিতে প্রস্তুত যাবতীয় রসনাতৃপ্তিকর বিকৃত খাদ্য সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিবেন। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত এই প্রকার খাদ্য দ্রব্য শরীরের পুষ্টিসাধন না করিয়া সমূহ অনিষ্ট করিতে থাকে। অমৃতভ্রমে তাঁহারা অহরহ গরলই পান করিতেছেন, আমাদের যুবক ও ছাত্র সম্প্রদায়ই এই সমস্ত হোটেল ও আশ্রমের বিশেষ ভক্ত দেখিতে পাই। তাঁহারা তাঁহা-দের অভিভাবকদের কষ্টার্জ্জিত অর্থ এই প্রকারে শুধু নষ্ট করিতেছেন না, অধিকন্তু নিজের অমূল্য স্বাস্থ্যের মূলেও কুঠারাঘাত করিতেছেন। এইপ্রকার দুর্ম্মূল্য খাদ্যভ্রমে বিষ গ্রহণ না করিয়া তাঁহারা অতি সহজেই ও অল্পমূল্যে নিম্ন লিখিত প্রকৃত পুষ্টিকর, অকৃত্রিম খাদ্য গ্রহণ করিতে পারেন। অবশ্য প্রথম প্রথম এই সব খাদ্য তেমন রসনাতৃপ্তিকর না হইতে পারে; কিন্তু অভ্যাস করিলে ইহাতেও তাঁহারা যথেষ্ট রসাস্বাদ পাইবেন। স্বাস্থ্যহানিকর হোটেলের কৃত্রিম ঘৃতভর্জ্জিত ও রোগবীজানুবাহী বাসীমাংস ও মাছ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা জলসিক্ত চিড়া, দধি ও কলা ইত্যাদি দিয়া বেশ পুষ্টিকর ভাল খাবারের ব্যবস্থা করিতে পারেন কিম্বা কিছু মুগ বা ছোলা জলে ভিজাইয়া আদা ও লবণ যোগে গ্রহণ করিতে পারেন। এইরূপ প্রাকৃতিক খাদ্য যেমন পুষ্টিকর তেমন অভিত খাদ্য বীর্য্য (Vitamine) বহুল বলিয়া ইহারা শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী। খাদ্যবীর্য্যবিহীন দুষ্পাচ্য লুচি মিষ্টি ইত্যাদি তাঁহারা যথাসম্ভব পরিত্যাগ করিয়া চলিবেন। ইহাতে তাঁহাদের অনেক অর্থঅপচয়ও বন্ধ হইবে এবং স্বাস্থ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হইবে।

মোটের উপর এই মৃতপ্রায় জাতিকে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক স্বাস্থ্যে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইলে খাদ্য সমস্যার ও স্বাস্থ্য রক্ষার বিধানের দিকে আমাদের এখন বিশেষ ভাবে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। জাতিগঠনের ও স্বরাজপ্রতিষ্ঠার ইহাও একটী প্রধান ভিত্তি বলিয়া মনে রাখিতে হইবে।

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়।

হিন্দী সাহিত্য

বাঙ্গালীর একটী বৈশিষ্ট্য আছে। তাহারই গর্ব্বে বাঙ্গালীর চরিত্রে একটী ক্ষুদ্রতা ঢুকিয়াছে। গত এক শতাব্দী ধরিয়া প্রতীচ্যের সভ্যতার দূতরূপে ইংরেজ তাহার ঐশ্বর্য্য-সম্ভার দেখাইয়া আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া আসিয়াছে; প্রতীচ্যের এই স্পর্শে আমাদের হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা কাটিয়া গিয়াছে ইহাই আমাদের ধারণা; ইহার মধ্যে যে কিছু সত্য

আছে সেটা অস্বীকার করিবার উপায় নাই ; প্রতীচ্যের স্পর্শে আর এক প্রকারের সঙ্কীর্ণতা আমাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রতীচ্যের দানগ্রাহী হইয়া আমরা ভারতবর্ষের প্রতি অবিচার করিতে বসিয়াছি। হিন্দী ও অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক সভ্যতার প্রতি অবজ্ঞা দেখাইতেছি।

স্বদেশী আন্দোলনের কল্যাণে বাঙ্গলার প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যের কথা বাঙ্গালীর প্রাণে জাগিয়াছিল। বাঙ্গালী বাঙ্গলার সেবায় কায়মনে যোগ দিয়াছিল। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনে যে রাষ্ট্রীয়বোধ জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা প্রাদেশিকতায় অনুরঞ্জিত ছিল। স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের অন্তরে যে সত্য জাতীয়তা বোধ আছে, যাহা জাতিধর্ম্ম-প্রদেশবর্ণের অপেক্ষা রাখে না, যাহাতে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলেরই সাধারণ অধিকার, যাহাতে উদ্বোধনে গুজরাট ও বাঙ্গলা, পাঞ্জাব ও সিংহল এক সঙ্গে মিলিতে পারে, সেই পরম সত্য জাতীয়তাবোধ জাগে নাই। প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য ফুটাইবার দিকেই আমাদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল ; অন্তর্প্রাদেশিক সহানুভূতির দিকে আমাদের দৃষ্টি যায় নাই ; তাই সকল প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যের সমবায় ও ঐক্যে ভারতীয় সভ্যতার যে বৈশিষ্ট্য আছে তাহার কথা আমরা ভুলিয়াগিয়াছিলাম। ফলে মহারাষ্ট্র বাঙ্গলাকে বুঝিতে পারে নাই, অবজ্ঞা করিয়াছে, ঘৃণা করিয়াছে, ভারতীয় সভ্যতার ভাণ্ডারে পাঞ্জাবের দান বাঙ্গলা বোঝে নাই। তাই বাঙলা ও অন্যান্য প্রদেশের মিলনস্থান ছিল একমাত্র নীরস ব্যর্থ রাষ্ট্রীয় দাবী করিবার সভা। ভারতীয় ঐক্য বোধের এই অভাব দেশপ্রেমিকেরা বুঝিয়াছিলেন কিনা জানি না, যতদূর মনে হয় তাঁহারা রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিতে ভারতের ঐক্যের কথা বুঝিলেও ভারতীয় সভ্যতার ঐক্য, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও প্রদেশের ঐক্য বোঝেন নাই।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের প্রতি বাঙালীর এই অবজ্ঞা বাঙ্গালীর সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দেয়। যতদিন না আমরা আমাদের এই প্রাদেশিকতার গর্ব্ব ত্যাগ করিয়া অন্যান্য প্রদেশের ভাষার ও সভ্যতার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে চেষ্টা করিব ততদিন ভারতীয় সভ্যতার অন্তরের ঐক্য এই কথাটী আমাদের পক্ষে অর্থহীন হইয়া থাকিবে।

পাঞ্জাবকে বুঝিতে হইলে নানক ও অন্যান্য শিখগুরু ভারতকে কি দিয়াছেন বুঝিতে হইবে, পাঞ্জাবের ভাষা, সাহিত্য ধর্ম্ম রীতিনীতি বুঝিতে হইবে। ভারতের সম্পদভাণ্ডারে মহারাষ্ট্রের দান বুঝিতে হইলে, একনাথ, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি মনীষিগণের বাণী বুঝিতে হইবে। আজ দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার একমাত্র উপায় বৈদেশিকগণের লিখিত কয়েকখানি পুস্তক মাত্র, অথচ আমাদের এই প্রতিবেশীগণের পরিচয় আমরা অতি সহজেই লইতে পারি। তাহার জন্য অপরিচিতের সাহায্য গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নাই।

মধ্যযুগের ভারতের সকল প্রকার আন্দোলনই হিন্দী সাহিত্যের উপর চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে ; সুতরাং অন্ততঃ দ্বাদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর ভারতকে বুঝিতে হইলে হিন্দী-সাহিত্যের আলোচনা আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

পঞ্চদশ শতকের বাঙ্গলা সাহিত্যের সহিত হিন্দীভাষার একটী অত্যন্ত নিকট যোগ আছে ; মিথিলার আদি কবিকে আমরা বাঙ্গালী কবি করিয়া লইয়াছি। তখনকার পূর্ব্ব-

হিন্দীর নিকট বাঙ্গলা ভাষা ঋণী; সুতরাং বাঙ্গলার প্রকৃতি বোঝার পক্ষে সে ভাষার আলোচনা একান্ত প্রয়োজন, শুধু ভাষা নহে, বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাসেও ইহার প্রভাব দেখিতে পাই।

মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস জানিতে হইলে হিন্দী সাহিত্যের আলোচনা আবশ্যক। এই যুগ ভারতের পক্ষে এক অপূর্ব্বযুগ; এক হিসাবে ইহাকে য়ুরোপের রেনাসাঁর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই সময়ে হইতে ভারতবর্ষের ইসলামসভ্যতার ও প্রতীচ্যের প্রভাব ধারাবাহিক ভাবে আরম্ভ হয়। এই সময়ে ভারতের চিন্তাজগতে এক বিপ্লব আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। শঙ্করের জ্ঞানপ্রধান ধর্ম্ম ভারতের মাটীতে যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছিল তাহা রামানুজ রামানন্দ বল্লভাচার্য্য শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির চেষ্টায় ভক্তিবৃক্ষে পরিণতি লাভ করিতেছিল। কবির নানক একেশ্বরবাদ প্রচার করিতেছিলেন। চিন্তা ও ধর্ম্মজগতে এই যে বিপ্লব চলিতেছিল তাহার জন্য ভারতের সমাজ ও সাহিত্য বিচিত্ররূপ ধারণ করিতেছিল। এক একজন মহাপুরুষ আসিতেছিলেন, সাহিত্যকে নূতন নূতন রঙ্গে সাজাইয়া যাইতেছিলেন। সেই যুগ হিন্দী সাহিত্যের প্রাদুর্ভাবের যুগ।

হিন্দীই তখন উত্তর ভারতের মুখ্যভাষা ছিল এবং মহারাষ্ট্র ব্যতীত অন্যসকল প্রদেশের (উত্তর ভারতের) ধর্ম্মসংস্কারকগণ হিন্দীতেই ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কবীর তুলসীদাস নানক প্রভৃতি নিজেদের রচনাদ্বারা মুখ্যতঃ হিন্দী সাহিত্যেরই সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। শঙ্কর রামানুজ প্রভৃতি সংস্কারকগণ লৌকিক ভাষাকে উপেক্ষা করিয়া তখনকার দিনের পণ্ডিতসমাজে প্রচলিত সংস্কৃতকেই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু পরবর্ত্তীকালে তাহা হয় নাই। কবীর স্পষ্টই বলিয়াছিহেন।

"সংসকিরত হৈ কূপজল
ভাষা বহতা নীর"

সংস্কৃত ও কূপজল ভাষা স্বচ্ছসলিলা গতিশীলা নদী, কূপের জল লইয়া কি করিব? এইখানে কবীর প্রভৃতি মনীষিগণ, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি যাঁহার ধর্ম্মপ্রচারে সংস্কৃতের সহায়তা লইয়াছিলেন তাঁহাদের চেয়ে, অনেক অধিক সুবিধা পাইয়াছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে শঙ্কর প্রভৃতির প্রচারিত মতবাদ সুদৃঢ়ভাবে যে বসিতে পারে নাই আর যেটুকুও বসিয়াছিল তাহাও বিকৃতিভাবে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া বলা যাইতে পারে, সংস্কৃতকে বোঝাইবার জন্য যে টীকাটিপ্পনীর কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি হইত তাহার মধ্য হইতে সত্যনির্ণয় করা জনসাধারণের পক্ষে শক্তই হইয়া দাঁড়াইত। এই জন্যই তুলসী কবীর প্রভৃতি জনসাধারণের নিকট সত্যশ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন, শঙ্কর প্রভৃতি তাহার পরিবর্ত্তে অন্ধ বিচার হীন ভক্তি লাভ করিয়াছেন।

অনেক মনে করে পৃথ্বিরাজের মন্ত্রীও বন্ধু চাঁদ (চন্দ্‌ কবি) রচিত পৃথ্বিরাজ রাসোই হিন্দীর আদি বাক্য। তাহার পূর্ব্বে হিন্দীভাষা কথিতভাষা মাত্র ছিল।

অমীর খসরু চাঁদের পরে অতি অল্পদিনের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুসলমান,

কিন্তু হিন্দী সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'পহেলিয়ার' ভাষা চাঁদ কবির ভাষা হইযে বহু পরিমার্জ্জিত ও নবীন। এই কারণে কেহ কেহ বলেন চাঁদের পূর্ব্বেও অনেক হিন্দী কবি ছিলেন এবং সেই সময়েই হিন্দীর দুইটী শাখা হয়; একটীর—যেটীর ভাষা বিশেষরূপে উন্নত হয়—প্রতিনিধি চাঁদ এবং অপরটীর প্রতিনিধি অমীর খসরু।

যাহাই হোক হিন্দী সাহিত্য যে অন্ততঃ ছয়শত বৎসরের প্রাচীন এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। চাঁদের পরে এই দীর্ঘ ছয় শতাব্দী ধরিয়া বহু সাহিত্যক এই সাহিত্যের পরেপুষ্টি সাধন করিয়াছেন।

বাঙ্গালীদেশের মাটীতে ভক্তি সহজ। বাঙ্গলার আদি কবি প্রেমভক্তির কাহিনী গাহিয়াছেন; এমন কি শ্রীরামের চরিত্র অঙ্কণ করিতে গিয়া বাঙ্গলার কবি তাঁহাকে মুখ্যতঃ অজেয় বীর না করিয়া বাঙ্গলার জলমাটি আবহাওয়ায় মানুষ নাম করিয়া তাঁহার চরিত্রে প্রেমভক্তিই প্রধান করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মহাবীর আমাদের দেশে পূজা পান নাই। আমাদের রামায়ণের মহাবীর মহাভক্ত, ভক্তিই তাঁহার চরিত্রের প্রধান উপাদান। তাই আদি কবি হইতে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার সকল কবিরই লেখনীতে প্রেম যেরূপ সহজে ফুটিয়াছে, বীর্য্য তেমনভাবে জমিয়া উঠিতে পারে নাই। মাইকেল বিদেশ হইতে বীররসের আমদানী করিয়াছেন, তাহা খাঁটী বাঙ্গলার জিনিষ নহে; বাঙ্গলার নিজস্ব বাউল, ভাটিয়াল কীর্ত্তন প্রভৃতি চারণগীতি নহে।

হিন্দী সাহিত্যের সঙ্গে বাঙ্গলার এইখানে একটী মস্ত বড় পার্থক্য রহিয়াছে। হিন্দী যে সকল প্রদেশের ভাষা সেগুলা পরাধীনতার নাগপাশে সহজে ধরা পড়ে নাই, সে দেশের পুরুষ-গুলা শেষ পর্য্যন্ত যুঝিয়াছে, হারিয়াছে, ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, মরিয়াছে, যখন কোন উপায় নাই তখন তাহাদের মেয়েরা আগুণে ঝাঁপ দিয়াছে। ভারতের এই সকল প্রদেশের লোক বীর, তাহারা সহজে স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দেয় নাই। আর ভারতের যত কিছু বহিরাক্রমণ যুদ্ধ বিগ্রহ বিপ্লব পশ্চিম প্রান্তেই হইয়াছিল, পূর্ব্বপ্রান্ত বেশ শান্তিতে, নিশ্চিন্ত সুখে দিন কাটাইতে পারিয়াছিল। কয়েকটী বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া বাঙলার শৌর্য্যচর্চ্চার উদাহরণ পাওয়া যায় না; বিপ্লব বা অরাজকতা বাঙলার মাটীতে বেশীদিন টিঁকে নাই। তাই বাঙলার দুয়ারে যখন শত্রু আসিয়া ডাক দিল তখন বাঙালী অতি সহজেই নির্ব্বিবাদে আত্মসমর্পণ করিয়া স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে শান্তি ভিক্ষা করিয়া লইল।

পশ্চিম প্রান্তেই বারবার শত্রু আসিয়াছিল; পশ্চিমের প্রদেশগুলি তাই প্রথম যুগে নিশ্চিন্ত ভাবে সাহিত্য গড়িয়া তুলিবার অবসর পায় নাই; যখন পাইয়াছিল তখন হিন্দীতেও প্রেমের কাব্য ভক্তির গাথার সৃষ্টি করিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত শান্ত পরবর্ত্তী যুগেও কিন্তু তাহার মধ্যে বীররসের কাব্য সৃষ্টি হইয়াছিল।

মুসলমানদের ধারাবাহিকরূপে আক্রমণের প্রথম যুগে খৃষ্টিয় দশম একাদশ শতাব্দীর কোন সময়ে হিন্দীভাষার সংগঠন আরম্ভ হয়। তখনকার কবি তাই প্রেমের কবিতার চেয়েও বীর্য্যের গাথা রচনা করিবার উপাদান পাইয়াছিলেন। হিন্দী আদি কবি তাঁহার কাব্যের নায়করূপে পৃথিরাজকে বরণ করিয়া অমর ভাষায় তাঁহার বীরত্ব কাহিনী রচনা করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দীর প্রথম কবি ভাটচারণগণ। হিন্দী সাহিত্যে এই ভাবে বীররস প্রধান্যলাভ করিয়াছিল।

রাসো প্রভৃতি কাব্যগুলি যদিও ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে লেখা হইয়াছে তথাপি তাহাদের মধ্যে কতখানি ঐতিহাসিকতা প্রামাণিকতা আছে তাহা বলা কঠিন। অধিকাংশস্থলে কবিগণ যে রাজার গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন তাঁহারা তাহারই সভাসদ ছিলেন সুতরাং উৎসাহের আতিশয্যে সত্যের অপলাপ হয়ত অনেক সময়েই হইয়াছে। তবে এই সকল কাব্যে সম-সাময়িক ভারতের রীতিনীতি ধর্ম্ম সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা যায়।

এইস্থলে একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এই শ্রেণীর গাথা কবিতা ভাটচারণের মুখে মুখে দেশে দেশে গীত হইত সুতরাং অনেক স্থলেই আদিকবির ভাষা পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও নবীনতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও পৃথ্বিরাজ রাসোর ভাষা অতি কঠিন এবং দুর্ব্বোধ্য এবং টীকার সাহায্য ব্যতীত তাহার রসগ্রহণ সম্ভবপর নহে।

চাঁদের পরবর্ত্তীযুগের কবিগণ চাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ শতকে শারঙ্গধর পদ্ধতির রচয়িতা শারঙ্গধর হামিরের বীরত্ব কাহিনী অবলম্বনে হাম্মীর রাসো, হাম্মীর কাব্য ইত্যাদি রচনা করিয়াছিলেন। তাহার পরে যে ভারতবর্ষের পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে বীররসের চর্চ্চা কমিয়া যায়, তৎকালীন সাহিত্যেও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহার পর মোগল সাম্রাজ্যের অবনতির যুগে ভারতবর্ষের আবার যখন স্বাধীনতার প্রচেষ্টা হইল, সেই সময়কার কবি তখন তাহাই অবলম্বনে যে সকল কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যেও বীর্য্যের পরিচয় পাই। মধ্যযুগের কবি ভূষণ মতিরাম প্রভৃতি কয়েকজন কবি তৎকালীন ভারতীয় স্বাধীনতা প্রচেষ্টার নেতাদের অবলম্বন করিয়া যে কাব্য রচনা করেন তাহা সর্ব্বাংশেই এ শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। শিবাজী তখন দক্ষিণ ভারতে মহারাষ্ট্র জাগ্রতির প্রতিনিধি, ভূষণ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া "শিবরাজভূষণ" ও "শিবা বাবণী" রচনা করেন; শিবাজীর এই প্রচেষ্টার সহকারী পান্নাধিপতি ছত্রসালের চরিত অবলম্বনে 'ছত্রসালদশক, প্রভৃতি খণ্ড কাব্য রচিত হইয়া এই শ্রেণীর কাব্যের সম্মানরক্ষা করিয়াছে। রাণা প্রতাপসিংহের স্বাধীনতাসংগ্রাম অবলম্বনে যে সকল চারণগীতি রচিত হইয়াছিল দুর্ভাগ্যক্রমে সেগুলি সাহিত্যে স্থান পায় নাই। ভূষণ মতিরামের পরে বা অব্যবহিত পূর্ব্বে যে সকল কাব্য রচিত হইয়াছিল তাহাদের যুদ্ধবর্ণনার স্থান বিশেষে যে বীররস চিত্রিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, সেগুলি পূর্ব্বোক্ত কারণে ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই; উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে তুলসী দাসের রাম চরিত মানসের লঙ্কাকাণ্ড যুদ্ধবর্ণনা; তাহাতে শব্দচ্ছটা, বর্ণনা বৈচিত্র্য আছে সত্য কিন্তু ভূষণের শিবাজী চরিত্রাঙ্কণের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না।

মুসলমান আক্রমণের প্রথম যুগের পর যখন ধীরে ধীরে মুসলমান শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, দেশে অরাজকতা বিপ্লব অন্তর্হিত হইল তখন হিন্দী সাহিত্য আবার নূতনরূপ ধারণ করিল। ইহাই হিন্দীর মধ্যযুগ ও সুবর্ণ যুগ। হিন্দীর গ্রিয়ার্সন খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে অগষ্টান্ এজ্ (Augustan Age) বলিয়াছেন। ইংরেজী সাহিত্যে এলিজাবেথের যুগ বা লাতিন সাহিত্যের অগষ্টান্ যুগের সহিত ইহার তুলনা করিতে পারা যায়। কবীর,

নানক, দাদূ, মীরা, তুলসী, সুরদাস, বিহারীলাল, কেশব প্রভৃতি এই যুগের কবি সাহিত্যসাধক। রাজনৈতিক বিপ্লবের অবসান হইয়াছিল ও বাহিরে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ধর্ম্ম ও চিন্তা জগতে তখন একটা বিপ্লব চলিতেছিল।

বৌদ্ধ প্রভাবের শেষাশেষি যখন দেশময় ভোগব্যভিচারের চরম হইয়াছিল তখন তাহার প্রতিবাদ রূপে বর্ণাশ্রমের শেষ আশ্রমটীকে বিশেষ ভাবে বড় করিয়া আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন। তাহার ভিত্তি ছিল জ্ঞানের উপর।

কিন্তু জ্ঞান সকলের অধিগম্য নহে এবং শঙ্করাচার্য্য তাঁহার যে অসাধারণ প্রতিভাদ্বারা জ্ঞানমার্গকে সরস করিয়া দেশের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তীকালে সেইরূপ প্রতিভার অভাবে তাহা শুষ্ক নীরস মায়াবাদে ও সন্ন্যাসবাদে পরিণত হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের ব্যর্থতার অন্য একটী কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জনসাধারণের মন তখন এই নীরসতা হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। তখন প্রেমের ধর্ম্ম আসিল, তাহার পরিণতি একদিকে কবীরের প্রেমরসসিক্ত একেশ্বরবাদ, মিলনপ্রয়াসী জ্ঞানবাদে, অন্যদিকে রামানন্দ বল্লভাচার্য্য শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির ভক্তিরসপ্রধান বৈষ্ণব ধর্ম্মে।

মুসলমানগণ তখন দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ছিলেন; সুতরাং তখনকার সাহিত্য ও ধর্ম্মজগতে তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রভাব আরম্ভ হইয়াছিল। কবীরের প্রচারিত মতবাদ সুফীগণের নিকট কতখানি ঋণী তাহা বিচার করিবার বিষয়।

কবীর যে ব্রহ্মের কথা প্রচার করিলেন তিনি জাতিভেদ স্বীকার করেন না, তাঁহার নিকট হিন্দুমুসলমানে ভেদ নাই; তিনি অনন্ত প্রেমের আধার। কবীর প্রাদেশিকতায় বদ্ধ হন নাই; তৎপ্রচারিত পন্থা ভারতপন্থা নামে পরিচিত। ভাষা হিসাবে কবীরের ভাষা খুব পরিমার্জ্জিত নহে; কিন্তু ভাবসম্পদে তাহা পরিপূর্ণ। তাঁহার ভাষায় মুসলমানদের প্রভাব যথেষ্ট লক্ষিত হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় কবীরের বাণী সম্পাদিত করিয়া বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।

নানক যখন ধর্ম্মপ্রচার করেন তখন বাবর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতেছেন। তাই নানকের ধর্ম্মে জাতীয়ভাবের পরিচয় পাই। একহিসাবে তাঁহার ধর্ম্ম মুসলমান ধর্ম্মের প্রতিবাদ। রাজশক্তি যখন ইসলাম অবলম্বন করিয়াছিল, তখন লোভে ও স্বীয় নষ্টপ্রায় কলুষিত ধর্ম্মে আস্থা হারাইয়া হিন্দুগণের মন স্বভাবতই ইসলামের দিকে গিয়াছিল; তবে ইহার আরও অন্য কারণ ছিল। নানক দেশকে পরম দুর্দ্দশার হাত হইতে মুক্তি দিবার জন্যই যেন শিখ-ধর্ম্মের প্রচার করেন। শিখ শব্দ শাস্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তাঁহার ধর্ম্মে প্রেমের বিশেষ স্থান নাই। নানক প্রাচীন পশ্চিমী হিন্দী ভাষায় রচনা করেন। তাঁহার রচনা বাহুল্যবর্জ্জিত, সংযত। তাঁহার সময়ে গুরুমুখীর সৃষ্টি হয়; তাঁহার ভাষার প্রাদেশিকতা ও পারসী ভাষার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী শিখগুরুগণের অনেকেরই রচনা হিন্দী সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। অর্জ্জুন, গুরুগোবিন্দ প্রভৃতি হিন্দীভাষাতেও রচনা করিয়াছিলেন। শিখদের আদিগ্রন্থ 'গ্রন্থ সাহেবে' বহু প্রাচীন হিন্দী সাধক কবিগণের বাণী সংগৃহীত হইয়াছে এবং তাহার অধিকাংশই প্রাচীন হিন্দীতে রচিত।

এইস্থলে হিন্দীর ভাষার বিভিন্ন রূপগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। উত্তরভারতের এক বাংলা ও উড়িষ্যা ছাড়া অন্যসর্ব্বত্রই কোন না কোন রূপে হিন্দী প্রচারিত। পাঞ্জাবের গুরুমুখীকে মুখ্যতঃ হিন্দীরই কন্যা বলা যাইতে পারে; গুজরাতীর সৃষ্টিও ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে। গুজরাতের আদি কবিগণের লেখা প্রাচীন হিন্দী হইতে বিশেষ ভিন্ন নহে। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনে এগুলি সকলই বিভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছে। তাহা ছাড়া পশ্চিমে মাড়বাড়ী, পূর্ব্বে মৈথিলী, দক্ষিণে ছত্রিশগড়ী ও বুন্দেলী এগুলিকেও হিন্দীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু সাহিত্যের ভাষা মূলতঃ দুইটী dialect অবলম্বনে গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রথমটী ব্রজভাষা ও পূর্ব্ব হিন্দী (কাশী প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত ভাষা); দ্বিতীয়টী পরে খড়ী বোলীনামে পরিচিত হইয়াছে। মধ্যযুগের হিন্দী কবিতাগুলি সাধারণতঃ ব্রজভাষায় লিখিত হইয়াছিল। তাহার কারণ এইকালের হিন্দী সাহিত্যের পরিণতি বৈষ্ণব ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া লইয়াছিল এবং মথুরা ছিল সেই ধর্ম্মের কেন্দ্র। মথুরা ও বৃন্দাবন বৈষ্ণবের পরমতীর্থ; শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি। সুতরাং সেই প্রদেশের ভাষায় যে এই শ্রেণীর সাহিত্য রচিত হইবে তাহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই, তাহা ছাড়া ব্রজভাষার পক্ষে কবিগণের বাহন হইবার অন্য একটী বিশেষ কারণও ছিল; ব্রজভাষা ব্যাকরণের নিয়মাবলীর নাগপাশে ততটা বদ্ধ নহে; সুতরাং ব্রজভাষার সহায়তায় কবিগণ ভাষাহিসাবে যথেষ্ট নিরঙ্কুশতা লাভ করিয়াছিলেন।

এই কারণেই খড়ী বোলির কবি বিশেষ দেখা যায় না; ব্যাকরণনিগড়ে পদে পদে ব্যাহত হইয়া তাহা কবিকুলের বিভীষিকার কারণ হইয়াছিল। তাহা ছাড়া ব্রজভাষার একটী স্বাভাবিক মাধুর্য্য আছে। হাথরস্, মথুরা প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসিগণের কথা যিনি শুনিয়াছেন, তিনিই এ কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন। সুরদাস মীরাবাই প্রভৃতির কবিতা ব্রজভাষার ভূষণ।

এই যুগের মুসলমানগণও হিন্দী সাহিত্যের আদর করিতেন। তাহার প্রমাণ প্রথম যুগের অমীর খসরু, কুতবন সেখ ও পরবর্ত্তী যুগে মালিক মহম্মদ জ্যায়সী, রসখান্ প্রভৃতির রচনা। খসরুর 'পহেলিয়া' (প্রহেলিকা) হিন্দি সাহিত্যে বিখ্যাত। জ্যায়সীর পদ্মাবত রূপকচ্ছলে মনোরম প্রেমের কাহিনী; রসখানের বৈষ্ণব কবিতাগুলি বৈষ্ণবগণের পরম আদরের বস্তু ও মুসলমানের বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ হইয়া আছে।

মুসলমান শাসনের প্রথম আমলে হিন্দী সাহিত্য নানাভাবে রাজদরবারের অনুগ্রহলাভ করিয়াছিল। সাহজহাঁর সময়ে উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি হয়; তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হিন্দী সাহিত্য নানা মুসলমান কবির রচনায় পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। আকবর স্বয়ং সুকবি ছিলেন, এবং হিন্দী সাহিত্যের রসগ্রাহী ছিলেন। আকবররায়ের ছদ্মনামে রচিত তাঁহার কবিতা এখনও পাওয়া যায়। তাঁহার রাজসভায় বহু হিন্দী কবি আসন পাইয়াছিলেন। হাস্যরসিক বীরবলের রচিত গল্প এখনও হিন্দীতে প্রচলিত আছে। সভানায়ক তানসেনের রচিত বহু পদ এখনও পাওয়া যায়। আকবরের সভাসদ আব্দর রহিম খানখানা নিজেই বহু কবির পৃষ্টপোষক ছিলেন। কথিত আছে তিনি বিহারীলালের প্রত্যেক দোঁহার জন্য এক একশত, মোহর দিতেন। তৎরচিত নীতিবিষয়ক দোঁহাগুলি হিন্দী সাহিত্যে আদর

লাভ করিয়াছে। আকবরের দরবারের গংগ কবির খুব কম পদই এখন পাওয়া যায় কিন্তু ভিখারীদাসের মতে তিনি তুলসীদাসের সমকক্ষ ছিলেন। এইরূপে হিত হরিবংশ গংগ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবির কত রচনাই নষ্ট হইয়া গিয়াছে; এককালে যাহা শত শত লোকের আনন্দবর্দ্ধন করিত আজ তাহার চিহ্ন মাত্রও নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅনাথনাথ বসু

কবিতার স্বরূপ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কবিতার উদ্দেশ্য আছে আর একটা, যেটা অনেকে জানেন, অনেকে মানেন না; অনেকে বলেন, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি কবিতার উদ্দেশ্য। আর্টের জন্যই আর্টের অস্তিত্ব, আর্টের আর কোন উদ্দেশ্য নাই। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাহা নয়, আর্টের উদ্দেশ্য মহান্, তাহা শিক্ষাদান। এই শ্রেণীর কলাবিদ্‌রা বলিয়াছেন যে কবি শুধু কবি নন, তিনি আচার্য্যও বটেন। যাঁহারা পূর্ব্বমত পোষণ করেন তাঁহারা বলেন "শিক্ষা-পূর্ণ কবিতা" এই কথাটাতেই পরস্পরবিরোধী ভাবের সমাবেশ। শিক্ষা দিবে দর্শন, আনন্দ দিবে কবিতা।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখা যায় যে কাব্যরাজ্যের অমর সৃষ্টিগুলি শুধু আনন্দ দিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। সেই আনন্দ দান অতি সূক্ষ্ম, পরোক্ষ ও নিগূঢ় ভাবে মানুষের চিন্তারাজ্যে ও ভাবরাজ্যে নূতন রত্ন দান করিয়া গিয়াছেন। জগতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিই আনন্দদানের ভিতর দিয়া শিক্ষা দেন। কবির এক উদ্দেশ্য আনন্দ দান, কলার চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়া। আর এক উদ্দেশ্য জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর তাহাদের প্রধান দ্বন্দ্বগুলির সমস্যা পূরণ করিয়া জীবনকে রসময় করিয়া তোলা। এবং ইহাই তাঁহার শিক্ষাদান। কবি গাহিয়া যান ছন্দে, তালে, আপনহারা হইয়া; তিনি নিজের কল্পনা ও ভাবের তীব্র আলোকে সর্ব্বদা নিজেকে লুকাইয়া রাখেন; তাই আমরা কবির কাব্যকে পাই, কবিকে পাই না। কিন্তু কবি সেই গানের ভিতর দিয়াই সমস্যা পূরণ করেন, লোকশিক্ষা দেন কিন্তু জানিতে দেন না। দর্শনের সহিত কবিতার এই খানেই প্রভেদ। দর্শন শিক্ষা দেয় প্রত্যক্ষভাবে যুক্তির ভিতর দিয়া। কবিতা শিক্ষা দেয় পরোক্ষ ভাবে আনন্দের ভিতর দিয়া। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতার ভিতর অনেক সময় আমরা প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদানের একটা চেষ্টা দেখিতে পাই। সে জন্য ওয়ার্ডসওয়ার্থকে অনেক সময় ধর্ম্ম যাজক বলিয়া মনে হয়। অপর পক্ষে কবি শেলি এমন সমস্ত মহান্ সত্য মানবজাতির সম্মুখে ধরিয়াছেন যে তাহাদের তুলনা নাই। কিন্তু সে শিক্ষার উপর তাঁহার কবিত্বের সোনার কাঠির পরশ লাগিয়াছে। কল্পনার রঙিন্ জালটী তাঁহার কবিতাকে সর্ব্বদা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাই শেলির কবিতা সর্ব্বদাই রঙীন্ ও কল্পনাময়। তাই তাঁহার কবিতার অবাধ গতি, অনন্ত ঝঙ্কার, অফুরন্ত গান, অপ্রতিহত ধ্বনি!

রবীন্দ্রনাথের ভিতর এইরূপ "আর্ট" ও আনন্দের ভিতর দিয়া শিক্ষা দান আছে।

সময়ে সময়ে কবিতার পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্য্যের ভিতর ও আর্টের উৎকর্ষ সাধনের মধ্যে এই শিক্ষণীয় বিষয়টী এমন নিগূঢ়ভাবে লুকাইয়া আছে যে প্রথমে আমাদের কবিতার আর্টই মুগ্ধ করে। কিন্তু গভীর চিন্তার পর যখন আমরা ভাবময় কবির অন্তরের গোপন কথাটির সন্ধান পাই তখন আমরা অমিয়নির্ঝর আবিষ্কার করার মত এতটা পুলক অনুভব করি। প্রবীণ সাহিত্যিকের এই বিশেষতাটুকু তাঁহার পরিণত বয়সের রচনার ভিতর বেশী মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। "বলাকার" কবিতাগুলি বাংলা সাহিত্যের রত্নরাজি বলিলেও চলে। প্রতি কবিতার ভিতর কবি একটা "মিষ্টিক" ভাবের ভিতর দিয়া পাঠককে অনুপ্রাণিত করিতেছেন। নূতন যুগের নূতন আলোর সন্ধান বলিতেছেন আর উত্তেজনার উন্মাদনায় তাহাদিগকে উদ্‌বুদ্ধ করিতেছেন। দুর্দ্দিনের দুর্দ্দশাকে মানবের মত, বীরের মত আহ্বান করিতে হইবে। পুরাতনকে ধ্বংশ করিয়া নূতনকে সিংহাসনে বসাইতে হইবে তাই কবি বলিতেছেন

দূর হতে কি শুনিস্ মৃত্যুর গর্জ্জন ?
ওরে দীন ওরে উদাসীন,
ওই ক্রন্দনের কলরোল।
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।

কবিতা জীবনকে বুঝাইতে চায়। জীবনের জটিল রহস্যের সমাধান করিতে চায়। জীবনকে নূতন ভাবে, নূতন আলোকের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চায়। কিন্তু তাহা বুঝায় ভাব ও কল্পনার ভিতর দিয়া, সৌন্দর্য্য বিকাশের মধ্যে।

কবিতা হৃদয়কে স্পর্শ করে। মর্ম্মস্পর্শী বলিয়াই কবিতার আদর। এই যে মর্ম্মস্পর্শ করিবার ক্ষমতা ইহা কবিতা পায় কোথা হইতে? ইহা প্রধানতঃ আসে ছন্দের ভিতর দিয়া, ছন্দ আনে ঝঙ্কার, ছন্দ আনে গতি ও লীলা, ছন্দ আনে মনভোলান সুর। এই জন্যই গদ্য অপেক্ষা কবিতা এত আদরের। বিশ্বসাহিত্যের আদিম ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে কবিতা গদ্য অপেক্ষা বহুপূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিল। গদ্য যখন মানবমস্তিষ্কের চিন্তার মধ্যেও স্থান পায় নাই তখন বেদের সামগান, আবেস্তার স্তোত্রপাঠ চলিতেছে; প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগে অর্দ্ধসভ্য টিউটন্ ও অ্যাংগ্লোস্যাক্সনদের ভিতর "বিউলফ্" এর বীরত্বগাথা রাজসভায় গীত হইতেছে। কারণ এই যে মানব-মন শীঘ্র মুগ্ধ হয়, শব্দের ঝঙ্কারে, ভাষার মাধুর্য্যে ও ছন্দে। ভাবকে লীলায়িত করে ছন্দ। এইবার প্রশ্ন আসিতে পারে যে, ছন্দ আদবেই প্রয়োজনীয় কিনা। যদি ঝঙ্কার ও গতিই ছন্দের প্রাণ হয় এবং সেই ঝঙ্কার ও গতিই যদি অবশ্য প্রয়োজনীয় হয় তাহা হইলে গদ্যেও ত সেই ঝঙ্কার, উন্মাদনা ও গতি আনিতে পারা যায়। বিখ্যাত ইংরাজ সমালোচক ও কবি কোলরিজ ছন্দ যে কবিতার অবশ্য প্রয়োজনীয় তাহা স্বীকার করেন নাই। তিনি খুব জোরের সহিত বলিয়াছিলেন যে অতি উচ্চ অঙ্গের কবিতাও ছন্দ ব্যতীত সম্ভব হয়। উদাহরণ স্বরূপ তিনি প্লেটো, জেরিমি টেলার প্রভৃতির রচনা দেখাইয়াছেন। এই ভাবের সমলোচকদের সমালোচনার মূল সূত্রটী এই—

কবিতার প্রাণ ভাব ও কল্পনা, ভাবপ্রবণতা ইত্যাদি, এইগুলি যদি কোন একটী সাহিত্য বস্তুর ভিতর বেশীমাত্রায় বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে তাহাকেই কবিতা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ছন্দবহুল কবিতা অস্বাভাবিক হয়। তাহাতে স্বাভাবিক লীলা থাকে না। তাহাতে লেখকের বা কবির ছন্দের দিকেই বেশী ঝোঁক থাকে, ভাবের উপর জোর চলিয়া যায়। শেষে শব্দের ঝঙ্কারই কবিত্ব মনে হয়। কবিত্ব জিনিষটা অতি উচ্চ। তাহাতে শব্দ ঝঙ্কারের সম্বন্ধ অতি সামান্য। তাহা না থাকিলে বা ছন্দ পতন হইলেও কবিতা কবিত্ব হারায় না। এমন অনেক সমালোচক আছেন যাঁহারা কবিতার সমালোচনা করেন ছন্দের দিক দিয়া। আরম্ভ করেন ছন্দ পতন হইয়াছে বলিয়া। আবার অনেকে আছেন, যাঁহারা দেখেন ভাব ও কল্পনা; অতি মধুর ছন্দ থাকিলেও তাঁহারা তাহাকে 'কবিতা' আখ্যা দেন না, 'ছড়া'র মধ্যে ফেলেন। অনেক সময় মেয়েলি ছড়ার মধ্যে বেশ ঝঙ্কারময় ছন্দ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমালোচকদের মতে জগতে পদ্যকাব্যও বিরল নয়। এমন কি ইংরাজী সাহিত্যে এমন কয়েকজন আছেন (ডিকুইন্সি, ওয়াল্ট হুইটম্যান প্রভৃতি) যাঁহারা ছন্দ পর্য্যন্ত গদ্যের ভিতর প্রবেশ করাইয়াছেন।

কিন্তু তাই বলিয়া ছন্দকে নির্ব্বাসিত করা যায় না, কবিতার রাজ্য হইতে। গদ্যে গীতিমাধুর্য্যের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু কবিতার গীতিমাধুর্য্য এবং ভাবকল্পনার সমাবেশ সমভাবেই প্রয়োজন। গীতের ঝঙ্কার না থাকিলে কবিতা মর্ম্মস্পর্শী হয় না। ছন্দ না থাকিলে কবিতা চলিতে পারে না। ঝঙ্কার ও গতি কবিতাকে গদ্য হইতে পৃথক করিয়া দেয়। বনভূমির মধ্যে, পাহাড়ের গা বাহিয়া, অবাধ ঝঙ্কারে ঝরিয়া পড়া ঝর্ণার মত কবিতা অপ্রতিহত ভাবে চলিয়া যাইতে চায়, কোথাও বাধা পাইতে চায় না। কাজেই ইহা বলা যাইতে পারে যে গদ্যে ভাব, কল্পনা ও ভাব প্রবণতা সমভাবেই বর্ত্তমান থাকিলে তাহাকে "কবিত্বপূর্ণ" বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে "কবিতা" বলা যাইতে পারে না। কবিতার ভাষায় একটা ঝঙ্কারময় বিশেষত্ব থাকা চাই।

কবিতার ছন্দের আরও একটা সার্থকতা আছে। ছন্দের মাধুরীর সঙ্গে সঙ্গেই কবিতার সৌন্দর্য্যও বাড়াইয়া তুলে। "উর্ব্বশীর" মত ছন্দ না হইলে আমরা উর্ব্বশীর সৌন্দর্য্য অত নিগূঢ়ভাবে অনুভব করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠা রূপসীর বর্ণনা যদি তরল "ত্রিপদী"তে হইতে তাহা হইলে কবিতার সৌন্দর্য্য ত বর্দ্ধিত হইতই না, রূপসীকে মানস চক্ষুর সম্মুখে প্রত্যক্ষ দেখিতাম না হয়ত। তাই "উর্ব্বশী" পড়িয়া অবাক হই; তাই কীট্‌সের "সাইকির প্রতি" কবিতার মধ্যে ছন্দের অপরূপ লীলার ভিতর সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সাধন দেখিয়া আশ্চর্য্য হই। 'ছন্দ' কবিত্বভাব প্রকাশের প্রধান সহায়; তাই কবিত্ব যতই প্রগাঢ় হইতে থাকে ছন্দ ততই মধুর এবং বিশেষত্বপূর্ণ হইয়া অশ্রান্ত সুরে ঝরিয়া পড়ে।

শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বাংলার কথা-সাহিত্য
কবিবর দক্ষিণারঞ্জনের
বাংলার বুকের গান
ঠাকু'মার ঝুলি
ঠানদিদির থলে
এত বড় স্বদেশী
আর কি আছে ?
— রবীন্দ্রনাথ —
রাজার গান
চাষার গান
বুড়ার গান
শিশুর গান
বাংলার
মায়ের গান
ঠাকুরদাদার
ঝুলি
দাদামশায়ের
থলে
সকল বাংলা
'HAS MARKED OUT AN EPOCH
IN OUR LITERATURE'
The Bande-Mataram
—AUROBINDO—
স্ত্রীর গান
যুবার গান
বাংলার স্বপ্নপুরী—ঠাকুরমার ঝুলি—১॥৹
বংলার পবিত্র বই—ঠানাদ্দির থলে—১॥৹
বাংলার ভোরের পদ্ম
বাঙালীর মায়ের শঙ্খরব
দাদামশায়ের থলে—১॥৹
ঠাকুরদাদার ঝুলি—২৲
বাঙালীর আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা
কবিবর দক্ষিণারঞ্জনের বাংলার কথা-সাহিত্য
৩৯।১ কলেজ ষ্ট্রীট—আশুতোষ লাইব্রেরী—কলিকাতা ।

সূচী

ক্যালকাটা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌,—৬৫ নং সার্পেণ্টাইন লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নব্যভারত

দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড]   কার্ত্তিক, ১৩৩১   [৭ম সংখ্যা

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

(১১)

'দেবী চৌধুরাণী' 'আনন্দমঠে'র দুই বৎসর পরে (১৮৮৫) প্রকাশিত হয় ; এবং আনন্দমঠের ন্যায় ইহাতেও একদল doctrinaire বা উচ্চ-আদর্শ-অনুপ্রাণিত দস্যুর অবতারণা হইয়াছে। কিন্তু 'দেবী চৌধুরাণী'র উপাখ্যানের মধ্যে অসাধারণত্বের ঈষৎ স্পর্শ থাকিলেও, ইহাতে বাস্তবতারই প্রাধান্য ; ইহার মধ্যে অলৌকিক উপাদান যাহা আছে, তাহা আমাদের বাস্তব জীবনের সহিত সহজেই মিলিতে পারে, আমাদের অভিজ্ঞতার বা দেশের বাস্তব অবস্থার বিরোধী নহে। ভবানী পাঠক সত্যানন্দের ন্যায় অতিমানব মহাপুরুষের স্তরে উন্নীত হন নাই ; প্রফুল্লের নিষ্কামধর্ম্মশিক্ষার মধ্যে যাহা কিছু অবাস্তবতা আছে, তাহা সমগ্র উপন্যাসটীর উপর ছায়াপাত করিতে পারে নাই, ও ইহার বাস্তবতার সুরটী ঢাকিয়া ফেলে নাই। আমাদের সামাজিক জীবনের সহজপ্রীতি-পূর্ণ অথচ ক্ষুদ্র-বিরোধ-বিড়ম্বিত চিত্রটীই ইহার অধিকাংশ ব্যাপিয়া আছে। গ্রন্থশেষে কঠোর বৈরাগ্য ও দেশহিতব্রতের উপর গার্হস্থ্যধর্ম্মেরই জয় বিঘোষিত হইয়াছে। দেবী চৌধুরাণী তাহার সমস্ত রাণীগিরির ঐশ্বর্য্য ও দেশের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রীর উচ্চপদ ত্যাগ করিয়া, আবার গৃহধর্ম্মপালনের জন্য হরবল্লভের সঙ্কীর্ণ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল ; তাহার নিষ্কামধর্ম্মের শিক্ষা দীক্ষা এই নূতন ক্ষেত্রে নিয়োজিত করিয়া তাহাকে পরমসার্থকতায় মণ্ডিত করিয়া তুলিল। বৈকুণ্ঠেশ্বর ও ব্রজেশ্বরের মধ্যে যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছিল, তাহাতে ব্রজেশ্বরই জয় লাভ করিল ; বৈকুণ্ঠেশ্বর তাঁহার বিরাট সত্ত্বা সঙ্কুচিত করিয়া ব্রজেশ্বরের পশ্চাতে আত্মগোপন করিলেন, এবং ইহার পুরস্কারস্বরূপ রমণীহৃদয়ের যে দেবদুর্ল্লভ প্রেম ও ভক্তি উপহার পাইলেন, তাহাতে বোধ করি তাঁহার ক্ষোভের কোন কারণ থাকিল না। 'দেবী চৌধুরাণী'র আরম্ভ একেবারে সম্পূর্ণ বাস্তব ; সামাজিক কারণে নিরপরাধিনী স্ত্রীর পরিত্যাগ, আধুনিক বাস্তবতা-প্রধান লেখকলেখিকাদের বিশেষ প্রিয় ও নিতান্ত সাধারণ বিষয় ; কিন্তু ইহারা যেমন এই বিষয়ের মধ্য দিয়া সামাজিক অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়া ধরেন, বঙ্কিম তাহা করেন নাই ; তিনি সমস্ত বিষয়টীকে

একটী গোপন প্রেম ও নিগূঢ় সহানুভূতির ধারায় অভিসিঞ্চিত করিয়াছেন। আমাদের হিন্দু সমাজে একটী স্বাভাবিক সংযম, ভক্তিশীলতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার জন্ম বিদ্রোহের খুব তীব্র আত্মপ্রকাশ বড় একটা হইতে পায় না—সে একটা গোপন ক্ষোভের মতই বক্ষঃতলে নিরুদ্ধ থাকে। অবশ্য এই প্রতিরুদ্ধ ভাবের প্রভাব আমাদের জীবনের পক্ষে যে সর্ব্বদা হিতকর বা প্রকৃত পৌরুষ-বিকাশের পক্ষে অনুকূল, তাহা বলা যায় না, অনেক সময় দুই পরস্পর বিরোধী কর্ত্তব্যের মধ্যে যেটী আমরা বাছিয়া লই, তাহা কাপুরুষোচিত নির্ব্বাচনই হইয়া দাঁড়ায়, প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মত সাহস ও মনের বল আমাদের থাকে না বলিয়াই আমরা সহজের বাঁধা রাস্তাটাই অবলম্বন করিয়া ফেলি। এই সব চরিত্র আর্টের দিক্ দিয়াও খুব সার্থক হইয়া উঠে না; সামাজিক ব্যবস্থার দাসসুলভ অনুবর্ত্তিতা তাহাদিগকে আর্টের দিক্ দিয়াও ব্যক্তিত্ব-বর্জ্জিত ও বর্ণলেশশূন্য করিয়া ফেলে। বঙ্কিম ব্রজেশ্বরের চরিত্রে এই সমস্ত দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রেম ও পিতৃভক্তির একটী সুন্দর সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছেন, তাহাকে একদিকে উদ্ধত অবিনয় ও অপর দিকে নিষ্ঠুর হৃদয়-হীনতা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। স্কটের উপন্যাসসমূহের প্রায় সমস্তগুলিতেই নায়কের চরিত্র নীরস ও বিশেষত্বহীন হইয়া পড়িয়াছে, স্কট তাহাকে সর্ব্বগুণোপেত করিয়া দেখাইবার চেষ্টায় তাহার মধ্যে প্রাণের ধারা মন্দীভূত করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহার হৃদয়ের গভীর স্তর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারেন নাই। বঙ্কিমের কৃতিত্ব এই যে তিনি ব্রজেশ্বরকে সর্ব্বগুণসম্পন্ন করিয়াও তাহাকে ব্যক্তিত্বহীন করিয়া ফেলেন নাই। ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে আমাদের বাঙ্গালী সমাজের কতকগুলি বিশেষত্বই ব্রজেশ্বরের চরিত্রকে একটা বৈশিষ্ট দিয়াছে, ও তাহাকে স্কটের নায়ক হইতে পৃথক করিয়াছে। প্রথমতঃ তাহার বহুপত্নীকত্ব —সাগরবৌ, নয়ান বৌ, ও প্রফুল্লের সহিত তাহার ব্যবহারের বিভিন্নতা, ও তাহার দাম্পত্য ব্যাপার সম্বন্ধে ব্রহ্মঠাকুরাণীর সহিত সরস কথোপকথন ও পরিহাসকুশলতা তাহাকে আদর্শ নায়কের রক্তমাংসহীন অশরীরি অবস্থা হইতে রক্ষা করিয়াছে। যাহাকে একাধিক স্ত্রী লইয়া ঘর করিতে হয়, এবং সে বিষয় লইয়া ঠানদিদির সহিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ আলোচনা চালাইতে হয়, তাহার চারিদিকে একটা লঘু-তরল হাস্যরসের আবেষ্টন সৃষ্টি হয়; এবং সেই জন্যই আদর্শ-নায়কের অবাস্তবতার ছায়া তাহার গায়ে লাগিতে পায় না। প্রফুল্লের সহিত তাহার ব্যবহারের মধ্যেও একটা সংযত অথচ গভীর প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়, যাহা সর্ব্বপ্রকারে নাটকীয় উচ্ছ্বাস ও আতিশয্য-বর্জ্জিত; বিশেষতঃ এই বিষয়ে তাহার সহজ, সরল কথাবার্ত্তা স্কটের নায়কদের গুরুগম্ভীর সাড়ম্বর বাক্যবিন্যাসের অপেক্ষা গভীরভাবপ্রকাশের পক্ষে অধিক উপযোগী তাহাতে সন্দেহ নাই; আবার দশবৎসর বিচ্ছেদের পরে প্রফুল্লকে চিনিবার পরে তাহার দস্যুবৃত্তির প্রতি ঘৃণা ও তাহার প্রতি উদ্বেল প্রেমের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী দ্বন্দ্বটুকু তাহার বাস্তবতা বাড়াইয়া দিয়াছে। ব্রজেশ্বরের শ্বশুরবাড়ী হইতে রাগ করিয়া চলিয়া আসা, ও সাগরের প্রতি দুর্জ্জয় অভিমান; বজরাতে ডাকাইতির সময় তাহার নির্ভীক, সপ্রতিভ ভাব, ও দেবীচৌধুরাণীর বজরাতে বন্দীভাবে নীত হইবার পর দেবীর সহচরীদের হাতে তাহার দুরবস্থা—এই সমস্তই তাহাকে আদর্শ-

লোক হইতে নামাইয়া বাস্তব জগতের আসনে দৃঢ়তর করিয়া বসাইয়াছে, ও তাহার সহিত পাঠকের একটা মধুর-প্রীতিপূর্ণ সখ্যভাব স্থাপন করিয়াছে। আবার প্রবল, অপ্রতিরোধনীয় প্রেমের মধ্যে পিতৃভক্তির অক্ষুণ্ণ মর্য্যাদা রক্ষা, প্রফুল্লকে পাইবার লোভেও পিতার সহিত জুয়াচুরি করিতে অস্বীকার করা, তাহার চরিত্রের উপর একটা দৃপ্ত পৌরুষের উজ্জ্বল আলোকপাত করিয়াছে। মোটের উপর ব্রজেশ্বর উপন্যাসজগতের চরিত্রদের মধ্যে একটী বিশেষ সজীব সৃষ্টি। স্কটের নায়কেরা প্রায়ই রোমান্স জগতের জীব, সুতরাং প্রকৃত জগতে পদার্পণ করিয়াও তাহারা সম্পূর্ণ সজীবতা লাভ করিতে পারে না; ব্রজেশ্বর আমাদের বাস্তব জগতের প্রতিবেশী, দুই একটী অসাধারণ ঘটনার সম্মুখীন হইয়াও তাহার বাস্তবতার কোন হানি হয় নাই।

অবশ্য গ্রন্থের কেন্দ্রস্থ দুর্ব্বলতা ব্রজেশ্বরকে লইয়া নয়, প্রফুল্লকে লইয়া; এবং প্রফুল্লের প্রতি গ্রন্থকার যে অসাধারণত্বের আরোপ করিয়াছেন, তাহাই উপন্যাসটীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিচারবিতর্কের বিষয়। অধিকাংশ সমালোচকই গ্রন্থের এই অংশটুকু একটু বিস্ময়মিশ্রিত অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়াছেন; যেন এইখানে ঔপন্যাসিক বঙ্কিম হিন্দুধর্ম্মের উৎকর্ষ-প্রচারক বঙ্কিমের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। ৺পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এখানে ধর্ম্মতত্ত্বের উপর আদিরসের প্রাদুর্ভাবের পরিচয় দেখিয়াছেন; গ্রন্থকার প্রফুল্লকে নিষ্কাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, দশ বৎসর বনে জঙ্গলে দস্যুদলের সহিত ঘুরাইয়া, শেষে আবার তাহাকে হরবল্লভের অন্তঃপুরে আত্মগোপন করিতে পাঠাইয়াছেন; এই পরিণতির জন্য শিক্ষা-দীক্ষার এত সুদীর্ঘ আড়ম্বরের বা পাঠকের নিকট খুব উচ্চকণ্ঠে এই শিক্ষার মাহাত্ম্য-বিজ্ঞাপনের কোন প্রয়োজন ছিল না। বাস্তবিক এই সমস্ত সমালোচনার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে সত্য আছে; এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে উপন্যাসটীর মধ্যে পর্ব্বতের মূষিকপ্রসবের ন্যায় একটী হাস্যজনক অসঙ্গতি আছে। কিন্তু আর এক দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে বঙ্কিমের অপরাধ তত গুরুতর বলিয়া মনে হইবে না। প্রফুল্লের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারটী গ্রন্থের উপর ধর্ম্মতত্ত্বের একটা বাহ্য প্রলেপ মাত্র, ইহার প্রভাব কেন্দ্র-স্তর পর্য্যন্ত ভেদ করিতে পারে নাই। এই নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রফুল্লের প্রকৃত চরিত্রকে অভিভূত করিতে পারে নাই, তাহার প্রেমোন্মুখ সুকোমল নারীহৃদয়ের উপর কোন বদ্ধমূল আধিপত্য বিস্তার করে নাই। ইহার প্রবল আক্রমণের মধ্যেও তাহার রমণীসুলভ মাধুর্য্য ও উদ্বেল স্বামিভক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল—শিক্ষাকালের মধ্যে একাদশীতে মাছ খাওয়ার নিষেধে অবাধ্যতার দ্বারা এই অনিবার্য্য প্রেম-প্রাবল্যের একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিয়াছেন। প্রফুল্লের প্রকৃতি কোথাও এই গুরুভার দীক্ষার চাপে বাঁকিয়া চুরিয়া যায় নাই, শারদাকাশে লঘু মেঘখণ্ডের ন্যায়ই ইহাকে অবলীলাক্রমে বহন করিয়াছে, তাহার চরিত্র কোথাও পৌরুষ বা স্পর্দ্ধাযুক্ত হয় নাই; মধ্যে মধ্যে এক একটা দার্শনিক সূত্রের বিচারসত্ত্বেও কোথাও পাণ্ডিত্যবিড়ম্বিত হয় নাই; গ্রন্থকার গ্রন্থশেষে তাহাকে আদর্শবাদের সর্ব্বোচ্চ স্তরে, ভগবানের অবতারপদে, উন্নীত করিলেও, পাঠকের কল্পনা ও সহানুভূতি এরূপ ভীতিজনক পরিণতিতে কখনও সায় দিতে চাহে না; প্রফুল্লকে আমরা বরাবরই

স্বামি-প্রেম-বিহ্বলা আদর্শ গৃহলক্ষ্মীর মতই দেখি, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কোন আদর্শের সহিত তাহার সম্বন্ধ আমাদের রসানুভূতিকে নিবিড় ভাবে স্পর্শ করে না। সুতরাং যদিও প্রথম দৃষ্টিতে, একটা বাহ্য বৈচিত্র্যের দিক্ দিয়া ঔপন্যাসিক ধর্ম্মতত্ত্ববিদের নিকট আত্ম-সমর্পন করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই দ্বন্দ্বে ঔপন্যাসিকেরই জয় হইয়াছে ; কলাকৌশলের দিক্ দিয়া ঔপন্যাসিকের সৃষ্টি ধর্ম্মতত্ত্বের দ্বারা অভিভূত হইতে পায় নাই।

প্রফুল্লচরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব এই যে তাহার নিষ্কামধর্ম্মে দীক্ষা তাহাকে কখনও সন্ন্যাসের দিকে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করে নাই। এই বিষয়ে সীতারামের শ্রী চরিত্রের সহিত তাহার প্রভেদ। স্বামির সহিত বিচ্ছেদের পরে শ্রীর চরিত্র যেমন জয়ন্তীর প্রভাবে রমণীসুলভ মাধুর্য্য হারাইয়া এক শুষ্ক কঠোর আসক্তি-লেশশূন্য নিষ্কামধর্ম্মের মরু-বালুকার মধ্যে নিজ স্নেহ-প্রেমের শীতল ধারাকে প্রোথিত করিয়া দিয়াছিল, নিষ্কাম-ধর্ম্ম-দীক্ষিতা প্রফুল্লের চরিত্রে নিশির সাহায্য-ফলেও তাহা হইতে পায় নাই। বাস্তবিক জয়ন্তীর মধ্যে যেমন একটা শিক্ষয়িত্রীর পরুষ ভাব ও আত্ম-প্রাধান্য-মূলক গর্ব্বের রেশ আছে, নিশি-চরিত্রে তাহার অনুরূপ কিছুই নাই ; নিশির মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারকের সঙ্কীর্ণতা কিছু দেখিতে পাই না। সখীর সমবেদনা তাহাকে প্রফুল্লের সুখ-দুঃখ-ভাগিনী করিয়া তুলিয়াছে ; সে প্রথম হইতেই প্রফুল্লের অক্ষুণ্ণ স্বামিপ্রেম দেখিয়া তাহার সহিত একটা সন্ধি স্থাপন করিয়া লইয়াছে, প্রেমের প্রাকার-মূলে বেদান্তের dynamite লাগাইবার কোন চেষ্টা করে নাই ; বরঞ্চ নিজেকে বেদান্ত-ধর্ম্মে আচ্ছাদিত করিয়া অনসূয়া-প্রিয়ংবদার মতই সর্ব্বান্তঃকরণে সখীর প্রেমের দৌত্য-কার্য্যে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছে। এই জন্যই বোধ হয় নিশি জয়ন্তী অপেক্ষা গ্রন্থকারের অধিক স্নেহভাজন হইয়াছে ; জয়ন্তীর গুরুগিরির জন্যই তিনি তাহার বিরুদ্ধে একটা গূঢ় প্রতিশোধ লইতে ছাড়েন নাই, সন্ন্যাসিনীর গৈরিক-বস্ত্রের নীচে একটী স্বভাবদুর্ব্বল, লজ্জাসঙ্কুচিত নারীহৃদয় প্রকাশ করিয়া তাহাকে বেশ যথেষ্ট রকমই অপ্রতিভ করিয়াছেন ; আর নিশি-দিবার নিকট যে চেলা-কাঠের উপঢৌকন দিয়া বিদায় লইয়াছেন, তাহার অন্তরালে তাঁহার সহজ স্নেহ ও কৌতুকমণ্ডিত প্রীতিরই পরিচয় নাই।

গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্রগুলি বিশেষ আলোচনা-যোগ্য নহে। নিশি চরিত্রের আংশিক অবাস্তবতা সম্বন্ধে পূর্ব্ব এক প্রবন্ধেই আলোচনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মঠাকুরাণী, সাগর-বৌ, নয়ান-বৌ, ব্রজেশ্বরের মাতা সকলেই সজীব চরিত্র, দুই একটী স্বল্প-রেখাতেই তাহাদের বৈশিষ্ট্য বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভবানী পাঠক, আদর্শ বাদের বাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়াও, বাস্তবতা হারায় নাই ; প্রফুল্লের প্রতি তাহার অপ্রত্যাশিত সস্নেহ ব্যবহার ও তাহাকে নিষ্কামধর্ম্মে দীক্ষা-প্রদান, একটু অসাধারণ হইলেও আমাদের বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করে না। উপন্যাসটির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জটিল চরিত্র হরবল্লভের। হরবল্লভের কঠোর বৈষয়িকতা ও নির্ম্মম সমাজানু-বর্ত্তিতা, মিথ্যাঅপবাদকলঙ্কিতা পুত্রবধুর নির্দ্দয় প্রত্যাখ্যান ও তাহার সকরুণ অনুরোধের হৃদয়হীন উত্তর—আমাদের বাঙ্গালী পরিবারের একটী সুপরিচিত শ্রেণী (type) কথা মনে করাইয়া দেয় ; কিন্তু দেবী চৌধুরাণীর প্রতি তাহার অমানুষিক বিশ্বাসঘাতকতা, ও দেবীর

নিকট বন্দী হইবার পর তাহার নিতান্ত হেয় কাপুরুষতা তাহাকে সাধারণ সঙ্কীর্ণমনা বাঙ্গালী গৃহকর্ত্তার শ্রেণী হইতে বিভিন্ন করিয়া চরম দুর্ব্বৃত্ততার অতল গহ্বরে নামাইয়া দিয়াছে ও ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তিকে আরও কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় নিক্ষেপ করিয়াছে। অথবা এই হরবল্লভের উপর গ্রন্থকারের যথেষ্ট আবজ্ঞার সহিত অনেকটা অনুকম্পার ভাবও মিশ্রিত হইয়াছে, তাহার আত্মাবমানার গভীরতাই তাহাকে আমাদের ঘৃণা হইতে রক্ষা করিয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বিষয় করিয়া তুলিয়াছে।

প্রকৃতিবর্ণনাতেও বঙ্কিম নিজ কবিজনোচিত অনুভূতির পরিচয় দিয়াছেন। চন্দ্রালোকে বর্ষা-স্ফীতা ত্রিস্রোতার চিত্র খুব উচ্চ অঙ্গের বর্ণনাশক্তির নিদর্শন; কিন্তু ইহা কেবল বর্ণনা-শক্তির পরিচয় দেয় না; ইহাতে মানবমনের সহিত বহিঃপ্রকৃতির একটা গূঢ় অন্তরঙ্গ সহানুভূতির ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। দেবীর উদ্বেগ প্রেমোন্মুখ হৃদয়ের সহিত এই অন্ধকারমিশ্র চন্দ্রালোকের তলে প্রবাহিতা বেগবতী নদীর একটী সুন্দর সুসঙ্গতি ও নিগূঢ় ভাব-গত যোগ রহিয়াছে। বঙ্কিমের প্রকৃতিবর্ণনা কেবল বহিঃসৌন্দর্য্যের নিপুণ সমাবেশমাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই, বহিঃসৌন্দর্য্যের পশ্চাতে যে ভাবের ব্যঞ্জনা রসগ্রাহী দর্শকের মনের সহিত একটা গূঢ় ঐক্য স্থাপন করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে বঙ্কিম তাহাকে অন্তরাল হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছেন, ও প্রকৃত কবির ন্যায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

অবশ্য গ্রন্থের অসাধারণ ঘটনাগুলি যে সম্ভাবনীয়তার দিক্ হইতে সর্ব্বত্র প্রমাদশূন্য হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। প্রফুল্লের অতর্কিত অন্তর্দ্ধান যে ভাবে তাহার মৃত্যু-সংবাদে রূপান্তরিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, তাহা একটু অবিশ্বাস্য বলিয়াই মনে হয়; এবং রূপান্তরের প্রকৃতি ও সাধারণ হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত গতিরই অনুসরণ করিয়াছে। সাধারণতঃ প্রাকৃতিক ঘটনাই অতিপ্রাকৃতের স্পর্শে অলৌকিকে রূপান্তরিত হয়, ইহার বিপরীত রকমের পরিবর্ত্তন বড় একটা হয় না। সাধারণ রোগে মৃত্যু অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের দ্বারা ভৌতিক ঘটনাতে রূপান্তরিত হইতে পারে; কিন্তু একটী ভৌতিক ঘটনা যে লোকমুখে প্রচারিত হইতে হইতে তাহার অতিপ্রাকৃত অংশ বর্জ্জন করিয়া একটী স্বাভাবিক মৃত্যুতে রূপান্তরিত হইবে, তাহা নিতান্ত বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ যেখানে দুর্ল্লভচন্দ্র ও ফুলমণির নিকট প্রফুল্লের প্রকৃত অবস্থা অবিদিত নাই, সেখানে যে তাহার অলীক মৃত্যুসংবাদ একেবারে নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে তাহার স্বগ্রামে ও শ্বশুরালয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা আমাদের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, অথচ এই অসন্দিগ্ধ বিশ্বাসের উপরই উপন্যাসটী প্রতিষ্ঠিত; এই মৃত্যুসংবাদের উপরেই ব্রজেশ্বরের গভীর প্রেম স্থিতিলাভ করিয়াছে! প্রফুল্ল ডাকাইতের দ্বারা আহত হইয়াছে এই সংবাদ পাইলে ব্রজেশ্বরের হৃদয়ে এত গভীর দাগ পড়িত কি না সন্দেহ। আর ইংরাজ পল্টনের হাত হইতে প্রফুল্লের অনুকূল দৈববশে উদ্ধারলাভেও আকস্মিকতার মাত্রা যেন একটু অধিক বলিয়াই মনে হয়; বিশেষতঃ তাহার উদ্ধারের জন্য প্রাকৃতিক আনুকূল্যের উপর একান্ত নির্ভর ও বিপৎকালে নিষ্কাম ধর্ম্মশিক্ষার পরিচয় দান একটু আতিশয্য-দুষ্ট হইয়াছে। তবে এইখানেও প্রফুল্লের সমস্ত তেজস্বিতা ও নিষ্কামধর্ম্মাচরণের মধ্যে তাহার রমণীসুলভ কোমলতা ও চরিত্রের অবর্ণনীয় মাধুর্য্য অক্ষুণ্ন রহিয়াছে।

মোটের উপর দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসটী অসাধারণ ঘটনাভারাক্রান্ত ও ধর্ম্মপ্রভাবগ্রস্ত হইলেও একটী বাস্তব জীবনচিত্র বলিয়াই আমাদিগকে আকর্ষণ করে; এবং ইহার মধ্যে যে একটা প্রবল ভাবাবেগ বহিয়া গিয়াছে, তাহাই ইহার বাস্তব চিত্রের উপর একটা গভীরতা ও গৌরব আনিয়া দিয়াছে।

'সীতারাম' (১৮৮৭) 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণীর সহিত একশ্রেণীভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে—তিনখানি উপন্যাসেই ধর্ম্মতত্ত্বব্যাখ্যা ঔপন্যাসিক চরিত্রচিত্রণের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 'আনন্দমঠে' আদর্শবাদ উপন্যাসের বাস্তব স্তরকে প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, 'দেবী চৌধুরাণীতে' ধর্ম্মতত্ত্ববিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রবল হইয়াও বাস্তব চরিত্র-চিত্রণকে অভিভূত করিতে পারে নাই। 'সীতারামে'ও একটা ধর্ম্মতত্ত্বের সমস্যাই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয়; কিন্তু এখানেও ধর্ম্মতত্ত্বের প্রাধান্য ঔপন্যাসিকের অন্তর্দৃষ্টিকে ক্ষীণ করিতে পারে নাই, পরন্তু চরিত্রের সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তনসংঘটনে ও তাহার কারণবিশ্লেষণে গ্রন্থকার আশ্চর্য্য নিপুণতাই দেখাইয়াছেন।

এখানে বঙ্কিমের ধর্ম্মতত্ত্বালোচনার প্রকৃতি ও উপন্যাসের উপর ইহার প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিষ্কার করিয়া লওয়া প্রয়োজন। ইংরেজী উপন্যাসে ধর্ম্মতত্ত্বালোচনার প্রভাব এতই কম, এমন কি উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাসের বিরুদ্ধে এমন একটা বদ্ধমূল সংস্কার আছে, যে ইংরাজী-সাহিত্যপুষ্ট আমাদের রুচি সহজেই, উপন্যাসের সহিত ধর্ম্মতত্ত্বের সম্পর্ক অস্বাভাবিক ও কলানৈপুণ্যের দিক হইতে ক্ষতিকর, এইরূপ একটা ধারণা করিয়া বশে। অবশ্য এইরূপ ধারণা করার জন্য যে যথেষ্ট হেতু নাই তাহা বলিতেছি না; অধিকাংশ স্থানেই দেখা যায় যে লেখক তাঁহার প্রতিপাদ্য ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেই এত নিবিষ্টচিত্ত হইয়া পড়েন, যে তিনি তাঁহার সৃষ্টচরিত্রগুলিকে সজীব করিয়া তুলিতে ভুলিয়া যান, ও তাহাদের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ও পরিণতি তাঁহার মৌলিক উদ্দেশ্যের দ্বারা অযথারূপ নিয়ন্ত্রিত করেন—তাঁহার চরিত্রগুলি অনেকটা নৈতিক গুণের মূর্ত্ত বিকাশ হইয়া পড়িতে চাহে। সুতরাং এই শ্রেণীর উপন্যাসের বিরুদ্ধে আমাদের একটা সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক; কিন্তু এই স্বাভাবিক সন্দেহ যদি অযৌক্তিক সংস্কারে গঠিত হইয়া প্রতিভাবান লেখকের রসাস্বাদনের পক্ষে বাধা উপস্থিত করে, তাহা হইলে সমালোচনার উদ্দেশ্য ও আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়। 'সীতারামে' সেরূপ কোন বাধা উপস্থিত হইয়াছে কি না, তাহা তাহা আমাদিগকে ধীরভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

সীতারাম উপন্যাসে ধর্ম্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যা যে বঙ্কিমের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাহা অবিসংবাদিত, ইহার মুখবন্ধে গীতা হইতে উদ্ধৃত শ্লোক সমষ্টিই তাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ! গীতা আলোচনাফলে বঙ্কিমের মনে গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য খুব গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার শেষ জীবনের উপন্যাসগুলিতে ঔপন্যাসিক চরিত্রসৃজনদ্বারা ও মানবজীবনের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে তিনি এই ধর্ম্মের বিশেষত্ব, ইহার আদর্শ ও সাধনপথে বিঘ্নসমূহ ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কথাটা আর্টের দিক হইতে শুনিতে ভাল লাগিবে না; কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা কথা মনে করিলে এবিষয়ে আমাদের অনেকটা সন্দেহ নিরসন হইবে।

ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা যে মানবমনস্তত্ত্ববিদ্ ছিলেন না, এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই—প্রত্যুত তাঁহাদের অনেক উপদেশ অনুশাসন মানবমনের গভীর জ্ঞানের উপরই প্রতিষ্ঠিত। বিশেষতঃ মনের উপর পাপের সূক্ষ্ম প্রভাব ও ক্রমবৃদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের কল্পনা বিলক্ষণ সচেতন ছিল বলিয়াই মনে হয়। সীতারাম উপন্যাসে একটি স্বভাব-মহান্ চরিত্রের উপর এই পাপের সূক্ষ্ম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও চরম পরিণতির একটী বেশ গভীর আলোচনা হইয়াছে। সীতারাম পড়িতে পড়িতে যদি আমরা ইহার গীতোক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব ভুলিয়া যাই, তাহা হইলেও ইহার কলাসৌন্দর্য্যের ও human interest এর কোন হানি হয় না। যাঁহারা উপন্যাসের সহিত ধর্ম্মতত্ত্বের একটি চির বিচ্ছিন্ন বিরোধের কল্পনা করেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই 'সীতারাম'কে ধর্ম্মতত্ত্বের আবেষ্টন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আধুনিক কালের ধর্ম্মপ্রভাবমুক্ত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের আবেষ্টনের মধ্যে অনায়াসেই ফেলিতে পারেন। সীতারামের মধ্যে যে দুর্ব্বলতার বীজ নিহিত ছিল, তাহা মনুষ্য হৃদয়ের একটী সাধারণ, চিরন্তন মোহ; গীতাকার কেবল তাহাকে একটী বিশেষ সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন উহা হইতে উদ্ধার পাইবার সাধন পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র। বঙ্কিম তাঁহার সমৃদ্ধ কল্পনাভাণ্ডার হইতে এই বাস্তব মোহের একটী উদাহরণ লইয়াছেন; এবং যদিও সীতারামের জীবন-সমস্যার উপর হিন্দু-সমাজ ও ধর্ম্মতত্ত্বের প্রভাব আসিয়া ইহাতে জটিলতা করিয়া তুলিয়াছে—শ্রীর সহিত তাহার সমস্ত সম্পর্কই হিন্দুর সামাজিক ও ধর্ম্মগত বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—তথাপি তাহার নৈতিক অধঃপতনের চিত্রাঙ্কণ ও ইহার কারণ বিশ্লেষণ সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে। নিতান্ত বাস্তবপ্রিয় পাঠকেরও এ বিষয়ে অসন্তুষ্ট হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই।

অবশ্য বঙ্কিম ধর্ম্মতত্ত্ব ও অতি-প্রাকৃতিক দিক্‌টা একেবারে অবহেলা করেন নাই—শ্রী ও জয়ন্তীর ভিতর দিয়া এই দিক্‌টা বেশ যথেষ্টই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শ্রীর সহিত সীতারামের সম্পর্কের বিশেষত্বটুকু হিন্দু জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশ্বাসেরই ফল; আবার উপন্যাসের শেষের দিকে জয়ন্তী-শিষ্যা শ্রীর সন্ন্যাসের প্রতি অমায়িক নিষ্ঠাই সীতারামের চিত্ত বিভ্রম জন্মাইয়া তাহার অধঃপতনের গতি দ্রুততর করিয়া দিয়াছে। কিন্তু সীতারামের নিজের জীবনের উপর ধর্ম্মতত্ত্বের লক্ষিত হয় না। বঙ্কিমের কৃতিত্ব এই যে তিনি ধর্ম্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যাকে জীবনের মনস্তত্ত্বমূলক বিশ্লেষণের সহিত এমন নিশ্চিহ্নভাবে মিলাইয়া দিয়াছেন। সীতারামের অপরিমিত রূপ-মোহ কিরূপে ধীরে ধীরে তাঁহার মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিল ও অনুকূল ঘটনাযোগে দুর্দ্দমনীয় হইয়া তাঁহার রাজত্ব ও মনুষ্যত্বের যুগপৎ ধ্বংস সাধন করিল তাহার কাহিনীর রসোপলব্ধির জন্য আমাদের ধর্ম্মতত্ত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই।

সীতারামের চরিত্রে অতৃপ্ত রূপ-মোহের দুর্ব্বলতা যে প্রথম হইতেই সুপ্ত হইয়া ছিল, তাহা বঙ্কিম বিপন্না সাহায্যপ্রার্থিনী শ্রীর সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ কালেই একটী সূক্ষ্ম অথচ অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন।—"তুমি, শ্রী, এত সুন্দরী"। পিতৃআজ্ঞা-অনুসারে নিরপরাধিনী শ্রীকে নিশ্চিন্তভাবে পরিত্যাগ, ও তাহার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য বোধের সম্পূর্ণ

বিসর্জ্জন—ইহাও চরিত্র দৌর্ব্বল্যেরই সূচক। তাহার পর যে এত দিনের বিস্মৃত কর্ত্তব্যজ্ঞান এরূপ উচ্ছ্বসিত ভাবে জাগিয়া উঠিল, শান্ত হৃদয়ে যে গভীর তরঙ্গ-বিক্ষোভ জন্মিল, তাহার মূলে, সমবেদনা, আত্মগ্লানি প্রভৃতি সমস্ত উচ্চভাবকে ছাপাইয়া যে শক্তি ছিল তাহাও এই রূপ তৃষ্ণা। গঙ্গারামের জন্য তাঁহার অভাবনীয় আত্মোৎসর্গের প্রস্তাবও এই মূল ভাব হইতে প্রসূত। অবশ্য রূপমোহ যতই প্রবল হউক না কেন, তাহা সাধারণ প্রকৃতির লোককে এরূপ আত্মোৎসর্গে প্রণোদিত করিতে পারে না। সীতারামের চরিত্রের অসাধারণ মহত্ব না থাকিলে কোন শক্তিই তাঁহার মনকে এত উচ্চ-সুরে বাঁধিয়া দিতে পারিত না। সুতরাং এই দৃশ্য যেমন একদিকে সীতারামের স্বাভাবিক মহত্ত্বের পরিচয় দিতেছে, তেমনই অন্যদিকে তাঁহার উপর রূপমোহের প্রবল প্রভাবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে—এখানে তাঁহার মহত্ত্ব ও দুর্ব্বলতা একই সূত্রে গ্রথিত হইয়া দেখা দিয়াছে। তার পর যুদ্ধের সময় শ্রীর সিংহবাহিনী মূর্ত্তি সীতারামের অন্তরস্থ সুপ্ত উচ্চাভিলাষের দ্বারে আঘাত করিয়াছে, তাঁহার স্বাধীনতার কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া শ্রীর প্রতি আকর্ষণকে নিবিড়তর করিয়া তুলিয়াছে। রূপমুগ্ধ সীতারাম এই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া তাহার নেশাকে আরও রঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছে, ও তাহার রূপমোহের উপর আর একটা উন্নততর আকাঙ্ক্ষার প্রলেপ দিয়াছে।

তারপর শ্রীর সহিত প্রথম বোঝা-পড়া; শ্রী:কে পরিত্যাগ করিবার কারণ প্রকাশ করিতেই স্বামির অমঙ্গল-ভয়-ভীতা শ্রীর অন্তর্দ্ধান। এই অপ্রাপণীয়া শ্রী সীতারামের ধ্যানে আরও উজ্জ্বলতর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিল, শ্রী সীতারামের নিকট অজ্ঞাত অনন্তের বিচিত্র-রহস্য-মণ্ডিত হইয়া উঠিব। রূপমোহ চরম পরিণতি প্রাপ্ত হইল; সমস্ত কল্পনা ও ধ্যান ধারণার উপর জুড়িয়া বসিয়া জীবনের উপর প্রবলতম প্রভাব হইয়া দাঁড়াইল।

এদিকে গঙ্গারামের ব্যাপার লইয়া যে সামান্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা, তাহা একটা ক্ষুদ্র স্বাধীনতা-সংগ্রামের গৌরব ও ব্যাপকতা লাভ করিয়া বসিল। সীতারাম অনেকটা অজ্ঞাতসারে, অনেকটা ঘটনার প্রবল স্রোতে বাধ্য হইয়া আপনাকে একজন স্বাধীন-রাজ্যপ্রতিষ্ঠাতার আসনে আসীন দেখিতে পাইলেন। এই উত্তেজনা ও কোলাহলের সময় শ্রীর চিন্তার বাহ্য প্রকাশ কতকটা মন্দীভূত হইয়া থাকিল; আত্মরক্ষা ও রাজ্যস্থাপনের প্রবল প্রয়োজন সীতারামকে শ্রীর চিন্তা হইতে কতকটা অপসৃত করিল। কিন্তু এ সময়েও যে তাহার অন্তরস্থ ইচ্ছা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় যে কেবল অবসরেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল, গ্রন্থকার তাহার প্রচুর নিদর্শন দিয়াছেন।

তার পর আর এক দৃশ্যে সীতারামের শ্লাঘ্যতম গৌরবে শিখরে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অন্তরস্থ দুর্ব্বলতার বীজে নব্বারিনিষেক হইল। যে দিন ছদ্মবেশী সীতারাম সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী ও শ্রীর সাহায্যে একাকী দুর্গরক্ষা করিয়া অমানুষিক বীরত্বের পরিচয় দিলেন, সেই দিনই তাঁহার চরম গৌরবের দিন, ও শ্রীর সহিত শুভতম সম্মিলনের লগ্ন। সেই শুভদিনের পর হইতেই তাঁহার সাংসারিক ও নৈতিক উভয়বিধ অধঃপতনের আরম্ভ হইল। রাজ্য-রক্ষার পুরস্কার-স্বরূপ যে রত্ন তিনি পাইলেন, তাহা তাঁহার জীবনে দীর্ঘকালসঞ্চিত দাহ্যপদার্থের নিকট অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতই আসিয়া পড়িল। আবার রমার গঙ্গারামঘটিত কলঙ্ক-ব্যাপার ও তাহার প্রকাশ্য দরবারে বিচার, একদিকে সীতারামের মনে একটা গভীর বিক্ষোভ জাগাইয়া, ও

অন্যদিকে রমার প্রতি একটা বদ্ধমূল বিরাগের সৃষ্টি করিয়া, তাহাকে উন্মত্ত, সর্ব্বগ্রাসী প্রেমের আবর্ত্তের দিকে আরও অগ্রসর করিয়া দিল।

অতঃপর অভাবনীয়রূপে পরিবর্ত্তিতা সন্ন্যাসিনী শ্রীর সহিত মিলনের পর সীতারামের চির পোষিত রূপ-তৃষ্ণা অপ্রত্যাশিত বাধা পাইয়া সাংঘাতিক বিষের ন্যায় তাঁহার সমস্ত মনে ছড়াইয়া পড়িল, তাঁহার নৈতিক জীবনের ভিত্তি পর্য্যন্ত টলমল করিতে লাগিল। গ্রন্থকার অতি সুন্দরভাবে এই প্রতিরুদ্ধ প্রবৃত্তির ভীষণ ক্রিয়া সীতারামের কার্য্য-কলাপের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 'বিষবৃক্ষে' জমিদার নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীর প্রেমে পড়িয়া ও আপনার সহিত যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া মদ খাইতে লাগিলেন, ও দুই একটা নিরীহ ভৃত্যকে প্রহার করিয়া নিজ অন্তর্দ্দাহের পরিচয় দিলেন। স্বাধীন রাজা সীতারাম, নিজ পরিণীত ভার্য্যার উপর স্বামীর অধিকার প্রয়োগ করিতে না পারিয়া উগ্রতর রক্তের নেশায় মাতাল হইয়া উঠিলেন, ও নিজ উন্মত্তপ্রায় অস্থিরমতিত্বে একটা রাজত্বের উপর বিশৃঙ্খলার স্রোত বহাইয়া দিলেন, এখনও সংযমের শেষ বন্ধন ছিন্ন হয় নাই; শ্রীর প্রতি প্রকৃত প্রেম সীতারামকে পাশবিক অত্যাচারের পাপ হইতে রক্ষা করিয়াছিল; এখনও পর্য্যন্ত তাহার অপরাধ কর্ত্তব্য-চ্যুতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল, অত্যাচার ও পাপাচরণের চরম সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই; এই কর্ত্তব্যচ্যুতির ফলেই একদিকে রমা মরিল, অন্যদিকে চন্দ্রচূড় তিরস্কৃত হইলেন ও রাজকর্ম্মচারীরা শূলে গেল। তবে এখন পর্য্যন্ত সীতারাম নিজেরই ক্ষতি করিয়াছেন; ইন্দ্রিয়দাস পশুতে পরিণত হন নাই।

কিন্তু এই চরম দুর্গতি ও অধঃপতনও বাকী রহিল না। শ্রী, কতকটা নিজ সন্ন্যাস-পালন-ক্ষমতায় আস্থা হারাইয়া, কতকটা রাজাকে অধঃপতনের গতিরোধ করিবার জন্য, জয়ন্তীর পরামর্শে ও তাহারই ছদ্মবেশের সাহায্যে প্রমোদ-উদ্যান হইতে অন্তর্হিতা হইল। সীতারামের ক্ষিপ্ততা চরমে উঠিল; বিজাতীয় ক্রোধ আসিয়া তাহাকে হিংস্র পশুর ন্যায় জয়ন্তীর প্রতি দংষ্ট্রা-নখর-প্রয়োগে উত্তেজিত করিল; অন্তঃরুদ্ধ রূপ-তৃষ্ণা এইবার প্রচণ্ড সর্ব্বগ্রাসী কামানলের শিখায় উঠিল; আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত হিন্দুরাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা মহিমাময় সীতারাম একটা ঘৃণিত কামার্ত্ত পশুতে পরিণত হইলেন, সীতারাম চরিত্রের এই ভীষণ পরিবর্ত্তন অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দ্বারা আমাদের সম্মুখে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক করিয়া ধরা হইয়াছে; সীতারামের এই অধঃপতনের চিত্র সর্ব্বতোভাবে বীর ম্যাক্‌বেথের রক্তপিপাসু পশুতে পরিণতির সহিত তুলনীয় এবং এই চরিত্রবিশ্লেষণে বঙ্কিম সগৌরবে ধর্ম্মতত্ত্বের ক্ষীণতম প্রভাব হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছেন।

অবশ্য শেষ দৃশ্যে আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে দুর্গপ্রাচীর-ভেদ-কারী কামানের শব্দ ও তাহার প্রতিধ্বনির মধ্যে সীতারামের নৈতিক পুনরুদ্ধার সাধন করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার গভীর ধর্ম্মবিশ্বাসেরই পরিচয় দিয়াছেন। এইখানে ইংরেজ কবির সহিত হিন্দু গ্রন্থকারের প্রভেদ। ইংরেজ জাতি এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনে তাদৃশ বিশ্বাস করে না। সেইজন্য শেকশ্‌পিয়ার তৃতীয় রিচার্ড ও ম্যাকবেথকে হিংস্র পশুবৎ রাখিয়াই শমনসদনে পাঠাইয়াছেন, তাহাদের নৈতিক পুনরুদ্ধারের কোন চেষ্টা করেন নাই। অবশ্য মৃত্যুর প্রাক্কালে এই সমস্ত অধঃপতিত

বীরের মুখে কবি যে সমস্ত গভীর ভাব ও উদাস খেদপূর্ণ বাণী দিয়াছেন, তাহাতে ইহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে তাহাদের মধ্যে নিস্ফল ক্ষোভ ও অনুতাপের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্কিমের সীতারাম এক মুহূর্ত্তে তাঁহার সমস্ত দৌর্ব্বল্য ও চরিত্র গ্লানি ধূলিজঞ্জালবৎ ঝাড়িয়া ফেলিয়াছেন; গ্রন্থের এইরূপ পরিসমাপ্তি করিয়া বঙ্কিম তাঁহার জাতিগত ও ধর্ম্মবিশ্বাসগত বৈশিষ্ট্যেরই পরিচয় দিয়াছেন; ইহাতে বাস্তবতার বিশেষ হানি হইয়াছে বলিয়া মনে করার কোন কারণ নাই। পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে প্রত্যেক জাতির একটা বিশেষ রকম রোমান্সের দিকে প্রবণতা আছে, এবং এই রোমান্সের প্রকৃতি তাহার বাস্তব জীবনের বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে। ইউরোপীয় রোমান্স আমাদের বাঙ্গালী-জীবনের আবেষ্টনের মধ্যে ঠিক মিলিবে না; আমাদের জাতিগত ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপরই আমাদের রোমান্সের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই মানদণ্ডে বিচার করিতে গেলে সীতারামের শেষ মুহূর্ত্তের পরিবর্ত্তনের যে রোমান্স তাহা আমাদের বাস্তব জীবনের অবস্থার সহিত বেশ সুসঙ্গতই হইয়াছে। সীতারামের পূর্ব্বজীবনের স্বাভাবিক মহত্বও এই পুনরুদ্ধারের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছে। বিশেষতঃ বঙ্কিম যেরূপ গভীর আবেগ, ও সংযত অথচ মর্ম্মস্পর্শী সহৃদয়তার সহিত এই পরিবর্ত্তনের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে যে তিনি কেবল একটা সুলভ ভাবাতিরেক (sentimentality) চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছেন, এরূপ সন্দেহের কোন অবসর থাকে না; তাঁহার অস্থিমজ্জাগত গভীর ধর্ম্মভাবই এই দৃশ্যের প্রত্যেক ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সীতারামচরিত্র বঙ্কিমের অপূর্ব্ব সৃষ্টি; সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ও বাস্তবের সহিত রোমান্সের সংমিশ্রণের সুসঙ্গিতে ইহা পাশ্চাত্য উপন্যাসের যে কোন সমজাতীয় চরিত্রের সহিত সমকক্ষতার স্পর্দ্ধা করিতে পারে।

রোমান্সের যাহা কিছু আতিশয্য ও অসঙ্গতি, তাহা শ্রী ও জয়ন্তীর যুগ্ম-চরিত্রের উপর দিয়াই ব্যয়িত হইয়াছে। জয়ন্তীকে আমাদের খুব সূক্ষ্মভাবে দেখিবার প্রয়োজন নাই —সে রোমান্স-প্রাসাদের একটা আবশ্যকীয় গৃহ-সজ্জা মাত্র। শ্রীকে সন্ন্যাসে ব্রতী করিবার জন্য ও সীতারামের জীবনে একটা প্রলয়-ঝটিকা তুলিবার জন্য এরূপ একটা অবিমিশ্র-সংসার-বন্ধনশূন্যা, প্রলোভনাতীতা সন্ন্যাসিনীর প্রয়োজন ছিল; গ্রন্থকার নিজ কল্পনার ইন্দ্রজালবলে এরূপ একটী সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণা সন্ন্যাসিনীকে পাঠকের সম্মুখে হাজির করিয়াছেন—তাহার অতীত জীবনের কোন আভাস দেন নাই। পাঠকের কৌতূহল ও অনুসন্ধানস্পৃহা যে লেখক-নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অসুবিধাজনক প্রশ্ন উত্থাপন করিবে বঙ্কিমের এরূপ অভিপ্রায় ছিল না; এবং রোমান্সের জগতে এরূপ তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসাপ্রবৃত্তিও অনেকটা অনধিকার-প্রবেশ-কারী বলিয়াই বিবেচিত হইবার যোগ্য। যেমন আমাদের দ্বার-প্রান্তপ্রবাহিনী নদী কোন সুদূর পর্ব্বতশিখর হইতে নামিয়া আসিয়া আমাদের প্রাত্যহিক জীবনস্রোতের সহিত আপনাকে মিলাইয়া দেয়, উহার অতীত জীবন সম্বন্ধে আমরা কোন প্রশ্নই উত্থাপন করি না, সেইরূপ জয়ন্তীও অজ্ঞাতের রাজ্য হইতে আসিয়া উপন্যাসের কর্ম্মস্রোতের সহিত মিশাইয়া গিয়াছে। সুতরাং জয়ন্তীতে বিশেষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দেখিবার আশা আমরা করিতে পারি না। কিন্তু বঙ্কিম এরূপ একটী গৌণ রকমের চরিত্রেও যথেষ্ট মাধুর্য্য ও human interest সঞ্চার করিয়াছেন।

অবশ্য শ্রীর সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষা ও তাহার চরিত্রগত গভীর পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য কৃতিত্ব, আর্টের দিক্ হইতে, জয়ন্তীর প্রাপ্য নহে; কেননা এই পরিবর্ত্তন পাঠকের চক্ষুর অগোচরে, যবনিকার অন্তরালে সম্পাদিত হইয়াছে। আবার শ্রীর সহিত জয়ন্তীর নিষ্কামধর্ম্মসম্পর্কীয় যে সমস্ত দার্শনিক আলোচনা হইয়াছে, তাহাতেও তাহার সজীবতার পরিমাণ বাড়ে নাই। কিন্তু বঙ্কিম এমন একটা সন্ন্যাসের অশরীরী আদর্শকে এমন অগ্নিপরীক্ষায় ফেলিয়াছেন যে তাহার মুখ হইতে মানুষের মর্ম্মের কথা বাহির করিয়া লইয়াছেন। সেই মুহূর্ত্ত হইতে জয়ন্তী আমাদের নিকট কেবল আদর্শ সন্ন্যাসিনী নহে, একটা সজীব ঘাত-প্রতিঘাতচঞ্চল মানুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জয়ন্তীর বিচারের দৃশ্য যেমন একদিকে বঙ্কিমের বর্ণনাশক্তি ও সৃজনী প্রতিভার পরিচয়, তেমনি অপরদিকে তাঁহার সূক্ষ্ম নৈতিক অনুভূতিরও নিদর্শন। জয়ন্তীর মনে যে মুহূর্ত্তে একটু সূক্ষ্ম অহঙ্কারের ভাব প্রবেশ করিয়াছে, যে মুহূর্ত্তে তাহার সন্ন্যাসের মধ্যে বাহ্যাড়ম্বরের একটু সামান্য স্পর্শ হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই স্ত্রীজাতিসুলভ লজ্জা আসিয়া তাহার সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। বঙ্কিমের প্রতিভা এখানে অতিসূক্ষ্ম তাপমান যন্ত্রের ন্যায় অন্তরস্থ অহঙ্কারের সামান্য তারতম্য, ঈষৎ মাত্রাভেদও অভ্রান্তভাবে ধরিয়া ফেলিয়াছে।

শ্রীর চরিত্রেই উপন্যাস-মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবাস্তবতা দৃষ্ট হইয়াছে। শ্রীর চরিত্রের গুরুতর পরিবর্ত্তনটী আমাদের দৃষ্টির বাহিরে সাধিত হওয়ায় তাহার গৌরব অনেকটা খর্ব্ব হইয়াছে। শ্রীর স্বামিপ্রেমের যে গভীর, মর্ম্মস্পর্শী বিবরণ পাই, তাহাতে তাহার পরিবর্ত্তনের কাহিনীটী বিশ্বাসের উপর মানিয়া লইতে আমাদের আরও অনিচ্ছা হয়। বিশেষতঃ ইহার পরে শ্রী জয়ন্তীর প্রভাবে পড়িয়া একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। জয়ন্তীর একান্ত অনুগতা শিষ্যার অপ্রধান অংশ অধিকার করিয়াছে। সীতারামের আজীবন-ব্যাপী আকুল বাসনা, শ্রীর নিজ অন্তঃকরণের সন্ন্যাসের আদর্শ ও স্বামি-প্রেমের মধ্যে ক্ষীণদ্বন্দ্ব, ও বিলম্বিত (belated) অনুতাপ—কিছুতেই তাহার ধমনীতে প্রাণপ্রবাহের সঞ্চার করিতে পারে নাই। শ্রীর সিংহবাহিনী মূর্ত্তিই আমাদের কল্পনার চক্ষে গভীর রেখায় ফুটিয়া উঠে, তাহাই আমাদের তাহার সম্বন্ধে শেষ এবং সত্য ধারণা। সন্ন্যাসিনী শ্রী একটা আদর্শ-জ্যোতিঃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী হইয়া, সীতারামের অনির্ব্বাণ কামনার আগুনে রাঙ্গা হইয়া, কিন্তু নিজে প্রভাত-নির্ব্বাপিত-জ্যোতিঃ তারকার ন্যায় আমাদের চক্ষুর সম্মুখ হইতে অবাস্তবতার তরল অন্ধকারে লীন হইয়া গিয়াছে।

বাস্তব-চরিত্রদের মধ্যে রমাই সর্ব্বপ্রধান। রমাই আমাদিগকে উচ্চ আদর্শ ও বীরত্বের রাজ্য হইতে আমাদের প্রাত্যহিক পারিবারিক জীবনের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে। সীতা-রামের উচ্চাভিলাষ ও স্বাধীন রাজ্যস্থাপন তাহার দুই চক্ষের বিষ; মুসলমানের ভয় তাহার দিবসের শান্তি ও রাত্রির নিদ্রা হরণ করিয়াছে—উপন্যাসের যুদ্ধ কোলাহল ও সন্ন্যাসধর্ম্মের উচ্চ আদর্শের মধ্যে সে খাঁটী বাঙ্গালী নারীর সুরটী তুলিয়াছে—একমাত্র রমাই সীতারামকে বাঙ্গালী বলিয়া নিঃসন্দেহে চিনাইয়া দিয়াছে। কিন্তু অসাধারণ প্রতিবেশের প্রভাব এ হেন রোদন-প্রবণা, অতিমাত্র স্নেহ-দুর্ব্বলা নারীকেও রোমান্সের দীপ্তি ও গৌরব আনিয়া দিয়াছে।

প্রথমতঃ গঙ্গারামকে অন্তঃপুরে আমন্ত্রণের ব্যাপারে তাহার শঙ্কাতিশয্যই তাহাকে দুঃসাহসের চরম-সীমায় ঠেলিয়া দিয়াছে। আর প্রকাশ্য দরবারে বিচারের দিন পুত্রস্নেহ তাহার সমস্ত লজ্জা-সঙ্কোচ-দুর্ব্বলতাকে সরাইয়া দিয়া তাহার কণ্ঠ অতুলনীয় বাগ্মিতায় ভরিয়া দিয়াছে, ও সেই ক্ষীণপ্রাণা রমণীর উপর মহামহিমময়ী সম্রাটীর জয়মুকুট পরাইয়াছে। রোমান্সের অসাধারণত্ব ও আমাদের সাধারণ জীবনের উপর তাহার অনমুমেয় প্রভাব সম্বন্ধে বঙ্কিমের দৃষ্টি কত তীক্ষ্ণ ছিল, রমার চরিত্রই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রমার, সীতারামের অবহেলাজনিত শোচনীয় মৃত্যু তাহার পাণ্ডুর মুখে একটা করুণ আভা আনিয়াছে, এবং মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিক্ দিয়াও, সীতারামের অধোগতির একটী সোপানস্বরূপেও উপন্যাসের তাহার সার্থকতা আছে।

অন্যান্য চরিত্রের বিস্তারিত আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন নাই। গঙ্গারামের বিশ্বাস ঘাতকতা একটা অতর্কিত বিকাশ বলিয়াই প্রথম দৃষ্টিতে অনুভূত হয়। কিন্তু লেখক উপন্যাসের প্রথম অংশে তাহার আত্মসর্ব্বস্বতার একটু ক্ষুদ্র ইঙ্গিত দিয়া বোধ হয় তাহার শোচনীয় পরিণামের জন্য আমাদিগকে কতকাংশে প্রস্তুত করিতে চাহিয়াছেন। কাজীর নিকট গঙ্গারামের বিচারের দিন, সীতারাম তাহার উদ্ধারের জন্য কতখানি আয়োজন করিয়াছেন, মুসলমানের সহিত লড়াই করিবার জন্য কত খানি প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন, তাহা গঙ্গারামের জানিবার কোন উপায় ছিল না; তাহার সহিত কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে সীতারামের নিশ্চয়ই কোন পরামর্শ হইতে পায় নাই। অথচ গঙ্গারাম আত্মরক্ষা ব্যতীত অন্য কিছু না ভাবিয়া সীতারামকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া রাখিয়া সীতারামের অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া অনায়াসে পলায়ন করিল, অবশ্য কামারকে ঘুষ দিয়া গঙ্গারামের হাত পা বেড়ীমুক্ত করিয়া লওয়াতে গঙ্গারামের সহিত পূর্ব্ব-পরামর্শের একটা ক্ষীণ আভাস পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু বোধ হয় ইহার উদ্দেশ্য এই যে সুযোগ উপস্থিত হইলে যাহাতে গঙ্গারামের পলায়নের পক্ষে কোন বিঘ্ন না থাকে তাহার ব্যবস্থা করা। গঙ্গারাম যে এরূপ অতর্কিতভাবে ও অপরকে বিপদে ফেলিয়া নিজ পলায়নের উপায় নিজেই করিয়া লইবে, কোন উপদেশের অপেক্ষা রাখিবে না, ইহার জন্য বোধ হয় কেহই প্রস্তুত ছিল না। আমাদের এইরূপ ব্যাখ্যা যদি অযথার্থ না হয়, তবে গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রারম্ভেই গঙ্গারামের মধ্যে স্বার্থপরতার বীজের অস্তিত্ব দেখাইয়াছেন; পরে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা অনুকূল ঘটনার আশ্রয়ে এই মৌলিক স্বার্থপরতার স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র।

সীতারামে অসাধারণ ও রোমান্টিক দৃশ্য বর্ণনায় বঙ্কিমের কল্পনার বিশাল প্রসার ও পরিধি প্রস্ফুট হইবার অবসর পাইয়াছে। বিশাল, উদ্বেল, জন-সমুদ্র-বর্ণনে বঙ্কিম যেরূপ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী লেখকের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়। এইরূপ তিনটি দৃশ্য উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—গঙ্গারামের উদ্ধার লইয়া হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা, রমা ও গঙ্গারামের বিচার, ও জয়ন্তীর বেত্রদণ্ডাজ্ঞা। এই তিনটী দৃশ্যে বিক্ষুব্ধ জনতার বিশেষ বিশেষ mood—কোথাও উত্তেজনা-ও-কোলাহল-ময়, কোথাও কৌতুহলী, কোথাও বা রুষ্ট-গাম্ভীর্য্য-ভীষণ বা অজ্ঞাত বিপদের ছায়াপাত-শঙ্কিত—বঙ্কিম অতি দক্ষতার সহিত বিচিত্র করিয়াছেন। সীতারামের পুনরুদ্ধারের চিত্রের মহনীয়তার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

কিন্তু রোমান্সের প্রাচুর্য্য-সত্বেও সীতারামের বাস্তবতার কোন অভাব অনুভূত হয় না। কি উপায়ে এই বাস্তবতার impression সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহারও কতক বিচার করা হইয়াছে। সীতারামের চরিত্রে যে সংঘাত তাহা মূলতঃ একটী বাস্তব দ্বন্দ্ব রমা, নন্দা, গঙ্গারাম প্রভৃতি বাস্তব চরিত্রগুলি উপন্যাসকে শ্রীজয়ন্তী-ঘটিত অবাস্তবতার ছায়া হইতে উদ্ধার করিয়াছে। বিশেষতঃ শ্রী ও জয়ন্তীর অলৌকিকত্ব সাধারণ লোকের মুখে মুখে কিরূপ উদ্ভট আকার ধারণ করিতেছিল, তাহা আমরা রামচাঁদ শ্যামচাঁদের কথোপকথনেই বুঝিতে পারি। এই জনসাধারণের সুরটী—মুরলার দৌত্য ও দুরবস্থা, যমুনার কৌতুকপ্রদ নীতিজ্ঞান, কবিরাজ-মণ্ডলীর চিকিৎসা-নৈপুণ্য, এমন কি জয়ন্তীর বেত্রদণ্ডাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নির্ব্বাচিত চণ্ডাল ও মুসলমান কসাইসকলের সমবেত আবির্ভাবের ফলে—গ্রন্থমধ্যে সর্ব্বদা জাগরুক রহিয়াছে, রোমান্সের শোভাযাত্রার কোলাহলের মধ্যে ডুবিয়া যায় নাই। মোটের উপর সীতারাম বাস্তব ও অসাধারণের মধ্যে একটী সুন্দর সংমিশ্রণ ও সামঞ্জস্য ; ইহার মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্বের প্রভাব ইহাকে উপন্যাসোচিত আদর্শ হইতে চ্যুত করিতে পারে নাই। ইহার চরিত্র-বিশ্লেষণ ও ঘটনাপরিণতি কোথায়ও নীতিবিদের বা তত্ত্ব-ব্যাখ্যাতার সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নাই ; পাপপুণ্যের তারতম্য অনুসারে দণ্ড-পুরস্কার বিতরণের যে ক্ষুদ্র প্রবৃত্তি (narrow poetic justice) তাহা উপন্যাসের বিশালতাকে সঙ্কুচিত করে নাই। শেক্‌স্‌পিয়ারের উচ্চাঙ্গের ট্রাজেডিগুলির মত সীতারামও মানবমনের দুর্জ্জেয়তার, ইহার মধ্যে একদিকে পাপের গোপন সঞ্চার ও বিশাল পরিণতি ও অপরদিকে অপ্রত্যাশিত মহিমা-এককথায় মানবের রহস্যময় প্রকৃতির উপর একটী উজ্জ্বল আলোকরেখাপাত করিয়া আমাদিগকে বিহ্বলতামণ্ডিত অথচ বিশ্বাসপূর্ণ বিস্ময়ে অভিভূত করে।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

এলোরা
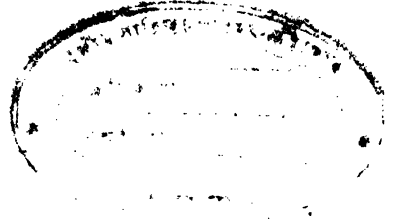
মনমদ জি, আই, পি রেলওয়ের মেন লাইনে একটী বড় জংসন ষ্টেসন। এখান হইতে N, G. S. R (Nizam's Guaranteed State Railway) বাহির হইয়া হায়দ্রাবাদ গিয়াছে। বম্বে বা কলিকাতা হইতে এলোরা যাইতে হইলে মনমদে আসিয়া গাড়ী বদল করিতে হইবে। নিজাম সরকারের ডাক গাড়ী দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। যে গাড়ীতে ডাক যায় (mail van) তাহা দুই কম্পার্টমেণ্টে বিভক্ত। এক কম্পার্টমেণ্টের উপর লেখা আছে "British mail service" ও দ্বিতীয় কম্পার্টমেণ্টে লেখা আছে "Nizam's mail service" কয়েকটী ষ্টেসন পার হইলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে গাড়ী নিজাম রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। বরোদা রাজ্যেও দেখিয়াছি ষ্টেসনে পুলিসের ইউনিফর্ম্মে লেখা আছে "Govt. Railway Police" কিন্তু নিজাম রাজ্যে এই নিয়মের

অন্যথা দেখি, রেলওয়ের পুলিসের ইউনিফর্ম্মেও লেখা আছে "Nizam's Railway Police."

দৌলতাবাদ ষ্টেসনে নামিয়া এলোরা যাইতে হয় ষ্টেসন হইতে প্রায় ১১ মাইল দূর; অনেক গরুর গাড়ী পাওয়া যায়। যখন ষ্টেসনে নামিলাম তখন গভীর রাত্রি, নামিয়াই দেখি ষ্টেসনে একটী খুব বড় Saloon দাঁড়াইয়া আছে; শুনিলাম নিজাম রাজ্যের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা রেসিডেণ্ট সাহেব এখন এলোরায় আছেন; বুঝিলাম আমাদের কপাল মন্দ; ষ্টেশনের নিকটেই এক ডাক বাংলো আছে, মনে করিলাম সেখানে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া সকালে এলোরা রওয়ানা হইব; কিন্তু গাড়োয়ানদিগের নিকট যাহা শুনিলাম তাহাতে সেখানে থাকা আর উপযুক্ত বিবেচনা করিলাম না। তাহারা বলিল, "রেসিডেণ্ট সাহেব শীকার করিতে এলোরায় আসিয়াছেন—তিনি কাল ফিরিয়া যাইবেন; তাঁহার মোটর গাড়ী এলোরা হইতে ষ্টেশনে না আসা পর্য্যন্ত কাহারও সাধ্য নাই রাস্তায় গরুর গাড়ী চালায়।" আমরা বলিলাম, "আলবৎ, তাহাত ঠিক; কিন্তু তাঁহার মোটর গাড়ীত সমস্তদিন যাওয়া আসা করিবে না; তিনি যদি সকালে আসেন আমরা বিকালে যাইব; আর তিনি যদি বিকালে আসেন আমরা সকালে যাইব।" তাহারা বলিল, "তিনি সকালে আসিবেন কি বিকালে আসিবেন তাহার কিছুই ঠিকানা নাই; তবে আমাদের প্রতি হুকুম জাহির হইয়াছে তাঁহার মোটর ষ্টেশনে না আসা পর্য্যন্ত আমরা রাস্তায় গরুর গাড়ী লইতে পারিব না।" বুঝিলাম আজ রাত্রির শেষেই এলোরা না পৌছিতে পারিলে কাল সমস্ত দিনই হয়ত এখানে পড়িয়া থাকিতে হইবে। এই ১১ মাইল পথ তিনি মোটরে হয়ত আধ ঘণ্টায় আসিলেন—কিন্তু ঠিক কখন আসিবেন তাহা যখন তিনি অনুগ্রহ করিয়া স্থির করেন নাই, অথবা তিনি হয়ত স্থির করিয়াছেন কিন্তু পুলিশ কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া সব অস্থির করিয়া তুলিয়াছে তখন বলিতেই হইবে আমাদের অদৃষ্ট মন্দ। পরদিন অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকা অপেক্ষা আজ রাত্রিতেই রওনা হওয়া ভাল মনে করিয়া তখনই যাত্রা করিলাম।

সকালে এলোরা ডাক বাংলোতে আসিয়া পৌছিলাম; অজন্তার ন্যায় এখানেও একটী ডাক বাংলো ও একটী Guest House আছে; সর্ব্বসাধারণের জন্য ডাক বাংলো, এবং বড় বড় কর্ম্মচারী ও নিজাম বাহাদুরের মাননীয় অতিথিদের জন্য Guest House; এই অতিথিশালার কথা আর কি বলিব? ডাক বাংলোটী প্রকৃতই খুব সুন্দর; উচ্চ পাহাড়ের শিখর দেশে ইহা নির্ম্মিত। এই পাহাড়ের তলদেশেই, এই পাহাড়ের গাত্রেই এলোরার গুহাগুলি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট মন্দ; ডাকবাংলোর খানসামা বলিল, "ডাকবাংলোতে এখন স্থান নাই, কারণ রেসিডেণ্ট সাহেব এলোরায় আসিয়াছেন।" আমরা বলিলাম, "রেসিডেণ্ট সাহেব তো অতিথিশালায় আছেন, আমরা ডাকবাংলাতে স্থান চাই।" খানসামা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিল রেসিডেণ্টের সঙ্গে সর্ব্বদাই অনেক সাঙ্গোপাঙ্গ থাকে। বুঝিলাম ও বিদায় লইলাম। অগ্রসর হইলাম, পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া প্রায় ২ মাইল দূরে এলোরা গ্রামে আসিলাম, কিন্তু অদৃষ্ট যখন মন্দ তখন কে আর

কি করিতে পারে? এলোরার পাণ্ডারা যথারীতি আক্রমণ করিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল; তাহারা বাসের জন্য যে সুন্দর গৃহগুলি দেখাইয়া দিল তাহাতে গরু ভেড়া থাকিতে পারে কিনা গবেষণার বিষয়—মানুষের কথা পৃথক। আমরা হতাশ হইয়া ফিরিয়া চলিলাম; আমাদের অদৃষ্টচক্রও বোধহয় সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া গেল। গুহাগুলির নিকটে আসিয়া যখন পর্ব্বত আরোহণ করিতে যাইতেছি, তখন দেখি কাছেই একটী পুলিসের চৌকী। এখানে ৪।৫টী পুলিস থাকে, তাহাদের কাজ গুহাগুলি পাহারা দেওয়া ও নিকটস্থ গ্রামগুলিতে শান্তি রক্ষা করা। তাহাদের নিকট যাইয়া আমরা আমাদের দুঃখের কথা নিবেদন করিলাম। তাহারা বলিল, "আমাদের একটী মাত্র কুঠরী, ভিতরে কোনই স্থান নাই—আপনারা যদি বারান্দায় থাকিতে রাজী হন তবে আমাদের কোনই আপত্তি নাই।" পুলিসের এই প্রকার ব্যবহার আমরা কখনও আশা করি নাই; তাহাদের এই সহৃদয়তায় আমরা মুগ্ধ হইয়া সেইখানেই আস্তানা গড়িলাম।

অজন্তার গুহাগুলি পাহাড়ের মধ্যভাগে; এলোরার গুহাগুলি পাহাড়ের তলদেশে, অজন্তা গুহাগুলির সম্মুখে পর্ব্বত শ্রেণী। দৃষ্টি পর্ব্বতে আবদ্ধ হইয়া যায়; এলোরা গুহাগুলির সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রান্তর,—যতদূর দেখা যায় কেবল প্রান্তরের পর প্রান্তর। অজন্তায় গুহার সংখ্যা ২৮; এলোরায় গুহার সংখ্যা ৩২; অজন্তায় সমস্ত গুহাই বৌদ্ধদিগের; এলোরায় কতকগুলি গুহা বৌদ্ধের, কতকগুলি জৈনের এবং কতকগুলি হিন্দুর। অজন্তায় বিশেষত্ব রঙীন চিত্র, এলোরায় সে প্রকার কোন চিত্র নাই।

অজন্তা হইতে এলোরায় আসিলে মনে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে আসিলাম। হিন্দুগুহার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান গুহার নাম কৈলাস মন্দির। কৈলাস মন্দির দেখিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। এক বিশাল পর্ব্বতকে কাটিয়া খুদিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। একটী ইট কিম্বা পাথর বাহির হইতে আনিয়া মন্দিরের কোন অংশে যুক্ত করা হয় নাই; যোগের কাজ একেবারে নাই; এক বৃহৎ অখণ্ড মন্দির—তাহার প্রত্যেক অংশই এক বিশাল পর্ব্বতকে খুঁদিয়া খুঁদিয়া করা হইয়াছে। মন্দিরের উচ্চশিখর হইতে তলদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত অংশ, সমস্ত কারু-কার্য্য, সমস্ত মূর্ত্তিই পর্ব্বতের পরিবর্ত্তিত অঙ্গ। ইহা এক সুবিশাল মন্দির—মন্দিরের চারিদিকে বড় বড় গুহা; সব গুহাগুলিই দ্বিতল; গুহাগুলিও বেশ আলোকিত। গুহা বলিতে সাধারণ লোক যাহা মনে করে এ গুহাগুলি সে প্রকার নহে; প্রত্যেক গুহাই এক সুবিশাল হল ঘর, যেন এক বড় দরবার গৃহ; বড় বড় মোটা মোটা স্তম্ভ নানা কারু-কার্য্যখচিত। বারান্দায় বৃহৎ বৃহৎ মূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। মূর্ত্তির সংখ্যাও অনেক; মূর্ত্তিগুলি পুরাণের গল্প বর্ণিত করিতেছে। কোথাও রাবণ মহাদেবের পূজা করিতেছে; কোথাও গণেশ তাহার মাতার নিকট দাঁড়াইয়া আছে, কোথাও অন্নপূর্ণা অন্নবিতরণ করিতেছেন। কোন মূর্ত্তিতে দেখি মহাদেবের বিবাহের আয়োজন হইতেছে, মহাদেব সতীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন; আবার অন্য মূর্ত্তিতে দেখি তিনি ধ্যানে বসিয়াছেন, তাঁহাকে প্রলুব্ধ করা হইতেছে এবং ধীরে ধীরে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইতেছে। মনে রাখিতে হইবে কোন মূর্ত্তিই প্রস্তুত করিয়া আনিয়া বারান্দায় বসান হয় নাই; পাহাড় খুঁদিয়া বারান্দা

হইয়াছে—পাহাড় খুঁদিয়া এই মূর্ত্তিগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। দেখিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়ি; বিশ্বাস হয় না কোন মানুষ এই ভীষণ কাজ করিতে পারে; স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা না করিলে মানুষের একাজ সম্ভব নহে। কি অমানুষিক পাশবিক বলে একটা বিশাল পাহাড়কে ভাঙ্গিয়া, কাটিয়া, মাজিয়া, ঘসিয়া, খুঁদিয়া খুঁদিয়া নানা কারু-কার্য্যখচিত ও বহু গুহা সম্বলিত এই মন্দিরটী নির্ম্মান করা হইয়াছে ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হই বটে, কিন্তু আনন্দে তেমন পুলকিত হই না। মন্দিরের সর্ব্বত্রই এক অমানুসিক শক্তির পরিচয় পাই; কিন্তু কোথাও কমনীয় সৌন্দর্য্যের কোন নিদর্শন নাই; যাহাঁ দেখিলাম তাহা Art বটে, কিন্তু ললিত কলা (Fine Art) নহে; কোমলতা বা রমণীয়তার কোন চিহ্ন কোথাও নাই যাহা অজন্তার চিত্রে ভূরি ভূরি দেখিতে পাই। সর্ব্বত্রই এক নগ্ন কঠোর রুদ্র ভাব, যাহারা এই মন্দির ও মূর্ত্তিগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহাদের শক্তি অসীম ছিল কিন্তু তাহাদের শিক্ষা ও রুচি যেন তেমন সুমার্জ্জিত ছিল না—ইহাই মনে হয়। ইংরাজিতে যাহাকে fineness or delicacy ববে তাহার লক্ষণ কোথাও নাই। কঠোরতা আছে, কমনীয়তা নাই; শক্তি আছে, ভক্তি নাই।

কৈলাস মন্দিরে আর একটী অভাব দেখিলাম সে অভাব অজন্তাতে মোটেই নাই। অজন্তার আর্ট humanistic কিন্তু কৈলাস মন্দির সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। কৈলাস মন্দির দেবদেবীর কাণ্ডকারখানা লইয়াই ব্যস্ত; এখানে মানুষের সুঃখ দুখের কোন স্থান নাই। দেবদেবীর জন্ম, তাহাদের বিবাহ, তাহাদের স্নেহ ভালবাসা, তাহাদের হিংসাদ্বেষ তাহাদের মাহাত্ম্য, সর্ব্বত্রই তাহাদের কথা। অজন্তায় ঠিক ইহার বিপরীত; দেবদেবী, যক্ষ রক্ষ সেইখানে তাণ্ডবনৃত্য করে না; প্রাণীর সেবাই বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ ভগবান—তাই সেখানে দেখি মানুষের হাসি, মানুষের অশ্রু, পিতার প্রেম, মাতার ব্যাকুলতা, ভ্রাতার স্নেহ, ভগিনীর মমতা। সেখানে দেখি পরের কার্য্যে নিজের স্বার্থত্যাগ, পরের দুঃখে আত্মবলিদান, পরের জন্ম জীবনধারণ। মানুষ মানুকে আকর্ষণ করে; অজন্তার চিত্র ও দর্শকের মধ্যে এক আন্তরিক সম্বন্ধ আছে; কিন্তু এখানে সেপ্রকার কোন সম্বন্ধ নাই; কৈলাস মন্দিরের দেব দেবীর মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া আমরা উদাসীন থাকি, ইহা আমাদিগের অন্তরাত্মাকে তেমন আকর্ষণ করিতে পারে না; আমরা বুঝি যে আমরা এখানে সাক্ষী মাত্র, দেবদেবীর কার্য্য কলাপের দর্শক, কিন্তু অজন্তায় প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই স্মরণ থাকে যে আমরাই অভিনেতা—দর্শক নহি।

কৈলাস মন্দিরের আর একটী গুরুতর দোষ—অশ্লীলতা, মন্দিরের গাত্রে, বারান্দায়, প্রাচীরে ও হল ঘরের মধ্যে অনেক কুৎসিত মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তিগুলি এঁত কুৎসিত যে দুই বন্ধুও একত্র দাঁড়াইয়া মূর্ত্তিগুলি অবলোকন করিতে সাহস করিবে না, লজ্জায় তাহাদের মুখ নিশ্চয়ই অবনত হইবে। মানুষের কতদূর অধঃপতন হইলে এবং তাহার হৃদয়ের উচ্চ প্রবৃত্তিগুলি কি ভাবে তিরোহিত হইলে সে পাঁচজনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া ও পরামর্শ করিয়া এই মূর্ত্তিগুলি গড়িতে পারে এবং প্রকাশ্য স্থানে রাখিতে সাহস করে—তাহা পাঠক পাঠিকা বিবেচনা করুন। দেশের তখনকার নৈতিক চিত্রের কথা

স্মরণ করুন, যখন বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অসীম ধৈর্য্যসহকারে শিল্পীগণ এই সব ভীষণ কুৎসিত মূর্ত্তি গড়িয়া আনন্দ অনুভব করিতেছিল। কি শক্তিই তাহারা এই প্রকারে ক্ষয় করিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আবারও বলি—তাহাদের শক্তি ছিল অসীম, কিন্তু শিক্ষা ও রুচি ছিল অধম। তাই বলিতেছিলাম অজন্তা হইতে এলোরা আসিলে মনে হয় স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে আসিলাম। অজন্তায় আছে কমনীয় সৌন্দর্য্য, এলোরায় আছে অমানুষিক শক্তির নগ্নদৃশ্য, অজন্তায় আছে মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম, এলোরায় দেখি দেবদানবের তাণ্ডব নৃত্য; অজন্তায় আছে সুমার্জ্জিত রুচির সংযত চিত্র, এলোরায় আছে পাশবিক রুচির উদ্দাম মূর্ত্তি। অজন্তায় হাজার হাজার চিত্র আছে কিন্তু একটী চিত্রও কুৎসিত নহে। যাহারা কৈলাস মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহাদের নিকট নিশ্চয়ই ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

অন্যান্য হিন্দুগুহা সম্বন্ধে যার বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, সমস্ত হিন্দু গুহাতেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে—সর্ব্বত্রই মহাদেব ও পার্ব্বতীর প্রতিমূর্ত্তি। এখানে একদিন শৈব যোগী ঋষিগণ তাঁহাদের ধর্ম্মসাধনার ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু কয়েকটী গুহা দেখিলেই বুঝা যায় যে সে গুলি একদিন বৌদ্ধ ভিক্ষুকের আশ্রয়স্থল ছিল, গুহাগুলি হয়ত বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া শিবমন্দিরে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে, বুদ্ধদেবের যোগাসীন মূর্ত্তি সরাইয়া দিয়া শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। হিন্দু গুহাগুলিতে যে বৃহৎ বৃহৎ মূর্ত্তি দেখিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। প্রায় কোন মূর্ত্তিই মানুষের ন্যায় দেখিতে নহে, কাহারও ছয় হাত, কাহারও আট হাত, কাহারও কাহারও তিন মুখ, কাহারও দশ মুখ, কাহারও তিন চোখ, কাহারও বা কুড়ি চোখ—এই ভাবে দেব দেবী, যক্ষ রক্ষের ধারণা করা হইয়াছে। গ্রীকেরাও দেবতাকে মানুষ-ভাবে কল্পনা করিয়াছে—জুপিটার, ভিনাস, মারকারি সকলেই মনুষ্যাকৃতি দেবতা, কিন্তু এ দেবতাগুলি বিকৃত নহে, পাঁচ হাত বা দশ মুণ্ড দিয়া দেবতা গুলিকে কোন অস্বাভাবিক জন্তুতে পরিণত করা হয় নাই, সকলেরই দেহ-সৌন্দর্য আছে, দেখিতে কেহই বিকট নহে। কিন্তু গ্রীক-মূর্ত্তিগুলির তুলনায় হিন্দুমূর্ত্তিগুলি দেখিতে কদাকার, গ্রীক মূর্ত্তিগুলিকে দেখিয়া যেমন আনন্দ হয়, হিন্দু মূর্ত্তিগুলিকে দেখিয়া তেমন আনন্দ হয় না। তিন মুণ্ড বা হস্তিশুণ্ড বা অর্দ্ধ পশু দেখিলে সাধারণ মানুষের ঔৎসুক্যের উদ্রেক হইতে পারে বটে কিন্তু সৌন্দর্য্যপিপাসা বর্দ্ধিত হয় না। Sir William Archer হিন্দু মূর্ত্তিগুলির বিকট আকার দেখিয়া এই আর্টকে Barbarous Art বলিয়াছেন; Barbarous কথাটা হয়ত খুব কঠোর, তবে Barbarous না হইলেও এ আর্ট যে Fine Art নহে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

গ্রীক মূর্ত্তিগুলিতে যে দেহলালিত্য আছে তাহা হিন্দুমূর্ত্তিগুলিতে মোটেই নাই। গ্রীক শিল্পীগণ মনুষ্যশরীরের গঠন প্রণালী (Anatomy) সম্বন্ধে ভালরূপ শিক্ষা লাভ করিত; তাহা শিখিবার তাহাদের সুযোগও বেশ ছিল; সর্ব্ব-সাধারণের জন্য যে স্নানাগার থাকিত সেখানে যাইয়া তাহারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন প্রণালী অবলোকন করিত; কোথায় মাংসপেশী বেশী, কোথায় চর্ব্বি বেশী, কোথায় বা হাড়ের পরিমাণ অধিক, কোন মাংস-

পেশী কখন কি প্রকার অবস্থা ধারণ করে, ইহা তাহারা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অবলোকন করিত। রঙ্গমঞ্চে যোদ্ধাগণ যখন কেবল মাত্র এক ল্যাঙ্গোট পড়িয়া আসিয়া বাদ্যের তালে তাল রাখিয়া হিংস্রপশুদের সহিত যুদ্ধ করিত,তখনও শিল্পীগণ মনুষ্যদেহ অবলোকন করিবার সুযোগ পাইত ; কখন কোন মাংসপেশী ফুলিয়া ওঠে, কি ভাবে কতখানি ফুলিয়া ওঠে, কখনইবা আবার নরম হইয়া যায় তাহা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া তাহাদের কার্য্যে নিয়োগ করিত ; সেইজন্য গ্রীক্ মূর্ত্তি গুলি দেখি জীবন্ত, অন্তরের ভাবটী চোখে মুখে দেহে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু হিন্দু-মূর্ত্তিগুলিতে ভাব যেন তেমন প্রকাশ পায় নাই। এই মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া মনে হয় দেহের গঠন প্রণালী সম্বন্ধে হিন্দুশিল্পীদের তেমন বিশেষজ্ঞান ছিল না ; তাহারা ধারণা করিয়া মূর্ত্তি গড়িয়াছে, দেখিয়া গড়ে নাই। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাণ, মাংসপেশীর ক্রিয়া কিছুই তেমন জীবন্ত ভাবে রচিত হয় নাই। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়ার মধ্য দিয়া ভাবের সমন্বয় আনিতে এলোরায় হিন্দু শিল্পীগণ সক্ষম হয় নাই।

এতক্ষণ হিন্দুগুহা সম্বন্ধে বলিতেছিলাম ; এক্ষণে বৌদ্ধ ও জৈন গুহা সম্বন্ধে কিছু বলিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই। হিন্দু গুহা হইতে বৌদ্ধ গুহাতে যাইবামাত্র বুঝা যায় যে এক নূতন যায়গায় আসিয়াছি। কোথাও কোন প্রকার কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তি নাই ; যে দুই একটী মূর্ত্তি আছে তাহা বুদ্ধ দেবের যোগাসীন শান্তমূর্ত্তি, দেখিলেই স্বভাবতঃই ভক্তির উদ্রেক হয়। হিন্দুদের কল্পনা শক্তি যেন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সকল আইন কানুন ভঙ্গ করিয়া এক প্রবলঝঞ্ঝার ন্যায় বহিয়া গিয়াছে। কতপ্রকার অদ্ভুত কল্পনাই তাহারা করিয়াছে, কত অনাবশ্যক মূর্ত্তিই না তাহারা সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারা মূর্ত্তির পর মূর্ত্তি গড়িয়া গিয়াছে ; কোনটীর যে প্রয়োজন আছে আর কোনটীর যে প্রয়োজন নাই তাহা বিবেচনা করিবার সময় তাহারা যেন পায় নাই ; আবশ্যকতা থাকুক বা না থাকুক তাহারা কেবলই সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ গুহা গুলিতে এ প্রকার কোন অসংযমের বা উচ্ছৃঙ্খলতার লক্ষণ পাওয়া যাইবে না। প্রয়োজনাতিরিক্ত মূর্ত্তি তাহারা নির্ম্মান করে নাই, তাহাদের সৃষ্টি শক্তি তাহারা অযথা অপব্যয় করে নাই, জীবনের কঠিন সংগ্রামে তাহারা সংযম অভ্যাস করিয়াছে, কল্পনার রচনা প্রবৃত্তিতেও তাহারা সেই সংযমের পরিচয় দিয়াছে। সংযমের এই কঠোর অভ্যাস শিল্পীর চিত্ত ও হস্তকে সংযত রাখিয়াছে, হিন্দু মন্দিরের ন্যায় এখানে তেমন হৈ চৈ, ধুমধাম, জাঁকজমক, তোলপাড় কিছুই নাই, বরং এই সংযতভাবের জন্য বৌদ্ধমন্দিরে যে সরলতার আবহাওয়া পাই তাহা অন্যত্র বিরল। আর্টের দিক হইতে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে হিন্দুমন্দির ও মুসলমান মসজিদ পরস্পর বিরোধী, দুইটীই চরমপন্থাবলম্বী, মন্দির গিয়াছে জাঁকজমকের আতিশয্যের দিকে, আর মসজিদ গিয়াছে সরলতার আতিশয্যের দিকে। কিন্তু কোন আতিশয্যই ভাল নহে, জাকজমকের ধুমধামের এবং সরলতার নগ্নদৃশ্য—দুইএর একটীকেও "সুন্দর" (beautiful) এই বিশেষণে অভিহিত করা যায় না। মূর্ত্তি যতই মহান ও পবিত্র হউক না কেন মসজিদে তাহার স্থান নাই ; আর মন্দিরে সুন্দর ও অসুন্দর সকল প্রকার মূর্ত্তিই বিরাজ করিতেছে ; কিন্তু বৌদ্ধ বিহারগুলি মধ্যপন্থাবলম্বী ; খৃষ্টানদের গির্জ্জাও এই দলভুক্ত।

এখানে মন্দিরের জাঁকজমক নাই, অথচ মসজিদের শূন্যভাবও নাই। আবশ্যকীয় কয়েকটী মাত্র মহান পবিত্র মূর্ত্তি গৃহের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়া শোভা পাইতেছে।

জৈনগুহা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই ; গুহাতে বুদ্ধদেবের পরিবর্ত্তে মহাবীরের মূর্ত্তি আছে ; এবং এই মূর্ত্তি দেখিতেও প্রায় বুদ্ধের মত ; যাহারা জানে না তাহারা অনেকেই এই মূর্ত্তিকে বুদ্ধ বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে। তবে বৌদ্ধগুহাগুলিতে সরলতার যে আবহাওয়া আছে, এখানে তাহা নাই ; অথচ ধূমধামের আড়ম্বরও তেমন নাই—যেন হিন্দুদের মত আড়ম্বর করিতে গিয়াছিল কিন্তু পারে নাই। মোটের উপর, জৈন গুহাগুলি হিন্দুগুহা ও বৌদ্ধগুহার ব্যর্থ অনুকরণ বলিয়া বর্ণনা করিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না।

অজন্তা গুহার সহিত এলোরা গুহার তুলনা করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। গুহা হিসাবে এলোরা গুহা অজন্তা গুহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। অজন্তা গুহার মুখ ছোট, ভিতরে যাইয়া বড় হইয়াছে ; মুখ ছোট হওয়াতে ভিতরে আলো ও বাতাস বেশী যাইতে পারে না ; কিন্তু এলোরার গুহাও যেরূপ বৃহৎ, ইহার প্রবেশ দ্বারও তদ্রূপ। সেই জন্য ভিতরে আলো বাতাসের কোন অভাব নাই। অনেকগুহা (বিশেষতঃ বৌদ্ধগুহা) দেখিতে কোন আধুনিক স্কুল বা কলেজ গৃহের ন্যায়। দ্বিতল গুহাগুলি অপেক্ষাকৃত সুন্দর ; সম্মুখে খোলা বারান্দা, ভিতরে বৃহৎ হল ঘর, প্রচুর আলো ও বাতাস। গুহার মধ্যে দাঁড়াইয়া যতদুর দৃষ্টি যায় দেখিতে পাই বিস্তীর্ণ প্রান্তর পড়িয়া রহিয়াছে। স্তম্ভের উপর যে সব কারুকার্য্য রহিয়াছে তাহাও অজন্তার কারুকার্য্য অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। পাথরের উপর এরূপ রেখাভঙ্গিমা অজন্তায় পাওয়া যায় না। তবে মোটের উপর অজন্তা এলোরা অপেক্ষা অনেক সুন্দর ; অজন্তা আছে স্বপ্নজগতে, এলোরা আছে বাস্তব জগতে ; অজন্তা স্বর্গীয়, এলোরা পার্থিব।

শ্রীইন্দু ভূষণ মজুমদার

শিখ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)
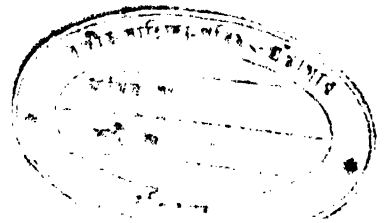
আকালীরা কোন দিনই সম্পূর্ণভাবে কোন শাসনকর্ত্তার অধীনতা স্বীকার করে নাই ; গুরুই এবং গুরুর বাণীই তাহাদের একমাত্র প্রভু, সঙ্গতই বা গুরুমন্ত্রাই তাহাদের জীবনের বিধায়ক, অন্য কোন শাসন তাহারা মানিবে না। ১৭৬৪খৃষ্টাব্দে আহমদ শাহ দুরানী যখন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া যায়, তখন শিখগণ বিভিন্ন নেতার অধীনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা এইবার অমৃতসরে মিলিত হইয়া গুরুমন্ত্রা করিল। এইখানেই বারজন বিভিন্ন নেতার অধীনে বারটী বিভিন্ন রাজনৈতিক সম্প্রদায় বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ভিত্তিপতন হইল। বৎসরের পর বৎসর "সরবৎ খালসা" অর্থাৎ সমগ্র শিখ সম্প্রদায় এইভাবে দিপালীর দিন সমবেত হইত ; এখনও

সেই প্রথা চলিয়া আসিতেছে যদিও এই সম্মেলনীর এখন কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা নাই ; কিন্তু সমাজের অত্যাচার অবিচার দূর করা, নিজেদের অন্যান্য উন্নতির ব্যবস্থা করা এই সম্মেলনী ভালভাবেই করিয়া আসিয়াছে। দূর দূরান্তর হইতে আসিয়া এই সম্মেলনী যোগদান করা শিখগণের পক্ষে অন্যতম ধর্ম্মানুষ্ঠানের মতই হইয়া পড়িয়াছে। এই সম্মেলনী উপলক্ষেই ১৯১৯খৃষ্টাব্দে জালিবানবালাবাগের হত্যাকাণ্ড অভিনীত হয়। Cunringham এই প্রকার সম্মেলনীকে theocratic confederate feudalism নামে অভিহিত করিয়াছেন। ১৭৬৪খৃষ্টাব্দে এই সম্মেলনীতে বারটী মিসিল হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কতকগুলির নেতা পরবর্ত্তীকালের শিখ ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছিলেন। ইহারই মধ্যে "শুকরজাতিয়া" মিসিলে মহারাজা রণজীৎ সিংহ জন্মগ্রহণ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখ রাজ্যগুলিকে একত্রিত করিয়া বিরাট শিখ সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করেন। অন্যতম মিসিল "ফুলকিয়া"র নেতৃবৃন্দই পাতিয়ালা নাভা ঝিন্দ প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

এইখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে আকালীরা কোন মিসিলেরই অন্তর্ভুক্ত না হইয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিল Cunningham লিখিয়াছেন

" Besides the regular confederacies with their moderate degree of subordination, there was a body of men who threw off all subjection to earthly governors, and who peculiarly represented the religious element of Sikhism. These were the "Akalis", the immortals or rather the soldiers of God, who with their blue dress and bracelets of steel, claimed for themselves a direct institution by Govind Singh The Guru had called upon men to sacrifice everything for their faith, to leave their homes, to follow the profession of arms; but he and all his predecessors had likewise denounced the inert asceticism of the Hindu sects, and thus the fanatical feeling of a Sikh took a destructive turn. The Akalis formed themselves in their struggle to reconcile warlike activity with the relinqueshment of the world. The meek and the humble were satisfied with the assiduous performance of menial offices in temples but the fierce enthusiasm of others prompted them to act from time to time as the armed guardians of amrittas or suddenly to go where blind impulse might lead them and to win their daily bread, even singlehanded at the point of the sword. They also took upon themselves something of the authority of censors and although no leader appears to have fallen by their hands for defection to the Khalsa, they inspired

awe as well as respect, and would sometimes plunder those who had offended them or had injured the commonwealth. The passions of the Akalis had full play until Ranjit Singh became supreme and it cost that able and resolute chief much time and trouble at once to suppress them and to preserve his own reputation with the people".

(Cunningham—History of the Sikhs Chap. IV)

রণজীৎসিংহকে আকালী ফুলাসিংহের সহায়তাগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সত্য বটে তাঁহার শান্তিপূর্ণ সাম্রাজ্যে শিখজাতি ও ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত গণতন্ত্রবাদে আঘাত লাগিয়াছিল এবং তাহা অনেকঅংশেই বিনষ্ট হইয়াছিল, সত্য বটে আকালীগণের মধ্যে ধর্ম্মান্ধতা কোন কোন সময়ে মাত্রা অতিক্রম করিয়া যাইত, তবুও আকালীগণের এই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, ধর্ম্মানুরাগ ও গুরুভক্তি কোন কালেই একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। এই সুপ্ত গুণগুলিই পরবর্ত্তী কালে শিখজাগ্রতি সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল।

গণতন্ত্রমূলক শাসন ব্যতীত অন্য সকল প্রকার রাষ্ট্রেই অভিজাতবর্গের সহিত শাসকবর্গের একটা স্বার্থের যোগ থাকে যাহার বলে অভিজাতবর্গ শাসকসম্প্রদায়ের সম্মুখেই অনেক অত্যাচার করিতে সাহস পায়। শাসক সম্প্রদায় ও অভিজাতবর্গের অনেক দোষ দেখিয়াও দেখেন না; কারণ অভিজাতবর্গের স্থায়িত্বে তাঁহাদের নিজেদের অবস্থা নিশ্চিত থাকে। মহারাজা রনজীৎ সিংহের মৃত্যুর পর, স্বার্থান্ধ ক্রুর বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীগণের হাতে পড়িয়া প্রকাণ্ড শিখ সাম্রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ইংরেজ সেই সময়ে সুযোগ পাইয়া তাহা ছলে বলে হস্তগত করিলেন; গৃহবিবাদে আর একবার ভারতের ভাগ্যরবি অস্তমিত হইল।

এই অরাজকতার সময় বহু দুষ্ট শিখ গুরুদ্বারাগুলি অধিকার করিয়া বসিয়াছিল; গুরুদ্বারা ও তাহাদের সংশ্লিষ্ট প্রকাণ্ড ভূসম্পত্তিগুলি এইরূপ কতকগুলি দুরাচার লোকের হাতে আসিয়া পড়ায় তাহারা যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিল; শিখধর্ম্ম তখন নিজেদের বৈশিষ্ট্য স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা ও সর্ব্বপ্রকার অত্যাচারের সর্ব্বথা প্রতিকূলাচরণের আদর করিতে ভুলিয়াছে; শিখগণ তখন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এই শ্রেণীর মোহন্তদিগের কর্ম্মে বাধা দেওয়া তখন সম্ভবপর হয় নাই। শিখসমাজও তখন গৃহবিবাদে কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল, জনসাধারণ গুরুগণের প্রচারিত কঠোর ধর্ম্ম ভুলিয়া, আদর্শ ভুলিয়া বিলাসিতা, নির্জ্জীবতার পঙ্কে ডুবিয়া যাইতেছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে গুরুদ্বারগুলি শিখগণের নিকট কত প্রিয়, শিখধর্ম্মে গুরুদ্বারগুলির স্থান কত উচ্চে। এখন এই সকল বিলাসী ইন্দ্রিয়পরায়ণ, কুটিল মোহন্তগুলির জন্য সেগুলি পাপের কেন্দ্র হইয়া উঠিল। শিখধর্ম্মে পৌত্তলিকতার স্থান নাই, স্থানে স্থানে গুরুদ্বারগুলিতে দেবদেবীর মূর্ত্তি পূজিত হইতে লাগিল; ধর্ম্মে ও সমাজে যখন ব্যাধি প্রবেশ করে তখন সহজেই তাহা জনসাধারণের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া পড়ে।

ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট গুরুদ্বার তথা শিখধর্ম্ম ও সমাজের এই কেন্দ্রগুলির পবিত্রতা রক্ষার

জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন না ; কারণ বিশিষ্ট ভূম্যধিকারী এই মোহন্তগুলির সহিত তাহাদের নিজেদের স্বার্থ অনেক অংশে জড়িত ছিল। গুরুদ্বারের সম্পত্তিগুলি কোন মতেই মোহন্তের ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইতে পারে না ; মোহন্তগুলির হস্তে সেগুলি শুধু সমাজ ও ধর্ম্ম সেবার জন্য ন্যস্ত মাত্র ; সাধারণতা লঙ্গর প্রভৃতির জন্য সেগুলি ব্যয়িত হইবে ; কিন্তু মোহন্তগুলি সুযোগ পাইয়া সেগুলিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করিতে লাগিল ; ধর্ম্মের জন্য সেগুলি না লাগিয়া মোহন্তগণের ব্যভিচার ও বিলাসের আয়োজন যোগাইবার জন্য লাগিল।

অত্যাচারী ব্যভিচারী মোহন্তদিগের পদচ্যুত করিবার জন্য আইন হইল বটে কিন্তু ততদিনে মোহন্তগণ নিজেদের অধিকার এমন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল আর আইন এতদূর কুটিল ছিল যে কোন প্রতিকার করা প্রায় অসম্ভবই হইয়া পড়িয়াছিল।

ধর্ম্মের ও সমাজের এই দুর্দ্দশার সময় কয়েকজন মহাপ্রাণ শিখের হৃদয়ে সমাজ ও ধর্ম্মকে নিষ্কলুষ করিয়া অতীতের মহাআদর্শকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিবার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। ইহাই সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত। এইরূপ প্রথম আন্দোলন নিরঙ্করী নামে অভিহিত গুরুদ্বারগুলিতে যে দেবদেবীর মূর্ত্তি পূজিত হইয়া ধর্ম্মে পৌত্তলিকতার গ্লানি আসিয়া পড়িতেছিল ইহা তাহারই বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। পেশবারের বাবাদয়াল এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তক ; তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করেন ; শিখগুরুগণ মদ্যপান নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সময়ে শিখগণের মধ্যে মদ্যপান বিশেষরূপে প্রচলিত হইয়া পড়িতেছিল, তিনি ইহার বিরুদ্ধে প্রচার করেন, কিন্তু এই আন্দোলন বিশেষভাবে সফলতা লাভ করে যাই।

দ্বিতীয় উল্লেখ যোগ্য আন্দোলনের প্রবর্ত্তক বাবা বালক সিংহ ও তাঁহার শিষ্য বাবা রামসিংহ। ইহা নামধারী আন্দোলন নামে অভিহিত ; ইঁহাদের শিষ্যগণ নামধারী সম্প্রদায়রূপে পরিচিত। বাবা রামসিংহ প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন ; তিনি গুরুদ্বারের মোহন্তগুলির অত্যাচার ও ব্যাভিচারে সমাজের ও দেশের যে ক্ষতি হইতেছে তাহা দেখিতে পাইয়া তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঠশালা ও লঙ্গরের প্রতিষ্ঠা করেন ; পাশ্চত্য সভ্যতা যে ভাবে দেশের স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্ব হরণ করিতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেন ; প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষে অসহযোগের প্রচার তিনিই প্রথম করেন ; তিনি গবর্ণমেন্টের সকল প্রকার সংশ্রব ছিন্ন করিতে, আইন আদালত ও গবর্ণমেন্টের শিক্ষায়তন ও চাকুরী বর্জ্জন করিতে শিষ্যগণকে উপদেশ দেন ; প্রথমত নামধারী সম্প্রদায়ের শিখগন গুরুর এই আদেশ পালন করে ; শুনিতে পাই কতকগুলি বিশেষ ভক্ত নামধারী রেলগাড়ী চড়ে না, গবর্ণমেন্টের ডাক বিভাগের সাহায্য পর্য্যন্ত লয় না। রামসিংহের প্রবর্ত্তনায় দেশময় জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল।

পুরোহিত মোহন্ত সম্প্রদায় বাবা রামসিংহের উপদেশে বিরক্ত হইয়া উঠিল, গবর্ণমেন্ট পাশ্চাত্য সভ্যতার এই নিন্দাবাদে ও অসহযোগের প্রবর্ত্তনে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন ;

তাঁহারা পাশ্চত্য সভ্যতার এই নিন্দাবাদকে ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন বলিয়া ধরিয়া লইলেন।

বাবা রামসিংহ দয়া, সত্যনিষ্ঠা ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিয়াছিলেন; অশিক্ষিত জনসাধারণ তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। কোন কোন স্থলে ধর্ম্মান্ধতা অসহিষ্ণুতারূপে দেখা দিতে লাগিল; মালেরকোট্‌লা নামক স্থলে জনৈক মুসলমান কসাই কর্ত্তৃক গোবধ বন্ধ করিতে গিয়া কয়েকজন নামধারী দাঙ্গা করিয়া বসিল। অধিকাংশই ধরা পড়িল; কয়েকজনকে তোপে উড়াইয়া দেওয়া হইল, বিচারের অভিনয়ে বহুজনের ফাঁসী হইল। বাবা রামসিংহ ধরা পড়িলেন; তিনি দাঙ্গার সম্ভাবনা দেখিয়া পুলিসকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দূর করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল; এই সুযোগ তাহারা বাবা রাম সিংহকে কয়েকজন অনুচরের সহিত ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে রেঙ্গুনে নির্ব্বাসিত করিল।

তাঁহার নির্ব্বাসনের পরই তৎপ্রবর্ত্তিত আন্দোলনের শেষ হইয়া যায়। ইহার পর ১৮৮৮ খৃঃঅব্দে লাহোরে খালসা দিবান নামে একটী সংস্কার সমিতি স্থাপিত হইল এবং শীঘ্রই ইহার শাখা দেশ ছাইয়া ফেলিল; এই সভার উদ্দেশ্য পূর্ব্ববৎই গুরুদ্বারগুলির পবিত্রতা ও নিজেদের সামাজিক উন্নতি বিধান করা। কিন্তু সমিতি বিশেষ আগ্রহ দেখাইলেন শিক্ষার প্রচারে। শিখগণ এই সময়ে নিজেদের মধ্যে শিক্ষার অভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছিলেন। এই সমিতির চেষ্টাতেই খালসা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল!

খালসা দিবান শিখ সমাজে নব জাগরণের সূচনা করিয়া দিয়াছিল! কিন্তু কিছু কাল পরেই এ সমিতি অকর্ম্মণ্য হইয়া যাওয়ায় প্রধান খালসা দিবান নামে আর একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূর্ব্বতন সমিতির কাজ হাতে লইল।

এই সময়ে শিখগণ গবর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্র, অনুগ্রহভাজন ছিল, সুতরাং এসকল কাজে অনেক সময়েই তাহারা গবর্ণমেণ্টের সহায়তা পাইতেছিল। এ সহায়তা কতখানি স্বাধীনতার বিনিময়ে কিনিতে হয় পরবর্ত্তীকালে খালসা কলেজের অবস্থাতে তাহা বোঝা যায়। গবর্ণমেণ্ট ক্রমে ক্রমে ইহার ভার নিজের হাতে লইয়া শিখগণের প্রভাব ক্ষুন্ন করিয়া দিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানে ইহা গবর্ণমেণ্ট কলেজেরই মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের সহিত শিখগণের প্রথম বিরোধ বাধিল ১৯১২ সালে।

দিল্লীর নবরাজধানীতে যেখানে বড়লাটের প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতেছিল তাহারই সম্মুখে রিকাবগঞ্জ গুরুদ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

এইখানেই অওরঙ্গজেবের অত্যাচারে নিষ্ঠুর ভাবে নিহত নবমগুরু তেগবাহাদুরের মৃতদেহের সৎকার হয়; সুতরাং এই স্থানটী শিখদের নিকট অত্যন্ত পবিত্র। গুরুদ্বারটী একটী খারাপ প্রাচীর দিয়া ঘেরা ছিল; লাটভবনের সম্মুখে এরূপ একটা কুদৃশ্য প্রাচীর রাখা যায় না; গবর্ণমেণ্টল্যাণ্ড একুইজিশনের আইনে গুরুদ্বারার মোহন্তর সহায়তায় গুরুদ্বারা ও প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী জমি কিনিয়া লইলেন। ১৯১৪ সালে এই দেওয়ালের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। লাহোরের প্রধান খালসা দিবান গবর্ণমেণ্টের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মান্ধতাই এখানে বিরোধ জাগাইয়া তুলিল। এখানে গবর্ণমেণ্ট যে ধর্ম্মে হাত দিয়াছিলেন বা অত্যাচার করিতে ছিলেন এ কথা বলা চলে না। গবর্ণমেণ্ট গুরুদ্বারের সম্পর্কিত যে জমিগুলি লইয়াছিলেন তাহার বিনিময়ে ভাল জমিই দিয়াছিলেন; গুরুদ্বারার পূজা পাঠ ও গমনাগমন সম্বন্ধে কোন প্রকার বিধি নিষেধ তাঁহারা রাখেন নাই; তাঁহারা শুধু গুরুদ্বারসংলগ্ন জমীটাকে নিজেদের অধীনে রাখিয়া সুন্দর করিতে চাহিলেন; তাহাদের এই শেষ প্রস্তাবটী শিখদের মনোমত হইল না।

ধর্ম্মান্ধ, অন্ধভক্তিপরায়ণ লোক সকল দেশেই সকল সময়েই থাকে; তাহারা সুযোগ পাইলেই কোলাহল করে; তাহাদের বিশ্বাসের মূল্য আছে সত্য কিন্তু অনেক সময়ে তাহা অবাঞ্ছিত ফল প্রসব করে; এবং বাহুল্যের সৃষ্টি করে।

রিকাবগঞ্জ গুরুদ্বার লইয়া এই বিরোধে বেশ আন্দোলনই জাগিয়া উঠিল; স্থানে স্থানে সভা হইতে লাগিল; অবশেষে গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া সভা বন্ধ করিয়া দিতে হইল। ঠিক এই সময়েই আরো কতকগুলি কারণে শিখগণের মন আলোড়িত হইতেছিল। রাবী নদী হইতে অমৃতসরের পবিত্র পুষ্করিণীগুলিতে ভাল জল আনিবার জন্য একটী খাল বৃটিশশাসনের বহুপূর্ব্বেই খনিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট কি কারণে জানি না এই খাল বন্ধ করিয়া জল সরবরাহের জন্য নলকূপের ব্যবস্থা করিলেন। বহুদিনের প্রচলিত প্রথায় বাধা পড়ায় শিখগণ বিরক্ত হইয়া উঠিল।

কৃপান ব্যবহার ও জেলে কঙ্খা চিরুণী ব্যবহার লইয়াই আন্দোলন চলিতেছিল; এই দুইটাই শিখগণের পক্ষে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ধর্ম্মসাধনপঞ্চকের অন্যতম ছিল। কৃপাণগুলির দৈর্ঘ্য ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট ছিল না! গবর্ণমেণ্ট কৃপাণ ব্যবহারের আন্দোলন সুদৃষ্টিতে দেখিতে পারিলেন না। দেশে বীর্য্যের অনুশীলন হয় ইহা বোধহয় তাঁহাদের মনোমত হয় নাই; তাঁহারা কৃপাণের দৈর্ঘ্য নির্দ্দেশ করিয়া কৃপাণ ব্যবহারের আন্দোলন নষ্ট করিতে চাহিলেন।

এইরূপ নানাকারণে যখন শিখগণের মন উত্তেজিত হইতেছিল তখন কোমাগাটা মারু জাহাজের ঘটনা হইয়া শিখগণের মনে অসন্তোষ ও বিরোধ বাড়িয়া উঠিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীনির্ভয় সিংহ

উপায় নির্দ্ধারণ

প্রসিদ্ধ লেখক এইচ্ জি ওয়েল্স্ তাঁহার "Outline of History"তে, ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের গঠনকার্য্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ঠিক যতটুকু পরিষ্কার করিয়া ভাবা হইয়াছিল, বিপ্লবীরা তাহার সমস্তই করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার বেশী আর কিছুই কোন দিকে গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় নাই। বাংলার চিন্তাজগতের বর্ত্তমান অবস্থায় ওয়েলসের এই কথা বিশেষ অর্থপূর্ণ এবং মূল্যবান।

প্রায় কুড়ি বৎসর হইল, আমরা আমাদের মঙ্গলঅমঙ্গলের কথা লিখিয়া বিশেষভাবে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তাহার আগেও আলোচনা হইয়াছে এবং খুব ব্যাপকভাবেও হইয়াছে, কিন্তু আলোচকের সংখ্যা খুবই কম ছিল। এই কুড়িবৎসরে প্রায় একসহস্র লোক (এটা সম্পূর্ণ আমার আন্দাজ) নানা দিক্ হইতে এই আলোচনায় যোগ দিয়াছেন; কিন্তু আজও আমরা মঙ্গলঅমঙ্গলের কুয়াশা কাটাইয়া কোনও পরিষ্কার জায়গায় আসিতে পৌঁছিতে পারি নাই। ইহার কারণ কি? কেন এমন হয়?

এই প্রশ্ন নিতান্ত তুচ্ছ প্রশ্ন নয়; এই প্রশ্নের দিকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলেই আমার উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হইবে। হঠাৎ ইহার একটা উত্তর দিতে আমি মোটেই সমর্থ নই এবং উত্তর দেওয়া উচিৎও মনে করি না। তথাপি কোন্ দিক দিয়া এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতে পারে, সেই বিষয়ে কিছু আন্দাজ দিতে চেষ্টা করিব।

একটা নির্দ্দিষ্ট সমস্যা লইয়া বিচার আরম্ভ করা যাউক্। সমস্যার মোটেই অভাব নাই; আমি "বঙ্গসমাজে নারীর অবস্থা" এইটাকেই বাছিয়া লইলাম। দেখা যাউক আমরা এই বিষয়ে কতগুলি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।

প্রথমতঃ বঙ্গসমাজে নারীর কথা আলোচনা করিবার সময় সময় আমরা মোটেই মুসলমান রমণীর উল্লেখ করি না। কেন? বাঙ্গলাদেশের মুসলমান কি বাঙ্গালী নয়? মুসলমান রমণী কি বঙ্গসমাজের অন্তর্ভুক্ত নন? বঙ্গসমাজে নারীর কথা কাগজে যত আলোচিত হইয়াছে, এক স্বরাজ ছাড়া বোধ হয় আর কিছুই এত বেশী আলোচিত হয় নাই; কিন্তু অধিকাংশ হিন্দু লেখকের লেখা পড়িলে এ সন্দেহ আদৌ হয় না যে বঙ্গসমাজে মুসলমান আছে এবং এবং মুসলমানগণের মধ্যে নারীও থাকিতে পারে।

হিন্দুলেখকের পক্ষে মুসলমানরমণীর বিষয় আলোচনা করা উচিত কিনা ইহা এক বিভিন্ন প্রশ্ন—এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় না। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের বুদ্ধিজীবন যদি সজাগ থাকিত তাহা হইলে কোন লেখকই শুধু হিন্দু বা শুধু মুসলমানের কথা বলিতে গিয়া বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী এই দুইটী শব্দের অপব্যবহার করিতে সাহস পাইত না।

দ্বিতীয়তঃ হিন্দু সমাজের নারীর কোন শ্রেণী বিভাগ করা কেহই আবশ্যক মনে করেন না। হিন্দু সমাজের সমস্ত নারীর অবস্থা কি একই? কায়স্থ পরিবারের নববিবাহিতা বধূ এবং আগুরী চাষীর কর্ম্মঠ স্ত্রী কি সমানই পর্দ্দানশীন? অধ্যাপক কন্যা এবং কুম্ভকার কন্যার শিক্ষার সমস্যা কি একই? মৌলিক কায়স্থকন্যা এবং রজককন্যার বিবাহে কি সমানই পণ দিতে হয়? এই সকল প্রশ্নের কোনই উত্থাপন দেখি না। যাহা কোন বিশেষ শ্রেণী-সম্বন্ধে খাটে তাহা সমস্ত হিন্দু সমাজের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যে ভুল এবং এই রূপ ভুল করা যে অপরাধ, এই বিষয়ে কোন সজাগ কর্ত্তব্যবুদ্ধির পরিচয় খুব অল্প লেখকের মধ্যেই দেখিতে পাই।

অবশ্য অধিকাংশ লেখায় যে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত এবং ভদ্র পরিবারের নারীর কথাই আলোচিত হইয়া থাকে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু যে সকল শব্দ ব্যাবহার

করি তাহার অর্থ যথাসম্ভব স্থির থাকা দরকার। একজন বিখ্যাত লেখক Philosophyর সংজ্ঞা দিয়াছেন "A Criticism of Categories"; কথাটা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। Terms ও Concepts, শব্দ ও কোন বিশেষ শব্দে ঠিক কি কি বুঝায়, তাহা নির্দ্দিষ্ট ভাবে সংজ্ঞীভূত না হইলে, পরিষ্কার চিন্তা করা ও অপরের চিন্তায় যোগ দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, ইহা এতদূর সত্য যে ইহার উল্লেখ মানুষের বুদ্ধির পক্ষে অপমানজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় আমাদের চিন্তাজগতে এই সহজ সত্যের ব্যতিক্রমটাই নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত এবং ভদ্র পরিবারের নারী সম্বন্ধে যদিও অসংখ্য আলোচনা হইয়াছে, তথাপি আমরা কি চাই, আমাদের লক্ষ্য ঠিক কি কি, বর্ত্তমান অবস্থার ঠিক কি কি পরিবর্ত্তন হইলে মঙ্গল নামক আমাদের অনির্দ্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষিত বস্তু কতটা বাস্তবে পরিণত হইতে পারে তাহা এতটুকুও পরিষ্কার হয় নাই, এমন কি তাহা নির্দ্দিষ্ট করার কোনরূপ চেষ্টাও হয় নাই। ফলে হইয়াছে, একজন লেখক কিছু লিখিতে ইচ্ছা হইলেই, গোড়া হইতেই সমস্তই আলোচনা সুরু করিয়া দেন এবং আর একজন লেখক তাহার কিছুই না বুঝিয়া, অতি সহজে সমস্তটাই ভুল দেখাইয়া দেন।

ধরা যাউক্ স্ত্রীস্বাধীনতা! সকলেই এই শব্দের সহিত সুপরিচিত। কিন্তু স্ত্রী স্বাধীনতা বলিতে আমরা ঠিক কি বুঝি? বাঙ্গালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ও ভদ্র পরিবারের নারীর অবস্থার ঠিক কি কি পরিবর্ত্তন হইলে, স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে আমাদের আকাঙ্ক্ষার ও দাবীর পূরণ হইতে পারে? এ বিষয়ে কোনই মতৈক্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহার কারণ স্ত্রীস্বাধীনতা বলিতে অধিকাংশই লেখকই যদিও ইউরোপীয় নারীর এবং ব্রাহ্ম নারীর সামাজিক অবস্থা যেরূপ তাহাই বুঝিয়া থাকেন এবং হিন্দু সমাজে তাহা হইতে পারিলে ভালই হইত বলিয়া মনে করেন, কিন্তু ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা তাঁহারা দরকার মনে করেন না। তাহা না করিয়া তাঁহারা বুঝাইতে চেষ্টা করেন হিন্দু নারীর অবস্থাটা একবার ভাল বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করিলেই তাহার মধ্যে অনেক ভাল জিনিষ দেখিতে পাইব এবং ব্রাহ্ম নারীর অবস্থার মধ্যে একবার দোষ খুঁজিতে আরম্ভ করিলে বিস্তর দোষ তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িবে। ইহাতে বিরক্ত হইয়া যে সকল লেখক স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, তাঁহারা ইঁহাদের মতের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিবাদে মনোযোগ দেন। এইরূপে আসল কথাটা পূর্ব্বেকার মতই অপরিষ্কার থাকিয়া যায়।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধেও আমরা ইহাই দেখিতে পাই। লেখকের পর লেখক এখনও আলোচনা করিতেছেন, শিক্ষা না পাইয়াও রাম বাবুর প্রপিতামহী কোনরূপ দুঃখের আত্ম-জীবনী লিখিয়া যান নাই, কাজেই রাম বাবুর স্ত্রীর যদি কোন দুঃখ থাকে তবে তাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বাল্মিকীর কাব্যে সীতা রামের অনুগামী হইয়াছিলেন, সুতরাং সুরেশচন্দ্রের স্ত্রী যে স্বামীর কথার উত্তর দিতে শিখিয়াছে তাহা কেবল বেথুন কলেজে পড়িয়াই। এক কথায় শিক্ষা না পাইয়াও কতকগুলি লোক সুখী হইয়াছেন সুতরাং শিক্ষাই আমাদের সমস্ত দুঃখের একমাত্র কারণ। দক্ষতর লেখকেরা, এই সমস্ত প্রলাপের মধ্যে কোথায় কোথায় সঙ্গতির অভাব

হইয়াছে, তাহা দেখাইতেই নিজেদের ব্যস্ত রাখিয়াছেন। এদিকে নারীদের কতটা শিক্ষা চাই এবং কিরূপ শিক্ষা চাই, তাহাদের রোমের ইতিহাস পড়া দরকার না মৎস্যপুরাণ পড়া দরকার, শিক্ষা পাইতে কি সকলকে বাধ্য করা উচিত না শিক্ষা ব্যাপারটা লোকের মর্জ্জির উপর ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, এই সকল ও আরও অসংখ্য জটিল প্রশ্ন সমানই জটিল হইয়া রহিয়াছে। কিছু একটা ঠিক করিয়া ফেলা যে দরকার এবং তাহা না হইলে বেশ চেতনভাবে নিজেদের ভাগ্য নিজেরা গড়িয়া তোলা যে একেবারে অসম্ভব, এই সত্যের প্রভাব আমাদের চিন্তাজগতে খুবই অপরিস্ফুট।

চতুর্থতঃ, লক্ষ্য কি তাহা স্থির না থাকার দরুণ, উপায় স্থির করার চেষ্টা আমরা আদৌ করি নাই। কি চাই তাহাই যখন জানি না, তখন তাহা লাভ করার উপায় স্থির করা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু চিন্তা করার যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে তবে তাহা হইল, দুঃখের নিকট, অসত্যের নিকট পরাজয় স্বীকার না করিয়া, কাহার উপর নির্ভর করিয়া এই দুঃখ ও এই অসত্য এতদূর বলবান্ হইয়া উঠিয়াছে তাহা নির্ণয় করা, এবং অনুসন্ধান করা কোন্ উপায়ে তাহাদের আক্রমণ করিলে তাহারা দূরীভূত হইবে। যদি চিন্তা করার উদ্দেশ্য ইহা না হয় তবে চিন্তা করা বিফল, এমন কি অনিষ্টকর। দুঃখের বিষয়, চিন্তা করিয়া কোনরূপ উপায় ঠিক করা আমরা এতদূর অসম্ভব মনে করি, যে কতকটা এই কারণেই আমরা লক্ষ্য ঠিক রাখা দরকার মনে করি না এবং যাহা ইচ্ছা খানিকটা বকিয়া গিয়া মনের ঝাঁজ কতকটা মিটাইয়া লই।

জোড়াসাঁকোর আনন্দময়ীর কথা অনেকের মনে থাকিতে পারে। "বঙ্গসমাজে নারীর অবস্থা" সম্বন্ধে যাঁহারা ভাবিয়া থাকেন তাঁহারা সেই ব্যাপারে অনেক মশলা পাইয়াছিলেন এবং লিখিয়া মনের ঝাঁজ মিটাইবার এক অপূর্ব্ব সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ফল হইয়াছিল কি? আনন্দময়ীর দুঃখের ঠিক কারণ কি আবিষ্কৃত হইয়াছিল? ভবিষ্যতে আর যাহাতে এইরূপ ঘটনা না হয় তাহার কি কোন উপায় ঠিক হইয়াছে? কিছুই হয় নাই। কেন না, কিছু যে হইতে পারে এই বিশ্বাস লইয়া রীতিমত চিন্তা করিতে কেহই অগ্রসর হন নাই।

যে কোন বিষয় অনুসন্ধান করিতে হইলে, সেই বিষয়ে যতগুলি প্রশ্ন উঠিতে পারে তাহার সমস্তগুলির ঠিক উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ এই আনন্দময়ীর ব্যাপারকেই ধরা যাক্। তাহার পিতা তাহাকে স্বগৃহে লইয়া যাইতে পারেন নাই কেননা তাহার স্বামীর ও শাশুড়ীর ইহাতে অমত ছিল। তাহাদের মতের এত জোর কোথা হইতে আসিল? শুনিয়াছি আইনমতে স্বামী তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রীকে কাছে থাকিতে বাধ্য করাইতে পারেন। যদি তাহা হয়, তবে সেই আইন বদলান দরকার; সুতরাং আমাদের একটা লক্ষ্য এই আইন তুলিয়া দেওয়া। এইরূপে লক্ষ্য স্থির হইলে, তখন সেই লক্ষ্যে পৌছিবার উপায় ঠিক করা চলিতে পারে। আনন্দময়ীর স্বামী তাহাকে বেত্রাঘাত করিলেও ও লোহা পোড়াইয়া ছেঁকা দিলেও, বাহিরে কেহই তাহা জানিতে পারিত না। আমাদের সমাজে নারীর ইচ্ছামত বাটীর বাহিরে যাইবার ক্ষমতা থাকিলে কখনই এইরূপ সম্ভব হইত না। সুতরাং দেশে আনন্দময়ীর সংখ্যা কমাইতে হইলে আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নারীর ইচ্ছামত

চলাফেরা করার অধিকার লাভ। এই লক্ষ্য কতদূর সম্ভব বা অসম্ভব ইহা পরের কথা। কিন্তু কার্য্যকে তাহার কারণের সহিত যুক্ত করিতেই হইবে। আমরা অক্ষম বা দুর্ব্বল হইতে পারি কিন্তু ভুল বুঝিব কেন ?

বঙ্গসমাজে নারীর অবস্থা আলোচনা করাই আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমি এই প্রশ্ন লইয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা মঙ্গলজনক নয় বুঝিয়াও আমরা কেন অমঙ্গলের কতকগুলি কারণ এবং সেই কারণগুলি দূর করার কয়েকটি উপায় স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। বঙ্গনারী প্রসঙ্গে দেখিয়াছি আমরা রীতিমত চিন্তা করি না, কার্য্যকারণসম্বন্ধ অনুসন্ধান করি না, conceptগুলিকে সংজ্ঞীভূত অর্থে ব্যবহার করি না, চিন্তা করিয়া লক্ষ্য স্থির করার চেষ্টা করি না এবং সকলের উপরে ভাবিয়া উপায় ঠিক করিয়া যে নিজেদের অমঙ্গল নিজেরাই দূর করিতে পারি, এইরূপ বিশ্বাস আমাদের আদৌ নাই। হয়ত আমায় প্রসঙ্গে এই কথাগুলি ঠিক ফুটিয়া উঠে নাই ; হয়ত এই কথাগুলি খুব পুরাণো এবং চেনা চেনা বলিয়া ঠেকিতে পারে, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু আমার প্রধান প্রশ্নটির উত্তর যে কতকটা এই দিকে, এইটুকু পরিষ্কার হইয়া থাকিলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

কিন্তু ইহার প্রতিকার কি ? অর্থাৎ আল্‌গাভাবে চিন্তা করার প্রবৃত্তির মূল কারণ কি এবং কি উপায়ে আমাদের মধ্যে রীতিমত চিন্তা ও অনুসন্ধান করার প্রবৃত্তি আসিতে পারে ? এই প্রতিকার সম্বন্ধে আমার সামান্য কিছু বলিবার আছে।

প্রথমে আল্‌গা চিন্তা ও রীতিমত চিন্তা বলিতে কি বুঝায়, তাহাদের প্রভেদ কি তাহা পরিষ্কার বুঝা দরকার। বাঙ্গালাদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম প্রচলন হইতেই, দেশে এখন একদল লোক দেখিতে পাই যাঁহারা বিশ্বাস করেন দেশে নারীস্বাতন্ত্র্যের দরকার, অর্থাৎ সোজাকথায়, নারীরা ইচ্ছামত বেড়াইতে পারে, পরস্পরের সহিত মিশিতে পারে, খোলা মাথায় পুরুষের সহিত সাহস করিয়া কথা বলিতে পারে, অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে, সেরূপই হওয়া উচিত। এমন কি কেহ কেহ বিশ্বাস করেন, নারীস্বাতন্ত্র্যের অভাবই আমাদের দেশের সব চেয়ে বড় অমঙ্গল। আমি হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই কথা বলিতেছি। আমি কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না বাঙ্গালী মুসলমানগণের মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি নারী স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করেন : এই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় দল, কি উপায়ে, আমাদের এই বাঙ্গালাদেশে নারী স্বাতন্ত্র্য বাস্তবিকই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার না করিয়া, উদ্দেশ্য লাভের প্রত্যেক ধাপটী মনে মনে গাঁথিয়া লইবার চেষ্টা না করিয়া, শুধু অপর পক্ষের সহিত নিজেদের বিশ্বাস ভুল কি ঠিক এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া, এবং নারী স্বাতন্ত্র্যের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের সমস্ত চিন্তাশক্তি ক্ষয় করিতেছেন। ইহাই আমার মতে আল্‌গা চিন্তা।

এখন রীতিমত চিন্তার একটি উদাহরণ দেখা যাক্। ইউরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্যবসায় বিপ্লবের ফলে যখন ক্রমে ক্রমে শ্রমিকরা ধনিকদের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া পড়িল তখন দেশের অর্থবিভাগের ন্যায় অন্যায়ের দিকে সকলের দৃষ্টি পড়িল। যাহারা কাজ করে তাহাদের খাইতে পাইবার ও সুখে থাকিবার অধিকার আছে এই বিষয়ে সাধারণ ভাবে অনেক আলো-

চনা ও অশেষ বাদ প্রতিবাদ চলিতে লাগিল; কিন্তু আলোচনা ঐখানেই থাকিল না Fourier, St. Simon, Marx ইত্যাদি জনকতকলোক ভাবিতে বসিলেন, কর্ম্মীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যে অধিকার ত আছেই, কিন্তু সেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে কিরূপে; যে জনকতক লোক পৃথিবীর যাহা কিছু তাহার তিনভাগ দখল করিয়া বসিয়া আছে তাহাদের বেদখল করা যায় কিরূপে। তাঁহারা সমাজবন্ধনের কোন শৃঙ্খলকেই হাতুড়ী মারিতে কুণ্ঠিত হইলেন না; সম্ভব অসম্ভব সবরকম সুবিস্তৃত খসড়া তৈয়ার করিতে লাগিলেন। কেহ ঠিক করিলেন রাষ্ট্রকে হাত করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে; কেহ ঠিক করিলেন দেশে বিপ্লব আনিতে হইবে; কেহ ঠিক করিলেন রাষ্ট্রকে একেবারে তুলিয়া দিতে হইবে। তাঁহাদের এই সব নানা ফন্দী ও মতলব প্রথম প্রথম অনেকেরই ঠাট্টার জিনিষ ছিল। কিন্তু আজ আমরা বুঝিতে পারিতেছি, এই সব ফন্দীবাজ লোকেদের মতলবের ফলেই রুষিয়ার বিপ্লবের মত এতবড় যুগান্তকারী ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারিয়াছে। ইহাই রীতিমত চিন্তা।

ইউরোপের চিন্তার এই বিস্ময়কর সাফল্যের মূল কারণ সেখানকার চিন্তাশীল লোকেদের মনে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অন্ত ছিল না। মানুষের ব্যক্তিত্বের চেয়ে পবিত্রতর জিনিষ তাঁহাদের নিকট আর কিছুই ছিল না। ইহাতে একদিকে যেমন বুদ্ধিকে তাঁহারা বাইবেল, পোপ, গীর্জ্জা, গণতন্ত্র, পালিয়ামেণ্ট, শ্রমবিভাগ, অবাধবাণিজ্যনীতির চেয়ে বেশী বিশ্বাস করিতেন, অপরদিকে তেমনই বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ নরনারীদের সমস্ত দুঃখ যে কোন উপায়ে দূর করাই তাঁহারা সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। আর একটা কথা, মানুষের শক্তিতে তাঁহারা সন্দিহান ছিলেন না। কাজেই কিসে মানুষের মঙ্গল হয়, এই বিষয়ে বুদ্ধির সিদ্ধান্তকে বাস্তবে পরিণত করার দিকেই তাঁহারা সমস্ত চেষ্টা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহাদের সাফল্যের মূল কারণ।

আলগা ভাবে চিন্তা করার প্রবৃত্তির মূল কারণ কি তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি—মূল কারণ মানুষের প্রতি বিশ্বাসের অভাব। রীতিমত চিন্তা ও অনুসন্ধান আরম্ভ করিতে হইলে প্রথমে আমাদের মানুষকে এবং মানুষের বুদ্ধিকে অকুণ্ঠিত ভাবে বিশ্বাস করিতে হইবে এবং সেই বিশ্বাসের নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করিতে হইবে। আমি বলিতে চাই, এই বিশ্বাস লইয়া সমাজের মঙ্গল সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু সত্য বলিয়া জানি, ধর্ম্ম সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন বাধা না মানিয়া তাহাকে এই বাঙ্গলাদেশে বাস্তব করিবই, এই উদ্দেশ্যে এখন হইতে উপায় ঠিক করা আরম্ভ হউক্। এই উদ্দেশ্য লইয়া দেশে একটা চিন্তাসংঘ গড়িয়া উঠুক্। আমাদের সমস্ত দাবী সংজ্ঞীভূত হউক্ এবং সেই দাবী আদায়ের যত রকম উপায় থাকিতে পারে, তাহার আলোচনা চলিতে থাকুক্। আজ সময় প্রতিকূল বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু কি চাই তাহা ঠিক না থাকিলে, যেদিন সুবিধা আসিবে সেই অনুকূল মুহূর্ত্তে আমরা কিছুই ভাল করিয়া গুছাইয়া লইতে পারিব না। আমি ওয়েলসের যে কথা দিয়া এই প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছিলাম, সেই কথার সত্যতা সেইদিন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিব!

শ্রীঅমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

তৃতীয় অধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই সকল বিভিন্ন কারণ ও শক্তির সমবায়ে পঞ্চম ও নবম শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপীয় সমাজকে বর্ব্বরতার কবল হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত নানা বিচিত্র চেষ্টা উদ্ভূত হইয়াছিল।

প্রথম চেষ্টাটি স্বল্প পরিমাণেই কার্য্যকরী হইয়াছিল, কিন্তু ইহাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না, কারণ এ চেষ্টা বর্ব্বর জাতিদের মধ্য হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। ষষ্ঠ ও অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন বর্ব্বর জাতির বিবিধ বিধান সঙ্কলিত ও লিপিবদ্ধ হইল। ইহার পূর্ব্বে এগুলি কখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই। রোমীয় সম্প্রদায়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্ব্বে বর্ব্বরদিগের জীবনযাত্রা অলিখিত রীতি নীতির দ্বারাই শাসিত হইত। যে সকল বিধি বিধান লিপিবদ্ধ হইল তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই উল্লেখযোগ্য—বর্গণ্ডীয় বিধি, সালীয় বিধি, রিপুয়ারীয় ফ্রাঙ্কদিগের বিধি, বিসিগথ্ বিধি, লম্বার্ড বিধি, সাক্সন বিধি, ফ্রিসীয় বিধি, বাভেরীয় বিধি ও আলেমানী বিধি। এখানে স্পষ্টতঃই সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইবার একটা প্রথম চেষ্টা দেখা যাইতেছে; সমগ্র সমাজকে একটা সাধারণ বিধিনিয়মের অধীনে আনিবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে। এ চেষ্টার সফলতা যে খুব অধিক হইবে এরূপ আশাকরা যায় না; কারণ বর্ব্বর সমাজ যখনও রোমীয় সাম্রাজ্যের সীমানার মধ্যে আসিয়া বাস করে না, যখনও তাহারা যাযাবর সামরিক জীবনযাত্রার পরিবর্ত্তে স্থাবর ভূ সম্পত্তির অধিকারী হইয়া সুস্থির জীবনযাত্রা আরম্ভ করে না, সেই আদিম সমাজের বিধিবিধান এখন লিপিবদ্ধ হইল মাত্র। এই সকল বর্ব্বর সংহিতার মাঝে মাঝে কোথাও বা এমন দুই একটা বিধান পাওয়া যায় বটে যাহাতে বিজিত ভূসম্পত্তির উল্লেখ আছে অথবা প্রাচীন অধিবাসীবর্গের সহিত বিজেতৃবর্গের সম্বন্ধনির্দ্দেশের চেষ্টা আছে; কিন্তু এই সকল বিধির অধিকাংশই জার্ম্মান জাতির প্রাচীন অবস্থার পক্ষেই প্রযোজ্য। নবীন জার্ম্মান সমাজে এই সকল বিধি অধিকাংশ স্থলেই অপ্রয়োজ্য ছিল, এবং এই সমাজের বিকাশ সাধনে ইহাদের কার্য্যকারিতা অতি সামান্য।

এই সময়েই ইটালী ও দক্ষিণ গলে আর এক প্রকার চেষ্টা আরম্ভ হয়। সেখানে অন্য স্থানের মত রোমীয় সমাজ সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয় নাই। নগরগুলির মধ্যে অন্য দেশ অপেক্ষা কিছু অধিক শৃঙ্খলা ও জীবনী শক্তি ছিল। এই নগরগুলির মধ্যে সভ্যতা পুনরায় মাথা তুলিতে চেষ্টা করিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যদি থিয়োডোরিকের শাসন কালে ইটালীর অষ্ট্রোগথ্ রাষ্ট্রের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে দেখিব বর্ব্বর জাতি ও বর্ব্বর রাজার শাসনেও প্রাচীন পৌরতন্ত্র বেশ টিকিয়া আছে এবং চারিদিকের ঘটনাবলীর উপর প্রভাব বিস্তার

করিতেছে। দক্ষিণ গলেও ঐ ব্যাপার দেখা যায়। অষ্ট শতাব্দীর প্রারম্ভে আলারিক নামক টুলুস্ নগরের একজন বিসিগথ্ রাজার আদেশে রোমীয় ব্যবহার বিধি সঙ্কলিত হইল; তিনি ঐ সংহিতা গ্রন্থ তাঁহার রোমীয় প্রজাবর্গের জন্য Brevia rum Ariani নামে প্রকাশিত করিলেন।

স্পেনে আর এক পক্ষ হইতে সভ্যতার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা হইল। চর্চ্চই এই চেষ্টার প্রবর্ত্তক। প্রাচীন জার্ম্মান যোদ্ধ সভার পরিবর্ত্তে টোলেডোর চর্চ্চ সংসদেরই স্পেনে প্রাধান্য হইল। যদিও সম্ভ্রান্তপদস্থ বাহিরের লোকও এই সংসদে উপস্থিত হইতেন, তথাপি বিশপদিগেরই তথায় প্রাধান্য। বিসিগথ্ দিগের ব্যবহার বিধির আলোচনা করুন; দেখিবেন তাহা মোটেই বর্ব্বর বিধি নহে; এ সংহিতা নিশ্চয়ই সেকালের দার্শনিকগণ কর্ত্তৃক অর্থাৎ যাজক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়া ছিল। ইহার মধ্যে সাধারণ নীতির, সাধারণ তত্ত্বের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য, সে সকল নীতি ও তত্ত্বের সহিত বর্ব্বর রীতি নীতির কোনই সম্পর্ক নাই। একটা দৃষ্টান্ত দেখুন। আপনারা জানেন বর্ব্বরদিগের সমস্ত বিধি বিধান ব্যক্তিগত ও জাতিগত; অর্থাৎ এক জাতির লোকের পক্ষেই এক বিধি প্রয়োজ্য। রোমীয়গণের পক্ষে রোমীয় বিধির প্রয়োজন হইবে, ফ্রাঙ্কদিগের পক্ষে ফ্রাঙ্ক বিধির প্রয়োজন হইবে; প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র বিধি, যদিও সকলেই এক দেশে এক রাজ শাসনে বাস করিতেছে। ইহারই নাম হইল ব্যক্তিগত বিধান; এবং ইহার উল্টা বিধানের নাম বাস্তব বিধান, যে বিধান জাতি-কুলনির্ব্বিশেষে এক ভূখণ্ডের অধিকারী সকলের পক্ষেই প্রয়োজ্য। এখন, বিসিগথদের বিধান ব্যক্তিগত বা জাতিগত নহে, দেশগত। বিসিগথ্ই হউক, রোমীয়ই হউক, স্পেনের সমস্ত অধিবাসী একই বিধানের বশবর্ত্তী। এই আলোচনায় আরও কিছুদূর অগ্রসর হউন, দেখিবেন দার্শনিকতার আরও নিদর্শন পাওয়া যাইবে। বর্ব্বর দিগের মধ্যে বিভিন্ন লোকের অবস্থা ও পদবী অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইত। বর্ব্বর, রোমীয়, স্বাধীন ভূস্বামী, আশ্রিত প্রজা, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের জীবনের মূল্য আইনের চক্ষে এক ছিল না। বিসিগথ্দের শাসন কালে আইনের চক্ষে সকলেরই জীবনের এক মূল্য এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। বিচার পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, দেখিবেন দ্বন্দ্বযুদ্ধের দ্বারা ন্যায় পরীক্ষার পরিবর্ত্তে সাক্ষ্যদ্বারা প্রমাণ, যুক্তিমূলক বিচার প্রভৃতি সভ্য সমাজোপযোগী বিচার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইল। এক কথায় সমগ্র বিসিগথ্ বিধির মধ্যে একটা সুচিন্তিত, সুসম্বদ্ধ ও সামাজিক ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়।

অতএব স্পেনে আরব আক্রমণের অব্যবহিত কাল পর্য্যন্ত যাজকতন্ত্রই সভ্যতাকে বাঁচাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

ফ্রান্সে এই একই চেষ্টা আর এক শক্তির দ্বারা আরব্ধ হইল। এখানে মহাপুরুষের চেষ্টা, বিশেষতঃ শার্লেমেনের চেষ্টাই উন্নতির মূল। নানা দিক হইতে তাঁহার শাসন কালের পর্য্যালোচনা করুন; দেখিবেন প্রজাবর্গকে সভ্য করিয়া তুলিবার সংকল্পই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান চিন্তার বিষয়। প্রথমে তাঁহার যুদ্ধ বিগ্রহের আলোচনা করুন। তিনি সর্ব্বদাই যুদ্ধক্ষেত্রে কাল কাটাইতেছেন, দক্ষিণ হইতে উত্তর পূর্ব্ব দিকে পূর্ব্বান্ত, এব্রোনদী হইতে

এল্‌ব্‌ অথবা ওয়েজার নদী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তিনি যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত। আপনারা কি বিশ্বাস করিতে পারেন যে এ যুদ্ধগুলি সমস্তই খামখেয়ালী ব্যাপার, অথবা কেবল মাত্র বিজয় লিপ্সার পরিচয়? কিছুতেই না। আমি এ বলিতে চাই না যে তাঁহার যুদ্ধপ্রণালীর মধ্যে অনেক পরিমাণ চাতুরী, কৌশল বা নীতিকৌটিল্য ছিল না; কিন্তু তিনি এক বৃহৎ প্রয়োজনের তাড়নায় এই সকল যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন; সে প্রয়োজন আর কিছুই না, বর্ব্বরতায় উৎসাদন। তাঁহার সমগ্র রাজত্বকাল ব্যাপিয়া তিনি একদিকে মুসলমান আক্রমণ, অপর দিকে স্লাব্‌ আক্রমণ, এই উভয় আক্রমণ প্রতিরোধ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। শার্লমেনের রাজত্বের যে যুদ্ধবিগ্রহ, ইহাই হইল তাহার প্রকৃতি; সাক্‌সিনদিগের বিরুদ্ধে যে তিনি যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন তাহার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

তাঁহার যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়িয়া তাঁহার আভ্যন্তরীণ শাসনপ্রণালী যদি আলোচনা করেন, সেক্ষেত্রেও ঐ একই প্রকৃতি দেখিতে পাইবেন। তাঁহার অধিকারভুক্ত সমস্ত দেশের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা ও একত্ব স্থাপন করা—ইহাই হইল তাঁহার শাসনতন্ত্রের মূলনীতি। শার্লমেনের অধিকার নির্দ্দেশ করিতে হইলে রাজ্য (kingdom) বা রাষ্ট্র (State) কোন আখ্যাই ঠিক খাটে না, কারণ ঐ শব্দ দুইটির দ্বারা যে নিয়ম শৃঙ্খলার ভাব ব্যঞ্জিত হয় শার্লমেন শাসিত সমাজের পক্ষে সে ভাব প্রযোগ্য হয় না। কিন্তু এটা নিশ্চয় যে এক বিশাল ভূখণ্ডের অধীশ্বর হইয়া চারিদিকে বিশৃঙ্খলা অরাজকতা ও বর্ব্বরতার দৃশ্য তাঁহাকে অসহিষ্ণু করিয়া তুলিয়াছিল, তিনি এই বীভৎস দৃশ্যের পরিবর্ত্তন সাধনে সচেষ্ট হইলেন। প্রথমে তিনি তাঁহার রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্র একদল কর্ম্মচারী প্রেরণ করিলেন, যাঁহারা বিভিন্ন প্রদেশের রীতিনীতি লক্ষ্য করিবেন ও সংস্কার করিবেন অথবা তাঁহার নিকট সমস্ত বিজ্ঞাপন করিবেন। পরে পরে তিনি কতকগুলি সাধারণ সম্মিলনীর সাহায্যে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার সময়ে এই সম্মিলনীগুলির পূর্ব্বাপেক্ষা নিয়মিত অধিবেশন হইতে লাগিল। এই সকল সভায় তাঁহার রাজ্য মধ্যে গণ্যমান্য যে কেহ আছে সকলকেই উপস্থিত করাইতেন। সেগুলি অবশ্য জনগণের স্বাধীন সম্মিলনী নহে; অথবা আমরা যেরূপ স্বাধীন আলোচনায় এখন অভ্যস্ত, সেরূপ আলোচনা অবশ্য সেখানে হইত না, এই সম্মিলনগুলি শার্লমেনের নিকট কেবল তথ্যসংগ্রহের ও উচ্ছৃঙ্খল প্রজাবৃন্দের মধ্যে কোন প্রকার শৃঙ্খলা ও একতা স্থাপনের উপায় স্বরূপ ছিল।

শার্লমেনের রাজত্বের যেদিক দিয়াই বিচার করুন সর্ব্বত্রই এই এক ব্যাপার—বর্ব্বরতার উৎসাদন ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠা। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগ্রহ, পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রতি প্রীতি, যাজক সম্প্রদায়ের পক্ষ সমর্থন—এক কথায় তিনি সমাজের উন্নতি কল্পে বা ব্যক্তির উন্নতি কল্পে যাহা কিছু করিতে যাইয়াছিলেন তাহার মধ্যে এই একই মূলনীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

কিছুকাল পরে ইংলণ্ডে রাজা আল্‌ফ্রেড্‌ এইরূপ চেষ্টাই করিয়াছিলেন।

অতএব দেখা গেল যে সভ্যতামুখী যে কয়টি শক্তি ইউরোপকে বর্ব্বরতার কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিল বলিয়া পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইউরোপের কোন না কোন অংশে পঞ্চম হইতে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত সেই সমস্ত শক্তি সমূহের ক্রিয়া চলিতেছিল।

কিন্তু ইহার মধ্যে কোনটাই সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। শার্লমেন তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যশাসনপদ্ধতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেন না। স্পেনে খৃষ্টীয় চর্চ্চও সেইরূপ যাজকতন্ত্রনীতির প্রতিষ্ঠা করিতে পারিল না। ইটালী ও দক্ষিণ গলে রোমীয় সভ্যতা বারম্বার মাথা তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু এই যুগের মধ্যে অর্থাৎ পঞ্চম হইতে নবম শতাব্দীর মধ্যে এ সকল চেষ্টার বিশেষ কোন ফলই হয় নাই। রোমীয় সভ্যতা যথার্থই কিঞ্চিৎ জীবনীশক্তি পুনরর্জ্জন করিয়াছিল অনেক পরে, দশম শতাব্দীর শেষের দিকে। সেই সময় পর্য্যন্ত ইউরোপে বর্ব্বরতার উৎসাদন ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠাকল্পে যত কিছু চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছিল। সংস্কার চেষ্টার প্রবর্ত্তকগণ জনবৃন্দকে যতখানি উন্নত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন বাস্তবিক পক্ষে মানুষ তখনও তত উন্নত হয় নাই; তাঁহারা সকলেই নানা আকারে এমন একটা সুবিস্তৃত ও সুনিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন যাহার পক্ষে তাঁহাদের ক্ষমতাও পর্য্যাপ্ত ছিল না, লোকসমূহের মানসিক অবস্থাও উপযোগী ছিল না। তথাপি তাঁহাদের চেষ্টা একেবারে নিরর্থক হয় নাই। দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে শার্লমেনের বিশাল সাম্রাজ্যের কথাও শুনিতে পাওয়া যায় না। টোলেডোর যাজকসংসদেরও কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, কিন্তু বর্ব্বর শাসনেরও যে তখন অন্তিমকাল উপস্থিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যে দুইটী বড় রকমের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।—

১। উত্তর ও দক্ষিণ হইতে বর্ব্বরদিগের আক্রমণবেগ নিরুদ্ধ হইয়াছে। শার্লমেনের সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে খণ্ডিত ও বিভক্ত হইয়া গেলে রাইন নদীর পূর্ব্বতীরে যে সকল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইল তাহারা, যে সকল বর্ব্বরজাতি জার্ম্মাণী হইতে পশ্চিমদিকে আসিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল, তাহাদের পথ রোধ করিয়া বসিল। নরমান আক্রমণের ইতিহাস হইতেই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সকল টিউটনজাতি সমুদ্র পথে ইংলণ্ড আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে, এই যুগে সামুদ্রিক অভিযানের দৃষ্টান্ত বড় বেশী পাওয়া যায় না। নবম শতাব্দী হইতে এই সামুদ্রিক অভিযান নিত্য ও ব্যাপক হইয়া উঠিল। তাহার কারণ, এই যে স্থল পথে আক্রমণ ক্রমশঃ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, স্থল পথে রাষ্ট্রগুলির সীমান্ত তখন স্থায়ী ও স্থানির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে সকল বর্ব্বরজাতিকে একেবারে ফিরাইয়া দেওয়া অসম্ভব হইল, তাহাদিগকেও বাধ্য হইয়া স্থল পথ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রপথ আশ্রয় করিতে হইল। নরমান আক্রমণে পশ্চিম ইউরোপের যতই ক্ষতি হউক না কেন, সে ক্ষতি পূর্ব্ববর্ত্তী স্থলপথে আক্রমণের মত সর্ব্বনাশ ঘটাইতে পারে নাই, উদীয়মান সমাজকে সেরূপ ব্যাপকভাবে উদ্বাস্তু করিয়া তোলে নাই।

দক্ষিণেও সেই এক ব্যাপার দেখা যায়। আরবরা তখন স্পেনে আড্ডা লইয়াছে; তাহাদের সহিত খৃষ্টানদের যুদ্ধবিগ্রহ চলিতে থাকিল বটে, কিন্তু তাহাতে এমন আর নূতন করিয়া কোন অধিবাসীবর্গের স্থানচ্যুতি ঘটিল না। তখনও সারাসেনদের ভিন্ন ভিন্ন দল ভূমধ্যসাগরের উপকূলভাগে উপদ্রব করিতেছিল বটে, কিন্তু মুসলমান আক্রমণের প্রথম বড় বেগটা তখন একপ্রকার রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে।

২। এই যুগে ইউরোপের মধ্যভাগেও সর্ব্বত্র লোকসমূহের চলাচল, বাসভূমির অনু-

সন্ধানে দেশদেশান্তরে পরিভ্রমণ এ সমস্ত অনেক পরিমাণে বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। লোকবর্গ তখন স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়াছে; তাহাদের সম্পত্তি স্থায়ী ও নির্দিষ্ট হইয়াছে; এবং মানুষে মানুষে পরস্পর সম্বন্ধ তখন আর আকস্মিক উৎপাত ভিন্ন অন্য কারণে দিনে দিনে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে না। মানুষের আভ্যন্তরীণ ও নৈতিক অবস্থার মধ্যেই একটা পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তাহার জীবনপ্রণালী যেমন স্থিরতা লাভ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তা, ভাব, ধারণা সমস্তই স্থায়ী নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি লাভ করিয়াছে। যে যে স্থানে সে বাস করিতে লাগিল, সেই সেই স্থানে সে যেসকল নূতন নূতন সম্বন্ধ স্থাপন করিল, যে যে ভূসম্পত্তি সে সন্তানবর্গের জন্য রাখিয়া যাইবে বলিয়া সংকল্প করিতে লাগিল, যে বাসগৃহ একদিন সে নিজের দুর্গ (castle) বলিয়া পরিচিত করিবে, যে মুষ্টিমেয় ঔপনিবেশিক ও ক্রীতদাসের সমষ্টি একদিন গ্রামে পরিণত হইবে—এই সকলের প্রতিই সে আসক্তিবন্ধনে আবদ্ধ হইল। সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে লাগিল, যেন সেগুলি মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির মাপ অনুসারে ছোট করিয়া কাটা। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে ক্রমশঃ একটি সংহতি নীতি অনুপ্রবিষ্ট হইল, যাহাতে কোন রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট না হইয়াও রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মিলিয়া এক একটি রাষ্ট্রসংঘ গড়িয়া উঠিল। বর্ব্বরদিগের রীতিনীতির মধ্যেই এই সংহতি নীতির বীজ নিহিত ছিল। একদিকে প্রত্যেক বিশিষ্ট ব্যক্তি নিজ নিজ ভূসম্পত্তির মধ্যে পরিবার ও ভৃত্যবর্গ লইয়া স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; অন্যদিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এই সকল যুদ্ধপ্রবণ ভূস্বামিবর্গের মধ্যে একটা দায়াধিকারক্রম গড়িয়া উঠিল। এ ব্যাপারটি কি? ইহা আর কিছুই নহে, বর্ব্বরসমাজের মধ্য হইতে ভূস্বামীতন্ত্রের, ফিউডালিজ্‌মের উদ্ভব। ইউরোপীয় সভ্যতার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে জার্ম্মাণীর অংশটুকুই যে প্রথমে প্রাধান্য লাভ করিবে ইহা স্বাভাবিক। জার্ম্মাণদের হাতেই তখন শক্তি, তাহারা ইউরোপ বাহুবলে জয় করিয়াছে; তাহাদের নিকট হইতেই ইউরোপকে তাহার প্রথম সামাজিক গঠন ও সমাজ ব্যবস্থা লইতে হইয়াছিল। বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়াছিল। ফিউডালিজ্‌ম্ বা ভূস্বামীতন্ত্র, তাহার প্রকৃতি, ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে তাহার স্থান ও কার্য্যকারিতা কি, ইহাই আমার পরবর্ত্তী বক্তৃতার আলোচ্য বিষয়। এই বিজয়ী ভূস্বামীতন্ত্রের আধিপত্যের মাঝখানেই আমরা পদে পদে দেখিব যে ইউরোপীয় সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গ—রাজতন্ত্র, যাজকতন্ত্র, পৌরতন্ত্র—সকলেই বাঁচিয়া আছে, কেহই বিনষ্ট হয় নাই; এবং আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব যে ইহাদের কেহই ফিউডালিজ্‌মের চাপে একেবারে তলাইয়া যাইবে না; ফিউডালিজ্‌মের সঙ্গে সংঘর্ষে তাহারা কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইবে, ফিউডালিজ্‌মের প্রকৃতি কিয়ৎ পরিমাণে আত্মসাৎ করিবে, এবং ভবিষ্যতে তাহাদের অভ্যুদয়কাল কখন আসিবে তাহারই জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকিব।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত এবং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

———

আমেরিকায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিকাগোতে প্রথম রাত্রি

১৯০৬ সালের ২রা জুন আমার জীবনে এক বিশাল পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন নগরী কাশীতে সাধারণের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছিলাম; এমন অবস্থায় সাংসারিক আচার ব্যবহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ আমার মত একজন লোকের পক্ষে, কোনও প্রকার জানাশুনা না থাকা সত্ত্বেও আমেরিকার প্রসিদ্ধ শিকাগো নগরে প্রবেশলাভ করা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যজনক। কোনও বন্ধু বান্ধবের নামে কোনও প্রকার পরিচয়পত্র আমি সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি নাই। এমন কি ইহার পূর্ব্বে জীবনে কোনও দিন কোন হোটেলে খাই নাই। ছুরীকাঁটা দিয়া কেমন করিয়া খানা খায়, কেমন করিয়া লোকে এখানে আলাপ পরিচয় করে—ইত্যাদি বিষয় আমার নিকট সম্পূর্ণ অজানা ছিল।

সকাল বেলা ১০টার সময় "ভ্যাঙ্কোভর" হইতে শিকাগো সহরে পঁহুছিলাম, ভ্যাঙ্কোভর হইতে শিকাগো ২৮০০ মাইলের মত হইবে। গাড়ী যখন এক ষ্টেশনে থামিল আর "শিকাগো" "শিকাগো" এই শব্দ যখন আমার কানে আসিল তখন বুঝিলাম যে ষ্টেশনে আসিয়াছি। গাড়ীতে যে সকল লোক ছিল তাহারা নামিয়া পড়িল ও স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। আমি ভাবিলাম এখন যাই কোথায়? সকলের পরে ট্রাঙ্ক লইয়া গাড়ী হইতে নামিলাম। টিকেট দিয়া যখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন এক কোচম্যান, আমি কোথায় যাইব, জিজ্ঞাসা করিল। কোথাকার কথা বলি? আমি ত এখন কোনও জায়গার নামই জানিতাম না যেখানে গিয়া থাকিতে পারি। ভাবিতে ভাবিতে "ওআই, এম্, সি, এ" (Young Men's Christian Association) এর নাম মনে পড়িল। খ্রীষ্টানদের মূল্য দেশের বাহিরে গেলে ভালরকমেই বোঝা যায়। এই সমস্ত সমিতি কি চমৎকার! এখানে নবীন যুবক দেশের ও জাতির সেবা করিতে শিখে; বিদেশী কেহ আসিলে তাহার সাহায্য করে। আর আমাদের দেশে এক ধার্ম্মিক সভা আছে। উহার সময় কেবল শাস্ত্র বিচারে ও পরের মানহানিকর আলাপে নষ্ট হয়। সেই জন্যই ত এই দুর্দ্দশা!

গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া আমি এদিক্ ওদিক্ লোকজন দেখিতেছিলাম, সকলেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; নূতন বুট্ পায়ে, নূতন সুট্ গায়ে, মাথার চুল বেশ বিন্যস্ত। কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলেই এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। চার দিন ক্রমাগত পথ চলিয়া আমার কাপড় ময়লা হইয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ প্যান্টালুনটি তো খুবই ময়লা হইয়াছিল। আমার সমস্ত কাপড়ই এক বড় বাক্সের মধ্যে। সে বাক্সটী আবার মালগাড়ীতে। নতুন সুট্ না পাইলে, আমার কাপড় বদ্লাইবার উপায় ছিল না। আমি বারে বারেই কাপড় চোপড়ের দিকে নজর করিতে ছিলাম; আর রাস্তায় যাহারা যাইতেছিল তাহাদের সহিত তুলনা করিতে-

ছিলাম। ইহার মধ্যেই গাড়ী Y. M. C. A. এর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল; কোচম্যান দরজা খুলিয়া দিল। একটী বালক জিনিষ পত্রগুলি উঠাইবার জন্য অগ্রসর হইল; কিন্তু যেই সে আমার ময়লা কাপড় আর চারদিনের দাড়ী দেখিল, অম্‌নি সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। আমি উহার মুখচ্ছবিতে উপহাসের ভাব দেখিতে পাইলাম। নিজের ট্রাঙ্ক নিজেই উঠাইয়া লইয়া, ঐ সুবৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দুইতলার উপর "এসোসিয়েসন"এর আফিসের ভিতরে গেলে, এক যুবক আমাকে সেক্রেটারীর নিকট লইয়া গেলেন। যথেষ্ট বিনয়ের সহিত আমার সঙ্গে আলাপ করিলেন। আমাকে কোনও হোটেলে যাইবার পরামর্শ দিলেন। কোনও জাপানী ছাত্রের খবর পাইলে ভাল হয়, আমি এইরূপ জানাইলাম। এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী কয়েক স্থানে "টেলিফোন্‌" করিলেন, কিন্তু কোনও সংবাদ পাইলেন না। মহাবোধী সোসাইটীর ঠিকানা আমার জানা ছিল; কাজেই ওখানে গিয়া কোনও জাপানী ছাত্রের খবর লইব, স্থির করিলাম। Y. M. C. A. তে ট্রাঙ্ক রাখিয়া, এই সোসাইটীর খোঁজ লইতে বাহির হইলাম।

রাস্তায় চমৎকার দৃশ্য! নরনারী সকলে এদিকে ওদিকে যাইতেছিল। সকলেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, প্রসন্নমুখ; নিজ নিজ কাজে যেন মধুমক্ষিকার মত লাগিয়া আছে। কাহাকেও একটুও অলস বলিয়া বোধ হইতেছিল না। সকলেরই বেশ স্ফূর্ত্তি। কি বৃদ্ধ, কি যুবক, কি বালক, কি বালিকা, সকলেই চক্রের মত ঘুরিতেছে। একদিকে ছোট ছোট বালক "ডেলি-নিউজ," "রেকর্ড" "হেরাল্ড্‌" প্রভৃতি দৈনিক পত্রিকা বিক্রী করিয়া বেড়াইতেছিল। বৈদ্যুতিক গাড়ী লোকে পরিপূর্ণ হইয়া এদিক্‌ ওদিক্‌ চলিতেছিল। ঘোড়ার গাড়ী ও মালপত্রে বোঝাই "ছকড়" দেখিতে পাইলাম। অন্যদিকে এক রকম গাড়ী ছিল বড় বড় লোহার থামের উপর। রাস্তা হইতে ৪০ গজ উঁচুতে আকাশে আর এক রাস্তা। উহার উপর দিয়া আর এক প্রকার ইলেকট্রিকের গাড়ী ("এলিভেটরকার্‌") গড়্‌ গড়্‌ শব্দে এদিক ওদিক ছুটিয়া বেড়াইতেছিল।

পথে সর্ব্বপ্রথম "মাসোনিক টেম্পল্‌" (Masonic Temple) এর গগনস্পর্শী প্রাসাদ দেখিলাম। ইহা একটী বাইশতলা বাড়ী। যেন আকাশের সঙ্গে কথা বলিতেছে! দেখিয়া মনে হইল, বিজ্ঞান কি না করিতে পারে।

পুলিসের এক সেপাইর নিকট হইতে সোসাইটীর খোঁজ খবর জানিয়া লইলাম ও শীঘ্র সেই পথে রওয়ানা হইলাম। শিকাগো পৃথিবীর বড় বড় সহরের মধ্যে তৃতীয়। ইহার ২০ মাইল পর্য্যন্ত লম্বা রাস্তাও আছে; একটী তো ২৭ মাইল। এইজন্য ঐ এসোসিয়েসনের বাড়ীতে পৌছিতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগিল। পথের দৃশ্য আমার ভারী মনোরম লাগিল। যখন "মার্‌শাল ফিল্‌ডের" (Marshallfield) প্রকাণ্ড দোকানের নিকট আসিলাম, তখন উহা দেখিয়া আমি একেবারে বিস্ময়ান্বিত হইয়া গেলাম। কত বড় দোকান! কোটি কোটি টাকার মাল, অনেক রকম জিনিষ বিক্রীর জন্য মজুত ছিল। এক একবার ইচ্ছা হইতেছিল যে ইহার মধ্যে গিয়া সকল মাল ভাল করিয়া দেখিয়া লই। কিন্তু তখন সময় ছিল না; রাত্রে থাকিবার চিন্তা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।

"ডিয়ার-বর্ণ" লেনে মহাবোধী সোসাইটীর আফিস ছিল। ঐ অট্টালিকার নিকট যখন গেলাম তখন জানিতে পারিলাম যে আফিসঘর বিশ তলাতে। দালানের উপর চড়িবার কি চমৎকার উপায়। একটী ঘেরা কুঠুরি প্রকাণ্ড শিকলে বাঁধা, উহার ভিতর প্রায় দশ জন লোকের দাঁড়াইবার স্থান আছে। কুঠুরিটীকে একপ্রকারের দোলা বলা চলে। উহার প্রত্যেক তলার সঙ্গেই সম্বন্ধ আছে। ইহার ভিতর দাঁড়াইয়া যে তলায় যাইতে হইবে চাকরকে বলিয়া দিলেই সে সেই তলাতেই পৌছাইয়া দরজা খুলিয়া দিবে। বাস্ আপনি আপনার গন্তব্য গৃহে গমন করুন। প্রত্যেক দালানেই উপরে নীচে যাতায়াত করিবার জন্য এই প্রকার তিন চারটী স্থান আছে। এখানে সকল জায়গাতেই এক নিয়ম, সময় অল্প, লাভ বেশী।

দালানের উপর গিয়া খবর লইয়া জানিতে পারিলাম যে মহাবোধী সোসাইটী আফিসের স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এক জন মহিলা অত্যন্ত ভদ্রতার সহিত আমাকে নূতন আফিসঘরের ঠিকানা লিখিয়া দিলেন। আমি উহার তল্লাস করিতে লাগিলাম। কিন্তু ১১টা হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত ক্রমাগত ঘোরাঘুরিতে হয়রাণ হইয়া পড়িয়াছিলাম শুধু ইহাই নয় ভ্যাঙ্কোভর হইতে শিকাগো পর্য্যন্ত চারদিন কেবল এক এক মুঠা ছোলা খাইয়া কাটাইয়াছি। যদিও প্রত্যেক রেল গাড়ীর সঙ্গে খাওয়ার গাড়ী ("ডাইনিং কার্") থাকে এবং সে গাড়ীর যাত্রীরা সময় মত খাবার পাইয়া থাকেন; তবু আমার পক্ষে এ ব্যবস্থা না থাকারই সমান। জন্মাবধি মাছ মাংসের প্রতি ঘৃণা, এইজন্য চারদিন আমাকে নিরাহারে থাকিতে হইল, আবার শিকাগোতে পঁহুছিয়াও কোথাও কোন সুবিধা করিতে পারিলাম না। তাহার উপর আবার চারি ঘণ্টা সহরে ক্রমাগত ঘোরা। ইহার ফলে শরীর মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল। তবু মহাবোধী সোসাইটীর খোঁজ লইতে হইবে। তাই রওনা হইলাম।

পথ চলিতে চলিতে কোনও এক স্থানে ছোট ছোট হোটেলের নোটীশ ও নামের বোর্ড দেখিলাম। মনে হইল, যে ইহার কোনও একটীতে কোনও প্রকারে এক রাত থাকিয়া যাই আর পরদিন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া কোনও জাপানী ছাত্রের সন্ধান লই। এক পথিকাশ্রমের উপরে গেলাম। গিয়া ম্যানেজারের নিকট সমস্ত খবর জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমার নাম লিখিয়া লইলেন ও এক কামরাতে লইবার জন্য আমাকে ইঙ্গিত করিলেন। সেই সময় আমার মনে কি হইল বলিতে পারি না। আমি বুঝিলাম যে, ঐ ব্যক্তির মনের ভাব হয়ত ভাল নয়। সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গলিতে আসিলাম। পরে বুঝিতে পারিলাম যে উহা বদমায়েসদের আড্ডা। উহারা পথিকদের রাত্রে ওখানে শয়ন করিতে দেয় ও শয়ন করিলে পর পকেট হইতে সব কিছু বাহির করিয়া কাজ সাফ করিয়া লয়। সকালবেলা ম্যানেজার ভাড়া আদায় করিয়া লয়। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যাত্রী বেচারি চুপচাপ করিয়া সহ্য করে এবং ওখান হইতে একেবারে নিরুপায় হইয়া চলিয়া যায়।

এক ঘণ্টা পরে মহাবোধী সোসাইটীতে উপস্থিত হইলাম। যে ভদ্রলোকটী কার্য্য পরিচালনা করিতেন তিনি অত্যন্ত আদর যত্নের সহিত আমার কথা শুনিলেন, এবং আমার সঙ্গে গিয়া কোনও ভাল হোটেলে আমার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। উঁহার

সহিত বৈদ্যুতিক গাড়ীতে চড়িয়া "টম্‌সন" হোটেলে গেলাম। পথে পোষ্টাফিসের বিশাল সৌধ দেখিতে পাইলাম। "টম্‌সন" হোটেলের ম্যানেজার আমার ময়লা কাপড় দেখিয়া ও আমাকে বৈদেশিক জানিয়া স্থান দান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সেইজন্য আমার সহচর মহোদয় ও আমি নিরাশ হইয়া অপর হোটেলে গেলাম। ওখানে কোনও প্রকারে থাকিবার ব্যবস্থা হইল; দুই রাত্রির জন্য ছয় টাকা লাগিবে বলিয়া ঠিক হইল। মহাবোধী সোসাইটী হইতে যে ভদ্রলোকটী আমার সহিত আসিয়াছিলেন তিনি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। এক চাকরের সাথে লিফ্‌টে চড়িয়া পাঁচ তলায় গেলাম। চাকরটী আমাকে বেশ সাজান গোছান একটী কাম্‌রায় লইয়া গিয়া বলিল, "মশায়! এই কামরাই আপনার"। ইহা বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ভৃত্যটী চলিয়া গেলে আমি ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। রাত্রে থাকিবার স্থান হইল বলিয়া আমি ভগবানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম। কিন্তু ভাবনা হইল এই যে এখন কাপড়ের কি করি। কাপড় ত সবই ময়লা। সঙ্গে সাবান ছিল। মনে ভাবিলাম, যদি কাল জিনিষ পত্র না পাওয়া যায়, ইহাদিয়াই কাপড় পরিষ্কার করিতে হইবে। ঘরের ভিতর গরম ও ঠাণ্ডা জলের দুইটী পাইপ ছিল। ঐ খানেই সব কাপড় ধুইলাম। এই করিতে করিতে রাত্রি প্রায় দশটা বাজিয়া গেল। তার পরে ক্ষৌর কার্য্য সারিয়া লইলাম। ময়লা কাপড়ে কেমন করিয়া বাজারে যাইব—এ চিন্তা তখন দূর হইল। ক্লান্তশ্রান্ত দেহে অভুক্ত অবস্থাতেই শুইয়া পড়িলাম। পরিষ্কার সুন্দর বিছানাতে পড়িবামাত্রই নিদ্রাদেবী আমাকে আপনার করিয়া লইলেন।

দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদ।

শিকাগোর রবিবার

শিকাগো পৃথিবীর প্রসিদ্ধ নগরসমূহের অন্যতম। ঐখানেই জগদ্‌বিখ্যাত ধনী জন্‌, ডি, রক্‌ফেলর স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়। আমেরিকার অনেক বড় বড় কারখানা, যাদুঘর প্রভৃতি এখানেই। এই সকল কারখানাতে নানাবিধ লোক কাজকর্ম্ম করে। এত বড় প্রসিদ্ধ নগরের লোকেরা অবসর সময় কিরূপে কাটায়, কেমন করিয়াই বা মনের একঘেয়ে ভাব দূর করে? ঐ নগরে দর্শনীয় কি কি আছে?—এই সকল প্রশ্নের উত্তর পাঠকের চিত্তবিনোদার্থে বর্ত্তমান প্রবন্ধে লিখিতেছি। পাঠক আসুন, আপনাকে শিকাগো সহর দেখাই। ইহার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দৃশ্য দর্শন করাই। আর এই সহরে কি কি দেখিবার আছে, তাহাও বলিয়া দিই। আমি সেই প্রসঙ্গে এই নগরবাসীদের চালচলন সম্বন্ধেও কিছু না কিছু বলিতে পারিব এবং আপনিও আমেরিকার এই ভাগের লোকজনের জীবন যাত্রা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। এই উদ্দেশ্যে আমি রবিবার মনোনীত করিয়াছি। রবিবারের মহিমা কীর্ত্তনই করিতে বসিয়াছি। ইহা দ্বারা আমারও অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে এবং আপনি ইহাও বুঝিতে পারিবেন যে শিকাগোবাসীরা কি প্রকারে রবিবারের অবসর কাটাইয়া থাকে।

রবিবার ছুটীর দিন। ভারতবর্ষে স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরাও একথা জানে। এশিয়া ও আফ্রিকাতে, যেখানে যেখানে খ্রীষ্টানদের রাজ্য, সেই সেই স্থানেই রবিবার দিন সমস্ত স্কুল, আফিস ইত্যাদি বন্ধ থাকে। কিন্তু রবিবারটি কেমন করিয়া কাটান উচিত, তাহা খ্রীষ্টানদের মধ্যে না থাকিলে ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় না। রবিবারের ছুটী কাটাইবার জন্য শিকাগোতে কেমন কেমন স্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ও কেমন করিয়া ওখানকার লোকেরা জীবনের আনন্দ উপভোগ করে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনুন।

খ্রীষ্টধর্ম্মঅনুসারে রবিবার দিন কাজকর্ম্ম করা নিষেধ। এইজন্য সমস্ত দোকান, পুস্তকালয়, কারখানা প্রভৃতি এই দিন বন্ধ থাকে। কি ধনী কি নির্ধন, কি প্রভু কি ভৃত্য, কি বালক কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলের জন্যই আজকার দিন ছুটী। সাড়ে দশটা, এগারটার সময়, নির্দ্দিষ্ট সময়ে, প্রাতঃকালে, প্রায় সমস্ত লোকই নিজ নিজ গির্জ্জা বা উপাসনা-মন্দিরে যাইতেছে দেখা যায়। ওখানে ভগবানের উপাসনা করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়া, সকলে আহারাদি করে। তৎপরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া,আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্য বাহির হয়।

শিকাগো অতি বৃহৎ সহর। পৃথিবীর সমস্ত নগরীর মধ্যে ইহা আকারে তৃতীয়। এখানে "ফিল্ড্ মিউজিয়ম" নামে এক যাদুঘর আছে। উহা "মিশিগান্" হ্রদের কিনারায় ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অল্প দূরেই হইবে। রবিবার সকালে নয়টা হইতে সন্ধ্যা পাঁচটা পর্য্যন্ত সকলে এখানে কোনও দর্শনী না দিয়া বেড়াইতে পারে। এইজন্য এদিন এখানে বড়ই জনতা। আট নয় বৎসরের বালক বালিকারা এইপ্রকার স্থানেই বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করে। কারণ, এই স্থানেই সংসারের সমস্ত অদ্ভুত অদ্ভুত বস্তুর সংগ্রহ রহিয়াছে। ঐ গুলির শিকাগোর প্রসিদ্ধ জগৎ মেলায় ("ওয়ার্ল্ড্'স্ ফেয়ার্") একত্রিত করা হইয়াছিল। এখানে যথাক্রমে দেখান হইয়াছে যে পৃথিবীতে প্রাণীজীবন প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে, কিরূপে বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। ভূগর্ভবিদ্যাসম্বন্ধীয় পদার্থসমূহ ভিন্ন ভিন্ন স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিয়া উহার ক্রমবিকাশের ধারা পরিস্ফুট ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। উত্তর আমেরিকার হরিণ কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নিজের রঙ্ পরিবর্ত্তিত করে এবং প্রকৃতিমাতা তুষারপাতের সময় কিরূপে উহার আহার যোগাইয়া দেন, তাহা এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর মেরু-প্রদেশের ভল্লুকসমূহের বরফের ভিতরকার সুদৃশ্য ঘর কেমন সুন্দর ভাবে দেখান হইয়াছে। আমেরিকার আদিম নিবাসীগণ ('রেড্ ইণ্ডিয়ান্") কোন্ দেবদেবীর পূজা করিত, কিরূপ গৃহে বসবাস করিত, কি প্রকারে ও কোন্ বস্তুর সাহায্যে পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করিত, এ সকল বিষয় এখানে অতি সুন্দরভাবেই দেখান হইয়াছে। উহাদের নৌকা, উহাদের পানভোজনের দ্রব্যাদি, উহাদের দেবালয়, উহাদের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র—এ সমস্ত জিনিষই বেশ ভাল ভাবে দেখান হইয়াছে। যে যে প্রাণী সব চাইতে সক্ষম কেবল তাহারাই যে সংসারে টিকিয়া থাকিতে পারে—এই সকল সংগ্রহ দ্রব্য দেখিবামাত্রেই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। যখন আমি ঐ সকল বস্তু দর্শন করিলাম তখন আমার ইহাই মনে হইল, যে ভারতবাসীদের নাম, তাহাদের বস্তু নিচয়, তাহাদের ইতিহাস ইত্যাদি সমস্ত নষ্ট হইয়া গেলেও কোনও দিন ত "ব্রিটীশ মিউজিয়মে" তাহাদের নিদর্শন থাকিবে।

এই যাদুঘরের মধ্যে মহাত্মা কলম্বসের এক প্রকাণ্ড মর্ম্মর মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই জেনোয়া নিবাসীকে দেখিয়া দর্শকের মনে বিভিন্ন চিন্তার উদয় হয় ও এক অদ্ভুত দৃশ্য চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। প্রাচীন আমেরিকা ও নবীন আমেরিকায় কত প্রভেদ। এখানকার প্রাচীন নিবাসীরাই বা কোথায়? বিগত তিন শতকের মধ্যে এখানকার রূপ কতই না পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কোথায় ইউরোপ, আর কোথায়ই বা আমেরিকা। হাজার হাজার মাইল ব্যবধান। ভারতবর্ষের খোঁজ লইতে এক ব্যক্তি বাহির হইলেন এবং ভ্রমক্রমে এদিকে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহার এখানে আসা যেন যমরাজের আগমনের ন্যায় হইয়া উঠিল। স্বাধীনভাবে বিচরণশীল, হাজার বৎসরের নিবাসী কি মানুষ, কি পশু, কি পক্ষী, সকলেই তিন শতাব্দীর মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। কোটী কোটি মহিষ, না জানি কত কাল হইতে, আমেরিকার বনে জঙ্গলে আনন্দে বিচরণ করিতেছিল; কিন্তু আজ তাহাদের নাম গন্ধও নাই। ঐ সকল জীব কি অপরাধ করিয়াছিল? যাহাদের কোনও অধিকার এ দেশে ছিল না এমনতর দূর বিদেশবাসী এক জাতি আসিয়া এখানকার আদিম নিবাসী দিগের বিনাশ সাধন করিল। এই কি ঈশ্বরের বিধান! এই স্থান দর্শন করিতে করিতে এইরূপ নাস্তিকভাবময় প্রশ্ন দর্শকের মনে উঠে। কিন্তু সেই সময়ে এ কথাও কর্ণে ধ্বনিত হয় প্রকৃতির ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে সকলের অপেক্ষা সক্ষমতম, এবং যোগ্যতমই পৃথিবীতে স্থায়ী হইবে। যদি তুমি নিজের অস্তিত্ব রাখিতে চাও, তবে স্বীয় প্রতিবাসীর সমান হও। যে জাতি এই নিয়ম অনুসারে চলে, সে-ই সংসারে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে।

এই যাদুঘরে বৃক্ষ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, জন্তু বিদ্যা, নর-শরীর বিদ্যা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যাসম্বন্ধেও বস্তুসমূহ রহিয়াছে। "এক ঢিলে দুই পাখী." "রথ দেখা ও কলা বেচা— ছুটীর দিন, আমোদও করুন এবং কিছু শিক্ষাও লাভ করুন। উন্নতি লাভের কত সুন্দর সুযোগ এখানকার অধিবাসীদের জন্য রহিয়াছে! বাল্যকাল হইতেই খেলার ছলে ছলে এখানকার লোকেরা এতখানি উন্নতি করাইয়া লয় যে আমাদের দেশে দশ বৎসর স্কুলে পড়িলেও সেরূপ হয় না।

যাদু ঘরের বাহিরে গিয়া দেখুন, ঝিলের ধারে ধারে রাস্তা। বেঞ্চও আছে। ওখানে স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকারা আনন্দে বসিয়া আছে, ও হাসি ঠাট্টা, খেলা ধুলা করিতেছে উহাদের দিকে তাকাইলেই দেখা যায় যেন "স্বাধীনতা" উঁহাদের মাথার মণির মত জ্বলিতেছে; যুবক স্বীয় প্রিয়তমার সহিত ইতস্তত বিচরণ করিতেছে ও আলাপ করিতেছে, ইহা দেখিয়া কেমন আনন্দ হয়। মিশিগান হ্রদও যেন তাহাদের এই প্রেম দর্শন করিয়া প্রসন্ন হইয়াছে মনে হয়। স্বচ্ছ শীতল পবনহিল্লোলে সে যেন দম্পতীকে আশীর্ব্বাদবর্ষণ করে। তরঙ্গমালা, ছোট ছোট বালক বালিকাকে দেখিয়া যেন উহাদের সহিত মিশিবার আশায় তটের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু তৎকালেই পাছে কোনও বেয়াদবি হয় এই মনে করিয়া পিছনে সরিয়া যাইতেছে। এই সময়ে রবিতৃদেব আপনার দিনের কাজ শেষ করিয়া পশ্চিম প্রান্তে গমন করিলেন।

এই যাদুঘর ভিন্ন, আরও বহু স্থান শিকাগোবাসীদের রবিবার কাটাইবার জন্ম রহিয়াছে। অনেক উদ্যানও আছে। সেখানে পিয়ানো ইত্যাদি বাজে; মনের শান্তি আনিবার মত আরও বহু উপকরণ থাকে। সেখানে সকলে গিয়া বসে, গান বাজনা শোনে এবং আনন্দমগ্ন হইয়া নূতন প্রাণে গৃহে ফিরিয়া যায়।

"হুম্‌বোল্‌ড্‌পার্ক (Humboldt Park) একটী উদ্যান। এখানে বড় বড় পুকুর আছে। সেগুলি সর্ব্বদাই জলে পরিপূর্ণ। ছোট ছোট নৌকা ভাসমান। নৌকাগুলি খেলার জন্য রাখা হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে এখানে নৌকার দৌড় হয়। রবিবার দিন এ উদ্যানের দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। যুবকের দল নৌকায় উঠিয়া হাসিয়া খেলিয়া গানবাজনায় জীবনের আনন্দ উপভোগ করে। এক এক নৌকায় প্রায়শঃ একজন যুবক ও একজন যুবতীকে দেখা যায়। উভয়ে সহপাঠি বন্ধু অথবা পতিপত্নী। এপ্রকার মিলন এ দেশে নিন্দনীয় নহে। এবং আমাদের দেশের ন্যায় কোনও কুৎসিত ভাব ইহাতে ইঁহাদের মনে উপস্থিত হয় না। স্ত্রীজাতির এখানে বিশেষ সম্মান। তাঁহাদের সহিত নীচ ব্যবহার করে, এরূপ অনেক অসৎ পুরুষও দেখা যায়। তবে এই প্রকার পুরুষের পক্ষে আইনে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা। প্রায় সকল উদ্যানেই এরূপ পুষ্করিণী আছে। যে স্থান যাঁহার নিকট, তিনি সেখানে গিয়াই রবিবার দিবস আনন্দে যাপন করেন।

কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন যে ঐ সকল স্থানে অন্যদিন যাওয়ার কি নিষেধ আছে? না, সেরূপ কিছু নাই। তবে কথা এই যে রবিবার দিবস ব্যতীত অন্য দিন প্রায় কাহারও ছুটী থাকে না, এই জন্য রবিবার দিন সকলে এই উদ্যানে একত্রিত হয়। প্রত্যহ শুধু কোনও কোনও স্থানে স্ত্রীপুরুষগণকে টেনিশ খেলিতে দেখা যায়। ইহা অবশ্য গ্রীষ্মকালের কথা। শীত কালে যখন এই সকল পুষ্করিণীর জল জমিয়া যায়, তখন সকলে এখানে "স্কেটিং" করেন। প্রত্যেক বৎসরই ডিসেম্বর মাসে স্কেটিংএর সময় উপস্থিত হয়। খুব বেশী শীত পড়ে আর বালকবালিকাগণকে এখানে নাচিতে দেখা যায়।

লিঙ্কন উদ্যানও খুব প্রসিদ্ধ। এখানে আমেরিকার বিখ্যাত যোদ্ধা বীরবর "গ্র্যাণ্ট" এর মূর্ত্তি আছে। এই অশ্বারূঢ় প্রতিমূর্ত্তি এদেশের ইতিহাসবেত্তাকে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, এই যুদ্ধ দাসব্যবসায় বন্ধ করাইবার জন্য আমেরিকান জাতির মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। উত্তর আমেরিকার লোকেরা কহিতেছিলেন যে দাস ব্যবসায় বন্ধ হইয়া যাউক্। উঁহাদের সিদ্ধান্ত যে স্বাধীনতার চোখে সকল লোকই সমান—জীবন ও স্বাধীনতায় স্বাভাবিক নিয়মে সকলেরই সমান দাবী। আমেরিকার মত স্বাধীন দেশে মানুষ ছাগল ভেড়ার মত বিক্রীত হইবে, ইহা তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল না। এই সত্য নীতি রক্ষার জন্য উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে এক লোমহর্ষণ যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, এবং পরিণামে সত্যেরই জয় হইল। মহাবীর গ্র্যাণ্ট এই যুদ্ধে উত্তর আমেরিকাবাসীদের পক্ষে সেনাপতি ছিলেন। ইনি 'কালো' নিগ্রোদিগের জন্য, 'শাদা' আমেরিকানদিগের সমান অধিকার দাবী করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার মূর্ত্তি দর্শকের মনে এক নব জীবনী শক্তি আনিয়া দেয়, জানাইয়া দেয় যে কোনও মানুষের অপরের উপর শাসনদণ্ড পরিচালন করিবার অধিকার নাই। এ বিষয়ে সকল মনুষ্যই

সমান। সমাজ যন্ত্রের সকল মনুষ্যই উহার অঙ্গ, নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে সকলেই সমাজের সেবক। কাহাকেও ঘৃণা করিও না; শাদা, কালা, সমস্ত লোক একই পিতার পুত্র।

এই উদ্যানের এক ভাগে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বৃক্ষ রহিয়াছে। যে বৃক্ষ যতটুকু তাপে বাঁচিতে পারে, তাহাকে ততটুকু তাপ দিয়া বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অনেক গাছ এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভিদ্ বিদ্যা সম্বন্ধে অনেক কথা দর্শকগণ এখানে জানিতে পারেন।

উদ্যান ভিন্ন আরও বহু স্থান আছে যেখানে লোকেরা বিশ্রাম করে, হাসি খেলা করিতে পারে। শিকাগো অতি বৃহৎ নগর। এই জন্য নগরবাসীদের আরাম ও বিশুদ্ধ বাতাসের জন্য মধ্যে মধ্যে রাস্তায় বুলাভার্ড (Boulavards) নামক বিহার স্থল আছে। এখানকার রাস্তা আমাদের দেশের রাস্তার ন্যায় নয়। এক এক রাস্তায় এক একটী বাজার। পাথরের দালানের সাম্‌নে দিয়া পথের দুই পার্শ্বেই পাঁচ ফুট করিয়া রাস্তা, লোকজনের চলিবার জন্য তৈয়ারী হইয়াছে। মাঝের সড়ক গাড়ী, ঘোড়া, মটর প্রভৃতির জন্য। খোলা দালান কোঠা ও চওড়া সড়কের মোড়ে মোড়ে বায়ু বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য এবং গরীব লোকদের মনোরঞ্জন করিবার উদ্দেশ্যে কিছু দূর পরে পরেই বিহারবাটিকা রহিয়াছে। সেখানে বসিবার জন্য বেঞ্চ্ প্রভৃতিও আছে। সায়ংকালে কর্ম্মক্লান্ত স্ত্রীপুরুষগণ এখানে আসিয়া থাকেন। কারণ, অন্যান্য স্থানে গান বাজনা, জল বিহার প্রভৃতির জন্য অল্পবিস্তর খরচ হইয়া থাকে। অল্প আয়ের লোকেরা উহা করিতে পারে না। তাহাদের জন্য এই সকল স্থানে উদ্যানে ও যাদু ঘরে ভ্রমণ করিবার অনুমতি আছে। যাহাতে সকলে এই স্বাধীন দেশে আনন্দ লাভের সুযোগ পায় তজ্জন্য যথেষ্ট যত্ন লওয়া হইয়াছে। এখানে যে অর্থব্যয় করা হয়, উহা শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ উন্নতির জন্যই হইয়া থাকে।

এই ত গেল দিনের কথা, এখন রাত্রির কথা শুনুন। এখানে বহুপ্রকার নাট্যশালা, প্রদর্শনী ও সমিতি রহিয়াছে। সেখানে নিজ নিজ রুচি অনুসারে সকলে রাত্রে যাইয়া থাকে। শিকাগোতে রাত্রেও লোকে গির্জ্জায় যাইয়া থাকে। রাত্রেও সেখানে উপদেশ গান ইত্যাদি হয়। একটী জায়গার নাম "হোয়াইট্ সিটি" (White City) বা শ্বেত নগরী। অনেক লোক সেখানে যায়। এ স্থানকে শ্বেত নগরী এই জন্যই বলে যে এখানে এমন বৈদ্যুতিক আলো দেওয়া হয় যাহাতে রাত্রিও দিনের মত হইয়া উঠে। ইহার বিশাল গেটের উপর বড় বড় বিজলীর অক্ষরে "দি হোয়াইট সিটি" (The White City) এইরূপ লিখিত আছে। বিদ্যুতের মহিমা এখানে খুবই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। স্থানে স্থানে বৈদ্যুতিক তেজে বিভিন্ন রঙের অক্ষরচিত্র রহিয়াছে। মিনিটে মিনিটে উহার রং বদ্‌লাইতেছে। এই শ্বেত নগরীর ভিতর অনেক মনোরঞ্জক স্থান আছে; কোথাও গান হইতেছে; কোথাও বা বড় বড় "হলে" নাচ চলিতেছে; সার্কাস প্রভৃতিও আছে, পৃথিবীর সকল তামাশাওয়ালাকে এখানে আনান হয়। গরমের সময় তিনচার মাসে তাহারা হাজার হাজার টাকা উপায় করে। এই জায়গাটি এক কোম্পানীর। তাহাদের লোক সমস্ত পৃথিবীতে তামাসাওয়ালাদিগের খোঁজে ঘুরিয়া বেড়ায়। ভারতবর্ষের যদি দুই তিন

খুব ভাল পালোয়ান কোনও দেশী কোম্পানীর সহিত আসে তবে হাজার হাজার টাকা লইয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশে লোকে টাকা রোজগার করার উপায় সমূহ ভাল করিয়া শেখে নাই। সামান্য কোনও ইংরেজ, আমাদের দেশে আসিয়া কেবল বিজ্ঞাপনের সাহায্যে নিজের খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা করে ও লক্ষ লক্ষ টাকা কুড়াইয়া লইয়া যায়। কিন্তু আমাদের স্বদেশী কারীগর, পালোয়ান, বাজীকর প্রভৃতি কেহই এ সকল দেশে আসিতে সাহস করে না। আমেরিকাতে কুস্তীর সখ বাড়িতেছে। যদি এই সময় কোনও পালোয়ান কিছু খরচপত্র করিয়া এখানে আসে, এবং কোনও ভাল কোম্পানীর সহায়তায় কুস্তি করে তবে সে লক্ষ মুদ্রার সংস্থান করিতে পারে।

এই শ্বেত নগরীতে রবিবার দিন প্রকাণ্ড এক মেলা বসে। স্ত্রীপুরুষে গাড়ী বোঝাই হইয়া যায়। হাজার হাজার দর্শক একত্রিত হয়। রাত্রে ৮টা হইতে ১১টা ১২টা পর্য্যন্ত মেলা থাকে। এ স্থান কেবল গরমের দিনই খোলে; কারণ শীত কালে ঠাণ্ডার জন্য এখানে কেহ আসিতে পারে না। শীতের সময়ের জন্য নগরের অন্যান্য স্থানে অন্যান্য প্রকারে মনোরঞ্জক মেলার ব্যবস্থা আছে।

রবিবার দিন এই নগরে লোকে এই প্রকারেই সময় কর্ত্তন করে। এখন যদি এখানকার জীবন যাত্রার সহিত ভারতবর্ষের জীবন যাত্রার তুলনা করিতে যাই তবে কত বড় পার্থক্য দেখিতে পাইব। ঐ সকল তামাশা বা নাটকের কথা ছাড়িয়া দিন, যাহার বিষয় হয়ত আমাদের বহু পাঠক-পাঠিকার বিশেষ জ্ঞান নাই; কিন্তু এমন বহুতর মনোরঞ্জক শিক্ষাপ্রদ মেলা ও তামাসা আছে, যাহার বিষয়েও আমাদের দেশের লোকদের কোনও প্রকার সখ্ নাই। ইঁহারা নিজের অবকাশ কাল, ছুটীর দিন কি প্রকারে অতিবাহিত করেন? ভাঙ্ খাইয়া, তাশ খেলিয়া, পাখী উড়াইয়া, এবং অনর্থক নিন্দা পরিবাদে লিপ্ত হইয়া তাঁহারা যে সময়ের মূল্য জানেন না তাহা প্রমাণ করেন, লেখাপড়া জানা এমন অনেকে আছেন যাঁহারা এইসকল কদাচরণে লিপ্ত নহেন তথাপি ত্রিশ কোটির মধ্যে এ প্রকার লোকের সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয়। আমাদের দেশের অর্দ্ধেকেই ত স্ত্রীলোক, তাঁহাদের বাহিরে আসিবার আদেশ পর্য্যন্তনাই। যেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা আটজনেরও কম মাত্র লিখিতে পড়িতে জানে সেখানকার লোকদের দুর্ব্যসনে হইতে কেবল ভগবানই—বাঁচাইতে পারেন।

শিকাগোর একদিনের দৃশ্য পাঠকের দৃষ্টিপথে আনিলাম। আশা করি ইহা হইতে কিছু লাভ করিতে পারিবেন। আমাদের দেশের কোটি কোটি নির্ধন কিরূপে জীবনের দিন অতিবাহিত করে, একবার ভাবিয়া দেখুন। যাহাদিগকে আমরা নীচ জাতি বলি তাহাদিগকে কি ঘৃণার দৃষ্টিতেই না আমরা দেখি? তাহাদের সুখের জন্য আমরা কিই বা চিন্তা করিতেছি। নিজের গৃহ, নিজের নগর, নিজের জীবন যাপনের উপায় প্রভৃতি অন্য দেশের সহিত তুলনা করুন ও বুঝিয়া দেখুন, এ সময়ে আমাদিগের কর্ত্তব্য কি?

সত্যদেব

স্বামীসত্যদেবের গ্রন্থ হইতে শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন লাহিড়ীর দ্বারা অনূদিত

জাতীয় কবি গোবিন্দদাস

বর্ত্তমান সময়ে কোন কবির কবিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা বড়ই কঠিন। একটা কথা উঠিয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়ে সকল প্রকারের আলোচনায় একটা বিশ্বজনীন অধিষ্ঠান ভূমি (universal standpoint) নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক এবং সেই ভূমি হইতে আলোচনা করিলেই আলোচনা সঙ্গত হইবে। কবিতার আলোচনায় পৃথিবীর সকল দেশের সকল কবির কাব্য আলোচনা করিলে, কবিতার একটা বিশ্বজনীন সংজ্ঞা পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সেই সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ সহজ নহে। আবার তাহাতে মতভেদও অবশ্যম্ভাবী। এই কারণে অনেক বিচক্ষণ লোক সমালোচনা করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিলে, একটা বিশ্বজনীন অধিষ্ঠান-ভূমি আপনা হইতেই আবিষ্কৃত হইবে না। সুতরাং, কাব্য ও কবিতা সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে সমালোচনা হওয়া আবশ্যক। সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

গোবিন্দদাস সম্বন্ধে প্রথম ও প্রধান কথা এই যে, তিনি বাঙ্গালার একজন উচ্চাঙ্গের জাতীয় কবি। 'জাতীয় কবি' বলিলে কি বুঝিতে হইবে, তাহাই প্রথম আলোচ্য। মানুষের অন্তরতম প্রকৃতি সর্ব্বত্রই একরূপ। মানব-হৃদয়ের চিরন্তন আশা, আকাঙ্খা ও উদ্দীপনা সকল দেশে ও সকল যুগে একরূপ; কিন্তু ইহা মানবের অন্তরতম সনাতন প্রকৃতি। এই প্রকৃতি আত্ম-প্রকাশ করিতেছে—আত্ম-প্রকাশ করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। এই সংগ্রাম সকল দেশে ও সকল যুগে একরূপ নহে। এক এক দেশ ও এক এক জাতি, এক এক যুগে কতকগুলি বিশেষ রকমের সমস্যার সম্মুখীন হয়, এবং সেই সমস্যাগুলির মীমাংসা করিতে বাধ্য হয়। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির যুগের সমস্যা, আর ঈশ্বরগুপ্তের বা হেমচন্দ্রনবীনচন্দ্রের যুগের সমস্যা, ঠিক একরূপ নহে। একটা যুগের সাধারণ সমস্যা ছাড়া, প্রত্যেক মানুষেরও জীবন কতকগুলি সমস্যার ছায়ায় বেষ্টিত এবং প্রত্যেক মানুষকে সেই সমস্যাগুলির সহিত সংগ্রাম করিয়া, যাহা হউক একটা মীমাংসায় উপস্থিত হইতে হয়। ব্যক্তিগত জীবনের এই সংগ্রাম, কেবল মাত্র ব্যক্তিগত নহে, তাহারও একটা নিত্যতা ও সর্ব্বজনীনতা আছে। সুতরাং প্রত্যেক মানুষের জীবন-সংগ্রাম, কেবল তাহারই সংগ্রাম নহে,—গভীর ভাবে বুঝিতে পারিলে, বিশ্ব-সংগ্রামের একটি তরঙ্গ মাত্র।

কোন কবি জাতীয় কবি কি না, ইহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, তাঁহার কবিতায় জীবনের যে সমস্যা ও সংগ্রাম মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, সেই সমস্যা ও সংগ্রাম আমাদের বর্ত্তমান যুগের প্রকৃত জীবনের সাধারণ সমস্যা ও সংগ্রাম কি না, তাহাই নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কবি যে দুঃখে কাঁদিতেছেন, যে জ্বালায় জ্বলিতেছেন—সেই দুঃখ ও জ্বালা, আমাদের সকলের জীবনের দুঃখ ও জ্বালা কি না, তাহা অবধারণ করিতে হইবে মোটামুটি এই লক্ষণগুলির দ্বারায় কোন কবি, 'জাতীয় কবি'—এই আখ্যা পাইবার অধিকারী কি না, তাহা নির্দ্ধারিত হইবে। আমাদের দুঃখ আছে; সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য আমরা চিন্তাও করি, চেষ্টাও করি। সংসার একটি সংগ্রাম-ক্ষেত্র। এই যুদ্ধে যোগ দেওয়াই মানব-

জীবনের সার্থকতা। 'জাতীয় কবি' তিনি, যিনি ভাবের দিক্ দিয়া মানুষকে এই সংগ্রামে উদ্বোধিত করিতে পারেন; এবং এমন একটা অপার্থিব রস মানব-হৃদয়ে সঞ্চারিত করিতে পারেন, যাহাতে মানুষ নব বলে বলীয়ান্ হইয়া আশায় ও উৎসাহে এই সংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারে। জাতীয়-জীবনের ইহাই প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক তাঁহার আবিষ্কারের দ্বারা, কর্ম্মী তাঁহার কর্ম্মের দ্বারা, যদি এই কার্য্য করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা বলিব— উঁহারা জাতীয় বৈজ্ঞানিক ও জাতীয় কর্ম্মী। কবির ক্ষেত্র অবশ্য স্বতন্ত্র; তিনি তাঁহার নিজের ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিবেন। গীতায় ভাষায়—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইবেন। কিন্তু তাঁহার এই ধর্ম্ম-নিষ্ঠা বা কর্ত্তব্য-পালন জাতির জীবনের পূর্ব্বোক্ত প্রয়োজনগুলি যদি সাধন করিতে না পারে, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে 'জাতীয় কবি' বলিতে পারিব না।

কবি কে এবং কবিতা কি? তাহারও একটি সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। ছন্দোবদ্ধ বাক্য,—পড়িতে ভাল লাগে—তাহাই কি কবিতা? এই সংজ্ঞায় এখনকার লোকে তুষ্ট হইবে না। কতকগুলি বড় বড়, নীতি কথা-হৃদয়ের কাছে ও কর্ণের কাছে যিনি মিষ্ট করিয়া বলিতে পারেনা তিনিই কি কবি?—তাঁহারই রচনা কি কবিতপদবাচ্য? এই সংজ্ঞাতেও বর্ত্তমান যুগ তুষ্ট হইবে না। কবির প্রথম লক্ষণ এই যে, তাঁহার একটা নিজত্ব থাকা চাই। Sainte Beauve বলিয়াছেন—The end and object of every original writer is to express what nobody has expressed, to render what nobody else is able to render. ইহার অর্থ—মৌলিকতা না থাকিলে, কেহ সুলেখক হয় না। তাঁহাকে এমন কথা বলিতে হইবে, যাহা আর কেহ বলে নাই। ইহার অর্থ এমন নয় যে, কবি একেবারে নূতন ব্যাপার আবিষ্কার করিবেন—তাহা অসম্ভব। একেবারে খাঁটি নূতন কিছু আছে কি না সন্দেহ। কথাটা এই যে, সত্য করিয়া কবি হইতে হইলে, তাঁহার একটি 'নিজস্ব দর্শন' (personal vision) থাকা চাই। তিনটি জিনিষ—আন্তরিকতা (sincerity), নিজত্ব (personality) ও রচনা-রীতির বৈশিষ্ঠ্য (style) এই তিনটি গুণ না থাকিলে, কাহাকেও কবি বলা যায় না। আন্তরিকতার অর্থ— সত্য-ভাষণ। সত্যকে আমরা কেহই সম্পূর্ণরূপে পাই নাই। কাজেই, আমরা প্রত্যেক লোকের কাছে, তাহার যেটি সত্য, সেটি সকল সময়ে বলিতে পারি না। কিন্তু আমার সত্য, আমার বলিবার সামর্থ্য থাকা আবশ্যক। কবির প্রথম কার্য্যই এই He must tell *himself* the truth. কবি একজন শিল্পী—শব্দ তাঁহার উপকরণ। শব্দের সাহায্যে তিনি তাঁহার চিন্তা (thoughts), কল্পনা (emotions), বেদন (sensation) প্রকাশ করিতেছেন। চিত্রকরও শিল্পী—তিনি বর্ণ-বিন্যাসের দ্বারা ঐগুলি প্রকাশ করিতেছেন। গায়কও শিল্পী—তিনি সুর ও ধ্বনির দ্বারা ঐগুলি প্রকাশ করিতেছেন। এখন কথা এই—প্রত্যেক সত্য-শিল্পীকে তাঁহার নিজের চিন্তা, নিজের কল্পনা ও নিজের বেদন প্রকাশ করিতে হইবে। প্রত্যেক শিল্পী হয়ত মনে করেন—তিনি নিজেরই ভাব প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, তিনি অন্য লোকের ভাব, কল্পনা ও বেদন লইয়া কেবল কারবার করিতেছেন। এই শ্রেণীর লেখকগণকে কবি বলিতে পারিব না। এই প্রকারের

চেষ্টা কেবল শক্তির অপচয় মাত্র। সাহিত্যের মধ্য দিয়া, কোন চিন্তা বা কোন 'দর্শন' (vision) দিতে হইলে, প্রথমেই বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে—ইহা আমার নিজের চিন্তা ও নিজের 'দর্শন' কি না। কবির শক্তি কম হইতে পারে, ভাষার নৈপুণ্য কম থাকিতে পারে, অর্জ্জিত বিদ্যা নাও থাকিতে পারে; কিন্তু এই দর্শন যদি তাঁহার নিজস্ব দর্শন হয়, তাহা হইলে তিনি কবি—সত্যকার কবি।

তাহা হইলে, কবি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, এই ব্যক্তিত্ব ও নিজত্ব (Personality) তাঁহার কতখানি আছে, তাহারই বিচার সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক। দেখিতে হইবে, তাঁহার নিজের কিছু সত্য করিয়া বলিবার আছে কিনা। রচনা-শক্তি এই ব্যক্তিত্বের বহিঃ-প্রকাশ (The external mark of personality is Style)।

মৎ-সঙ্কলিত 'মোহন-সুধা নামক সংগ্রহ-গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছি—'রচনা-ভঙ্গী বা রচনা-রীতি, শব্দ ও পদ-বিন্যাসের একটি কৃত্রিম বিধান মাত্র নহে। কোন বিশিষ্ট লেখকের রচনা-রীতির আলোচনায়, শব্দের ব্যাকরণ-শুদ্ধি বা অলঙ্কারাদির বিশুদ্ধতার হিসাব করিলেই চলিবে না। এই হিসাবের প্রয়োজন আছে সত্য; কিন্তু উহা গৌণ। সাহিত্যের রচনা-রীতি তাহার সমগ্রতার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা, লেখকের মানসিক-প্রকৃতি প্রকাশ করিয়া থাকে। একজন প্রতীচ্য পণ্ডিত এই রচনা-রীতিকে organology of writing বলিয়াছেন।

এখনকার দিনে কোন কবির কবিতা আলোচনা করিতে হইলে, তাঁহার রচনা-রীতি ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। সাহিত্যের বাজারে বহুকাল হইতে প্রচলিত ভাল ভাল কথা, উপমা প্রভৃতি (Conventional expressions) বহুল পরিমাণে ও নিপুণভাবে ব্যবহার করিয়া, অনেকে সুকবি বলিয়া একদল লোকের নিকট প্রশংসা লাভ করেন। কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত কবি-পদবাচ্য নহেন। আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণব কবিগণের ব্যবহৃত শব্দ ও উপমাগুলিকে ছন্দে ও তানে মিলাইয়া একপ্রকারের কবিতা বহুল পরিমাণে রচিত হইতেছে। নানাকারণে, এই কবিতাগুলি আনন্দ বিধান করে। প্রথমতঃ প্রাচীন-কালের প্রিয়বস্তুর প্রতিধ্বনি, দ্বিতীয়তঃ ভাষা ও ছন্দের কমনীয়তা, আমাদিগকে মুগ্ধ করে; কিন্তু তাই বলিয়াই কবিতা-রাজ্যে তাঁহাদিগকে উচ্চস্থান দেওয়া যাইবে না। দেখিতে হইবে, ঐ কবিতার মৌলিকতা ও আন্তরিকতা আছে কি না।

কবি ও কবিতার মূল্য নির্দ্ধারণের যে কষ্টিপাথর দেওয়া হইল, তাহা যাঁহারা গ্রহণ করিবেন তাঁহারা কবিহিসাবে গোবিন্দদাসের বিশেষ সমাদর করিবেন। গোবিন্দদাস ইংরাজী লেখাপড়া জানিতেন না, সংস্কৃতও জানিতেন না। বাঙ্গালা ভাষার মধ্য দিয়া যেটুকু জ্ঞানলাভ করা তাঁহার যুগে সম্ভব ছিল, সেই টুকুই তাঁহার সম্বল। কাজেই, ভাণ করিবার নকল করিবার, ও ধার করিবার ক্ষেত্র ও সুবিধা তাঁহার খুব বিস্তৃত ছিল না। অবশ্য, প্রাচীন বাঙ্গলা কবিতা লইতে তিনি 'চক্রবাক চক্রবাকীর প্রেম,' 'কমল কুমুদের ভাল-বাসা' লইতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহার পক্ষপাতী ছিলেন না। এই প্রণালীতে, অর্থাৎ অপর কবির রচনা হইতে, তিনি কি পরিমাণে ভাল কথা, ভাল উপমা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার কবিতাকে কৃত্রিম সাজে সাজাইয়াছেন, তাহার বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক। এই

আলোচনায় দেখা যাইবে, তিনি ইহার পক্ষপাতী ছিলেন না। নিজের সত্যকার বেদন, অনুভূতি ও দর্শন নহে—এমন কথা তিনি প্রায়ই বলেন নাই। এই আন্তরিকতা ও সত্য-দর্শন, গোবিন্দদাসের বিশিষ্টতা। কৃত্রিম সাহিত্যের এই অতি-বিস্তারের যুগে, এই বিশিষ্টতা কত মূল্যবান, ও বাঞ্ছনীয়, সুধিগণ বিচার করিবেন।

গোবিন্দদাস যেরূপ তীব্রভাষায় দেশের লোককে গালাগালি করিয়াছেন, তেমন তীব্রভাষা এই যুগে অন্য কোন কবি ব্যবহার করেন নাই বা ব্যবহার করিতে পারেন নাই। শুনিয়াছি,—অনেক ভাললোক নাকি এই কারণে কবি গোবিন্দদাস ও তাঁহার কবিতা পছন্দ করেন না। কিন্তু এই তীব্রভাষা প্রয়োগের মূলে যে জ্বালা রহিয়াছে, সেই জ্বালা যে সত্য—অতিশয় সত্য। সেই জ্বালায় কবি সারাজীবন জ্বলিয়াছেন ও ছট্‌ফট্‌ করিয়াছেন। অনেক দানশীল বড়লোকের আশ্রয় পাইয়াছেন, কিন্তু কোথাও তিষ্টিতে পারেন নাই। এই গঞ্জনার তাড়নায় পুঃন পুঃন নিরালম্ব অবস্থায় দারিদ্র্য-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন। এই জ্বালা দাসত্বের জ্বালা—এই জ্বালা সহায়হীন শক্তিহীনতার জ্বালা! এই জ্বালা যখন সত্য, অন্যের কাছে না হউক, কবির নিজের কাছে যখন সর্ব্বাপেক্ষা বড় সত্য, তখন এই তীব্রতার মধ্যে একটা আন্তরিকতা আছে এবং এই কারণে তিনি প্রকৃত কবি। আর এই জ্বালা যদি আমাদের সকলের জ্বালা হয়, তাহা হইলে তিনি—জাতীয় কবি।

শ্রীশিবরতন মিত্র।

সে কালের রাইয়ত

(ফরাসী ধনবিজ্ঞানবিৎ পোল লাফার্গ প্রণীত গ্রন্থের এক অধ্যায়)

(১)

রাইয়তদের রক্ষণাবক্ষণের ভার ছিল সে যুগে জমিদারদের হাতে। এই রক্ষণাবেক্ষণের পারিশ্রমিক স্বরূপই জমিদাররা পাইত কর। "ফিউদ"-প্রথার সমাজে ইহাই প্রত্যেক স্তরের জনগণের পরস্পর সম্বন্ধের গোড়ার কথা।

কিন্তু কালে এই রক্ষণাবেক্ষণের ভার ফিউদারদের হাত হইতে উঠিয়া যায়। তথাপি ইহারা রাইয়তদের নিকট হইতে সাবেক কালের পাওয়ানা ভোগ করিতে থাকে। রাইয়তরা অনর্থক কর দিতে বাধ্য হইত। রাইয়তে জমিদারে বিরোধ জন্মে।

এই বিরোধের যুগে রাইয়তদের পক্ষে একদল লেখক ফরাসী সমাজে দেখা দেয়। তাহারা "বুর্জোআ" অর্থাৎ শিল্প বাণিজ্যে ধনশালী নবীন অভিজাতদের খয়েরখাঁ। ইহারা জমিদারদের স্বার্থের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করে। জমিদারদের স্বপক্ষে কলম চালাইবার ভার লয় ফিউদতত্ত্ববিৎ উকীলেরা। ইহারা পুরাণা অভিজাতদের অন্নবস্ত্রে প্রতিপালিত লোক।

"বুর্জোআ"পন্থী আর ফিউদার-পন্থী এই দুই দলের রাষ্ট্রকে বাকবিতণ্ডা চলিয়াছিল বহুকাল। শেষ পর্য্যন্ত ১৭৮৯ সালের বিপ্লবে ফরাসীরা জমিদারদের পাওনাগুলা খারিজ করিয়া দেয়। এই বিপ্লব জমিদারপন্থীদের পরাজয় এবং বুর্জোআ-পন্থীদের বিজয়লাভ ঘোষণা করে। সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার ধনদৌলতের পরিবর্ত্তে রাষ্ট্রে ও সমাজে নতুন আর এক প্রকার ধনদৌলতের প্রভাব প্রকটিত হয়।

এই "বুর্জোআ" প্রভাব বিলাতে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবে। হাউস অব কমন্স বা জনসাধারণের ঘর তখন হাউস অব লর্ডস্ বা অভিজাতদের ঘরের সমকক্ষরূপে পার্ল্যামেণ্ট সভায় ইজ্জত পায়। কিন্তু বিলাতী বিপ্লবে ফিউদযুগের দাবীদাওয়াগুলা একদম লুপ্ত হইয়া যায় নাই। জমিদার শ্রেণীর লোকেরা আজও রাইয়তদের নিকট হইতে অনেক কিছু অন্যায় আদায় করিতে অধিকারী। বিলাতে আজকাল জনসাধারণেরই জয়জয়কার চলিতেছে। তাহা সত্ত্বেও এখানে জমিদারদের বিশেষ অধিকার দেখা যায়। এ এক বিচিত্র দৃশ্য, বর্ত্তমান জগতেও মান্ধাতার আমলের জের!

বুর্জোআ ধনবিজ্ঞানবিদেরা ফিউদযুগটাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করিতে অভ্যস্ত, কিন্তু এইরূপ গালাগালিতে না মাতিয়া মধ্যযুগের জমিদারি প্রথাটার ভিতরকার কথা বুঝিতে চেষ্টা করাই যুক্তিসঙ্গত।

জমিদাররা রাইয়তদের নিকট নানা বাবদে নানা প্রকার আদায় ভোগ করিতে অভ্যস্ত। রইয়তদের মুরুব্বি সাজিয়া বুর্জোআ পণ্ডিতেরা এই আদায়গুলার নাম শুনিবামাত্র জুলুমের মূর্ত্তি চোখের সম্মুখে দেখে। কিন্তু ঐতিহাসিক আলোচনার ফলে জানিতে পারা যায় যে জমিদারদের এই সকল আয় কালে জোর জবরদস্তি এবং অত্যাচারের আদায়রূপে দেখা দিয়াছিল সত্য। কিন্তু এইগুলার উৎপত্তি কালে রাইয়তরা স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবেই ব্যবস্থা করিতে অভ্যস্ত ছিল। রাইয়তদের নিকট হইতে জমিদাররা যা কিছু পাইত সবই "অস্থাবর" শ্রেণীর ফিউদ সম্পত্তির অন্তর্গত।

সকল জমিদারই রাজা বাদশা বা অন্য কোনো বিজেতার সমরপ্রতিনিধিরূপে উৎপন্ন হয় নাই। অনেকে পল্লীবাসী, পল্লীর একজন, পল্লী-মোড়ল মাত্র ছিল। তাহার সঙ্গে অন্যান্য পল্লীবাসীর সম্বন্ধ ছিল সমানে সমানে। জমিজমার ভাগবাটোআরা চাষ আবাদ সম্বন্ধে এই পল্লী-মোড়ল জমিদার তাহার জাতভায়াদের বিধান মানিয়াই চলিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়ত ইতরজনেরা তাহার জমি চষিয়া দিত। কিন্তু তাহার একমাত্র কারণ এই যে তাহা হইলে সে চব্বিশ ঘণ্টা পল্লীবাসীদের রক্ষণাবেক্ষণে কাটাইবার সুযোগ পাইত।

হাক্‌সৎহার্ডজেন বলেন রুশিয়ায় "মির" (পল্লী সমবায়) এর এলাকার তৃতীয় বা চতুর্থ অংশ জমিন পল্লীমোড়লের (জমিদারের) প্রাপ্য। লাক্রয় মোঁ মেলিয়ঁ। ১৮২৫ সালে প্রকাশিত "দ্রু দ্রোআ দে কমুন স্থির লে বিআঁ কমুনো" (চৌথ সম্পত্তিতে জনগণের অধিকার) নামক গ্রন্থে ফরাসী পল্লী-মোড়ল বা জমিদারদের হিস্যা বিবৃত করিয়াছেন। দেখা যায় যে, চাষীরা যদি "বাবুর" বনভূমিতেও চৌথ অধিষার ভোগ করে, তাহা হইলে

চৌথ চষা জমির দুই-তৃতীয়াংশ বাবুর ভোগে আসিত। আর জনগণে যৌথ অধিকার যদি একমাত্র যৌথ বনভূমিতে আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে বাবুর হিস্যা চষাজমির এক তৃতীয়াংশ মাত্র।

সাংসারিক এবং আধ্যাত্মিক দুই প্রকার জমিদারের সম্পত্তির পরিমাণই বাড়িয়া যাইতেছিল। তখন "বাবুরা" এবং "মোহন্ত"রা জমি চাষ করাইবার জন্য "সার্ফ (ভূমিগোলাম) ঢুঁড়িয়া পাইত না। তখন ফিউদাররা অগত্যা কিষাণ-সমবায়ের হাতে নিজ নিজ জমি চাষের ব্যবস্থা ছাড়িয়া দিত। এই চাষের ব্যবস্থাকে "বর্দলাজ" বা "মেতেয়াজ" বলে। চাষীরা এই ব্যবস্থায় স্বাধীন অর্থাৎ ভূমিগোলাম নয়।

ফিউদাররা চাষীদের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ফসল পাইত। টাকা গুণিয়া কর আদায় করা হইত না। মধ্যযুগে ইয়োরোপের সর্ব্বত্র এই প্রথা চলিয়াছে। ১৭৮৯ সালের বিপ্লব পর্য্যন্ত "বর্দলাজ" বা "মেতেয়াজ"ই ফরাসী জমিজমার দস্তুর ছিল। অতিপ্রাচীন কালে—নবম শতাব্দীতে—প্যারিসের নিকটবর্ত্তী সাঁজার্ম্মা মঠের জমিদারিতে এই প্রথাই প্রচলিত ছিল। ইংরেজ নৃতত্ত্ববিৎ গম তাঁহার "ভিলেজ-কমিউনিটিজ" গ্রন্থে ইংল্যাণ্ডে, স্কটল্যাণ্ডে এবং আয়র্ল্যাণ্ডে এই ধরণের কিষাণ সমবায়ের অস্তিত্ব বিবৃত করিয়াছেন।

সার্ফ (বা ভূমিগোলাম) ই হউক অথবা মেতেয়াজ প্রথার স্বাধীন রাইয়তই হউক প্রত্যেকেই জমিদার (বাবু বা মোহন্ত) কে বৎসরে কয়েকদিনের গতর খাটাইবার সেবা দিতে হইত। ফিউদারদের জমি চষা আর ফসল গোলাবাড়ীতে মজুত করা এই দুই সেবার জন্য চাষীদের কয়েক দিন নির্দ্দিষ্ট থাকিত।

তখনকার দিনে ব্যবসা বাণিজ্য বিশেষ বিস্তৃত ছিল না। মাল বিনিময়, "বাজার করা" কেনা বেচা ইত্যাদি কারবার চলিত কম। ফিউদারের বাড়ীতে সকল প্রকার শিল্প-কারখানা থাকিত। অস্ত্রশস্ত্র, চাষ আবাদের যন্ত্রপাতি, তাঁত বুনা, কাপড়চোপড় তৈয়ারী করা সবই ছিল জমিদারি আর গির্জ্জার গৃহশিল্প। চাষীরা সস্ত্রীক এই সকল কারখানায় আসিয়া কয়েকদিন গতর খাটাইতে বাধ্য থাকিত।

নারীরা জমিদার পত্নীর খোদ তত্ত্বাবধানে কাজ করিত। "মানর" বা জমিদারের বাস্তু ভিটার যে অঞ্চলে মেয়েদের কারখানা থাকিত তাহাকে বলে "জেনিসিয়া"। মঠ-মন্দিরেও মোহন্তরা মেয়েদের খাটাইবার জন্য "জেনিসিয়া" কায়েম করিত। ৭২৮ খৃষ্টাব্দে এবার্হার্ড বাবু ম্যারবাখ মঠে কিছু দানের ব্যবস্থা করে। দানের দলিলে মঠের জেনিসিয়েতে মেয়ে-মহরের কথা উল্লিখিত আছে।

কারখানার মেয়েমহলগুলা ক্রমশঃ বাবুদের এবং মোহন্তদের বেশ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল। দুই শ্রেণীর জমিদারগণই নিজ নিজ রাইয়ত বা গোলামের স্ত্রীকন্যাদিগকে যথেচ্ছ ভোগ করিতে অভ্যস্ত ছিল। জেনিসিয়ারিয়া (অর্থাৎ জেনিসিয়া নামক জমিদার কারখানার মেয়ে-মজুর) শব্দ কালে বেশ্যা অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে। বর্ত্তমান জগতের বেশ্যালয়গুলা এইরূপে ধনী জমিদারের আর সন্ন্যাসী সাধু বাবাজীদের মঠ মন্দিরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

প্রথম প্রথম দিন তিনেকের বেশী রাইয়তদের ফিউদারের জন্য গতর খাটাইতে হইত না। বিজোর জনপদের এক বিধান এই :—"স্বাধীন রাইয়ত সারা বৎসরই স্বাধীনতা ভোগ করুক। বৎসরে মাত্র তিনদিন জমিদারের কাজে খাটিলেই তাহার কর্ত্তব্য ফুরাইয়া যাইবে।"

দলিলে লেখাপড়া না থাকিলে ফ্রান্সের রাজবিধানে রাইয়তরা বার্ষিক দশ দিন খাটিতে বাধ্য ছিল। এই গেল স্বাধীন রাইয়তদের কথা।

সার্ফ বা ভূমি গোলামদের এত সহজে রেহাই পাইবার জো ছিল না। তবে সপ্তাহে মোটের উপর তিন দিন ছিল তাহাদের কড়ার। তিন দিনের বেশী খাটা এক প্রকার নিষিদ্ধ ছিল। সার্ফদের প্রতি জমিদারের ব্যবহারও নেহাৎ মন্দ ছিল না। জমিদাররা গোলামদিগকে এক টুকরা জমি দিয়া দিত। এই জমি হইতে তাহাদিগকে খেদাইয়া দেওয়া চলিত না। তাহা ছাড়া সার্ফেরা জমিদারের ফসলে হিস্যা পাইত আর বন ভূমিতে জানোয়ার চরাইতেও অধিকারী ছিল।

মোটের উপর দেখিতেছি কয়েক দিনের জন্য গতর খাটানো। সেকালের ব্যবস্থায় রাইয়তদের পক্ষে কষ্টজনক বিবেচিত হইত না। জমিদারদের তরফ হইতে বরং বোধ হয় কিছু অসুবিধাই ভোগ করিতে হইত। অষ্টাদশ লুইয়ের কৃষিসচিব ১৮২২ সালে "ফে র্মাজ" (বা খাজনা) নামক গ্রন্থে এই কারণে বলিয়াছেন যে "জমিদাররা রাইয়তদের গতর খাটানো ব্যবস্থা পছন্দ করে না। তাহাদের পক্ষে চষা জমির ফসলে হিস্যা পাওয়াই লাভজনক।"

গতর খাটার প্রথাকে "সোকাজ" বলে। এই সোকেজ বাড়াইবার দিকে জমিদারেরা পরবর্ত্তী কালে বিশেষরূপে ঝোঁক দিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জাঁ শেণু নামক লেখক বলিতেছেন—"জমিদাররা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। চাষীদিগকে ধরিয়া বাঁধিয়া আনিয়া নিজ নিজ জমি চষানো হইত। আঙুর তোলাইবার জন্যও রাইয়তদিগকে বাধ্য করা হইত। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কাজে তাহাদিগকে তলব করা জমিদারদের স্বভাবে দাঁড়াইয়াছিল। অথচ এই সকল সেবায় তাহাদের কোনো ন্যায়সঙ্গত দাবী ছিল না। রাইয়তেরা মার খাইবার ভয়ে অথবা কোনো মতে জমিদারদের প্রতিহিংসা এড়াইয়া ধনপ্রাণ বাঁচাইবার আশায় হুকুম তামিল করিয়া আসিত।"

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইয়োরোপের প্রায় সকল দেশেই মাৎস্যন্যায় কম বেশী নিবারিত হইয়াছিল। সমাজে শান্তি দেখা দিয়াছিল। কাজেই তখন জমিদারদের তাঁবে দেশ রক্ষার কোনো দায়িত্ব ছিল না। ফিউদ-প্রথা বজায় থাকিবার কোনো কারণই দেখা যায় নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জমিদারেরা সাবেক কালের দাবী দাওয়াগুলা ষোল আনায় বজায় রাখিতে সচেষ্ট ছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীবিনয় কুমার সরকার।

বাংলার কথা-সাহিত্য
কবিবর দক্ষিণারঞ্জনের
বাংলার বুকের গান
ঠাকুরমার ঝুলি
ঠানদিদির থলে
রাজার গান
চাষার গান
এত বড় স্বদেশী আর কি আছে?
— রবীন্দ্রনাথ —
বুড়ার গান
শিশুর গান
বাংলার
মায়ের গান
ঠাকুরদাদার ঝুলি
দাদামশায়ের থলে
সকল বাংলা
'HAS MARKED OUT AN EPOCH IN OUR LITERATURE'
The Bande-Mataram
—AUROBINDO—
স্ত্রীর গান
যুবার গান
বাংলার স্বপ্নপুরী—ঠাকুরমার ঝুলি—১॥০
বংলার পবিত্র বই—ঠানদিদির থলে—১॥০
বাংলার ভোরের পদ্ম
বাঙালীর মায়ের শঙ্খরব
দাদামশায়ের থলে—১॥০
ঠাকুরদাদার ঝুলি—২৲
বাঙালীর আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা
কবিবর দক্ষিণারঞ্জনের বাংলার কথা-সাহিত্য
৩৯।১ কলেজ ষ্ট্রীট—আশুতোষ লাইব্রেরী—কলিকাতা।

সূচী

ক্যালকাটা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌,—৬৫ নং সার্পেণ্টাইন লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নব্যভারত

দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড] অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ [৮ম সংখ্যা

মলিয়ার ও তাহার নাট্য প্রতিভা

উত্তরকালে মলিয়ার যে একজন জগৎবিখ্যাত হাস্যরসিক হইবেন তাহা তাঁহার জন্মের দিনই বুঝা গিয়াছিল। কেননা যে পরিবারে তাঁহার জন্ম হয় তাহার নাম পক্‌লাঁ্যা (Poquelin), মলিয়ার নয়। ১৬২২ সনের ১৫ই জানুয়ারী প্যারিস সহরের St Eustache গীর্জ্জায় তাঁহার শুভনামকরণ হয় এবং নাম হয় জাঁ বাপ্‌তীস্‌ত্‌ পক্‌লাঁ্যা, Jean Baptiste Poquelin ইহার বাইশ বছর বাদে তিনি 'মলিয়ার' এই ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। সে কালে ভদ্রঘরের ছেলের পক্ষে আপনার বংশগৌরবের সংস্কার জলাঞ্জলি দিয়া প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে অভিনয় করা অত্যন্ত নিন্দার ব্যাপার ছিল, কাজেই তিনি যখন বংশের মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করিলেন তখন যে সমাজে একটা প্রচণ্ড রকমের বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মা-বাপ উভয়েই বেশ ভদ্রঘরের মধ্যবিত্তের সন্তান আর উভয়েই রাজ-সরকারে উঁচুদরের চাকরী করিতেন বলিয়া সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তিও ছিল যথেষ্ট। মধ্যবিত্তঘরের ছেলে হইয়াও মলিয়ার সেইকারণে রাজ-পরিবারের আদবকায়দা ও জাঁকজমকের সঙ্গে বিশেষ ভাবেই পরিচিত ছিলেন। ফরাসী রাজ-পরিবারের তখন গৌরবময় যুগ—ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ লুইর শাসন কাল, রিশল্যু এবং মাজারাঁ্যা কলব্যার এবং কঁদে প্রমুখ শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিশারদদের প্রভাব তখন অপ্রতিহত। রাষ্ট্র, সাহিত্য, এককথায় চিন্তাজগতে তখন ফরাসী ইতিহাসের গৌরবের যুগ। ষোড়শ শতাব্দীর ইংলণ্ডের ন্যায় সপ্তদশ শতাব্দীর ফ্রান্সও উন্নতির চরমে যাইয়া পৌঁছিয়াছিল। ইংলণ্ডে সে যুগে যেমন সপ্তম হেন্‌রী হইতে রাণী এলিজাবেথ পর্য্যন্ত পর পর শক্তিশালী রাজ-রাজড়ার আবির্ভাব হইয়াছিল, ফ্রান্সেও ঐ যুগ তেমনি চতুর্থ হেন্‌রী হইতে চতুর্দ্দশ লুই পর্য্যন্ত অতি পরাক্রমশালী নরপতির শাসন কাল। একদিকে ইংলণ্ডে স্যার ফিলিপ সিড্‌নী, মার্লো, শেক্সপিয়ার, হুকার, স্যর ফ্র্যান্সিস বেকন প্রমুখ চিন্তাবীরগণ, আর দিকে ফ্রান্সেও প্যাস্কাল, রাশফুকো, করনেই, এবং মলিয়ার, লাফঁতেইন্‌, রাসীন্‌, বোয়ালো, এবং বোসুয়ে প্রমুখ প্রতিভাবানের আবির্ভাব হইয়াছিল। বোয়ালোকে যদি সে যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

সমালোচক বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহা হইলে মলিয়ার যে সে যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান পুরুষ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মলিয়ারের ছেলেবেলার কথা বেশী কিছু জানিবার উপায় নাই। সে যুগের প্রায় সকল বড়লোকদের জীবনের কথা সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। মলিয়ার সম্বন্ধে মোটামুটি এই জানিতে পারা যায় যে তিনি পিতামাতার স্নেহ বড় বেশী ভোগ করিতে পারেন নাই। দশবছর বয়সের সময় মলিয়ারের মা পরলোক গমন করেন আর তাহার পরের বছরই তাঁহার বাবা পুনরায় বিবাহ করেন। ফলে মাতৃহীন শিশুপুত্রকে তাঁহার দাদামহাশয়ের স্নেহাশ্রয়ই গ্রহণ করিতে হয়। বৃদ্ধ দাদামহাশয় ছিলেন একজন উদারনৈতিক ও সুরসিক লোক এবং, অনেকের মতে, মলিয়ার তাঁহার এই বৃদ্ধ মাতামহের নিকটেই নাকি হাস্যরসের প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। এই কথা কতদূর সত্য সে বিষয়ে কোন কোন লোকের সন্দেহ থাকিলেও এ কথা সত্য যে, বৃদ্ধ তাঁহার বার্দ্ধক্যের সম্বল দৌহিত্রটিকে সঙ্গে লইয়া তখনকার দিনের প্রায় সবগুলি রঙ্গালয়েই অভিনয় দেখিতে যাইতেন। ইহা হইতেই যে বালকের মনে অভিনয়-শিল্পের উপর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আসিবে সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নাই।

ছেলেবেলায় মলিয়ার যাহাদিগকে সঙ্গীহিসাবে পাইয়াছিলেন তাহাদিগকে ঠিক ভদ্র আখ্যা দেওয়া যায় না। কেননা পথের ভিখারী-গায়ক, ছড়াওয়ালা, ইস্কুলের ইচড়ে পাকা ছেলে, চাকর খানসামা, আর ছোটজাতের স্ত্রীলোক—ইহাদের কাহাকেই শিক্ষিত ভদ্র বা সভ্য বলা চলে না। ইহাদের বেশীর ভাগেরই আড্ডা ছিল পঁন্নফ্-এর (Pont Neuf) পুলের আশেপাশে যে সকল অসংখ্য নাচঘর ছিল সেইখানে। ইহাদের, বিশেষ করিয়া সেই সময়কার একটা হুবহু চিত্র "মলিয়ার" নামক ব্যঙ্গনাটকখানায় দেখিতে পাওয়া যায়। মানব-সমাজের নিম্নস্তরের এই সব সঙ্গীর নিকট হইতে মলিয়ার তাঁহার হাস্যরসের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। এ সকল রঙ্গালয়ে যে সকল নাটক অভিনীত হইত তাহার প্রায় সবগুলিই অত্যন্ত জঘন্য রুচির পরিচায়ক। নায়ক নায়িকারা সকলেই মাতাল, শঠ, বদমায়েস, চরিত্রহীন চাকর বাকর আর দুশ্চরিত্রা নারী। এই জাতীয় বিদ্যালয়েই হাস্যরসিক মলিয়ারের হাস্যরসের হাতে খড়ি হইয়াছিল। এইখান হইতেই তিনি তাঁহার নাট্যকলার শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যের জোগান পাইয়াছিলেন। সমালোচক-বন্ধু বোয়ালো প্রহসনের উপর তাঁহার এতটা অনুরাগ দেখিয়া অনেক সময় দুঃখ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার আফ্‌শোস মলিয়ার সত্যকার নাট্য-সাহিত্যের চর্চ্চা না করিয়া প্রহসনে তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার অপচয় করিতেছেন কিন্তু মানব-সমাজের জীবন-চিত্র তিনি যে ভাবে দেখিয়াছেন, তাহার প্রাণের স্পন্দন, তাহার আশা-নিরাশা, সুখ দুঃখ ও অশ্রু-হাস্যের বিচিত্র লীলাকে তো তিনি কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারেন না। তাই এই সব চিত্র আঁকিবার অমন সুন্দর সহজ সুযোগকে তিনি কাজে না লাগাইয়া থাকিতে পারেন নাই। বন্ধু-বান্ধবের শত অনুযোগও তাঁহাকে তাঁহার আদর্শ হইতে এক পদও বিচলিত করিতে পারে নাই।

তখনও কিন্তু যুবক পকল্যাঁ, 'মলিয়ার' হন নাই। আর আর ছেলেদের মতই তাঁহাকেও "মানুষ" হইবার জন্য সমাজের দেওয়া সনাতন পদ্ধতির তথাকথিত শিক্ষার

গাঁতাকলে মাথা বাড়াইয়া দিতে হইল। ১৬৩৬—৪১ সন পর্য্যন্ত এই ছয় বৎসর কাল তাঁহাকে ক্লেরমঁ জেসুইট্ কলেজের নীরস আইন-কানুনের অতিচাপ সহিতে হইয়াছে এবং সে চাপ যে কতটা দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা মলিয়ারের লেখা পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়।

ছেলের ভবিষ্যৎ লইয়া বাপ ও দাদা মহাশয়ের মধ্যে ভীষণ পারিবারিক বিরোধের সৃষ্টি হইতে চলিল। একদিন বাপ মেজাজ গরম করিয়া বৃদ্ধ শ্বশুরকে বলিয়াছিলেন, "আপনি কি চান যে, ছেলেটা প্রহসনের নট হয়ে দাঁড়ায়?" জবাবে বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন, "ভগবান কি তাই করবেন যে, আমার দৌহিত্র বেলরোজের মত একদিন বিখ্যাত হাস্যরসিক অভিনেতা হয়ে উঠ্‌বে!"

বলাবাহুল্য, পিতার জেদ বজায় রাখিবার জন্য পুত্রকে ছয়-ছয়টি বৎসর জেসুইট কলেজের অচলায়তনে বন্দী হইয়া থাকিতে হইয়াছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দাদামহাশয়ের ভবিষ্যৎ বাণীই সফল হইয়াছিল।

কম

তখনকার দিনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেদের ছাত্রজীবনে নানারকম বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত। পোষাকে-পরিচ্ছদে, আহারে-বিহারে যেমন তাহাদের অত্যন্ত সংযম অভ্যাস করিতে হইত, আবার মাষ্টারদের রক্তচক্ষু আর উদ্যত বেত্রদণ্ডের বিভীষিকাও নেহাৎ কম ছিল না। তাহার পাশেই বড় ঘরের ছেলেরা পোষাক-পরিচ্ছদে, জাঁকজমকে ও বিলাসিতার বাহুল্যের সঙ্গে নানারকম উচ্ছৃঙ্খলতারও অবাধ প্রশ্রয় পাইত। মলিয়ারের বাবা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হইলেও সামাজিক সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ছেলেকে যে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন সেখানে বড় ঘরের ছেলেরাই পড়িতে পাইত। কাজেই সৌভাগ্যের বিষয়, মলিয়ারকে অশনভূষণে, আহারে-বিহারে কখনই তেমন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। এই বিদ্যালয়ের দিকে বড় ঘরের ছেলেদের এতটা ঝোঁক পড়িয়া গিয়াছিল যে, কিছুদিনের জন্য প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিমাকেও সে ক্ষুণ্ণ করিয়া দিয়াছিল। মলিয়ারের সহপাঠীদের মধ্যে Princede Conti, সুবিখ্যাত কঁদেএর ভাই সুরসিক বিখ্যাত বিলাসী ক্লদ্ শ্যাপেল, কবি হেনো, ডাক্তার ফ্রাঁসোয়া ব্যারনিয়ে প্রমুখের নাম করা যাইতে পারে। এই ব্যার্নিয়েই সম্রাট শাহ্‌জাহান ও আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আসিয়া মোগল-দরবারে স্থান পাইয়াছিলেন এবং তিনি যে দিন-লিপি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা সে যুগের ভারত ইতিহাসের একটা দিক উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

জেসুইট কলেজে সেই সময় একজন দার্শনিক গোছের অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহার নাম গ্যাসেণ্ডি (Gassendi)। ইনি কতকটা আমাদের চার্ব্বাক মুনির মতাবলম্বী। "জীবনের সকল সৌন্দর্য্য ও আনন্দ সর্ব্বদিক দিয়া পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান আদর্শ। গ্রীক্-কবি লুক্রেসিয়াস ছিলেন তাঁহার অতি প্রিয় আদর্শ মানব। ছেলেদের পড়াইবার সময় ক্লাসে পাইচারী করিতে করিতে তিনি তাঁহার কবিতা আওড়াইতেন। সত্যকারের

কাব্যপাঠে মন উন্নত এবং ভাষা ও লিপি-শিল্প মার্জ্জিত হয়, এই ছিল তাঁহার বলিবার বিষয়। এই জাতীয় অধ্যাপকের প্রভাব যে তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ করিয়াই লাগে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। শ্যাপেল্ প্রমুখ যুবক অতিমাত্রায় ভোগবিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন কিন্তু একমাত্র মলিয়ারই তাঁহার হাল্‌কা ভাবগুলিই কেবল গ্রহণ করেন নাই, সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক দেকার্তের গাম্ভীর্য্যও তিনি একান্ত আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। অধ্যাপক গ্যাসেণ্ডির নিকট হইতে তিনি পাইয়াছিলেন সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যানুভূতি, রঙ্গ ও ব্যঙ্গরসের উপাদান এবং মানব-জীবনের প্রহসনের ভাব, আর দেকার্তের নিকট হইতে লইয়াছিলেন সংযম-নিষ্ঠা, ব্যক্তিগত জীবনের সরলতা ও একান্ত ভাবে আর্টের সাধনা।

সেকালে মাতৃভাষার চর্চ্চা করাটা ফরাসী দেশেও সভ্য-সমাজ-বিরুদ্ধ ছিল। গ্রীক, ল্যাতিন তখন শিক্ষিত সমাজের একমাত্র গতি—ফরাসীর চর্চ্চায় শিক্ষা যে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে এই বিশ্বাস নবীনদলের ছিল না। মলিয়ারও এই প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। যে কয় বছর তিনি জেসুইট কলেজে ছিলেন সেই ছয় বছরকাল তিনি ল্যাতিন সাহিত্যের একান্ত চর্চ্চায় মশ্‌গুল হইয়া পড়িলেন, ফলে প্লেটো ও টেরেন্সর ব্যঙ্গ-নাট্যের প্রভাব তিনি কিছুতেই এড়াইতে পারেন নাই। এস্‌কিলস্, সফোক্লিস, এরিষ্টফেনিস, মেনান্দার এবং ইউরিপিডিস-প্রমুখ গ্রীক নাট্যকারদিগের রচনাও সম্ভবত তিনি ভালো করিয়াই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ছেলেদের অভিনয়ের জন্য শিক্ষকেরা তখন ল্যাতিন ভাষায় নাটক রচনা করিয়া দিতেন এবং এইরূপ কোন নাটকের অভিনয়েই মলিয়ার জীবনের সবপ্রথম ভূমিকা গ্রহণ করেন।

একজন লিখিয়া গিয়াছেন যে, মলিয়ার কেবল হাস্যরসের আধারই ছিলেন না, একজন উঁচুদরের দার্শনিকও বটে। কলেজ ছাড়িয়া দিয়া কিছুকাল একমাত্র দর্শনের চর্চ্চা লইয়াই তিনি দিনরাত কাটাইতেন কিন্তু পিতার নিকটে তাড়া খাইয়া তাঁহাকে দায়ে পড়িয়া আইনের চর্চ্চায় মন দিতেই হইল। অরলেয়াঁ হইতে তিনি আইনের উপাধি পাইলে একজন হাস্যরসিক নাট্যকার তাহা লইয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, অরলেয়াঁ হইতে গাধা-ঘোড়াও উপাধি পাইতে পারে! ক্রমশঃ

শ্রীকালিদাস নাগ

বাঙ্গলার আশুতোষ

যে মাসের শেষভাগে মাত্র কয়েকটি দিনের জন্য যখন আমাদের জিলায় জিলাসম্মেলনে যোগদানের নিমিত্ত কলিকাতা পরিত্যাগ করি, তখন কে জানিত যে ইহারই মধ্যে বাঙ্গলার মস্তকে এমন অশনিপাত হইবে? বাঙ্গলার বুকের ধন আশুতোষকে পাটলীপুত্রে হারাইতে হইবে.? সৌম্য সুন্দর আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের মহাপ্রয়াণের দুই দিন পরেই যখন বাঙ্গালার সার্থকনামা পুরুষশার্দ্দূল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত

মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিলাম বাস্তবিক মনে হইল দেশের উপর বিধাতার কি অভিশাপ! এই বিরাট্ পুরুষ, যিনি তাঁহার কর্ম্মজীবনের বিবিধ গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের মধ্যেও দেশের কল্যাণের জন্য এত চিন্তা করিয়াছিলেন, এত চেষ্টা করিয়াছিলেন, এত শক্তি ব্যয় করিয়াছিলেন, যিনি সেই কর্ম্মজীবন হইতে কতক পরিমাণে অবসর গ্রহণ করিবার সময়ে সমস্ত শক্তি এখন দেশের সেবায় নিয়োগ করিতে পারিবেন বলিয়া কত উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, কত নূতন কর্ম্মপ্রচেষ্টার কল্পনা করিয়াছিলেন, যাঁহাকে ভারতবর্ষের এই সন্ধিক্ষণে রাজনৈতিক সমরক্ষেত্রে একজন মহারথীরূপে পাইতে আশা করিয়া দেশবাসী কত ভরসা অনুভব করিতেছিলেন —ঠিক্ এই সময়েই এই বিরাট্ শক্তিকে বিধাতা তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসৃত করিলেন! ভারতে যেন একটা ইন্দ্রপাত হইল; বাঙ্গলা যেন নিঃসহায় নিঃসম্বল হইল। আমরা স্বল্পদৃষ্টি; বিধাতার নিগূঢ় লীলা রহস্য আমরা ভেদ করিতে পারি না; হয়ত ইহার মধ্যেও কোনও মহান্ মঙ্গলের বীজ নিহিত থাকিতে পারে; কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে আমাদের মনে হয়, যে এই যে নিদারুণ বিপৎপাত, ইহা সহজে পূরণ হইবার নহে। আশুতোষের মত মনীষী, আশুতোষের মত কর্ম্মী, আশুতোষের মত তেজস্বী পুরুষ কোনদেশে শতাব্দীতে একটা জন্মায় কি না সন্দেহ; বিশেষতঃ আমাদের মত ক্ষীণজীবী নিরীহ গতানুগতিকের দেশে আশুতোষের মত পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব একটা phenomenon বলিলেই হয়। তাঁহার আকস্মিক তিরোধানে দেশের যে কি সর্ব্বনাশ হইল হইল তাহার ইয়ত্তা করা দুরূহ।

আশুবাবুর জীবনকাহিনী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্য্যালোচনা করার এবং জাতীয় জীবনে আশুবাবুর স্থান নির্দ্দেশ করিবার সময় এখনও আসে নাই; এবং তাহা করিবার স্থানও ইহা নহে; এবং সে চেষ্টা করিবার অধিকারীও আমি নহি। এখানে শুধু তাঁহার জীবনের ও চরিত্রের মোটা মোটা কয়েকটা কথা যাহা স্বতঃই মনে উদিত হয় তাহারই যৎসামান্য আলোচনা করিব।

আশুতোষ ব্রাহ্মণ; বংশে ব্রাহ্মণ, জীবনেও আশুতোষের ব্রাহ্মণ্য গুণের কোন অভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। ব্রাহ্মণের সহজ অনাড়ম্বর জীবন যাপন, ব্রাহ্মণের গভীর মনীষা, ব্রাহ্মণের চিরঅতৃপ্ত জিজ্ঞাসা এই সবই তাঁহাতে ছিল। কিন্তু যাহা আশুতোষকে ব্রাহ্মণ সাধারণ হইতে বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছিল, যাহা কর্ম্মক্ষেত্রে আশুতোষকে অতবড় প্রচণ্ড শক্তিতে পরিণত করিয়াছিল, তাহা ছিল অপর একটী গুণ, তাহা আশুতোষের ক্ষত্রিয়ত্ব। এই ক্ষাত্র তেজই আশুতোষকে এই নির্জ্জীব নিশ্চেষ্ট দাসভাবাপন্ন বিপন্ন আত্মপ্রত্যয়হীন দেশে অবিসংবাদিত নেতৃত্বে উন্নীত করিয়াছিল। ইহার বলেই তাঁহার দেশবাসী স্বতঃই তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন। বিপদে সঙ্কটে নিরুপায় হইয়া তাঁহাকেই যেন এক পরম আশ্রয় পরম সহায় বলিয়া মনে করিতেন। ব্রততী যেমন মহীরুহকে আশ্রয় করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে সেই রকম একান্তভাবেই দেশবাসী তাঁহাকে জড়াইয়া থাকিতেন। এই ক্ষত্রিয় গুণের প্রভাবেই তিনি শুধু তাঁহার মিত্রের ভক্তিভাজন ছিলেন না, তাঁহার শত্রুর, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর ভয় ও শ্রদ্ধার ভাজন ছিলেন। আমাদের মত ভদ্রলোকের দেশে মিষ্টত্ব কমনীয়ত্ব ও মাধুর্য্য অনেকেরই থাকে। আশুতোষেরও যে তাহা ছিল না তাহা নহে—যাঁহারা

তাঁহার নিকটসম্পর্কে আসিয়াছেন তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার যে তিক্তত্ব, রূঢ়ত্ব ও গাম্ভীর্য্যের সমাবেশ ছিল তাহাই তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা করিয়াছিল। রঘুবংশে অমরকবি কালিদাস রাজর্ষি দিলীপের বর্ণনা করিতে গিয়া যে চিত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, বাস্তবিকই অক্ষরে অক্ষরে সে বর্ণনা বাঙ্গলার আশুতোষের সঙ্গে মিলিয়া যায়:

ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।
আত্মকর্ম্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রো ধর্ম্ম ইবাশ্রিতঃ॥
সর্ব্বাতিরিক্তসারেণ সর্ব্বতেজোঽভিভাবিনা।
স্থিতঃ সর্ব্বোন্নতেনোর্ব্বীং ক্রান্ত্বা মেরুরিবাত্মনঃ॥
আকার সদৃশ প্রাজ্ঞঃ প্রাজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ।
আগমৈঃ সদৃশারম্ভঃ আরম্ভ সদৃশোদয়ঃ॥
ভীমকান্তৈ র্নৃপগুণৈঃ স বভূবোপজীবিনাম্।
অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ॥

কালিদাসের তেজোময়ী তুলিকা যে অপূর্ব্ব আলেখ্যের অবতারণা করিয়া মূর্ত্তিমান্ ক্ষাত্র তেজকে ফুটাইয়া দিয়া তুলিয়াছে, বাঙ্গালার প্রকৃতই গৌরবের ও শ্লাঘার বিষয় যে রেখায় রেখায় সেই আলেখ্যে বাঙ্গালার আশুতোষের চিত্রই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই বিরাট্ শক্তিমান্ দেহ, সেই তীক্ষ্ণ সুগভীর মনীষা, সেই অক্লান্ত অশ্রান্ত কর্ম্মৈষণা, সেই আশ্রিতগণের অভিগম্যতা, সেই প্রচণ্ড অধৃষ্যতা, সেই অটুট আত্মপ্রত্যয়,—সকলই আশুতোষে ছিল। যাহার বলে তিনিও তাঁহার স্বদেশে মেরুর ন্যায়ই সগৌরবে অবস্থিতি করিতেন। আশুতোষের চরিত্রের এতদপেক্ষা সত্যতর বাস্তবতর বিশ্লেষণ হইতে পারে কিনা সন্দেহ।

আমার মনে হয় ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্রগুণের এই অপূর্ব্ব সমাবেশই আশুতোষের চরিত্রে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়, কিন্তু আর একদিক্ দিয়াও তাঁহার চরিত্রের বিশ্লেষণ কতকটা পরিমাণে করা যাইতে পারে। সেটী হইতেছে তাঁহার জীবনে ও চরিত্রে প্রাচ্য প্রতীচ্যের অদ্ভুত সম্মেলন। তিনি জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি খাঁটী প্রাচ্য ছিলেন, খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন; চিরকাল লোকমুখে "আশুবাবু" বলিয়া সম্ভাষিত হইতে গৌরব বোধ করিতেন। কখনও তিনি "মুখার্জ্জী সাহেব" বলিয়া পরিচিত হন নাই। অথচ কর্ম্মজীবনে বাঙ্গালী উচ্চতম যে যে পদ কামনা করিতে পারে, সেই সমস্ত পদ প্রতিষ্ঠা তাঁহার হইয়াছিল, পাশ্চাত্য গবর্ণমেণ্টের অধীনে কার্য্য করিয়া জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি ব্যয় করিয়াছিলেন; বড় বড় সাহেব সুবার সঙ্গে, লাট বড়লাটের সঙ্গে মিশিবার ও তাঁহাদের সঙ্গে একাসনে বসিবার যে সুযোগ তাঁহার হইয়াছিল তাহা অধিকাংশ ভারতবাসীরই হয় না। তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। প্রধান বিচারপতি হইয়াছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার ছিলেন, শেষকালে সেই পদে অধিষ্ঠিত না থাকিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কর্ণধার ছিলেন; তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন; তিনি কলিকাতা গণিত সভার সভাপতি ছিলেন; তিনি কাউন্সিলের মেম্বর হইয়াছিলেন;

তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের মেম্বর হইয়াছিলেন ; আর যে কত অগণিত সরকারী ও বেসরকারী অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান, সভা ও সমিতির সহিত বিশিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই—যে পদ গৌরবের শতাংশের একাংশ পাইলে বাঙ্গালী সাহেব বনিয়া যায় সেই সমস্ত পদ গৌরবের অধিকারী হইয়াও তিনি "আশুবাবু"ই চিরকাল রহিয়া গেলেন। আর সরকারী কাজের কয়েক ঘণ্টা সময় ব্যতীত তাঁহার সেই চিরন্তন লম্বা কোট মোটা চাদর সাদা ধুতি ও ফিতাহীন জুতাও কোনদিন ফুরাইল না। একথা সকলেই জানেন তিনি সাক্ষাৎভাবে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিতে সুযোগ পান নাই; কিন্তু নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা, নিজের বেশভূষায় আচারে ব্যবহারে পাশ্চাত্য হাবভাব ও বিলাস উপকরণ বর্জ্জন করিয়া তিনি যে উদাহরণ দেশবাসীকে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালার জাতীয় সম্মানজ্ঞান কম উদ্বুদ্ধ হয় নাই। এই স্বদেশ ভক্তি, স্বদেশের গৌরবে নিজের গৌরববোধ, বিদেশীর কাছে নিজেকে কখনও খাটো ও হীন ও অপমানিত না করা এই ভাব আশুবাবুর প্রত্যেক কর্ম্ম প্রচেষ্টার ভিতর লক্ষ করা যায়।

আশুবাবুর জীবনের প্রধান যাহা দান—দেশে শিক্ষার অপরিসীম বিস্তার তাহারও ভিতরের কথা এই দেশপ্রাণতা। সমস্ত দিকে কার্য্য করিবার তাঁহার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই সত্য, কিন্তু যে দিকটায় হস্তক্ষেপ করিবার তিনি অবকাশ পাইয়াছিলেন—শিক্ষার দিক্—সে দিকে তাঁহার আপ্রাণ প্রচেষ্টাই এই ছিল যে তিনি বাঙ্গালায় ঘরে ঘরে শিক্ষার আলোক বিকীরণ করিবেন। লাট কার্জ্জনের বিশ্ববিদ্যালয় আইনের মূলনীতির বিরুদ্ধে সেই আইনই অবলম্বন করিয়া আশুবাবু যেরূপে তাঁহার আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার অদ্ভুত কর্ম্মনৈপুণ্য ও অকপট স্বদেশভক্তিরই পরিচয় দিতেছে। শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষা প্রদানের প্রণালী লইয়া তাঁহাকে উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারীদিগের সহিত কত যে লড়াই করিতে হইয়াছে তাহা ত কাহারও অবিদিত নাই। স্বদেশীর যুগে ব্রজমোহন বিদ্যালয় রক্ষাকল্পে আশুবাবু সরকারী শিক্ষাবিভাগের সহিত যে কিরকম বুঝিয়াছিলেন, তাহাত আমরা সকলেই জানি, এবং সেজন্য আমরা বরিশালবাসী সকলেই তাঁহার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিব। আশুবাবুর মুখেই শুনিয়াছি যখন লাট হার্ডিং প্রথম বড় লাট হইয়া কলিকাতায় আসেন তখন একদিন তাঁহার সঙ্গে আশুবাবুর শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা হয়। হার্ডিং বলেন যে শিক্ষা পদ্ধতিকে সংস্কার করিতে হইবে standard নীচু হইয়া গিয়াছে! better education দিতে হইবে। তখন আশুবাবু নির্ভীকভাবে বড়লাটকে বলেন I like your better education, but if by 'better education you mean less education I shall have none of it" আশুবাবুর এই স্পষ্ট বাক্যে বড়লাট হার্ডিং বেশ একটু সমঝিয়া গেলেন। তারপরে যখন কলিকাতায় বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠানকল্পে আশুবাবুর অদম্য অধ্যবসায় ও প্ররোচনার ফলে সার তারক নাথ পালিত তাঁহার বহুমূল্য সম্পত্তি দান করেন, তখন আশুবাবুই জোর করিয়া বলেন যে দেশের লোকের অর্থে প্রতিষ্ঠিত এই বিজ্ঞান বিদ্যালয়ে দেশীয় অধ্যাপকই শুধু নিযুক্ত করিতে হইবে—Tom, Dick

ও Harryর মত সাহেবদের জন্য ত সরকারী কলেজই রহিয়াছে। তারকনাথ একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন তখন আশুবাবু তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, আশুবাবুর নিজের মুখে শোনা সেই কথা, এখনও আমার কাণে বাজিতেছে—"পালিত সাহেব, আপনি কালো চামড়া হয়ে একথা আপনি বলতে পারবেন না যে কালোচামড়া ছাড়া আমার চেয়ারে কেউ বস্‌তে পারবে না ?" স্বজাতিপ্রীতি, জাতীয় আত্মসম্মানবোধ এতই তাঁহার বদ্ধমূল ছিল। তাঁহার হিন্দুত্ব যে খুব গোঁড়া ছিল তাহা নহে, তিনি সামাজিক সংস্কারের খুবই পক্ষপাতী ছিলেন, নিজে প্রবল আন্দোলনসত্ত্বেও বিধবা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু বিদেশীর সম্মুখে তিনি তাঁহার হিন্দুত্ব, তাঁহার orthodoxy সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া চলিতেন ; কোন দিন গভর্ণমেণ্ট হাউসে dinner খান নাই ; নিমন্ত্রিত হইলে বলিতেন যে তিনি orthodox হিন্দু, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে না পারিয়া দুঃখিত আছেন। এই আত্ম সম্মান বোধ ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের বলেই বিদেশীগণও তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত, তাঁহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। এবং তাঁহার সম্মুখে খাটো হইয়া থাকিত। এবং সত্য কথা বলিতে কি, সাহেব জব্দ করিয়া রাখিবার এই বাঙ্গালীদুর্লভ অসাধারণ শক্তির জন্য তাঁহার স্বদেশীয়গণ মনে মনে অত্যন্ত গর্ব্ব অনুভব করিত। এই প্রসঙ্গে আশুবাবুর নিকটেই শ্রুত একটী গল্প বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৯১৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে Post graduate Department বসাইবার বিষয় নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত ভারত গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশঅনুসারে একটী কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে সাহেবও অনেক ছিল, বাঙ্গালীও অনেক ছিল। আশুবাবু ছিলেন সভাপতি। সকলেই জানিত যে এই ব্যাপার লইয়া একটা তুমুল যুদ্ধ কমিটিতে হইবে ; কারণ ভারতগবর্ণমেণ্ট আশুবাবুর কল্পিত এই Post Graduate Deparmentকে বড় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন না। সুতরাং সকলেই আশঙ্কা করিয়াছিল যে সাহেবরা বিরোধী হইবে। এণ্ডার্সন সাহেব ছিলেন সেক্রেটারী। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল যে কমিটিতে কোন মতানৈক্য নাই, তাঁহারা unanimous report দিয়া আশুবাবুর মতই সমর্থন করিয়াছেন। সেই সময়ে স্বনামধন্য Sharp সাহেব ছিলেন ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগে। তিনি ত এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে চটিয়াই আগুন, তিনি এণ্ডার্সন সাহেবকে কড়া চিঠি লিখিলেন, তোমরা সব কি করিয়াছ ? তোমরা কি সব ঘুমাইতেছিলে ? আশুবাবু, তোমরা সব সাহেব থাকিতে, কি করিয়া unanimous report বাহির করিতে পারিলেন ? ইহার কিছুদিন পরে শার্পসাহেব কলিকাতা আসিলেন, এবং এক ডিনারে তাঁহার সঙ্গে এণ্ডার্সনের দেখা হইলে পুনরায় অনুযোগ করিলেন। তখন এণ্ডার্সন যে জবাব দিলেন তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য ! তিনি বলিলেন, Well, Mr. Sharp, it is all very easy to write Sharp letters from Simla: but when you have to meet that man face to face, it is quite another question.

এই স্বাদেশিকতা, অনেকে হয়ত বলিবেন উৎকট স্বাদেশিকতা, থাকিলেও তিনি প্রতীচ্যকে ঘৃণা করিতেন না, প্রতীচ্যের বিজ্ঞান সাধনা, প্রতীচ্যের অদম্য কর্ম্মশক্তি, প্রতীচ্যের

অবিচলিত উদ্যম তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতেন, এবং শুধু তাহাই নহে, নিজের জীবনে প্রতীচ্যের সদ্‌গুণাবলী তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। আশুবাবুর কর্ম্মপ্রিয়তা প্রবাদে পরিণত হইয়াছে—আমাদের এই গরম ও কর্ম্মবিমুখ দেশে সত্যই তাঁহার কর্ম্মপ্রিয়তা ও কর্ম্ম করিবার শক্তি অতি অপূর্ব্ব ছিল—এমন কি পাশ্চাত্যেরাও তাহাতে বিস্মিত হইতেন। সে দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে আশুবাবুর স্মৃতিসভায় এখনকার প্রধানবিচারপতি Sir Lancelot Sanderson সাহেব বলিয়াছেন, আমি আশ্চর্য্য হইয়া যাইতাম যে আশুবাবু কেমন করিয়া হাইকোর্টে সারা দুপুর অত শ্রান্তিকর কাজ করিয়া আবার বৈকালবেলা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া রাত্রি নয়টা দশটা পর্য্যন্ত খাটিতেন। আমার ত এক বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চান্সেলারী করিয়াই আর স্বাস্থ্যে কুলাইল না। Sanderson সাহেব তাঁহার মনের কথাই বলিয়াছিলেন। আর আগেই বলিয়াছি যে হাইকোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও যে তাঁহার আর কত কাজ ছিল সংখ্যা করা যায় না। আমাদের আশ্চর্য্য মনে হইত, যে ঐ মোটা দেহ লইয়া কিরকমে তিনি এত কাজ পারিয়া উঠেন। আর এত কাজের চাপেও নিজে কোন দিন বিরক্ত হইতেন না, অথবা কাজ ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিতেন না। একদিনের একটী ঘটনার উল্লেখ করি। কি কার্য্য-ব্যপদেশে ঠিক আমার স্মরণ নাই সন্ধ্যার পরে আশুবাবুর বাসায় গিয়াছি: শুনিলাম তিনি তখনও আসেন নাই; হাইকোর্টের পর কোথায় কোন মিটিং ছিল, খুব সম্ভবত: Asiatic Societyতে, সেই খানে তিনি সভাপতি, তথায় গিয়াছেন: আমি তাঁহার বৈঠকখানায় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এমন সময় দেশপূজ্য পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় তথায় উপস্থিত; তিনিও আশুবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। কতক্ষণ পরে আশুবাবু আসিলেন বাড়ীর মধ্যে গিয়া কাপড় ছাড়িয়াই সংবাদ পাইলেন যে পণ্ডিত মালবীয় আসিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ বৈঠকখানায় চলিয়া আসিলেন। দেখিয়াই তাঁহাকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত মনে হইল। আশুবাবুও বলিলেন যে মিটিং সারিয়া আসিতে তাঁহার দেরী হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিতজী বলিলেন যে তাহা হইলে আপনি একটু বিশ্রাম করুন, পরে আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইবে। আশুবাবু উত্তর করিলেন "Punditji, Rest! Rest is not for me" সত্যই তাঁহার সমস্ত জীবনই এই অক্লান্ত খাটুনির ভিতর দিয়া গিয়াছে; আর সেই জন্যই বুঝি যখন কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া একটু বিশ্রামের সময় আসিয়াছিল, তখনই প্রকৃতি দেবী তাঁহাকে কাড়িয়া লইলেন। হাইকোর্টের জজিয়তী তারপর ডুমরাঁও কেসের খাটুনী, আর সেই খাটুনী যেই শেষ হইয়া আসিল, তাহাতেই মহাপ্রয়াণ। সত্যই আশুবাবু বলিয়াছিলেন Punditji, rest is not for me ইংরাজীতে যাহাকে বলে dying in harness, আশুবাবুর ভাগ্যে তাহাই হইল; বোধ হয় ইহাই তাঁহার কামনা ছিল।

এই যে কর্ম্মশক্তি ইহা তাঁহার সম্ভবই হইত না যদি তাঁহার মধ্যে কার্য্যশৃঙ্খলাগুণ খুব বেশী পরিমাণে না থাকিত। এই পাশ্চাত্য গুণও তাঁহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। তাঁহার কাজ করিবার পদ্ধতির regularity অতি অসাধারণ। তাঁহাকে একদিন তাঁহার

যৌবনের বিষয়' জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন যে আমার নিজেরও মনে হয় যে এই regularity আমার অনেক সাহায্য করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কয়টার সময় উঠেন? তিনি বলিলেন, 'ভোর চারিটার সময়।' আমি বলিলাম, 'কতদিন ধরিয়া?' তিনি বলিলেন, "শৈশব হইতে, আজ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ঐ সময়েই উঠিতেছি। এখনও মনে পড়ে ছেলেবেলা যখন বাল্যশিক্ষা পড়িতাম, সকালবেলা মাষ্টার মহাশয় পড়াইতে আসিতেন, আমি ভোর চারিটার সময় উঠিয়া পিলসুজের বাতির নিকট গিয়া একটী চৌকিতে বসিয়া পড়া মুখস্থ করিয়া রাখিতাম। বাড়ীর অন্যান্য ছেলেরা দেরীতে উঠিয়া পড়া করিয়া উঠিতে পারিত না, মাষ্টার মহাশয়ের বকুনি খাইত, আমার খুব মজা লাগিত।" সকলে জানেন আশুবাবু চৌরঙ্গীর পাশে-গড়ের মাঠের রাস্তা ধরিয়া প্রত্যহ প্রাতঃভ্রমণ করিতেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি সকালবেলা গড়ের মাঠে কতদিন ধরিয়া বেড়াইতেছেন?" তিনি বলিলেন 'চল্লিশ বৎসর ধরিয়া'। তাঁহার সব বিষয়েই regularity এই রকম অদ্ভুত।

আমাদের দেশে সচরাচর এই সব পাশ্চাত্যদেশসুলভ গুণের বড় অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার কর্ম্মশক্তি, এই প্রকার নিয়মানুবর্ত্তিতা এই প্রকার উৎসাহ ছিল বলিয়াই এত বিবিধ ক্ষেত্রে তিনি সফলকাম হইতে পারিয়াছিলেন। শারীরিক শ্রমশীলতাও ছিল তাঁহার অসাধারণ। শরীরের প্রতি দৃষ্টি, ব্যায়াম, এই সকল আমরা সাধারণতঃ গ্রাহ্যই করি না। আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যেও এ গুণ বড় কমই দৃষ্ট হয়। বোধ হয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছাড়া এই বিষয় আদর্শস্থানীয় বাঙ্গালী বড় কমই আছেন। এই জন্য লোকে কত আশা করিয়াছিল যে আরও অন্ততঃ কুড়ি বৎসর কাল আশুবাবুকে আমরা পাইব; তাঁহার যে শারীরিক শক্তি ছিল তাহাতে ইহা কিছুমাত্র দুরাশা ছিল না। এ জন্যও তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যু লোকের মনে বড় লাগিয়াছে।

পাশ্চাত্যজাতিসুলভ এই সব গুণ থাকা সত্ত্বেও আমাদের প্রাচীন সমাজের যে সব ভাল ভাল গুণ তাহাও তাঁহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। প্রথমেই মনে পড়ে তাঁহার সামাজিকতা। আলাপে ব্যবহারে নিমন্ত্রণে আপ্যায়নে তিনি তাঁহার ব্রাহ্মণ্য প্রাচ্য ধারা সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়ছিলেন। সব শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন; অত বড় একটা লোক কিন্তু কোন প্রকার আভিজাত্যের ভাব বা exclusion ছিল না; তাঁহার বৈঠকখানা আবাল যুবক বৃদ্ধের সমাবেশ ক্ষেত্র ছিল; ছাত্রদিগের তিনি পরম বন্ধু, আশুবাবুর কাছে তাহাদের ত সাতখুন মাপ; পড়া শুনা নিয়া কারও কোন গোলমাল বা অসুবিধা হইল, ধর গিয়া আশুবাবুকে; চাকুরীর জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, ধর গিয়া তাঁহাকে; আর তিনি অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত দিনের পর দিন এই সমস্ত লোকের কথা শুনিতেন। তাহাদের উপকার করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন, কত দুঃস্থ ছাত্রকে বই কিনিয়া দিয়া বা অন্যপ্রকারে অর্থসাহায্য করিতেন; দেখা না পাইয়া তাঁহার ঘর হইতে কাহারও ফিরিয়া যাইতে হইত না। এই কারণে অনেক প্রসিদ্ধ লোক যেমন শুধু নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন, কদাপি নরলোকের চক্ষুগোচর হন না, আশুবাবুর প্রসিদ্ধি সেই প্রকার হয় নাই। অসংখ্য লোকের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল; এবং এই পরিচয় রক্ষা করিতে

সাহায্য করিয়াছিল তাঁহার অদ্ভূত স্মরণ শক্তি। যাঁহাকে একবার দেখিতেন তাঁহাকে ভুলিতেন না; বিশ্ববিদ্যালয়ের calendar তাঁহার মুখস্থ ছিল। এবং এই পরিচয় শুধু লৌকিক দুটী কথাতেই পর্য্যবেসিত হইত না; তিনি গুণের সমাদর করিতে জানিতেন, এবং গুণীকে উৎসাহ দিতে জানিতেন। এই সামাজিকতা, লৌকিকতা ও অবাধে পরিচয়ের ফলে আশুবাবুর মৃত্যুকে যত লোক নিজেদের personal loss বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং মর্ম্মাহত হইয়াছেন, এরকম অন্য বড় লোকের মৃত্যুতে হয় নাই। হিন্দু গৃহস্থের সব সদগুণই তাঁহাতে ছিল। তিনি মাতৃবৎসল পুত্র, প্রেমিক স্বামী, স্নেহপ্রবণ পিতা ছিলেন; তাঁহার প্রথমা কন্যার দুর্ভাগ্যে তিনি যে মনে কতবড় দাগা পাইয়াছিলেন, এবং কন্যার মৃত্যুতে যে কি পরিমাণে শোকাভিভূত হইয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা তাঁহার পারিবারিক জীবনের খোঁজ রাখেন তাঁহারাই অবগত আছেন। শেষের সে শোক তিনি জীবন থাকিতে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; অনেকের ধারণা যে তাঁহার নিজের শরীর ভঙ্গের কারণও অনেকটা ইহাই; পাটনায় মৃত্যুশয্যায় শুইয়া তাঁহার সেই উক্তি কমলা! মা, তুমি আমায় ডাক্‌ছো! স্মরণ করিলে আমাদেরও অশ্রুসংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। অতি সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থের জীবন যাত্রা যে প্রণালীতে চলে, আশুবাবুর গৃহের ব্যবস্থা পদ্ধতিও ঠিক্ সেই প্রণালীতেই চলিত। তাঁহার আতিথেয়তাও ছিল চমৎকার; লোক খাওয়াইতে তাঁহার কি উৎসাহ; এবং যেমন খাওয়াইতে তেমনি খাইতেও তাঁহার উৎসাহ কিছু কম ছিল না। অন্য বিষয়ে তিনি যেমনই হউন না কেন, ভোজন বিষয়ে যে তাঁহার বিপ্রত্ব ষোলআনা বজায় ছিল তাহা তাঁহার অতিবড় শত্রুও অস্বীকার করিতে পারিবে না। আশুবাবুর ভীমনাগের সন্দেশপ্রীতি ত প্রায় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আর শুধু সন্দেশে নয় সর্ব্ববিধ ভোজ্য দ্রব্যেই তাঁহার বিচারপতিসুলভ অপক্ষপাতই ছিল। যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে রাসবিহারী বাবু ও আশুবাবু এই দুইজনের এক বৈঠকে বসিয়া খাইবার দৃশ্য একটি দেখিবার জিনিষ ছিল। আমি নিজেও কত দিন Mathematical Societyতে দেখিয়াছি এবং স্বীকার করিতে হয় যে কতকটা ঈর্ষার সঙ্গেই দেখিয়াছি যে সভাপতি আশুবাবুর জলযোগের জন্য আনীত কমলালেবু, স্তূপীকৃত সন্দেশ ও রাশীকৃত ডাব আনা হইয়াছে, আর তিনি খাঁটী সদ্‌ব্রাহ্মণেরই ন্যায় অবলীলাক্রমে সেইগুলিকে সংহার করিতেছেন। এই dyspeptic যুগের বাঙ্গালীর কাছে এ দৃশ্য দেখিয়াও সুখ। রাজা রামমোহন রায়ের খাওয়ার কথা বহিতে পড়িয়াছি, আশুবাবুর খাওয়া দেখিয়াছি। আর এক কারণে তিনি খুব জনপ্রিয় হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার হাস্যপরিহাসপ্রিয়তা, তাঁহার রসিকতা, তাঁহার আমোদী স্বভাব। আমাদের ভিতরে অনেকে আছেন যাঁহারা তাঁহাদের পদগৌরবে অত্যন্ত গুরুভারাক্রান্ত হইয়া পড়েন, এবং গাম্ভীর্য্যটাও স্বভাবসিদ্ধ করিয়া ফেলেন, এবং চটুলতা ও ছেলেমিকে অশোভন মনে করেন। কিন্তু আশুবাবুর এই অবিচলিত অটুট গাম্ভীর্য্য ছিল না। গম্ভীর, আবশ্যক হইলে, তিনি হইতে পারিতেন না এমন নহে, প্রলয়ের মেঘের মত এই রকম গাম্ভীর্য্যও তাঁহার বদনমণ্ডলে দেখিয়াছি, কিন্তু সুস্থ অবস্থায় সাধারণ অবস্থায় তাঁহার চটুল গল্পপ্রিয় ও চকিত কটাক্ষ, লঘু পরিহাস, ও প্রাণ খোলা অট্ট হাস্য তাঁহার

সান্নিধ্যকে ভীষণ না করিয়া অত্যন্ত মনোহর ও উপভোগ্য করিয়া তুলিত। গল্প করিতে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন ; আর anecdoteও তাঁহার জিহ্বাগ্রে ছিল ; এক কথায় conversationalist হিসাবে তিনি খুব brilliant ও চিত্তাকর্ষক ছিলেন। তাঁহার মত লোকের বালসুলভ চপলতা বড়ই প্রীতিকর লাগিত। একদিনের আমার নিজের সম্বন্ধে একটা কথা মনে পড়ে ; এখন আমার মনে হইতেছে সেই তাঁহার সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ ; তাই সেই পরিহাসের আনন্দের সঙ্গে আমার বিষাদ মিশ্রিত হইয়া আছে। গতবৎসর বাঙ্গালা ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্ব্বাচনে আমি যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে candidate দাঁড়াইলাম, শেষে অকৃতকার্য্য হই, তারপর একদিন আমি কি কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া রেজিষ্ট্রারের কামরায় প্রবেশ করিয়াছি ; ঢুকিয়াই দেখি যে আশুবাবু চোখাচাপকান পরিয়াই হাইকোর্ট হইতে তথায় আসিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। আমি তাঁহাকে নমস্কার করিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন "হেরো। হেরো! হেরো! চিরটা কাল ফার্ষ্ট হয়ে এখন হেরে গেলি?" আমি হাসিতে লাগিল্যাম। আর একদিন সে অনেক বৎসরের কথা। তখন সবে মাত্র এম্, এ পাশ করিয়াছি। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু অধ্যাপক মধুসূদন সরকার মহাশয়ও সেবার এম্, এ পাশ করিয়াছেন। এবং পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। আমরা দুইজনে আশুবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি। অন্যান্য কথাবার্ত্তা অনেকক্ষণ ধরিয়া হইবার পর কে একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক আশুবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তিনি আসিলেই, আশুবাবু আমাদের দুজনকে দেখাইয়া কহিলেন "দেখ্ছেন মশাই, এ দুজন কে। এক চড় দিলে কিন্তু পড়ে যায়। কিন্তু এরাই অশ্বিনীবাবুর দলের গুণ্ডা, গবর্ণমেণ্ট বলে anarchist ; do they look like it?" আর হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। আর একদিন আমি বসিয়া আছি, এমন সময়ে সরকারী চাকুরীপ্রার্থী এক যুবক আশুবাবুর নিকট আসিয়া জানাইলেন যে তিনি উঁহার নিকট একখানা সার্টিফিকেট পাইলে বড় উপকৃত হন। আশুবাবু বলিলেন "দেখ বাপু। তুমি ভুল কর্‌ছ। You have come to the wrong shop. আমি সার্টিফিকেট দিলে তোমার সরকারী চাকুরী এমনি যদি বা হ'ত তাও খসে যাবে। ওরা আমায় মনে করে কি জান, ওরা ঠিক করে বসে আছে, আমি বোমাওয়ালার সর্দ্দার। তবে ওরা আমায় কিছু বলে না কারণ আমায় ভয় করে। they are afraid of me!" আর অট্টহাস্যে কক্ষ মুখরিত হইয়া উঠিল। আশুতোষের এই Homeric laughter বিখ্যাত হইয়া গিয়াছে।

চরিত্রে এই সমস্ত আপাতবিরোধীগুণের সমাবেশে, ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্রধর্ম্মের, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যে আশুতোষ এত বড় হইয়াছিলেন। কিন্তু এ সমস্ত অতিক্রম করিয়া, এ সমস্ত ছাপাইয়া যে শক্তিতে তিনি অদ্বিতীয় কর্ম্মী ও নেতা হইয়াছিলেন, সে শক্তি তাঁহার অদম্য আত্মবিশ্বাস ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। মনীষায় তিনি বড়, কিন্তু তদপেক্ষা বড় মনীষীও হয়ত দেশে আছেন ; শুধু কর্ম্মপরায়ণতায় তিনি বড়, কিন্তু তদ্রূপ কর্ম্মঠ লোকও হয়ত আছেন ; সামাজিকতায় তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়, কিন্তু সে রকম সামাজিক প্রকৃতির লোকও আরও আছেন ; কিন্তু এ সকলের সমবায়েই শুধু যথেষ্ট হইত না—যাহা তাঁহাকে বাঙ্গালার

এই লোকারণ্যে বিশাল বনস্পতিরূপে পরিণত করিয়াছিল, সর্ব্বংসহ দেশনায়করূপে পরিণত করিয়াছিল, তাহা তাঁহার মেরুদণ্ড এবং তাঁহার magnetism। শক্তি সংক্রামক, বিশ্বাসও সংক্রামক। নিজের শক্তিতে, নিজের আদর্শে দৃঢ়বিশ্বাস অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসী করে। দুর্ব্বলকে বল দেয়; এবং সেই চৌম্বক শক্তিতে কাঁচা লোহাকে চুম্বকে পরিণত করে। যে আত্মবিশ্বাসের বলে যৌবনে তিনি Sir Alfred Croftকে বলিয়াছিলেন—Sir Alfred Croft তাঁহাকে একটী অধ্যাপকতা দিতে চাহিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে দেখ আশু, তুমি যে Bar join করিতে চাও, Bar তো ভয়ানক over crowded—"Bar over-crowded! I know. But it is overcrowded with rubbish!"—সেই আত্মবিশ্বাস উত্তরকালে আরও গভীরতর আরও ব্যাপকতর হইয়া, এবং স্বজাতির প্রতি বিশ্বাস ও স্বদেশের প্রতি বিশ্বাস তৎসঙ্গে যুক্ত হইয়া, তাঁহাকে সমস্ত কর্ম্মে সমস্ত উদ্যমে জয়যুক্ত করিয়াছিল। এই বিশ্বাসের বলেই আজন্মকাল নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। বাল্যকালে চাঁদর নিবারণী সভার মোড়লী করা হইতে আরম্ভ করিয়া যৌবনে, দেশনায়ক বা সুরেন্দ্রনাথ যখন Contempt of Court অপরাধে দণ্ডিত হইলেন, তখন ছাত্রসঙ্ঘের দলপতি হইয়া হাইকোর্টের লোহার গেট ভাঙ্গিবার উদ্যম হইতে আরম্ভ করিয়া, কর্ম্মজীবনে, সর্ব্বত্র, হাইকোর্টে, বিশ্ববিদ্যালয়ে নেতৃত্বই করিয়া গিয়াছেন। এই বিশ্বাস, এই সাহস, এই নেতৃত্ব, এই গুণেরই আমাদের বড় অভাব। আমরা হয়ত আজ্ঞাবহ হইয়া বেশ ভাল পথে করিতে পারি; কিন্তু নেতা হইয়া সংঘবদ্ধ করিয়া দৃঢ়ভাবে কর্ম্ম প্রচেষ্টা পরিচলিত পারি না। আমাদের দেশে অতি অল্প লোকের এই গুণ আছে। সম্ভবতঃ বহুবর্ষের পরাধীনতারই ইহা বিষময় ফল! initiative ও সাহস উঠিয়া গিয়াছে। মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা মহৎগুণ সাহস; এবং সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও নীচতার নিকৃষ্টতম ভীরুতা। তেজের সহিত, সাহসের সহিত, কেহ যদি একটা অন্যায় অত্যাচারও করে, তাহার জন্য কোন ভয় নাই, তাহার conversion হইলে সে বাস্তবিকই মহৎ লোক হইতে পারে; কিন্তু ভীরুর পরিত্রাণ নাই। ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের অন্যতম নেতা দাঁতো বলিয়াছেন "l'audace, encore l'audace toujours l'audace"—চাই সাহস, আরও সাহস, সর্ব্বদা সাহস। বাঙ্গলার আশুতোষ সেই কথাই প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন "Boldness always appeals to me, timidity never does"। তেজস্বী আশুতোষই বলিয়াছেন "Freedom first, freedom second, freedom always"।

এই সাহস ও বীরত্বেরই আর একটা প্রকাশ আশুতোষের বিরাট অসহয়নীয় এবং বিরাটভাবে সেই কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তিতে ও উদ্যমে বর্ত্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাঁহার সেই কল্পনাশক্তিও কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তির প্রধান নিদর্শন। বৃহৎভাবে যে এইরূপ একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার শক্তি তাহা আশুতোষের ছিল, এবং তাহাই তাঁহার প্রধান বিশেষত্ব। He could build like a Titan। তাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। তাই লর্ড লীটন সত্যসত্যই আশুতোষের স্মৃতিসভায় বলিয়াছেন "আশুতোষ যথার্থই গর্ব্ব করিতে

পারিতেন, যে আশুতোষই বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ই "আশুতোষ"। দোষ ত্রুটি সব কাযেরই আছে, তাঁহার কাযেরও ছিল; কিন্তু সে দোষ ত্রুটি সর্ব্বাগ্রে আমাদের চক্ষে পড়িলেও, তাহাই প্রধান নয়, প্রধান এবং প্রকৃত হইতেছে সেই বিপুল প্রাসাদ যাহা তাহার শিল্পীয় কল্পনা ও কর্ম্মশক্তির জীবন্ত সাক্ষ্য প্রকাশ করিতেছে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে "we cannot see the wood for the trees"; সেই পরিমাণজ্ঞানহীনতা, সেই sense of proportionএর অভাব আমাদের অনেকেরই আছে; তাই বিচার তাড়াতাড়ি করিতে গিয়া ভুল করিয়া ফেলি। এই বিপুল প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে আবার অত্যন্ত ছোট খুঁটিনাটির প্রতি মনোযোগ দিবার মত ইচ্ছা ও ক্ষমতা আশুতোষের ছিল। এই বিষয়ে তাঁহার প্রতিভা বাস্তবিকই Napoleonic। লোকে তাই পরিহাস করিয়া বলিত, বড়লাটের সঙ্গে ঝগড়া হইতে আরম্ভ করিয়া হার্ডিংহষ্টেলের সিঁড়ির মাপ পর্য্যন্ত আশুবাবু না হইলে হয় না। অবশ্য এই প্রকার বিরাট্ ব্যাপকতার দোষ আছে; ইহাতে উপযুক্ত লোক তৈয়ারী হয় না; বিশাল বনস্পতির আওতায় পড়িয়া ছোট গাছ আর বড় হইতে পারে না। কিন্তু ছোট গাছের পক্ষে ইহা যতই ক্ষতিকর হউক না কেন, বনস্পতির ইহাতে বিশালতাই প্রকটিত হয়।

ব্যক্তিত্বের এই বিপুলতার জন্যই আশুতোষ চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে, আমাদের দেশের এই যে পনের আনা লোক ঘাসের চাপড়ার মত ধরণীর বক্ষে লাগিয়া রহিয়াছে, কোন মতে কায়ক্লেশে কাতর ক্লিষ্টভাবে জীবনটিকে করুণরূপে আঁকড়িয়া ধরিয়া কথঞ্চিৎ টিঁকিয়া রহিয়াছে এবং তাহাতেই জীবন সফল হইল বলিয়া মনে করিতেছে, এই উদ্যমহীন, উৎসাহহীন, বৈচিত্র্যহীন তৃণাস্তৃত সমাজের মধ্যে হঠাৎ যে একটা সবল, সতেজ, সপ্রাণ মহান্ মহীরুহ গজাইয়া উঠিল, ইহাকে কি বলিব? ইহা কি ভারতীয় প্রকৃতির একটা ব্যতিক্রম—একটা exception, একটা freak? যদি তাই হয়, তবে সেই ব্যতিক্রমকেই চিরস্নেহে চিরআদরে চিরগৌরবে ভারতজননী মণ্ডিত করিয়া রাখিবেন। তবে ইহাও কি আমরা আশা করিতে পারি না, যে এই নবজাগরণের দিনে, নবশক্তির উন্মেষে, এই নবীন ভারতে এই ব্যতিক্রম আর অতিপ্রাকৃত থাকিবে না, তাহাই নিয়ম হইবে, তাহাই সাধারণ হইবে, তাহাই সহজ হইবে, বাঙ্গলার শার্দ্দুলের জ্বলন্ত জীবন প্রভাবে বাঙ্গলার ঘরে ঘরে পুরুষ শার্দ্দুলের উদ্ভব হইবে? কবির প্রার্থনাই নিয়ত মনে ধ্বনিত হয়—

অবনত ভারত চাহে তোমারে
ওহে সুদর্শনধারী মুরারী।
সম্মান শৌর্য্যে পৌরুষ বীর্য্যে
কর পূরিত নিপীড়িত ভারত তোমারি।

এই প্রার্থনা সফল হউক।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১।

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ।

সেকালের রাইয়ত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গতর খাটানোর মতন জমিদারদের আর একটা জবরদস্তি ছিল সেটা শস্য-কাটার কাল নির্দ্ধারণ করা। বাবুরা রাইয়তদিগকে হুকুম করিতে পারিত কবে কখন জমির ঘাস কাটা হইবে, আঙুর তোলা হইবে, শস্য কাটা হইবে ইত্যাদি। অনেকের বিশ্বাস যে এই ধরণের দিনক্ষণ ঠিক করিয়া দেওয়া খাঁটি ফিউদ প্রথার এক অনুষ্ঠান। বাস্তবিক পক্ষে এ এক অতি পুরাতন রীতি। মান্ধাতার আমলের যৌথ সম্পত্তির যুগেও এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল।

সেকালের পল্লী-বৃদ্ধেরা জটলা করিয়া স্থির করিত কবে কোথায় সমবায়ের জানোয়ারগুলা স্বাধীনভাবে চরিতে পারিবে। তদনুসারে চষা জমির শস্যকাটার দিনও সমবেত ভাবে স্থির করা হইত। অর্থাৎ "বাঁ দ' মোআস" ছিল পল্লীবাসীদের স্বরাজেরই এক অঙ্গ।

কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ফিউদারের উৎপত্তি হয়। জমিনফিউদার বাবুরাও আবার নিজ নিজ ফসল বিক্রী করিবার রীতি কায়েম করে। তখন পল্লী সমবায়ের একতিয়ার তুলিয়া দিয়া বাবুরা নিজে শস্য কাটার দিনক্ষণ কায়েম করিতে লাগিয়া যায়। এইখানে এক জুলুম সুরু হয় এই কারণে যে, পল্লীবাসীরা জমিদারের পূর্ব্বে বাজারে মাল হাজির করিবার সুযোগ পাইত না। বাবুরা নিজ ফসল মোটালাভে বেচিবার পর পল্লীসমিতিকে "বাঁ" কায়েম করিতে অনুমতি দিত।

জমিদারি প্রথার আর এক জুলুমকে বলে ফরাসীতে "বানালিতে"। রাইয়তরা বাবুদের কোনো কোনো সম্পত্তি বা যন্ত্রপাতি নিজ নিজ কাজের জন্য ব্যবহার করিতে বাধ্য থাকিত। বাবুর বাড়ীতে যাইয়া আটা ভাঙিয়া আটা অথবা রুটি তৈয়ারি করিয়া লওয়া নেহাৎ ঝকমারি সন্দেহ নাই তাহার উপর আটা রুটি ইত্যাদি তৈয়ারি মালের কিয়দংশ বাবুর লভ্য বিবেচিত হইত!

কিন্তু এই যে "বানালিতে" প্রথা ইহাও খাঁটি ফিউদ প্রথার প্রতিষ্ঠান নয়। মান্ধাতার আমলের যৌথ সম্পত্তির যুগেও পল্লীবাসীরা এইরূপ যৌথ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত ছিল। সেকালে গোটা পল্লীর জন্য এক ব্যক্তি বাহাল থাকিত জানোয়ার চরাইতে। তাহাতে প্রতিপালন হইত পল্লীসমবায়ের আয় হইতে। সেইরূপ পল্লীসমবায়ের অধীনে কল, জাঁতা, কসাইখানা ইত্যাদি যৌথ প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছিল। পল্লীবাসীরা নিজ নিজ সুবিধামত এই সকল প্রতিষ্ঠানের সদ্ব্যবহার করিত। কতকগুলা হৃষ্টপুষ্ট সুস্থ সবল জানোয়ার পল্লীসমবায়ের যৌথসম্পত্তিস্বরূপ রাখা হইত। এইগুলার সাহায্যে পল্লীবাসীরা নিজ নিজ জানোয়ারের বংশবৃদ্ধি করাইয়া লইত।

কোথাও কোথাও যৌথ রান্নাঘরও থাকিত। বিভিন্ন পরিবারের লোকেরা এই

যৌথ রান্নাঘরে আসিয়া নিজ নিজ রুটি তৈয়ারি করাইয়া লইত। পল্লীতে আগুনের খরচ কমাইবার জন্য এই প্রথা উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। পল্লীবৃদ্ধদের সভা হইতে এই যৌথ উনন তদবির করিবার ব্যবস্থা করা হইত। উননে পল্লীবাসীদের রুটি ভাজিবার জন্য সার্ব্বজনিক পাচক মোতায়েন থাকিত। এই গেল পল্লীস্বরাজের "স্বর্ণযুগের" কথা।

কিন্তু জমিদারি প্রথা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যৌথ উননটা আসিয়া পড়িল বাবুর হাতে। বাবুর লোকজন হইল পাচক। তাহার দ্বারা কাজ করাইয়া লইবার জন্য পল্লীবাসীদিগকে কর দিতে হইত। ১২২৩ সালের এক অনুশাসনে জানিতে পারি যে বাঁস্ জনপদের মোহান্ত রুটি ভাজা হইলে পুরোহিত সর্দ্দারের হিস্তায় একটা করিয়া পড়িবার ব্যবস্থাও তাহাতে দেখিতে পাই।

বুশে দার্জি "কোদ রুরাল" (পল্লী-কানুন) নামক গ্রন্থে "বানালিতে" বা যৌথ সরঞ্জাম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ১৫৬৩ এবং ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দের অনুশাসন অনুসারে পল্লীবাসীরা ফিউদার বাবুদের জাঁতায় আটা ভাঙিতে গিয়া ষোল ভাগের একভাগ এবং এমন কি তের ভাগের একভাগ মালিককে কর দিতে বাধ্য থাকিত। পরবর্ত্তী কালে জাঁতার মালিক দশ ভাগের একভাগ পর্য্যন্ত দাবী করিতে পারিত।

এই ধরণের ঝকমারি ও জুলুম চলিতে পারে একমাত্র তখন যখন সমাজে ধনোৎপাদনে ঘাঁটা পড়িয়াছে। বস্তুত: সে যুগে লোকজনেরা আর্থিক প্রচেষ্টায় এক প্রকার ঢিলা দিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। জমিদারি প্রথার এই সকল উৎপাত নবীন তন্ত্রের বুর্জোআপন্থী স্বদেশ সংস্কারকের পক্ষে চক্ষুঃশূল সন্দেহ নাই। ১৭৯০এর বিপ্লবে ফিউদপ্রথার আনুষঙ্গিক হিসাবে "বানালিতে" প্রথা উঠিয়া যায়।

গির্জ্জা বা দেবালয় কালে পুরোহিত মোহান্তদের একচেটিয়া সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্মোপাসনার দিনক্ষণ ছাড়া গির্জ্জায় আজকাল অন্য কোন সময়ে জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু এই সকল ধর্ম্মগৃহ বা মন্দিরই সাবেক কালে গোটা পল্লীর সমবেত সম্পত্তি ছিল। পুরোহিত, জমিদার এবং কিষাণ এই তিনে মিলিয়া গির্জ্জার মালিক থাকিত।

বেদি-অংশটা ছিল পুরোহিতদের এলাকায়। "চান্সেল" থাকিত জমিদারদের তাঁবে। পুরোহিত এবং বাবুরা নিজ নিজ অংশের মেজে, কাঠের কাজ ইত্যাদি মেরামত করিতে বাধ্য থাকিত। বেদিতে দেবতার মূর্ত্তি থাকে। এইখানে পূজা, "মাস্" অর্থাৎ যীশুখৃষ্টের প্রাণদান যজ্ঞ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। চান্সেল অংশে আসিয়া পুরোহিত যজমানদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে অভ্যস্ত।

গোটা গির্জ্জার ভিতর বেদী এবং চান্সেল অতি অল্পস্থান মাত্র অধিকার করে। গির্জ্জার প্রধান অংশ—সমগ্র ভবনটা—"নেভ" নামে অভিহিত। এই "নেভ্" ছিল পল্লীবাসীদের সম্পত্তি। এই খানে আসিয়া কিষাণরা বাজার কায়েম করিত, পঞ্চায়েৎ বসাইত এবং নাচ-গানের ব্যবস্থা করিত। অথবা দরকার হইলে গির্জ্জার এই অংশ ধর্ম্মগোলারূপে জনগণ কর্ত্তৃক কাজে লাগানো হইত।

১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দের এক গির্জ্জা-কানুনের বিধান এই :—"গির্জ্জা একমাত্র ভগবৎপূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট। এইখানে কোনো প্রকার মহোচ্ছব, নাচ গান তামাসা, আমোদপ্রমোদ, রঙ্গাভিনয়, বাজার মিছিল বা ঐ জাতীয় অশোভন কিছু করা চলিবে না।"

ইংরেজ ধনবিজ্ঞানবিৎ থরল্ড রজার্স তাঁহার ইকনমিকাল ইন্টারপ্রেটেশান অব্ হিষ্ট্রি (ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা) নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন মধ্যযুগে গির্জ্জাটা পল্লীবাসীদের যৌথভবন স্বরূপ ছিল। এই ভবনই আপদবিপদের সময় দুর্গের কাজ করিত। পল্লীর গোড়াপত্তন হইবার সময় যেখানে আত্মরক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রথম খুঁটার ব্যাড়া গাড়া হইত ঠিক সেইখানেই গির্জ্জা গড়িবার দস্তুর ছিল।

গির্জ্জার ঘণ্টাগুলাও থাকিত জনসাধারণের সম্পত্তি। পঞ্চায়েতের সভা ডাকিবার জন্য পল্লীবাসীরা আসিয়া এইগুলা বাজাইত। কোথাও আগুন লাগিলে অথবা দুস্‌মনের আক্রমণ ঘটিলেও কিষাণরা গির্জ্জার ঘণ্টা বাজাইতে অভ্যস্ত ছিল।

এই ঘণ্টাগুলার বিরুদ্ধে রাজরাজড়ারা অনেক সময় মোকদ্দমা পর্য্যন্ত চালাইয়াছে। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর কাজীর বিচারে ফরাসীরা পল্লীবাসীদের ঘণ্টাকে সাজার যোগ্য বিবেচনা করিত। নুন-কর আদায় করিবার জন্য তহশিলদার আসিতেছে, এই সংবাদ প্রচার করার জন্য ঘণ্টাগুলাকে অনেকবার সাজা দেওয়া হইয়াছিল।

ঘণ্টাগুলাকে সাজা দিবার রীতি এই। গির্জ্জার চুড়া হইতে এই গুলা নামাইয়া লওয়া হইত। পরে আদালতের জল্লাদ নিজ হাতে ঘণ্টার উপর চাবুক লাগাইত। ঘণ্টার পক্ষে এই ছিল চরম সাজা। কেননা ক্রিস্‌ম ঋষির তেল, ধূপ, উপাসনা, ভজন ইত্যাদি ষোড়শোপচারে যে ঘণ্টার পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাকে আকাশ হইতে নামাইয়া এইরূপে বে-ইজ্জদ করা যে সে কথা নয়।

যাহা হউক, গির্জ্জাকে মোহন্তদের জমিদারিতে পরিণত করা ফিউদযুগের এক চূড়ান্ত জুলুম স্বীকার করিতেই হইবে। জমিদারের "মানর" প্রাসাদের সঙ্গে টক্কর দিবার জন্যই পল্লীবাসীরা এই ধর্ম্মভবনের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই আওতার তাহারা একসঙ্গে কঠোর কোমল মাতৃ স্নেহ দাবী করিতে অধিকারী ছিল।

সে যুগের আর এক জুলুম "টাইদ" কর। গির্জ্জার মোহন্তরা কিষাণ বাবু উভয়ের উপরই এই কর বসাইত। প্রথম প্রথম অবশ্য উভয়েই নিজ নিজ ফসলের কিয়দংশ গির্জ্জাকে স্বেচ্ছায়ই দিত। আজও আইরিশ সমাজে এইরূপ স্বেচ্ছাদত্ত টাইদ প্রচলিত আছে। তখন্‌কার দিনে অবশ্য যাদুকরেরাও পুরোহিতদের মতনই জনগণের স্বেচ্ছা দানে ভাগ বসাইত।

নবম শতাব্দীর এক পুরোহিত সর্দ্দার আগোবার আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে এই দক্ষিণা পুরোহিতদের কপালে জুটে কম পরিমাণে, ভূতুড়ে কাণ্ডের সাহায্যে যে সকল লোক ঝড় বৃষ্টি উঠাইতে নামাইতে পারে তাহারাই পল্লীবাসীদের ভক্তি এবং দক্ষিণা বেশী আকৃষ্ট করিত।

টাইদগুলা কালে অবশ্য দেয় খাজনায় পরিণত হয়। কি ঐহিক কি আধ্যাত্মিক উভয় শ্রেণীর আমীর অর্থাৎ বাবু এবং মোহন্ত দুয়েই জনগণকে টাইদ দিতে বাধ্য করিত। "টাইদ

ছাড়া জমিন থাকিতেই পারে না"—এই ছিল তখনকার নীতিশাস্ত্রের বয়েৎ। অবশ্য সে যুগে টাইদ পাওয়ার মূল্যস্বরূপ জমিদাররা রাইয়তদিগকে কোনো প্রকার অধিকার প্রদান করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিত না। এই কর ছিল ষোল আনা জবরদস্তি। স্বেচ্ছার দান হইতে অত্যাচারের যন্ত্র কায়েম করা খাঁটি সোনাকে অকথ্য তামায় রূপান্তরিত করার সমান মর্ম্মান্তিক কষ্টদায়ক।

(২)

জমিদার মোহন্তদের দাবীদাওয়াগুলা প্রথম অবস্থায় ছিল রাইয়ত, প্রজা, ভূমিগোলাম ইত্যাদি শ্রেণীর লোকের স্বেচ্ছায় দেওয়া অধিকার। কম-সে-কম জমিদার প্রজায় একটা পরিবারিক সম্বন্ধ সর্ব্বদাই বিরাজ করিত। গতর খাটা, খাজনা, টাইদ ইত্যাদি পাইয়া বাবু-বাবাজীরা জনগণকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বাধ্য থাকিত। কিন্তু এই সব পরবর্ত্তীকালে আসল জোর জবরদস্তিতে দাঁড়াইয়া যায়।

জমিদারির জমিজমাগুলার ক্রমবিকাশও ঠিক এইরূপ। প্রথম প্রথম একটা সামরিক পদে বাহাল হইয়া বাবুরা খানিকটা সার্ব্বজনিক জমির মালিক হইত। ঠিক মালিক বলাও চলে না। পল্লীবাসীদের সামরিক জমি ভাগবাটোয়ারায় এই সকল সামরিক কর্ম্মচারীদের একটা হিস্সা নির্দ্দিষ্ট থাকিত, এইরূপ বলিলেই জমিদারির উৎপত্তি ঠিক বুঝা হইবে। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে চুরি জুয়াচুরি করিয়া ছলেবলেকৌশলে বাবুবাবাজীরা জনসাধারণের জমিজমা দখল করিয়া "রাজা" হইয়া বসিয়াছে।

স্কটল্যাণ্ডের এবং ইংলণ্ডের বাবুরা "য়োম্যান" শ্রেণীর স্বাধীন কিষাণসমাজকে নিষ্ঠুর-ভাবে ভিটা মাটি উচ্ছন্ন করিয়া ছাড়িয়াছে। সেই অত্যাচারকাহিনী কার্ল মার্কস প্রণীত "কাপিটাল" (বা পুঁজি) নামক গ্রন্থের সাতাইশ নং অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। জমিজমা হইতে চাষীরা কিরূপে বিতাড়িত হইয়া থাকে সেই বিষয়ে মার্কস এখানে আলোচনা করিয়াছেন।

"হোলিনশেড্‌স্ ক্রণিকল" নামক বিলাতী ঐতিহাসিক কাহিনীমালার অন্যতম গ্রন্থ সম্পাদক হারিসন জমিচোরদের দিগ্বিজয় সম্বন্ধে বলিতেছেন: ইহারা অতি অল্প কালের ভিতর স্বাধীন রাইয়তদিগকে জমিহীন করিয়া ছাড়িয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতেও বিলাতে অধিকাংশ পল্লীবাসীই নিজ নিজ ভূমিতে মালিক বিবেচিত হইত। অবশ্য জমিদারদের সঙ্গে দেনাপাওনা এবং বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধও নানা প্রকার ছিল কিন্তু ইহাদিগকে যেন কিছুতেই জমিহীন বিবেচনা করিতে পারিত না। ঐতিহাসিকগণের আলোচনায় বুঝিতে পারিব, সে যুগে বিলাতে অন্তত পক্ষে ১৫০,০০০ এইরূপ স্বাধীন কিষাণ বসবাস করিত। ইহাদের সংখ্যা সপরিবারে গোটা ইংরেজ জাতির সাতভাগের এক ভাগ এইরূপ অনুমান করা চলে। এই সকল জমির মালিক কিষাণরা বৎসরে ৬০।৭০ পাউণ্ড অর্থাৎ আজকালকার ভারতীয় মুদ্রার প্রায় ১০০০৲ আয় ভোগ করিত।

কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে এই স্বাধীন কিষাণদের জমিজমার ভাঙন লাগে। বড় বড় বাবু বাবাজীরা কিষাণদিগকে জমি হইতে খেদাইয়া দিতে সুরু করিয়াছিল। এইরূপ জমি বাজেআপ্ত করিবার কারণ পাওয়া যায় সে কালের শিল্পের ইতিহাসে।

বেল্‌জিয়ামের অন্তর্গত পশম ব্যবসায়ের জেলাগুলার তাঁতীরা ইয়োরোপে প্রবল হইতেছিল। তাহার ফলে বিলাতের পশমওয়ালারা দাম বাড়াইতে লাগিয়া গিয়াছিল। কাজেই সকলেই পশম তৈয়ারি করিবার কাজে, অর্থাৎ মেষ পালন বা ভেড়ার চাসে নজর দিতেছিল। ভেড়ার "চাষ" চলিতে পারে কেবল তখন যখন প্রচুর পরিমাণে জমি আবাদহীনরূপে পড়িয়া থাকে।

ঠিক তাহাই ঘটিতেছিল। "ইউটোপিয়া" (অর্থাৎ সৃষ্টিছাড়া মুল্লুক, "কোথায় ও না") নামক আদর্শবাদপূর্ণ গ্রন্থে ভাবুক সমাজতত্ত্ব লেখক টমাস মোর বলিতেছেন,—ভেড়াগুলা এতদিন ছিল, যারপর নাই ম্যাড়াকান্ত অর্থাৎ ঠিক ম্যাড়ার মতনই নিরীহ ও ঠাণ্ডা। কিন্তু এই গুলা খাইতও কম, কিন্তু আজকাল শুনিতেছি ইহারা এত বেশী খাইতে আরম্ভ করিয়াছে আর এত দুর্দ্দান্ত হইয়া পড়িয়াছে যে মানুষ পর্য্যন্ত খাওয়া এখন ইহাদের স্বভাব। এই কথায় মেষ পালনের মুসরুম পড়ায় কৃষিকার্য্যে ভাটা লাগা বুঝিতে হইবে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে শেষ দশকে "য়োম্যান" শ্রেণীর স্বাধীন কিষাণরা গুন্‌তিতে মামুলি চাষীদের চেয়ে অধিক ছিল। ইহারাই সেনাপতি এবং সামরিকগণতন্ত্রনেতা ক্রমওয়েলের পল্টনের মেরুদণ্ড ছিল। মেকলের মতে মাতাল ভদ্রলোক এবং তাহাদের চাকরবাকরদের চেয়ে সেইজন্য শিষ্টাচার বিষয়ে য়োম্যানরা বেশী প্রশংসনীয় জীবন যাপন করিত। এমন কি সে যুগের পল্লীপুরোহিতেরাও য়োম্যানদের তুলনায় অতি ঘৃণ্য জীবনের প্রতিনিধি ছিল। তখনকার পুরোহিতরা বাবুভায়াদের পরিত্যক্ত উপপত্নী বেশ্যাদিগকে বিবাহ করিতে লজ্জা বোধ করিত না। বস্তুতঃ এই সকল পণ্ডিত "স্কোয়ার" শ্রেণীর ভদ্রলোকের চাকরশ্রেণীর অন্তর্গতই বিবেচিত হইত।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে "য়োম্যান" শ্রেণীর আর টিকি দেখা যাইত না। সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীতে শেষাশেষি কিষাণদের চৌপ জমিজমার শেষ চিহ্নও লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে অবস্থা এমত দাঁড়াইতেছে যে কিষাণরা কোনোদিন যে সমরাপন্থী সমাজে যৌথ জমিজমা ভোগ করিয়াছিল সেই স্মৃতি পর্য্যন্ত আর ইংরেজ মুল্লুকে প্রবাহিত হয় না। বরং ১৮০০ হইতে ১৮৩১ পর্য্যন্ত কালের ভিতর ধড়িবাজ জমিদার মোহন্তরা পার্লামেণ্ট সভার কারসাজী ও আইন সম্বন্ধীয় মারপ্যাচ কায়েম করিয়া প্রায় ১০, ৫০০,০০০ বিঘা জমি বাজেআপ্ত করিয়া লইয়াছে। এই এক কোটী বিঘার উপরও বিস্তৃত জমিজমা একমাত্র কলমের জোরে হাতছাড়া হইয়াছে। কিষাণরা তাহাদের দখল এবং ভোগের অধিকার ছাড়িয়া দিবার ক্ষতিপূরণের বাবদ এক দামড়িও সরকার বা জমিদারদের নিকট হইতে পায় নাই।

এইরূপ জমিচুরির শেষ নিদর্শন স্কটল্যাণ্ডের পাহাড়ী ভূমি হাইল্যাণ্ড আবাদে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। "জমিজমা" ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করা নামক এক প্রকার কাণ্ড এই দেশে ঘটিয়াছে। তাহার দ্বারা কিষাণদিগকে জমিজমা হইতে সটান ঝাঁটাইয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জমিচুরি রীতিই জমিদারি প্রথার কথায় প্রথম দ্রষ্টব্য।

স্কট্‌ল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ড অঞ্চলের পাহাড়ী লোকেরা কেল্টিক জাতির অন্তর্গত লোক। ইহারা "ক্ল্যান" বা যৌথ সম্পত্তিশীল সমর সঙ্ঘদ্বারা শাসিত হইত। এই ক্ল্যানের বা গোষ্টির

সর্দ্দার জনগণের প্রতিনিধি বিবেচিত হইত। এই হিসাবে ক্ল্যানের সমবেত সম্পত্তি প্রকারান্তরে সর্দ্দারের সম্পত্তি বলিয়া পরিচিত ছিল। বাস্তবিক পক্ষে সর্দ্দার ব্যক্তিগতভাবে এই জমির মালিক ছিল না। বিলাতের রাণী সেইসময় গোটা বিলাতের জমিজমার মালিক। স্কটল্যাণ্ডের ক্লান-সর্দ্দারগণও নিজ নিজ ক্ল্যানের জমিজমাগুলার সেইরূপ মালিক ছাড়া আর বেশী কিছু ছিল না।

সর্দ্দারে সর্দ্দারে লাঠালাঠি দস্তুরমতনই চলিত। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই সকল লাঠালাঠি নিবারণ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু সর্দ্দাররা পরস্পর মারামারি বন্ধ করিয়া ক্ল্যানের অন্যান্য লোকজনের উপর মামলা চালাইতে লাগিয়া যায়। ডাকাইতি রূপপরিবর্ত্তন করিল মাত্র। সর্দ্দাররা ক্ল্যানগত জমিগুলা দখল করিয়া কিষাণদিগকে "হাজতে" "হাঘরে" করিয়া ছাড়িয়াছিল। অধ্যাপক নির্ডম্যান বলেন :—"এই ডাকাইতি কেমন? না ইংলণ্ডের রাজা যেন ইংরেজ প্রজাদিগকে জমিহীন করিয়া সমুদ্রের ভিতর ডুবাইয়া মারিবার প্রয়াস করিতেছে।"

স্কটল্যাণ্ডে এই জমি বিপ্লব সুরু হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। জেম্‌স্ ষ্টুয়ার্ট এবং জেম্‌স্ আণ্ডার্সন ইত্যাদি লেখকদের রচনায় এই ডাকাইতি কাণ্ডের প্রথম যুগ দেখিতে পাই।

উনবিংশ শতাব্দীতে জমি ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করিবার এক দৃষ্টান্ত দিতেছি। সাদার-ল্যাণ্ডের ডচেস বা বেগম সাহেব ১৮১৪ হইতে ১৮২০ পর্য্যন্ত ছয় সাত বৎসরের ভিতর ৩০০০ পরিবারকে জমিহীন অন্নবস্ত্রহীন করিয়া তাহাদের জমিজমা ভেড়া চরাইবার মাঠে পরিণত করিয়াছেন। এই লুটপাটে প্রায় ১৫০০০ লোক সর্ব্বস্বান্ত হয়। এই স্কট মহিলাকে সাহায্য করিবার জন্য বৃটিশ সরকারের পল্টন মোতায়েন ছিল। পল্লীগুলা, ঘরবাড়ীগুলা, চাষ আবাদের জমিগুলা সবই উজাড় হইয়া যায়। খোলাখুলি লঙ্কাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

এক বুড়ী তাহার কুঁড়ে ছাড়িয়া কোন মাঠে যাইতে রাজি হয় নাই। কুঁড়ে কামড়াইয়া পড়িয়া থাকাই সে তাহার জীবনের শেষ সাধ বিবেচনা করিয়াছিল। কিন্তু বেগম সাহেব বুড়ীকে তাহার কুঁড়ে সহ আগুনে পুড়াইয়া মারিতে ইতস্ততঃ করেন নাই।

এই ডাকাইতির জোরে স্কট মহিলা প্রায় ২,৪০০,০০০ বিঘা জমির মালিক হন, জমিগুলা সবই পূর্ব্ববর্ত্তী কালে ক্ল্যানের যৌথ সম্পত্তি ছিল। হতভাগ্য নরনারী দিগকে সমুদ্রের কিনারায় ১৮০০০ বিঘা জমি দান করিয়া মহিলা নিজ কর্ত্তব্যের চূড়ান্ত পালন করেন। পরিবার প্রতি ৬ বিঘা জমি তাহাদের অন্নবস্ত্রের উপায় হইল।

বেগম সাহেবের কর্ত্তব্য জ্ঞানের আর একটুক পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। এই ১৮,০০০ বিঘা জমি এতদিন পড়িয়া ছিল! কোনো লোকে যে কোন কিছু চাষ করিবে তাহা সম্ভবপরও ছিল না। কিন্তু একর প্রতি আড়াই শিলিঙ্ অর্থাৎ বিঘা প্রতি প্রায় ။৵০ হারে খাজনা দিতে হইবে এই কড়ার বসাইয়া মহিলার রক্ত ঠাণ্ডা হইয়াছিল। এই সব কিষাণই এই মহিলার পূর্ব্বপুরুষগণের জন্য সাবেক কালে রক্ত ঢালিয়াছে।

মহিলা তাহার লুটের জমির চাষ আবাদ তুলিয়া দিয়া ২৯টা ভেড়া চরাইবার মাঠে

সমস্তটা ভাগাভাগি করিয়া ফেলে, প্রত্যেক ভাগে একজন করিয়া মেষপালককে সপরিবারে বসবাস করিবার জন্ত পাট্টা দেওয়া হয়। মেষপালকেরা আসিয়াছিল ইংলণ্ড হইতে। ১৮৩৫ সালে ১৫০০০ কেণ্টিক নরনারীর বাহিরে দেখা দিল ১২১,০০০ ভেড়ার পাল। আর যে সকল স্বদেশী লোক কোনো মতে প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছিল তাহারা সমুদ্রের কিনারায় মাছ ধরিয়া জীবন ধারণ করিতে অভ্যস্ত হইতে থাকিল। তাহারা হইল বাস্তবিক পক্ষে "উভচর", আধা স্থলের আধা জলের বাসিন্দা।

জনগণের জমি লুটিয়া খাওয়াই জমিদারির উৎপত্তির এক মাত্র কারণ নয়। সরকারী সার্ব্বজনীন জমি চুরি করিয়াও মধ্য বিলাতের জমিদার বাবুরা ভুঁড়ি মোটা করিয়াছে। এই সকল জমি চুরি স্বরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে—ষ্টুয়ার্ট যুগের বিপ্লবের পর অরেঞ্জবংশীয় উইলিয়াম যখন রাজগদিতে বসিবার সুযোগ পায়, জমিগুলা একত্র করিয়া বিনা দামে অথবা নেহাৎ কম্ দামে যাহাকে তাহাকে দিয়া দেওয়া হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জমিদারেরা সরকারী জমিগুলা বেমালুম গাপ করিয়া বসে। আইন কানুনের ধার ধারিতে কেহই অভ্যস্ত ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে গির্জ্জা মঠ ইত্যাদি আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানের দেবোত্তর সম্পত্তিগুলা লুটের ভিতর আসিয়া পড়ে। এই সকল মোহন্ত সম্পত্তির অনেকাংশই পূর্ব্ববর্ত্তী গণতন্ত্র এবং বিপ্লবের আমলে ঐহিক জমিদারিতে পরিণত হইয়াছিল।

আজকাল বিলাতে যে সকল আমীর ওমরাহ জমিদার তালুকদার দেখা যায় তাহারা সকলেই এই বিপ্লবের যুগের জমিচোর। ইহারা হয় স্বাধীনজনগণের জমিজমা বাজেআপ্ত করিয়াছে না হয় বিপ্লবের অশান্তির সুযোগে সরকারী সম্পত্তি বেহাত করিয়া লইয়াছে। এই যুগে "বুর্জোআ" শিল্পবাণিজ্য মহলের ধনদৌলতওয়ালারা ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছিল। ইহারা জমির ডাকাইতকে সুনজরে দেখিতেই অভ্যস্ত ছিল। ছোট খাটো জমিজমার মালিকের আমল ইহাদের কাজ কর্ম্মের পক্ষে সুবিধাজনক নয়। ইহারা চাহিত সুবিস্তৃত ভূখণ্ডের প্রথা। কাজেই যাহাতে ছোট ছোট জমিওয়ালারা বড় জমিদারদের নিকট নিজ নিজ স্বত্ব বিলাইয়া দেয় সেইদিকেই বুর্জোআদের নজর থাকিত তাহার ফলে একদিকে চাষ আবাদের আয়তন বাড়িয়া গিয়াছিল। অপর দিকে বহুসংখ্যক চাষী জমিদারের জমিমজুর বা বেতনভোগী কিষান রূপে পরিণত হইয়াছিল। কিষাণ সমাজে "প্রোলেটারিয়ান" নামক শ্রমজীবী দেখা দিতে থাকে; এই সবই বুর্জোআদের মনমত।

চুরি ডাকাইতি করিয়া জমি জমা দখল করা গেল জমিদারি প্রথার এক দিক। অপর দিক ছিল গবরমেণ্টকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করা। ইহাও একপ্রকার জুলুম; সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের বিলাতী শাসন প্রথা মনে আনিতে হইবে। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে গণতন্ত্রের পর ষ্টুয়ার্ট রাজবংশ আবার গদিতে বসে। এই সময় জমিদাররা পার্ল্যামেণ্টে একটা আইন জারি করিয়া জমিদারিসম্পত্তিকে পুরাপুরি নিস্কর করিয়া ফেলিয়াছিল।

১৬৭২ সালে দ্বিতীয় চার্লসের আমলে এই আইন কায়েম হয়। জমিদাররা তাহার ফলে সামরিক সেবা, রাজসাহায্য, বাধ্যতামূলক রাজকার্য্য, নাবালক সেলামি, ইত্যাদি

ফিউদযুগের নানাবিধ সরকারী আদায় হইতে অব্যাহতি পায় ; এই সকলের পরিবর্ত্তে মামুলি একসাইজ করই জমিদারদের এক মাত্র দেয় ইহাই সাব্যস্থ হয়। সেইদিন হইতে বিলাতে সরকারী খাজনার চাপ প্রধান ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে সাধারণের ঘাড়ে, জমিদাররা "অভিজাত"সুলভ আরাম ভোগের সুযোগ পাইয়াছে। বিলাতী সমাজে এই জুলুম ঘটিয়াছে আইনের সাহায্যে। কিন্তু ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে একটা আইনের অছিলা দেখাইবারও প্রয়োজন হয় নাই।

রাইয়তদের প্রতি ফিউদারদের এমন আর কোনো কর্ত্তব্য নাই। গবরমেণ্টের খাজাঞ্চিখানায়ও ফিউদারেরা কোনো কর দেয় না। দুই তরফ হইতে প্রায় পুরাপুরি স্বাধীনতা লাভ করিয়া জমিদারি প্রথা খাঁটি পুঁজি বা মূলধন নামক সম্পত্তির রূপ ধারণ করিল।

এই আর্থিক বিপ্লব বিলাতে কিষাণসমাজকে চরম দুর্দ্দশায় আনিয়া ঠেকাইয়াছে! ভিটে মাটী উচ্ছন্ন হওয়ায় চাষীরা রাস্তার ভিখারী হইতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু ভিক্ষা মাগিয়া খাইবার স্বাধীনতাও তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই। আইনের বিধানে ভিক্ষুকদিগকে "বদমায়েস" বিবেচনা করা হইত। ইচ্ছা থাকিলে ইহারা কাজ করিয়া অন্ন সংস্থান করিতে পারে, এইরূপ ছিল সেকালের কানুনের প্রথম স্বতসিদ্ধ। ভিক্ষুক বদমায়েসদের দৌরাত্ম্য হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট অনেক আইন জারি করিয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে সপ্তমহেন্‌রির আমলে ভিক্ষুক দলনের জন্য প্রথম কানুন জারি হয়। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে অষ্টম হেনরির স্মৃতিশাস্ত্র এই:—কাজ করিতে অক্ষম ভিক্ষুকরা একটা সরকারী চাপরাশ পাইবে। সেই চাপরাশের জোরে তাহাদিগকে ভিক্ষা করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে। কিন্তু "ষ্টার্ডি ভাগাবণ্ড" অর্থাৎ জোয়ান ভবঘুরেশ্রেণীর ভিক্ষুক বদমায়েসদিগের কপালে জুটিবে চাবুক এবং কয়েদ। ইহাদিগকে গাড়ীতে বাঁধিয়া চাবুক লাগানো হইবে। শরীর হইতে রক্তের স্রোত বহিলে তবে চাবুক লাগানো বন্ধ করা হইবে। তাহার পর ইহাদিগকে স্বদেশে অর্থাৎ জন্মস্থানে অথবা বিগত তিন বৎসর ধরিয়া ইহারা যেখানে বসবাস করিয়াছে সেইখানে ফিরিয়া যাইবার জন্য শপথ করিতে বন্দোবস্ত হইবে। আর সেইখানে যাইয়া পুনরায় কোনো কাজে লাগিতে চেষ্টা করাও সেই হলপের অঙ্গ থাকিবে। অষ্টমহেনরি পরে আর একটা কানুন জারি করিয়া ১৫৩০ সালের আইনটা আরও কঠোর করিয়া তুলিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার "ভাগাবণ্ড" হিসাবে ধরা পড়িলে আসামীকে পুর্ব্বের মতন রক্তবহা পর্য্যন্ত চাবুক খাইতে হইত। সঙ্গে সঙ্গে একটা কানের খানিকটা কাটিয়া দেওয়া হইত। তৃতীয়বার এই দোষ করিলে ভিক্ষুক বদমায়েসকে পাকা দাগী এবং দেশের শত্রু হিসাবে প্রাণদণ্ড ভোগ করিতে হইত। আইনের কি ব্যভিচার।

রাণী এলিজাবেথের আমলে ১৫৭২ সালে ভিক্ষুক দলের জন্য এক আইন জারি হয়। তাহার বিধানে ১৪ বৎসরের বেশী বয়সওয়ালা লোকেরা বিনা চাপরাশে ভিক্ষা মাগিতে গেলে চাবুক খাইত এবং কানপোড়া হইয়া জীবন ধারণ করিতে বাধ্য থাকিত। যদি কেহ তাহাদিগকে দুই বৎসরের জন্য নকৃরি দিতে রাজি হইত তাহা হইলে কান পোড়ানো রেহাই

হইত। দ্বিতীয় বার ভিক্ষায় ধরা পড়িলে, আর ঘটনাচক্রে যদি তাহারা ২৮ বৎসরের বেশী বয়সের লোক হয়, তাহাদের সাজা ছিল প্রাণনাশ। তবে কেহ যদি দয়া করিয়া তাহাদিগকে দুই বৎসরের জন্য নকরি দেয় তাহা হইলে প্রাণনাশ ঘটিত না, কিন্তু তৃতীয় বার এই অপরাধ করিলে তাহাদিগকে প্রাণদণ্ড ভোগ করিতেই হইত।

এলিজাবেথ এই ধরণের আইন আরও কায়েম করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী রাজা প্রথম জেম্‌সও ১৫৯৭ সালে আইন কায়েম করিয়া ভিক্ষুকদিগকে বদমায়েস এবং সাজাযোগ্য অপরাধী বলিয়া ঘোষিত করে। প্রথম দোষের জন্য চাবুক ও ছয় মাস জেল, দ্বিতীয় দোষের জন্য দুই বৎসর জেল ছিল বিধান। জেলখানায় চাবুক লাগানোর মাত্রা নির্দ্ধারিত করিত বিচারক। যে সকল দাগী বদমায়েস শুধরাইবার অযোগ্য বিবেচিত হইত তাহাদিগকে বাঁ ঘাড়ে "আর" অক্ষরে দাগিয়া দেওয়া হইত। "আর" অক্ষরটা রোগ (অর্থাৎ বদমায়েস) শব্দের প্রথম অক্ষর। "আর" দাগীরা কঠোর কাজে বাহাল থাকিত তাহার পরেও যদি ইহাদিগকে ভিক্ষা মাগিয়া খাইতে দেখা যাইত তাহা হইলে আর নিস্তার নাই। মৃত্যুই ছিল একমাত্র শাস্তি।

এই সকল ভিক্ষুকদলননীতি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্য্যন্ত বিলাতে জারি ছিল। রাণী আনের রাজত্ব বার বৎসর চলিবার পর কানুনগুলা তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হয়।

ইংলণ্ডে এবং স্কটল্যাণ্ডে যে ধরণের অমানুষিক অত্যাচার জমিদারি প্রথার ক্রমবিকাশের সহচর, ততটা ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে কোথায় দেখা যায় নাই। কিন্তু সর্ব্বত্রই কিষাণরা যারপর নাই জুলুম ও নির্য্যাতন ভুগিতে বাধ্য হইয়াছে। ভিটা মাটি উচ্ছন্ন হওয়ার কাণ্ডে কিষাণ সমাজ প্রায় সকল দেশেই অশেষ লাঞ্ছনা সহিয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

স্বামী রামতীর্থ।

স্বামী রামতীর্থের সহিত—আমরা বাঙ্গালী—আমাদের বিশেষ পরিচয় নাই। বাংলার বাহিরে যে সকল মহাপুরুষ নীরবে কাজ করিয়া যান তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি অল্প, জানিবার ঔৎসুক্য বোধ করি তাহার চেয়েও অল্প, অথচ এই ত্রুটী সারিয়া লইবার চেষ্টাও আমাদের প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যের মোহে মুগ্ধ চরিত্রে বড় বেশী দেখা যায় না; ইহা নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কথা বলিতে হইবে। ১৯০৬ সালে রামতীর্থের মৃত্যু হয়; জীবিতকালে সাক্ষাৎ ভাবে নিজের চরিত্র ও আদর্শ প্রচার দ্বারা, ও মৃত্যুর পর তাঁহার রচনাবলী দ্বারা, পাঞ্জাবের ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের শিক্ষিত জনসাধারণের ও যুবকদিগের চরিত্রের উপর তিনি যে একটা বিশিষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং করিতেছেন, এই সুদীর্ঘকাল পরেও তাহার বিশেষ কোন সংবাদই আমরা রাখি না; অথচ পাঞ্জাবের ও উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের তরুণ হৃদয়ের

মনের গতি কোন পথে চলিতেছে, কি ভাবে তাহা গড়িয়া উঠিতেছে তাহা জানিবার বুঝিবার জন্য এই প্রভাবের মূলে যে মানুষগুলি আছেন তাঁহাদের পরিচয় একান্ত প্রয়োজন। রামতীর্থ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

স্বামী রামতীর্থের কথা আলোচনা করিতে গিয়া প্রথমেই আমাদের এই প্রদেশের এক-জন মহাপুরুষের কথা মনে পড়ে; উভয়ের চরিত্রে ও চারিপাশের জনসাধারণের উপর প্রভাবে অনেকখানি সাদৃশ্য দেখা যায়। স্বামী বিবেকানন্দের কার্য্যক্ষেত্র মোটামুটিভাবে সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া বিস্তৃত হইলেও মুখ্যতঃ তাহা যেমন বিংশ শতাব্দীর প্রথমযুগের বাংলার তরুণদিগের উপর কাজ করিয়া তাহাদের চরিত্রে একটা নূতন বৈশিষ্ট্যের ছাপ দিয়াছিল, স্বামী রামতীর্থের প্রভাবও বিশেষ করিয়া তাঁহার জন্মভূমির উপরেই পড়িয়াছিল। বিবেকানন্দ যখন বাংলায় নূতন ভাবের বন্যা আনিয়া দিতেছিলেন, বাংলার সুপ্তচিত্তকে সিংহ-গর্জ্জনে জাগাইয়া নূতন জীবনের দিকে তাহার দৃষ্টি মেলিয়া দিতেছিলেন, রামতীর্থ সেই সময়েই সুদূর পাঞ্জাবে এক নূতন ভাবজগতের সৃষ্টি করিয়া, নূতন আদর্শের প্রচার করিয়া উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের যুবকদিগের চিন্তাজগতে বিপ্লব আনিয়া দিতেছিলেন। উভয়েই সন্ন্যাসী এবং উভয়েই মহাজ্ঞানী, বৈদান্তিক বিবেকানন্দের ন্যায় রামতীর্থও প্রথম জীবনে তীক্ষ্ণধী, মেধাবী, শক্তিমান, তেজস্বী ছাত্র ছিলেন উভয়েই সুখ দুঃখময় প্রকৃত জীবনের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া বেদান্তের প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং এই নব আদর্শবাদ, নব্য বেদান্তের প্রচারকল্পে জাপান আমেরিকা ইত্যাদি ভ্রমণ করিয়া প্রতীচ্যের বহু নরনারীর দৃষ্টি ভারতের সনাতন ভাণ্ডারের বিপুল সম্পদের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। এইরূপ আরো নানাদিকে উভয়ের জীবনের সৌসাদৃশ্য দেখা যায়, তাহা আমরা প্রসঙ্গক্রমে পরে আলোচনা করিব। তাহার পূর্ব্বে রামতীর্থের জীবনের মোটামুটি ঘটনাগুলির সহিত পরিচয় করার দরকার।

রামতীর্থের পূর্ব্বনাম গোস্বামী তীর্থরাম; তিনি ১৮৭৩ খৃঃঅব্দে ২২শে অক্টোবর দীপা-লীর পরদিন পাঞ্জাবের গুজরাণবালা জেলার অন্তর্গত মুরারীবালা নামক গ্রামে গোস্বামীকুলে জন্ম গ্রহণ করেন; তাঁহার পিতার নাম গোস্বামী হীরানন্দ। জন্মের কয়েক দিন পরেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পিতৃস্বসা তীর্থরামের লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন। এই ধর্ম্মপরায়ণা একান্ত নিষ্ঠাবতী রমণীর নিকটেই তিনি প্রথম ধর্ম্মশিক্ষালাভ করেন; তাঁহার প্রভাব তীর্থরামের জীবনের ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছিল। শৈশবে মাতৃদুগ্ধের অভাবে তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ব্যায়াম ও সংযমদ্বারা তিনি অনবদ্য স্বাস্থ্য লাভ করেন।

শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ সমাপন করিয়া তিনি গুজরাণবালা হাইস্কুলে প্রবেশ করেন; গুজরাণবালায় পাঠকালীন তিনি পিতৃবন্ধু ধন্নারামভগতের রক্ষণাধীনে ছিলেন। এই সাধুপ্রকৃতি বৃদ্ধও তীর্থরামের তরুণহৃদয়ে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং এই তরুণ ও প্রৌঢ়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ্যের এমন একটি মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল যাহা শিষ্যের মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

প্রচলিত প্রথানুযায়ী বাল্যাবস্থাতেই তাঁহার বিবাহ হয়। গুজরাণবালার পাঠসমাপন করিয়া ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য পিতার

অনুমতি প্রার্থনা করেন। পিতা হীরানন্দের অভিলাষ ছিল পুত্র এইবার কোন চাকুরী করে; তিনি অনুমতি দিলেন না। দৃঢ়চিত্ত পঞ্চদশবর্ষীয় বালক তাহাতে ভীত বা ক্ষুণ্ণ না হইয়া লাহোরে আসিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইলেন; ক্রুদ্ধ পিতা অর্থসাহায্য বন্ধ করিয়া দিলেন। অপরিচিত জনাকীর্ণ বৃহৎ সহরে এই অসহায় কিশোর বালক তাহাতেও ভীত হইলেন না; এখন সম্বল শুধু তাঁহার বৃত্তি ও গুরুধন্নারামের ও আত্মীয় রঘুনাথমলের উৎসাহ; বৃত্তিও অল্প। কিন্তু তীর্থরাম ভগ্নোৎসাহ না হইয়া পড়িতে লাগিলেন; কঠোর শ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভগ্ন হইল কিন্তু পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি পাইয়া তিনি সকল দুঃখ ভুলিয়াছিলেন। এবারে পিতা বুঝিলেন তীর্থরাম কোনমতেই তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইবে না এবং স্বাবলম্বী হইয়া তাঁহার অপেক্ষা না করিয়াই সে স্বীয় অভীষ্টপক্ষে চলিবে; তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া কিশোরী পুত্রবধূকে পুত্রের নিকট রাখিয়া দিয়া গেলেন। তীর্থরাম তখন বি, এ পড়িতেছেন; বৃত্তির অল্প কয়েক টাকার উপরই তাঁহার নির্ভর, তাহাতেই কলেজের বেতন, এবং নিজের খাবার খরচ চালাইতে হয়; ইহার উপর আবার কিশোরী স্ত্রীর ভার আসিয়া পড়িয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল; কিন্তু তিনি ভয় পাইলেন না, কঠোর পরিশ্রমে সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পরীক্ষার জন্য তৈয়ারী হইতে লাগিলেন। বি, এ পর্য্যন্ত তীর্থরাম সংস্কৃত জানিতেন না; ফার্সীই তাঁহার প্রধান পাঠ্য মাতৃভাষারূপ ছিল; কিন্তু জনৈক বন্ধুর কথায় পরীক্ষার পূর্ব্বে তিনি সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিলেন; ইহার জন্য তাঁহার এত সময় লাগিল যে সে বৎসর পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। তখন আর এক বিপদ উপস্থিত; পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তাঁহার বৃত্তিবন্ধ হইল; বহুদিনের সঞ্চিত আশা, উচ্চশিক্ষালাভের প্রবল আগ্রহ, যেন অতৃপ্তই থাকিয়া যাইবে; কিন্তু পরম নির্ভরশীল, আত্মপ্রত্যয়ী যুবক তীর্থরাম হতাশ না হইয়া গৃহশিক্ষকতা করিয়া ও অধ্যাপকদিগের সাহায্যে নিজের পড়া ও স্ত্রীর ভরণ পোষণ চালাইতে লাগিলেন এবং বৎসরান্তে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রথম স্থান লাভ করিলেন। এই কঠোর পরীক্ষার মধ্যেও তিনি যে কিরূপে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস না হারাইয়া চলিয়াছিলেন তাহার পরিচয় উল্লিখিত তৎকালীন পত্রাবলীর মধ্যে নাই।

বি, এ পরীক্ষায় এই ভাবে কৃতকার্য্য হওয়ায় তাঁহার অবস্থা অনেকটা স্বচ্ছল হইয়া উঠিল। মাসিক ৬০৲ ছাত্রবৃত্তিতে তাঁহাদের স্বামীস্ত্রীর খরচ বেশ চলিয়া যাইত। ১৮৯৫ খৃঃঅব্দে তীর্থরাম কৃতিত্বের সহিত এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার শিক্ষার প্রতি প্রবল অনুরাগ এবং সাংসারিক বিষয়ে বৈরাগ্যের উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে বি, এ পরীক্ষার পর যখন তাঁহার কলেজের প্রিন্সিপাল ডেপুটীগিরির জন্য তাঁহার নাম সরকারে পৌছাইতে চাহিয়াছিলেন, তখন তিনি শিক্ষা বিভাগে প্রার্থনা করিয়া সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন!

পঠদ্দশায় তাঁহার চরিত্রের মধ্যে কয়েকটী বিশেষত্বের পরিচয় আমরা পাই। প্রথম, তাঁহার প্রবল শিক্ষানুরাগ, তাহার জন্য তিনি পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। দ্বিতীয় দৃঢ়চিত্ততা, কোন বাধাই তাঁহাকে তাঁহার অভীষ্ট পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। তৃতীয় ঈশ্বরে পরম বিশ্বাস।

এই সময় হইতেই তীর্থরামের চরিত্রে আর দুইটি বিশেষত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল

একান্তবাসের প্রবল আগ্রহ ও প্রকৃতিপূজা। প্রকৃতির প্রতি তাঁহার এই প্রগাঢ় প্রেম বোধ হয় তাঁহার জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত প্রকৃতি যে কি ভাবে তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল তাহার পরিচয় আমরা তীর্থরামের পরবর্ত্তী জীবনে বহুবার পাই। তাঁহার নির্জ্জনবাসের প্রবল আগ্রহ প্রকৃতিকে একান্ত ভাবে উপভোগ করিবার এই ইচ্ছা হইতেই সঞ্জাত।

এম,এ পরীক্ষার পর কয়েক স্থানে চাকুরী করিয়া তিনি পরে লাহোরের মিশন কলেজে অধ্যাপকের পদলাভ করেন। এই সময়ে তিনি স্থানীয় সনাতন ধর্ম্ম সভার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হয়েন।

বাল্যকাল হইতেই তীর্থরামের চরিত্রে ধর্ম্মভাব বিকাশ লাভ করিয়াছিল। এই সময় তাহা বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণরূপে ফুটিয়া উঠিল। তিনি, ভক্তশিরোমণি, হিন্দীরামায়নের রচয়িতা গোস্বামী তুলসীদাস যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেইবংশে জন্মিয়াছিলেন এবং আবাল্য বৈষ্ণব পরিবেষ্টনের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন; সুতরাং বৈষ্ণবধর্ম্মে যে তাঁহার স্বাভাবিক অনুরক্তি থাকিবে ইহা বিচিত্র নহে। তাঁহার ধর্ম্মসাধন বৈষ্ণবদাস্যসাধনেব মার্গ গ্রহণ করিয়াছিল। ধর্ম্মজীবনের এই বিকাশের পরিচর আমরা তৎকালীনপ্রদত্ত তাঁহার কয়েকটী ভাষণের মধ্যে পাই। তখন তিনি কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধ, পরমভক্ত বলিয়া পরিচিত; তাঁহার অবকাশগুলি শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি—মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি বৈষ্ণব তীর্থস্থানগুলিতে কাটিল।

জীবনে তিনি কোনদিনই বিষয় বুদ্ধির জন্য বিখ্যাত ছিলেন না; নির্লিপ্ততা. আর্ত্তের প্রতি সমবেদনা, ত্যাগ এইগুলি সকল সময়েই তাঁহার জীবনে বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল অনেক সময়ে বেতনলব্ধ অর্থ তিনি নগরের দীন দরিদ্রের সেবায় দিয়া ফেলিতেন; উদ্বৃত্তের অনেকখানি আবার পুস্তকক্রয়ে চলিয়া যাইত; এদিকে গৃহে যে অন্নাভাব সেদিকে তাঁহার দৃষ্টিই থাকিত না। পুস্তকক্রয় ও পুস্তকপাঠ তাঁহার ব্যসনরূপেই দাঁড়াইয়াছিল; তাঁহার পুস্তকাগারে যে কত পুস্তক তিনি ক্রয় করিয়াছিলেন, আরও কত যে তিনি পাঠ করিয়াছিলেন তাহার সীমা নির্দ্দেশ করা কঠিন। কলেজের কাজটুকু সারিয়া বাকি সময় তিনি নির্জ্জনে পুস্তক লইয়া কাটাইতেন।

এই সময় দ্বারকা মঠের অধীশ্বর জগৎগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য লাহোরে আসিয়া সনাতন ধর্ম্ম সভার অতিথি হন, রামতীর্থের উপরেই তাঁহার সেবার ভার পড়ে। শঙ্করাচার্য্যের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তিনি বৈদান্তিক হইয়া দাঁড়াইলেন; গীতা, ব্রহ্মসুত্র, উপনিষদ্ প্রভৃতি তাঁহার নিত্যসঙ্গী হইয়া উঠিল, বৃন্দাবন মথুরার পরিবর্ত্তে এখন হইতে হিমালয়ের বক্ষে উত্তরাখণ্ডের নির্জ্জন স্থানগুলি তাঁহার অবকাশ যাপনের ক্ষেত্র হইয়া উঠিল। তাহার নিজের ভাষায় "প্রেমকী জরদী জ্ঞানকী লালীমেঁ বদলনে লগী" অর্থাৎ প্রেমের ম্লান লালিমা জ্ঞানের রক্তরাঙ্গা রঙ্গে পরিনত হইল।

বেদান্তের চর্চ্চায় তিনি এরূপ অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন যে অমৃতবর্ষিনী নামে একটী সভার সৃষ্টি করিয়া তাহাতে তিনি সাপ্তাহিক বেদান্তালোচনার ব্যবস্থা করিলেন এবং কিছুকাল পরে আলিফ্ নামিক উর্দ্দু পত্রিকা এই উদ্দেশ্যে প্রকাশ করিলেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মের অবকাশে তিনি নির্জ্জনবাস ও সাধনার জন্য হিমালয়ের ক্রোড়ে ঋষিকেশের নিকট তপোবন নামক স্থানে গমন করেন। তপোবনের কোলে কলনিনাদিনী গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে, প্রকৃতির ক্রোড়ে পরমরমণীয় এই স্থানে তিনি স্বরূপ উপলব্ধি করেন—যাহা খুঁজিতেছিলেন তাহা লাভ করেন।

কথিত আছে এই আত্মদর্শন লাভের পর তিনি বলিয়া উঠিয়াছিলেন,

আজাদা অম্, আজাদা অম্ অজ রংজ দূর উষ্ তন্দা-অম্
অজ ঈশবএ জালে জহাঁ অজাদা-অম্ বালাস্তম্...... ।

আমি মুক্ত, আজ আমি মুক্ত, দুঃখ শোক হইতে আজ আমি মুক্তি পাইয়াছি; এই বৃদ্ধ জগতের মায়ায় আর আমি ভুলিব না......।

অবকাশান্তে এবার যখন তিনি কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার জীবনের ধারা বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্রস্বার্থ, অর্থসম্পদ, সহকর্ম্মী ও আত্মীয় স্বজনের প্রীতিশ্রদ্ধা কিছুই আর তাঁহাকে এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। বাহিরের উদার জগৎ, বিশ্বপ্রকৃতি তাঁহাকে ডাক দিয়াছিল; তপোবনের উদাত্ত বাণী তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি ১৯০১ সালে জুলাই মাসে চাকরী ছাড়িয়া সপরিবারে কয়েকজন শিষ্যের সহিত হিমালয়ে প্রস্থান করেন।

প্রকৃতি তাঁহার জীবনে চিরকালই এক অপূর্ব্ব প্রভাব, অদৃশ্য আকর্ষণজাল বিস্তার করিয়াছিল; বিশেষ করিয়া হিমালয় তাঁহাকে একান্ত আপনার করিয়া লইয়াছিল, প্রাচীন ভারতের এই ঋষি-অধ্যুষিত তপস্যার আসনকে তিনি তাঁহার সাধারণ ক্ষেত্র করিয়া লইয়াছিলেন। এই পার্ব্বত্যস্রোতস্বনীমুখরিতা গহন-বনভূমির নির্জ্জনতার মধ্যে প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মবাণীর সন্ধান পাইয়াছিলেন।

কোন কিছুকে পাইতে হইলে তাহাকে শক্তির মধ্যে সংযমের মধ্যে লাভ করিতে হয়; তবেই তাহা অশান্তির মধ্যে অসংযমের মধ্যে সত্য হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। সাধুরা হিমালয়ে যান তপস্যার জন্য; হিমালয়ে যেন সংযমের মূর্ত্তিমান পরীক্ষা। চারিদিকেই বিরাট প্রাচীরের মত শৃঙ্গগুলি দাঁড়াইয়া আছে, কারাগৃহের অন্ধকার প্রাচীরের মত। তাহারই মধ্যে সাধনা করিতে হয়, এ যেন বিদ্রোহী বিক্ষিপ্ত মনের কারাবাস। যে সত্য এই কারাগারে লাভ হয় তাহাই প্রচারের জন্য সাধনার শেষে সাধুগণ সমতলের বিস্তৃতির মধ্যে নামিয়া আসেন। বিপুল বিস্তৃতির মধ্যে সহজে আপনাকে ছড়াইয়া দিতে হইলে তাহার পূর্ব্বে যে সঙ্কোচনের শক্তির, সংহতির প্রয়োজন তাহা যেন হিমালয়ের এই অনুকূল কারাবাসের বন্ধনের মধ্যে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান সভ্যতার বস্তুবাদের গোলমাল, বিক্ষেপ সেখানে এখনও পৌঁছায় নাই, মানুষ এখনও সেখানে সরল প্রকৃতির শিশু; মায়ের মত যে প্রকৃতি পরম স্নেহের বাহুর সহস্র বন্ধনে আমাদিগকে ঘেরিয়া আছে, উদার আকাশ, শ্যামল বনভূমি, কলনিনাদিনী নির্ঝরিণী দিয়া যে মাতা আমাদের জীবনকে আকাশের মত উদার, বনভূমির মত সহজ বিস্তৃত,

যৌবনশ্যামল, নির্ঝরিণীর মত চঞ্চল জীবনের আনন্দে গতিশীল করিবার জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে আহ্বান করিতেছে, আমরা তাহাকে ভুলিয়া, তাহার সেই আহ্বানকে ভুলিয়া, বর্ত্তমান সভ্যতার অপ্রকৃত প্রাণহীন যন্ত্রবাদের আবর্ত্তে পড়িয়া আছি; এই আড়ম্বরবহুল অপ্রকৃত জীবনের কোলাহলে অন্তরের দেবতার বাণী ডুবিয়া যায়, হৃদয় সংশয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠে তীর্থরাম সেই ব্যাকুলতা অনুভব করিয়া উত্তরাখণ্ডের পত্রমর্ম্মরমুখর বনভূমির নির্জ্জনতার মধ্যে অন্তরের দেবতার সত্য বাণী শুনিবার জন্য আকুল হইয়া ছুটিয়া গিয়াছিলেন।

সে বাণী তিনি লাভ করিয়াছিলেন।

এই খানে ১৯০১ সালের প্রারম্ভে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া "রামতীর্থ" নাম গ্রহণ করেন। তাহার পর তিনি উত্তরাখণ্ডের অতি দুর্গম তীর্থগুলি, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদার নাথ, সুমেরু পর্ব্বত, বদরী নারায়ণ প্রভৃতি দর্শন করেন। হিমালয়ের এই তীর্থগুলি চির তুষারে আবৃত, অতি দুর্গম, কিন্তু ইহাদের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। রামতীর্থ এই ভ্রমণ কাহিনীর কিছু কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যেও এই প্রকৃতির উপাসনার পরিচয় পাওয়া যায়।

হিমালয় হইতে ভারতে ফিরিয়া ১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসে রামতীর্থ মথুরার ধর্ম্মমহাসভায় সভাপতির কার্য্য করেন। তাহার পর কিছুদিন দেশে থাকিয়া তিনি আবার হিমালয়ে ফিরিয়া যান। এই খানে তাঁহার টিহরীর মহারাজার সহিত পরিচয় হয়; মহারাজা সুশিক্ষিত সত্যবাদী ছিলেন; রামতীর্থের সহিত আলাপে তুষ্ট হইয়া তিনি তাঁহাকে টিহরীতে নিমন্ত্রণ করেন; কিছুদিন পরে স্বামিজী টিহরীর রাজার গ্রীষ্মাবাস প্রতাপ নগরে গিয়া রাজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন।

এই সময়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে চিকাগো ধর্ম্মমহাসভার অধিবেশনের মত জাপানেও নিখিল ধর্ম্মমহাসভার এক অধিবেশন হইবে। টিহরীর মহারাজা স্বামিজীকে সেই সভায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে যাইতে অনুরোধ করেন; স্বামিজীও সম্মত হইয়া আগষ্ট মাসে (১৯০২) জাপান যাত্রা করেন। তাঁহার সহিত শিষ্য নারায়ণস্বামী ছিলেন।

জাপানে আসিয়া বহুঅনুসন্ধানেও সভার অধিবেশনের কোন সংবাদ না পাইয়া তাঁহারা বুঝিলেন অধিবেশনের সংবাদ মিথ্যা। জাপানে কিছুদিন থাকিয়া নানা স্থানে বক্তৃতাদিয়া রামতীর্থ জাপানবাসিদের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সেখান হইতে কিছুদিন পরে, তিনি আমেরিকায় গমন করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় রামতীর্থও এখানে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেন; নানা স্থানে বক্তৃতাদি দিয়া তিনি আমেরিকার জনসাধারণের হৃদয় ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐশ্বর্য্যসম্পদ্ ধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ করেন; তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সানফ্রান্সিকোতে বেদান্তালোচনার জন্য Hermatic Brotherhood সাধু সঙ্গত প্রতিষ্ঠিত হইল; বহু নরনারী তাঁহার অপূর্ব্ব বৈরাগ্য, ত্যাগোজ্জল জ্যোতিরুদ্ভাসিত আকৃতি; শিশুর মত সরল হাস্যমণ্ডিত মুখশ্রী, মধুর অভিভাষণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। কথিত আছে একদিন নিরীশ্বরবাদী জনৈকা মহিলা জিজ্ঞাসুভাবে তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার

ধ্যানসমাহিত প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন "আমার সন্দেহের নিরাকরণ হইয়াছে; আমি আর নাস্তিকবাদে বিশ্বাস করি না"। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনেও নাকি এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রের নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া তিনি ভারতের বাণী নব্যবেদান্তবাদ প্রচার করেন।

আমেরিকা হইতে মিসর হইয়া তিনি ১৯০৪ সালে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আমেরিকায় প্রচারের ফলে তাঁহার নাম ভারতের শিক্ষিত সমাজে ইতিপূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল; সুতরাং ভারতে আসিয়া তিনি নানাস্থানে প্রচুর অভ্যর্থনা লাভ করেন; জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলেই রামতীর্থের আদর করিলেন।

বোম্বাই হইতে লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, মথুরা প্রভৃতি নানাস্থান ঘুরিয়া তিনি বিশ্রাম ও একান্তবাসের জন্য পুষ্করতীর্থে গমন করেন; কিছুদিন সেখানে বাস করিয়া তিনি যুক্ত-প্রদেশে ও বাঙ্গালার কয়েক স্থান ভ্রমণ করিয়া আবার হিমালয়ে ফিরিয়া যান।

এবার হিমালয়ে তিনি ব্যাসাশ্রম নামক স্থানে বাস স্থাপন করিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন বেদের পূর্ণজ্ঞান ব্যতীত ভারতের প্রাচীন সভ্যতার মর্ম্মগ্রহণ ও ধর্ম্মপ্রচার সুন্দরভাবে করা যায় না, তাই তিনি ব্যাসাশ্রমে বসিয়া বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করেন এবং অল্পকালমধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমগ্র বেদ পাঠ করেন।

ব্যাসাশ্রম হইতে স্বামিজী আরো নির্জ্জনতর স্থানের সন্ধানে বশিষ্ঠাশ্রম নামক স্থানে যান; সঘনবনের অন্তরালে ১০০০০ফিট উচ্চে এই পরম রমণীয় স্থানে বাস করিয়া তিনি বেদচর্চ্চায় ও শিষ্যদের উপদেশাদিদানে কিছুদিন কাটাইলেন। যুক্ত-প্রদেশ ও বাঙ্গলা ভ্রমণের পরেই তাঁহার যে স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল এই দুর্গমস্থানে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তাহা আরো খারাপ হইয়া পড়ায় শিষ্যবর্গের অনুরোধে তিনি বশিষ্ঠাশ্রম ত্যাগ করিলেন।

টিহরীর নিকটেই একটী নির্জ্জন স্থানের সন্ধান তিনি পাইলেন। স্থানটীর তিন দিক বেড়িয়া ভৃগুগঙ্গা প্রবাহিতা; অপরদিক ঘনবনে আবৃত। বহু সাধু এই স্থানে সাধনা করিয়াছিলেন। এইস্থানে টিহরীর মহারাজের ব্যয়ে প্রস্তুত গৃহে তিনি বাস করিতে লাগিলেন।

এই স্থানে বাস করিবার সময় শিষ্য নারায়ণ স্বামীর একান্ত বাসের জন্য এখান হইতে তিন মাইল দূরে একটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া তথায় নারায়ণস্বামীকে পৌছাইয়া দিবার সময় পথে তিনি তাঁহাকে নানা উপদেশ দিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার পাঁচদিন পরে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর দীপালির দিন মধ্যাহ্নে ভৃগু গঙ্গায় স্নান করিবার কালে তিনি সলিল সমাধি লাভ করেন।

মৃত্যুর অনতি পূর্ব্বে স্নানে যাইবার সময় তিনি লিখিয়া গিয়াছিলেন, "মৃত্যু আমার এই পঞ্চদেহ নষ্ট করিয়া দাও; আমার দেহের সংখ্যাত কিছু কম নহে; শুধু চাঁদের কিরণ ও তারার বসন পরিয়াই ত' স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারি; পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর বেশে গান গাহিয়া গাহিয়া ফিরিব, সাহারার বালুবেশে নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইব"।

ইহাই রামতীর্থের জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ; এ জীবন কর্ম্মবহুল নহে, শান্ত, আত্ম সমাহিত।

ইহাকে কর্ম্মবহুল নহে বলিতেছি, কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁহার কর্ম্মজীবনের যে পরিচয় পাই তাহার মধ্যে কর্ম্মবাদী'র প্রচণ্ডগতিশীলতার পরিচয় রহিয়াছে ; তথাপি প্রধানতঃ ইহাকে কর্ম্মবাদময় জীবন বলা চলে না।

তিনি প্রথম জীবনে বৈষ্ণব মতের উপাসক ছিলেন, পরজীবনে বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করেন। বৈদান্তিকবাদ জ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ; রামতীর্থ নিজে সন্ন্যাসী ছিলেন কিন্তু পরজীবনে তিনি যে মতবাদ প্রচার করেন তাহাকে দার্শনিক পরিভাষায় বৈদান্তিক সমুচ্চয়বাদ বলা চলে। তিনি জ্ঞানী ছিলেন এবং পরম জ্ঞান লাভই তাঁহার জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। গৃহস্থ জীবনে তাঁহার পাঠানুরাগের ও জ্ঞান-চর্চ্চার আগ্রহের নিদর্শন পাই। তাঁহার পুস্তকাগার বিবিধ গ্রন্থে পূর্ণ ছিল ; নানা বিদ্যার আলোচনায় তিনি মগ্ন থাকিতেন। দেশী ও বিদেশী সাহিত্য ও দর্শন তাঁহার আয়ত্ত ছিল ; বিজ্ঞানেও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল ; সন্ন্যাসাশ্রমে পুষ্করে একান্ত বাস সময়েও তিনি নবপ্রকাশিত হার্বার্ট স্পেনসারের সমাজতত্ত্বসম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী পড়িতে ছিলেন। ডারবিন হেগেল, মিল বেন্থাম প্রভৃতি প্রতীচ্যের মনীষিগণের দার্শনিক চিন্তার ধারার সহিত তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় ছিল। কিট্‌স্ শেলী ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি য়ুরোপীয় কবিগণের তিনি ভক্ত ছিলেন ; হাফেজ, সাদী, জালালুদ্দিন রুমী প্রভৃতি পারস্যের কবি ও মনীষিভক্তগণের বাণী, তুলসীদাস ও সুরদাস প্রভৃতির গ্রন্থাবলী তাঁহার নিত্যসঙ্গী ছিল। হিন্দুর সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু জ্ঞানই তাঁহার জীবনের চরম পরিণতি নহে।

মস্ত—এই একটা উর্দ্দু কথা আছে, ইহার বাংলা অর্থ মুগ্ধ করা যাইতে পারে ; এই কথাটীতেই বোধ করি রামতীর্থের জীবনের রহস্যটী ধরা পড়ে : তিনি ছিলেন 'মস্ত', কিসে "মস্ত ? এই বিশ্ব প্রকৃতির-আত্মার-জীবনের-সৌন্দর্য্যে "মস্ত"। খণ্ডিত আত্মা নহে, যে আত্মা এই বিশ্বচরাচরব্যাপ্ত হইয়া নানা বিচিত্র রূপে, রসে, সৌন্দর্য্যে আপনাকে প্রতিনিয়ত প্রকাশ করিয়াছে, সেই বিরাট আত্মা, বিশ্বাত্মা—তাহারই প্রেমে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আত্মার এই বিরাট প্রকাশে আপনপর ভেদ নাই, কোন গণ্ডী নাই, সঙ্কীর্ণতা নাই ; তাই তাঁহার নিকট আপনপরভেদ ছিল না ; তাঁহার স্বদেশ-প্রেম বিশ্বপ্রেমেরই অঙ্গীভূত তাই তিনি পাশ্চাত্য যন্ত্রমুখী সভ্যতার মধ্যে শুধু অন্যায়ই দেখেন নাই, তাই তাহার তলায় মানুষের অদম্য আত্মা আপনাকে প্রকাশ করিবার যে চেষ্টা করিয়াছে তাহা দেখিয়া তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সকলই তাঁহার নিকট প্রাণবান্, বিভূতিমান্ ছিল ; ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ হইতে সাগর নদী পর্ব্বত সকলই তাঁহার নিকট এক হইয়া গিয়াছিল ; নিজের পুস্তক, কাপড় প্রভৃতি জড়পদার্থের মধ্যেও তিনি এই বিরাট প্রাণের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাই অনেক সময়ে তিনি তাহাদিগকে প্রাণী বোধে সম্বোধন করিতেন।

প্রকৃতির এই বিচিত্র রূপের মধ্যে তিনি নিজেরই আত্মার বিভূতি দেখিয়া ছিলেন ; প্রকৃতির দাস নহেন, প্রকৃতিই তাঁহার দাসী, প্রকৃতি তাঁহার সহিত অভেদাত্মা ; এই যে

বাহিরের বৈচিত্র্য ইহা তাঁহারই আত্মার বিচিত্র প্রকাশ: আত্মজ্ঞানের এই দীপ্তিটীতে তিনি দৃপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—

The world turns aside
To make room for me ;
I come Blazing light
And the shadows must flee.

*   *   *

I ride on tempests
Astride on the gale
My gun is the lightening,
My shots never fail

চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া যিনি বলিয়াছিলেন

Who lent you this beauty, O silver ball !
My dream is her lustre and silver and all
The music of the waving pines
The echoes of the ocean's war

*   *   *

The Golden beam of the sun
The twinkle of the silent star
The shimmering light of the silvery moon
The apple-bosomed earth and heaven's glorious wealth
Am I, am I, am I.
The oceans surge, the rivers roll,
In me, in me, in me.

প্রকৃতির উদ্দেশ্যে তিনি বলিয়াছিলেন

For nature and I are one, you see,
And she is always subservient to me.

—তীর্থ সেবক

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

চতুর্থ অধ্যায়।

রোম সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর আধুনিক ইতিহাসের আদিপর্ব্বে অর্থাৎ বর্ব্বর শাসন যুগে ইউরোপের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে এই বর্ব্বরযুগের অবসানকালে দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপীয় সমাজের মধ্যে প্রথম যে শাসননীতি ও শাসন ব্যবস্থা বিকাশ ও বিস্তৃতি লাভ করিল সেটি ফিউড্যালিজ্‌ম্ বা ভূস্বামীতন্ত্র। ফিউড্যালিজ্‌ম্‌ই বর্ব্বরতন্ত্রের প্রথম সন্তান। অতএব এখন এই ফিউড্যালিজম্ সম্বন্ধেই আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে।

একথা অবশ্য বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ঘটনা পরম্পরার ইতিহাস আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। ভূস্বামীতন্ত্রের বাহ্য ঘটনার ইতিহাস আমি এখানে দিতে আসি নাই। আমাদের আলোচ্য বিষয় সভ্যতার ইতিহাস। বাহ্য ঘটনার আবরণের মধ্যে সভ্যতার মূলতত্ত্বগুলি কিরূপে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহাই আমাদের সন্ধানের বিষয়।

অতএব বাহ্য ঘটনা বলুন, সমাজে সঙ্কটই বলুন, আর সমাজের বিচিত্র অবস্থা বিপর্য্যয়ই বলুন, এ সমস্ত সভ্যতার ইতিহাসের দিক দিয়াই আমরা আলোচনা করিব। আমরা দেখিব তাহারা কে কিরূপে সভ্যতার বিকাশে বাধা দিয়াছে বা সহায়তা করিয়াছে, সভ্যতাকে তাহারা কে কি দিয়াছে বা দেয় নাই। আমরা কেবল এই ভাবেই ফিউড্যাল্ ব্যবস্থার আলোচনা করিব।

আমরা গ্রন্থের প্রারম্ভেই সভ্যতার মূল প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে, সভ্যতার মধ্যে দুইটি মূলতত্ত্ব নিহিত আছে, একদিকে আত্মার বিকাশ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, মনুষ্যত্বের বিকাশ; অপর দিকে মানুষের বাহ্য অবস্থার ও সামাজিক বেষ্টনীর পুষ্টি ও পরিণতি। সুতরাং আমরা যে কোন নূতন ঘটনা বা নূতন ব্যবস্থা বা জগতের কোন নূতন অবস্থার সম্মুখে উপস্থিত হইব, তাহার সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে একদিকে সে মানুষের আত্মার বিকাশে কি সহায়তা করিয়াছে বা কি বাধা দিয়াছে, অপরদিকে সে সমাজের পুষ্টি বিষয়েই বা কিরূপে অনুকূল বা প্রতিকূল আচরণ করিয়াছে ?

আপনারা আগে হইতেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে ধর্ম্মতত্ত্ব ও নীতিতত্ত্বের কতকগুলি বড় বড় সমস্যা এড়াইয়া যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। কোন একটা ঘটনা বা ব্যবস্থা মানুষের আত্মার বা সমাজের পুষ্টি ও বিকাশ সাধনে কি সহায়তা করিল বা না করিল তাহা জানিতে হইলে তাহার পূর্ব্বেই জানা আবশ্যক যে মানবাত্মার বা মানব সমাজের প্রকৃত উন্নতি ও পুষ্টি কাহাকে বলে। তবেই আমরা বুঝিতে পারিব, কোথায় উন্নতি না হইয়া অবনতি হইতেছে, পুষ্টি না হইয়া বিকৃতি ঘটিতেছে, কোন্ উন্নতি উন্নতির মিথ্যা ভাণমাত্র, কোন্ পুষ্টি অস্বাস্থ্য জনিত অযথা স্ফীতিমাত্র।

আমাদের ইতিহাস ব্যাখ্যানের মধ্যে যখন যখন এইরূপ নৈতিক ও দার্শনিক তত্ত্বের মীমাংসার প্রয়োজন হইল, তখন সে আলোচনায় আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আধুনিক যুগের চিন্তাস্রোত লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝা যায় যে দর্শন ও ইতিহাসের সমন্বয়ই হইতেছে আধুনিক আলোচনাপদ্ধতির প্রকৃষ্ট লক্ষণ। আমরা এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে বস্তুর সহিত বিজ্ঞানের, তথ্যের সহিত তত্ত্বের, চিন্তার সহিত ব্যবহারের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এতদিন পর্য্যন্ত মানব ইতিহাসে এই সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় নাই। মানুষের চিন্তা ও মানুষের ব্যবহার পরস্পর নিরপেক্ষভাবে স্বতন্ত্রপথে চলিয়া আসিয়াছে। মানুষের চিন্তা যখন যখন ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তখন সে কেবল ভাবোন্মাদের আকারে উন্মাদনা শক্তির প্রচণ্ড বেগে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছে। মানব সমাজের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে দুইটী বিরুদ্ধ দল পরস্পর নিরপেক্ষভাবে কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিয়াছে। একদিকে বিশ্বাসীর দল, তত্ত্ববাদীর দল, ভাবোন্মত্তের দল, অপরদিকে ব্যবহারিকের দল, যাঁহারা কোন কোন সাধারণ নীতি বা তত্ত্বকে আমল দেন না, যাঁহারা কেবল অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করেন, ঘটনাস্রোতের গতি লক্ষ্য করিয়া উপস্থিত প্রয়োজন অনুসারে সুযোগ সুবিধার অনুবর্ত্তন করিয়া চলেন। এ অবস্থাটা কিন্তু এখন চলিয়া যাইতেছে। এখন হইতে মানব সমাজে শুদ্ধ তত্ত্ববাদীরও আধিপত্য থাকিবে না, শুদ্ধব্যবহারবাদীরও আধিপত্য থাকিবে না। এখনকার কালে মানবসমাজ শাসন করিতে হইলে, মানব সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিতে হইলে, তত্ত্বও জানিতে হইবে, তথ্যও জানিতে হইবে, ধর্ম্মনীতির গৌরবও স্বীকার করিতে হইবে, প্রয়োজনের মূল্যও মানিতে হইবে, অতএব আমরা উপস্থিত ক্ষেত্রে বর্ত্তমান যুগোচিত চিন্তাপ্রণালী অনুসরণ করিয়া প্রতিক্ষণেই ঘটনাবলী আলোচনা করিতে করিতে তত্ত্বালোচনায় আসিয়া পড়িব। ব্যবহার ক্ষেত্রে ভাবোন্মাদনার বশে তথ্যনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ তত্ত্বের অনুসরণ করিতে গিয়া মানুষ নিজকে কিরূপ আবদ্ধ ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া ফেলে, ফরাসী জাতি অল্পদিন হইল বিগত বিপ্লবের সময় তাহার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে। সেই অভিজ্ঞতার ফলে ফরাসী জাতির মধ্যে বিশুদ্ধ তত্ত্বের প্রতি একটা অশ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিয়াছে। এখন আমরা তথ্যের দিকে বাস্তব ঘটনার দিকে, বিশিষ্ট ক্ষেত্রোপযোগী, বিশিষ্ট বিধিবিধানের দিকে মুখ ফিরাইয়াছি। ইহাতে আক্ষেপের বিষয় কিছুই নাই। ইহাদ্বারা আমরা সত্যরাজ্যের একটা নূতন পথের সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু এই বস্তুতন্ত্রতার ঝোঁকে যেন আমরা সামঞ্জস্য হারাইয়া না ফেলি। একথা যেন না ভুলিয়া যাই যে জগতে সত্যই একমাত্র শাসনাধিকারী; বাস্তব ঘটনা যে পরিমাণে সত্যকে প্রকাশ করে সেই পরিমাণেই তাহার মূল্য; চিন্তার মহত্ত্ব, ভাবের মহত্ত্বই প্রকৃত মহত্ত্ব; ভাবরাজ্যের সফলতাই প্রকৃত সফলতা।

অতএব আমাদের ইতিহাস ব্যাখানের যেখানে যেখানে তত্ত্বমূলক বিচারের প্রয়োজন হইবে আমরা সে আলোচনায় বিমুখ হইব না। ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের সম্পর্কে ভূস্বামীতন্ত্রের আলোচনা করিতে গেলে আমাদিগকে একাধিকবার এইরূপ দার্শনিক বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

দশম শতাব্দীতে ভূস্বামীতন্ত্রের যে প্রয়োজন ছিল, সে যুগে অন্য কোন ছাঁচে সমাজ

গঠন যে সম্ভব ছিল না, ভূস্বামীতন্ত্রের বিস্তৃতি ও ব্যাপক প্রতিষ্ঠাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যেখানে যেখানেই বর্ব্বরতন্ত্রের অবসান হইতে লাগিল, সেই সেই স্থানেই সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভূস্বামীতন্ত্রের ছাঁচে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমটা লোকে দেখিল এত অরাজকতারই জয়জয়কার চলিতেছে। সমস্ত ঐক্য, সার্ব্বজনীন সভ্যতার সমস্ত উপাদান অন্তর্হিত হইয়া গেল; চারিদিকে বিরাট সমাজ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল এবং তাহার স্থলে কতকগুলি ক্ষুদ্র, নিষ্প্রভ, সঙ্কীর্ণ সম্বদ্ধ সমাজ মাথা তুলিয়া উঠিল। তখনকার লোকের চক্ষে এব্যাপার বিশ্বব্যাপী ধ্বংস ও প্রলয়ের সূত্রপাত বলিয়া মনে হইল। সে কালের কবি ও ইতিবৃত্তকারদের রচনা পাঠ করুন: দেখিবেন তাঁহাদের সকলেরই বিশ্বাস যে তাঁহারা জগতের অন্তিম কালে উপস্থিত হইয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু তখন এক নূতন সৃষ্টির সূত্রপাত হইল; সমাজ ক্ষেত্রে তখন ভূস্বামীতন্ত্ররূপ এক নূতন তন্ত্র, নূতন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিল। এ ব্যবস্থা পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা পরম্পরার একমাত্র অবশ্যম্ভাবী পরিণাম; সেই যুগে এইরূপ একটা শাসনতন্ত্রেরই একান্ত প্রয়োজন ছিল; সুতরাং চারিদিকে সমাজের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই ভূস্বামীতন্ত্রের ছাঁচে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এমন কি যাজকতন্ত্র, পৌরতন্ত্র, রাজতন্ত্র প্রভৃতি যে সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত ইহার প্রকৃতিগত কোন সাদৃশ বা সম্পর্ক নাই, তাহারাও ইহার সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে, ইহার ছাঁচে স্ব স্ব প্রকৃতি পুনর্গঠিত করিয়া লইতে বাধ্য হইল, চর্চ্চগুলি ফিউড্যাল্ ব্যবস্থার মধ্যে একদিকে প্রভুস্বাধিকারী ভূস্বামী (suzerain), অপরদিকে দায়বদ্ধ ভূভোগী প্রজা (vassal) হইয়া পড়িল। পৌরসংঘগুলিও একদিকে প্রভু, অন্যদিকে প্রজা হইল। রাজক্ষমতা এখন ভূম্যাধিকারীর অধিকারে মণ্ডিত হইয়া আপনার পূর্ব্বপরিচয় লুকাইয়া ফেলিল। শুধু ভূমিবণ্টন ব্যাপারেই ফিউড্যাল নীতির ক্রিয়া আবদ্ধ থাকিল না। জঙ্গলে গাছ কাটিবার অধিকার, জলে মাছ ধরিবার অধিকার প্রভৃতি অধিকারও ভূস্বত্বের ন্যায় ফিউড্যাল নীতি অনুসারে বণ্টিত হইতে লাগিল। চর্চ্চের যে সমস্ত নানাবিধ আয় ছিল, তাহাও এই ভাবে বিলি করা হইত। সমাজের সমস্ত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান যেমন ফিউড্যালিমের কাঠামর মধ্যে প্রবেশ করিল, সেইরূপ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সমস্ত তুচ্ছতম উপকরণ পর্য্যন্ত ফিউড্যালিজ্মের ছাপ গ্রহণ করিল।

ফিউড্যালিজ্মের বাহ্য-আকৃতি যেভাবে সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয় অধিকার করিয়া বসিল, তাহাতে প্রথমটা মনে হইতে পারে যে ফিউড্যাল নীতির অন্তঃপ্রকৃতি ও প্রাণতত্ত্বও বুঝি সর্ব্বত্র জয়ী হইল। কিন্তু সেটা ভুল। সমাজের যে সমস্ত অঙ্গ, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ফিউড্যালিজ্মের অন্তঃপ্রকৃতির সহিত সম্পর্কিত ছিল না, তাহারা ফিউড্যালিজ্মের বাহ্য আকৃতি গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু স্ব স্ব মূল প্রকৃতি বা বিশিষ্ট নীতি বর্জন করিল না। চর্চ্চ বাহিরে ফিউড্যাল্ চর্চ্চ হইল, কিন্তু মূলে যাজকতন্ত্র নীতিদ্বারা শাসিত ও অনুপ্রাণিত হইতে থাকিল; ফিউড্যালিজ্মের ছদ্মবেশকে সে দাসত্বের চাপরাশ ভিন্ন আর কিছুই মনে করে নাই; তাই কখনও রাজশক্তির সহায়তায়, কখনও পোপের সহায়তায়, কখনও বা প্রজাশক্তির সহকারিতায় সে এই ফিউড্যালিজ্মের উচ্ছেদ সাধনের জন্যই অবিরাম চেষ্টা করিয়াছে। রাজতন্ত্র ও পৌরতন্ত্রের ক্ষেত্রেও ঐরূপ ব্যাপার; মূলে তাহারা স্ব স্ব বিশিষ্ট প্রকৃতি দ্বারাই

অনুপ্রাণিত হইতে থাকিল। ফিউড্যালিজমের চাপরাশ সত্ত্বেও ইউরোপীয় সমাজের এই সমস্ত বিচিত্র অঙ্গ এই বিরুদ্ধ প্রকৃতি শাসনতন্ত্রের ছাপ মুছিয়া ফেলিয়া নিজ নিজ বিশিষ্ট প্রকৃতির অনুযায়ী স্বরূপে প্রকট হইবার জন্য অনবরত চেষ্টা করিয়াছে।

ফিউড্যালিজ্‌মের বাহ্যআকৃতি কিরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল তাহা দেখা গেল, কিন্তু তাহার অন্তঃপ্রকৃতি ও প্রাণতত্ত্বও যে সেইরূপ সর্ব্বত্র বিস্তৃতি ও ব্যাপ্তি লাভ করিল এ সিদ্ধান্ত যেন আমরা না করিয়া বসি, আর যে ক্ষেত্রেই ফিউড্যালিজ্‌মের বহিঃসাদৃশ্য মাত্র দেখিব সেই ক্ষেত্রেই ফিউড্যালিজ্‌মের যথার্থ পরিচয় লাভ করিব এরূপ আশা না করি। ফিউড্যালিজ্‌মকে ভাল করিয়া বুঝিতে ও জানিতে হইলে, আধুনিক সভ্যতার গঠন সম্পর্কে ইহার প্রভাব ও কার্য্যকারিতা বুঝিতে ও বিচার করিতে হইলে, এমন ক্ষেত্রে ইহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে যেখানে ইহার বাহ্য আকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি একত্র সম্মিলিত হইয়াছে। যেখানে ইউরোপীয় ভূখণ্ডের বর্ব্বরবিজেতৃবর্গের সম্মিলনে, স্তরে স্তরে উচ্চনীচ পর্য্যায়ে ভূস্বামী ও ভূসম্পত্তির বিন্যাস ঘটিয়াছে, সেই ক্ষেত্রেই ইহার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাইবে। আসুন আমরা এখন সেই ক্ষেত্রেই প্রবেশ করি।

অনতিপূর্ব্বে আমরা ইতিহাসচর্চ্চায় নীতিতত্ত্বের আলোচনা কিরূপ আবশ্যক হয় তাহা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীতমুখে মানবজীবনের আরও একটা দিক আছে, যাহা এপর্য্যন্ত যথাযুক্তভাবে আলোচিত হয় নাই. একটা নূতন ঘটনা বা বিপ্লব বা নূতন সামাজিক পরিবর্ত্তনের দ্বারা মানুষের শারীরিক জীবন যাত্রা প্রণালী, মানুষের বাহ্যজীবনে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, সমাজের এই বাহ্য অবস্থার দিকটা আমরা সব সময়ে যথোপযুক্তরূপে আলোচনা করি নাই। অথচ এই সকল বাহ্য পরিবর্ত্তন সমগ্র সমাজের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। ইতিতত্ত্ববিদ্‌ মঁতেস্কিয়্‌ (Montequieu) জল বায়ুর প্রভাব সম্বন্ধে কিরূপ গবেষণা করিয়াছিলেন ও ঐ প্রভাবকে কতখানি মূল্য দিতেন তাহা কাহার অবিদিত আছে? মানুষের উপর জলবায়ুর মুখ্য প্রভাব হয় ত যতটা ব্যাপক বলিয়া তিনি মনে করিয়াছেন ততটা নহে; অন্ততঃ সে প্রভাবের ক্রিয়া অস্পষ্ট ও তাহার পরিমাপ নির্দ্দেশ করা কঠিন। কিন্তু জলবায়ুর গৌণ প্রভাব, যদ্দ্বারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোককে মুক্ত বায়ুতে বাস করিতে হয়, শীত প্রধান দেশের লোককে গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়, বিভিন্ন দেশের লোককে বিভিন্ন দ্রব্য আহার করিয়া প্রাণধারণ করিতে হয়, এই গৌণ প্রভাব তুচ্ছ ব্যাপার নহে; কারণ এই রূপে বাহ্য অবস্থার সামান্য প্রভেদে সভ্যতার গতি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। বড় বড় বিপ্লবমাত্রেই সমাজের বাহ্য জীবনে এইরূপ অনেক পরিবর্ত্তন আনিয়া ফেলে; এবং এই সকল পরিবর্ত্তন বিশেষ ভাবে আলোচনার বিষয়।

ফিউড্যালিজ্‌মের প্রতিষ্ঠার ফলে সমাজের বাহ্যাবস্থার এইরূপ একটা বড় পরিবর্ত্তন আনিয়া ফেলে। ইতিপূর্ব্বে ভূম্যধিকারিবৃন্দ যাহারা দেশের মালিক, তাহারা ঝাঁক বাঁধিয়া হয় স্থাবরভাবে সহরে বাস করিত, নয় যাযাবরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দলে দলে দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইত। ফিউড্যাল্‌ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ফলে সেই লোকেরাই

এখন পরস্পর হইতে বহুদূরে আপন আপন আলয়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে স্বতন্ত্র ভাবে বাস করিতে লাগিল। সভ্যতার গতি প্রকৃতির উপর এত বড় একটা পরিবর্ত্তনের প্রভাব যে কতখানি হইবে তাহা আপনারা সহজেই বুঝিবেন। সমাজের কর্ত্তৃত্ব, সমাজ শাসনের কেন্দ্র এখন সহসা সহর হইতে পল্লীগ্রামে চলিয়া গেল। সামাজিক সম্পত্তির অপেক্ষা এখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল্য বাড়িয়া গেল; সামাজিক জীবন অপেক্ষা ব্যক্তিগত জীবনের আদর বাড়িয়া গেল। ফিউড্যাল সমাজ প্রতিষ্ঠার এইটিই হইল প্রথম ফল। এই ফলের সম্বন্ধে যতই আলোচনা করা যাইবে ততই দেখিতে পাইব এই একটি পরিবর্ত্তনের পরিণাম কত দূরব্যাপী।

এখন এই ফিউড্যাল সমাজেরই একটু বিশেষ পরিচয় লওয়া যাউক এবং দেখা যাউক সভ্যতার ইতিহাসে এই সমাজ কি ভাবে কাজ করিয়াছে। প্রথমে এই ফিউড্যাল্ সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা সরল, আদিম ও ভিত্তিগত উপাদান লইয়া আরম্ভ করা যাউক। মনে করুন একটি সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ডের একমাত্র ভোগাধিকারী তাঁহার ভূসম্পত্তির মধ্যভাগে একেশ্বর হইয়া বাস করিতেছেন। এখন দেখা যাউক তাঁহার চতুঃপার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র সমাজ গঠন করিয়া যাহারা বাস করিতেছে তাহাদের কিরূপ অবস্থা হয়।

তিনি একটি স্বতন্ত্র সুপরিচ্ছিন্ন উচ্চ স্থান বাছিয়া লইয়া প্রাকার পরিখাদি দ্বারা তাহাকে সুরক্ষিত করিয়া তাহার মধ্যে নিজের আবাসের জন্য একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। কাহাদিগকে লইয়া তিনি এখানে বাসস্থাপন করিলেন? তাঁহার স্ত্রী পুত্রকন্যা লইয়া। হয়ত জন কয়েক ভূসম্পত্তি হীন স্বাধীন প্রজা ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার অনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত একত্র বাস করিতে লাগিল ও তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। দুর্গের অভ্যন্তরে ইঁহাদের বাস। বাহিরে দুর্গের পাদমূলে চতুষ্পার্শ্বে কতকগুলি দাস ও অন্যান্য লোক আসিয়া একটি উপনিবেশ স্থাপন করিল; তাহারা ভূম্যধিকারীর কার্য্যে নিযুক্ত হইল। নিম্নভূমির এই উপনিবেশের মধ্যে ধর্ম্ম আসিয়া একটি গির্জ্জা প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার মধ্যে একটি যাজক বসাইয়া গেল। ফিউড্যাল্ তন্ত্রের আদিম অবস্থায় এই যাজক এক কালে দুর্গেরও পুরোহিত ছিলেন, গ্রামেরও পুরোহিত ছিলেন, ক্রমশঃ এই দুই পদ স্বতন্ত্র হইয়া স্বতন্ত্র ব্যক্তির অধিকারে গিয়া পড়ে; গ্রামের যাজক তখন গ্রামের মধ্যেই তাঁহার গির্জ্জাঘরের পাশে বাস করিতে লাগেন। এই হইল ফিউড্যাল্ সমাজের মৌলিক মূর্ত্তি, ইহাকে একটি ফিউড্যাল্ অণু বলা যাইতে পারে। এই মূলবীজটিকেই আমাদিগকে প্রথমে বুঝিয়া লইতে হইবে। ইহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে হইবে—"তুমি মানুষের আত্মার বিকাশে কি সহায়তা করিলে? তুমি মানব সমাজের পুষ্টিই বা কিরূপে অগ্রসর করিয়া দিলে?"

এখনই যে ক্ষুদ্র সমাজটি বর্ণনা করা গেল—তাহারই নিকট এত বড় দুইটী প্রশ্ন উপস্থিত করায় কিছুমাত্র দোষ হইবে না, এবং সে যে উত্তর দিবে তাহা মানিয়া লইতে কোন দ্বিধার প্রয়োজন নাই। সে যে সমগ্র ফিউড্যাল্ সমাজের মূল আদর্শ ও প্রতিনিধি। ভূস্বামী তাঁহার অধিকারভুক্ত লোকবর্গ, ও যাজক—ছোট আকারেই হউক আর বড় আকারেই হউক এই তিন উপাদান লইয়াই ফিউড্যাল্ সমাজ। অবশ্য ইহা ছাড়া রাজা আছেন, পৌর সমাজ

আছে। কিন্তু রাজতন্ত্র ও পৌরতন্ত্র ফিউড্যাল্ সমাজের মৌলিক উপাদান নহে—স্বতন্ত্র উপায়ে স্বতন্ত্র নীতি হইতে তাহাদের উদ্ভব।

এই ক্ষুদ্র সমাজের বিষয় চিন্তা করিলে প্রথমেই একটি জিনিষ চোখে পড়ে। এসমাজে ভূস্বামীর মর্য্যাদা ও গৌরব তাঁহার নিজের চক্ষে ও তাঁহার অনুচরবর্গের চক্ষে খুব বড় আকার ধারণ করে। ব্যক্তিত্বের ধারণা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভাব বর্ব্বর সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল কিন্তু ফিউড্যাল্ ভূস্বামীর যে আত্মমর্য্যাদাবোধ, এ একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার। বর্ব্বরসমাজে প্রত্যেক মানব, প্রত্যেক যোদ্ধা ব্যক্তি হিসাবে যে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা অনুভব করিতেন, এ তাহা নহে। এখানে ব্যক্তি হিসাবে ব্যক্তির মর্য্যাদা নহে, ভূসম্পত্তির অধিকারী হিসাবে অধিকার গৌরব, গৃহস্বামী হিসাবে স্বামিত্বের গৌরব, দাসবৃন্দের চালক হিসাবে প্রভুত্বের গৌরব। এমন অবস্থার ফলে ফিউড্যাল্ সমাজের নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে একটা অপরিমিত আত্মগরিমার সৃষ্টি হইল, যাহার যথার্থ তুলনা অন্য কোন সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া যায় না। এ কথা প্রমাণ করিয়া দেওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীন ইউরোপীয় সমাজের মধ্য হইতে একটা আভিজাত্যের নিদর্শন লওয়া যাউক। যথা, ধরুন রোমের পাট্রিসিয়ান্ আভিজাত্য। ফিউড্যাল্ ভূস্বামীর মত রোমের পাট্রিসিয়ান্ গৃহস্বামী, প্রভু ও জননায়ক ছিলেন। তাহা ছাড়া স্বপরিবারের মধ্যে তিনি পন্টিফ্ বা ধর্ম্মযাজক ছিলেন।

এখন ধর্ম্মযাজক হিসাবে তাঁহার যে মর্য্যাদা সে মর্য্যাদা আসিয়াছে বাহির হইতে ; এ মর্য্যাদায় তাঁহার কোন ব্যক্তিগত গৌরব নাই ; তিনি এখানে দেবতার প্রতিনিধি ; তিনি ধর্ম্মমন্ত্রের ব্যাখ্যাতা মাত্র। রোমক পাট্রিসীয়ান্ তাহা ছাড়া সেনেটনামধারী এক পৌরসঙ্ঘের সভ্য। কিন্তু এ মর্য্যাদাও তাঁহার বাহির হইতে পাওয়া, পৌরসঙ্ঘের নিকট হইতে ধার করা এ মর্য্যাদা। প্রাচীন অভিজাতবর্গের যে পদমর্য্যাদা তাহা ধর্ম্ম ও রাজনীতি সংশ্লিষ্ট, সমাজ হইতে সঙ্ঘ হইতে তাহার উদ্ভব, তাহা স্বতন্ত্র ব্যক্তির স্বতন্ত্র সম্পত্তি নহে। কিন্তু ফিউড্যাল্ ভূস্বামীর মর্য্যাদা একেবারে ব্যক্তিগত ; ইহা কাহারও নিকট হইতে পাওয়া নহে ; তাঁহার সমস্ত অধিকার, সমস্ত ক্ষমতা তাঁহা হইতেই উদ্ভূত। তিনি ধর্ম্মযাজক, ধর্ম্মনিয়ন্তা ছিলেন না ; তিনি কোন সেনেটের ধার ধারিতেন না ; তাঁহার সমস্ত গৌরব ও মর্য্যাদা তাঁহার একান্ত নিজস্ব। এমন পদের যিনি অধিকারী হইবেন তাঁহার চরিত্রের উপর যে ইহার প্রভাব কিরূপ প্রচণ্ড হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহার মনের মধ্যে না জানি কি ঔদ্ধত্য, কি অহঙ্কার, কি বিরাট দর্পের উদ্ভব হইবে! তাঁহার মাথার উপরে এমন কেহ নাই, যাঁহার তিনি প্রতিনিধি বা ব্যাখ্যাতা ; তাঁহার চারিপাশে এমন কেহ নাই যিনি তাঁহার সমানপদস্থ ; এমন কোন প্রবল বিধিবিধান নাই যাহা তাঁহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারে এমন কোন নীতি নাই যাহা তাঁহার ইচ্ছাশক্তিকে খর্ব্ব করিতে পারে ; তাঁহার শক্তির সাধারণ সীমা ও আসন্ন বিপদ ব্যতিরেকে আর কোন বাধাই তিনি মানেন না। মানব-চরিত্রের উপর ফিউড্যাল্ তন্ত্রের ইহাই অবশ্যম্ভাবী ফল। (ক্রমশঃ)

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম. এ, মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

উড়িয়া মন্দির

গত ফাল্গুন মাসে আমরা উড়িয়া শিল্পশাস্ত্রের মোটামুটী পরিচয় দিয়াছিলাম, কিন্তু সেখানে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য উড়িয়া মন্দিরের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা হয় নাই। এই প্রবন্ধে আমরা উড়িয়া মন্দিরের সম্বন্ধে শুধু দুইটী জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা করিব : প্রথম, তাহাদের পরিকল্পনা ও দ্বিতীয় তাহাদের জাতিবিভাগের প্রণালী। ভবিষ্যতে সুযোগ হইলে মন্দিরের অলঙ্কার, অর্থাৎ যে সকল নক্‌সা বা মূর্ত্তি স্থানে স্থানে বসাইয়া মন্দিরের শোভাবর্দ্ধন করা হয়, তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিব।
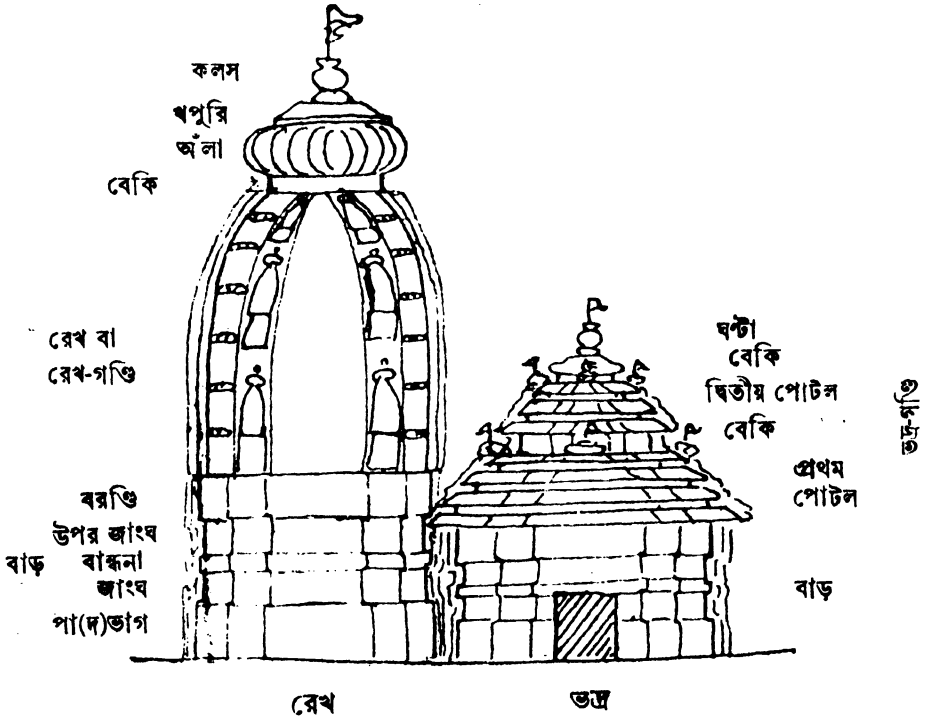
মন্দিরের সাধারণ বর্ণনা—

উড়িয়া মন্দির সাধারণতঃ কিরূপ হইয়া থাকে, তাহার একখানি চিত্র দেওয়া গেল। রেখ-দেউলের মধ্যে বিগ্রহ থাকেন এবং ভদ্র দেউলে দাঁড়াইয়া যাত্রীরা তাঁহাকে দর্শন করেন। রেখ ও ভদ্র দেউল পারিভাষিক নাম, কিন্তু সাধারণ ব্যবহারে ইহাদের বড় দেউল ও জগমোহন বা মুখশালা বলা হয়। আমরা পারিভাষিক নামই ব্যবহার করিব। 'রেখ' ও 'ভদ্র' এই দুই নামের অর্থ বুঝা দরকার। রেখ দেউলের দিকে দেখিলে প্রথমেই তাহার উচ্চতা চোখে পড়ে এবং তাহার পর তাহার গায়ে বিভিন্ন রথের (pilasters) মধ্যে যে

অন্ধকার ব্যবধান কালরেখার মত উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়াছে, তাহা চোখে পড়ে। বোধ হয় তাহা হইতেই ইহার নাম রেখ-দেউল।

ভদ্র-দেউল শব্দের অর্থ যতদূর বুঝিয়াছি, তাহা এইরূপ। শিল্পশাস্ত্রে একটী প্রবাদ পাওয়া যায় যে সর্ব্বসমেত ৩৬ রকম মন্দির আছে, কিন্তু সেই পুঁথিতেই আবার অধিক সংখ্যক মন্দিরের বর্ণনা আছে। এই পুরাতন ৩৬ মন্দিরের নামযুক্ত একটী শ্লোক পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে 'ভদ্র' ও 'মহাদ্রবিড়া' নামের দুই মন্দিরের উল্লেখ আছে। অন্যত্র মন্দিরের যে সকল বর্ণনা আছে তাহা পাঠ করিলে দেখা যায় 'ভদ্র' ও 'মহাদ্রবিড়া' ছাড়া সকলগুলি রেখ-দেউল ছিল। কালক্রমে এই ভদ্র দেউলের অনুকরণেই বোধ হয় পরে নলিনী-ভদ্র বিজয়া-ভদ্র প্রভৃতি ভদ্র-দেউলের রচনা হয়, এবং তাহার পর 'ভদ্র' এই শব্দ জাতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। অতএব রেখ-দেউল যেমন বিবরণমূলক নাম, ভদ্র-দেউল সেরূপ নহে। ভদ্র-দেউলেরও একটী বিবরণমূলক নাম পাওয়া যায়। কিন্তু শিল্পশাস্ত্রে তাহার ব্যবহার অতি কদাচিৎ হইয়াছে। ভদ্র-দেউলের ছাত পিরামিডের মত দেখিতে হয়। অনেকগুলি ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ধাপ গাঁথিয়া ছাতের রচনা হয়। তাহা হইতে ভদ্র-দেউলের এক নাম হইয়াছে পিঢ়া-দেউল। পিঢ়া শব্দের অর্থ 'পিঁড়ি'।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মন্দিরে বিগ্রহ থাকেন, সেই মন্দিরকে 'বড় দেউল' বলা হয়। উড়িষ্যায় সাধারণতঃ বড় দেউল রেখ-দেউল হইয়া থাকে। তাহার সম্মুখে ভদ্র-দেউল থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে। সময়ে সময়ে যাত্রীদের অকুলান হইলে সামনে আরও একটী বা দুইটী ভদ্র দেউল বাড়াইয়া দেওয়া হয়। কখনও কখনও আবার দেখা যায় যে বড় দেউল একটী ভদ্র-দেউল ও তাহার সম্মুখে যাত্রীদের বসিবার দাঁড়াইবার জন্য চারি পাশ খোলা বা ঘেরা মণ্ডপ থাকে।

মন্দিরের পরিকল্পনা—

(১) ভুবনপ্রদীপে একটী পদ আছে "মেঘনাদ পুংসবিমান। এ প্রমাণে সব্ প্রসাদ হোই" (৫৭ পৃঃ)। ইহার অর্থ হইল 'যে পুরুষ রথ আছে তাহাকে মেঘনাদ বলিয়া জানিবে। সব প্রাসাদের বেলায় এই প্রমাণ সত্য। এখানে মন্দিরকে পুরুষ ও রথ উভয়ের সঙ্গে এক করা হইল। এখনকার শিল্পীরা সকলে রেখ-দেউলকে পুরুষ ও ভদ্র-দেউলকে স্ত্রী বলিয়া ভাবে। তাহার সম্মুখে যদি দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভদ্র-দেউল যোগ করা হয়, তবে তাহারা যথাক্রমে সখী ও সখার স্থান পায়। শিল্পীদের মধ্যে এই শ্রুতিগত প্রবাদ ভুবনপ্রদীপের উল্লিখিত-পদকে কিছুদূর সমর্থন করে।

(২) মন্দিরের বিভিন্ন অংশের পারিভাষিক নাম চিত্রের মধ্যে মোটামুটী দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে দেখা যাইবে সর্ব্বনিম্ন বিভাগের নাম 'পাদভাগ' (অপভ্রংশে পাঅভাগ, পাভাগ) ; তাহার উপরে জাংঘ ('জংঘা' শব্দের অপভ্রংশ), তাহার উপর বান্ধনা ('বন্ধন শব্দজাত), তাহার উপরে 'উপর জাংঘ' ও 'বরণ্ডি'। তাহার উপর গণ্ডি (আভিধানিক অর্থ 'দেহের মধ্যভাগ'), তাহার উপর বেকি (= গলা), আঁলা (= আমলকী), কপুরি বা খপুরি

(=মাথার খুলি) ও কলস। এই সকল নামের মধ্যে অধিকাংশের পিছনে মন্দিরকে মানুষ বলিয়া পরিকল্পনা করার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভদ্র দেউলের বাড় অংশ রেখ-দেউলের অনুরূপ। কিন্তু ছাতে পুঞ্জে পুঞ্জে 'পিঢ়া' সাজান আছে বলিয়া তাহার পারিভাষিক বর্ণনাও অন্যরূপ। ৫,৬ বা ৭ পিঢ়ার এক পুঞ্জকে এক 'পাটল' বলে (সং, পটল= অধ্যায়।) ২ পোটলের মধ্যে খাড়া দেওয়ালকে বেকি বলে। ১, ২ বা ৩ পোটলের সমষ্টিকে রেখ গণ্ডির অনুকরণে 'ভদ্র গণ্ডি' বলে। তাহার উপর বেকি ঘণ্টা বসে। ঘণ্টার মধ্যে কপুরি, আঁলা প্রভৃতি ক্ষুদ্রতর বিভাগ আছে। অতএব এ ক্ষেত্রেও মন্দিরের পিছনে মানুষের ধারণার (concept) পরিচয় পাই। কিন্তু এক্ষেত্রে 'গণ্ডির' (দেহের মধ্যভাগ) মধ্যে ২।১ টী 'বেকি' (গলা) আসিয়া পড়ায় মানুষের পরিকল্পনা তত সূক্ষ্মভাবে খাটে নাই দেখা যাইতেছে।

(৩) মন্দিরে দেওয়ালে যে সব রথ (pilasters) দেখা যায় তাহাদের নাম মধ্যরথ, উপরথ, অনুরথ, পরিরথ প্রভৃতি। ইহার মধ্যে রথের ধারণা স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিয়াছে। (আজকাল এই সকল নামের পরিবর্ত্তে রাহা, অনুরাহা, অনুরথ, পরিরথ প্রভৃতি নাম ব্যবহার হয়। শিল্প শাস্ত্রে উভয় নামগুচ্ছের ব্যবহার দেখা যায়।)

(৪) সময়ে সময়ে কোন কোন রথে ছোট আকারের রেখ-দেউলের প্রতিকৃতি থাকে। এগুলিকে 'শিখর' বলে। যখন শিখরগুলি অপেক্ষাকৃত বড় আকারের হয়, তখন সমস্ত মন্দিরটীকে অনেক শৃঙ্গযুক্ত (শিখর) পাহাড়ের মত দেখায়। ইহা ছাড়া কোণের রথে কতকগুলি ছোট বিভাগ করা হয়, (চিত্র দেখুন), এগুলিকে যথাক্রমে প্রথম ভূমি, দ্বিতীয় ভূমি, তৃতীয় ভূমি বলে। যে মন্দিরে ভূমির সংখ্যা যত বেশী, তাহার বেশী উচ্চ হওয়ার সম্ভাবনাও তেমনই বেশী।

(৫) ভুবন প্রবেশে একটী পদ আছে "সিখর হীন প্রসাদং। ঈতরজন যথা মহা।" (২০ পৃঃ) অর্থাৎ ইতর লোক যেমন মহান লোক বলিয়া পরিচয় দিয়া নিন্দার পাত্র হয়, যে প্রাসাদের (মন্দির) শিখর নাই, তাহার অবস্থাও ঠিক তেমনই হয়। বাস্তবিক শিল্পীদের মধ্যে ও শিল্প শাস্ত্রে কোথাও কোথাও শিখরবিহীন প্রাসাদকে 'নপুংসক' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

সারকথা—আমরা এতক্ষণ মন্দিরের বর্ণনায় ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের বিচার করিলাম। এখন সবগুলিকে চোখের সামনে রাখিলে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই মন্দিরের পরিকল্পনার পিছনে তিনটী ধারণা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রথম মন্দির ও রথ এক ;

দ্বিতীয়, মন্দির একটী মানুষ বিশেষ ;

তৃতীয়, পাহাড়ের সহিত তাহার তুলনা করা চলে।

এই ত' গেল পরিকল্পনার কথা। এই বারে দ্বিতীয় প্রস্তাব।

মন্দিরের জাতি বিভাগের প্রণালী

রেখদেউলের যে চিত্রটী দেওয়া হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিলে বুঝা যাইবে যে

মন্দিরের দেওয়াল সাধারণ বাড়ীর দেওয়ালের মত সমান উঠে নাই। মাঝখানে কিছু অংশ অবশিষ্ট অংশ হইতে মেলিয়া আসিয়াছে। তাহার পর আবার মাঝের অংশ হইতে আবার কিছু অংশ আরও মেলিয়া আসায় মন্দিরের প্রত্যেক দিক সবশুদ্ধ পাঁচটী রথের (pilasters) সমষ্টি হইয়াছে। এইরূপে ত্রিরথ, সপ্তরথ, নবরথ দেউল হওয়াও সম্ভব। ত্রিরথ দেউলকে শূদ্রজাতীয়, পঞ্চরথ দেউলকে বৈশ্যজাতীয়, সপ্তরথ দেউলকে ক্ষত্রিয় জাতীয় ও নবরথ দেউলকে ব্রাহ্মণজাতীয় বলা হয়। উড়িষ্যার একরথ দেউল অতি কদাচিৎ দেখা যায়, কিন্তু যে দুইখানি শিল্পশাস্ত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে একরথ দেউলের কথা একেবারেই নাই। যতগুলি মন্দিরের বর্ণনা পুঁথিতে দেওয়া হইয়াছে, তাহারা প্রত্যেকেই এই চারি জাতির একটীর অন্তর্গত।

মোটামুটী এইরূপ জাতি বিভাগের পর, নিম্নলিখিত বিষয়পরম্পরের মধ্যে প্রভেদ আনিয়া বিভিন্ন উপজাতির সৃষ্টি হয়

(১) তাহাদের বিভিন্ন রথের প্রস্থের অনুপাতে পার্থক্য ;

(২) তাহাদের শিখরের সংখ্যায় পার্থক।

উপজাতির মধ্যে আর কোনো মূলগত প্রভেদ নাই। সকল রেখদেউলেরই উপর হইতে নীচের বিভাগগুলি (horizontal components) সমান। অর্থাৎ যে কোন মন্দিরের গর্ভ (যে ঘরে বিগ্রহ থাকেন) ১০ হাত দীর্ঘ প্রস্থ হইলে, তাহার পাদভাগ ৬০ আঙ্গুল, তাহার জাংঘ ৫০ আঙ্গুল ইত্যাদি হইবে। তবে কোন রেখ দেউলের সম্মুখে ভদ্র দেউল করিতেই হইবে, আবার কোনটীর সম্মুখে ভদ্র দেউল করিতে নাই।

এইরূপে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৪২ রকমের মন্দিরের বর্ণনা উভয় পুঁথিতে আছে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এমন সন্দেহ হইবার কারণ আছে যে পূর্ব্বে মাত্র ৩৬ রকম প্রাসাদের প্রচলন ছিল। হয়ত সময়ক্রমে বা ভুলক্রমে (নামের উচ্চারণে দোষের জন্য) তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। যাহাই হউক, কতকগুলি মন্দিরের নাম দেওয়া হইল। নাম করণে যথেষ্ট রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। মেরু, মন্দর, কৈলাস, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, ভদ্র, মহাদ্রবিড়া, চিত্রকুট, সুবর্ণকুট, হংস, গরুড়, মেদিনীবিজয়, রত্নসার, মাধবী, বসন্ত ইত্যাদি।

ভদ্র দেউল—এতক্ষণ আমরা প্রধানতঃ রেখদেউল লইয়াই ব্যস্ত ছিলাম। বাস্তবিক শিল্পশাস্ত্রের মধ্যেও তাহাই হইয়াছে। শিল্পশাস্ত্রে ভদ্র দেউলের স্থান তত উন্নত নয় এবং সর্ব্বসমেত মাত্র ৫ রকম ভদ্র দেউলের সন্ধান পাওয়া যায়। ভদ্র দেউলের পরিকল্পনার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এখন কেবল রেখ দেউলের সহিত তাহাদের অনুপাতের সম্বন্ধ ও তাহাদের জাতি বিভাগের প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ করিব।

যদি রেখ দেউলের গর্ভ ১ হাত (১৬ আঙ্গুল) দীর্ঘপ্রস্থ হয়, তবে তাহার বাহিরের মোট উচ্চতা ৫ হাত হইবে বলিয়া শাস্ত্রে বিধি আছে (কিন্তু তথ্যের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়।) তাহার সম্মুখে যে ভদ্র দেউল থাকিবে তাহার গর্ভ ১¼ হাত (২০ আঙ্গুল) ও বাহিরের মোট উচ্চতা ৩¾ হাত (৬০ আঙ্গুল) হইবে।

ভদ্র দেউলে এক পোটল পিড়া থাকিতে পারে, দুই পোটল থাকিতে পারে, অথবা তিন পোটল থাকিতে পারে। রেখদেউল সাধারণতঃ' যেমন একরথ হয় না, ভদ্র দেউলও তেমনি হয় না, মধ্যের রথ কিছুদূর মেলিয়া আসে। তাহার উপর শোভাবৃদ্ধির জন্য একটী ক্ষুদ্র আকারের 'ঘণ্টা' বসান হয়। চিত্রটী দেখিলে বুঝা যাইবে যে ভদ্র দেউলে মাত্র একটী পোটল থাকিলে চারিদিকে মধ্যরথে চারটী ছোট ঘণ্টা ও প্রধান বড় ঘণ্টাটী লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ ঘণ্টা হয়। এরূপ ভদ্র দেউলকে সাধারণতঃ 'পঞ্চ ঘণ্টা ভদ্র' বলে। যদি এক পোটলের পরিবর্ত্তে দুই পোটল থাকে, তবে সর্ব্বসমেত নয় ঘণ্টা হয় এবং দেউলকে 'নবঘণ্টা ভদ্র' বলে। এইরূপ 'ত্রয়োদশ ঘণ্টা ভদ্র' হইতে পারে। ইহার বেশী আর কোন সূক্ষ্ম উপজাতিবিভাগের প্রণালী ভদ্র দেউল সম্বন্ধে প্রচলিত নাই। অবশ্য রেখ দেউলের মত ভদ্র দেউলও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতীয় হইয়া থাকে।

উপসংহার—অতএব আমরা মোটের উপর দেখিলাম যে উড়িয়া মন্দিরের পরিকল্পনার মধ্যে ব্যবস্থা আছে এবং তাহাদের জাতি বিচারের প্রণালী ন্যায়সঙ্গত।

আমাদের সাধারণ বাঙ্গালী বাড়ীর পরিকল্পনায় 'সুবিধা' ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য থাকে না। তবে নিতান্ত অসুন্দর দেখাইবে বলিয়া গ্রীক থাম, ভিনীশিয় জানালা প্রভৃতি জুড়িয়া দিয়া একটী বিচিত্র ছন্দোবিহীন রচনা তৈয়ারী হয়। কোন বাড়ী দেখিতে ক্যাশ-বাক্সের মত, কোনটী বা স্বর্গে উঠিবার ভাঙ্গাচোরা ধাপের মত দেখিতে হয়। কিন্তু উড়িয়া মন্দিরের রচনা এইরূপ বেরসিক রচনা নয়। তাহার পিছনে ধারণার একটী ঐক্য আছে এবং এইজন্য মন্দিরের উপর যে সব অলঙ্কার, মূর্ত্তি প্রভৃতি বসান হয়, তাহাদের অবস্থিতি প্রধান ছন্দের সহিত ঠিক জুড়িয়া দেওয়া যায়। ইহার ফলে সমস্ত মন্দিরে যে ভাবগত ঐক্য আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে, তাহাতে সমস্ত রচনাটী পরিপুষ্ট ও সুন্দর বোধ হয়।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু।

পুস্তকপরিচয়

মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র। শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ এম, এ, বিরচিত। মূল্য দুই টাকা।

এ দেশে মহৎ লোকদিগের জীবনচরিতের উপাদান সংগ্রহ করা নিতান্ত সহজ নহে। এ জন্য জীবনচরিত রচনা করাও অতিশয় কঠিন কার্য্য। সুলেখক মন্মথ বাবু এই কঠিন কার্য্যেই হস্তার্পন করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া, কবি হেমচন্দ্র, মহাভারতের অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির জীবনচরিত রচনা করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার প্রণীত "মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র" প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই গ্রন্থখানি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। লেখক উদারচিত্ত, তাঁহার ভাষা সুমিষ্ট, তিনি অর্থব্যয় করিয়া অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির ছবি এই গ্রন্থে মুদ্রিত করিয়াছেন। এই সকল কারণে লেখকের গ্রন্থখানি অতিশয় মনোজ্ঞ হইয়াছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি, বি, এ, কর্ত্তৃক বিরচিত। মূল্য ১৲ টাকা। আমরা এই গ্রন্থখানি পড়িয়া সুখী হইয়াছি। লেখক সরল ভাষায় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ভিত্তি, "মামেকং শরণং ব্রজ," "ঈশ্বর মঙ্গলময়" প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের সকল স্থানেই এই সকল আলোচনা যে আশানুরূপ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু তবুও বইখানি পড়িয়া শিক্ষালাভ করা যায় উপকার পাওয়া যায়, গ্রন্থের প্রথমেই শ্রদ্ধেয়া কবি কামিনী রায়ের লিখিত একটি ভূমিকা মুদ্রিত করা হইয়াছে। সেই ভূমিকাটি অতিশয় চিত্তাকর্ষক।

সূচী

ক্যালকাটা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌,—৬৫ নং সার্পেণ্টাইন লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নব্যভারত

দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড] পৌষ, ১৩৩১ [৯ম সংখ্যা

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

চতুর্থ অধ্যায়

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

এখন ফিউড্যালিজ্‌মের দ্বিতীয় পরিণামের বিষয় আলোচনা করা যাক। ফিউড্যালিজ্‌মের সম্পর্কে আসিয়া মানুষের পারিবারিক জীবন, পারিবারিক সম্বন্ধ যে নূতন আকার ধারণ করিল, তাহার প্রভাব সাধারণতঃ উপেক্ষিত হইলেও নিতান্ত সামান্য নহে।

এ পর্যান্ত যত প্রকারের পরিবার-শাসনপদ্ধতি দেখা গিয়াছে, সেগুলির দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করা যাউক। প্রথমতঃ বাইবেল ও প্রাচ্যগ্রন্থাদিতে যে পিতৃতন্ত্র (patiarchal) পরিবারের আদর্শ পাওয়া যায় তাহাই ধরা যাউক। এ জাতীয় পরিবার এক বৃহৎ সমাজ-বিশেষ। এক একটি পরিবার লইয়া এক এক জাতি (tribe)। কুলাধিপতি এই বৃহৎ পরিবারের মধ্যে তাঁহার পুত্রকন্যা জ্ঞাতিগোষ্ঠী দাসদাসী লইয়া একত্র বাস করেন। তিনি যে শুধু তাহাদিগের সহিত একত্র বাস করেন তাহা নহে, অর্থানর্থ, বৃত্তিব্যসন, জীবনযাত্রা সকল বিষয়েই তাঁহার সহিত তাহাদের কোন প্রভেদ নাই। আব্রাহমের কথা ভাবুন, পাট্রিয়ার্কদের কথা ভাবুন, আধুনিক কালের আরবদলপতিদিগের কথা ভাবুন, সর্ব্বত্রই কি এই এক চিত্র দেখা যায় না?

ক্লান্‌-পদ্ধতি বা গোষ্ঠীপদ্ধতি বলিয়া আর এক ধরণের পরিবার দেখা যায়। আয়র্লণ্ডে ও স্কটল্যাণ্ডে এই পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায়। সমগ্র ইউরোপেই বোধ হয় অধিকাংশ পরিবার এই ক্লানপদ্ধতির মধ্য দিয়া আসিয়াছে। এ পদ্ধতির মধ্যে কুলাধিপতি ও সাধারণ জনগণের মধ্যে একটা বৃহৎ পার্থক্য দেখা যায়। তাহাদের জীবনযাত্রা একরূপ নহে। অধিকাংশ লোক কৃষিকার্য্য ও দাসত্ব করিত; সর্দ্দারের কোন কাজ ছিল না, তিনি ছিলেন যুদ্ধপ্রিয়। অথচ তাহারা সকলেই একবংশের সন্তান, সকলের কৌলিক নাম এক; এবং জ্ঞাতিত্ব, প্রাচীন

কুলপদ্ধতি, প্রাচীন কুলগৌরব, প্রভৃতি দ্বারা একসূত্রে গ্রথিত থাকায় ক্লান্‌ভুক্ত সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে একপ্রকার সাম্যও দেখা যাইত।

ইতিহাস হইতে এই দুইটি প্রধান পারিবারিক পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু এর মধ্যে কি ফিউড্যাল্ পরিবারের পরিচয় পাওয়া গেল? অবশ্যই গেল না। প্রথমে মনে হয় ফিউড্যাল পরিবারের সহিত "ক্লান"-পদ্ধতির পরিবারের বুঝি কিছু সম্বন্ধ আছে। কিন্তু দুইএর মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্য অনেক অধিক। ফিউড্যাল্ ভূস্বামী যে ক্ষুদ্র জনসমাজ-দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বাস করেন, তাহাদের সহিত তাঁহার বংশগত কোন সম্পর্কই নাই। তাহারা তাঁহার কৌলিক নামধারণ করে না। তাঁহার জীবনযাত্রাও বৃত্তির সহিত তাহাদের জীবনযাত্রা ও বৃত্তির কোন সাদৃশ্য নাই, তাঁহার কোন কার্য্য নাই; তাহারা শ্রমজীবী। ফিউড্যাল্ পরিবার ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ; ইহার গণ্ডী বিস্তৃত হইয়া জাতিপর্য্যন্ত পৌছায় না। স্ত্রী ও পুত্রকন্যা লইয়াই এই পরিবারের গঠন; অবশিষ্ট জনসমাজ হইতে পৃথক হইয়া দুর্গের সঙ্কীর্ণ পরিবার মধ্যেই এই পরিবারের জীবনযাত্রা। দাস ও উপনিবেশিকবর্গ এ পরিবারের অন্তর্গত নহে, কারণ তাহাদের উদ্ভব স্বতন্ত্র, পদমর্য্যাদাহিসাবে তাহাদের সহিত এ পরি-বারের পার্থক্য অপরিমেয়। চারিদিকের সমাজ হইতে স্বতন্ত্র ও উচ্চপদস্থ পাচ ছয়টি ব্যক্তি লইয়া ফিউড্যাল পরিবারের গঠন। এবং এই গঠনবৈশিষ্ট্য জন্য ইহার প্রকৃতির মধ্যেও একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এ পরিবার সঙ্কীর্ণ ও কেন্দ্রীভূত; কাহাকেও ইহারা বিশ্বাস করিতে পারে না; নিজেদের অনুচরবর্গের হস্ত হইতেও আত্মরক্ষা করিবার জন্য ইহাদিগকে সতত প্রস্তুত থাকিতে হইয়াছে। এরূপ পরিবারপদ্ধতিতে পরিবারের আভ্যন্তরীণ জীবন, পারিবারিক আচারব্যবহার অবশ্যই পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। এ কথা অবশ্য মানি যে ফিউড্যাল ভূস্বামীর উদ্দামপ্রবৃত্তির পাশবতা, অনবরত যুদ্ধবিগ্রহ ও মৃগয়াতে কালক্ষেপ—ইহা পারিবারিক শিষ্টাচার বিকাশের পক্ষে একটা প্রকাণ্ড বাধাস্বরূপ ছিল। কিন্তু এ বাধা অনতিক্রম্য ছিল না। গৃহস্বামী মৃগয়া ও যুদ্ধের অবকাশে সচরাচর গৃহেই ফিরিতেন। সেখানে আসিয়া সর্ব্বদাই স্ত্রীপুত্রকন্যাকে দেখিতে পাইতেন, এবং অনেক সময় কেবল মাত্র তাহাদিগকেই দেখিতে পাইতেন; ইহাদিগকে লইয়াই তাঁহার স্থায়ী সমাজ, ইহাদিগের সহিতই তাঁহার স্থায়ী সংসর্গ, ইহারাই কেবল তাঁহার সুখ দুঃখ ভাগ্যাভাগ্যের অংশী। কাজে কাজেই পারিবারিক জীবন পরিপুষ্ট ও প্রভাববান হইয়া উঠিল। ইহার প্রচুর প্রমাণ আছে। ফিউড্যাল্ পরিবারের মধ্যেই কি স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল না? প্রাচীন কালে যে যে সমাজে পারিবারিক জীবন প্রাধান্যলাভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোথাও ফিউড্যাল সমাজের মত স্ত্রীজাতির প্রভাবগৌরব স্বীকৃত হয় নাই। ফিউড্যাল্ সমাজের মধ্যে পারিবারিক শিষ্টাচার বিকশিত ও প্রভাবশালী হইয়া উঠিল বলিয়াই স্ত্রীজাতির পদমর্য্যাদার এই উন্নতি সম্ভব হইল। কেহ কেহ প্রাচীন জার্ম্মাণদিগের বিশিষ্ট আচারব্যবহারের মধ্যে স্ত্রীজাতির এই উন্নতির মূল দেখিতে পান, কারণ জার্ম্মাণ জাতি অরণ্যবাসকালেই নাকি স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। টাসিটসের একটি উক্তির উপর নির্ভর করিয়া জার্ম্মাণ স্বাদেশিকতা স্ত্রীপুরুষের পরস্পরসম্বন্ধবিষয়ে জার্ম্মাণ আচার যে

আদিমকাল হইতে পবিত্র ও গরীয়ান্ এইরূপ একটা ধারণা গড়িয়া তুলিয়াছে। এ কেবল কল্পনার কথা। জার্ম্মাণদিগের আচারব্যবহার সম্বন্ধে টাসিটসের যে উক্তি, তদনুরূপ শত শত উক্তি বহু পর্য্যটক অসভ্য ও বর্ব্বর জাতিদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন। ইহাতে প্রাচীনকালোচিত সরলতার কিছুই নাই, বিশেষ কোন জাতির বৈশিষ্ট্যও কিছুই নাই। সমাজে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবার ফলেই পারিবারিক শিষ্টাচারের উন্নতি ও প্রভাববৃদ্ধি হইতেই ইউরোপে স্ত্রীজাতির মর্য্যাদার উদ্ভব; এবং এই শিষ্টাচারের বিকাশ অতি অল্পকালের মধ্যেই ফিউড্যাল্ পদ্ধতির একটা প্রধান বিশেষত্ব হইয়া উঠিল।

ফিউড্যাল্ সমাজে পারিবারিক জীবনের প্রাধান্যের আর একটি নিদর্শন পাওয়া যায়। কুলপারম্পর্য্যবোধ ফিউড্যালিজমের একটি বিশেষ ধর্ম্ম। পারিবারিক ভাবের মধ্যেই এই কুলস্থিতির আদর্শ জড়িত হইয়া আছে। কিন্তু এ আদর্শটি ফিউড্যালিজ্মের আশ্রয়ে যেমন সতেজ ও পরিপুষ্ট হইল তেমন আর কোথাও হয় নাই। ফিউড্যাল্ পদ্ধতির ভিত্তিস্বরূপ যে ভূসম্পত্তি, সেই ভূসম্পত্তির বিশেষ প্রকৃতি হইতেই এই বংশপারম্পর্য্য, বংশস্থিতি আদর্শের উদ্ভব। ফীফ্ বা ফিউড্যাল্ সম্পত্তি অন্যান্য সম্পত্তি হইতে ভিন্ন প্রকৃতির। ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য, চারিদিকের ভূস্বামি সমাজের মধ্যে ইহার মান মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অনবরত একটি কর্ত্তৃশক্তির প্রয়োজন ছিল। তাহার ফলে ভূস্বামী ভূসম্পত্তি এবং ঐ সম্পত্তির ভবিষ্যৎ অধিকারীপরম্পরা সকলে মিলিয়া এক বলিয়াই বিবেচিত হইত।

এই সকল কারণে ফিউড্যাল সমাজের পারিবারিক বন্ধন আরও দৃঢ় ও সবল হইয়া উঠিল।

এখন ভূস্বামীর আবাস হইতে বাহির হইয়া নিম্নভূমিস্থ ক্ষুদ্র উপনিবেশটির মধ্যে প্রবেশ করা যাউক। এখানে সমস্তই অন্যবিধ। মানুষের স্বভাবের মধ্যেই এমন একটা মঙ্গলের বীজ নিহিত আছে যে যে কোন প্রকারের সমাজব্যবস্থার মধ্যে মানুষ মানুষের সন্নিহিত হইয়া বাস করিলেই—তা সে সন্নিধান যতই অসম্পূর্ণ হউক না কেন—কিছুকাল পরে পরস্পরের মধ্যে একটা ভাবের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে, দয়াদাক্ষিণ্য প্রীতি আশ্রিতবাৎসল্যের ভাব ফুটিয়া উঠে। ফিউড্যাল্ ব্যবস্থার মধ্যেও ঐরূপ ঘটিয়াছিল। নিম্নভূমির ঔপনিবেশিক্-বর্গের সহিত দুর্গবাসী ভূস্বামীর মধ্যে অবশ্যই কিয়ৎকালের মধ্যে কতকগুলি নৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। কতক পরিমাণে প্রীতিসৌহার্দ্দ্যের আদানপ্রদান চলিয়াছিল। কিন্তু এ ব্যাপার সমাজব্যবস্থার গুণে সংঘটিত হয় নাই, সমাজব্যবস্থার বৈষম্যসত্ত্বেই ঘটিয়াছিল। শুদ্ধ সমাজব্যবস্থাহিসাবে বিচার করিতে গেলে এ সমাজের ব্যবস্থা কখনই অনুমোদন করা যায় না। ভূস্বামী ও দাসবর্গের মধ্যে বাস্তবিক পক্ষে কোনই নৈতিক আদান প্রদানের সম্বন্ধ ছিল না; তাহারা তাঁহার সম্পত্তির অংশমাত্র ছিল; তিনি তাঁহাদের ষোল আনা মালিক ছিলেন। একাধারে তিনি রাজা, প্রভু ও স্বত্বাধিকারী। তিনি আইন করিতে পারেন, কর বসাইতে পারেন, দণ্ড দিতে পারেন। আবার দান বিক্রয়ও করিতে পারেন। তাঁহার ক্ষমতা অপ্রতিহত; তাঁহার সম্মুখে এমন কোন অধিকার, এমন কোন বিধিবিধান,

এমন কোন সমাজ শাসনের ব্যবধান ছিল না যাহা তাঁহার শক্তির কবল হইতে এই দাসসমাজকে রক্ষা করিতে পারে।

আমার মনে হয় এই কারণেই সর্ব্বকালে জনসাধারণ ফিউড্যাল প্রথা ও ফিউডালিজ্মের নিদর্শন মাত্রেরই প্রতি গভীর বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকে। একেশ্বরতন্ত্র অত্যাচারী হইলেও মানুষ তাহা সহ্য করিয়াছে, তাহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, তাহার শাসনে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, এমন কি স্বেচ্ছাচার তাহাকে বরণ করিয়া লইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। রাজতন্ত্র ও যাজকতন্ত্র যথেচ্ছচারী হইয়াও অনেক সময় জনসমাজের সম্মতি, এমন কি প্রীতিও লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই ফিউড্যাল্ একেশ্বরতন্ত্র চিরকালই লোকের ঘৃণাভাজন ও বিদ্বেষভাজন হইয়া আসিয়াছে। সে লোকসমাজের ভাগ্যনিয়ন্তা হইতে পারে। কিন্তু লোকের আত্মার উপর সে প্রভাববিস্তার করিতে পারে নাই। ইহার কারণ এই যে রাজতন্ত্র ও যাজকতন্ত্র সমাজে রাজা বা পোপ্ এমন কতকগুলি তত্ত্বের দোহাই মানিয়া শক্তি চালনা করেন যাহার নিকট রাজা প্রজা উভয়েই মাথা হেট করেন। রাজশক্তি সেখানে এক উচ্চতর শক্তির প্রতিনিধি, সে হয় ভগবানের নামে না হয় কোন বড় তত্ত্বের নামে আজ্ঞা প্রচার করে, দণ্ডপুরস্কার বিধান করে, তাহার শাসন শুদ্ধমাত্র মানুষের দ্বারা মানুষের শাসন নহে। ফিউড্যাল একেশ্বরতন্ত্রের প্রকৃতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহা এক মানুষের উপর আর এক মানুষের আধিপত্য; একটি মানুষের ব্যক্তিগত যথেচ্ছাচারী ইচ্ছাশক্তির অখণ্ড আধিপত্য। মানুষের পক্ষে এটা গৌরবের কথা যে সে আর সর্ব্বপ্রকার অত্যাচারীর আধিপত্য স্বীকার করিতে পারে, কিন্তু এরূপ নিছক ব্যক্তিমানবের খেয়ালি শাসন সে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইবে না। যখনই সে দেখে যে তাহার শাসক শুদ্ধ একটি মানুষ মাত্র, যে ইচ্ছাশক্তি তাহাকে দমাইয়া রাখিতেছে তাহা শুদ্ধ মাত্র তাহাদেরই মত একটি মানুষের ব্যক্তিগত খেয়াল, তাহার মন তখন বিদ্রোহী হইয়া উঠে, সে সক্রোধ বিক্ষোভের সহিত সে শাসনভার বহন করে। ফিউড্যাল্ শাসনশক্তির ইহাই প্রকৃত পরিচয়; এবং তাহার বিরুদ্ধে চিরকাল ধরিয়া যে বিদ্বেষের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, এই হইল তাহার মূল কারণ।

ফিউড্যাল তন্ত্রের সঙ্গে যে ধর্ম্মের সংযোগ ঘটিয়াছিল তাহাতে তাহার শাসনভার কিছুমাত্র লঘু হয় নাই। আমার মনে হয় না যে পূর্ব্ববর্ণিত ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে যাজকের প্রভাব খুব বেশী ছিল এবং নিয়ভূমির দাসবর্গের সহিত ভূস্বামীর সম্বন্ধ বিধিবদ্ধ ও ন্যায়সঙ্গত করিয়া তুলিতে তিনি যে কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহাও মনে হয় না। খৃষ্টীয় চর্চ যে ইউরোপীয় সভ্যতার উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা নিশ্চয়, কিন্তু এ প্রভাব সাধারণ ভাবে কাজ করিয়াছিল, মানুষের মনের গতি খানিকটা পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিল, সমাজের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিধিবিধান অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান আচার ব্যবহারে ধর্ম্ম ও ন্যায়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। এ ক্ষুদ্র ফিউড্যাল সমাজের একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে ভূস্বামী ও দাসবর্গের মধ্যস্থ হিসাবে যাজকের প্রভাব অতি সামান্যই ছিল। অধিকাংশ স্থলে তিনি নিজেই দাস সমাজের মত দাসভাবাপন্ন ও শিক্ষাসৌজন্যবর্জ্জিত

ছিলেন, সুতরাং ভূস্বামীর দর্পদম্ভ প্রতিরোধ করিবার মত তাঁহার সামর্থ্যও ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। অবশ্য ঐ নিম্ন সমাজের মধ্যে নৈতিক ও ধর্ম্ম জীবনের পুষ্টি ও সংরক্ষণে নিযুক্ত থাকিতে হইত বলিয়া অনেক স্থলেই তিনি ঐ সমাজের প্রীতি আকর্ষণ ও কল্যাণ সাধন করিতে পারিয়াছিলেন; ঐ সমাজের মধ্যে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে আশ্বাস ও জীবনীশক্তি সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁহার যজমানদের ঐহিক ভাগ্যের উন্নতি বিধান পক্ষে তাঁহার সামর্থ্যও ছিল না তিনি কিছু করেনও নাই।

এখন আমরা ফিউড্যাল সমাজের মূল মূর্ত্তির পরিচয় পাইলাম। ভূস্বামী, তাঁহার পরিবার ও তাঁহার দাসানুচরবর্গের উপর এই সমাজ গঠনের প্রভাব কিরূপভাবে কাজ করিয়াছে, তাহাও দেখা গেল। এখন এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে যাওয়া যাউক। এক এক ভূস্বামীর মহালভুক্ত সকল অধিবাসীই যে ভূমি অবলম্বন করিয়া বাস করিত তাহা নহে;—এ সমাজের বাহিরে এমন অনেক অনুরূপ বা ভিন্নরূপ সমাজ ছিল যাহাদের সহিত ভূস্বামীর মহালের সম্বন্ধ ছিল। এই যে বাহিরের বৃহৎ সমাজ সভ্যতার উপর তাহার প্রভাব কিরূপ তাহা বুঝা আবশ্যক।

এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমি একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিব। ভূস্বামী ও যাজক উভয়েই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বাহিরের বৃহৎ সমাজের সহিত যুক্ত ছিলেন। দুর্গ ও মহালের বাহিরে ও দূরে তাঁহাদের অনেক সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু ঐ দাস সমাজ, ঔপনিবেশিক সমাজের পক্ষে এ কথা বলা যায় না। এই যুগে দেশের অধিবাসীসমূহ বুঝাইতে যখনই আমরা "জন-সমাজ" বা "প্রজাবর্গ" বা এরূপ কোন সাধারণ আখ্যার প্রয়োগ করে তখনই আমরা একটা ভুল করিয়া বসি, কারণ "জনসমাজ" বলিয়া তখন সাধারণ লোকের দেশব্যাপী কোন সমাজ ছিল না। এক এক ভূস্বামীর মহালভুক্ত দাস ও শ্রমজীবি লইয়া এক একটি স্বতন্ত্র স্থানীয় সমাজ। মহালের বাহিরে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাহাদের পক্ষে কোন বৃহৎ সাধারণ নিয়তি ছিল না; দেশ বলিয়া তাহাদের কিছুই ছিল না; তাহাদিগকে লইয়া একটা দেশব্যাপী জনসমাজ গড়িয়া উঠে নাই। যখনই আমরা সমগ্রভাবে বৃহৎ ফিউড্যাল সমাজের কথা বলি তখন তাহাতে ভূস্বামী সমাজ লক্ষ্য করা হয়।

এখন দেখা যাউক পূর্ব্ববর্ণিত ক্ষুদ্র ফিউড্যাল সমাজের সহিত বাহিরের বৃহৎ সমাজের কি সম্পর্ক ছিল, এবং এই সম্পর্কের ফলে সভ্যতার গতি প্রকৃতিই বা কিরূপে নিয়মন্ত্রিত হইল।

ফিউড্যাল ভূসম্পত্তি বা ফীফের অধিকারীদিগের মধ্যে পরস্পর কিরূপ বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধ ছিল, তাহা অবশ্য আপনারা অবগত আছেন। নিম্ন স্তরের অধিকারী উচ্চ স্তরের অধিকারীকে যুদ্ধাদিকালে নিজের বাহুবল ও লোকবলের দ্বারা সাহায্য করিবেন, উচ্চাধিকারী তেমনি নিম্নাধিকারীকে বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন ও আশ্রয় দিবেন—এই হইল পরস্পরের মধ্যে সর্ত্ত। এই সর্ত্তগুলির বিশেষ বিচার এখানে আবশ্যক নাই। সেগুলি কি ধরণের ছিল সে সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা থাকিলেই যথেষ্ট। এখন এই সমস্ত সর্ত্তবন্ধন ও দায় বন্ধনের একটা ফল অবশ্যম্ভাবী। ইহার ফলে প্রত্যেক ভূস্বামীর চিত্তে কর্ত্তব্যবোধ, প্রীতিসৌহার্দ্দ্য প্রভৃতি কতকগুলি নৈতিকভাব ফুটিয়া উঠিল। একথা সর্ব্বজনবিদিত যে এই

যুগে ফিউড্যাল ভূস্বামীবর্গের মধ্যে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, আত্মসমর্পণ, সত্যরক্ষা ও এতৎসদৃশ ভাব-সমূহের যথেষ্ট বিকাশ ও পুষ্টি সাধিত হইয়াছিল।

এই সকল দায়, কর্ত্তব্য ও মনোভাব ক্রমশঃ বিধি-প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হইতে চেষ্টা করিয়াছিল। ফিউডাল ভূস্বামীর নিকট হইতে তাঁহার উপরিতন ভূস্বামী কি কি সাহায্য পাইবার অধিকারী; নিম্নতন ভূস্বামীই বা তৎপরিবর্ত্তে কিরূপ সাহায্য দাবী করিতে পারেন; নিম্নাধিকারী উচ্চাধিকারীকে কোন্ স্থলে অর্থ সাহায্য করিতে বাধ্য, কোন্ স্থলেই বা সামরিক সাহায্য করিতে বাধ্য; উচ্চাধিকারী যখন নিম্নাধিকারীর নিকট মূল সর্ত্তের অতিরিক্ত সাহায্য চান, তখন কি কি আকারে তাঁহার সম্মতি লইবেন—এই সমস্ত বিষয় ফিউড্যালিজ্‌ম্ আইনে বাঁধিয়া দিতে চাহিয়াছিল একথা সকলেই জানেন। এইরূপে এমন একটা ফিউড্যাল্ ব্যবহার-পদ্ধতি গড়িয়া উঠিতে লাগিল যাহার সাহায্যে উচ্চাধিকারী তাঁহার অধীনস্থ ভূস্বামীবর্গের মধ্যে দাবীদাওয়া লইয়া সমস্ত বিবাদবিসম্বাদ মীমাংসা করিয়া দিতে পারিতেন। এইরূপে বড় বড় ভূস্বামীগণ প্রত্যেকে তাঁহার অধীনস্থ ভূস্বামীবর্গের সম্পত্তি গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে পার্লামেণ্ট বা মন্ত্রণাসভার আহ্বান করিতেন। এক কথায় রাজনীতি আইন ও যুদ্ধব্যাপার সম্পর্কিত এমন কতকগুলি উপায় ছিল যাহার সাহায্যে ফিউড্যাল্ সম্বন্ধগুলিকে সুসম্বদ্ধবিধি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। কিন্তু এই সমস্ত বিধি অধিকার ও প্রতিষ্ঠানের কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না, তাহাদের স্থিতির কোন স্থিরতা ছিল না।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই স্থিতির স্থিরতা আসে কোথা হইতে? যদি সমাজের মধ্যে প্রতিনিয়ত এমন একটা ঐশ্বর্য্যশালী শক্তি জাগিয়া থাকে যে সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির ইচ্ছা ও শক্তিকে বিধিনিয়ন্ত্রিত করিতে সাধারণের অধিকার ও সাধারণের স্বার্থ মানিয়া চলিবার জন্য বাধ্য করিতে ইচ্ছুক ও সমর্থ, তবেই সে সমাজের বিধিব্যবস্থার স্থিতির একটা স্থিরতা থাকে।

সমাজের কেন্দ্রে এই শক্তি প্রতিষ্ঠা কেবল দুইটি উপায়ে হইতে পারে। হয় এমন একজন ক্ষমতাবান্ ব্যক্তিবিশেষ থাকা চাই যাঁহার ইচ্ছা ও শক্তি এত প্রবল যে অন্য কোন ব্যক্তিই তাহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে না, সে শক্তি আসরে নামিলে সমাজান্তবর্ত্তী অন্য সকল শক্তিই তাহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করে; অথবা জনসাধারণের সম্মিলিত ইচ্ছা ও সম্মিলিত শক্তি হইতে উদ্ভূত এমন একটা সাধারণ সমাজ-শক্তি থাকা আবশ্যক, যাহা সমাজস্থ প্রত্যেক খণ্ড শক্তিকে শাসনে রাখিতে পারে এবং যাহা সকলের নিকট সমানভাবে সম্মানিত হয়।

লোকস্থিতির এই দুই উপায়;—হয় একেশ্বরতন্ত্র নয় জনতন্ত্র। বিভিন্ন শাসনপদ্ধতি আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখিবেন সকল পদ্ধতিই হয় একটির না হয় অপরটির অন্তর্গত।

ফিউড্যাল পদ্ধতিতে কিন্তু এ উভয়ের কোনটিরই স্থান নাই।

অবশ্য ফিউড্যাল ভূস্বামীগণ সকলেই সমান পর্য্যায়ের ছিলেন না। তাঁহাদের

মধ্যে অনেকে এমন ক্ষমতাশালী ছিলেন যে দুর্ব্বলতর ভূস্বামীর উপর অত্যাচার করিতে পারিতেন। কিন্তু সকল ভূস্বামীর উর্দ্ধতন ভূস্বামী যে রাজা তাঁহাকে শুদ্ধ ধরিলেও তাঁহাদের মধ্যে এমন ক্ষমতাশালী কেহই ছিলেন না যিনি অন্যান্য সকল ভূস্বামীর উপর আইন জারী করিতে বা তাঁহাদিগকে বাধ্য করিতে সমর্থ ছিলেন। শক্তি প্রয়োগের যে সমস্ত স্থায়ী উপাদান ও উপকরণ ফিউড্যাল্ সমাজে তাহা ছিল না। স্থায়ী সেনা ছিল না, স্থায়ী কর ছিল না, স্থায়ী ধর্ম্মাধিকরণ ছিল না। যখন আবশ্যক হইত তখন সামাজিক শক্তি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে হইত। প্রত্যেক বিচারের জন্য নূতন করিয়া ধর্ম্মাধিকরণ গড়িতে হইত, প্রত্যেক যুদ্ধের সময় নূতন করিয়া সেনা গড়িয়া লইতে হইত, অর্থ আবশ্যক হইলেই নূতন করিয়া কর বসাইতে হইত। সমস্তই ছিল সাময়িক, আকস্মিক, বিশেষ ব্যবস্থা। একটা স্থায়ী, স্বাধীন কেন্দ্রবর্ত্তী শাসন ব্যবস্থার কোন উপকরণ ছিল না। ইহা সুস্পষ্ট যে এরূপ অবস্থায় কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে আধিপত্য লাভ করা ও সমাজে শৃঙ্খলা ও শক্তি স্থাপন করা অসম্ভব ছিল। এদিকে দমন ও শাসন যে পরিমাণে কঠিন, বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ সেই পরিমাণে সহজ ছিল। নিজের দুর্গমধ্যে আবদ্ধ হইয়া তাঁহারই মত সমপদস্থ ভূস্বামীবর্গের সহজলভ্য সহযোগিতায় যে কোন নিম্নতম ভূস্বামী অতি সহজেই আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন।

অতএব দেখা গেল যে সমাজস্থিতির প্রথম পদ্ধতি অর্থাৎ যাহাতে এক পরাক্রান্ত শক্তির দ্বারা সমাজ শাসিত ও সংরক্ষিত হয়—তাহা ফিউড্যাল সমাজে সম্ভব ছিল না।

আবার ওদিকে জনতন্ত্র পদ্ধতির উদ্ভবও ফিউড্যাল সমাজে সম্ভব ছিল না। ইহার কারণ সুস্পষ্ট। এখনকার কালে আমরা যখন রাষ্ট্রশক্তির কথা বলি, রাষ্ট্রপতির অধিকারের কথা বলি, আইন জারী করিবার, কর বসাইবার, দণ্ড দিবার অধিকারের কথা তুলি তখন আমরা জানি যে এ অধিকার কোন ব্যক্তি বিশেষের একান্ত নিজস্ব নহে, আমরা জানি যে নিজের জন্য নিজের নামে অন্যকে দণ্ডদিবার, অন্যের উপর আইন জারী করিবার অধিকার কাহারও নাই। এসমস্ত অধিকার সমষ্টিভাবে সমগ্র সমাজের নিজস্ব; সমাজের নামেই এসমস্ত অধিকার প্রযুক্ত হয়; সমাজ আবার এসমস্ত অধিকার নিজের কাছ হইতে পায় নাই, সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের নিকট পাইয়াছে। সুতরাং যখন কোন ব্যক্তি বিশেষ এইরূপ অধিকারসম্পন্ন কোন শাসন শক্তির সম্মুখীন হয় তখন তাহার মনের মধ্যে এই ভাবটি অজ্ঞাতসারে জাগিতে থাকে যে সে এমন একটা সার্ব্বজনীন ন্যায্য অধিকারসম্পন্ন শক্তির সম্মুখে আসিয়াছে, যে দৈব-অধিকারের জোরে তাহার উপর আদেশ চালাইতেছে। এইরূপে তাহার মন পূর্ব্ব হইতেই নত হইয়া থাকে। কিন্তু ফিউড্যাল্ সমাজে একেবারে অন্যরূপ ব্যাপার। ভূস্বামী নিজের এলাকার মধ্যে সমস্ত রাজ ক্ষমতার অধিকারী; এসমস্ত অধিকার তাঁহার ভূসম্পত্তির অংশ স্বরূপ, তাঁহার একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি। এখন যে সকল অধিকার রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক অধিকার বলিয়া গণ্য হয়, তখন সেগুলি ছিল ব্যক্তিগত অধিকার। এখন যেসকল ক্ষমতা সমাজের বা রাষ্ট্রের, তখন সেগুলি ছিল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির করতলগত। ভূস্বামী যখন স্বীয় মহালে স্বনামে রাজ ক্ষমতা পরিচালন করিয়া, মাঝে

মাঝে উর্দ্ধতন ভূস্বামীর সম্মুখে পার্লামেন্টে উপস্থিত হইতেন, তখন সেখানেও তিনি লোক সমষ্টির সম্মিলিত শক্তির কোন পরিচয় পাইতেন না ; সে সব পার্লামেন্ট অল্প কয়েকটি লোক লইয়া গঠিত, তাহারাও আবার তাঁহার সমান পদস্থ ব্যক্তি, তাঁহারাও স্ব স্ব এলাকার মধ্যে তাঁহারই মত রাজশক্তিসম্পন্ন, রাজাধিকারভোগী। দেশের রাজকীয় সরকারী প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে সে এমন কিছু গৌরব বা মহিমা সার্ব্বজনীনতা দেখিতনা যাহাতে তাহার শ্রদ্ধা উদ্রেক করিতে পারে। সুতরাং সরকারী ব্যবস্থা মনোমত না হইলেই, সে তাঁহা মানিতে অস্বীকার করিত এবং বিদ্রোহ করিয়া উঠিত।

ফিউড্যাল্ তন্ত্রে বাহুবল দ্বারাই অধিকার বজায় রাখিতে হইত। যাহার যে অধিকার আছে তাহাকে টিকাইয়া রাখিবার জন্য, লোক সমাজে তাহাকে প্রতিষ্ঠান দিবার জন্য, সে কেবলই বাহুবল অবলম্বন করিত। সমাজের কোন প্রতিষ্ঠানই কিন্তু এউপায়ে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিল না। এবং একথাটা সকলে বুঝিত বলিয়াই কেহ কখনও স্বাধিকার সমর্থনের জন্য বিধি প্রতিষ্ঠানের দোহাই দিত না। যদি উর্দ্ধতন ভূস্বামীর বিচারালয় ও নিম্নতন ভূস্বামীদের পার্লামেন্টের কোন যথার্থ প্রভাব থাকিত তাহা হইলে ইতিহাসে আরও বেশী করিয়া তাহাদের উল্লেখ দেখিতে পাইতাম, তাহাদিগকে আরও ক্রিয়াশীল দেখিতে পাইতাম। তাহাদের বিরলতাই তাহাদের অক্ষমতার প্রমাণ।

ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কারণ পূর্ব্ববর্ণিত কারণ ছাড়াও ইহার আর একটা গভীর ও প্রবল কারণ আছে। সর্ব্বপ্রকার শাসন পদ্ধতির মধ্যে ফেডারেশন্ পদ্ধতিই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ঘট। ইহা গড়িয়া তুলিতেও কষ্ট, ইহাকে প্রাধান্য দেওয়াও শক্ত। এব্যবস্থায় প্রত্যেক খণ্ড প্রদেশ ও খণ্ড সমাজকে সমস্ত স্থানীয় ব্যাপারে সম্পূর্ণ শাসনাধিকার দেওয়া হয় ; কেবল সমগ্রদেশের বৃহৎ সাধারণ সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য যেটুকু দরকার সেই পরিমাণ শাসনাধিকার স্থানীয় কেন্দ্রগুলির হাত হইতে সরাইয়া লইয়া সমগ্র রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থলে লইয়া গিয়া একটী কেন্দ্রে শাসনতন্ত্র গড়িয়া তোলা হয়। নৈয়ায়িক হিসাবে এ ব্যবস্থার মত সরল ব্যবস্থা আর কিছুই নাই ; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহার ন্যায় জটীল পদ্ধতি আর কিছুই নাই। স্থানীয় কেন্দ্রগুলির স্বাধীনতা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কি পরিমাণে সমগ্র সমাজের কল্যাণের খাতিরে খর্ব্ব করিয়া সাধারণ কেন্দ্রের কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে সমাজে সভ্যতার অবস্থা খুব উন্নত থাকা আবশ্যক। এ পদ্ধতিতে মানুষকে বাধ্য করিবার ক্ষমতা জোর করিয়া চালাইবার ক্ষমতা অন্যান্য শাসন পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক অল্প, সুতরাং এ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য, ইহার বিধান মানিয়া লইবার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা ও সম্মতি থাকা আবশ্যক।

অতএব ফেডারেশন্‌পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে হইলে সমাজে বিচারবুদ্ধি, ধর্ম্মবোধ ও সভ্যতার বিশেষ উৎকর্ষ থাকা আবশ্যক। অথচ ফিউড্যালিজম্ এই ফেডারেশন্ গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল। সমগ্র রাষ্ট্রব্যাপী এক বিরাট ফিউড্যাল সমাজের আদর্শ, ফেডারেশনেরই আদর্শ। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ফেডারেশন্ যে মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ইহারও অবলম্বন সেই নীতি। ফিউড্যালিজম্ চাহিয়াছিলেন যে প্রত্যেক

ভূস্বামী তাঁহার এলাকার মধ্যে যতদূর সম্ভব শাসনাধিকার প্রয়োগ করিবেন, এবং ইহাতেও শাসন কার্য্যের যে টুকু অবশিষ্ট থাকিবে, সেইটুকু মাত্র হয় উর্দ্ধতন ভূস্বামীর হাতে, না হয় বেরণ দিগের একটী সাধারণ সম্মিলনীর হাতে তুলিয়া দেওয়া হইবে। কেন্দ্রাধিপতির এটুকু ক্ষমতাও আবার বিশেষ অনিবার্য্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য হইবে। ফিউড্যাল্ যুগের অজ্ঞান, পাশবতা ও দুর্নীতির মধ্যে এরূপ একটা শাসনতন্ত্র গড়িয়া তোলা যে অসম্ভব তাহা আপনারা সহজেই বুঝিতেছেন। যাহাদের উপর এই বিধির প্রয়োগ হইবে তাহাদের ধারণা, তাহাদের আচার ব্যবহার যে কোন প্রকার শাসনতন্ত্রের প্রতিকূল। সুতরাং শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থা আনিবার জন্য যে সব চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা যে ব্যর্থ হইয়া গেল ইহাতে কে বিস্মিত হইতে পারে ?

আমরা ফিউড্যাল সমাজকে প্রথমে ইহার সরল মৌলিক মূর্ত্তিতে, পরে ইহার বিরাট সমগ্র মূর্ত্তিতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলাম। এই দুইদিক দিয়া আমরা দেখিলাম ইহার প্রকৃতি কিরূপ, ইহার ক্রিয়াই বা কিরূপ, এবং সভ্যতার গতিনিয়তির উপর ইহার প্রভাব বা কিরূপ। আমার মনে হয় আমাদের আলোচনার ফলে দুইটি সিদ্ধান্ত পাওয়া গিয়াছে :—

প্রথমতঃ, ফেডারেশনের আদর্শ মানুষের আত্মার বিকাশে, ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুরণে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। মানুষের মনে নূতন নূতন তত্ত্বের উন্মেষ হইয়াছে, নূতন নূতন ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, নৈতিক বৃত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং চরিত্র ও প্রেম নব নব সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ সমাজের দিকে দেখিতে গেলে, ফিউড্যালিজ্‌ম্ কোন স্থায়ী বিচার-তন্ত্র বা শাসনতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। অবশ্য বর্ব্বর আক্রমণের ফলে প্রাচীন সমাজ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর পুনর্গঠন যুগে ফিউড্যালিজ্‌ম্ অপেক্ষা সুনিয়ন্ত্রিত ও সুবিস্তৃত সমাজ গড়িয়া উঠার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ফিউড্যালিজ্‌মের মূলগত দোষে এ সমাজ নিজকে বাড়াইতেও পারিল না, নিয়ন্ত্রিত করিতেও পারিল না; রাজনৈতিক অধিকারই ফিউড্যালিজ্‌ম্ প্রয়োগ করিতে শিখাইল। সে প্রতিরোধও আবার বৈধ প্রতিরোধ নহে; বিধিবিধানপক্ষে বিদ্রোহের প্রতিরোধ। সমাজে ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তির উপর সাধারণের ইচ্ছাশক্তিকে জয়ী করিয়া তোলা, ব্যক্তিগত প্রতিরোধ প্রতিহিংসার স্থলে আইন সম্মত বৈধ প্রতিরোধের প্রবর্ত্তন করা—ইহাতেই সমাজের উন্নতি বুঝা যায়। ইহাই সমাজ ব্যবস্থার মহৎ উদ্দেশ্য ও প্রধান সার্থকতা। ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে খুব প্রশ্রয় দাও; যখন তাহার পদস্খলন হইবে তখন সমাজের সম্মিলিত বিচার বুদ্ধির কাছে তাহার বিচার হউক; ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে কতখানি খর্ব্ব করিয়া দিতে হইবে সমাজই তাহার বিচার করিয়া দিক্। ইহারই নাম বৈধ ব্যবস্থা, ইহারই নাম বৈধ প্রতিরোধ। ফিউড্যাল সমাজে এ প্রকার কিছুই ছিলনা। ফিউড্যাল্ ভূস্বামীরা যে প্রতিরোধ পদ্ধতি অনুসরণ করিতেন তাহা ব্যক্তিগত প্রতিরোধ; তাহার অবলম্বন আইন নহে, সমাজের বিচার বুদ্ধি নহে, নিজের বাহুবল। এ প্রতিরোধের

মূলনীতি সমাজবিধ্বংসী নীতি। তথাপি মানব প্রকৃতি হইতে এ নীতি সমূলে উৎপাটিত হউক ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ বাধা দিবার অধিকার বর্জ্জন করিলে অনেক সময় দাসত্বই বরণ করিয়া লইতে হয়। রোমীয় সমাজের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিরোধ প্রবৃত্তি মানুষের মন হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল এবং মাথা তুলিতে পারে নাই। খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবে যে এ প্রবৃত্তির পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর ছিল, আমার ত এরূপ মনে হয় না। ইউরোপীয় চরিত্রে এই নীতির পুনঃ প্রবেশের জন্য ফিউড্যালিজ্‌মের নিকটই আমরা ঋণী। সভ্যতার গর্ব্ব যে সে এ নীতিকে নিষ্ক্রিয় ও নিষ্প্রয়োজন করিয়া রাখিয়া দেয়, ফিউড্যালিজ্‌মের গর্ব্ব যে সে সদাসর্ব্বদা এই কীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছে ও মানিয়া আসিয়াছে।

ফিউড্যাল সমাজের মোটামুটি সাধারণ বিচারের দ্বারা, ইতিহাসের ঘটনাবলীর সাক্ষ্য গ্রহণ না করিয়াই আমরা উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দুইটি পাইলাম। এখন যদি ঘটনার দিকে ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করি, দেখিব আমরা যুক্তি দ্বারা যাহা অনুমান করিয়াছি, ইতিহাসও তাহাই দেখাইতেছে। ফিউড্যালিজ্‌মের ইতিহাস, তাহার ভাগ্য-বিবর্ত্তন, তাহার প্রকৃতিকেই অনুসরণ করিয়াছে। ফিউড্যালিজ্‌মের মূল প্রকৃতি হইতে যে সকল অনুমান ও সিদ্ধান্ত করা গিয়াছে, সে সকলগুলিই ঐতিহাসিক ঘটনার দ্বারা প্রমাণ করিয়া দেওয়া যায়।

দশম ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফিউড্যালিজ্‌মের সাধারণ ইতিহাসের দিকে তাকাইয়া দেখুন, ভাবরস, চরিত্র ও তত্ত্ববিকাশের অনুকূলে ফিউড্যালিজ্‌ম্ যে ঐ সময়ে কত বড় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা লক্ষ্য না করা অসম্ভব। এই যুগের ইতিহাস খুলিলেই মহৎ ভাব, মহৎ কীর্ত্তি, বিকশিত মনুষ্যত্বের সুন্দর সুন্দর নিদর্শন চোখে পড়িয়া যায়। সেগুলি অবশ্য ফিউড্যাল্ আচারব্যবহার রীতিনীতির ক্রোড়েই পুষ্টি লাভ করিয়াছিল। শিভাল্‌রী বা "বীরধর্ম্ম" এবং ফিউড্যালিজ্‌ম্ অবশ্য এক জিনিষ নহে; এক না হউক, কিন্তু শিভালরী যে ফিউড্যালিজ্‌মের কন্যা ইহা কে অস্বীকার করিবে? ফিউড্যালিজ্‌ম্ হইতেই এই উদার ও মহৎ ভাব সমন্বিত আদর্শের উদ্ভব। সন্তানকে ধরিয়া বিচার করিলে জনকের মহত্ত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

আর একদিকে দৃষ্টিপাত করুন। বর্ব্বরতার অন্ধকূপ হইতে বাহির হইয়া ইউরোপীয় কল্পনার প্রথম উন্মেষ, কাব্য সাহিত্য রচনার প্রথম চেষ্টা, অতীন্দ্রিয়রসের প্রথম আস্বাদ—এ সমস্তই ফিউড্যালিজ্‌মের ডানার আড়ালে, ফিউড্যাল দুর্গের অন্তঃপুরে জন্ম-লাভ করে। মানবতার এমন বিকাশ ঘটিতে হইলে মানবাত্মার আলোড়ন চাই, মানবজীবনে একটা সচলতা আসা চাই, অবকাশ চাই, আরও কত কি চাই, যাহা সাধারণ জনসমাজের শ্রান্তিক্লান্তিময়, অবসাদগ্রস্ত কঠোর কঠিন জীবনযাত্রার মধ্যে দুর্ল্লভ। ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে, জার্ম্মাণীতে, ফিউড্যাল-যুগের সহিতই ইউরোপের প্রথম সাহিত্য কলা সৃষ্টির স্মৃতি বিজড়িত।

এদিকে আবার যদি ফিউড্যালিজ্‌মের সামাজিক প্রভাবের বিষয়ে ইতিহাসকে প্রশ্ন করি, এক্ষেত্রেও ইতিহাস আমাদের অনুমানগুলিকে সমর্থন করিবে। ইতিহাস

বলিবে, ফিউড্যালিজ্‌ম্‌ সামাজিক শৃঙ্খলারও শত্রু, সামাজিক স্বাধীনতারও শত্রু। যেদিক দিয়াই সমাজের উন্নতির ইতিহাস বিচার করিবেন সর্ব্বত্রই দেখিবেন ফিউড্যালিজ্‌ম্‌ কেবল বাধা দিতেছে। সেই জন্যই সে দুই প্রচণ্ড শক্তির প্রেরণায় সমাজে শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার আদর্শ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, ফিউড্যাল-যুগের আরম্ভ হইতেই তাহারা অনবরত ফিউড্যালিজ্‌মের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে। বিভিন্ন সময়ে ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া একটা বিধিবদ্ধ ব্যাপক সমাজ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে; ইংলণ্ডে প্রথম উইলিয়াম ও তাঁহার পুত্রগণ এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, ফ্রান্সে স্যাঁ লুই চেষ্টা করিয়াছিলেন, জার্ম্মাণীতে একাধিক সম্রাট এই চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়। ফিউড্যালিজ্‌মের স্বভাবই শৃঙ্খলা ও বিধিবিধানের প্রতিকূল। আজকাল কোন কোন বুদ্ধিমান লেখক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ফিউড্যাল সমাজ বেশ একটা বিধিবদ্ধ সুনিয়ন্ত্রিত উন্নতিশীল সমাজ; তাঁহারা ফিউড্যাল যুগকে একটা স্বর্ণযুগ করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে যদি প্রশ্ন করা যায় ঠিক কোন্‌ স্থানে কোন্‌ সময়ে এই ফিউড্যালিজ্‌মের এই কল্পিতরূপ বাস্তব আকার লাভ করিয়াছিল, তাহা হইলে তাঁহারা উত্তর দিতে পারিবেন না। তাঁহাদের কল্পিত ভুস্বর্গের সন তারিখ নির্দ্দেশ করা যায় না; অতীতের ইতিহাস খুঁজিয়া এ নাটকের রঙ্গমঞ্চও পাওয়া যায় না, অভিনেতাও পাওয়া যায় না। তাঁহাদের এই প্রাপ্ত ধারণার কারণ সহজেই পাওয়া যায়; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা বিনা অভিসম্পাতে ফিউড্যালিজ্‌মের নামোচ্চারণ পর্য্যন্ত করিতে পারেন না, তাঁহাদেরও ভ্রমের কারণ বুঝিতে পারা যায়। ফিউড্যালিজ্‌মের যে দুইটি বিভিন্নরূপ আছে তাহা অনুকূল-প্রতিকূল কোন পথই ভাল করিয়া লক্ষ্য করেন নাই। একদিকে ব্যক্তিমানবের উপর মানুষের চিন্তা, চরিত্র ও প্রবৃত্তির উপর ফিউড্যালিজ্‌মের যে প্রভাব, অপর দিকে সমষ্টিমানবের উপর, মানুষের সামাজিক অবস্থার উপর ফিউড্যালিজ্‌মের প্রভাব—এই দুইটা দিক তাঁহারা পৃথক করিয়া দেখেন নাই। এক পক্ষ মানিতে চান না যে, যে সমাজের মধ্যে এতগুলি সদ্ভাব ও সদ্‌গুণের বিকাশ ঘটিয়াছিল, যে সমাজের মধ্য হইতে আধুনিক ইউরোপের সমস্ত সাহিত্যের জন্ম হইল, যে সমাজে আচারব্যবহার ও রীতিনীতি এমন একটা উন্নত আদর্শ লাভ করিল, তাঁহারা জানিতে চান না যে, সে সমাজের ব্যবস্থা বা গঠন নীতির কোনই গুণ ছিল না। এদিকে আবার ফিউড্যালিজ্‌ম্‌ সাধারণ জনসমাজের প্রতি যে অন্যায় আচরণ করিয়াছে, সমাজে শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা স্থাপনের বিরুদ্ধে সে যে সকল বাধা উপস্থিত করিয়াছে, অপর পক্ষ কেবল তাহাই দেখিতেছেন। সুতরাং ইঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, এমন সমাজ ব্যবস্থার ফলে সুন্দর চরিত্র বা সদ্‌গুণের বিকাশ হইতে পারে। সভ্যতার মধ্যে যে দুইটি বিভিন্ন স্রোত চলিতেছে, অন্ততঃ কিছু কালের জন্য দুইটি স্রোত যে পরস্পর নিরপেক্ষভাবে চলিতে পারে, একথাটা উভয়পক্ষই বুঝেন নাই।

এখন দেখা গেল তত্ত্ববিচার করিয়া ফিউড্যালিজ্‌ম্‌ ও তাহার ফল সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছিলাম, ইতিহাস তাহা সমর্থন করে। রোম-শাসিত জগৎ যাহারা জয় করিয়া লইল,

ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত সত্বার প্রবল উদ্যম—ইহাই তাহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ; সুতরাং তাহারা যে সামাজিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিল তাহাতে সর্ব্বাগ্রে ব্যক্তিত্বেরই বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি ঘটিল। কোন একটা সামাজিক ব্যবস্থা নূতন প্রবর্ত্তন করিবার সময় মানুষ নিজের অন্তঃপ্রকৃতিসম্ভূত যে সমস্ত ভাব, চিন্তা ও গুণরাশি লইয়া প্রবেশ করে, সমাজ ব্যবস্থার উপর সেগুলির প্রভাব নিতান্ত কম নহে। আবার মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির উপর সমাজ ব্যবস্থারও একটা প্রতিক্রিয়া হয় এবং তাহার ফলে ঐ স্বাভাবিক ভাবচিন্তা ও গুণরাশি আরও পরিপুষ্ট হয়। জার্ম্মাণ সমাজে ব্যক্তিরই প্রাধান্য ছিল, সুতরাং জার্ম্মাণ সমাজের সন্তানস্বরূপ সে ফিউড্যাল সমাজ তাহার প্রভাব ব্যক্তিত্ব পরিপোষণেরই অনুকূল হইল। সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গ ও উপাদানের মধ্যেও এই ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যাইবে ; তাহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব বিশিষ্ট ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিয়াছে ; তাহাদের গতি ও প্রভাব তাহাদের মূল প্রকৃতিকেই অনুসরণ করিয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চর্চ্চের ইতিহাস এবং ইউরোপীয় সভ্যতার উপর চর্চ্চের প্রভাব আলোচনা করিতে গিয়া আমরা এই ব্যপারের আর একটা বড় দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইব।

(* শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, এম্, এ, মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।)

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

সেকালের রাইয়ত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এইবার ফ্রান্সের কথা। সেখানে বাবুরা অতি কঠোর ভাবে শুষিতে সুরু করিয়াছিল। চাষীরা এই সকল দেয় হইতে মুক্তি পাইবার জন্য নিজ নিজ জমির কিছু অংশ বাবুকে দিয়া দেওয়াই নিরাপদ বিবেচনা করিত। বাবুরা এই ধরণের জমি পাইলেই খুসীও হইত।

জমিদারেরা একটা ফন্দিও বাহির করিয়াছিল। চাষীরা জমিদারকে কোনো জমিদান করিবার পূর্ব্বে পল্লী পঞ্চায়তের মতামত লইতে বাধ্য থাকিত। জমিদাররা পল্লীর কয়েকজন লোককে নানা কৌশলে নিজ মতলব মাফিক মত দেওয়াইবার ফিকিরে থাকিত। এই অবস্থায় রাজশক্তি জমিদারদের ঘুশ এবং অন্যান্য প্রভাব হইতে রাইয়তদিগকে কিছু বাঁচাইবার আয়োজন করে। আইন জারি করা হয় যে পল্লীর সকল নরনারী পঞ্চায়তে একমত না হইলে কোনো জমিদান অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে না।

এক ফন্দিবাজির জোরেই জমিদাররা রাইয়তদের জমি নিজ ভোগে আনিত, এমন নয়। খোলাখুলি নিষ্ঠুর লুটনীতিও প্রচলিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে "বুর্জোআ" শ্রেণীর শিল্প-

বাণিজ্যের ধনদৌলতওয়ালা অভিজাত সমাজ গড়িয়া উঠিতেছিল। পল্লী সমবায়ের চৌথ জমিজমার উপর ইহাদের লোভ ছিল ঠিক বাবুদের মতনই।

সহরগুলা বিস্তৃত হইতেছিল। লোক সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাষ আবাদের পরিমাণ বাড়াইয়া তোলা ছিল সহুরে ধনীদের স্বার্থ। সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ডে চাষ চালাইবার সুযোগ ঢুঁড়িতে গিয়া "বুর্জোআ"রা রাজশক্তির শরণাপন্ন হইয়াছিল। "পড়ো" জমিগুলা যাহাতে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয় সেই দিকে নজর রাখিয়া সরকার আইন জারি করিতে অভ্যস্ত হয়। এই ধরণের আইনের জোরে "পড়ো" জমির ওজরে "বুর্জোআ"রা পল্লী স্বরাজের চৌথ জমিগুলা দখল করিয়া বসিল। কিষাণরা এই পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। কিন্তু সরকারী পল্টন বুর্জোআদের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য মোতায়েন থাকিত।

অসংখ্য অছিলায়ই কিষাণরা তাহাদের জমিজমা হাতছাড়া করিতে বাধ্য হইয়াছে। জমিদারদের জুয়াচুরির অন্ত ছিল না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জমিদাররা বলিত যে রাইয়তের পাট্টার সঙ্গে তাহার জমি খাপ খায় না। একথা অবশ্য ঠিক—কেননা পাট্টা হিসাবে কিষাণরা বাবুদের পুরাপুরি গোলাম ছিল না অথবা বাবুদের মাহিমোফিক সেলামই করে বাধ্য ছিল না। রাইয়তরা নিজ নিজ জমিজমার স্বত্ব সম্বন্ধে পাকা প্রমাণ উপস্থিত করিতে বাধ্য থাকিত। যাহাদের কবুলিয়তে কিছু গলদ বাহির হইত তাহারা সেই অনুসারে জমি দণ্ড ভোগ করিত।

কোনো কোনো সময় জমিদাররা রাইয়তদের দলিল পত্রগুলা হাত করিবার পর সেইসব নিষ্ঠুর ভাবে নষ্ট করিয়া ফেলিত। তাহার পর রাইয়তদের পক্ষে ত নিজ জমির দখল স্বত্ব স্বপ্রমাণ করা সম্ভবপর হইত না। প্রমাণিত হইত যে তাহারা বে-আইনি ভাবে জমি ভোগ করিতেছে অর্থাৎ জমিটার আইনতঃ কোনো মালিক নাই। কিন্তু ফিউদযুগে নীতি ছিল :— "প্রভুহীন জমিন থাকিতেই পারে না" ("পা দ ত্যোয়ার সাঁ সেইঞ্যর")। অতএব "বে-আইনি ভাবে" যে সকল জমি রাইয়তরা ভোগ করিতেছিল সে সব বাবুদের তাঁবে আসিতে বাধ্য।

ষোড়শ শতাব্দীতে জমিদাররা রাইয়তদের দলিল ধ্বংস করিয়া তাহাদিগের জমিজমা বে-আইনি প্রচারিত করিয়াছিল। বাবুদিগকে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল ১৭৮৯ সালের বিপ্লবে। কিষাণরা ক্ষেপিয়া জমিদারদের কাগজপত্রগুলার উপর "ওতো দা ফে" চালাইয়াছিল। অর্থাৎ খাতাপত্র ইত্যাদি যা কিছুর জোরে বাবুরা প্রজাদের উপর কর্তামি করিত সবই আগুনে পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার নাম প্রতিহিংসা।

বনভূমিগুলা লুটিয়া লওয়া হইয়াছিল আরও নৃশংস ভাবে। বাদবিচার না করিয়া বাবুরা এই সব জমি দখল করিয়া ফেলে। বাজে লোককে সেখানে শীকারের একতিয়ার দেওয়া বন্ধ করা হয়। এমন কি জ্বালানি কাঠ কুড়াইতে আসা, ঘরবাড়ী, ব্যাড়া, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মেরামত করিবার মতন কাঠ কাটিয়া লইয়া যাওয়া ইত্যাদি সবই নিষিদ্ধ হইয়া যায়। বনভূমিগুলা সবই ছিল কিষাণদের চৌথ সম্পত্তি। বাবুরা এই সব ঘেরিয়া লওয়া মাত্র দেশে মহা কিষাণ-বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে গণ্ডা গণ্ডা "জ্যাকারি" বা কিষাণ-দাঙ্গা ঘটিয়াছিল। ফরাসী-বাবুরা রাইয়তদিগকে "জ্যাক বনম" অপমান সূচক নামে ডাকিত। এই কারণে কিষাণদের বিদ্রোহকে জ্যাকারি বলে। জমিদাররা রাইয়তদিগকে বনভূমিতে শীকার করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল। অধিকন্তু দরিয়ার মাছ ধরা এবং বনের অন্যান্য সম্পদ ভোগ করার এক্তিয়ার হারাইতে বাধ্য হইয়া "জ্যাক বনম" নামক ফরাসী "ছোট লোক"গুলা বাবুদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করিতে ঝুঁকিয়াছিল।

ফ্রান্সের উত্তর এবং মধ্য প্রদেশে কিষাণ-বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল অনেক। জার্ম্মাণীতেও স্যাক্সনরা সম্রাট দ্বিতীয় হেন্‌রির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া ছিল। দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের সুআবিয়ান জার্ম্মাণরাও ধর্ম্মসংস্কারক লুথারের জীবিতকালে বিদ্রোহী হয়। বনভূমির অধিকারে বঞ্চিত হওয়া এই সকল কিষাণ-বিদ্রোহের কারণ।

এই সকল দাঙ্গার ফলে বাবুরা রাইয়তদিগকে কখনো কখনো তাহাদের পুরাণা-অধিকার ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইত। কিষাণরা বন হইতে কাঠ আনিতে পারিত ও মাঠে জানোয়ার চরাইতে পারিত। মে মাস ছাড়া অন্যান্য মাস ভরিয়া তাহাদিগকে এই সকল অধিকার ভোগ করিতে দেওয়া হইত।

বন আর মাঠের অধিকার ছিল কিষাণদের মজ্জাগত। কিষাণরা এই সকল ভোগ করিতে গিয়া ন্যায়ের মাত্রা ছাড়াইয়া গেলেও তাহাদিগকে এই সব হইতে বঞ্চিত করা সম্ভবপর ছিল না। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে লা পোআ দ ফ্রেমিনহ্বিল বলিতেছেন :—"বন মাঠ ভোগ করা কিষাণদের বাপদাদাদের আমল হইতে সনাতন রীতি হিসাবে চলিয়া আসিতেছে। যে সব লোক এখনও জন্মে নাই তাহাদেরও এই অধিকার রহিয়াছে।"

এই ছিল ফিউদপন্থী স্মার্ত্ত পণ্ডিতদের মত। কিন্তু ১৭৮৯ সালের বিপ্লবী "বুর্জোআরা" স্মৃতি শাস্ত্র মাফিক কিষাণদের অধিকার বজায় রাখিতে রাজি ছিল না। জমিদারদের স্বার্থ পুষ্ট করিয়া কিষাণদিগকে অবনত করা এই বিপ্লবের অন্যতম কাজ।

জমিদাররা মাঝে মাঝে রাইয়তদের চৌথ অধিকার স্বীকার করিত বটে, কিন্তু এইরূপ স্বীকার করা ছিল অনেকটা অনুগ্রহ করার সমান। ইহারা নিজেই যে বনভূমিগুলার খোদ মালিক এ সম্বন্ধে তাহাদের চিন্তার কোনো গোঁজামিল থাকিত না। পরবর্ত্তী কালে ঠিক এই ধরণেরই জমিদাররা নিজদিগকে রাইয়তদের সকল প্রকার জমিজমার মালিক বিবেচনা করিতে সুরু করিয়া ছিল।

এইখানে মধ্যযুগের কেত্‌াটা একবার স্মরণে আনা আবশ্যক। কোনো পল্লীবাসী সে যুগে কোনো প্রতাপশালীর নিকট "বশ্যতা" স্বীকার করিবার সময় নিজ জমিন হইতে এক চাপ মাটি আনিয়া প্রভুর চরণ তলে রাখিয়া দিত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কিষাণ নিজেই যে নিজ জমির মালিক সে বিষয়ে কোনো তর্ক উঠিত না। বৃটানি ইত্যাদি কোনো কোনো প্রদেশে জমির উপরকার মাল—যথা শস্য, গাছগাছড়া, ঘরবাড়ী ইত্যাদি—সম্বন্ধে তাহারা রাইয়তদের মালিকত্ব স্বীকার করিয়া চলিত। কিন্তু আন্তর্ভৌম ধনসম্পদ অর্থাৎ জমির ভিতরকার যা কিছু সব বিষয়ে জমিদাররাই মালিক এই রীতি প্রচলিত ছিল। এই ধরণের

সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই বুর্জোআ আমলের জমিদারগণ তাহাদের রাইয়তদিগকে ভিটা মাটি উচ্ছন্ন করিয়া ছাড়িয়াছিল। মার্কস-বিবৃত সাদার্ল্যাণ্ডের ডাচেসের (বেগমের) লুট কাহিনী সেই নীতির চরম দৃষ্টান্ত।

১৭৮৯ সালের বিপ্লবে জমিজমার ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিয়ম পাকাপাকি জারি হইয়া যায়। "নিজস্ব" প্রথা এইরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ফ্রান্সে জমিদারের জমিজমা ও যৌথ সম্পত্তির বিধান অনুসারে কম বেশী পল্লীর প্রত্যেক লোকের ভোগে আসিত। শস্য কাটা হইবা মাত্র বাবুদের বনে ও মাঠে জনসাধারণের আনাগোনা অব্যাহত থাকিত। বাবুদের আঙুরের ক্ষেত্রে ও পল্লীবাসীরা আঙুর তোলা হইয়া যাইবার পর নিজ নিজ জানোয়ার চরাইত। কোন কোন জমিদার অবশ্য এইরূপ যৌথ ব্যবহার পছন্দ করিতনা। সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের "সোসিয়েতে দেকোনোমি রুরাল আঁ বার্ণ" (বার্ণ জনপদের পল্লীসমাজ সমিতি) কর্তৃক ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এক রচনায় সেযুগের এক জমিদারের প্রতিবাদ দেখিতে পাই।

জমিদাররা যৌথ অধিকারের বিধান মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিত। এবিষয় কোনো সন্দেহ করা চলেনা। অধিকন্তু চাষ আবাদের উপর আঙুর গাছ লাগানো ইত্যাদি বিষয়েও পল্লীবৃদ্ধদের অনুশাসন অনুসারে জমিদারদিগকে কাজ করিতে হইত। মতেস্কিয়ু নামক সমাজতত্ত্ববিদের কিছু জমিদারি ছিল। ফরাসী বিপ্লবের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তীকালে এই বাবুকে পল্লীস্বরাজ বেশ একটু জব্দ করিতে পারিয়াছিল।

১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে চতুর্দ্দশ লুইয়ের আমলে একটা সনাতন পল্লীপন্থা বিধিবদ্ধ হয়। তাহার প্রভাবে জমিদাররা নিজ নিজ জমি চাষ করিতে সমর্থ থাকিলে অন্য কোনো লোক বাহাল করিয়া সেই কাজ সামালাইতে অধিকার পাইত না। ঠিক এই নিয়ম চালাইয়া পল্লীবাসীরা মতেস্কিয়ুকে জনসাধারণের প্রতাপের নিকট মাথা নোয়াইতে বাধ্য করিয়াছিল।

বিপ্লবের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগটাকে সাধারণ হিসাবে ফিউদ-যুগ ধরিয়া লওয়া চলে। এইযুগে জমিজমা বাস্তবিক পক্ষে কোনো লোকের হাতেই আসল স্বাধীন ছিল না। সম্পত্তি ছিল পরিবার-গত। প্রত্যেক পরিবারকে বাপদাদাদের নিয়ম মানিয়া চলিতে হইত। আবার ভবিষ্য বংশধরগণের স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলাও প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য থাকিত।

গির্জ্জা, দেবালয় ইত্যাদি মোহন্ত প্রতিষ্ঠান গুলা অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জমিদারি সমূহও ঠিক এইরূপেই অতীত এবং ভবিষ্যতের বাঁধাবাঁধির ভিতর আত্মরক্ষা করিত। সাধুবাবাজী পুরোহিত সন্ন্যাসীরা ছিল জমিদারির অভিভাবক এবং তদবিরকারক মাত্র। অবশ্য বাবাজীরা বাটপার জোচ্চোর কম ছিলনা।

সরকারী খাজনা হইতে রেহাই পাইবার জন্য পুরোহিতরা প্রচার করিত যে দেবোত্তর গুলা মামুলি ধন দৌলত নয়। এসব কোনো মানুষের সম্পত্তি নয় ইত্যাদি। বিপ্লবের সময়কার বুর্জোআরা সয়তানে সয়তানে কোলাকুলি করিয়া বলিল "বহুত আচ্ছা সাধু বাবাজীরা গির্জ্জার মালিক নয়। ঠিক কথা। এইসব সম্পত্তির মালিক "এক্লেজিয়া" "এগ্লিজ" অর্থাৎ সঙ্ঘ।" তখন প্রশ্ন উঠিল "সঙ্ঘটা কে বা কি? জবাব:—"সকল

খৃষ্টান নরনারীর পরিষৎ অর্থাৎ গোটাদেশ। এই যুক্তি অনুসারে দেবোত্তর সম্পত্তিগুলা সরকারী খাশ মহলে পরিণত হইয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবওয়ালারা বিলাতী অষ্টম হেন্‌রির মতন এই ধরণেই গির্জ্জাগুলা লুটিয়া দরিদ্রের ধনদৌলত নিজ নিজ পেটোআর ভিতর বাঁটিয়া দিয়াছিল।

ফিউদযুগের জমিদার রাইয়তদের দেনাপাওনা ছিল পারস্পরিক। তাহার বিধানে কিষাণদের উপকার ও হইত যথেষ্ট। কিন্তু বুর্জোআ এবং তথাকথিত "লিবারল" (বা উদারপন্থী) ধনবিজ্ঞান-বিদেরা এই যৌথ সম্পত্তি-মূলক সমাজ পদ্ধতির চরম শত্রু। ইহারা পল্লীবাসীদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে।

বুর্জোআ ঐতিহাসিকগণ লম্বাগলা করিয়া প্রচার করিয়াছেন যে ফরাসী বিপ্লবের ফলে কিষাণরা জমি পাইয়াছে এবং সুখ ও স্বাধীনতা চাহিতে সমর্থ হইয়াছে। মিথ্যা কথা। কিষাণদিগকে পল্লীসমবায়ের জমিজমার উপর যৌথ অধিকার হইতে বঞ্চিত করাই এই বিপ্লবের অন্যতম কাজ। তাহা ছাড়া কিষাণরা ইহার প্রভাবে সুদখোর মহাজনদের খপ্পরে আসিয়া পড়িয়াছে। অধিকন্তু পুঁজিপতি যন্ত্রপাতিশীল জমিদার বাবুদের সঙ্গে "স্বাধীন ভাবে টক্কর দিতে বাধ্য থাকা ও ফরাসী বিপ্লবই কিষাণদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে। সরকারকে খাজনা দেওয়া ত তাহার উপর আছেই। কিষাণরা চরম বিপদে পড়িয়াছে।

১৮৫১ সালে ফ্রান্সে ৭,৮৪৬,০০০ জমির মালিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ভিতর ৩,৬০০,০০০ জনের অবস্থা অতি শোচনীয়। ইহারা "প্রকাশ্য" খাজনা দিতে অসমর্থ। কৃষি কর্ম্মে উন্নতি বিধানের জন্য ফরাসী গবর্মেণ্ট পরবর্ত্তী কালে একটা সরকারী কৃষি-ঋণ তুলিয়া জমির মালিকদের ভিতর তাহা বাঁটিয়া দিবার ব্যবস্থা করে। এই সূত্রে সকল জমিজমার আর্থিক অবস্থা পরিষ্কার রূপে আলোচনা করা হয়। ১৮৭৯ সালের ২৫ আগষ্ট তারিখের "লা রেপ্যিব্লিক ফ্রাঁসেজ" নামক দৈনিক কাগজে সম্পাদক গাঁবেতা লিখিয়াছিলেন—অধিকাংশের অবস্থাই দেউলিয়া। ধার লইয়া তাহা শুধিবার ক্ষমতা অনেক মালিকেরই নাই। অর্থাৎ প্রায় ৭৮॥০ লাখ জমির তথাকথিত মালিকের ভিতর মাত্র ২৮।০ লাখকে বিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা করা হইয়াছিল।

ফিউদ যুগের চাষীরা অনেকটা সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিত। ফরাসী বিপ্লবের নায়কস্থানীয় বুর্জোআ ভদ্রলোকেরা একথা ভুলিয়া গিয়াছেন। বরং তাঁহারা যেন তেন প্রকারেণ জমিদারি প্রথাকে গালাগালি করিতেই অভ্যস্ত। সেকালের চাষীদের সঙ্গে বর্ত্তমান বুর্জোআ যুগের ভূমি মজুরের আর্থিক ব্যবস্থা তুলনা করিলে বুর্জোআ লেখকদের ভুলগুলা হাতে হাতে ধরা পড়িবে।

নর্মাণ্ডি প্রদেশের মজুর সমাজ বিষয়ক অনুসন্ধান গ্রন্থে দ'লিল বলিতেছেন "মজুরের ভাগ্যের সঙ্গে মনিবের ভাগ্য গ্রথিত ছিল। ফসলের পরিমাণের উপর বাবুর পাওনা নির্ভর করিত।" তুর অঞ্চলের সাঁ জুলিয়া মোহতরা রাইয়তদের নিকট হইতে পাইত ছয় ভাগের এক ভাগ। কোথাও কোথাও কর ছিল দশমাংশ মাত্র। বার ভাগের এক ভাগও কোনো কোনো অঞ্চলের রীতি। দক্ষিণ ফ্রান্সের নানা অঞ্চলেও এইরূপ ষষ্ঠাংশ

বা দ্বাদশাংশের নিয়ম প্রচলিত ছিল। বুর্জোআ আমলের কোনো জমিদার এই পরিমাণ পাইয়া সন্তুষ্ট হয় কি ?

মধ্যযুগে তার্ণ-এ-গারোণ জেলায় মো আসাক প্রসিদ্ধ জীবনকেন্দ্র বিবেচিত হইত। লাগ্রেজ ফোসা প্রণীত এতুদ ইস্তোরিক স্যির মোআস্সাক মোআস্সাক সম্বন্ধে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে লেখক ১২১২ এবং ১২১৪ সালের দলিল উদ্ধৃত করিয়াছেন। জানা যায় যে, সেকালের মোহন্তরা রায়তদের নিকট হইতে ফসলের তৃতীয়, চতুর্থ এবং কোনো কোনো সময়ে দশমাংশ মাত্র পাইয়াই যথেষ্ট বিবেচনা করিত। লাগ্রেজ ফোসার মতে মোহন্তরা রাইয়তদের সঙ্গে যে চুক্তি করিত তাহাকে খাজনা, কর ইত্যাদি বিষয়ক চুক্তি বলা চলে না। ইহাতে স্বাধীন ভাবে পরস্পর আলোচনা করিয়া জীবন ধারণের ব্যবস্থা করার পরিচয়ই পাওয়া যায়।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে নর্মাণ্ডির আঙ্গুরচাষীরা বাবুদের সঙ্গে আধাআধি বখরার নিয়মে আবাদ চালাইত। আজকালকার দিনে যে সকল দেশে আঙ্গুর চাষ চলিতেছে, সেখানকার চাষীরা আঙ্গুর চাখিয়া দেখিতে পর্য্যন্ত অধিকারী নয়।

সাঁ জার্ম্মা দে প্রে নামক প্যারিসের নিকটবর্ত্তী পল্লী মোহন্তদের আয়ের গেরার কর্ত্তৃক ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। নবম শতাব্দীতে শার্ল্যমেঞ এর আমলে কিষাণ রাইয়ত প্রজারা কিরূপ জীবন যাপন করিত এই খাতায় তাহার বিশদ বিবরণ পাই। মোহন্তদের জমিগুলা চষা হইত ব্যক্তিগত ভাবে নয়। বিশ ত্রিশ জন পৌর কিষাণ দলবদ্ধ ভাবে চাষ আবাদের দায়িত্ব লইত।

মাঠের জমি তিন প্রকার চাষীর ভিতর ভাগাভাগি ছিল। প্রথম শ্রেণীকে বলে "স্বাধীন" জমিন, দ্বিতীয়ের নাম "করদ", তৃতীয় "গোলাম" নামে অভিহিত। স্বাধীন চাষীরা মোহন্তদিগকে বৎসরে বিঘা প্রতি ১।৶ দিত; "করদ"রা দিত বিঘা প্রতি ২৲। "গোলাম" জমিনের চাষীদের নিকট হইতে মোহন্তরা পাইত বিঘা প্রতি ২৷৷৹। অবশ্য টাকা দেওয়া হইত না। ফসল এবং পরিশ্রমের পরিমাণ দেখিয়া গেরার মুদ্রার হিসাবে রায়তদের দেয় কষিয়া দেখিয়াছেন।

এই মঠের জমিদারি বেশ সুবিস্তৃত ছিল। সপরিবারে চাষীদের সংখ্যা ছিল ১০০২৬। ইহাদের নাম দেখিয়া বোধ হয় অধিকাংশই জার্ম্মাণ। এতগুলা চাষী যখন এইরূপ সর্ত্তে আবাদ চালাইত, তখন সহজেই অনুমান করা চলে যে সে যুগে রাইয়তরা সাধারণতঃ এই ধরণের কড়ারেই অভ্যস্ত ছিল। মোটের উপর তাঁহাদের স্বচ্ছলতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না। জিজ্ঞাসা করিতেছি,—উনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোআ জমিদারদের রাইয়ত গিরি বর্জ্জন করিয়া কোন চাষী বিঘা প্রতি ২৷৷৹ হিসাবে নবম শতাব্দী মোহন্তদের গোলাম জমিনের ইজারা লইতে অরাজি হইবে ?

বিলাতী মজুরদের অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল ছিল। ঐতিহাসিক হালাম "মধ্য যুগের ইয়োরোপ" নামক গ্রন্থে বলিতেছেন :—এডোয়ার্ড অথবা ষষ্ঠ হেনরির আমলের মজুর এবং চাষীরা আজকালকার চেয়ে বেশী সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিত। সেকালের

মূল্য তালিকার সঙ্গে একালের মূল্য তালিকা তুলনা করিলে অনেকেই এই ধরণের অসন্তোষ জনক মত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন।

হালাম বিস্তৃত ভাবে জিনিষপত্রের দর আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন। সার জন কুলুসের তথ্য অনুসারে হালাম বলিতেছেন, "চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে শস্য কাটিতে আসিয়া চাষী।৹ আনা রোজ পাইত। এক সপ্তাহ খাটিলে সে এক কোম্ব গম কিনিতে পারিত কিন্তু আজকাল (১৭৮৪ সালে) সেই পরিমাণ গম কিনিতে হইলে চাষীর দশ বার দিনের রোজগার। আগে ষষ্ঠহেন্‌রির আমলে আধসের মাংসের দাম ছিল দেড় ফার্দিং। ভারতীয় দেড় পয়সা। মজুরা রোজ তিন পেনি বা ৶৹ হিসাবে ছয় দিনের সপ্তাহে ১৶৹ রোজগার করিত। এই টাকার অর্দ্ধেক খরচ করিলে সে এক বুশেল গম কিনিতে পারিত। অপর অর্দ্ধেকে সে পাইত ১২ সের মাংস।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পার্লামেণ্ট আইন করিয়া মজুরদের দৈনিক মজুরির হার ঠিক করিয়া দিয়াছে। ১৮০০ সালের মজুরবিধি অনুসারে শস্য কাটার জন্য মজুরেরা পাইত রোজ ৶৹ (তিন আনা)। তাহাদিগকে খাইতে দেওয়া হইত না। এই তিন আনা আজকালকার বাজারে ৩৸৹ র সমান। ১৪৪৪ সালের বিধানে মজুরেরা শস্য কাটিতে আসিয়া পাইত ।৶৹ আর ঘরামির কাজে মামুলি মজুরের প্রাপ্য ছিল ৶১০। সেকালের পাঁচ আনা হালামের সময়কার ৫৲ এবং সাড়ে তিন আনা ছিল ৩৷৹র সমান। ১৪৯৬ সালে শস্যকাটার মজুরী সাবেক হারেই ছিল। মামুলি মজুরির হার কথঞ্চিৎ বাড়াইয়া দেওয়া হয়।

১৪৪৪ সালের আইনে মেষপালকের বার্ষিক মাহিয়ানা নির্দ্ধারিত হয় ১৮৲। হালাম এই বেতনকে নিজ সময়কার ৩০০৲র সমান বিবেচনা করেন। গৃহস্থালীর কাজের চাকর বাকর পাইত বৎসরে প্রায় ১৪৲। অধিকন্তু মাংস এবং মদ তাহারা গৃহস্থের নিকট দাবী করিতে পারিত। ১৪৯৬ সালের মজুর বিধানে এই সব হার কিছু কিছু বাড়ানো হইয়াছিল।

মজুরির হার সম্বন্ধে হালামের মত এই—"যে সকল অঙ্ক দেওয়া হইল সে সব আইনতঃ সর্ব্বোচ্চ। পার্লামেণ্ট সেই সময়কার প্রচলিত মজুরির হারের উচ্চতম অঙ্ক গ্রহণ করে নাই। বরং হারটা যথাসম্ভব নরম করিবার দিকেই গবর্মেণ্টের দৃষ্টি ছিল। বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে মজুরেরা এই আইন নির্দ্দিষ্ট হারের চেয়ে উঁচু হারেই মজুরি ভোগ করিতেছিল। কম সে কম সেকালের পারিবারিক হিসাবপত্র দেখিলে এইরূপই মনে হইবে। কেন না সরকারী মজুরি-হারের সঙ্গে পারিবারিক খরচের হার মিলে না।"

সেকালে চাকরি পাওয়া বিলাতী সমাজে অনেকটা অনিশ্চিত ব্যাপার ছিল। কাজেই ইংরেজ মজুরদের পক্ষে জীবন ধারণের উপায়গুলা বড় একটা "হাতের পাঁচ" গোছের ছিল না। তাহার পর "আকাল" দুর্ভিক্ষ ইত্যাদিও মাঝে মাঝে জনগণের কষ্টের কারণ হইত। একমাত্র জলবায়ু বরফ কুয়াসার সুখের উপরই এই দুর্য্যোগ বা অনটন নির্ভর করিত না। সেকালের ইংরাজেরা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া "অন্ন ধ্বংস" করিতে অভ্যস্ত হয় নাই। বিশেষ করিয়া এই কারণেই যখন তখন মজুর সমাজে অন্নের অভাব ঘটিয়াছে।

মধ্যযুগের আর্থিক অবস্থা আলোচনা করিতে যাইয়া এই সকল তথ্য মনে রাখিতেই হইবে।

তাহা সত্ত্বেও হালাম বলিতেছেনঃ—সেকালের দৈব দুর্য্যোগ এবং অন্যান্য অসুবিধা গুলা নজরে রাখিয়াও আমি বিশ্বাস করি যে আজকালকার মজুর তাহার তিনচারশ বৎসর পূর্ব্বেকার বাপদাদাদের চেয়ে পরিবার প্রতিপালন বিষয়ে কম সমর্থ। যন্ত্রপাতিনিয়ন্ত্রিত শিল্পের কল্যাণে অনেক জিনিষ মজুরেরা ঊনবিংশ শতাব্দীতে বেশ সস্তায়ই পাইতেছে একথা অস্বীকার করা চলে না। তাহা সত্ত্বেও জীবন সংগ্রাম হিসাবে ইহাদের সামর্থ্য পূর্ব্বপুরুষদের অপেক্ষা অনেক নিচু।

১৭৮৯ সালে যখন ফরাসী বিপ্লব ঘটে তখনও জমিদারি প্রথা ফিউদ-যুগের যৌথ সম্পত্তিশীল সমাজের স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারেই কিছু কিছু নিয়ন্ত্রিত হইত। জমিজমা পুরাপুরি নিজস্বে পরিণত হয় নাই। কাজেই তখনও পল্লীবাসীরা এবং কিষাণরা হাভাতে হাঘরে হইতে বাধ্য হয় নাই। ফরাসী বিপ্লবের পর যে "বুর্জোআ" যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেই যুগেই কিষাণদের দুর্গতি চরমে আসিয়া ঠেকিয়াছে। কারণ একালে যৌথ সম্পত্তির বিধান সমাজে আর নাই। জনগণ আজ "ব্যক্তি" এবং "স্বাধীন" জীব—অর্থাৎ পুঁজিপতিদের দ্বারা স্বাধীন ও যথেচ্ছভাবে শোষণের যোগ্য জানোয়ার ছাড়া রাইয়তরা আর বেশী কিছু নয়।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

হিন্দুর ধর্ম্মসাহিত্য।

(১)

ভারতবর্ষের ইতিহাস সুষ্ঠুরূপে জানিতে হইলে বিশেষ গবেষণাপূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষার ইতিহাস জানা একান্ত আবশ্যক। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে সেই প্রাচীন ঋষি এবং পণ্ডিতগণের লিখিত গ্রন্থ চিরকালের জন্য ভারতবর্ষের গৌরবের বিষয় হইয়া আছে। সংস্কৃত ভাষা বহু প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ। এই ভাষার শব্দগুলির সংখ্যা গণনা করা সাধ্যাতীত; প্রথমতঃ মূল শব্দগুলির সংখ্যা খুব বেশী, তারপর শব্দগুলিতে প্রকৃতি প্রত্যয় বিভক্তি অথবা শব্দান্তর যোগ করিলে শব্দসম্পদ্ এত বৃদ্ধি পায় যে মনুষ্যের অন্তঃকরণের যে কোন গূঢ় ভাব প্রকাশ করিতে শব্দের কোনই অভাব অনুভূত হয় না। কোন কোন পণ্ডিতের মতে সংস্কৃত ভাষাই পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার জননীস্থানীয়া। এই সব সত্ত্বেও খেদের বিষয় এই যে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে উহার ব্যবহার ছিলনা, তাই বর্ত্তমানে সংস্কৃতভাষা মৃতভাষা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের লোকেরা সংস্কৃত-ভাষাকে "দেবভাষা" বা "অমরভাষা" কহিয়া থাকে। অতি প্রাচীনকালে

শিক্ষিত লোকেরা এই ভাষাই ব্যবহার করিত, আর অশিক্ষিত এবং সাধারণ নীচজাতীয় লোকেরা প্রাকৃত নামে এক অপভ্রষ্ট ভাষা ব্যবহার করিত। এই প্রাকৃতভাষা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে কথিত হইত এবং ইহাদিগকে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী ও পৈশাচী প্রভৃতি নাম দেওয়া হইত। ইহাদের মধ্যে মহারাষ্ট্রী দক্ষিণ দেশগুলিতেই, শৌরসেনী মথুরার পার্শ্ববর্ত্তী ব্রজমণ্ডলে, মাগধী মগধ প্রভৃতি দেশগুলিতে এবং পৈশাচী বনবাসী ও নীচজাতীয় লোকদিগের দ্বারা কথিত হইত। হিন্দুস্থানে আজকাল ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কথিত হিন্দী, বাঙ্গালা, মারহাটী, পাঞ্জাবী, গুজরাতী প্রভৃতি ভাষা সকলই এই প্রাকৃত ভাষা হইতে বহির্গত হইয়াছে এবং ইহারা উহাদেরই রূপান্তর মাত্র।

সংস্কৃতভাষার গ্রন্থসমূহকে আমরা সাধারণতঃ ধর্ম্মগ্রন্থ ও সাহিত্যগ্রন্থ এই দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথমতঃ যাহাতে বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়গুলি বলা হইয়াছে সেগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ এবং যাহাতে প্রধানতঃ সাহিত্যের বিষয় বলা হইয়াছে সেগুলিকে সাহিত্যগ্রন্থ বলা যাইতে পারে। যেমন সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থগুলিতে সাহিত্যের অভাব নাই সেইরূপ সংস্কৃত সাহিত্যগ্রন্থও ধর্ম্মবিষয়ক কথাবার্ত্তায় পরিপূর্ণ, তথাপি ধর্ম্মগ্রন্থগুলিতে প্রধানতঃ ধর্ম্মের এবং সাহিত্যগ্রন্থগুলিতে প্রধানতঃ সাহিত্য রসপ্রধান বিষয় থাকায় এইরূপ বিভাগ করা গেল।

সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ আঠার ভাগে বিভক্ত এবং এই অষ্টাদশ বিদ্যা বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। এই অষ্টাদশ বিদ্যার মধ্যে চতুর্ব্বেদ, চতুরুপবেদ, ষড়্‌বেদাঙ্গ, এবং চতুরুপাঙ্গ গণিত হইয়া থাকে। চতুর্ব্বেদের নাম ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব। চতুরুপবেদের নাম আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ, এবং অর্থশাস্ত্র। ষড়্‌বেদাঙ্গের নাম শিক্ষা, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, কল্প, জ্যোতিষ এবং ছন্দঃ। পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্রকে চতুরুপাঙ্গ বলা হইয়া থাকে। নিম্নে ইহাদের প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

(২)

বেদ।

চারবেদের মধ্যে ঋগ্বেদ বিস্তারে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং বিশেষ গবেষণার যোগ্য। ঐতিহাসিকগণের সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহাই অন্যান্য বেদ অপেক্ষা অধিক প্রাচীন। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ১০১৭ সূক্ত বা মন্ত্রসমষ্টি পাওয়া যায়। প্রত্যেক মন্ত্রের নাম ঋক্। ঋগ্বেদের দুইরকমে বিভাগ করা হইয়াছে। প্রথম বিভাগানুসারে এই গ্রন্থে আট আট অধ্যায়যুক্ত আটটী অষ্টক এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে কয়েকটী বর্গ এবং প্রত্যেক বর্গে কয়েকটী করিয়া মন্ত্র আছে। (এই বিভাগটী পাঠে সুবিধার জন্য কেবল পুস্তকের আকারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া করা হইয়াছে।) দ্বিতীয় বিভাগানুসারে ঋগ্বেদে ১০টী মণ্ডল আছে, প্রত্যেক মণ্ডলে কয়েকটী অনুবাক এবং প্রত্যেক অনুবাকে কয়েকটী করিয়া সূক্ত এবং প্রত্যেক সূক্তে কয়েকটী করিয়া ঋক্ আছে। আর্য্যদিগের প্রাচীন সিদ্ধান্তানুসারে বেদ ঈশ্বরপ্রণীত, কিন্তু আধুনিক মতানুসারে ঋষিরাই বেদের প্রণেতা। ঋগ্বেদের প্রথম ও দশম মণ্ডল ভিন্ন

অবশিষ্ট মণ্ডলগুলির এক একজন ঋষি এবং প্রথম ও দশম মণ্ডলের একাধিক ঋষি বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই বিভাগটী বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে সম্পাদিত হইয়াছে, এখানে শুধু পুস্তকের আকারের দিকে লক্ষ্য রাখা হয় নাই—কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ঋষি অনুযায়ী মন্ত্রগুলির ভাগ করা হইয়াছে; পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা এই বিভাগানুসারেই চলিয়া থাকেন। বেদের মন্ত্রভাগের নাম সংহিতা। শাকল্য ঋষি প্রত্যেক মন্ত্রের পদপাঠ অর্থাৎ মন্ত্রের প্রত্যেক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন সম্পূর্ণরূপ সন্ধি-সমাস-প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া পৃথকভাবে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। বেদগুলির কোন্ মন্ত্রের বিনিয়োগ কোন্ প্রকরণে করা উচিত ইহা জানাইবার জন্য ব্রাহ্মণগ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। বেদের মত ব্রাহ্মণেও সকল মন্ত্র সস্বর লিখিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদে প্রায়ই গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ এবং জগতী এই তিন ছন্দে লিখিত মন্ত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঋগ্বেদের মন্ত্রে অনেক দেবতার স্তুতি করা হইয়াছে এবং ঐ মন্ত্রগুলি দ্বারা প্রার্থনা করা হইয়াছে যে তাঁহারা যেন নিজ নিজ ভক্তগণকে বিপত্তি হইতে রক্ষা করেন এবং উহাদের শত্রুগণের বিনাশ সাধন করেন। প্রাচীনকালের ঋষিদিগের ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল এবং যে সব দেবতাকে উঁহারা ঈশ্বরের শক্তি মনে করিতেন তাঁহারা সজ্জনদিগের রক্ষক এবং দুষ্টদিগের সংহারক বলিয়া তাঁহাদের ধারণা ছিল। ঋগ্বেদে অদিতি, দ্যৌ, অগ্নি, সূর্য্য, বরুণ, উষস্, অশ্বিনীকুমার, ইন্দ্র, মরুৎ, রুদ্র, বিষ্ণু (সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর) এবং যম ইত্যাদি দেবতাগণের স্তুতির মন্ত্র আছে। সিন্ধু এবং সরস্বতী এই দুইটী নদীরও স্তুতি আছে। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিতে প্রজাপতি ও মিত্রাবরুণের এবং স্থানে স্থানে কোন কোন গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরার এবং উর্ব্বশী, পুরুরবা, মনু, ইক্ষ্বাকু, ত্রসদস্যু, পুরুকুৎস, সুদাস, দশরথ, রাম, পুরু, যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু, এবং মনুর সন্তানগণের ও ভরতাদি কুরুবংশীয় রাজাদিগের এবং বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিদিগেরও উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে হিমালয়পর্ব্বত এবং পাঞ্জাবের সবগুলি নদীরও নাম আছে যথা সিন্ধু, বিতস্তা (ঝিলম্), পরুষ্ণী বা ইরাবতী (রাবী), বিপাশা (ব্যাস), চন্দ্রভাগা (চনাব), শতদ্রু (সতলজ), কুভা (কাবুল) সুবস্তু (সোয়াত্), ক্রমু (কুরুম্), গোমতী (গোলাম) আর গঙ্গা ও যমুনার নামও প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়িয়াছে; এই সময়ের লোকদিগের খাদ্য প্রধানতঃ গম এবং যব ছিল।

ঋগ্বেদের সময়ে যে লোকেরা সোণারূপাপ্রভৃতির ব্যবহার জানিত ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে বন্য পশুগুলির মধ্যে সিংহ, বৃক, বরাহ, ভল্লুক, বানর এবং হাতী আর গৃহপালিত পশুদিগের মধ্যে ঘোড়া, গরু, ভেড়া, ষাঁড়, কুকুর, গাধা এবং মহিষ, ও পক্ষীদিগের মধ্যে হাঁস, তোতা, ময়ুর, কাক প্রভৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে। সর্পের বিষয়ও প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে এবং উহাদিগকে মনুষ্যজাতির শত্রু বলিয়া বর্ণনা করা হইত।

ঋগ্বেদের দ্বারা ঐ সময়ের ভারতবাসীদিগের চালচলন, ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। পিতা গৃহে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা বলিয়া ধারণা ছিল, এবং স্ত্রীপুরুষ উভয়ে মিলিয়া বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন এবং স্ব স্ব সন্তানগণের মঙ্গল কামনা করিতেন। স্ত্রীলোকদিগের বড় আদর করা হইত এবং স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাভ্যাস করিত। এমন কি স্ত্রীলোকেরা কোন কোন বৈদিক সুক্তের ঋষি পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। বিবাহের বিধি ঐ সময়ে

যে রকম ছিল, প্রায় সেইরূপই আজকালও হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। কন্যা নিজের ইচ্ছানুসারেও বর খুঁজিয়া লইতেন। বিধবারও কখন কখন পুনর্ব্বিবাহ হইত। কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে আজকালকার মত তখনও লোকে সুখী হইত না। চোরের দণ্ড এবং অর্থাদি ধার করার প্রথা তখনও প্রচলিত ছিল।

মৃতগণকে পোড়ান হইত এবং কখনও কখনও মাটীতেও পুতিয়া রাখা হইত। ঐ সময়ের লোকদিগের খাদ্য প্রধানতঃ দুধ, ঘি, যব ও গম ছিল। খাদ্য কখনও বা পিষিয়া আটার রুটী প্রস্তুত করিয়া, কখনও বা ভাজিয়া, আর কখনও বা ক্ষীরের মত করিয়া খাওয়া হইত। শাকপাতা, তরকারী, এবং ফলও তখন আহার করা হইত। মাংসের উল্লেখও পাওয়া যায়, (তবে যজ্ঞে ভিন্ন কেহ কখনও মাংস খাইত না)। লোকেরা যজ্ঞে সোমলতার রস দেবতাদিগকে অর্পণ করিয়া পান করিত। জুয়াখেলা এবং মদ খাওয়া পাপকার্য্য বলিয়া ধারণা ছিল। প্রত্যেক গৃহস্থ তখন অগ্নিহোত্রী ছিলেন। ক্ষেত্রের কার্য্য, বাণিজ্য এবং পশুপালনাদি কার্য্য বৈশ্যেরা করিতেন। ব্রাহ্মণ পৌরহিত্য করিতেন, পূজাপ্রভৃতি কার্য্য করিতেন ও করাইতেন। ঋণপরিশোধের প্রথা তখনও প্রচলিত ছিল। শস্ত্রবিদ্যার যথোচিত অভ্যাস করিয়া রাজা প্রজার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন এবং বৃদ্ধবয়সে শাসনের ভার স্বীয় সন্তানগণের উপর সমর্পণ করিয়া যাইতেন। ঢোল (দুন্দুভি), বীণা বাঁশী (বীণ) প্রভৃতি বাদ্য বাজান এবং গানগাওয়াও ঐ সময়ে প্রচলিত ছিল। বাণিজ্যে বহুবিধ গরুর দ্বারা বস্তুর মূল্য নির্দ্ধারিত হইত। কাঠ, চেলা ও ধাতু প্রভৃতির কার্য্যও হইত এবং ইহাদের দ্বারা রথ, নিশান, প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। কাপড় বুনান এবং চামড়ার কার্য্যও হইত। সমুদ্র যাত্রার প্রচলন তখনও ছিল। দান গৃহস্থের এক প্রধান কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত এবং জনসাধারণের পাঠের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। নীতি, ধর্ম্ম, দর্শন, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে পণ্ডিতগণ বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিতেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং শূদ্র এই চার জাতি এবং সেই সময়ে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চার আশ্রম ছিল।

যজুর্ব্বেদের মন্ত্র যজ্ঞকর্ম্মে পুরোহিতদিগের (অধ্বর্য্যুদিগের) জন্য লিখিত হইয়াছিল। যজুর্ব্বেদের মুখ্যতঃ কর্ম্মকাণ্ডের সহিতই সম্বন্ধ। যজুর্ব্বেদস্থ প্রায় অর্দ্ধেক মন্ত্রই ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের যে মন্ত্রগুলি যজ্ঞাদিক্রিয়াকলাপের সময় পঠিত হয় তাহাকেও যজুঃ বলে। এই বেদের দুইটী ভাগ আছে,—কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ বা তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং শুক্লযজুর্ব্বেদ বা বাজসনেয়িসংহিতা। যে ভাগ মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়নের দ্বারা সঙ্কলিত হইয়াছিল তাহাকে কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ এবং যে ভাগ বৈশম্পায়নের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য দ্বারা সঙ্কলিত হইয়াছিল তাহাকে শুক্ল যজুর্ব্বেদ বলা হয়। (এই বিষয়ে একটী সুন্দর গল্প আছে—মহামেরুতে ঋষিদিগের একটী মহাসভা হয়, এই সভায় ঋষিগণ বলিলেন "যে ঋষি আমাদের এই সভায় না আসিবেন তাঁহার ব্রহ্মহত্যা পাতক হইবে।" বৈসম্পায়ন এই সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহার এই পাতক হইল—তাঁহার বার্দ্ধক্যজনিত অসামর্থ্য বশতঃ তিনি শিষ্যগণকে কঠোর তপস্যা দ্বারা তাঁহার ব্রহ্মহত্যা পাপ মোচন করিতে প্রতিনিধি অর্পণ করিলেন। এই আদেশ প্রদান সময়ে যাজ্ঞবল্ক্য নামক তাঁহার একজন শিষ্য অনুপস্থিত ছিলেন। কিছুকাল

পরে তিনি আসিয়া বলিলেন যে যে-সব শিষ্যেরা তপস্যা করিতেছে তাহারা হীনবীর্য্য এবং তাহারা রীতিমত তপস্যা করিতে অসমর্থ, আর নিজে গুরুর হিতার্থে তপস্যা করিতে অনুমতি চাহিলেন। শিষ্যের এইরূপ ঔদ্ধত্যে গুরু অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট হইতে অধীত সকল বিদ্যা ফিরাইয়া চাহিলেন, যাজ্ঞবল্ক্যও তখন সেগুলি ক্রোধভরে প্রত্যর্পণার্থ উদ্গীরণ করিলে উপস্থিত শিষ্যগণ তিত্তিরী পাখী হইয়া সেগুলি গলাধঃকরণ করিলেন, তাই তাঁহাদের বেদাংশের নাম হইল তৈত্তিরীয় সংহিতা, আর যাজ্ঞবল্ক্য তারপর সূর্য্যের আরাধনা করিয়া যে বেদাংশ সঙ্কলিত করেন তাহার নাম হইল বাজসনেয়ি সংহিতা, কারণ অনেকে বলেন যে যাজ্ঞবল্ক্য বাজসনির পুত্র ছিলেন)। যজুর্ব্বেদের মন্ত্রে গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদীর এবং কুরুপাঞ্চাল প্রভৃতি দেশের নাম আছে। রুদ্রের মহাদেব, শঙ্কর, শিব ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামও ইহাতেই প্রথম পাওয়া যায়। বিষ্ণুর নামেরও ইহার মন্ত্রে উল্লেখ আছে।

সামবেদের মন্ত্র গান করিয়া পঠিত হয়। এই বেদে প্রায় ১৫৪৯টী মন্ত্র আছে, তন্মধ্যে কেবল ৭৫টী সামমন্ত্র ভিন্ন অবশিষ্ট সকলই ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। সোমযাগে সামমন্ত্রগুলি গান করিতে হয়।

অথর্ব্ববেদে প্রায় ৬০০০ মন্ত্র আছে, তন্মধ্যে প্রায় ১২০০ মন্ত্র ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদের মন্ত্রগুলিরও কর্ম্মকাণ্ডের সহিতই সম্বন্ধ রক্ষিত হইয়াছে। জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু এবং রাজ্যাভিষেক প্রভৃতির কার্য্যবিষয়ক মন্ত্র এবং মারণ, উচাটন, আরোগ্য, চিরজীবিতা, শত্রুনাশাদির উপযোগী মন্ত্রও এই বেদে সঙ্কলিত আছে। বিশেষভাবে ঐহিক বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ থাকায় পারলৌকিক (ঋক্, যজু, ও সাম) ত্রয়ীর সহিত স্বাধ্যায়ে ইহার পাঠের বিধি মানা হয় না।

উপরে যে চারবেদের বর্ণনা করা গেল, উহাদ্বারা কেবল সংহিতা বা মন্ত্রভাগ বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ এই বেদ কখন রচিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। অনাদিকাল হইতে সৃষ্টি চলিয়া আসিতেছে সেইরূপ ঋষিপ্রোক্ত মন্ত্রও সংসারে অনাদিকাল হইতেই প্রচলিত আছে। তবে যে যে বৈদিক মন্ত্রে যে যে ঋষি বা রাজা প্রভৃতির উল্লেখ আছে সেই মন্ত্র সকল সেই সেই ঋষি বা রাজার সময়ে (বা তাহার পরে) কথিত হইয়াছিল ইহাও আমরা মানিয়া লইতে পারি। যেমন—যে মন্ত্রে রাজা ভরতের নাম পাওয়া যায় তাহা রাজা ভরতের সময়ে বা তাহার পরে কথিত হইয়াছিল। কিন্তু সকল বৈদিক মন্ত্রের সময়ের এইরূপ কোন সন্ধান না পাওয়ায় ইহা বলাও অনুচিত হইবে না যে বেদ অনাদি। এই হেতু ইহাও বলা যায় না। মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ে পরাশরের পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বৈদিক মন্ত্রগুলির সঙ্কলন করিয়াছিলেন, এই সঙ্কলন যে আজকাল যতটা পাওয়া যায় এই পর্য্যন্তই ছিল কিনা তাহারও কিছু ঠিক নাই। বেদের সময় এবং সমগ্রভাগ কোন ঐতিহাসিক নিয়মে বিদিত হওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। তবে বেদের সঙ্কলন করিয়াছিলেন বলিয়াই কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নাম বেদব্যাস (বেদ—বি+অস্+ঘঞ্) বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিদ্বারা এইরূপ বলাই উচিত যে বেদের প্রচলিত মন্ত্রগুলির সঙ্কলন প্রায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়েই হইয়াছিল।

এই ত গেল সংহিতার কথা, কেবল সংহিতাভাগকেই বেদ বলিয়া মানা অন্যায়। বেদে ব্রাহ্মণ, সূত্র, আরণ্যক এবং উপনিষদভাগও সম্মিলিত আছে। এই হেতু উক্ত গ্রন্থগুলিকেও বেদ বলিয়াই স্বীকার করা হয়। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রক্রিয়া নির্দ্দেশ করিবার জন্য তৎ-সংশ্লিষ্ট আখ্যানসমূহ ব্রাহ্মণ নামক বৈদিক গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। উপাসনা অর্থাৎ দেবপূজন বা ধ্যান এবং জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ রাখিবার জন্য যে বেদে নানা বিষয়ের বর্ণনা আছে তাহাদের নাম আরণ্যক এবং উপনিষদ্। প্রত্যেক বৈদিক সংহিতার সহিত সম্বদ্ব ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ আছে। আরণ্যক বনবাসী ঋষিরা স্ব স্ব (অধিকারী) শিষ্যগণকে নিজ নিজ আশ্রমে যে শিক্ষা প্রদান করিতেন তাহা লিখিত আছে এবং উপনিষদে অনেক উপখ্যানাদির দ্বারা এক আত্মা অথবা ব্রহ্মের সিদ্ধি সংস্থাপিত করা হইয়াছে। উপনিষদ্গুলির সিদ্ধান্তও অদ্বৈতবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বেদ সঙ্কলনের সময়ের মত এই ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, এবং উপনিষদ্ গ্রন্থগুলির সঙ্কলন সময়ের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। শতপথ ব্রাহ্মণে পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় এবং তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের নাম পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা অনুমান করা হইয়া থাকে যে এই গ্রন্থখানি জনমেজয়ের কিছু পরে লিখিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা অনুমান করা যায় যে সংহিতাভাগ এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্কলনে (ব্যাস হইতে জনমেজয়) প্রায় দেড়শত বৎসরের অধিক সময়ের ভেদ হয় নাই।

(৩)

উপবেদ

চার উপবেদের মধ্যে ঋগ্বেদের উপবেদ "আয়ুর্ব্বেদ" বা বৈদ্যকশাস্ত্র। আয়ুর্ব্বেদের সূত্র, শারীর, ঐন্দ্রিয়, চিকিৎসা, নিদান, বিমান, বিকল্প ও সিদ্ধিভেদে আটটী স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহার নির্ম্মাণকর্ত্তা ব্রহ্ম, প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র ও ধন্বন্তরী, ভরদ্বাজ, আত্রেয় এবং অগ্নিবেশ ইত্যাদি ঋষি। এই ঋষিদিগের গ্রন্থের সারভাগ গ্রহণ করিয়া চরক এক সংক্ষিপ্ত বৈদ্যকগ্রন্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাই চরক সংহিতা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অনেকে বলিয়া থাকেন চরক কাশ্মীরের তুরস্করাজ কনিষ্কের রাজবৈদ্য ছিলেন। এই মতে চরক সংহিতা দ্বিতীয় বিক্রমশতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল। চরক সংহিতায় পূর্ব্বোক্ত আটটী স্থানেরই বিভিন্ন প্রকরণ আছে। সুশ্রুত নামক পণ্ডিত "সুশ্রুত সংহিতা" নামে আর একখানা বৈদ্যকগ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে মাত্র ৫ টী স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থে ঘা চেড়াফাড়ার প্রক্রিয়া এবং কোন ঘাকে ঔষধ প্রদানের উপযুক্ত করিবার জন্য প্রায় ১২৭ টী যন্ত্রের বর্ণনা করা হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন যে সুশ্রুত চতুর্থ বিক্রমশতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। সুশ্রুতের পরে বাগভট প্রভৃতি কয়েকজন পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষায় আরও কয়েকখানি বৈদ্যকগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলি দেখিলে স্পষ্টভাবে বিদিত হওয়া যায় যে প্রাচীনকালে হিন্দুগণ বৈদ্যক বা চিকিৎসাশাস্ত্রে কত উন্নতি করিয়াছিলেন।

কামশাস্ত্রও আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্গত, কারণ সুশ্রুত আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে "বাজীকরণ" নামক কামশাস্ত্রের কথা বলিয়া গিয়াছেন। বাৎস্যায়ন প্রণীত পঞ্চাধ্যায়যুক্ত একখানি কামশাস্ত্র এখনও পাওয়া যায়। কামশাস্ত্রের উদ্দেশ্য বিষয়বৈরাগ্য; কারণ শাস্ত্রোল্লিখিত পথেও বিষয় ভোগ করিলে পরিণামে দুঃখই ভোগ করিতে হয়।

যজুর্ব্বেদের উপবেদের নাম ধনুর্ব্বেদ, বিশ্বামিত্র নামক ঋষি ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাতে চারিটী পাদ আছে, যথা—দীক্ষাপাদ, সংগ্রহপাদ, সিদ্ধিপাদ এবং প্রয়োগপাদ। এই ধনুর্ব্বেদ কবে কবে রচিত হইয়াছিল তাহা ঠিক ঠিক নির্ণয় করা কঠিন। ধনুষ্ শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধই আছে, কিন্তু ধনুর্ব্বেদ শব্দে ধনুষ্ শব্দ দ্বারা আয়ুধমাত্রের গ্রহণ করা হইয়াছে। আয়ুধ চার রকমের হইয়া থাকে—প্রথমতঃ যাহা নিক্ষেপ করা হয় তাহা "মুক্ত" যেমন চক্রাদি, দ্বিতীয়তঃ যাহা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মুষ্টিবদ্ধ ভাবেই চালিত হইয়া থাকে তাহা "অমুক্ত" যেমন খড়্গাদি, তৃতীয়ত: যেগুলি দুই প্রকারেই অর্থাৎ নিক্ষেপ করিয়া এবং মুষ্টিবদ্ধ ভাবে চালিত হইয়া থাকে তাহা "মুক্তামুক্ত" যেমন গদা, শল্য, বর্শা প্রভৃতি, আর চতুর্থতঃ যেগুলি যন্ত্রদ্বারা চালিত হইয়া থাকে তাহাদিগকে যন্ত্রমুক্ত বলা হইয়া থাকে, যথা বাণ, শতঘ্নী ইত্যাদি। মুক্ত আয়ুধকে "অস্ত্র" এবং অমুক্ত আয়ুধকে "শস্ত্র" বলা বলা হয়।

সামবেদের উপবেদ গান্ধর্ব্ববেদ বা সঙ্গীতশাস্ত্র। এই বিষয়ের একখানি গ্রন্থ ভরত মুনি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে নাট্যশাস্ত্র নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। এই গ্রন্থে গান, বাদ্য এবং নৃত্যের নানাবিধ ভেদ কথিত হইয়াছে; ভরত মুনির ঠিক সময় নির্দ্ধারণ করা যায় না।

অথর্ব্ববেদের উপবেদের নাম অর্থশাস্ত্র। ইহার অনেক শাখা আছে; (১) নীতিশাস্ত্র (২) শালিহোত্র (অশ্ববিদ্যা) (৩) শিল্পশাস্ত্র (কারিগরি) (৪) সূপশাস্ত্র (পাকবিধি) প্রভৃতি ৬৪ কলার বিষয় এই শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে শুক্র, বিদুর, কামন্দক, চাণক্য প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত নীতিশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। যদিও চাণক্যের সময় বিক্রম হইতে প্রায় ২৬৩ বৎসর পূর্ব্বে বলিয়া একরূপ নিশ্চিত হইয়াছে এবং চাণক্যের অর্থশাস্ত্র এই বিষয়ের একখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, তথাপি অর্থশাস্ত্রের প্রত্যেক শাখার বিস্তারের সময় ঠিক ঠিক নির্ণয় করা কঠিন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী।

যবক্ষারজানের জন্মান্তর রহস্য

সকলেই অবগত আছেন যে আমাদের এই পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে উর্দ্ধে প্রায় পঞ্চাশ মাইল বিস্তৃত বায়ুমণ্ডলের এক বেষ্টনী রহিয়াছে, ইহা হয়ত কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে, এই বায়ুই আমাদের জীবন রক্ষার প্রধান সহায়। যাবতীয় জীবজন্তু ও উদ্ভিদ্ এই বায়ুর অভাবে অল্প সময়ও বাঁচিয়া থাকিতে অক্ষম, পৃথিবীতে প্রাণী ও উদ্ভিদের সৃষ্টি ও রক্ষা ইহার অভাবে কিছুতেই সম্ভব হইত না। পূর্ব্বপ্রকাশিত "তরল বায়ু" নামক প্রবন্ধে ইহার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছি, বায়ুর অবয়ব ও উপাদান সম্বন্ধেও উক্ত প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে বায়ুর দুইটি প্রধান উপাদান, অম্লজান ও যবক্ষারজান নামক দুইটি মারুত পদার্থ; একশত ভাগ বায়ুতে প্রায় ৭৮ ভাগ যবক্ষারজান ও ২১ ভাগ অম্লজান রহিয়াছে, ইহার মধ্যে অম্লজানের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে পূর্ব্ব প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছি। যবক্ষারজানের গতিবিধি ও কার্য্যকারিতা আলোচনাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। অম্লজানের প্রখর ক্রিয়াকে মৃদুভাবাপন্ন করা ব্যতীত প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহগঠনে ইহার বিশেষ কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হয়। ইহা প্রাণী ও উদ্ভিদ্ দেহের একটি প্রধান উপাদান। প্রাণিগণ বায়ুমণ্ডল হইতে সহজ ভাবে মৌলিক যবক্ষারজান গ্রহণে অক্ষম। অধিকাংশ উদ্ভিদও বায়ু হইতে মৌলিক যবক্ষারজান গ্রহণপূর্ব্বক শরীরপুষ্টি করিতে সক্ষম নহে। শুধু এক জাতীয় উদ্ভিদ্ যাহাদিগকে "লেগুবিনোসি" বলা হয়, যথা সিম, মটর ইত্যাদি, মৌলিক যবক্ষারজান গ্রহণে সমর্থ। এই জাতীয় উদ্ভিদের শিখরশাখায় এক প্রকার বীজাণু বাস করে, ইহাদের নাম "সিন্‌বাইয়োটিক" বা সহজীবী জীবাণু। ইহাদেরই সহযোগিতায় এই জাতীয় উদ্ভিদ্‌গণ বায়ু হইতে মৌলিক যবক্ষারজান সহজভাবে গ্রহণপূর্ব্বক শরীর সংগঠন ও পোষণ করে, উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তরে এই যবক্ষারজান যৌগিক উদ্ভিজ্জ আমিষে বা "Vegetable protein"এ পরিণত হয়। এতদ্ব্যতীত বায়ু মণ্ডলের উর্দ্ধপ্রদেশে তাড়িতশক্তির প্রভাবে বায়ুর উপাদানদ্বয় অম্লজান ও যবক্ষারজান মারুতের প্রায়ই রাসায়নিক সংযোগ ঘটিতেছে। এই যৌগিক যবক্ষারজান ঘটিত মারুত পদার্থ বৃষ্টিজলে ধৌত হইয়া পৃথিবীতে জমির উপর পতিত হয়। এইরূপে জমিতে যবক্ষারাম্লের উৎপত্তি হয়, ইংরাজীতে ইহাকে নাইট্রিক ও নাইট্রাস এসিড বলা হয়। এই যবক্ষারাম্ল উদ্ভিদগণের একটি প্রধান খাদ্য, মাটীর আভ্যন্তরীণ ক্ষার সংযোগে এই যবক্ষারাম্ল আবার সোরা বা যবক্ষারলবণে পরিণত হয়, ইহাও উদ্ভিদের একটি প্রধান খাদ্য। এই হেতু সোরা জিনিষটি একটি অতি আবশ্যকীয় সাররূপে কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। যবক্ষারাম্ল ও যবক্ষার লবণ উদ্ভিদ্‌দেহে প্রবেশ লাভ করিয়া পূর্ব্ববর্ণিত উদ্ভিজ্জ আমিষের সৃষ্টি করে। প্রাণিগণ নানাবিধ উদ্ভিজ্জ পদার্থ খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাদের নিজ শরীর পোষণোপযোগী যবক্ষারজানের সংগ্রহ করিয়া থাকে। প্রাণীদেহে এই সমস্ত উদ্ভিজ্জ আমিষ বা যৌগিক যবক্ষারজান ঘটিত পদার্থ পাচক রসের ক্রিয়ায় পরিবর্ত্তিত হইয়া পুনরায় প্রাণীজ আমিষের সৃষ্টি করে, ইহাতেই প্রাণীগণের শরীরের পুষ্টি ও গঠন

হয়। শরীর গঠনের প্রয়োজনাতিরিক্ত আমিষ বা যৌগিক যবক্ষারজানঘটিত পদার্থ শরীরের ক্রিয়ায় বিকৃত হইয়া মলমূত্র সহযোগে প্রাণীদেহ হইতে বিনির্গত হয়।

এই প্রাণিদেহবিনিসৃত যবক্ষারজানঘটিত বিকৃত যৌগিক পদার্থ জমির উপর পতিত হইয়া নানাবিধ জীবাণু সহযোগে বিবিধ প্রকারে আরো পরিবর্ত্তিত হয়। পরিশেষে এমোনিয়াঘটিত লবণে (এমোনিয়া একটি যবক্ষারজানঘটিত পদার্থ) ও যবক্ষারাম্লে বা যবক্ষার লবণে ইহাদের পরিণতি ঘটে, প্রস্রাবের যায়গায় যে উৎকট গন্ধ পাওয়া যায়, এমোনিয়ার উৎপত্তিই ইহার প্রধান কারণ। তখন পুনরায় উদ্ভিজ্জদেহে উহারা প্রবেশ লাভ করিয়া উদ্ভিজ্জ আমিষের সৃজন করে। অন্যদিকে আবার যখন উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর মৃত্যু হয়, তখন উহাদের দেহ জমির উপর ও অভ্যন্তরে পচিতে থাকে। নানা জীবাণু সংযোগে তাহাদের দেহের যৌগিক যবক্ষারজানঘটিত পদার্থ সমূহের (অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ আমিষের) বিবিধ বিকার ঘটিতে আরম্ভ হয়। ইহার ফলে যবক্ষারজান সমষ্টির একাংশ মুক্ত মারুত রূপে পুনরায় বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ লাভ করে। অধিকাংশ এমোনিয়াঘটিত লবণ যবক্ষারাম্ল ও যবক্ষার লবণে পরিণত হইয়া পুনরায় উদ্ভিদের খাদ্যরূপে উদ্ভিদ্দেহে প্রবেশ করে, আবার প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে যেমন জমির উপর সর্ব্বদা এমোনিয়া ঘটিত লবণ, যবক্ষারাম্ল ও যবক্ষার লবণের সৃষ্টি হইতেছে সেইরূপ এই সমস্ত যবক্ষারজান ঘটিত পদার্থ সমূহও এক প্রকার ধ্বংসকারী জীবাণু সহযোগে অহরহ বিনষ্ট হইয়া বায়ুমণ্ডলে মুক্ত যবক্ষারজান মারুতের আমদানী করিতেছে। অতএব আমরা দেখিতে পাই যে যেই যবক্ষারজান বায়ুমণ্ডল হইতে নানাবিধ সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদেহে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল তাহাই আবার বিবিধ ধ্বংসপ্রক্রিয়ার সাহায্যে বায়ুমণ্ডলে পুনরাবর্ত্তন করে। আজ যেই যবক্ষারজানের অণুটি ঊর্দ্ধাকাশে নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে, কালই হয়তঃ উহা বায়ুমণ্ডলের তাড়িত শক্তির প্রভাবে অম্লজানের অণুর সহিত রাসায়ণিক মিলনসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের যুগল জীবন যাত্রা আরম্ভ করিবে। এমন সময়ে হঠাৎ একদা নীলাকাশে কালো মেঘের উদয় হইয়া ঘনঘটার সৃষ্টি করিবে, হয়ত দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বারিবর্ষণ আরম্ভ হইবে। আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত যবক্ষারাম্লজান দম্পতীটিও বারিবিন্দুতরণীতে আরোহণ করিয়া নূতন বেশে ধরাতলে উপস্থিত হইবে। ধরাতল হইতে নানাবিধ অণুর সহিত সন্ধিবিগ্রহের পর উহা উদ্ভিদ্দেহে প্রবেশ লাভ করিবে। উদ্ভিদ্ দেহে কিছুকাল জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পর খাদ্যরূপে প্রাণীদেহে আশ্রয় লাভ করিবে। প্রাণীদেহ হইতে হয়ত পরদিবসেই মলমূত্ররূপে বিনিঃসৃত হইয়া পুনরায় ধরাতলে আগমন করিবে, কিম্বা কিছুকাল প্রাণীদেহে সহবাস করিয়া প্রাণীর মৃত্যুর পরে আবার ধরাতল আশ্রয় করিবে। অন্যবিধ অণুর সহিত তাহার মিলনসূত্র বিচ্ছিন্ন হইলে সে মুক্তিলাভ করিয়া ধরাতল হইতে পুনরায় তাহার আদিম আবাস বায়ুমণ্ডলে পলায়ন করিবে। কিন্তু ইহাতেও নিস্তার নাই, বায়ুমণ্ডলে হয়ত আবার পরমুহূর্ত্তেই তাড়িত শক্তিসহযোগে তাহাকে অম্লজানের অণুর সহিত মিলনসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পুনরায় জন্মমৃত্যুর চক্রে আবর্ত্তিত হইতে হইবে। যদি বিশেষ ভাগ্যবান হয় তবে কিছুকাল নিয়তির

নির্ম্মম হস্ত এড়াইয়া মুক্তাকাশে বিচরণ করিতে পারিবে, কিন্তু একদিন না একদিন তাহার জন্মচক্রে ধরা দিতে হইবে। তাই কবির কথা মনে পড়ে

"অস্তিত্বের চক্রতলে, একবার বাঁধা প'লে
নাহিক নিস্তার!"

নিয়তি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে সঙ্কেত করিয়া যেন বলিয়া দিতেছেন,—"মুক্তি নাই! কাহারো মুক্তি নাই!" তুমি মানুষ হও, জন্তু হও, উদ্ভিদ্ হও, সজীব হও, নির্জীব হও কিছুতেই তোমার মুক্তি নাই! তুমি নিয়তির ক্রীড়ণক মাত্র!"

নিম্নে যবক্ষারজানের জন্মচক্র প্রদর্শিত হইল,—
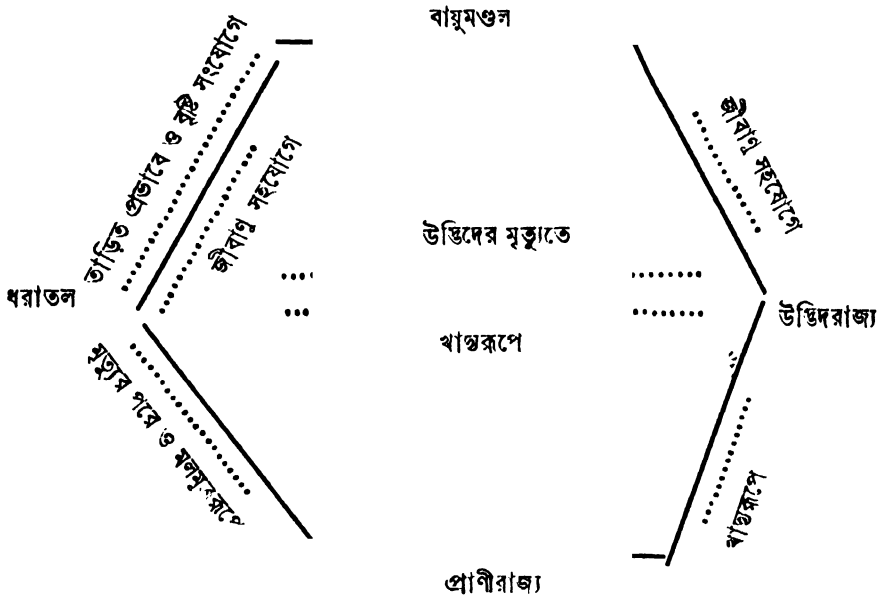
যবক্ষারজানের এই জন্মচক্র সৃষ্টিনীতির এক অতি আবশ্যকীয় শৃঙ্খল রক্ষা করিতেছে; ইহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারিব, প্রকৃতি দেবী তাঁহার রাজ্যে যে নিয়ম বিধান করিয়াছেন,—তাহার কিছুতেই ব্যতিক্রম ঘটিবার উপায় নাই। যবক্ষারজানের পূর্ব্ববর্ণিত জন্মচক্রের দ্বারা বায়ুমণ্ডলের যবক্ষারজানের ও অম্লজানের অনুপাত অপরিবর্ত্তিতভাবে রক্ষিত হইতেছে; এবং প্রাণী ও উদ্ভিদ্ রাজ্যের আবশ্যকীয় খাদ্যের উৎপত্তি, সংস্থান ও সরবরাহ হইতেছে, পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে এই প্রকার প্রকৃতি দেবীর সর্ব্ববিধ বিধানের ভিতর সৃষ্টিরক্ষার একটি গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে এই প্রাকৃতিক বিধানেই যখন প্রাণী ও উদ্ভিদের খাদ্য সংস্থান ঘটিতেছে তখন কৃষিকার্য্যে কৃত্রিম সারের আবশ্যকতা কি? পূর্ব্বোক্ত যবক্ষারজানের জন্মচক্র পরীক্ষা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, বর্ত্তমানে শুধু এই প্রাকৃতিক বিধানের উপর নির্ভর করিলে প্রাণিজগতের খাদ্যসংস্থান ও সরবরাহ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কারণ জীবজগতে বংশবৃদ্ধির দরুণ, সভ্যতার বিস্তারহেতু যবক্ষারজানবহুলখাদ্যের আকাঙ্ক্ষাবৃদ্ধির

জন্য, নানাবিধ রাসায়নিক কারখানায় যবক্ষারজান ঘটিত পদার্থের ব্যবহারের দরুণ এবং সভ্যতাভিমানী যুদ্ধপ্রিয় মানবজাতির যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম বারুদ ও বিস্ফোরক প্রস্তুতের জন্য যবক্ষারজানঘটিত পদার্থ সমূহের আবশ্যকতা ও অভাব ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে, এতদ্ব্যতীত মানবজাতির খাদ্যবিচারের দিক্ হইতে দেখিলে আমরা দেখিতে পাইব যে প্রকৃতিজাত যবক্ষার জানঘটিত পদার্থ মাত্রই মানব বা জন্তুগণের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। প্রথমতঃ এমন অনেক উদ্ভিদ্ রহিয়াছে যাহা মানব বা জন্তুর খাদ্যরূপে গৃহীত হয় না, সুতরাং তাহাদের দেহসঞ্চিত যবক্ষারজান ঘটিত পদার্থ প্রাণিগণের খাদ্যহিসাবে মূল্যহীন; আবার প্রাণিগণের দেহবিনিসৃত মলমূত্রাদি নদীপথে সমুদ্রে যাইয়া পড়িতেছে, অতএব উহাদের আভ্যন্তরীন যবক্ষারজানঘটিত পদার্থ সমূহ শুধু সামুদ্রিক জীবজন্তু বা সামুদ্রিক উদ্ভিদের উপভোগে আসিতে পারে। তাহাতে মানবজাতির কোন উপকার ঘটে না, এতদ্ব্যতীত যথেষ্ট যবক্ষার লবণ বা যবক্ষারাম্ল ধরাতল হইতে বৃষ্টিজলের সাহায্যে ধৌত হইয়া নদী বা সমুদ্রের জলে মিলিতেছে, ইহাও মানবজাতির কোনও কাজে আসিতে পারে না। এই কারণেই কৃত্রিম সারের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে, যবক্ষারজানঘটিত কৃত্রিম সার নানাবিধ উপায়ে সংগৃহীত হইতেছে। প্রথমতঃ কয়লা পোড়াইয়া যখন জ্বালানি গ্যাস তৈয়ারী হইয়া থাকে, উহার সঙ্গে নানাবিধ যবক্ষারজানঘটিত পদার্থেরও উৎপত্তি হয়। ইহাদের বেশীর ভাগ এমোনিয়াঘটিত লবণ ও এমোনিয়া। এই সমস্ত পদার্থ মূল্যবান সাররূপে কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়তঃ দক্ষিণ আমেরিকার চিল্লী প্রভৃতি প্রদেশের সমুদ্রোপকূলে অতি বিস্তৃত যবক্ষার-লবণের স্তর রহিয়াছে। ইহা হইতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মণ যবক্ষারলবণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র রপ্তানী হইয়া থাকে। যবক্ষারজানঘটিত পদার্থের সরবরাহের ইহাই একটি প্রধান স্থান। এবং এই স্তর হইতে বৎসর বৎসর যেই পরিমাণ যবক্ষারলবণ ক্ষয় হইতেছে, তাহাতে বিশেষজ্ঞরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে আর ১৫।২০ বৎসরের মধ্যে এই স্তর নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। ইহাতে বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের বড়ই ভাবনা হইয়াছিল যে যবক্ষারজানঘটিত সারের অভাবে কৃষিকার্য্যের ব্যাঘাত ঘটিয়া পরিশেষে মানবজাতির খাদ্যাভাব হইয়া পড়িবে। এই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনীয় বিপদের প্রতিকারের জন্য তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়া চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদের লক্ষ্য হইল যবক্ষারজানের অফুরন্ত ভাণ্ডার বায়ুমণ্ডল হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়া কৃষিকার্য্যে লাগাইতে হইবে। আমাদের বায়ুমণ্ডলে ৪,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ টন যবক্ষারজান রহিয়াছে ইহা পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন; পৃথিবীর প্রত্যেক বর্গমাইলের উপর ২০,০০০,০০০ টন যবক্ষারজান আছে। বৈজ্ঞানিকগণ বহু বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁহাদের এই উদ্যমে সফলতা লাভ করিয়াছেন, এই বিষয়ে বারান্তরে বিশেষভাবে বলিবার ইচ্ছা রহিল। সুতরাং এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি যে যবক্ষারজানের বায়ুমণ্ডলে নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইবার অবকাশ শুধু প্রকৃতির বিধানে নহে, মানবের তাড়নায় এবং প্রয়োজনেও ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। দুর্ব্বলের ভাগ্য শুধু বিধির বিধানে নহে, সবলের বিধানেও সর্ব্বদা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। অবশ্য অদৃষ্টবাদী

ভারতবাসী আমরা সবলকে বিধাতারই অস্ত্রস্বরূপ মনে করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে শয্যাগ্রহণ করিব।

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

যবক্ষারজান নামটি ঠিক নহে, যবক্ষার বলিতে যব পোড়াইয়া যে ক্ষার হয় তাহাই বুঝান উচিত কিন্তু বরাবর "যবক্ষারজান" নামের দ্বারা "নাইট্রোজেন" গ্যাসকে বাংলায় লিখা হইতেছে বলিয়া উহা আর এখন পরিবর্ত্তন করিলাম না। যবক্ষারের সঠিক ইংরাজি প্রতিশব্দ পোটাসিয়াম কার্ব্বনেট।

দর্শনের কথা

আমরা এই প্রবন্ধে দর্শন জিনিষটা কি—তাহার বিষয় কি এবং কি উপায়ে সে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সব দেশেই অতি প্রাচীন কাল হইতে দর্শনের আলোচনা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু উল্লিখিত বিষয়সমূহে দার্শনিকদের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐকমত্যের একান্ত অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও যে সব শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, সে সব শাস্ত্রেও এরকম গোড়ার কথা লইয়া অনিশ্চয় দেখা যায় না। কোনও রাসায়নিকই হয়ত রসায়ন শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় এবং কি উপায়ে সেই শাস্ত্রে সত্য নির্ণীত হইয়া থাকে সে সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত হইবেন না। দুইজন রাসায়নিকের মধ্যে এ বিষয়ে মতদ্বৈধ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই অল্প। কিন্তু যখন আমরা দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করি তখন দেখিতে পাই সব দার্শনিকই কতকগুলি সাধারণ প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকিলেও, দর্শনশাস্ত্রের পরিসর ও সীমা সম্বন্ধে, উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায় সম্বন্ধে যে কোন দুই মৌলিক দার্শনিকই সহজে একমত হইতে পারেন না।

কি বিষয়ে দর্শন কি রকম জ্ঞানলাভ করিতে চাহিতেছে—তাহাই যদি ঠিক্ হইল না, তবে তো সর্ব্ববাদিসম্মত কোন উপনীত হওয়া দর্শনের পক্ষে সুদূরপরাহত। শুধু বৈয়ক্তিক মতামত লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। কিন্তু যে জ্ঞান নিজের আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য সঙ্গতি বা যুক্তিযুক্ততার বলে নিজকে সাধারণ মানব বুদ্ধির কাছে গ্রহণীয় করিয়া তুলিতে না পারে, সে জ্ঞানে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারের হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই হয় না—তাহা জ্ঞানরাজ্যের সীমার বাহিরেই পড়িয়া আছে বলিয়া বুঝিতে হয়। সে জ্ঞান প্রমাত্মক কিংবা ভ্রমাত্মক কিছুই বলিবার যো থাকে না। অতএব মনে হয় দার্শনিক জ্ঞান যদি কোন রকমের লাভদায়ক হইতে হয়, তবে তা ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি না হইয়া বিচারের সাহায্যে সাধারণ মানব বুদ্ধির কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত।

সব মানুষের বুদ্ধির একটা সাধারণ স্বভাব আছে। মানববুদ্ধির এই সাধারণ স্বভাবে বিশ্বাসই আমাদের সমস্ত জ্ঞানরাজ্যের ভিত্তি। আমার কাছে স্পষ্টত যেটা সত্য বলিয়া মনে হইতেছে—সেটা যদি অপরের কাছে মিথ্যা বলিয়া মনে হয়—আমি যাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিতেছি তাহাই যদি অপরের কাছে নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া লাগে, তবে সত্য মিথ্যা যৌক্তিকতা অযৌক্তিকতার কোন অর্থ থাকে না। একথা অবশ্য সত্য যে অনেক সময় আমরা যাহা সত্য বলিয়া মনে করি, তাহা অনেকে মিথ্যা বলিয়া মনে করিতে পারেন। এরকম মতদ্বৈধ থাকে বলিয়াই—আমাদের মধ্যে নানা বাদবিবাদের অবতারণা হইয়া থাকে—কিন্তু এই বাদবিবাদ যেমন একদিকে আমাদের প্রাথমিক মতদ্বৈধের প্রমাণ—তেমন ইহাই আবার আমাদের বুদ্ধিগত একতা এবং অন্তিম ঐকমত্যের জ্বলন্ত সাক্ষী। আমাদের বুদ্ধি যদি একরূপ না হয় তবে আমাদের পরস্পর বাক্যালাপই বৃথা,—কেন না আমি যে কথার যে অর্থ বুঝিতেছি সে কথার সে অর্থ আমার প্রতিপক্ষের বুঝিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই আমি তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া থাকি। ভাষার অস্পষ্টতা বা অন্য কোনও দোষে হয়ত দু এক জায়গায় ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে,—কিন্তু তথাপি এমন এক জায়গা থাকা নিতান্তই আবশ্যক যেখানে আমরা বুদ্ধির দিক্ দিয়া সম্পূর্ণভাবে এক। এই ঐক্যই আমাদের ভাষা-কথাবার্ত্তা-সাহিত্যবিজ্ঞানদর্শন এক কথায় সমস্ত জ্ঞান রাজ্যের প্রাণ। আমি রাম বলিলে আমার বন্ধু যদি রহিম বোঝেন--আমি যেটাকে বলি সাধ্য তিনি যদি তাকে বলেন হেতু—তাহা হইলে আমাদের মধ্যে বাক্যালাপই চলে না। আমাদের একমত হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই আমরা বাদবিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। আমাদের প্রাথমিক পার্থক্য যদি পার্থক্য থাকিয়া যায়—যদি অন্তিমে কোন রকমের ঐক্যে পৌছিবার কোন সম্ভাবনাই না থাকে--তবে জিজ্ঞাসু হইয়া বাদ-বিবাদ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। তাই বলিতেছিলাম বাদবিবাদে যেমন আমাদের মতভেদের কথা বাহির হইয়া পড়ে, তেমনি শেষের মিলের কথাও গৃহীত বলিয়া ধরা থাকে। কোন বিষয়ের বিচারে যখন আমরা নানা প্রমাণ যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া থাকি, তখন আমাদের বিশ্বাস থাকে যে ঐ সব যুক্তিতর্ক আমাদের মনে যে ধারণা জন্মাইয়াছে, যথাযথভাবে বিচার করিলে আমাদের প্রতিপক্ষের মনেও তাহারা ঠিক্ সেই ধারণা জন্মাইবে। যে কথাটা প্রকৃতই যুক্তিযুক্ত, তাহা শুধু আমার জন্য কিংবা আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর জন্যই নহে—সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই তাহার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা উচিত। বুদ্ধি, যুক্তি, জ্ঞান সমস্ত মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি; কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কোন ব্যক্তিসমূহের নিজস্ব কিছু নয়। ইহার উপরে আস্থা আছে বলিয়াই মানুষের জ্ঞানের সীমা দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে। সুতরাং দার্শনিক জ্ঞান যদি জ্ঞান বলিয়া সমাদৃত হইবার উপযুক্ত হয়—তবে সে বিষয়ে বুদ্ধিমান বিচারকগণের একমত হওয়া আবশ্যক—কিন্তু জ্ঞান সম্বন্ধে একমত হইতে পারা যায় না—যতক্ষণ না আমরা জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞানলাভের উপায় সম্বন্ধে একমত হইতে পারিয়াছি। অন্ততঃ জ্ঞানের বিষয় সম্বন্ধেত ঐক্য হওয়া চাই। জ্ঞানের বিষয় ভিন্ন হইলে জ্ঞানও অবশ্য ভিন্ন হইয়া পড়ে এবং বিভিন্ন উপায়ে এক জ্ঞান লাভ করিতে পারা গেলেও একই উপায়ে একই জ্ঞান লাভ করা যতদূর সম্ভবপর, বিভিন্ন উপায়ে এক জ্ঞান লাভ করার

সম্ভাবনা ততদূর নয়। বিভিন্ন পথে একই জায়গায় উপনীত হওয়া সম্ভবপর হইলেও বিভিন্ন যায়গায় গিয়া উপস্থিত হইবার সম্ভাবনাই বেশী। তাই মনে হয় দার্শনিক জ্ঞানকে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মত সাধারণের সম্পত্তি করিতে হইলে এই জ্ঞানের সাধ্য ও সাধনা সম্বন্ধে, বিষয় ও উপায় সম্বন্ধে একমত হওয়া উচিত। সম্পূর্ণ ঐকমত্য সংস্থাপন করিতে না পারিলেও, বিচারের সাহায্যে কোন্ মত সব চেয়ে বেশী সমীচীন বলিয়া মনে হয়, তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। দার্শনিক জ্ঞানের বিষয় ও সেই জ্ঞান লাভের উপায় সম্বন্ধে যথাযথ বিচার করিবার আগে, কি উদ্দেশ্য লইয়া দর্শন শাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়া থাকি তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। কেননা আমাদের উদ্দেশ্য যদি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি তবে কোন্ বিষয়ে কি উপায়ে লব্ধ কি রকম জ্ঞানের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সুচারুরূপে সিদ্ধ হইতে পারে সে কথা বোঝা অপেক্ষাকৃত সহজ হইতে পারে। বাস্তবিক এটা একটা আশ্চর্য্যের কথা—কেন যে লোক সংসারের এত সব কাজ কর্ম্ম থাকিতে দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। দর্শন শাস্ত্রের দ্বারা জগতের কোন উপকার হইয়াছে বা হইতে পারে বলিয়া ত সহজে বোঝা যায় না। তবে কেন এই নিরর্থক চুলচেরা বিচার, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তিতর্ক, বৌদ্ধিক ব্যায়ামের ছেলে খেলা—মস্তিষ্কের অপব্যবহার ও মানব বুদ্ধির অপব্যয়? অন্য যে কোন শাস্ত্রের জ্ঞানই জগতের কোন না কোন কাজে লাগিয়াছে, সমগ্র মানব জাতির ক্রমোন্নতির সহায় হইয়াছে। এ কথার প্রমাণ আমরা বিশেষভাবে বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনায় দেখিতে পাই। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষের কতই না সুবিধা হইয়াছে। মানুষ দেশ কালের বাধা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে, প্রকৃতিকে স্ববশে আনিয়া তাহার যত সব গুপ্ত রহস্য জানিয়া লইতেছে। জীবনমৃত্যুকে আপনার অধীন করিবার চেষ্টাকেও ধৃষ্টতা মনে করিতেছে না। আর জ্ঞান রাজ্যের কোন্ প্রান্তে দর্শন শাস্ত্র তাহার কীর্ত্তিস্তম্ভ তুলিয়া রাখিয়াছে, তাহা যদি খুঁজিয়া দেখিতে চাই তবে আমাদের অনুসন্ধানের ব্যর্থতাই শুধু আমাদিগকে ব্যথিত করিয়া তুলে। গুটিকতক অতিবুদ্ধিমান লোকের মস্তিস্কবিকৃতি ছাড়া দর্শন শাস্ত্র অন্য কিছু করিতে পারিয়াছে বলিয়া সাধারণ লোকের চক্ষে পড়ে না।

প্রত্যেক জিনিষের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার বিচার করা উচিত। এক মাপকাঠিতে সকল জিনিষের বিচার চলে না। ইহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। পুরাতন সংবাদপত্র ওজনদরে মুদীর দোকানে বিক্রয় হইয়া থাকে—কিন্তু কালিদাসের কাব্যের বিচার ঠিক ঐ রকম ভাবে চলে না। পুরাতন সংবাদপত্র দ্বারা জিনিষপত্র বাঁধিতে পারা যায়, ইহাতেই তাহার মাহাত্ম্য। কিন্তু কালিদাসের কাব্যের দ্বারা ঠিক ঐ কাজ চলে না বলিয়া তাহার কোন মূল্যই নাই একথা বলিতে পারা যায় না। এমন কি গণিত শাস্ত্রের কোন প্রশ্নের বিচার আমরা যে রকম ভাবে করিয়া থাকি, কবিতার বিচার সে রকম ভাবে চলে না। গণিত শাস্ত্র যার জন্য আছে, কবিতা তার জন্য নয়।

কোন জিনিষ মানুষের অভাব যে পরিমাণে দূর করিয়া থাকে, সেই পরিমাণে তার

মূল্য নির্দ্ধারণ হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষের নানা রকমের অভাব বোধ রহিয়া যাইতেছে। সেই অভাব পরিপূরণের জন্য বিভিন্ন রকমের পদার্থ আবশ্যক। বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতির ফলে আমাদের অনেক ভৌতিক স্বাচ্ছন্দ্যের সুবিধা হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই মাপকাঠি দিয়াই কি সব বিষয়ের বিচার করিতে পারি? শুধু ডাল ভাত রুটী মাখনের উপরই মানুষের জীবন নির্ভর করে না। ডাল ভাতের অভাব মানুষের কাছে খুবই কষ্টদায়ক তাহা স্বীকার করি, কিন্তু শুধু ডাল ভাত লইয়াই মানুষ সন্তুষ্ট থাকিবে ইহা কিছুতেই বলিতে পারা যায় না এবং যদি কেহ সেরূপভাবে সন্তুষ্ট থাকে তবে বুঝিতে হইবে সে এখনও মনুষ্যত্বের উচ্চভূমিতে উঠিতে পারে নাই। শারীরিক অভাব ও আরাম ছাড়াও মানুষের মানসিক অভাব ও শান্তি রহিয়াছে। আর মানুষের মনুষ্যত্ব শরীরের দিক দিয়া ততদুর নয়, যতদুর মনের দিক দিয়া। অনেকেই দর্শনের কোন মূল্য আছে বলিয়া বুঝিতে পারেন না, তাহার কারণ—মানুষের যে অভাব পূরণের জন্য দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের সেই অভাববোধ এখনও হয় নাই।

মানুষ সংসারে নানারকমের অসামঞ্জস্য ও বিরোধ দেখিতে পায়। প্রেমের সঙ্গে বিচ্ছেদ, আশার সঙ্গে নৈরাশ্য—স্থিতির সঙ্গে গতি, একের সঙ্গে বহু, ভালর সঙ্গে মন্দ নিতান্ত 'অসঙ্গত' অবস্থায় লাগিয়া রহিয়াছে। এই অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য বা বিরোধই চরম বলিয়া মনের বুদ্ধি সহজে গ্রহণ করিতে পারে না। এই আপাতদৃশ্যমান বিরোধের পশ্চাতে সামঞ্জস্য রহিয়াছে এই বিশ্বাসে সেই সামঞ্জস্য খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য মানুষের স্বাভাবিক প্রেরণা আসে—এই প্রেরণার ফলেই দর্শনের উৎপত্তি। আমাদের বুদ্ধি সর্ব্বদাই সামঞ্জস্য শৃঙ্খলা দেখিতে চায়; তাহার অভাব শান্তভাবে সহ্য করিয়া যাওয়া বুদ্ধির স্বভাব নয়। সংসারে যাহা দেখি তাহাতে নানা রকমের অসামঞ্জস্য আছে বলিয়াই তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে চায় না। তাই সত্যের সন্ধানে ধাবিত হয়। এই সত্যের অনুসন্ধানের নামই দর্শন। সাধু ঋষি বা কবি অনুভূতির সাহায্যে উপলব্ধি বা সব বিরোধের সমাধান করিয়া থাকেন। দার্শনিক ঠিক সেই কাজই বুদ্ধির সাহায্যে করিতে চান। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যও আংশিকভাবে তাহাই। কোন নিয়ম বা তত্ত্বের সাহায্যে পরস্পরবিরুদ্ধ বহুত্বময় বিষয় সমূহের ঐক্য সাধনই বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য; ব্যোমযান, বিনাতারে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি ইহার অবান্তর ফলমাত্র। বিশেষ বিশেষ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে প্রয়োগাদির সাহায্যে বিজ্ঞান যাহা করিতে চায় দর্শনশাস্ত্র কেবল বুদ্ধির সাহায্যে সমগ্র বিশ্বকে লইয়া ঠিক তাহাই করিতে চায়। অতএব দেখা গেল আমাদের জ্ঞানের মধ্যে আমরা যে সব বিরোধ দেখিতে পাই, তাহার সমাধানের উদ্দেশ্যেই দর্শনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। আমরা যাহা দেখি বা শুনি তাহাতে যদি কোনপ্রকার বিরোধের আভাস পাওয়া না যাইত তবে আমাদের দর্শনালোচনায় কোন প্রবৃত্তিই আসিত না। এই বিরোধের সন্তোষজনক সমাধানেই দর্শনের সার্থকতা।

এই বিরোধ সমাধানের চেষ্টায় দর্শন বিশ্বের মূলতত্ত্বে উপস্থিত হইতে চায় এবং সেই তত্ত্বের সাহায্যেই আপাত দৃষ্টিতে যে সব বিষয় পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয় তাহার সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করিয়া থাকে। আমাদের বিশ্বাস পরস্পর বিরুদ্ধ বিষয় কখনই সত্য হইতে

পারে না—কোন বস্তুই হাঁ ও না কে বুকে লইয়া টিকিতে পারে না। সুতরাং যখন আমরা আমাদের জ্ঞানে কোন রকমের বিরোধাভাস দেখিতে পাই তখন আমরা ভাবিয়া থাকি এই বিরোধ কখনই শেষ কথা হইতে পারে না। প্রকৃত তথ্য জানিতে পারিলে এখন যে সব বিষয় আমাদের কাছে পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া লাগিতেছে, তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিতে পাইব। আমরা যদি বিশ্বের মূলতত্ত্ব যথাযথভাবে জানিতে পারি তবে সমস্ত বিরোধের—আমাদের সব প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যাইবে। দর্শনের উপাসক সকলেই সেই তত্ত্বজ্ঞানের প্রার্থী। কিন্তু সেই তত্ত্ব এক কিংবা বহু সেই সম্বন্ধে প্রথমেই কোন কথা বলিতে পারা যায় না। তবে একথা সত্য সে তত্ত্ব অত্যন্ত ব্যাপক হওয়া আবশ্যক। এমন কিছু থাকা উচিত না যাহা সেই তত্ত্বাধীন হইবে না—যাহা সেই তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত বা কোন প্রকারে সেই তত্ত্বের সহিত সম্বদ্ধ হইবে না। এই তত্ত্বের বাহিরে যদি কিছু থাকে তবে শুধু এই তত্ত্ব দ্বারা সব বিরোধ মিটাইতে পারিবনা। কেননা সেই বাহিরের বস্তুর এই তত্ত্বের সহিত বিরোধ থাকিতে পারে বা সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারে। সেই বিরোধের সমাধানের জন্য আমাদের অন্য তত্ত্বের আশ্রয় লইতে হইবে।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি দর্শনশাস্ত্র যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রবৃত্ত হয় বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহা যদি সত্য হয় তবে বিশ্বের যাবতীয় পদার্থই দর্শনশাস্ত্রের বিষয় হইয়া পড়ে। বিশ্বের মূলতত্ত্ব যখন ইহার অনুসন্ধানের বিষয় তখন সহজেই বুঝিতে পারা যায়, এমন কোন বিষয় থাকিবে না যাহা ইহার বাহিরে পড়িতে পারে। বিশ্বের মূলতত্ত্ব এই কথার অর্থ হইতেই বোঝা যায় জগতে যাহা কিছু আছে তাহার মূলে এই তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। এই তত্ত্ব হইতে কোন পদার্থ যদি বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিয়া যায় তবে আমাদের দর্শন চর্চ্চার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এই তত্ত্ব জ্ঞান আমরা চক্ষুকর্ণের সাহায্যে লাভ করিতে পারি না, মুখ্যত বিচারের সাহায্যেই এই তত্ত্বে উপনীত হইতে হয়। সংসারে আছে বলিয়া যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় তাহাই আমাদের বিচারের সামগ্রী। যাহা কিছু আছে তাহাই এই তত্ত্বের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ; সুতরাং অন্তিম তত্ত্ব যখন সাক্ষাৎভাবে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা জানিতে পারি না, তখন তাহার সহিত সম্বদ্ধ জগতে যাবতীয় পদার্থের আলোচনা দ্বারাই তাহার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিলে সত্য বস্তুর সম্যক্ জ্ঞান আমরা লাভ করিতে পারিব না। হস্তী সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তাহার সমস্ত অবয়ব আমাদের দেখা আবশ্যক। শরীরের অংশ বিশেষ দেখিয়া আমরা কখনই হস্তী সম্বন্ধে ঠিক ঠিক কল্পনা করিতে পারিব না।

অন্য উপায়েও তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে পারা যাইতে পারে। আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানা বিষয় হইতে অনুমান ও বিচারের সাহায্যে মূল তত্ত্বে উপস্থিত না হইয়া প্রথমেই আমরা হয়ত উচ্চাঙ্গের কল্পনা বা অসাধারণ কোন অনুভূতির সাহায্যে মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে পারি। কিন্তু সেই জ্ঞানের প্রামাণ্যের জন্য শুধু সেই তত্ত্ব ভূমিতে অবস্থান না করিয়া আমাদের সাধারণ জ্ঞানের বিষয়সমূহে নামিয়া আসিতে হয়। যতক্ষণ

পর্য্যন্ত আমরা আমাদের কল্পনা প্রসূত কিংবা অনুভূতিলব্ধ তত্ত্বের সহিত আমাদের সাধারণ জ্ঞানের বিষয়সমূহের সম্বন্ধ দেখাইতে বা বুঝিতে না পারিব, ততক্ষণ আমাদের তত্ত্ব জ্ঞান সত্য কিংবা মিথ্যা, কিছুই বলিতে পারা যাইবে না। সুতরাং শেষোক্ত উপায়েও মূল তত্ত্বের দার্শনিক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে জগতের যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা দরকার; দৃশ্য জগতের অন্তর্গত পদার্থ সমূহের সহিত এই তত্ত্বের সম্বন্ধ বা সামঞ্জস্য দেখাইতে না পারিলে দর্শনের কাজই সমাধা হয় না।

অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম—বিশ্বের মূলতত্ত্বই দর্শনের উপলব্ধির বিষয়। জগতের চরম সত্যবস্তু কি দর্শন তাহাই জানিতে চায়; এবং সেই জন্য জগতে যাহা কিছু আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় সেই সমুদায়ের আলোচনা দর্শনশাস্ত্রে করিতে হয়। আকাশের গ্রহনক্ষত্রের মত অতি দূরবর্ত্তী পদার্থ—মানুষের প্রাণের আকাঙ্ক্ষার মত অতি নিকটবর্ত্তী বস্তু—সকলই দর্শনের আলোচ্য বিষয়। আকাশ ও কালের মত অতি ব্যাপক পদার্থ হইতে ধূলিকণার মত অতিক্ষুদ্র নিমেষের মত অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী।পদার্থ পর্য্যন্ত কোন কিছুর প্রতিই দর্শন ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে পারে না।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে—বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাই জগতের নানা বিভাগের তত্ত্ব নিরূপণে ব্যাপৃত আছে। এই বিজ্ঞানের উপর আবার দর্শনের আবশ্যকতা কি? আর যে রকম জ্ঞান দর্শনশাস্ত্র লাভ করিতে চায় তাহা কি কখনও কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবপর?

বিভিন্ন বিজ্ঞান শাস্ত্র খণ্ডশঃ বিশ্বের আলোচনা করিয়া থাকে, সমস্ত দিক্ দিয়া সমস্ত বিশ্বের তত্ত্বনির্দ্ধারণ কোন বিজ্ঞানেরই উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তা বলিয়া দর্শনকে বিজ্ঞান সমষ্টিও বলা চলে না। বিভিন্ন বিজ্ঞান স্বতন্ত্রভাবে যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে সব সময় সামঞ্জস্য নাও থাকিতে পারে। তার উপর প্রত্যেক বিজ্ঞানেই কতকগুলি বিষয় গৃহীত বলিয়া ধরিয়া লওয়া থাকে। ঐসকল গৃহীত বিষয়ের উপরই তাহাদেব সব সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে, কিন্তু তাহাদের বিচার সেই সেই বিজ্ঞান শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। দর্শনশাস্ত্র ঐসব গৃহীত বিষয়গুলিরও বিচার করিয়া থাকে। আর এমনও অনেক বিষয় আছে যাহা কোন বিজ্ঞান শাস্ত্রেই স্থান পায় নাই, সেই সবের আলোচনা দর্শনে থাকিতে পারে। সব বিজ্ঞানই পরাক্ বা বাহিরের বস্তু লইয়া আলোচনা করিয়া থাকে—প্রত্যক্ অথবা ভিতরকার বিষয়সমূহের বিচার বিজ্ঞানের মধ্যে পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানে আমরা কি করিয়া কি ঘটে—তাহা জানিতে পারি। বৈজ্ঞানিক নিয়মের অর্থই তাই। কেন ঐরকম ঘটে তাহার উত্তর বিজ্ঞানে পাওয়া যায় না। দর্শন সে উত্তর দিবার চেষ্টা করে। বিজ্ঞান যন্ত্রাদির সাহায্যে প্রয়োগ করিয়া তাহার সত্য পরীক্ষা করিয়া থাকে, দর্শন শুধু যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে তত্ত্ব নির্ণয় করে। বিশ্বের মূল তত্ত্ব কি—যাহার সাহায্যে মানুষ তাহার জীবনের সব প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারে—সত্তা হিসাবে বা জ্ঞান হিসাবে যাহা কিছু আছে সেই সমস্তের কারণ বা আধারস্বরূপ এমন তত্ত্ব কি—ইহার উত্তর কোন বিজ্ঞানই দিবার চেষ্টা করে না। শুধু দর্শনেই এই চেষ্টা দেখিতে পাই। সুতরাং দেখা গেল দর্শন ও বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য উপায় আলোচ্যবিষয় বা

ক্ষেত্র—সবই ভিন্ন। মানুষের যে অভাব বিজ্ঞান পূরণ করিতে পারে না দর্শন সে অভাব পূরণের চেষ্টা করে বলিয়াই দর্শনের সার্থকতা।

কিন্তু জগতের যাবতীয় বিষয় আলোচনার ফলেই যে দর্শনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে সে দর্শন কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবপর ? এমন কেহ এখনও জন্ম গ্রহণ করেন নাই যিনি জগতের প্রত্যেক বিষয়ই জানেন। সর্ব্বজ্ঞতা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভবপর নয়। তবে কি দর্শন একটা অত্যন্ত অবাস্তব আদর্শের পশ্চাতে ছুটিয়াছে ?

কোন এক ব্যক্তির পক্ষে সব বিষয় জানা সম্ভবপর না হইলেও অনেকের দ্বারাতে সম্ভবপর হইতে পারে ? যিনি দার্শনিক হইবেন, তিনিত বিভিন্ন বিষয়বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে তাহার জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া লইতে পারেন। অথবা অনেকে মিলিয়া একত্রে দর্শনের মঠ গড়িয়া তুলিতে পারেন। আজকাল তাই দর্শনেও অনেককে যৌথ চর্চ্চার আশ্রয় লইতে দেখিতে পাওয়া যায়। তার উপর সব বিষয়ই যে তাহাদের বৈশিষ্ট্যের সহিত জানিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। জাতির জ্ঞান থাকিলে তার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে না জানিলেও চলিতে পারে। সাধারণভাবে সমস্ত জ্ঞেয় বস্তুর প্রকার বা রকম যদি জানিতে পারি তাহা হইলেও আমাদের চলিবে। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দর্শনের পক্ষে এই রকম জ্ঞানই যথেষ্ট। মাটী কি পদার্থ জানিতে হইলে সংসারে যত মাটী আছে তার সবই পরীক্ষা করিতে হইবে এমন নয়, একখণ্ড মাটী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই চলে।

তার উপর যদিও একথা সত্য যে জগৎ আমাদের কোন ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞানসাপেক্ষ নহে—জগতের কোন বস্তুরই থাকা না থাকা বা অস্তিত্ব কোন দার্শনিকেরই জানা না জানা বা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না। এমন অনেক বস্তু থাকিতে পারে—এবং আছেও—যাহা আমরা জানি না বা কখনই জানিতে পারিব না তথাপি আমাদের প্রত্যেকের জগৎ সম্পূর্ণভাবে আমাদের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে—একথা বাধ্য হইয়া আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। জগৎকে আমরা জানি বলিয়াই আছে বলিতে পারি। এই জগতের স্বগত অস্তিত্ব যতই আমাদের জ্ঞাননিরপেক্ষ হউক না কেন ইহার অস্তিত্বের প্রকাশ আমাদের জ্ঞানের ভিতর দিয়াই হইয়া থাকে। আমরা এমন কোন পদার্থ আছে বলিয়া চলিতে পারি না যাহার সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নাই। কোন বস্তু আছে বলিয়া স্থির করিতে হইলে তাহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থাকা চাই ই চাই। আছে বলিতে গেলেই কি আছে জানা আবশ্যক যতক্ষণ কি সেটা—তাহার স্বরূপ কি—আমরা জানিতে না পারি ততক্ষণ সেটা আছে কি না আছে—তাও বলিতে পারি না। সুতরাং স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় আমাদের জগৎ আমাদের জ্ঞানের সীমার দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই সীমা অতিক্রম করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। আমরা যে জগৎ জানিতেছি তাহার উপরই আমাদের দর্শনের ভিত্তি স্থাপিত করিতে হইবে। অজানা—অজ্ঞেয় বা অজ্ঞাত-বিষয় সম্বন্ধে কোন আলোচনাই হইতে পারে না। আমাদের জ্ঞানরাজ্যের মধ্যেই যে সব বিরোধ বা অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই, দর্শনশাস্ত্র তাহারই সমাধান করিবার চেষ্টা করিতে পারে। অজ্ঞেয় রাজ্যের কোন বার্ত্তা দর্শনের পক্ষে আনিয়া দেওয়া সম্ভবপর নয়। আমাদের পক্ষে যে জগৎটা আছে তাহা আমাদের জ্ঞানেই আছে। যাহা

আমাদের জ্ঞানে নাই তাহা আছে বলিয়াও আমরা জানি না। তার সম্বন্ধে আমরা কোন বিচারও করিতে পারি না। আমাদের জ্ঞান জগৎ লইয়াই আমাদের বিশ্ব এবং এই বিশ্বের কোন অংশই আমাদের অজ্ঞাত নাই, এরই উপরে আমাদের দর্শনের কাঠাম গড়িয়া থাকি। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞানের অভাব আমাদের দর্শনালোচনা না করার কোন কারণ হইতে পারে না।

কিন্তু বাস্তব জগৎ ও আমাদের জ্ঞানজগৎ ত সমান মাপের নয়। দিন দিনই আমরা নূতন জ্ঞান লাভ করিতেছি। যখন নূতন কোন বিষয় জানি তখন সেটা 'নাই' হইতে হঠাৎ 'আছে' হইয়া পড়ে এমন নয়। যাহা ছিল বা আছে তাহাই জানিয়া থাকি। আমাদের দর্শন শুধু আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানরাজ্যের কথা কহিবে এমনত নয়; বাস্তব জগতের কথা আমরা জানিতে চাই। দার্শনিকের মনোরাজ্যের ইতিহাস বা বিবরণের দ্বারা আমাদের জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। সেই বাস্তব জগতের পরিসর কোন ব্যক্তির জ্ঞানের পরিধির অন্তর্ভুক্ত হইবার নয়।

একথা সত্য আমাদের অজানা অনেক কিছু সংসারে আছে—জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমাদের জানার শেষ হইবে না। তবুও যখন আমরা আমাদের নিজেদের জ্ঞানের সাক্ষ্য লইয়া দর্শনের প্রতিমা গড়িয়া থাকি তখন আমাদের এই বিশ্বাস থাকে যে অপরের জ্ঞানও আমাদের জ্ঞানের মতই হইবে। আমাদের ভবিষ্যৎ জ্ঞান আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের অনুযায়ী হইবে। এই রকম বিশ্বাসই আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞানের ভিত্তি। আমি যাহা লাল বলিয়া বুঝি আমার বন্ধু যদি তাহা কাল বলিয়া বুঝেন তাহা হইলে কোন কথা বলাই চলে না। আজ আমরা জগৎকে যে রকম ভাবে বুঝিতেছি কাল যদি তাহা সম্পুর্ণভাবে বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে কোন বিষয়ে কোন সাধারণ সত্যে পৌঁছিতে পারা যায় না। আমাদের অভিজ্ঞতার কোন অর্থ থাকে না—দর্শন বিজ্ঞান অসম্ভব হইয়া পড়ে। অথচ আমি যাহা লাল বলিয়া বুঝি আমার বন্ধুও লাল বলিতে ঠিক তাহাই বুঝেন ইহা নির্ণয় করা দর্শন বিজ্ঞানের সাধ্যাতীত। আমাদের ভবিষ্যৎ জ্ঞান আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের প্রামাণ্য রক্ষা করিয়া চলিবে তাহাও নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে দার্শনিকের দৃষ্টিতে বলিতে পারা যায় না। সকলেই নিজ নিজ জ্ঞান অনুযায়ী দর্শন গড়িয়া তুলেন কিন্তু যদি অন্যান্য সব বিষয় সমান হয় তবে যাহার জ্ঞানের পরিসর যত বেশী তাহার দর্শনই সব চেয়ে বেশী আদরণীয় হয়। তবে যিনি যতই জ্ঞানী হউন না কেন ত্রিকালবিধিত সত্য তাঁহার দর্শনে পাওয়া যাইবে এমন কথা বলিতে পারা যাইবে না। হইতে পারে তিনি এমন সত্য জানিয়াছেন যাহা কখনই মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইবে না কিন্তু যতদিন না আমাদের ভবিষ্যতের শেষ পর্য্যন্ত দেখিবার ক্ষমতা হইয়াছে ততদিন সেকথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারিব না। বর্ত্তমানে থাকিয়া ত্রিকালবিধিত রূপে কোন কথা জানা অসম্ভব। সব জ্ঞান সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। দর্শন সম্বন্ধেও একথা খুব দোষের নয়। ব্যক্তিগত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং খুব উচ্চ দৃষ্টিতে বর্ত্তমান জ্ঞানের সন্দিগ্ধতাই জ্ঞান জীবনের প্রাণ। আমাদের যদি তৃতীয় নেত্র লাভ হইত—ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এক

দৃষ্টিতে নিঃসন্দিগ্ধ প্রত্যক্ষ ভাবে জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে জীবনে আমাদের কোন প্রশ্ন থাকিত না—সংশয় থাকিত না—নিয়ত গতিশীল জ্ঞানের রথ আপনা হইতেই হঠাৎ থামিয়া যাইত। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাসবিহারী দাস।

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

(১২)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের মতে 'রাজসিংহ'ই তাঁহার একমাত্র প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস। সুতরাং তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শসম্বন্ধে কি ধারণা ছিল তাহা 'রাজসিংহ' হইতে বুঝা যাইবে। 'রাজসিংহের' চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনটী বিশ্লেষণ করিলে এ বিষয়ে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সঙ্কলন করা যাইতে পারে। বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' উপন্যাসে প্রধান উদ্দেশ্য, হিন্দুদের যে বাহুবলের অভাব ছিল না এই বিষয়ের প্রতিপাদন করা। এই বিষয়ে ঐতিহাসিক বিবরণের অভাবের ও ঐতিহাসিকদের পক্ষপাতিত্বদোষের জন্য বঙ্কিম উপন্যাসের আশ্রয় লইয়াছেন; কারণ যদিও সর্ব্বত্র ইতিহাসের উদ্দেশ্য উপন্যাসের দ্বারা সুসিদ্ধ হয় না, তথাপি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সেরূপ কোন প্রতিবন্ধক নাই; "যখন বাহুবলমাত্র আমার প্রতিপাদ্য, তখন উপন্যাসের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে।"

বঙ্কিমের এই উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করা একটু দুরূহ। রাজপুতদের বাহুবলপ্রতিপাদনবিষয়ে উপন্যাস কেন ইতিহাসের উদ্দেশ্যসাধনক্ষম, তাহা তিনি খুলিয়া বলেন নাই; বিশেষতঃ এই সম্বন্ধেই ঐতিহাসিক প্রমাণের পরস্পর বিরোধিতার বিষয় বঙ্কিম নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন, ও এই সমস্ত পরস্পরবিরোধী প্রমাণসমূহের মধ্যে সত্যনির্ণয়ের দুঃসাধ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রকার বাধাবিঘ্ন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ইতিহাসের পক্ষে যাহা দুঃসাধ্য তাহা উপন্যাসের পক্ষে কেন সহজসাধ্য হইবে, উপন্যাস এই সমস্ত ইতিহাসগ্রন্থিকে কিরূপে সরল করিবে, লেখক তাহার কোন বিশদ ব্যাখ্যা দেন নাই। ইতিহাসের উপর উপন্যাসের এক মাত্র শ্রেষ্ঠত্ব এই যে ইহা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, ইহা সত্যের বন্ধন হইতে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন; কিন্তু এই কল্পনাকে ইতিহাস ক্ষেত্রে দুই প্রকারে প্রয়োগ করা যায়; ইহা লেখককে ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয়ের অপ্রীতিকর দায়িত্ব হইতে অব্যাহতিদানের উপায়স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে, অথবা ইহা একপ্রকার প্রত্যক্ষ অনুভূতির সাহায্যে ইতিহাসের পরস্পরবিরোধী জটিল

উক্তিসমূহ ভেদ করিয়া তাহার মর্ম্মগত সত্যে গিয়া হাত দিতে পারে। এখানে বঙ্কিম তাঁহার কল্পনার কিরূপ ব্যবহার করিতে চাহেন, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে; হিন্দুদের বাহুবলের যদি কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ না থাকে, তবে কল্পনার সাহায্যে তাহার প্রতিপাদন করিতে গেলে কল্পনার আশ্রয়ের কাল্পনিকতার প্রশ্রয়ে পরিণত হইবার সমূহ সম্ভাবনা আছে। বোধ হয় বঙ্কিমের উক্তির প্রকৃত মর্ম্ম এই যে রাজপুতদের বাহুবল এতই সুপরিচিত ব্যাপার যে এক্ষেত্রে কল্পনার আশ্রয় লওয়া তাদৃশ দূষনীয় নহে; কেননা এখানে অবিসংবাদিত ঐতিহাসিক প্রমাণ থাকুক বা না থাকুক, কল্পনা ও ঐতিহাসিক সত্যের মধ্যে ব্যবধান নিতান্ত অল্প হইবারই সম্ভাবনা।

রাজপুতদের বাহুবল প্রতিপাদন যদি 'রাজসিংহে' বঙ্কিমের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়; তবে তাহা উপন্যাসের প্রকৃত ভিত্তি হইতে পারে কি না সে বিষয়েও সন্দেহের অবসর আছে. কেননা এরূপ একটা সঙ্কীর্ণ ও পক্ষপাতমূলক উদ্দেশ্য ঠিক উচ্চতম আর্টের পক্ষে অনুকূল নহে। অবশ্য এই উদ্দেশ্য বঙ্কিমের কবি-কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া তাঁহার যুদ্ধবর্ণনাগুলির উপর একটা তীব্রতা ও কল্পনা গৌরব আনিয়া দিয়াছে সত্য; কিন্তু সত্য চিত্রণ, বিশেষতঃ ঐতিহাসিক সত্য-নির্দ্ধারণ যে উপন্যাসের আদর্শ, তাহার সহিত এইরূপ সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্যের সুসঙ্গতি হইতে পারে না। বোধ হয় এখানে বঙ্কিম নিজ প্রতিভার প্রতি অবিচার করিয়াছেন; রাজপুতদের বাহুবলপ্রতিপাদন করা সম্বন্ধে তাঁহার যতই প্রবল ইচ্ছা থাক, তিনি সে ইচ্ছাকে কলাকৌশলের দ্বারা নিয়মিত ও সংযত করিয়াছেন, কোথাও কলা-সৌন্দর্য্যের ও সুসঙ্গতির সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে দেন নাই। স্থানে স্থানে মুসলমানের বিরুদ্ধে একটু অযথা তীব্র সমালোচনা, একটু অসঙ্গত ও অশোভন বিদ্বেষ উদ্গীরণ ভিন্ন অন্য কোথাও এই উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হয় নাই; আর পরিস্ফুট হইলেও লেখক অসাধারণ দক্ষতার সহিত ইহাকে একটী অবিসংবাদিত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, মানুষের চিরন্তন হৃদয়স্পন্দনের সহিত ইহার গতিবেগকে মিশাইয়া দিয়াছেন।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে কল্পনার ক্রিয়া কতদূর প্রসারিত হইতে পারে, সে সম্বন্ধে বঙ্কিমের অভিমত আধুনিক সমালোচনার পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। এবিষয়ে কল্পনার ক্রিয়ার সীমারেখা বঙ্কিম বেশ সুস্পষ্টভাবেই নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাসের মূল সত্যকে অবিকৃত রাখিতে বাধ্য; তবে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ব্যাপারে কল্পনা আপনার স্বাধীনতা দেখাইতে পারে। ইতিহাসের কার্য্যকারণপরম্পরা যেখানে যথেষ্ট পরিস্ফুট নহে, কল্পনা সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নূতন যোগসূত্র সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সম্বন্ধ স্ফুটতর করিয়া তুলিতে পারে; ইতিহাসের যে সমস্ত ঘটনা আকস্মিক, তাহাদিগকে মানব-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের সহিত সম্পর্কান্বিত করিয়া দেখাইতে পারে ইতিহাসকে dramatic, বা নাটকীয় উপযোগিতা মণ্ডিত করিবার জন্য তাহার বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত রসকে ঘনীভূত করিয়া তুলিতে পারে। বঙ্কিম রাজসিংহে এই জাতীয় রূপান্তর সাধনের উদাহরণ দিয়াছেন। যুদ্ধের ফলাদি স্থূল ঘটনা অবিকৃত রাখিয়াছেন, তবে তাহার নূতন প্রকরণ বা নূতন উদ্দেশ্য কল্পনার দ্বারা গড়িয়া দিয়াছেন; ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি অবিকৃত রাখিয়াছেন, তবে ইহাদিগকে কাল্পনিক

দুঃখের মধ্যে ফেলিয়া ইহাদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য স্ফুটতর করিয়াছেন; যেখানে একই ঘটনা সম্বন্ধে দুই বা ততোধিক বিবরণ প্রচলিত আছে, যেখানে নাটকীয় উপযোগিতার হিসাবেই তাঁহার নিজের নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছেন। এ সমস্তই সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতা; ঐতিহাসিক উপন্যাস-কার ইতিহাসের বৃহত্তর সাধারণ সত্য দেখাইতেই বাধ্য; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁহাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা না দিলে ইতিহাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে কোন ভেদ থাকিতে পারে না। বঙ্কিমের ঐতিহাসিক বিবেক (historical conscience) বা সত্যনিষ্ঠা যে ইউরোপীয় উপন্যাসিকদের অপেক্ষা কম এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই, তবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রামাণিক সত্যের অংশ যে পরিমাণে কম, কল্পনার প্রসার ঠিক সেই পরিমাণেই বেশী হইতে বাধ্য, নচেৎ একটী পূর্ণাঙ্গ আখ্যায়িকা গড়িয়া উঠিতে পারে না। বঙ্কিম তাঁহার কাল্পনিক চিত্রের দ্বারা ইতিহাসের শূন্যরন্ধ্র পূরণ করিয়া যদি অতিসাহসের পরিচয় দিয়া থাকেন, তবে তাহা আমাদের দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে অপরিহার্য্য।

'রাজসিংহ' ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে 'দুর্গেশনন্দিনী' বা 'চন্দ্রশেখর' বা 'সীতারাম' হইতে মূলতঃ ভিন্ন। বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাসে ইতিহাস কেবল একটা প্রতিবেশরচনায় সহায়তা করিয়াছিল মাত্র; তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যার আলোচনা। ঐতিহাসিক বিপ্লব আসিয়া এই ব্যক্তিগত সমস্যাকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে সত্য, তথাপি মোটের উপর এই সমস্ত উপন্যাসে ইতিহাস অপ্রধান অংশ অধিকার করে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে ঐতিহাসিক প্রতিবেশ উপন্যাসের অনেক অংশ ব্যাপিয়া আছে; এবং নায়ক-নায়িকার ব্যক্তিগত জীবন ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ ও আলোড়িত হইয়াছে সত্য: কিন্তু তথাপি ইহার প্রধান ব্যাপার ব্যক্তিগত জীবনের বাধা-বিঘ্ন-ঘটিত প্রণয় লইয়া। 'চন্দ্রশেখর' ও 'সীতারামে'ও ইতিহাসের এই দূরত্ব ও অপ্রধানতা সহজেই লক্ষিত হয়; শৈবলিনীর ও সীতারামের চরিত্রবিশ্লেষণই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিশেষতঃ 'সীতারামে' সীতারামের অন্তর্দ্বন্দ্বই উপন্যাসের প্রধান বিষয়; তাহার রাজনৈতিক অধঃপতন নৈতিক অধঃপতনের পরোক্ষ ফল মাত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। 'রাজসিংহে' ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত; এখানে ইতিহাসই প্রধান বিষয়, ব্যক্তিগত জীবন সমস্যা ইতিহাসের অনুবর্ত্তন করিয়াছে মাত্র। উপন্যাসের মূল ব্যাপার হইতেছে রাজসিংহের সহিত আরঙ্গজেবের মহাযুদ্ধের বর্ণনা; তবে লেখক এই যুদ্ধের কেবল রাজনৈতিক ফলাফল নির্দ্দেশ না করিয়া, ব্যক্তিগত জীবনের উপর ইহার প্রভাব দেখাইয়াছেন, এই যুদ্ধের মহাবর্ত্তে পড়িয়া যে কয়েকটী প্রাণী পরস্পরের সন্নিহিত হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের মানসিক সংঘর্ষ ও পরিবর্ত্তনের চিত্রটিও উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।

সুতরাং 'রাজসিংহে' ঐতিহাসিক অংশেরই প্রাধান্য; ইতিহাস এখানে পারিবারিক জীবনের সহিত নিতান্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত, অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত হইয়াছে; মানুষের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবনের উপর বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় একটা বজ্র-কঠোর সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ হইয়া একান্তভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাসে ইতিহাস কেবল একটা

সুদূর দিগন্তরেখার ন্যায় পারিবারিক জীবনকে বেষ্টন করিয়াছে মাত্র; তাহার স্বাধীনতার গৌরবকে বিশেষ ক্ষুণ্ণ করে নাই; যদিও সময় সময় ইতিহাস-সমুদ্রের দুই একটী প্রবল তরঙ্গ আসিয়া আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে প্রতিহত হইয়াছে, ও আমাদের শান্ত জীবনে একটা প্রলয়-বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে, তথাপি মোটের উপর ইহার সুদূর অস্পষ্ট কল্লোল ব্যতীত ইহার অস্তিত্বের আর কোন স্পষ্টতর পরিচয় আমাদের গোচর হয় নাই। রাজসিংহে ইতিহাস তাহার উদাসীন দূরত্ব ত্যাগ করিয়া একেবারে অতিসন্নিহিত পড়িয়াছে ও আমাদের পারিবারিক জীবনকে প্রায় স্পর্শ করিয়াছে; তাহার উষ্ণ নিশ্বাস আমাদের শরীরে একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি, রক্তের মধ্যে একটা দ্রুততর স্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছ। আমাদের সাধারণ মনোবৃত্তি সমূহ, আমাদের প্রেম, ঈর্ষ্যা, বন্ধুত্ব প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীবননাট্যের অভিনেতৃবর্গ ইতিহাসের ভ্রুকুটী-কুটিল দৃষ্টির তলে, ইতিহাসের নির্ম্মম অঙ্গুলি-সঙ্কেত চালিত হইয়া একটা অলঙ্ঘনীয় প্রয়োজনের পেষণে আপন আপন অংশ অভিনয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই অসাধারণ তীব্র প্রভাবের বশে আমাদের সাধারণ জীবন তাহার সহজ-সরল স্বাধীনতা ও প্রসার হারাইয়া আপনার বিকাশকে ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া লইয়াছে, ও তীব্রতর গতিবেগের দ্বারা এই অপরিহার্য্য সঙ্কীর্ণতার অসুবিধা পূরণক রিয়াছে।

'রাজসিংহ' উপন্যাসটীকে মানব-চরিত্রের বিশ্লেষণ হিসাবে দেখিতে গেলে পদে পদে এই স্বাধীনতাসঙ্কোচের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম বিষয়-নির্ব্বাচনে। রাজসিংহের বৃহত্তর সংঘটনের মধ্যে, ইহার যুগান্তরকারী বিপ্লবের ভিতর সাধারণ নিম্নশ্রেণীর মানুষের কোন স্থান নাই। যাহারা শ্যামল সমভূমিতে বৃক্ষছায়াশীতল প্রদেশের পর্ণকুটীরে নিজ নিজ শান্ত নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহারা এই উপন্যাসের জগতে প্রবেশাধিকার পায় নাই; ইহার পাত্র-পাত্রীরা সকলেই উচ্চপদস্থ, সকলেই রাজনৈতিক আবর্ত্তের বিক্ষোভ-বিকম্পিত প্রদেশে, ইতিহাসের বজ্রমুষ্টির দুর্নিবার আকর্ষণপরিধির মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যে সমস্ত নিম্ন-উপত্যকা-বাসী ক্ষুদ্র বৃক্ষ তাহাদের ক্ষুদ্রত্বের জন্যই কাল-বৈশাখীর হাত এড়াইয়া যায়, তাহাদের জন্য এই উপন্যাসের কোন প্রয়োজন নাই; পরন্তু যে সমস্ত মহা-মহীরুহ উত্তুঙ্গ-পর্ব্বত-শৃঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রলয় ঝটিকার দুর্দ্ধর্ষবেগকে আহ্বান করে ও তাহার দ্বারা বিধ্বস্ত বিদলিত হয় তাহারাই এই উপন্যাস জগতের অধিবাসী। চঞ্চলকুমারী রাজকন্যা, নিজে আভিজাত্য-গর্ব্ব-গৌরবান্বিতা, দুই প্রতিদ্বন্দী রাজাধিরাজের সংঘর্ষের উপযুক্ত হেতু ও যোগ্য পুরস্কার। নির্ম্মলকুমারী বংশ-গৌরবে সামান্যা হইয়াও নিজ বুদ্ধি ও সাহস প্রভাবে এই রাজনৈতিক সংক্ষোভের ঠিক কেন্দ্রস্থলে আপনাকে অধিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহার বিবাহিত জীবন কোন্ অতল সমুদ্রে তলাইয়া গিয়াছে; সে রাজপুতকুল-গৌরবের প্রতিনিধি হইয়া সগৌরবে ও অভ্রান্ত পদক্ষেপে রাজনৈতিক জগতের বন্ধুর পিচ্ছিল রন্ধ্রপথে বিচরণ করিয়াছে, ও স্বয়ং বাদসাহের সম্মুখীন হইয়া বাগ্‌বৈভবে ও চাতুর্য্যে তাঁহাকে নিরস্ত নিরাকৃত করিয়াছে। গরীব দরিয়া, কেবল সংবাদবিক্রেত্রী বলিয়া নহে, আরও উচ্চতর, শ্লাঘ্যতর অধিকারে, শাহজাদীর প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে, রংমহালের বহ্নিজ্বালাময় প্রাসাদ-সমূহে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে। উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রের মধ্যে কেবল

এক মাণিকলালই, তাহার অভাবনীয় রূপান্তর ও উচ্চপদে আরোহণ সত্ত্বেও, স্বভাব-সিদ্ধ ধূর্ত্ততার জন্যই তাহার plebeian originএর চিহ্ন রাখিয়াছে, সম্পূর্ণ লুপ্ত হইতে দেয় নাই।

আবার অন্য দিক্ দিয়াও ইতিহাস পারিবারিক জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার স্বাভাবিক স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করিয়াছে, ও তাহার তুচ্ছতম ব্যাপারের সহিত একান্ত অপ্রত্যাশিত কঠোর পরিণতির সংযোগ স্থাপন করিয়া দিয়াছে। চঞ্চলকুমারীর একটা নিতান্ত তুচ্ছ কার্য্য, একটা সামান্য বালিকাসুলভ চাপল্য দুই জাতির মধ্যে তুমুল সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়াছে; যে আকাশ বাতাসে দাহ্য পদার্থ স্তূপীভূত হইয়া আছে, সেখানে একটা তুচ্ছ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রলয়ানল জ্বালাইয়া তুলিয়াছে। পারিবারিক জীবনে যাহা সর্ব্বপ্রধান সমস্যা—বিবাহ—এই বিদ্যুদগ্নিগর্ভ আকাশের তলে তাহার এক মুহূর্ত্তেই সমাধান হইতেছে; প্রেম নিতান্ত অনুগত অনুচরের ন্যায় দেশভক্তি বা রাজনৈতিক প্রয়োজনের অনুসরণ করিতেছে। চঞ্চলকুমারীর রাজসিংহের প্রতি যে অনুরাগ তাহার মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যাপার খুব কমই আছে; তাহা মূলতঃ স্বজাতি-প্রীতির একটা উচ্ছ্বসিত বিকাশ মাত্র; তাহা প্রণয়ীকে আত্মসমর্পণ নহে, বীরের পদে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি। নির্ম্মলকুমারীর বিবাহ ত একটা যুদ্ধের অপ্রত্যাশিত আনুসঙ্গিক ফল মাত্র। এই রাজনীতির oxygenপূর্ণ বাতাসে অতি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সকল এক মুহূর্ত্তে সংসাধিত হইতেছে; দস্যু দেশ-ভক্ত ও যুদ্ধকুশল সেনানীতে পরিণত হইতেছে; শ্রদ্ধা প্রেমে রূপান্তরিত হইতেছে, ও এই প্রেম রমণীসুলভ লজ্জাসঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়া, প্রত্যাখ্যানভয়শূন্য হইয়া প্রেমাস্পদের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতেছে; নির্ম্মম প্রয়োজন ইচ্ছাকে বশীভূত করিয়া মুহূর্ত্তেকের পরিচিতের জন্য বরমাল্য রচনা করিতেছে। বিশেষতঃ রাজসিংহের সপ্তম খণ্ড হইতে প্রায় অবিমিশ্র ঐতিহাসিক কাহিনী গ্রন্থকে ব্যাপ্ত করিয়া কল্পনাপ্রসূত উপন্যাসকে সবলে ঠেলিয়া দিয়াছে; আরঙ্গজেব পার্ব্বত্য রন্ধ্রপথে প্রবেশ করার পর ইতিহাসেরই প্রায় একাধিপত্য; সেনার কোলাহলে, দ্রুত-সঞ্চারী ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মানবের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সংঘাত প্রায় নীরব হইয়া গিয়াছে। বিপুল ইতিহাস ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবনকে প্রায় গ্রাস করিয়া লইয়াছে। আরঙ্গজেব রাজসিংহ ইহারাও ঐতিহাসিক ব্যক্তি বটেনই; কল্পনাপ্রসূত চরিত্রগুলিও—চঞ্চল, নির্ম্মল, মাণিকলাল প্রভৃতি—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া ঐতিহাসিক কোলাহলের মধ্যে নিজ নিজ কণ্ঠস্বর হারাইয়া ফেলিয়াছে, ও বৃহৎ ইতিহাস-যন্ত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গমাত্রে পরিণত হইয়াছে। গ্রন্থের এই অংশকে ঠিক উপন্যাস না বলিয়া উদ্দীপনার ঘাতপ্রতিঘাত-চঞ্চল ইতিহাস-পৃষ্ঠা বলিলেও চলে। মোটকথা রাজসিংহ উপন্যাসে ইতিহাসের প্রবল আকর্ষণে আমাদের সাধারণ জীবন তাহার স্বভাব-মন্থর গতি হারাইয়া ঐতিহাসিক ঘটনার বেগবান্ প্রবাহের সহিত সমতালে চলিতে বাধ্য হইয়াছে।

অবশ্য এই ইতিহাসের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে বঙ্কিম যে যুদ্ধ করেন নাই এমন নহে; ইতিহাসের গ্রাস হইতে ব্যক্তিগত জীবনের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, এবং আংশিক কৃতকার্য্যতা লাভও করিয়াছেন। যেখানে রাজনৈতিক কারণই আগুন জ্বালিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত, সেখানেও বঙ্কিম মানসিকসংঘর্ষজাত অগ্নিশিখার ক্রীড়া দেখাইতে

প্রয়াসী হইয়াছেন ; যেখানে রাজপুতের অদম্য স্বাধীনতাস্পৃহা ও মোগলের মদোদ্ধত, বলদৃপ্ত অত্যাচার বিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে, সেখানেও বঙ্কিম মানব চিত্তের স্বাধীন ক্রিয়া হইতেই প্রথম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রেরণ করিয়াছেন। এইরূপে তিনি ইতিহাসের সর্ব্বগ্রাসী একাধিপত্য হইতে মানবজীবনের স্বাধীনতা ও গৌরব বাঁচাইতে চাহিয়াছেন। আরংজীবের হিন্দুদ্বেষিতা, যথেচ্ছাচার, জিজিয়া-কর-সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলকুমারীকৃত অপমানের প্রতিশোধস্পৃহাও তাহার কার্য্য করিয়াছে। অগ্নি জ্বালিবার ইন্ধনের মধ্যে বিক্রম-শোলাঙ্কির অভিশাপ ও জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণীও স্থান পাইয়াছে। তা ছাড়া ইতিহাসের দারুণ নিষ্পেষণের মধ্যেও চরিত্রগুলি তাহাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে হারায় নাই। চঞ্চল, নির্ম্মল ইহারা রাজনৈতিক যন্ত্রে ঘূর্ণিত হইয়াও তাহাদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্খা সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দেয় নাই। দরিয়া সম্বন্ধে এই কথা আরও বিশিষ্টভাবে প্রযোজ্য, সে ইতিহাস-প্রবাহের মধ্যে এক উন্মত্ত একাত্মতার সহিত, অভ্রান্তলক্ষ্যে আপন হৃদয়ের প্রণয়ধারাই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। স্বয়ং সম্রাট্ আওরেঙ্গজেবও সময় সময় নিজ উচ্চপদের মহিমা হইতে অবরোহণ করিয়া কুটিলতাবর্ম্মাবৃত হৃদয়ের রুদ্ধকপাট খুলিয়াছেন ও সাধারণ মানুষের ন্যায় আপন প্রাণের গভীর স্তরস্থ অতৃপ্তি ও ক্ষোভকে বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রকারে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে উপন্যাসের বিশেষত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

এই ইতিহাস নাগপাশের মধ্যে মানব-হৃদয়ের সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন স্ফুরণ হইয়াছে মবারক-জেব-উন্নিসার প্রণয়কাহিনীতে। এইখানে বঙ্কিম ইতিহাসের বন্ধন কাটাইয়া উঠিয়া তাঁহার ঔপন্যাসিক প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন ; ইতিহাস এখানে মানব-হৃদয়-বিশ্লেষণকে অভিভূত না করিয়া তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছে। মবারক রাজনৈতিক আবর্ত্তের মধ্যে ঘূর্ণিত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু সে কোথাও ইতিহাস-প্রবাহে নিশ্চেষ্ট-নির্জ্জীববৎ আপনাকে ভাসাইয়া দেয় নাই, তাহার নিজের স্বাধীন মনোবৃত্তিই প্রধানতঃ তাহার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। জেব-উন্নিসার সহিত প্রথম প্রণয়-ব্যাপারে, মবারকের উৎপীড়িত বিবেক তাহার অবৈধ কলুষিত প্রেমের বিরুদ্ধে অন্ততঃ একটা ক্ষীণ প্রতিবাদও করিয়াছে ; এবং তাহার পরবর্ত্তী জীবনের সমস্ত ভাগ্য বিপর্য্যয়কেও সে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছে। রূপনগরের যুদ্ধের পর জেব-উন্নিসাকে ত্যাগ, আবার পার্ব্বত্য যুদ্ধের পর দীনা, অনুতপ্তা সম্রাট্‌দুহিতাকে পুনর্গ্রহণ, স্বজাতিদ্রোহিতার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ নিশ্চিত মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া সম্রাট্ শিবিরে প্রতিগমন—এসমস্তই তাহার স্বাধীন ইচ্ছার ফল। ইতিহাসের পাষাণ প্রাচীর তাহাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার স্বাধীন আত্মাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। তাহার এই অক্ষুণ্ণ স্বাধীনতার শেষ প্রমাণ এই যে রাজপুত-মোগলের অনলোদ্গারী কামান রাশির মধ্যে যে অস্ত্র তাহাকে মৃত্যুমুখে পাঠাইল তাহা দরিয়াহস্তনিক্ষিপ্ত।

উপন্যাস মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনের পূর্ণতম বিকাশ হইয়াছে জেব-উন্নিসার চরিত্রে। যেমন পর্ব্বতের কঠিন বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া যে নির্ঝরিণী নির্গত হইয়াছে, তাহার সৌন্দর্য্য আরও মনোহর, সেইরূপ ইতিহাসের পাষাণ প্রাচীরের মধ্যে অবরুদ্ধা জেব-উন্নিসার অন্তরের গোপন কাহিনীটী অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী, ও অনুপম মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়াছে। জেব-উন্নিসা ঐতিহাসিক চরিত্র ; কিন্তু তাহার ঐতিহাসিকত্বই তাহার প্রধান আকর্ষণ নহে, তাহার মধ্যে যে দুঃখজ্বালাপূর্ণ, প্রণয়াবেগশালী মানবহৃদয় আছে তাহাই তাহার মুখ্য পরিচয়। গ্রন্থারম্ভে জেবউন্নিসা ঐতিহাসিক চরিত্রহিসাবেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ; সে সম্রাটের প্রিয় দুহিতা, সাম্রাজ্যশাসনে তাঁহার প্রধান সহায়, রঙ্ মহালের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। মবারক তাহার প্রণয়াস্পদ বটে, কিন্তু এই প্রেমকে সে একটা অতি তুচ্ছ ব্যাপার বলিয়া নিতান্ত উপেক্ষার চক্ষেই দেখিয়া আসিতেছে—যেন প্রেমকে হৃদয়ে স্থান দান করিয়া সে প্রেমের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। মবারকের বিবাহ প্রস্তাবকে সে অবজ্ঞার হাসিতে উড়াইয়া দিয়াছে ; প্রণয়ের মাহাত্ম্য সে প্রতিপদক্ষেপে অস্বীকার করিয়াছে ; শেষে প্রণয়ী

অপ্রাপ্য হইলে ব্যর্থ প্রণয়ের জ্বালা অপেক্ষা বাদশাহজাদীর কুপিত অহংকারই তাহাকে প্রেমাস্পদকে পিপীলিকার মত টিপিয়া মারিতে প্রণোদিত করিয়াছে। ইহার পরই অপমানিত, অস্বীকৃত, নির্ব্বাসিত প্রেম আপনার অনিবার্য্য দীপ্ততেজে তাহার হৃদয় মধ্যে জ্বলিয়া উঠিয়া তাহার স্বাভাবিক মহিমার অবিসংবাদিত, অখণ্ডনীয় প্রমাণ দিয়াছে; এই নব-জাগ্রত প্রেম তাহাকে সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য হইতে নির্ম্মমভাবে টানিয়া আনিয়া একান্ত রিক্ততার মাঝে দাঁড় করাইয়াছে; তাহার সর্ব্ব অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া তাহাকে প্রেমের অতি দীনা ও অনুতপ্তা পূজারিণীতে পরিণত করিয়াছে; তাহার শাহজাদীত্ব ঘুচাইয়া তাহাকে সাধারণ মানবীর সমতলভূমিতে আনিয়া অধিষ্ঠিত করিয়াছে। তারপর সে আর ইতিহাসের ধার ধারে নাই; ইতিহাসের সমস্ত বিপর্য্যয়ের মাঝে সে আপন চিন্তায় নিমগ্না, আপন শোকে অধীরা, পূর্ব্বস্মৃতির বৃশ্চিকদংশনে কাতরা। পিতার অপমান ও পরাজয়, নিজ উচ্চাভিলাষের উন্মূলন, সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সূচনা—এ সমস্ত আর তাহার চিন্তায় স্থান পায় নাই। সর্ব্বশেষে ইতিহাস আবার তাহার পুনর্লব্ধ প্রণয়ীকে তাহার বুক হইতে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার জীবনের উপর আর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই—তাহার ঐকান্তিক প্রেমের পরিসমাপ্তিকে এক মহাব্যর্থতার করুণ সুরে ভরিয়া দিয়াছে মাত্র।

'রাজসিংহে' এইরূপ দুই চারিটী দৃশ্য ছাড়া উপন্যাসোচিত গুণ খুব বেশী নাই। চরিত্র-বিশ্লেষণ যদি উপন্যাসের প্রাণ হয়, তবে রাজসিংহে তাহার অবসর অপেক্ষাকৃত কম। ইতিহাসের প্রবল স্রোতে চরিত্রের বিশেষত্ব ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এই বিশাল সমুদ্র-মন্থনে যে রস উঠিয়াছে তাহা আমাদের সাধারণ জীবনের পক্ষে অতিশয় তীব্র; দুই যুদ্ধোদ্যত সৈন্যদলের মাঝে স্থিরভাবে দণ্ডায়মানা চঞ্চলকুমারীর মুখে যে সমস্ত তেজঃপূর্ণ বাক্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা জীবনের বীরত্বপূর্ণ সন্ধিস্থলেরই উপযুক্ত; এই ভাব ব্যক্তিগত নহে, typical; সেইরূপ বাদসাহের নিকট নির্ম্মলকুমারীর সরস বাকপটুতা ও সতেজ নির্ভীকতাও তাহার ব্যক্তিগত বিশেষত্বের অপেক্ষা জাতির প্রতিনিধিত্বেরই অধিক সূচক। রাজসিংহে বিবৃত ঘটনাগুলি এতই বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক যে পাঠকের মন চরিত্রবিশ্লেষণের দাবী করিতে ভুলিয়া যায়; আর এরূপ রোমাঞ্চকর সংঘটনের মধ্যে চরিত্রের উচিত বিকাশ ও পরিণতিও অসম্ভব। সুতরাং সূক্ষ্ম সমালোচকের দৃষ্টিতে 'রাজসিংহের' মধ্যে উপন্যাসোচিতগুণের অপেক্ষাকৃত অভাব লক্ষিত হইবে। কিন্তু কেবল আখ্যায়িকা হিসাবে, একটী জাতি-সংঘর্ষমূলক মহাযুদ্ধের জীবন্ত ও উদ্দীপনাপূর্ণ বর্ণনা হিসাবে, 'রাজসিংহ' অতুলনীয়। ইহার গঠন-কৌশলও (constructive power) অনবদ্য; দৃশ্যের পর দৃশ্য দ্রুতবেগে পরিণতির দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও অনাবশ্যক বাহুল্য নাই, কোথাও গতিবেগ মন্থর হইয়া আসে নাই, কোথাও কেন্দ্রাভিমুখী রেখা হইতে তিলমাত্র বিচ্যুতি হয় নাই। অবশ্য স্থানে স্থানে দুই একটী দৃশ্য অসম্ভবতা দোষে দুষ্ট হইয়াছে; দরিয়ার মোগল-অশ্বারোহীর ছদ্মবেশ, মাণিকলালের ঐন্দ্রজালিক চতুরতা রোমান্সের পক্ষেও ঠিক সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু বঙ্কিম তাঁহার আখ্যায়িকাকে এরূপ প্রচণ্ড গতিবেগ দিয়াছেন যে পাঠক এই সমস্ত ক্ষুদ্র ত্রুটির উপর মনোযোগ দিতেই অবসর পায় না। রাজসিংহে বঙ্কিমের এক নূতন রকমের ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; তাঁহার কৃতিত্ব এই যে তিনি একদিকে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনার মধ্যে চরিত্র-মূলক শৃঙ্খল যোজনা করিয়া দিয়াছেন। অপর দিকে ব্যক্তিগত জীবনে ইতিহাসের গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছেন; এবং এইরূপে দুই বিভিন্ন প্রকৃতির উপাদানের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সমন্বয়ে গড়িয়া তুলিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত এম্ এ কাব্যতীর্থ

প্রণীত

১। বিবেকানন্দচরিত ... ... ।৴০

"Received with many, many thanks the brochure—Vivekananda Charita. It is so very interesting that I read the whole of it at a stretch......................The style of the work from start to finish is pure, elegant and vigorous ....Your review on the assets of Vivekananda in the last chapter of the book is highly laudable and instructive."—

From the Raja Bahadur, Feudatory State of Hindol.

২। আরোগ্য-দিগ্‌দর্শন

বা স্বাস্থ্যনীতি — মহাত্মাগান্ধীর মূল গুজরাতী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ ॥০

"Prof. Sen in his lucid style has made the Bengali edition all the more interesting."——Amrita Bazar Patrika, March 25, 1923.

"বইখানির ভিতর সহজ ব্যবস্থাও এমন অনেক আছে যাহা সহজেই অনুসৃত হইতে পারে এবং দেহের ও মনের পুষ্টিসাধনের পক্ষে যাহাদের উপযোগিতাও কম নহে। .... আরোগ্য-দিগ্‌দর্শনের অনুবাদকের ভাষা ভাল—বেশ সহজ এবং প্রাঞ্জল, মোটেই অনুবাদের মত মনে হয় না।" প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২৯।

প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব,

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, অথবা বিচিত্রা প্রেস, ৩১নং ব্রজনাথ দত্তের লেন,

কলিকাতা।

পোলাও মূল্য ১।০

সুকবি বেনোয়ারীলাল প্রণীত। অর্দ্ধশিক্ষিতের জন্য ইহা নহে প্রাপ্তিস্থান কলিকাতা মৃজাপুর লেন Universal Book Depot ও গাইবান্ধায় আমার নিকট। বঙ্গবাণী জড়িমাজড়িত ভাষায় গাল দিয়াছেন। বঙ্গবাণী হইতে মুক্ত দীনেশ অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক অক্ষয় বলেন "লোকে এখন পোলাও চায় না এখন লোক চায় চানাচুর্‌র্‌র্" বঙ্গবাণী, মানসী ও বঙ্গবাসীতে তিনজন সাহিত্যরথ ইহার সৌন্দর্য্যবিশ্লেষণ করিয়াছেন।

শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ গোস্বামী।

গাইবান্ধা।

বাংলার কথা-সাহিত্য
কবিবর দক্ষিণারঞ্জনের
বাংলার বুকের গান
ঠাকুরমার ঝুলি
ঠানদিদির থলে
এত বড় স্বদেশী
আর কি আছে?
— রবীন্দ্রনাথ —
রাজার গান
চাষার গান
বুড়ার গান
শিশুর গান
—বাংলার-
-মায়ের গান
ঠাকুরদাদার ঝুলি
দাদামশায়ের থলে
-সকল বাংলা-
'HAS MARKED OUT AN EPOCH
IN OUR LITERATURE'
The Bande-Mataram
—AUROBINDO—
স্ত্রীর গান
যুবার গান
বাংলার স্বপ্নপুরী—ঠাকুরমার ঝুলি—১৷৷০
বাংলার ভোরের পদ্ম
দাদামশায়ের থলে—১৷৷০
বংলার পবিত্র বই—ঠানদিদির থলে—১৷৷০
বাঙালীর মায়ের শঙ্খরব
ঠাকুরদাদার ঝুলি—২৲
-কবিবর দক্ষিণারঞ্জনের বাংলার কথা-সাহিত্য
৩১৷১ কলেজ ষ্ট্রীট—আশুতোষ লাইব্রেরী—কলিকাতা

সূচী

ক্যালকাটা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,—৬৫ নং সার্পেণ্টাইন লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নব্যভারত

দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড]　　মাঘ, ১৩৩১　　[১০ম সংখ্যা

বৌদ্ধজ্ঞানে উপনিষদের প্রভাব

বেদ নিত্য, যেহেতু বেদ জ্ঞান ও শব্দ। যাহার ক্ষয়-ব্যয় নাই, যাহার উৎপত্তি বিনাশ নাই, যাহার উৎপাদ-নিরোধ নাই, তাহাই নিত্য। জ্ঞান কেবল জানা নয়; উহা অন্তর ও বহির্বিষয়ে ভাব-অভাব বুদ্ধি, কার্য্য-কারণ ও সম্বন্ধ বুদ্ধি এবং সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি। যে কোন জাতি পৃথিবীতে কিছু উন্নত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে জ্ঞান কোন না কোন আকারে দেখা দিয়াছে। যেখানে মানুষ, সেইখানে জ্ঞান। অসভ্য জাতিরও জানিবার চেষ্টা আছে, বুঝিবার চেষ্টা আছে, তাহাদের আখ্যান উপাখ্যান আছে, তাহাদের সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি ও সাহিত্য আছে। জ্ঞান নিত্য বলিয়া উহা আদিকারণের স্বরূপ। আবার জ্ঞানের মূর্ত্তি ভাষার দ্বারা প্রকাশ হয়, কাজেই জ্ঞান ও ভাষা পরস্পর নিত্যসম্বদ্ধ। এই ভাষাই শব্দ এবং শব্দ লইয়াই জ্ঞান যেন আপনার মূর্ত্তি আপনি দেখাইতেছে। অতএব শব্দও নিত্য এবং উহাও মূলকারণের স্বরূপ বা ব্রহ্ম। এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়াই প্রাচীন জাতি সমূহের অভ্যুদয় ও সমৃদ্ধি। তবে ভারতে উহার একটু বিশেষত্ব আছে। ভারতে বেদই জ্ঞানের বীজ; এবং অপরাপর পল্লব, শাখা যাহা কিছু হইয়াছে তাহা যেন লতার মত বেদকে জড়াইয়া আছে। এমন কোনও জ্ঞানের বিষয় নাই যাহা বেদে কোন না কোন আকারে পাওয়া যায়। মানুষের যাহাতে জ্ঞানের বিকাশ বা জ্ঞান যে আকার লইয়া মানুষের সম্মুখীন হইয়াছে সে সকলই বেদমূলক। যথারীতি মন্ত্র উচ্চারণের জন্য শিক্ষা, মন্ত্র পাঠের জন্য ছন্দ, অনুষ্ঠানের জন্য জ্যোতিষ, শব্দ বুঝিবার জন্য নিরুক্ত, পদ-বিন্যাসজন্য ব্যাকরণ, এ সমস্তই কেবল বেদে অনুপ্রবেশ করিবার জন্য উদ্ভুত হইয়াছে। বেদ ছাড়া উহাদের স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই। বেদ বুঝিবার জন্যই উহাদের আবির্ভাব, কাজেই উহারা বেদ-প্রাণ। মানুষ জ্ঞান সৃষ্টি করে না. উহা মানব হৃদয়ে দেখা দেয়, ইহাই বোধ হয় জ্ঞানের স্বভাব, ভারতে জ্ঞানের শাখাসমূহ বেদমূলক বলিয়া বেদই সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতির প্রসূতি।

নৈহাটীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশনে দর্শন-শাখায় পঠিত।

একটা প্রচলিত কথা আছে যে, এখন কোনও জ্ঞান বা বিজ্ঞান নাই যাহা পূর্ব্বে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত ছিল। এমন কি অভিব্যক্তি-বাদও ভারতে ও গ্রীক জাতির মধ্যে সুপরিচিত ছিল। মূলমন্ত্রটা জানা ছিল, তবে উহার কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে এই পর্য্যন্ত। ভূতত্ত্ব একটি নব্য বিজ্ঞান বলিয়া আমরা বুঝি, কিন্তু পৌরাণিক আখ্যায়িকায় সৃষ্টিপ্রকরণ ভূতত্ত্ব ব্যাখ্যার চেষ্টা মাত্র। কোনও সুপ্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ব-লেখক (১) তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে সাদরে বিভিন্ন দেশের ঐ সকল প্রাচীন আখ্যায়িকায় উল্লেখ করিয়াছেন। রসায়নকেও নব্য শাস্ত্র মনে করিবার কোনও কারণ নাই। ভূত সমূহের যোগে ও অণু, পরমাণু দ্বারা জগত সংগঠিত হইয়াছে ইহা প্রাচীনেরাও অনুভব করিযাছিলেন।

যাহা হউক জ্ঞান এক হইলেও ইহার শাখা প্রশাখা বড় নদীর মত অনেক হইয়া থাকে। ভারতের জ্ঞান যদিও বেদমাতৃক, কিন্তু পরে উহা ক্রমশঃ বেদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে মাথা তুলিয়াছে। জ্যোতিষ ও ব্যাকরণ প্রভৃতি ক্রমশঃ বেদের বাহিরে আসিয়া নূতন বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এই নূতনত্ব হইতে স্বতন্ত্র ভাব এবং স্বতন্ত্র ভাব হইতে স্বাধীনতা দেখা দিয়াছে, এবং সেই সময় হইতে ভারতের দৃষ্টিকেন্দ্রও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

সেটা একটা নূতন যুগ। প্রাচীনেরা প্রাচীন দৃষ্টিকেন্দ্রে জাগতিক রহস্য দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু নবীনেরা প্রাচীনের গণ্ডী ছাড়াইয়া নূতন ভাবে জ্ঞান চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। উভয় পক্ষে একটা দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল। যাহা হউক জ্ঞান ত একই, তবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে উহার বিভিন্ন আকার হয় কেন? অথবা যাহা লইয়া কলহ উহার মূল ব্যক্তিগত দৃষ্টিভ্রম আছে কি না? সাধারণতঃ সাম্প্রদায়িক কলহ বাহ্যিক আবরণ লইয়া হইয়া থাকে। সত্য এক ছাড়া দুই হইতে পারে না। উভয় পক্ষেই একই সত্যের বিভিন্ন আচ্ছাদন লইয়া কলহ করে। একটা কথা আছে যদি একশত লোক সূর্য্য দেখে, তাহা হইলে প্রত্যেকেই উহা বিভিন্ন ভাবে দেখিয়া থাকে। অর্থাৎ কেহ উহার আকার, কেহ বর্ণ, কেহ উজ্জ্বলতা, কেহ উত্তাপ, কেহ দেবত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব লইয়া নাড়া চাড়া করে। বিষয় যতই জটিল হইবে তাহা সেইরূপ বহুধর্ম্মী ও বহুকারণসমন্বিত হইবে। কাজেই কেহ কতকগুলি ধর্ম্ম দেখিয়া সমস্ত বিষয়টি বুঝিতে চেষ্টা করিবে, আবার অপর কেহ অন্য ধর্ম্মগুলির উপর দৃষ্টি রাখিয়া ঐ বিষয়ের অনুভব করিবে। যেস্থলে কেহ কোন বস্তুর নূতন ধর্ম্ম বা গুণ দেখিতে পায় অপরে সেখানে কিছুই দেখে না। ইহার জন্যই মতভেদ। স্বর্ণকার যেরূপ সোণা চিনে সাধারণ লোকে সেরূপ চিনিতে পারে না। অতএব স্বর্ণকার সোণার এমন একটা ধর্ম্ম বা ভাব দেখে যাহা সাধারণে দেখিতে পায় না। আবার খনিজ পণ্ডিত যে প্রস্তরের সহিত যে সোণা থাকে তাহা যেমন চিনেন, স্বর্ণকার তাহা জানেনা। পদার্থ-তত্ত্ববিৎ, তাহার উত্তাপ-গ্রহণ শক্তি, তাহার তড়িৎ-পরিচালকত্ব (কনডকটিভিটি) বিশেষ ভাবে বুঝেন। অতএব

(১) লায়েল।

একই বিষয়ে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন দৃষ্টি হইয়া থাকে। ইঁহারা প্রত্যেকেই যাহা দেখেন তাহা সত্য। তবে সোণা দৃশ্য বস্তু বলিয়া বিশেষ কোনও গোল নাই। কিন্তু অরূপ, অদৃশ্য বিষয়ের গুণাগুণ সম্বন্ধে বহু মত হওয়াই স্বাভাবিক।

ইউরোপীয় জাতি গণনাপ্রিয়, কাজেই তাঁহারা ভারতীয় জ্ঞানের একটা কাল নিরূপণ করিতে চেষ্টা করেন। কালটা ঠিক না হউক, তবে পৌর্বাপর্য্যটা কতকটা ধরিতে পারা যায় এবং ইহাও একটা হিসাবের পক্ষে বিশেষ সুবিধা। যাঁহারা মন্ত্র ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ প্রভৃতি সব এক সঙ্গে আবির্ভূত হইয়াছে মনে করেন, তাঁহাদের সংখ্যা আজকাল খুব কম বলিতে পারা যায়। বৈদিক মন্ত্র ভাগই ভারতীয় জ্ঞানের প্রথম স্তর তাহা মনে করিলে কোনও দোষের হয় না। জ্ঞান কখনও কাহারও মুখাপেক্ষী হয় না। ইহা আপনার পথ আপনি পরিষ্কার করিয়া লয়। মন্ত্রভাগের বিষয় উপনিষৎ ভাগের বিষয় হইতে ভিন্ন। আবার উপনিষৎভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ বিষয় অনুপাতে এক নহে। উপনিষৎ পাঠে বুঝা যায় যে ঐ সময়ে প্রকৃতি ও প্রকৃতির সূক্ষ্ম রহস্য সমূহ অর্থাৎ প্রাণতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি অনুসন্ধানে ঋষিগণ তৎপর রহিয়াছেন। বায়ু, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি তখন আর দেবশক্তিসম্পন্ন নহেন, উঁহারা পঞ্চভূতের অন্যতম। বৈদিক যুগের "ঋত", শ্বেতাশ্বতরে, ও বোধ হয় পরে সাংখ্য-তত্ত্বে, প্রকৃতিতে পরিণত হইয়াছেন। "ঋত" শব্দে প্রাকৃতিক নিয়ম, শৃঙ্খলা ও কার্য্যকারণ ভাব। মহাভারতের যুগে বৈদিক অনুষ্ঠান সমূহে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে বুঝা যায়। যদি গীতার উপদেশ ঐ সময়ে প্রচার হইয়া থাকে তাহা হইলে বেদ তখন "ত্রৈগুণ্যবিষয়" হইয়া পড়িয়াছে। দেবতারাও সমগ্রভাবে বিশ্বদেবে পরিণত হইতেছেন। অতএব ভারতের মানসিক দৃষ্টি ঐ সময়ে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। বৃহস্পতির মত কোন্ সময়ের তাহা বলা যায় না। হয়ত উহা বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বেই হইয়া থাকিবে। আত্মা ও ঈশ্বর তখন হইতে সংসারের বস্তু এবং চারিবেদ ভণ্ডধূর্ত্ত নিশাচরের ব্যবসায়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আজকালকার ভাষায় বলিলে উপনিষদের যুগ হইতেই জ্ঞান ও যুক্তিবাদের (১) প্রারম্ভ বলা যায়। কোন এক ইউরোপীয় বড় পণ্ডিতের মতে (২) সাংখ্য তত্ত্ব বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী। যাহা হউক ঐ সময়টা মোটামুটি বিজ্ঞানের যুগ বলা যায়। জ্যোতিষ, চিকিৎসাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্বসমূহের ক্রমশঃ আবির্ভাব হইতেছিল। বৌদ্ধসূত্র ও অভিধর্ম্ম গ্রন্থে যেরূপ মনস্তত্ত্বের গভীর বিচার দেখা যায় তাহা হইতে মনে হয় আধুনিক যুগের মত পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা ঐসময়ে পুরাভাবে চলিতেছিল।

পূর্ব্বের প্রশ্নটি আর একবার তোলা আবশ্যক। জ্ঞান ক্রমভাবী—তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রাচীনের উপর বিতৃষ্ণা ও নূতনের আদর মানুষের স্বভাবগত। ধর্ম্ম অভ্যন্তরের বস্তু, উহা মানবের প্রকৃতিগত (৩) বলিলেও চলে। বৈদিক যুগে অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি

---

(১) র‍্যাসান্তালিসম্

(২) গার্ব্বে।

(৩) ইনসটিনকটিব্।

দেবতার স্তব স্তুতি করিয়া ঋষিদের ধর্ম্মপিপাসা মিটিত। উপনিষৎ যুগে ধ্যান, আত্মজ্ঞান কর্ম্ম ও যজ্ঞ দ্বারা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হইত। কিন্তু তাহাতেও তৃপ্তি নাই, জৈন ও বৌদ্ধ আন্দোলন একটা অতৃপ্ত অবস্থার পরিচয় দিয়া থাকে। জৈন ও বৌদ্ধ ধারা ভারতে নূতন কিছু আনিয়া দেয় নাই। উপনিষৎতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া উভয় ধর্ম্ম দেখা দিয়াছে।

জৈন ও বৌদ্ধ আন্দোলন প্রায় সমসাময়িক। উভয় ধর্ম্মই আবার শুদ্ধি করুণা ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতির উপর অধিক ঝোঁক দিয়াছিল। উভয় ধর্ম্মই ভারতীয় জ্ঞানবিকাশের ফল এবং উভয় ধর্ম্মই বেদবিরোধী। আবার জৈন ধর্ম্ম কেবল বেদবিদ্বেষী নহে; উহাতে ব্রাহ্মণবিদ্বেষও আছে। বুদ্ধ ব্রাহ্মণ দেব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন; মহাকশ্যপ, বুদ্ধঘোষ, নাগার্জ্জুন প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধমতের ও ধর্ম্মের বহু উন্নতিসাধন করিয়াছেন। বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও বেদ-বিদ্বেষ ছিল এবং তিনি বেদকে তাঁহার তন্ত্র-ভুক্ত করিয়া লইলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বৈদিকধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইত। জৈন-ধর্ম্ম ব্রাহ্মণবিদ্বেষ লইয়া সেরূপ শিষ্য সংগ্রহ করিতে পারিল না, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণহস্তে পালিত হইয়া সার্ব্বজনীন হইয়া পড়িল।

বৌদ্ধধর্ম্ম একপ্রকার দার্শনিক ধর্ম্ম; কেবল জ্ঞান আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মের যতটুকু উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে তাহা বৌদ্ধ ধর্ম্মের হইয়াছে। আমাদের ষড় দর্শনও একপ্রকার ধর্ম্মমার্গ। ঐ সকল দর্শনের সারতত্ত্ব বুঝিতে পারিলে অপবর্গ নিশ্রেয়স, মোক্ষ প্রভৃতি হইয়া থাকে। তবে প্রত্যেক দর্শনেই স্বমতপ্রতিষ্ঠা হইলেও উহাতে বৈদিক আচার ও বর্ণাশ্রম প্রভৃতির সমর্থন আছে বলিয়া উহা প্রাচীন পন্থায় স্থান পাইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে উপনিষদের যুগ জ্ঞানের যুগ, তত্ত্বান্বেষণের যুগ এবং ঐ যুগকে দর্শন ও বিজ্ঞানের যুগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সকল আন্দোলন ও বাদ প্রতিবাদের মধ্যে বুদ্ধের জন্ম হয়। প্রাকৃতিক ক্রিয়া তখন আর দেবগণের ক্রীড়া নহে, উহা নিয়ম ও কার্য্য-কারণনিয়ন্ত্রিত, যেহেতু উহা যাদৃচ্ছিক নহে। প্রকৃতিতত্ত্ব অধ্যয়ন হইতে বিজ্ঞানের জন্ম এবং বিজ্ঞান হইতে উহার মূল মন্ত্র দর্শনের উৎপত্তি। জগতে মানুষের স্থান, বিশ্বের সহিত উহার সম্বন্ধ, জগতে উহার কার্য্য—এই সকল প্রশ্ন আপনা হইতে উঠিতে লাগিল। উপনিষদেও যে এ সকল তত্ত্ব নাই তাহা বলা যায় না, বরং ইহার প্রভাব বেশ দেখা যায়, এক মূল বস্তু, এক আদি কারণ হইতে এই বহু ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। এবং উহা মায়া বা প্রকৃতি-সৃষ্ট এই কল্পনা উপনিষৎ হইতেই আমরা পাইয়া থাকি। ইহা ছাড়া কর্ম্ম ও সংসার, ধ্যান, অমৃতত্ব প্রভৃতির আলোচনা উপনিষদেই দেখিতে পাওয়া যায়।

দর্শনের উৎপত্তি বুদ্ধপূর্ব্বযুগের হইতে পারে তাহার আভাস পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন শাস্ত্রের কালগণনা বিড়ম্বনা মাত্র। সাংখ্যকে যদি আদিদর্শন ধরা যায় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে সাংখ্য জগৎরহস্যের এক অভিনব দ্বার খুলিয়া দিয়া ভারতের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিয়াছেন। বিশ্লেষণ করিয়া আমরা অবশেষে দুইটি মাত্র পদার্থে পঁহুছিতে পারি। সেই দুই পদার্থ মন ও জড়; এবং তাহাদের ক্রিয়াশীল অবস্থাই জগৎ বা প্রকৃতি। এত অল্প ভাষায় প্রকৃতির স্বরূপ বুঝান তীক্ষ্ণ দার্শনিক দৃষ্টি না থাকিলে

হয় না। আর এই গভীর চিন্তা আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের গবেষণার ফল ইহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। চার্ব্বাক সম্প্রদায় চপল দার্শনিক, কাজেই তাঁহাদের রচিত দর্শন অন্ধ দর্শন এবং উহা পুরা ভাবে যুক্তিবাদীর চিন্তার ফল মাত্র। উহার বিস্তৃতি আছে, কিন্তু গভীরতা নাই, উহা আশুবোধ্য কিন্তু তত্ত্বের হিসাবে উহা লঘু।

এই যুক্তিবাদের দিনে এই তর্ক, বিচার ও পর্য্যবেক্ষণের যুগে বৌদ্ধ-মতের উদয় হইল। ঐ সময় বোধ হয় বুদ্ধের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ভারতে কেহ ছিলেন না। তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান ও চিন্তা উপেক্ষা করিতেন ইহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই, অথবা তিনি প্রাচীন মত ও বিশ্বাস সমূহ একবারে ধ্বংস করিয়া তাহার কঙ্কালের উপর তাঁহার মত রচনা করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন তাহাও বিশ্বাসযোগ্য নহে। জীবশরীর যেমন সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে ক্রমশঃ পরিপুষ্টি লাভ করে সেইরূপ জাতীয় জ্ঞানও অব্যক্ত অবস্থা হইতে উদ্ভূত হইয়া ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হয়। জাতীয় জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া তিনি তত্ত্ব অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। সামাজিক গ্লানি উপস্থিত হইলে জ্ঞানী ব্যক্তি সমাজ নষ্ট না করিয়া তাহার গ্লানি মোচন করিতেই চেষ্টা করেন। উপনিষদের জ্ঞানই তাঁহার আদরের বস্তু, তাঁহার শ্রদ্ধার সামগ্রী, সেই জ্ঞান মূলে আরোহন করিয়া তিনি প্রাচীনপন্থীদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। সমাজ দেশ ও সত্য রক্ষা করাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তদানীন্তন গলিত সংস্কারসমূহ তিনি বিদ্বান ব্যক্তিদের সম্মুখে ধরিয়া দিতেন, এবং প্রাচীন অসৎ বিশ্বাসের উপর যে সকল ক্রিয়া কর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত তাহার তিনি ঘোরতর প্রতিবাদ করিতেন। এই সকল বিষয়ের বৃত্তান্ত আমরা তিবেজ্জ সুত্ত ও অপরাপর সূত্র গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি এবং ঐ সকল গ্রন্থে ইহার যথাযথ বর্ণনা আছে। তদানীন্তন আচার ব্যবহার সংস্কার সমূহ তিনি সুবংশজাত ও শিক্ষিত ব্রাহ্মণ যুবকদের নিকট কি ভাবে তুলিতেন, কি ভাবে উহার দোষ দেখাইতেন এবং অবশেষে কি প্রকারে তাহাদের স্বমতে আনিতে চেষ্টা করিতেন তাহার অনেক বৃত্তান্ত আছে। বশিষ্ঠ ও ভরদ্বাজবংশ জাত দুই যুবক তাঁহার নিকট ধর্ম্ম উপদেশ লইবার জন্য গিয়াছিলেন এবং পরে তাঁহারা বুদ্ধ বাক্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মত শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

সূত্র ও অভিধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে বুদ্ধদেব কি ভাবে বিষয়ের মূলে উপস্থিত হইতেন ও তাঁহার কি রূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও অসাধারণ বিচারশক্তি ছিল তাহার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। তাঁহার উপদেশ সমূহ বাঁধা কথায় রচিত নহে অথবা সাধারণ ধর্ম্ম উপদেষ্টারা যে ভাবে প্রচলিত কথায় লোক সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন বুদ্ধদেবের সে ভাব ছিল না। তাঁহার শ্রোতৃবর্গ সাধারণ জনসংঘ নহে অথবা শ্রমজীবী শ্রেণীও নহে। যাঁহারা বিদ্যাপারদর্শী, শাস্ত্রমর্ম্মগ্রাহী, তত্ত্ব পিপাসু, তাঁহারাই তাঁহার শ্রোতা ছিলেন। বুদ্ধ বুঝিয়াছিলেন যে মানব চিত্তের গঠন ও ক্রিয়ার উপর আচার, নীতি, বিশ্বাস ও ধর্ম্ম প্রভৃতি দাঁড়াইয়া আছে। বাহ্য বস্তু ও বিশ্বক্রিয়ার অনুভব, মানবের মূল প্রত্যয় সমূহ এবং যে সকল সামাজিক কার্য্য ও নিয়মের উপর ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, তাহার আদিতে মন রহিয়াছে। কাজেই তাঁহাকে মনস্তত্ত্বের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছিল এবং উহার সন্নিবেশ ও বিশ্লেষণ এতই গভীর ও সমীচীন যে নব্য থিওরেটীক্যাল মনস্তত্ত্ব তাহা অপেক্ষা অধিক শিখাইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। তবে বুদ্ধ যে উহা নূতন করিয়া তৈয়ারী করিয়াছিলেন

তাহা মনে করিতে পারা যায় না। নূতন জিনিস হইলে লোকে সহজে তাহা বুঝিতে পারে না। মনস্তত্ত্ব বুদ্ধপূর্ব্বযুগের রচিত, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি উপনিষদে আমরা তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাই।

হিন্দুর ষড় দর্শনের মত বৌদ্ধদের কোনও বাঁধা দর্শন নাই, অন্তত বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় ও তাঁহার মহা নির্ব্বাণের দুই একশত শতাব্দীর মধ্যে কোনও দর্শন দেখা দেয় নাই। বুদ্ধদেবের অভিভাষণ ও উপদেশ গাম্ভীর্য্যসম্পন্ন ও দার্শনিক ছন্দে গঠিত এবং বোধ হয় সেই জন্যই অন্য কোনও দর্শনের তখন বিশেষ আবশ্যক হয় নাই। বুদ্ধউপদেশসমূহ এক প্রকার দার্শনিক তত্ত্ব বলিলেও চলে, আমাদের ষড় দর্শনেও কিছু কিছু ধর্ম্মের গন্ধ আছে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রত্যেক দর্শনের রচয়িতা কেবল যে জ্ঞানী ব্যক্তি তাহা নহে, ঐ সঙ্গে তিনি ধর্ম্ম উপদেষ্টা, যেহেতু প্রত্যেক দর্শনে সম্যক অধ্যয়নে অপবর্গ ও মোক্ষ প্রভৃতি আছে এবং এ কথার উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে।

বুদ্ধের উপদেশে পূর্ণমাত্রায় বেদবিদ্বেষ অথবা উহার নিন্দা নাই। যে সকল শুষ্ক ও অন্তঃসারশূন্য বৈদিক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল ও উপাসনার অর্থহীন বিধান ছিল তাহার তিনি প্রতিবাদ করিতেন ও তাহাদের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতেন। বৈদিক পন্থীদিগের মধ্যেও যে প্রাচীন কর্ম্ম অনুষ্ঠান, উপাসনা ও সামাজিক নিয়মের প্রতি কটাক্ষপাত ছিল না তাহা বলা যায় না। মহাভারতে, গীতায় এমন কি উপনিষদেও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। যাহা হউক বৌদ্ধ জ্ঞান ভারতীয় জ্ঞানেরই একটি স্তর বা উহার একটা অঙ্গ। উহা বাহিরের সামগ্রী নহে এবং যাঁহারা বৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্টা ছিলেন তাঁহাদের বংশোদ্ভব লোকেরাই বৌদ্ধ ধর্ম্মের আকার গঠন, চাকচিক্য সম্পাদন করিয়াছেন। ভারতে চিন্তা রাজ্যে যাহা কিছু নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার সহিত ব্রাহ্মণবুদ্ধি ও পটুতা সংযোগ আছে দেখিতে পাওয়া যায় এবং বৌদ্ধদর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্বের শ্রীবৃদ্ধি তাঁহাদের দ্বারাই হইয়াছে।

বৌদ্ধদর্শন ও জ্ঞান সম্বন্ধে সুবৃহৎ গ্রন্থ লিখিলেও উহা শেষ করা যায় না, কাজেই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার কেবল কণিকা এবং আভাস মাত্র দেওয়া যাইতে পারে। তাহার উপর বৌদ্ধ সাহিত্যে নির্দ্দিষ্ট কোনও দর্শন না থাকায় উহার বিষয় লইয়া আলোচনা আরও দুরূহ হইয়া পড়ে, বৌদ্ধ মনস্তত্ত্ব, বিভিন্ন সূত্র ও অভিধর্ম্ম গ্রন্থে পাওয়া যায়। মন ও মানসিক ক্রিয়া আলোচনায় বুদ্ধদেব সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং তাঁহার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ গভীরতা হিসাবে নব্য পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্বের সমকক্ষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃতির ক্রিয়া রহস্য, পরকাল, সৎ পবিত্র ধর্ম্ম কি হইতে পারে এই সকল প্রশ্ন বুদ্ধের অন্তরে জাগরূক ছিল। পরস্পর সঙ্গতি রক্ষা করিয়া এই সকল তত্ত্বের অনুসন্ধান ও উপদেশই তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য। যাহা হউক ইহা বিশেষ শক্তিমান পুরুষের কাজ এবং তখন চিন্তার আদান প্রদান ও দেশ পর্য্যটন আধুনিক যুগের মত সহজ ছিল না। ইহা ছাড়া বহু ধর্ম্ম সমন্বিত ভারতে বৌদ্ধ মতের উপযোগিতা প্রমাণকরাও সহজ কাজ নহে।

বৌদ্ধ মনস্তত্ত্ব:—সম্প্রতি বৌদ্ধ মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে দুইচারি কথা বলিব। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই মনকে জড় ও একটি আগারবিশেষ বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। যেমন কলে কোন একটি জিনিস তৈয়ারী করিতে হইলে বিভিন্ন স্থানে তাহার বিভিন্ন কার্য্য হইয়া থাকে সেই রূপ জ্ঞান রচনায় মনের ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ আছে। সেই প্রকোষ্ঠ পাঁচটি এবং তাহাদিগের নাম স্কন্ধ। স্কন্ধ অর্থে রাশি এবং সেই স্কন্ধগুলি যথাক্রমে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, বিজ্ঞান ও সংস্কার। নব্য মনস্তত্ত্বে ইহা অপেক্ষা ভাল বিভাগ নাই। ইন্দ্রিয়সমূহ যে সকল সংবাদ দেয় তাহাই রূপ। রূপের সঙ্গে সুখদুঃখ অনুভূত হইয়া থাকে উহাই বেদনা। রূপসমূহ প্রকটিত হইয়া নাম, কাল, দেশ, জাতি প্রভৃতির সংস্রবে আসিয়া যে বিষয় জ্ঞান হয় তাহা সংজ্ঞাস্কন্ধের কার্য্যে। তাহার পর অপরাপর বিষয়ের সহিত অর্থাৎ কার্য্য-কারণ, পরস্পর সম্বন্ধ সংখ্যা প্রভৃতি সংযুক্ত হইলে যে উচ্চতর বিষয় জ্ঞান হয় তাহা সংস্কার স্কন্ধ সংঘটিত। তাহার পর বিজ্ঞান স্কন্ধ; বিজ্ঞান অর্থে সম্বিৎ অর্থাৎ যাহা দ্বারা বিষয় সমূহ আলোকের মত প্রকাশিত হয়। বৌদ্ধদের মনসিকার মনের একাগ্রভাব বা মনঃসংযোগ অবস্থা। বস্তু সমূহে কাল, দেশ, জাতির সংস্থান কি করিয়া হয় অথবা সংখ্যা, পরিমাণ, কার্য্য কারণ ভাব এবং সম্বন্ধ বোধ কাহার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়? রূপসমূহ উত্তেজনা মাত্র। আলোকের উত্তেজনায় চক্ষুর ক্রিয়া, গন্ধের উত্তেজনায় নাসিকার ক্রিয়া হইয়া থাকে। অতএব রূপ-গ্রহণ শারীরিক ক্রিয়া। কার্য্য কারণ অনুভূতি অথবা সম্বন্ধবোধ উত্তেজনা বশতঃ হয় না, ইহা রূপ প্রভৃতি গ্রহণের পর হইয়া থাকে। অতএব রূপ-স্কন্ধ একপ্রকার শারীরিক ব্যাপারমাত্র। তাহা হইলে জ্ঞান ও সমাধান প্রভৃতি কি করিয়া নিষ্পন্ন হয় এবং উত্তরোত্তর জ্ঞান বৃদ্ধিই বা কি করিয়া হয়? বিদ্যার্থীর অধ্যয়নের প্রাকালের জ্ঞানের সহিত অধ্যয়ন-সমাপ্তির পর যে জ্ঞান হয় এই উভয়ের তুলনায় শেষোক্ত জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ বা বিস্তৃত। ইহা কিরূপে হইয়া থাকে? ইহা হইতে মনের এমন একটা শক্তি অনুমান করিতে হয়, যাহা দ্বারা জ্ঞান-খণ্ড সমূহ একত্রিত হইয়া বিশাল জ্ঞানে পরিণত হয়। বৌদ্ধেরা তাহাকে প্রজ্ঞা বা অভিজ্ঞান বলিয়া থাকেন। এ সকল জ্ঞান, রূপ ও অরূপ লোকের কথা অর্থাৎ বাহ্যিক ও মানসিক ব্যাপার সমূহের প্রতীতিমাত্র। ঋষি, অর্থাৎ, বোধিসত্ত্ব প্রভৃতি ব্যক্তির পারমার্থিক জ্ঞান কোথা হইতে আসে? সাধারণ জ্ঞান মনসিকার প্রভৃতির দ্বারা হইয়া থাকে কিন্তু পারমার্থিক জ্ঞান কেবলমাত্র ধ্যানসাধ্য। বৌদ্ধ মতে পারমার্থিক জগতও রূপ-জগতের মত স্তর বিশিষ্ট অর্থাৎ এক এক অবস্থায় এক এক জনের জ্ঞান হয় মাত্র। সকলের শেষ অবস্থায় অর্থাৎ সমাধি অবস্থায় সাধকের শূন্যতা, সংসার প্রভৃতি পারমার্থিক তত্ত্ব সমূহের অনুভূতি হয়। এই অবস্থাই পূর্ণ অবস্থা এবং উহাই বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তি। পারমার্থিক জ্ঞানের বিভিন্ন অবস্থাও প্রজ্ঞা-সাধ্য, যেহেতু লৌকিক ও পারমার্থিক উভয় জগতেই জ্ঞানের পরিপুষ্টি আছে এবং উহার এক একটি জগত প্রজ্ঞা নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়াতীত জগতেও প্রজ্ঞার বৃদ্ধি আছে এবং উন্নত প্রজ্ঞার নাম অভিজ্ঞা বা সম্প্রজ্ঞান। যাহা হউক বৌদ্ধের পঞ্চস্কন্ধ তৈত্তিরীয় উপনিষদে পাওয়া যায় এবং ধ্যানও উপনিষদের সামগ্রী, কাজেই উহা প্রাচীন বস্তু।

বৌদ্ধ ন্যায়—বাহ্যজগতের ক্রিয়া ও মানসিক ক্রিয়া এই উভয়ই ক্ষণিক কি না

এবং ইহার পশ্চাতে কোনও পদার্থ বা আত্মা আছে কি না বুদ্ধ উপদেশ হইতে তাহা স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় না। বুদ্ধ প্রয়াণের পরে যে সকল বৌদ্ধ মত দর্শন-আকার ধারণ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে এ সকল বিষয় অনেক আলোচনা দেখা যায় এবং তাহাদের সম্বন্ধে পরে বলা হইবে। সম্প্রতি বৌদ্ধন্যায় সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক। একই ন্যায় শাস্ত্র বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ই সাধারণ ভাবে অধ্যয়ন করিতেন। খ্রীষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে বৌদ্ধেরা প্রমাণ শাস্ত্র বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিতেন এবং বাস্তবিকই বৌদ্ধাচার্য্যেরাই উহার উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টার ফলে আমরা অনুমান বিষয়ক নূতন তত্ত্ব পাইয়াছি। বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিক্‌নাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন লেখক "অবয়ব" ও "অনুমান" অধ্যায়ের উন্নতি সাধন করিয়াছেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহারা সকলেই সংস্কৃত ভাষাতেই তাঁহাদের বিষয় নিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার কারণ ন্যায় বিষয়ক সূক্ষ্ম প্রসঙ্গ সাধারণ বৌদ্ধ বুঝিত না এবং বিচার বিতর্ক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সহিত হইত। তবে দুঃখের বিষয় এই যে অধিকাংশ বৌদ্ধ ন্যায় গ্রন্থ সংস্কৃতে বড় পাওয়া যায় না এবং উহারা তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া জীবনধারণ করিয়া আছে। অধুনা ন্যায়বিন্দু গ্রন্থ কেবল সংস্কৃতে পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত সংস্কৃতে লিখিত ছয়খানি ন্যায় গ্রন্থ প্রকৃত প্রস্তাবে দার্শনিক গ্রন্থ, উহা ঠিক ন্যায় বিষয়ক প্রবন্ধ নহে। পূর্ব্বোক্ত ন্যায়বিন্দু গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ঐ গ্রন্থের প্রত্যক্ষ অর্থে কেবল মাত্র প্রতীতি, উহাতে অপর কোনও বিশেষণ নাই অর্থাৎ উহাতে দেশ, সম্বন্ধ বা নামের সংস্রব নাই। উক্ত মতে জাতির প্রত্যক্ষ হয় না উহা অনুমানসাপেক্ষ, আবার ব্যক্তিজ্ঞান স্বলক্ষণবশতঃ হইয়া থাকে। অবয়বী বলিয়া কোনও স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। হিন্দু ন্যায় গ্রন্থে বস্তু সমূহ অবয়ব এবং পরমাণু উহার অবয়বী। ন্যায়বিন্দুকার বলেন অবয়ব সমূহের সমবায়ই অবয়বী। ন্যায়বিন্দুলেখক অনুমানবিষয়ক প্রস্তাব কিছু নূতন ভাবে লিখিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ উহাই স্বনামখ্যাত নব্যন্যায়ের পথ পরিস্কার করিয়া দিয়াছে। অতএব এস্থলেও আমরা দেখিতেছি যে উভয় সম্প্রদায়ই গোতমীয় ন্যায় অবলম্বন করিয়া তাহার পুষ্টি সাধন করিয়াছেন।

বৌদ্ধনীতি :—ইউরোপীয় লেখকেরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকেন যে প্রাচীন হিন্দুতন্ত্রে অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্যে নীতি বা চরিত্রের স্থান নাই। প্রাচীন হিন্দু স্তব, স্তুতি ও যাগ যজ্ঞ প্রভৃতিকেই ধর্ম্মচর্য্যা বলিয়া মনে করিতেন এবং বুদ্ধই নীতি ও আচরণকেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন। একথা ঠিক নহে, নীতি অনুসরণ বা কর্ম্ম প্রাচীনেরা ধর্ম্মের প্রধান সহায় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং বৃহদারণ্য ও তৈত্তিরীয় ঐতরেয় প্রভৃতি উপনিষদে ইহার অনেক উল্লেখ আছে। তবে আত্মজ্ঞান উপদেশই উপনিষদের প্রধান কার্য্য। কথা প্রসঙ্গে স্থানে স্থানে অবতারণা দেখিয়া বেশ বোধ হয় যে উপনিষদের মতে শম দম অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক সৎ-অভ্যাস গঠন মানুষের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক এবং বেদ অধ্যয়নকারীকে উহা অভ্যাস করিতে হইবে। কর্ম্ম অনুসারে পরলোক এবং পরলোকেই মানব জীবনের ফলাফল নির্ণয় করিয়া দেয় ইহা বুদ্ধ জীবনের পূর্ব্বে তাহার অনেক প্রমাণ আছে। যাহা হউক নীতি

মার্গ লইয়া বুদ্ধ বিশেষভাবে উপদেশ দিয়াছেন। কুশল ও অকুশল কর্ম্মের লক্ষণ অনেক দেখাইয়াছেন। জগতের ধর্ম্মসাহিত্যে বৌদ্ধনীতির স্থান অতি উচ্চ। নির্ব্বাণ যাঁহাদের লক্ষ্য তাঁহাদের কুশল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেই হইবে এবং নির্ব্বাণলাভ করিলে সংস্কার সমূহ দগ্ধ হইয়া যাইবে। শীল ও আচরণ এবং পারমিতা (সদ্‌গুণ) অবলম্বন ধর্ম্ম উৎসাহীকে করিতেই হইবে। ইহাই ধর্ম্মের প্রারম্ভ এবং কুশল কর্ম্মসমূহের তালিকা এতই বৃহৎ যে তাহার সামান্য-ভাবে উল্লেখেরও এস্থলে সংকুলান হইবে না। যাঁহাদের শীল ও পারমিতা অবলম্বনে জীবন গঠিত হইয়াছে তাঁহাদের আরও উচ্চতর জীবন আছে এবং সে জীবন কেবলমাত্র ধ্যানলভ্য। বৌদ্ধনীতিব্যূহ এতই বৃহৎ এবং বৌদ্ধ সাহিত্যের এত অধিক স্থান অধিকার করিয়া আছে যে ভূমিকা ভাবে বলিলেও অল্পস্থানে শেষ করা যায় না। তবে নীতি তত্ত্ব, বুদ্ধ, কোনও স্থলে বৈজ্ঞানিক প্রণালী বা হেতুতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই। নীতি-বুদ্ধি যুক্তি অথবা হিতাহিত- বুদ্ধি, শ্রেয়-প্রেয়জ্ঞান প্রভৃতি নীতিমূল অথবা নীতি-চর্য্যা, মানুষ প্রকৃতিকে ও প্রবৃত্তিকে দলন করিয়া কি করিয়া সাধন করে তাহার বিচার আলোচনা বড় দেখা যায় না। তাঁহার উপদেশই ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মই মানুষকে দুঃখ হইতে মুক্তি দেয় ইহাই তাঁহার বাণী। কাজেই উহা বিধি নিষেধের উপদেশ মাত্র, ইহা করিওনা এবং ইহা কর। ইহার হেতু জানিবার আবশ্যক নাই, ইহা ধ্যান দ্বারা তত্ত্ব দর্শনে জানা যায়। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ই ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধদর্শন। বুদ্ধের প্রকৃত দার্শনিক মত বুঝিবার বিশেষ উপায় নাই। ক্লেশ ও দুঃখ আছে তাহা বৌদ্ধ ও হিন্দুর স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়। হিন্দু দর্শনেও দুঃখই মানব জীবনের বিশেষ ব্যাপার এবং উহার মোচনই মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য। তাহার পর মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি এবং তাহার অস্তিত্বই বা কিসের জন্য ? মানুষ দ্বাদশ অঙ্গের বশীভূত, অবিদ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া এই দ্বাদশ ব্যাপার মানুষকে চক্রের ন্যায় ঘুরাইতেছে। অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান ইত্যাদি। অবিদ্যাই দুঃখের কারণ, কাজেই অবিদ্যা ও দুঃখ নিবৃত্তিই মানুষের চরম লক্ষ্য। কিন্তু অবিদ্যাও জগতের মূল কারণ নহে ; জগতের আদি ও পূর্ণ কারণ শূন্য। এই শূন্য, অবস্তু বা অসৎবস্তু নহে এবং এই শূন্যের আপরনাম প্রতীত্য-সমুৎপাদ। (১) অতএব মানবজ্ঞানে দুইটি ব্যাপার ধরিয়া লইতে হইবে। প্রথমতঃ এই ইন্দ্রিয়গম্যরূপ লোক এবং তাহা লৌকিক প্রত্যয়ের বিষয় এবং দ্বিতীয়তঃ অলৌকিক পরমার্থ-তত্ত্ব তাহা কেবল প্রজ্ঞা বা সম্প্রজ্ঞান গ্রাহ্য। অতএব সত্যেরও দুইটি পর্য্যায় এবং তাহারা লৌকিক ও অলৌকিক। লৌকিক সত্য মাধ্যমিক সূত্রের ভাষায় সংবৃত্তি সত্য এবং বৈদান্তিক মতে উহা ব্যবহারিক সত্য, এবং অলৌকিক সত্য—পরমার্থিক সত্য। সাধারণ-লোকের পক্ষে যাহা সত্য তাহাই সংবৃত্তি—এবং যাহা মণীষীগণের জ্ঞানে উদ্ভাসিত হয় উহাই পরমার্থ সত্য। ইন্দ্রিয়লব্ধজ্ঞান কেবল মাত্র দৃশ্য জগতের হইয়া থাকে, ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান কেবল সৎবস্তুরই হয় অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি বিনাশ নাই এইরূপ বস্তুরই হইয়া থাকে।

(১) যঃ প্রতীত্যসমুৎপাদঃ শূন্যতাং তাং প্রচক্ষতে। মাধ্যমিক সূত্র ২৪শ প্রকরণ

বৌদ্ধ মণীষী নাগার্জ্জুনই শূন্যবাদ রচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার সময় হইতেই বৌদ্ধ দর্শনের আরম্ভ ধরিতে পারা যায়। শূন্যবাদ হইতে পূর্ণভাবে কোনও দার্শনিক মত পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ বিশ্বাস সমূহ যে ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছে উহা তাহারই খণ্ডন মাত্র। শূন্য বা প্রতীত্য-সমুৎপাদ ছাড়া জগতে আর কিছুই নিত্য নাই; জড়, মন, দুঃখ ও এমন কি নির্ব্বাণও নিত্য নহে। শূন্য ভাবও নহে অভাবও নহে, সৎও নহে অসৎও নহে। উপনিষৎ যুগেও অসৎবাদীর পরিচয় পাওয়া যায়, সুতরাং শূন্যবাদও বৌদ্ধযুগের নূতন সামগ্রী নহে। শূন্য বস্তুটি কি তাহা বুঝা সুকঠিন। ইহাকে বৈদান্তিকের ব্রহ্ম বা হেগেলের "আবসলিউটের" সঙ্গে তুলনা করা যায়। ইহাকে জগতের মূল কারণও বলা যাইতে পারে এবং প্রতীত জগৎ উহা হইতেই উৎপন্ন তাহাও ধরা যাইতে পারে। জীবন চক্রের মধ্যে বীজ হইতে যেমন বৃক্ষের উৎপত্তি এবং বৃক্ষ হইতে পুনরায় বীজ অর্থাৎ উহা ধারাবাহিক ভাবে উৎপাদ ও নিরোধ। ইহাই শূন্যেরও অভিযান অথবা ইহাই বিশ্বকারণ এবং ইহার আনুসঙ্গিক হেতু, আলম্বন প্রভৃতি পঞ্চপ্রত্যয়। বীজ হইতে বৃক্ষ হইলে উহাতে কতকগুলি উপাধির আবশ্যক এবং উহার একটির অভাবে বৃক্ষের উৎপত্তি কার্য্যের ব্যাঘাত হইতে পারে। জীব বা উদ্ভিদ শরীরের উৎপত্তি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে বর্ত্তমান ভাব বা অবস্থা পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবের অভাবই জ্ঞাপন করিয়া থাকে। বীজ অথবা অণ্ড হইতে উদ্ভিদ ও জীবের অভিব্যক্তি ধারাবাহিকরূপে ভাব ও অভাবের বিনিময় ও আবর্ত্তন। প্রকৃতির এই মূর্ত্তি প্রাচীনেরাও দেখিয়াছিলেন। এবং অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে না দেখিলে এই রহস্য বুঝা যায় না। বিশ্ব অভিযান শূন্যবাদীর মতে মায়োপম, স্বপ্নোপম ও নাট্যশালার দৃশ্যের মত।

শূন্যবাদ ছাড়া আরও দুইটি প্রসিদ্ধ দার্শনিক মত আছে এবং উহা সম্ভবতঃ শূন্যবাদের পরে স্বীয় আকার গ্রহণ করিয়াছে। উহা অশ্বঘোষের তথতাবাদ ও রত্নকীর্ত্তির ক্ষণভঙ্গবাদ। জগৎ পরিণামশীল উহা উপনিষৎ যুগেরই কথা এবং বৌদ্ধেরা উহা ছাটিয়া বাছিয়া আরও পরিষ্কার করিয়াছেন। আধুনিক ভাবে বলিতে গেলে এই পরিণাম রাসায়নিক, শারীরিক ও মানসিক এবং কাহারও কাহারও মতে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন রাসায়নিক ক্রিয়া। যখন কোনও ভাবসন্তান ক, খ, গ, রূপে লক্ষিত হয়, তখন খ'এর বর্ত্তমানে "ক" অন্তর্হিত হইয়াছে এবং গ'এর তখনও আবির্ভাব হয় নাই। আবার যখন "গ" অবস্থার আরম্ভ হইয়াছে তখন ক ও খ দুইই নাই, অতএব যখন কোনও রূপের আবির্ভাব হয় তখন তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী রূপ আর নাই বা অভাবে পরিণত হইয়াছে। যাহা দৃশ্যমান্ তাহা একই ভাবে থাকিতে পারে না অতএব উহা ক্রিয়া-সন্তানের ফল এবং উহার পরও আবার রূপান্তর হয় অতএব সমস্তই ক্ষণিক। পরিবর্ত্তন অর্থে পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহারই অন্য ভাব হওয়া, কাজেই ইহা একটা ধারা বা ক্রমভাব এবং ক্রম বা ধারা কালসাপেক্ষ। এক একটা ক্রম কালসাপেক্ষ বলিয়া ক্ষণ অধিকার করিয়া থাকে, কাজেই উহা ক্ষণিক। কিন্তু যদি সমস্তই ক্ষণিক হয় তাহা হইলে আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান সত্য হইতে পারে না। এখন যাহা দেখিলাম পরে যদি উহা না থাকে তাহা হইলে জ্ঞানের সম্ভব কি করিয়া হয়। বস্তু

যদি স্থায়ী না হয় তাহা হইলে তাহার জ্ঞান কি করিয়া স্থায়ী হইবে। ক্ষণিকবাদ মতে অর্থক্রিয়াকারিত্ব সাহায্যে আমাদের জ্ঞান হইয়া থাকে। অর্থ ক্রিয়া-কারিত্ব শব্দে বস্তুর কার্য্য জনন শক্তি বুঝায়। এইটুকু আমাদের জানা আছে বলিয়া আমাদের জ্ঞান সম্ভব। জ্ঞান মাত্রেই আপেক্ষিক, উহা অপোহস্বভাব অর্থাৎ যে বস্তুর আমাদের জ্ঞান হয় উহা ভিন্ন অপর সকল বিষয়ের জ্ঞান আমাদের সঙ্গে সঙ্গে হইয়া থাকে। যখন আমরা গো-প্রত্যক্ষ করি তখন গরুর জ্ঞানটা আগে হয় না প্রথমে যাহা "অগো" বা যাহাতে গো ধর্ম্মতা নাই তাহারই জ্ঞান হইয়া থাকে। ইহাই অপোহ-জ্ঞান।

শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ উভয়ই দর্শনের নূতন দিক খুলিয়া দিয়াছে। বিচার ও যুক্তি সাপেক্ষ জ্ঞানে ইহার স্থান অতিউচ্চ এবং বৌদ্ধমতের আগমনে দেশে যে গভীর আন্দোলন হইয়াছিল ইহা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শূন্যবাদ ও ক্ষণিকবাদ ভারতীয় জ্ঞানের এক অভিনব সৃষ্টি এবং জগতের দার্শনিক সাহিত্যে ইহা সমুজ্জ্বল রত্ন।

যাহা হউক বৌদ্ধ মত আমরা যে ভাবেই দেখি উহা উপনিষদেরই দ্বারা এবং উপনিষদের মেরুদণ্ড লইয়াই এক নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। বোধ হয় সেইজন্যই বুদ্ধ অবতারবর্গের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। যে বিষয়ই বলি বৌদ্ধ মত ও জ্ঞান প্রাচীন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া সমুদ্ভূত হইয়াছে। ইহার ধ্যান, নীতি, দর্শন, আচার অধিকাংশই উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত। উহা উপনিষদের বর্ণে অনুরঞ্জিত এবং উপনিষদের সুরে বৌদ্ধমন্ত্র বাঁধা। যুগে যুগে মানসিক ভাবের ও জ্ঞান-কেন্দ্রের পরিবর্ত্তন হয়। বুদ্ধ যে যুগে জন্মাইয়াছিলেন তখন ভারত এক অভিনব জ্ঞান-জ্যোতির প্রভাবে অভিভূত হইয়াছিল। যাহাকে আমরা বৌদ্ধ-মন্ত্র, বৌদ্ধ দীক্ষা বা বৌদ্ধজ্ঞান বলি তাহা অপরাপর ব্যাপারের সহিত ঐ জ্ঞান জ্যোতি দ্বারা উদ্দিপীত হইয়াছিল।

শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য

সাম্প্রদায়িক বিরোধ এবং জাতিগঠনের ও স্বরাজলাভের অন্তরায়।

বড় বড় রাজনৈতিক পণ্ডিতগণের মধ্যে আজকাল অনেকেই বলিয়া থাকেন যে আমাদের স্বরাজলাভের ও জাতীয়তার প্রধান অন্তরায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ; এই বিরোধ হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ বা শ্রেষ্ঠ ও অন্ত্যজবর্ণের মধ্যে বিশেষ ও গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ চোখ রাঙাইয়া বলিতেছেন তোমাদের এই বিরোধের মীমাংসা না হইলে তোমরা স্বরাজলাভ করিতে পারিবে না; এই অবস্থায় তোমাদের "স্বরাজ" অরাজে পরিণত হইবে। দেশের নেতৃবর্গ এই বিরোধ মীমাংসার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া নানাবিধ মিলন বৈঠকের আয়োজন করিয়া কি করিলে হিন্দু মুসলমানে প্রীতি

সংস্থাপিত হইতে পারে তাহার বিধান নির্দ্ধারণে যত্নপর হইয়াছেন। জাতীয় মহাসভা প্রাদেশিক সমিতি ও জেলাসমিতি সমূহ হিন্দুমুসলমান প্রীতি ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রস্তাব পেশ করিতেছে। কোন কোন রাজনৈতিক দল আবার হিন্দুমুসলমানে প্রীতিসংস্থাপনের জন্য চুক্তিপত্রে উভয় সম্প্রদায়কে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এত চেষ্টা এত যত্ন সত্ত্বেও হিন্দুমুসলমানে মিলন সংস্থাপনে বা অনাচরণীয় জাতির উন্নয়নে আমরা এখনও প্রকৃতভাবে কিছুই অগ্রসর হইতে পারি নাই, ইহার কারণ অনুসন্ধান বা এই রোগের প্রকৃতি নির্ণয় করা বিশেষ আবশ্যক। সুতরাং এই চেষ্টা ব্যর্থ পরিশ্রম হইবে না মনে করিয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি।

প্রথমতঃ আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত এই রোগের ভিত্তি কোথায়; ইহা সত্যকার রোগ না মনের বিকার বা মিথ্যার ভান; ইহা জাতীয় শরীরের হঠাৎ বিকৃতিজনিত উপদ্রব না বাহ্যিক আবহাওয়ার দোষে স্থানিক ক্ষণস্থায়ী অস্বোয়াস্তি। ইহার বীজ ভিতরের না বাহির হইতে প্রক্ষিপ্ত। সর্ব্বোপরি দেখিতে হইবে ইহা কি বাস্তবিকই জাতিগঠনের বা স্বরাজলাভের অন্তরায়। আমি জানি মিলনপ্রয়াসী অনেকের ধারণা যে যতদিন হিন্দুমুসলমানের মধ্যে আহার বিহার বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক বন্ধন স্থাপিত না হইবে ও যতদিন শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট বর্ণের মধ্যে সামাজিক বন্ধনের সর্ব্ববিধ বাধাবিপত্তি ঘুচিয়া না যাইবে ততদিন স্বরাজ স্থাপনের চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবে না। এইরূপ ধারণার কোন মূল্য আছে কিনা আমরা পরে আলোচনা করিব। যাবতীয় বিরোধের, সে ব্যক্তিগত হউক কিম্বা সাম্প্রদায়িক হউক, মূল ভিত্তি স্বার্থের সংঘাত। এই বিষয়ে মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ হয়ত আমার বাক্যের সমর্থন করিবেন। হিন্দুমুসলমানে কিম্বা ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণে যাহা কিছু বিরোধ ইহাদেরও মূলে স্বার্থের সংঘাত। তবে এই স্বার্থ যদি সাম্প্রদায়িক সমষ্টিগত স্বার্থ হয় অর্থাৎ সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি এই স্বার্থের হানি বা উৎকর্ষের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত বা লাভবান হয় তবেই এই স্বার্থের সংঘাত জনিত যে বিরোধ তাহা সত্যকার বিরোধ। এই সত্যকার বিরোধ যে জাতিগঠনের বা স্বরাজলাভের প্রধান অন্তরায় এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। মনে করুন হিন্দু সম্প্রদায় কিম্বা হিন্দুবহুল মন্ত্রিসভা যদি দেশের শাসনদণ্ড লাভ করিয়া এমন আইন কানুন প্রচলন করেন যে তাহাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্যক্তিমাত্রেরই কিম্বা অধিকাংশেরই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় এবং অন্যদিকে হিন্দুসম্প্রদায়ের অধিকাংশই লাভবান বা ক্ষতিহীন হন তাহা হইলে যে সাম্প্রদায়িক বিরোধের সৃষ্টি হইবে তাহা সত্যকার বিরোধ—তাহাতে স্বরাজ "টিকিতে" পারিবে না। অবশ্যই লাভ বা ক্ষতির মূল্য আর্থিক হিসাবেই ধরিতে হইবে। এবং স্বার্থ বলিতেও আমি আর্থিক স্বার্থকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি। এই সত্যকার বিরোধ স্বরাজের প্রধান অন্তরায় এবং স্বরাজলাভ হইলেও স্বরাজকে অরাজে পরিণত করিবে। এইরূপ অন্যদিকে যদি মুসলমান বহুল মন্ত্রিসভা দেশের শাসনদণ্ড লাভ করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্যক্তিমাত্রেরই বা অধিকাংশের লাভজনক আইন কানুন প্রচলন করেন যাহাতে হিন্দুসমাজের অধিকাংশেরই কোন লাভ হয় না কিম্বা অধিকন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় তাহা হইলে আবার সেই সত্যকার

সাম্প্রদায়িক বিরোধ উপস্থিত হইয়া অরাজকতার সৃষ্টি করিবে। এই অবস্থা যেমন হিন্দুমুসলমানের পক্ষে সেইরূপ ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট বর্ণের পক্ষেও ঘটিতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে যদি দেশের বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষ বলেন যে তোমাদের এইরূপ সত্যকার সাম্প্রদায়িক বিরোধ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে, সুতরাং তোমরা এখনও স্বরাজলাভের উপযুক্ত নও,—তাহা হইলে তাঁহারা কিছু অন্যায় বলিবেন না। এইরূপ অবস্থার সম্ভাবনা থাকিলে দেশের শাসন ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের হাতেই সুচারুরূপে পরিচালিত হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় এইরূপ অবস্থা ঘটিবার কোন সত্যকার সম্ভাবনা আছে কিনা? এতদ্ব্যতীত সামাজিক আচার অনুষ্ঠান বা ধর্ম্মানুষ্ঠান লইয়া স্থানে স্থানে যে বিরোধ ঘটিতেছে তাহাকে সত্যকার বিরোধ মনে করা ভুল। এবং সেই সমস্ত বিরোধ যাহা অর্থগত নহে, যাহা শুধু মানসিক প্রবৃত্তি সম্ভূত, তাহা কখনো "স্বরাজলাভের" বা "স্বদেশ শাসনের" অন্তরায় হইতে পারে না। যে সমস্ত অর্থগত বিরোধও বিরোধীয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশকে আঘাত করে না তাহাও স্বরাজলাভের বাধা ঘটাইবে না। হিন্দুবহুল মন্ত্রীসভা যদি বাস্তবিকই মুসলমান বা অন্ত্যজ জাতির উপর অত্যাচার করে, কিম্বা মুসলমান বহুল মন্ত্রীসভা যদি শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার করে তাহা হইলে "স্বরাজ" প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। আর যদি হিন্দুবহুল মন্ত্রীসভা জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দেশের উপকারে ব্রতী হয় তবে কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই তাঁহাদের শাসন সসম্মানে মানিয়া লইবে। সেইরূপ মুসলমানবহুল মন্ত্রিসভা জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দেশের কল্যাণে রত হইলে হিন্দুমুসলমান সকল সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে। অত্যাচারী হিন্দু মন্ত্রিকে হিন্দুরাও সমর্থন করিবে না এবং অত্যাচারী মুসলমান মন্ত্রীকে মুসলমানেরাও সমর্থন করিবে না।

এখন আলোচনার বিষয় হিন্দুবহুল মন্ত্রীসভার মুসলমানের উপর এবং মুসলমান বহুল মন্ত্রীসভার হিন্দুর উপর অত্যাচার বা অবিচারের সম্ভাবনা আছে কি না। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কেহও আছেন কিনা যিনি মনে করেন যে উপযুক্ত হিন্দুবহুল মন্ত্রীসভা মুসলমান বা নিকৃষ্ট বর্ণের উপর অধিকতর কর ধার্য্য করিবেন, অথবা হিন্দুবহুল মন্ত্রীসভা হিন্দুসম্প্রদায়ের উন্নতির জন্যই শুধু ব্যবস্থা করিবেন এবং মুসলমানবহুল মন্ত্রীসভা শুধু মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতি ও শিক্ষার ব্যবস্থাতেই অর্থব্যয় করিবেন, উপযুক্ত ও শিক্ষিত হিন্দুমুসলমানের বিরুদ্ধে এইরূপ নিকৃষ্ট ধারণা কেহই পোষণ করেন না। কথাটী আরো একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক মনে করি, দেশের মধ্যে শতকরা ৯০ জনেরও অধিক লোক কি হিন্দু কি মুসলমান কৃষিজীবি, ভূমিকর্ষণ করিয়া ও জমিতে উৎপন্নদ্রব্য বিক্রী করিয়া তাহারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের লইয়াই দেশ, জাতি ও সম্প্রদায়, ইহাদের জীবন যাত্রায় কি হিন্দু বহুল কি মুসলমানবহুল কোন মন্ত্রীসভা যে ব্যাঘাত জন্মাইবে ইহা কেহই সন্দেহ করেন না। আমাদের যাহা কিছু স্বার্থের বিরোধ সে শুধু শতকরা ৮।১০ জন স্বার্থান্বেষী সম্মান ও মর্য্যাদালোভী চাকরীজীবিদের মধ্যে এই মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোকের ব্যক্তিগত স্বার্থের বিরোধকে সাম্প্রদায়িক সত্যকার বিরোধ বলিয়া বাড়াইয়া তোলা আর সত্যের অপলাপ করা দুইই সমান, ইহাতে ঐ স্বার্থান্বেষী কয়েকটি লোকেরই সুবিধা হয় মাত্র। কর্ত্তৃপক্ষও যে এইরূপ স্বার্থান্বেষীর পরামর্শে ভুলিয়া অনেক সময়

আমাদের বলিয়া থাকেন যে তোমরা এখনও "স্বরাজলাভের" উপযুক্ত হও নাই ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে ; এবং অনেকে আরো বিশ্বাস করেন যে কর্ত্তৃপক্ষও নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইহাদের সমর্থন করিতে দ্বিধা করেন না।

সুতরাং মোটের উপর আমরা এখন দেখিতে পাই যে আমাদের মধ্যে জাতীয়তা ও স্বরাজ লাভের অন্তরায় স্বরূপ কোনরূপ সত্যকার সাম্প্রদায়িক বিরোধ নাই। আমাদের যাহা কিছু বিরোধ সে সাধারণ সামাজিক আচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠান লইয়া, জগতে কোন জাতিই এই প্রকার সাধারণ বিরোধ হইতে মুক্ত নহে। যে জাতির মধ্যে সামাজিক আচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের কোন বিশেষ তারতম্য নাই সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামত লইয়া বিশেষ বিরোধ ও অনৈক্য রহিয়াছে, এই রাজনৈতিক দলের মতবিরোধ অনেক সময় আমাদের সামাজিক আচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিরোধ হইতেও গুরুতর আকার ধারণ করে। ইহা ছাড়া ধনী ও শ্রমজীবির বিরোধও অনেক দেশে প্রবলভাব ধারণ করিয়াছে। তাই বলিয়া কি কেহ বলিবেন যে ঐ সব জাতি "স্বরাজ" সম্ভোগের অনুপযুক্ত। তাঁহারা শত শত বৎসর নির্ব্বিবাদে দেশ শাসন করিতেছেন—এবং তাহাদের দেশকে অসভ্য বা অরাজক বলিতে কেহই সাহস করিবেন না। আবার অন্যপক্ষে দেশে কোন সামাজিক আচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিরোধ না থাকিলেই যে দেশে শান্তি স্থাপিত হইবে এই সম্বন্ধেও ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করিবে না। রুসিয়া, চীনবা আয়র্ল্যণ্ডে কোন বিশেষ সামাজিক আচার বা ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিরোধ নাই, কিন্তু রুশিয়া, চীন বা আয়র্লণ্ডবাসীরা এখনও তাহাদের দেশে শান্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হন নাই। আমার বলিবার বিষয় এই যে রাজনৈতিক বিরোধ এবং প্রকৃত স্বার্থের সংঘাতেই রাজ্যশাসনের অন্তরায়, সামাজিক আচার বা ধর্ম্মানুষ্ঠান অন্তরায় নহে। তবে স্বার্থান্বেষীরা এই সামাজিক আচার বা ধর্ম্মানুষ্ঠানকে রাজনৈতিক বিরোধে পরিণত করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট আছেন।

অবশ্য সভ্যতার এমন এক স্তর গিয়াছে যখন ব্যবহারিক ধর্ম্মের জন্য রাজ্যবিস্তার ও অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছে, ইউরোপের ইতিহাসে ইহার অনেক বিবরণ আমরা পাই। মুসলমান ধর্ম্মের ইতিহাসও ইহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ধর্ম্মবিস্তারের উদ্দেশ্যেই মুসলমান শাহ ও সম্রাটগণ রাজ্যবিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ইউরোপ আর এমন ব্যবহারিক বা আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মকে বড় উচ্চস্থান প্রদান করে না, ইউরোপ এখন ধর্ম্মযাজকের অনুশাসন হইতে মানবের স্বাধীন বুদ্ধি, বিবেচনা ও বিচারকে অধিকতর সম্মান করিতে শিখিয়াছে, তাই আজ ইউরোপের সর্ব্বত্রই প্রজা বা গণতন্ত্রের দ্বারা শাসনযন্ত্র নিয়মিত হইতেছে। গণতন্ত্রে সাধারণতঃ ধর্ম্মোন্মত্ততা বা ব্যক্তিবিশেষের দুরাকাঙ্ক্ষার স্থান নাই। তাই ইউরোপের রাজ্যবিস্তার এখন সমষ্টিগত স্বার্থের দ্বারাই প্রণোদিত। মুসলমান অধিকৃত বা শাসিত রাজ্যেও এই ভাবের আমদানী দেখিতে পাই। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আজ নবীন তুরস্ক এই নব ভাবকে বরণ করিয়া লইয়াছে। ধর্ম্মের সহিত রাষ্ট্রের প্রাচীন বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া তুরস্ক আজ নিজদেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তুরস্কের ত্রাণকর্ত্তা কামালপাশা এই মন্ত্রের প্রধান পুরোহিত। মিশর নামে রাজতন্ত্র হইলেও গণতন্ত্রের অনুকরণে রাজ্য শাসন করিতেছে।

অর্থাৎ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আজ জনমতের প্রাধান্য, এই জন বা প্রজাতন্ত্র স্বভাবতঃই কখনও অত্যাচারী বা অবিচারী হইতে পারে না। স্বার্থান্বেষী লোকের চক্রান্ত ভিন্ন এই জনতন্ত্রে কখনও ধর্ম্মোন্মত্ততা জাগিয়া উঠিতে পারে না, আমাদের ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষেও এই কথা খাটে। ভারতবর্ষে "স্বরাজ" প্রতিষ্ঠা হইলে তাহা মুসলমান কি হিন্দু স্বরাজ হইবে সেই জন্য কেহই চিন্তিত নন, কারণ সকলেই বুঝিতে পারেন ভারতবর্ষে শুধু একমাত্র প্রজা বা গণ-তন্ত্রের দ্বারা নিয়মিত "স্বরাজ" প্রতিষ্ঠারই সম্ভব হইতে পারে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত জনসমূহ বন্ধনসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষে যে যুক্তস্বরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিবে তাহাই একমাত্র স্থায়ী শাসনযন্ত্ররূপে পরিগণিত হইতে পারে অন্যবিধ চেষ্টা কখন ও ফলবতী হইতে পারে না। সুতরাং মুসলমান সম্প্রদায় বা খৃষ্টীয় সম্প্রদায় হইতে ধর্ম্মের জন্য যে রাষ্ট্রীয়শাসনের বিঘ্ন-প্রদ কোনপ্রকার বিরোধ সৃষ্ট হইতে পারে ইহার কোন আশঙ্কা নাই, হিন্দু ধর্ম্ম তাহার নানা-বিধ কুসংস্কার সংকীর্ণতা সত্বেও নিজের রাজ্য বিস্তার করিতে বা পরধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে চিরকালই নারাজ। হিন্দুধর্ম্মের অনুশাসন এইরূপ ব্যবস্থার ঘোর প্রতিকূল, সুতরাং হিন্দু সম্প্রদায় হইতেও ধর্ম্মানুষ্ঠানজনিত রাষ্ট্রীয় শাসনের বিঘ্ন ঘটিবার কোন কারণ নাই। বর্ত্তমানে যে সামাজিক আচার বা ধর্ম্মানুষ্ঠান লইয়া যে সমস্ত অপ্রীতিকর সংঘটন ঘটিতেছে ইহার মূলে স্বার্থান্বেষীর চক্রান্ত থাকিতে পারে ; না থাকিলেও এই সমস্ত সংঘর্ষকে "স্বরাজ" লাভের অন্তরায় স্বরূপ মনে করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই।

এই সমস্ত সাধারণ সমাজিক আচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠানজনিত বিরোধের যাহাতে প্রতীকার হইতে পারে তাহার জন্য দেশের নেতৃবর্গ চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন, এই সম্বন্ধে দেশের শীর্ষ-স্থানীয় হিন্দুমুসলমান নেতাগণ অনেক উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহার অধিক কিছু যে আমি বলিতে পারিব এমন ধৃষ্টতা আমার নাই। তবে গ্রামস্থ হিন্দুমুসলমানের নিকটসংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করি।

গ্রামবাসী হিন্দুমুসলমানেরা অধিকাংশই কৃষিজীবি বা শ্রমজীবি, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া বিবাদ বিসংবাদ বড়ই কম, তাহাদের বিবাদ বিসংবাদ সাধারণতঃ প্রাত্যাহিক জীবনের খুটিনাটি লইয়াই ঘটিয়া থাকে, যাহারা তাহাদের সাহায্য ও উপকার করে হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে তাহারা তাঁহাদিগকেই শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া চলে, এবং ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে গ্রামবাসী মুসলমানগণ শিক্ষিত হিন্দুভদ্রলোকের নিকট হইতেই তাহাদের অভাব অভি-যোগের অধিকতর প্রতীকারলাভ করিয়া থাকে, একবার গ্রীষ্মের অবকাশে যখন গ্রামে ছিলাম তখন দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে একটি মুসলমান মৎস্যব্যবসায়ী আমাদের গ্রামে আসিয়া হঠাৎ কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়, সে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া শয্যাগ্রহণ করে ; পাড়ার সমস্ত মুসলমানকে খবর দিয়াও তাহাদের কোনও সাহায্য পাই নাই। আমাদের মধ্যে কয়েকজন উৎসাহী হিন্দুযুবক ও ভদ্রলোকে মিলিয়া তাহার সেবাশুশ্রূষাও ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করি। দুর্ভাগ্য-বশতঃ রাত্রিতে তাহার মৃত্যু ঘটে। পরিশেষে তাহার কবরের ব্যবস্থার জন্য হিন্দুদের উদ্যোগী হইতে হয়, অবশ্য পরিশেষে এক মুসলমান জমিদারের সাহায্যে এই কাজ নিষ্পন্ন হয়

অবশ্য সকলেই স্বীকার করিবেন হিন্দুরা বেশী শিক্ষিত বলিয়াই দেশের ও দশের কল্যাণ ক্রমে সকলের অগ্রগামী হয়, এবং মুসলমানদের মধ্যে ও শিক্ষার বিস্তার ঘটিলে তাহারাও যে স্বদেশে ও সাধারণের সেবা ব্রতী হইবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, আমাদেরও বক্তব্য তাই, শিক্ষার সঙ্গে সন্দেহ আমাদের সঙ্কীর্ণতা ক্রমশঃ ঘুচিয়া যাইবে এবং কি হিন্দু কি মুসলমান আমরা সকলেই এখন দেশের ও সাধারণের স্বার্থের জন্য নিজ নিজ ক্ষুদ্র সার্থের ও সংস্কারের বলি দিতে সঙ্কুচিত হইব না।

পল্লী গ্রামে এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে হিন্দুর ধর্ম্মোৎসবে সামাজিক অনুষ্ঠানে যেমন শারদীয় পূজা চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও বিবাহোৎসব ইত্যাদিতে মুসলমানগণ আনন্দের সহিত যোগদান করিতেছে এবং মুসলমানগণের ধর্ম্মোৎসবে যেমন মহরম ইত্যাদিতে হিন্দুগণও যোগদান এবং সাহায্য প্রদান করিতেছে, শুধু বড় বড় সহরে যেখানে তথাকথিত শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানগণ নিজ নিজ স্বার্থ সাধনে ব্যস্ত যেখানেই এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছে, স্বীয় স্বার্থসাধনপ্রয়াসী ব্যক্তিগণ নিজের ক্ষুদ্রতাকে গৌরবের আবরণ দিবার জন্যই তাহাদের ক্ষুদ্র স্বার্থকে খাঁটী সাম্প্রদায়িক স্বার্থরূপে প্রচার করিতে চেষ্টা করেন, ইহার একমাত্র প্রতীকার মুসলমান ও হিন্দু গ্রামবাসীগণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার অবাধ বিস্তার। যখন হিন্দু ও মুসলমান কৃষি ও শ্রমজীবিগণ নিজের মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে পারিবে তখন আর তাহারা স্বার্থান্বেষী তথাকথিত হিতার্থী বন্ধুগণের বাক্যে বিপথগামী হইয়া পরস্পরের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধের সৃষ্টি করিবে না। উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের যে বিরোধ তাহার ও একমাত্র প্রতিকার শিক্ষার বিস্তারের দ্বারাই সম্ভব, উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ নিম্নবর্ণের সাহায্য ব্যতীত অনেকস্থলে তাহাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে অক্ষম। আজ যদি নিম্নবর্ণের হিন্দুগণ মিলিত হইয়া উচ্চবর্ণের সহিত সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা বর্জ্জন করেন তাহা হইলে অনেক স্থানে উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ টিকিয়া থাকিতে পারেন না, উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ যদি নিম্নবর্ণকে আপনাদের সমাজে স্থান না দেন, তবে নিম্নবর্ণেরাও একদিন তাঁহাদের সহিত সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিবেন, তখন উচ্চবর্ণকে বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে সমাজে গ্রহণ করিতে হইবে। অবাধ প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা যখন নিম্নবর্ণের মধ্যে বিস্তার লাভ করিবে, তখনই এই বিরোধ শান্তির সূচনা হইবে।

এই শিক্ষা শুধু পুরুষের শিক্ষা হইলে চলিবে না, মেয়েদের শিক্ষারই বিশেষ প্রয়োজন। হিন্দুগণের যাহা কিছু কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা তাহা তাহাদের অন্দর মহলের চতুঃসীমার মধ্যেই জন্ম। বৃদ্ধিলাভ করিয়া পরে সমস্ত সমাজে ছড়াইয়া পড়ে, এই কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত করিতে হইলে মাতৃজাতির শিক্ষার দিকেই আমাদের প্রধান লক্ষ্য রাখিতে হইবে মাতৃস্তন্যের সহিতই শিশুগণ এই কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা পান করিয়া বৃদ্ধিলাভ করে। বর্ত্তমানে বালিকাগণের শিক্ষার ব্যবস্থাই সমাজের ও দেশের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতে হইবে, আমাদের নানাবিধ সামাজিক পারিবারিক এমন কি শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির মূল কারণ আমাদের মাতৃজাতির সুশিক্ষার অভাব।

মোটের উপর আমাদের এই ব্যাধির একমাত্র প্রতীকার শিক্ষা।

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

পঞ্চম অধ্যায়।

আমরা ফিউড্যাল্‌তন্ত্রের প্রকৃতি ও প্রভাব পর্য্যালোচনা করিয়াছি। এখন পঞ্চম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় চর্চের ইতিহাস আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। মনে রাখিবেন আমরা খৃষ্টীয় চর্চের আলোচনা করিব, খৃষ্টধর্ম্মের নহে। খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মপদ্ধতি ও ধর্ম্মমতের কথা আমি বলিতে আসি নাই; খৃষ্টিয় যাজকতন্ত্র, খৃষ্টিয় যাজকসম্প্রদায়ের শাসন ব্যবস্থার দিকেই আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

পঞ্চমশতাব্দীতে এই যাজক সমাজের গঠন ও ব্যবস্থিতি প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; অবশ্য তাহার পর ইহার মধ্যে অনেক বড় বড় পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এটা বলা যায় যে সংঘ হিসাবে, খ্রীষ্টপন্থীসমাজের ধর্ম্মশাসন ব্যবস্থা হিসাবে চর্চ তখনই একটা সম্পূর্ণ ও স্বাধীন অস্তিত্ব লাভ করিয়াছিল।

পঞ্চম শতাব্দীতে চর্চের অবস্থা এবং ইউরোপীয় সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গের অবস্থায় যে কি প্রভেদ ছিল তাহা দৃষ্টিপাতমাত্রেই বুঝিতে পারা যায়। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ইউরোপীয় সভ্যতার চারিটি মৌলিক উপাদান—পৌরতন্ত্র, ফিউড্যালতন্ত্র, রাজতন্ত্র ও যাজক-তন্ত্র। পঞ্চম শতাব্দীতে পৌরতন্ত্র রোমসাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষমাত্র, একটা অস্পষ্ট নির্জীব ছায়ামাত্র। চারিদিকের বিশৃঙ্খলার মধ্য হইতে ফিউড্যালিজম্ তখনও মাথা তুলিয়া উঠে নাই। রাজতন্ত্র তখন নামে মাত্র আছে। আধুনিক সমাজ ও সভ্যতার সমস্ত অঙ্গই তখন, হয় জরাজীর্ণ না হয় শৈশবাবস্থ। সে সময়ে চর্চই কেবল যৌবনবলসম্পন্ন ও সুগঠিত, চর্চ্চের মধ্যেই কেবল গতিবেগ ও শৃঙ্খলা, উদ্যম ও নিয়মের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজের উপর প্রভাব ও প্রাধান্য বিস্তার করিতে হইলে স্বাভাবিক সচলতা ও নিয়মশৃঙ্খলার যে সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক তখন কেবল চর্চের মধ্যেই তাহা ছিল। তাহাছাড়া মানবপ্রকৃতির যে সমস্ত বড় বড় সমস্যা, মানুষের ভাগ্যনিয়তি সম্বন্ধে যত কিছু সম্ভাবনা,—এক কথায় যে সমস্ত বড় বড় প্রশ্নের দিকে মানুষের মন স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয়, চর্চ সে সমস্তগুলিই লোকসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছিল। এইরূপে আধুনিক সভ্যতার উপর চর্চের প্রভাব অত্যন্ত অধিক,—এত অধিক যে তাহা চর্চের শত্রুমিত্র উভয়পক্ষেরই ধারণাতীত।

পঞ্চমতশাব্দীতে খৃষ্টীয় চর্চ একটি স্বাধীন ও সুব্যবস্থিত সমাজরূপে দেখা দেয়। একদিকে রাজশক্তিমণ্ডিত ঐহিক শাসনাধিকারী শাসকবৃন্দ, অপরদিকে সাধারণ জনসমাজ, এই উভয় পক্ষের মধ্যে মধ্যস্বরূপে, যোগসূত্ররূপে, উভয়ত্র প্রভাবশীল শক্তিরূপে চর্চের অবস্থিতি।

অতএব ইহার ক্রিয়া ও প্রভাব সম্পূর্ণরূপে জানিতে বা বুঝিতে হইলে তিন দিক দিয়া ইহার আলোচনা করিতে হইবে। প্রথমে ইহার নিজস্ব স্বরূপটি কি, ইহার আভ্যন্তরীণ গঠন কিরূপ, ইহার মধ্যে কোন্ কোন্ তত্ত্ব বা নীতির প্রাধান্য, ইহার প্রকৃতি কিরূপ, তাহা দেখিয়া

লইতে হইবে। তাহার পর দেখিতে হইবে রাজা, ভূস্বামী প্রভৃতি চারিদিকের ঐহিক শাসনী-শক্তির সহিত ইহার সম্বন্ধ কিরূপ ; এবং সর্ব্বশেষে দেখিতে হইবে সাধারণ জনবর্গের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ। এই ত্রিবিধ বিচারের ফলে যখন আমরা চর্চের নীতি, অবস্থান ও অবশ্যম্ভাবী প্রভাব সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ চিত্র খাড়া করিতে পারিব, তখন ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনার সহিত আমাদের এই আনুমানিক চিত্রটি মিলাইয়া দেখিতে হইবে।

সর্ব্বাগ্রে চর্চের স্বরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

চর্চের অস্তিত্বই একটা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ব্যাপার। ঐরূপ একটা ধর্ম্মশাসনের ব্যবস্থা, একটা সংঘবদ্ধ যাজক সম্প্রদায়, একটা যাজকপ্রধান ধর্ম্ম যে গড়িয়া উঠিতে ও টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছিল, ইহাই একটা বড় কথা।

আধুনিক চিন্তালোকপ্রাপ্ত অনেকে মনে করেন "যাজক সম্প্রদায়", "ধর্ম্মশাসন ব্যবস্থা" এই কথাগুলিদ্বারাই ব্যাপারটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গেল। তাঁহারা মনে করেন যদি কোন ধর্ম্ম কালক্রমে গিয়া একটা যাজকতন্ত্রে বা ঐরূপ কোন একটা শাসনপদ্ধতিতে গিয়া পরিণত হয়, তাহা হইলে মোটের উপর সে ধর্ম্মদ্বারা সমাজের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই সাধিত হয়। তাঁহাদের মতে ধর্ম্ম মানুষের সঙ্গে ভগবানের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ মাত্র ; এবং যখনই এই ব্যক্তিগত সম্বন্ধের ভাবটুকু নষ্ট হইয়া যায়, যখনই ব্যক্তিমানব ও ধর্ম্মবিশ্বাসের আধারস্বরূপ ভগবানের মধ্যে কোন বাহিরের কর্ত্তৃত্বশক্তি আসিয়া পড়ে, তখন ধর্ম্মেরও অবনতি হয়, সমাজও সঙ্কটাপন্ন হয়।

এ প্রশ্নটি ভাল করিয়া বিচার না করিলে আমাদের চলিবে না। খৃষ্টীয় চর্চের প্রভাব কিরূপ হইয়াছে তাহা বুঝিতে হইলে, কোন একটা চর্চ বা যাজকতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম কি হওয়া উচিত তাহা আমাদের জানা আবশ্যক। এই প্রভাবের মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে বুঝিয়া লইতে হইবে ধর্ম্ম কি বাস্তবিক পক্ষেই একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, বাস্তবিক পক্ষেই কি মানুষের সঙ্গে ভগবানের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ মাত্র ব্যতীত ধর্ম্ম হইতে অন্য কোন কিছুর উদ্ভব হয় না,—না ধর্ম্ম হইতে অবশ্যম্ভাবিরূপে মানুষে মানুষে নূতন নূতন সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে, একটা ধর্ম্মসমাজ ও ধর্ম্মব্যবস্থা গড়িয়া উঠে?

যদি ধর্ম্ম বলিতে শুধু ধর্ম্মভাব বুঝি—যে ভাব বাস্তব হইলেও অস্পষ্ট ও অনির্দ্দিষ্ট ; যাহার প্রকৃতি নির্দ্দেশকরা একরূপ অসাধ্য, যাহা কখনও বাহ্য প্রকৃতি, কখনও বা মানবাত্মার নিভৃত অন্তঃপুর, কখনও বা কাব্য, কখনও বা জগতের ভাবী-রহস্য, অবলম্বন করিয়া ফুটিয়া উঠে,এক কথায় যাহা সর্ব্বত্রই আপনার চরিতার্থতা খুঁজিয়া বেড়ায়, কিন্তু কোথাও বাঁধা পড়ে না —ধর্ম্ম বলিতে যদি শুধু এই ভাবটুকু মাত্র, তাহা হইলে অবশ্য ধর্ম্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার কিছু বলিয়া মনে হয় না। এরূপ একটা ভাবের প্রেরণায় মানুষে মানুষে একটা ক্ষণিক সম্মিলন ঘটিতে পারে ; মানুষের প্রতি মানুষের পরস্পর সহানুভূতিতে এই ধর্ম্মভাবের কতকটা তৃপ্তি এবং পুষ্টিও সাধিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার চাঞ্চল্য ও অনিশ্চয়তার দরুণ ইহা কোন স্থায়ী বা যাজক সমাজ বন্ধনের মূলসূত্র হইতে পারে না, ইহা কোন একটা উপদেশ পদ্ধতি বা আচরণ পদ্ধতির সঙ্গে নিজকে খাপ খাওয়াইতে পারে না ; এক কথায়, ইহা একটা ধর্ম্মসমাজ বা ধর্ম্মশাসনতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে পারে না।

কিন্তু আমার যতদূর মনে হয় এই ধর্ম্মভাব মানুষের ধর্ম্মপ্রকৃতির সম্পূর্ণ প্রকাশ নহে। ধর্ম্মভাব হইতে ধর্ম্ম একটি বিভিন্ন ও পূর্ণতর বস্তু। মানবের স্বভাব ও পরিণতির মধ্যে এমন সকল রহস্য আছে, যাহাদের চূড়ান্ত মীমাংসা এ জগতের বাহিরে; যাহা কতকগুলি অতীন্দ্রিয় ব্যাপারের সহিত যোগসূত্রে আবদ্ধ, যাহা মানুষের মনকে একমুহূর্ত্ত বিশ্রাম দিতেছে না, যাহাদিগের মীমাংসা উদ্ধার করিবার জন্য মানুষের মন অনবরত লাগিয়া রহিয়াছে। এই সকল সমস্যার মীমাংসা, এবং যে সকল মতবাদ ও বিশ্বাসের মধ্যে এই মীমাংসাগুলি আবদ্ধ আছে—ইহাই হইল ধর্ম্মের আদিমূল ও আধার।

মানুষ আর এক পথ দিয়াও ধর্ম্মে উপনীত হইতে পারে। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট বোধ হয় স্পষ্ট প্রতীত হইবে চরিত্রনীতি ও ধর্ম্ম পৃথক ও পরস্পর নিরপেক্ষভাবে থাকিতে পারে। নৈতিক সদসদ্বিচার, অসৎ-পন্থা বর্জ্জন করিয়া সৎপন্থা অবলম্বন করিবার পক্ষে যে দায়িত্ব—এ সমস্ত তত্ত্ব ন্যায়শাস্ত্রের তত্ত্বের ন্যায় মানুষ নিজের স্বভাবের মধ্য হইতেই পায়; তাহার প্রকৃতির মধ্যেই ইহার মূল নিহিত তাঁহার জীবনক্ষেত্রেই ইহার প্রয়োগ। কিন্তু চরিত্রনীতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া লইলেও মানুষের মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন উঠে—চরিত্রনীতি আসে কোথা হইতে? কোথায় বা ইহার পরিণতি? এই যে নৈতিক কর্ত্তব্যবোধ ইহা কি একটা স্বতঃসিদ্ধ নিরবলম্ব ব্যাপার, ইহার কি কোন বিধাতা নাই, লক্ষ্য নাই? ইহার পশ্চাতে কি মানুষের একটা সংসারাতীত পরিণতির কথা লুকাইয়া নাই, সেই পরিণতির দিকেই কি ইহা অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেয় না? এ প্রশ্ন আপনা আপনি উঠিতে বাধ্য এবং এই প্রশ্নের দ্বারাই চরিত্রনীতি মানুষকে ধর্ম্মের দ্বারদেশে পৌঁছাইয়া দেয়।

এইরূপে একদিকে মানবপ্রকৃতিগত রহস্যের মধ্যে, অপরদিকে মানুষের নীতিবোধের প্রামাণ্য, উৎপত্তিমূল ও লক্ষ্যসন্ধানের মধ্যে ধর্ম্মের দুইটি সুনির্দ্দিষ্ট মূল পাওয়া গেল। ধর্ম্ম তাহা হইলে প্রথমতঃ, মানুষের প্রকৃতিগত রহস্যসম্ভূত কতকগুলি মতবাদের সমষ্টি; দ্বিতীয়তঃ ঐ সকল মতবাদের অনুযায়ী কতকগুলি উপদেশের সমষ্টি, যাহা মানুষের স্বাভাবিক নীতি-বোধকে তাৎপর্য্য ও প্রামাণ্য দিতেছে; এবং তৃতীয়তঃ মানুষের চরমপরিণতি সম্বন্ধে কতক-গুলি আশ্বাসবাণীর সমষ্টি। এইগুলি লইয়াই প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মের গঠন। ধর্ম্ম কেবল একটা ভাব বা অনুভূতি নহে, কল্পনার খেলা নহে, শুদ্ধমাত্র কাব্য নহে।

এইরূপে ধর্ম্মের প্রকৃত মূল ও উপাদান এবং যথার্থ প্রকৃতি ধরিয়া দেখিলে ধর্ম্ম আর শুদ্ধ ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকে না, ধর্ম্মের মধ্যে একটা প্রবল ও সৃজনশীল সংহতি-শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে কতকগুলি মত ও বিশ্বাসের সমষ্টিরূপে দেখুন:—সেক্ষেত্রে দেখিবেন সত্য কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে; সত্য বিশ্বব্যাপী, স্থানকালপাত্রনির্ব্বিশেষ; মানুষ একাকী নহে, সকলের সহিত মিলিত হইয়াই অলব্ধ সত্যের সন্ধান করিবে, লব্ধ সত্য স্বীকার করিবে। আবার এই সকল মত ও বিশ্বাসের অনুযায়ী উপদেশের সমষ্টি হিসাবে ধর্ম্মকে দেখুন; সে ক্ষেত্রে দেখিবেন একজনের পক্ষে যাহা অবশ্য পালনীয় বিধি, সকলের পক্ষেও তাহাই; এ বিধি-উপদেশ প্রচার করা আবশ্যক, সমস্ত মানুষকে এই বিধির অধীন করিয়া

আনা আবশ্যক। মানুষের ভবিষ্যৎসম্বন্ধে ধর্ম্মের যে আশ্বাসবাণী, সে ক্ষেত্রেও ঐ রূপ। এ সকল বাণী চারিদিকে প্রচার করা আবশ্যক, সমস্ত মানুষকেই এই আশ্বাসবাণীর ফল আহরণ করিবার জন্য আহ্বান করা আবশ্যক। অতএব ধর্ম্মের মূলপ্রকৃতি হইতেই ধর্ম্মসমাজের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। তত্ত্বপ্রচার ও সমাজবিস্তারের ইচ্ছা প্রকাশ করিবার জন্য 'প্রোজলিটিজ্‌ম্' বলিয়া যে কথাটি ব্যবহার করা হয়, ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষ্যেই তাহার সৃষ্টি এবং ধর্ম্মপ্রচার ক্ষেত্রেই তাহার যথার্থ প্রয়োগ।

ধর্ম্ম হইতে যখন একটা ধর্ম্মসমাজ জন্মলাভ করে, কতকগুলি লোক যখন কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্মবিশ্বাস, সাধারণ ধর্ম্মোপদেশ ও সাধারণ ধর্ম্মাশ্বাস লইয়া সম্মিলিত হয়, তখন সে সমাজের একটা শাসনব্যবস্থাও প্রয়োজন হয়। শাসনব্যবস্থা ব্যতিরেকে কোন সমাজ এক সপ্তাহ, এমন কি একঘণ্টাকালও টিকিয়া থাকিতে পারে না। সমাজ যখন গঠিত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই গঠনব্যাপারটি সম্ভব ও সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্যই একটা শাসনতন্ত্রের আবশ্যক হয়, যাহা সমাজের বন্ধন-স্বরূপ সাধারণ সত্যটিকে প্রচার করিবে, যাহা ঐ সত্যের অনুযায়ী বিধি-উপদেশগুলি শিক্ষা দিবে ও সমর্থন করিবে। অন্যান্য সমাজের ন্যায় ধর্ম্মসমাজের উপরও যে একটা শক্তিকেন্দ্র, একটা শাসনতন্ত্র স্থাপন করা প্রয়োজন, তাহা ঐ সমাজের অস্তিত্ব হইতেই অনুমেয়। এবং শুধু যে শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন হয় তাহা নহে, স্বাভাবিক নিয়মে তাহা গড়িয়াও উঠে। সাধারণভাবে সমাজে কিরূপে শাসনতন্ত্রের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা হয়, সে কথা আলোচনা করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। কেবল এইটুকুমাত্র বলিব, যে স্বাভাবিক নিয়মের গতি সেখানে কোন বাহিরের শক্তিদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যায় না, সেখানে শক্তি যোগ্যতমেরই হস্তগত হয়; যাহারা সমাজকে তাহার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতে পারিবে, তাহারাই সমাজের কর্ত্তৃত্ব শক্তি লাভ করে। সামরিক অভিযানে যিনি বীরশ্রেষ্ঠ, তিনিই নেতৃত্ব লাভ করেন। ঐরূপ যদি কোন সংঘের উদ্দেশ্য হয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা তদ্বিধ কোন নৈপুণ্যসাপেক্ষ ব্যাপার, তাহা হইলে যিনি দক্ষতম তিনিই সংঘের অধিপতি হইবেন। সর্ব্ববিষয়েই, যদি স্বাভাবিক নিয়ম অবাধে কাজ করিতে পায়, তাহা হইলে মানুষে মানুষে যে স্বাভাবিক শক্তি বৈষম্য, তাহা সহজেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং যাহার যেটি যথাযোগ্য স্থান সে তাহাই অধিকার করিয়া বসে। অন্যান্য ক্ষেত্রের মত ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও প্রতিভা, স্বাভাবিক বৃত্তি এবং ক্ষমতা হিসাবে মানুষে মানুষে কোনই সাম্য নাই; কেহবা ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করিতে এবং ধর্ম্মমতের দিকে লোকসাধারণকে আকর্ষণ করিতে সর্ব্বাপেক্ষা নিপুণ; কাহারও বা চরিত্রের মধ্যে এমন একটা নেতৃত্বশক্তি আছে যাহার দ্বারা সে সমাজকে ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশপালনে সম্মত করিতে পারে; কেহবা আবার মানুষের মনের মধ্যে ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মের আশা জাগাইয়া দিতে ও বাঁচাইয়া রাখিতে বিশেষ পারদর্শী। গুণ ও সামর্থ্যের যে তারতম্যের দরুণ ব্যবহারিক সমাজে কর্ত্তৃত্বশক্তির উদ্ভব হয়, ধর্ম্মসমাজেও সেই তারতম্যের জন্যই কর্ত্তৃত্বশক্তির উদ্ভব হয়। এক একজন মিশনরী বা প্রচারক উঠিয়া পড়ে ও সেনানায়কের মতই আত্মঘোষণা করে। এইরূপে একদিকে যেমন ধর্ম্মসমাজের প্রকৃতি হইতেই ধর্ম্মশাসনতন্ত্রের উদ্ভব হয়, অপরদিকে তেমনি এই তন্ত্রের পুষ্টি ও

পরিণতি মানুষের গুণকর্ম্মের স্বাভাবিক বৈষম্যবশতঃ স্বাভাবিক নিয়মেই সম্পন্ন হয়। অতএব দেখা গেল, যে মুহূর্ত্তে মানুষের মধ্যে ধর্ম্মের উদ্ভব হয়, সেই মুহূর্ত্তেই একটি ধর্ম্মসমাজ গড়িয়া উঠে; এবং ধর্ম্মসমাজের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সেই সমাজের একটি শাসনতন্ত্র গড়িয়া উঠে।

কিন্তু এইখানে একটা গোড়াকার আপত্তি উঠিতেছে। এই ধর্ম্মসমাজের ক্ষেত্রে হুকুম চালাইবার বা জোর খাটাইবার, এক কথায় শাসন ব্যাপারেরও কোন অবকাশ নাই। অবাধ-স্বাধীনতাই যখন এ সমাজের লক্ষণ, তখন ইহার মধ্যে শাসনের স্থান কোথায়?

নিজের বিধিবিধান মানাইবার জন্য ও হুকুম চালাইবার জন্য প্রত্যেক শাসনতন্ত্র যে বাহ্-শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে, কেবলমাত্র বা প্রধানতঃ সেই শক্তির মধ্যেই তাহার যথার্থ সত্ত্বা নিঃশেষিত হইয়াছে মনে করি, তাহা হইলে শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে অত্যন্ত স্থূল ও সঙ্কীর্ণ ধারণা করা হইবে।

ধর্ম্মশাসনের কথা ছাড়িয়া দিয়া ঐহিক শাসনতন্ত্রের কথাই ধরুন। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রেই ঘটনা পরম্পরায় সকল স্বাভাবিক গতি অনুসরণ করিয়া দেখুন। প্রথমে ধরুন একটা সমাজ আছে; সমাজ থাকিলেই সমাজের নাম'ও সমাজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটা কিছু কর্ত্তব্য আছে; হয় ত একটা বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে, হয় ত একটা বিধান প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, হয় ত বা একটা রায় প্রকাশ করিতে হইবে। এই সমস্ত সামাজিক প্রয়োজন-সাধনের জন্য একটা যথাযোগ্য আদর্শ প্রণালীও নিশ্চয় আছে; আদর্শ বিধিই প্রণয়ন করিতে হইবে, উৎকৃষ্ট বিধানই প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, নির্দ্দোষ সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিতে হইবে। আলোচ্যবিষয় যাহাই হউক না কেন, প্রত্যেকস্থলেই একটা আদর্শ আছে, একটা জ্ঞাতব্য সত্য আছে, এবং সেই সত্য অনুসারেই সমাজের প্রত্যেক কার্য্যের প্রণালী ও ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এই সত্যের সন্ধান লওয়া, কোন্ ব্যবস্থা ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত ও সমাজের উপযোগী তাহা আবিষ্কার করা—ইহাই শাসনতন্ত্রের প্রথম কর্ত্তব্য। এই সত্যাদর্শের সন্ধান পাইলেই শাসনতন্ত্র ইহা ঘোষণা করিবে। তখন আবশ্যক হয় লোকসমাজের মনের মধ্যে এই সত্য মুদ্রিত করিয়া দেওয়া; শাসনতন্ত্র যাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে, তাহাদের অনুমোদন লাভ করা; তাহার বিধিবিধান যে ন্যায়যুক্তির অনুকূল, লোকের মনে এই ধারণা উৎপাদন করা। ইহার মধ্যে কি বাহ্শক্তি প্রয়োগের কোন লক্ষণ পাইলেন? নিশ্চয়ই না। এখন মনে করুন যে সত্য দ্বারা সমাজের বিধিবিধান শাসিত হওয়া উচিত, তাহা আবিষ্কৃত ও ঘোষিত হওয়া মাত্র সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন বুদ্ধির দ্বারা তাহাকে স্বীকার করিয়া লইল, সকলেই তাহার নিকট স্ব স্ব স্বাধীন ইচ্ছা অবনত করিল, সকলেই শাসনতন্ত্রের ন্যায়যুক্তিপরতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান হইয়া স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাহার বিধিবিধান মানিয়া চলিতে লাগিল। এ ক্ষেত্রেও শাসনপরিচালনের, শক্তিপ্রয়োগের কোন অবসর নাই। তাহা হইলে কি এরূপ স্থলে শাসনতন্ত্রের কোন অস্তিত্ব নাই? এই সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে শাসনতন্ত্রের কোন বিশিষ্ট ক্রিয়া নাই? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রও আছে এবং সে তাহার বিশিষ্ট কর্ত্তব্যও সম্পন্ন করিতেছে। বাহ্শাসন তখনই আবশ্যক হয় যখন শাসনতন্ত্রাবলম্বিত আদর্শ বা নীতি

সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মতি ও স্বতঃপ্রণোদিত বশ্যতা প্রাপ্ত হয় না, যখন সমাজের ব্যক্তি-বিশেষে এই নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বসে। শাসনতন্ত্র তখন বশ্যতালাভ করিবার জন্য বাহ্য-শক্তি প্রয়োগ করে ; ইহা মানুষের স্বাভাবিক অসম্পূর্ণতার অবশ্যম্ভাবী ফল, এবং এ অসম্পূর্ণতা সমাজের মধ্যেও আছে, শাসনতন্ত্রের মধ্যেও আছে। এ অসঙ্গতি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা হয় ত কোনকালেই সম্ভব হইবে না ; ঐহিক শাসনতন্ত্র মাত্রই কিয়ৎপরিমাণে বাহ্যশাসনশক্তি প্রয়োগ করিতে চিরকালই বাধ্য হইবে। কিন্তু এই বাহ্যশক্তি দ্বারাই কোন শাসনতন্ত্র গঠিত হয় না ; যখনই এই শক্তি প্রয়োগ পরিহার করা সম্ভব হয় তখনই সে নিরস্ত হয়, এবং তাহাতে সকল পক্ষেরই প্রভূত কল্যাণ হয়। এমন কি, শাসনতন্ত্র যখন বাহ্যশাসন পরিহার করিতে পারে, এবং মানুষের স্বাধীন ধর্ম্মবুদ্ধি ও বিচারবুদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে, তখনই সে যথার্থ সম্পূর্ণতা লাভ করে। অতএব সে যে পরিমাণে বাহ্যশাসন পরিহার করিবে সেই পরিমাণে সে নিজের যথার্থ প্রকৃতির অনুবর্ত্তী হইবে, তাহার যথার্থ উদ্দেশ্য সাধন করিবে। ইহাতে বাস্তবিকপক্ষে তাহার শক্তির হ্রাস বা প্রভাব সঙ্কীর্ণ হয় না ; সে তখন আর একপ্রণালীতে কাজ করে মাত্র, এবং সে প্রণালী বাহ্যশক্তি প্রয়োগ অপেক্ষা শতকোটীগুণ ব্যাপক ও প্রবল। যে সকল শাসনতন্ত্র সমধিকপরিমাণে বাহ্য শাসন প্রয়োগ করে তাহাদের অপেক্ষা যাহারা ঐ পদ্ধতি একেবারেই অবলম্বন করে না বলিলেই হয়, তাহারা অধিকপরিমাণে কৃতকার্য্য হয়।

কেবলমাত্র মানুষের বিচার বুদ্ধি ও স্বাধীন ইচ্ছার উপর প্রভাব বিস্তার করাতে, কেবল-মাত্র নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপায়ের উপর নির্ভর করাতে শাসনতন্ত্রের সঙ্কোচ না ঘটিয়া বিস্তৃতি ও উন্নতিই সাধিত হয়। তখনই সে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্য সাধন করে, মহত্তম ব্যাপার সকল নিষ্পন্ন করে। বিপরীতপক্ষে, যখন তাহাকে কেবলই বাহ্যশাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া চলিতে হয়, তখনই সে ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন সে সামান্যই করিতে পারে, এবং যাহা করে তাহাও ভাল করিয়া করিতে পারে না।

অতএব দেখা গেল যে শক্তিপ্রয়োগ ও শাসনদণ্ড পরিচালনই শাসনতন্ত্রের সারতত্ত্ব নহে ; শাসনতন্ত্রের প্রধান উপাদান হইতেছে এমন কতকগুলি উপায় ও শক্তির সমষ্টি, যাহা দ্বারা ক্ষেত্রানুযায়ী ব্যবস্থা আবিষ্কার করা যাইবে, যাহা দ্বারা সমাজনীতির সত্য আদর্শের সন্ধান পাওয়া যাইবে। এই সত্যই সমাজকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করিতে একমাত্র অধিকারী। সুতরাং এই সত্যের আদর্শ সমাজের সমক্ষে ধরিলেই মানুষের চিত্ত স্বভাবতঃই ইহাকে স্বেচ্ছায় স্বাধীন ভাবে বরণ করিয়া লইবে। অতএব শাসনদণ্ড পরিচালনের কোন অবসর না থাকিলেও শাসন-তন্ত্রের একটা প্রয়োজন ও সার্থকতা থাকিতে পারে ইহা সহজেই ধারণা করা যাইতে পারে। এখন, ধর্ম্মসমাজের যে শাসনতন্ত্র, তাহা এই প্রকৃতির শাসনতন্ত্র। এ শাসনতন্ত্রের পক্ষে শক্তিপ্রয়োগ অবশ্যই নিষিদ্ধ ; এ যদি শক্তিপ্রয়োগ করিতে যায়, তা সে যে উদ্দেশ্যেই হউক না, কেন, তাহা হইলে ইহার পক্ষে অবৈধ আচরণ হইবে, কারণ ইহার একমাত্র শাসনাধিকার মানুষের বিবেকের ক্ষেত্রে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এ শাসনতন্ত্রের একটা অস্তিত্ব আছে, তাহাকে পূর্ব্বোক্তরূপ সমস্ত ক্রিয়াই সম্পন্ন করিতে হয়। ইহাকে আবিষ্কার করিতে হইবে কোন কোন

ধর্ম্মতত্ত্বের দ্বারা মানুষের ভাগ্যসমস্যার সমাধান হয় ; অথবা, যদি ঐরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মবিশ্বাসের সমষ্টি পূর্ব্ব হইতেই থাকে তাহা হইলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঐ সকল সাধারণ তত্ত্বের কিরূপ প্রয়োগ হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ ও প্রচার করিতে হইবে ; ঐ সকল তত্ত্বের অনুযায়ী উপদেশ ও ব্যবহারবিধি প্রবর্ত্তন ও সংরক্ষণ করিতে হইবে ; জনসমাজে এই সকল উপদেশ শিখাইতে ও প্রচার করিতে হইবে এবং সমাজ পথভ্রষ্ট হইলে পুনরায় তাহাকে ধর্ম্মপথে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। কোনরূপ জোর খাটান এখানে চলিবে না ; এ শাসনতন্ত্রের কর্ত্তব্য কেবল ধর্ম্মকর্ত্তব্যের আলোচনা, প্রচার ও শিক্ষণ, এবং প্রয়োজনানুসারে ত্রুটী প্রদর্শন ও তিরস্কার। বাহ্যশাসন যতই পরিহার করুন না কেন, তথাপি দেখিবেন শাসনতন্ত্র গঠনের সমস্ত মূলগত সমস্যাই মাথা তুলিয়া উঠিবে ও সমাধান দাবী করিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ প্রশ্নটী সর্ব্বদাই উঠিবে, সর্ব্বদাই আলোচনা করা আবশ্যক হইবে যে ধর্ম্মের জন্য একসম্প্রদায় ধর্ম্মশাসকের কোন প্রয়োজন আছে কি না, সমাজভুক্ত ব্যক্তিবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ধর্ম্মভাবের প্রেরণার উপর নির্ভর করা সম্ভব কি না। আপনারা জানেন এই প্রশ্ন লইয়া একদিকে অধিকাংশ ধর্ম্মসম্প্রদায়, অপরদিকে কোয়েকার দিগের মধ্যে বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। ঐরূপ একটা ধর্ম্মশাসকবর্গের প্রয়োজন আছে স্বীকার করিয়া লইলেও, এই সকল ধর্ম্মশাসক পরস্পর সমপদস্থ ও সমানাধিকারী হইবেন, সমানভাবে একত্র সম্মিলিত হইয়া আলোচনামীমাংসা করিবেন, না উচ্চ নীচ পদাধিকারক্রমে বিন্যস্ত হইয়া একটী জটীল শাসনপদ্ধতি গড়িয়া তুলিবেন—এ প্রশ্নেরও কখনও শেষ মীমাংসা হইবে না, কারণ কোন ধর্ম্মশাসকেরই হাতে বাহ্যশক্তি প্রয়োগের অধিকার নাই। অতএব ধর্ম্মশাসনতন্ত্রের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে গিয়া ধর্ম্মসমাজের পর্য্যন্ত অস্তিত্ব উড়াইয়া না দিয়া বরং ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে ধর্ম্মসমাজ স্বাভাবিকরূপেই গড়িয়া উঠে, এবং ধর্ম্মসমাজ হইতে ধর্ম্মশাসনতন্ত্রের উদ্ভবও তেমনি স্বাভাবিক, এবং কি আকারে এই শাসনতন্ত্রের গঠন হওয়া উচিত, ইহার ভিত্তি কোথায়, ইহার মূলনীতি কি কি, ইহার অধিকারের ন্যায় সঙ্গত সীমা কোথায়—এই প্রশ্নেরই বিচার আবশ্যক। অন্যান্য শাসনতন্ত্রের পক্ষেও যেমন ধর্ম্মশাসনতন্ত্রেরও পক্ষে তেমনি এই প্রশ্নের বিচারই একমাত্র প্রয়োজনীয় বিচার।

অন্যান্য শাসনতন্ত্রের যে যে গুণে বৈধতা নিষ্পন্ন হয়, ধর্ম্মশাসনতন্ত্রের পক্ষেও সেই সেই গুণের আবশ্যক। সে গুণ প্রধানতঃ দুইটি :—প্রথমে আবশ্যক যে যোগ্যতম ও শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির হস্তে শাসন ক্ষমতা থাকিবে ; সমাজের মধ্যে যে সকল শ্রেষ্ঠব্যক্তি ছড়াইয়া আছেন, তাঁহাদিগকে বাছিয়া আনিয়া তাঁহাদের হাতেই সামাজিক বিধি প্রণয়ন ও শাসনক্ষমতা পরিচালনের ভার দিতে হইল। দ্বিতীয়তঃ আবশ্যক যে বৈধভাবে গঠিত শাসনশক্তি শাসন-ভুক্ত প্রত্যেকব্যক্তির বৈধ অধিকার মানিয়া চলিবে। একদিকে শাসনশক্তি গঠনপ্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব, অপর দিকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাসংরক্ষণের সুব্যবস্থা, এই দুইটি গুণের দ্বারাই কি ধর্ম্মশাসনতন্ত্র, কি ঐহিকশাসনতন্ত্র, সকলপ্রকার শাসনব্যবস্থারই মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হয়, এই মাপকাঠিদ্বারাই সমস্ত শাসনতন্ত্রের বিচার হওয়া উচিত।

অতএব খ্রীষ্টীয় যাজকতন্ত্রের অস্তিত্ব ধরিয়াই বিদ্রূপ না করিয়া, আমাদের দেখা উচিত ইহার গঠন কিরূপ, উৎকৃষ্ট শাসনপদ্ধতির যে দুইটি লক্ষণ পূর্ব্বে উল্লেখ করা গেল তাহার সহিত

মূলনীতির মিল আছে কি না। এখন এই দুই দিক দিয়া খৃষ্টীয় যাজকতন্ত্রের বিচার করা যাউক।

চর্চের শাসনশক্তির উদ্ভব ও বিস্তার আলোচনাস্থলে খৃষ্টিয় যাজকসম্প্রদায় সম্বন্ধে caste বা জাতি বলিয়া একটা শব্দ প্রয়োগ্ করা হয়, আমি ঐ শব্দটি বর্জ্জন করিতে চাই। ধর্ম্মশাসকসম্প্রদায়কে অনেক সময় একটা জাতি বলা হয়। জগতের চারিদিকে তাকাইয়া দেখুন; ভারতবর্ষ বলুন, মিশর বলুন, যেখানে যেখানে জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব হইয়াছে, সর্ব্বত্রই দেখিবেন জাতি মূলতঃ বংশগত, ইহাদ্বারা পিতার পদ, পিতার অধিকার পুত্রে সঞ্চারিত হয়। যেখানে বংশগত উত্তরাধিকার নাই, সেখানে জাতি নাই, সে সমাজকে জাতি না বলিয়া সংঘ বলা উচিত। সংঘগত ভাবের কতকগুলি অসুবিধা আছে, কিন্তু ইহা জাতীয়ভাব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। "জাতি" কথাটা খৃষ্টিয় চর্চ সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায় না। যাজকদিগের চিরকৌমার্য্য তাহাদিগকে কখনও "জাতি" গড়িতে দেয় নাই।

এই বিভিন্নতার ফল আপনারা এখনই কতকটা বুঝিতে পারিতেছেন। জাতিপ্রথা ও উত্তরাধিকার প্রথা অনেকটা এক চেটিয়া ধরণের ব্যাপার। জাতি কথাটার সংজ্ঞায় মধ্যেই ঐ এক চেটিয়ার ভাব রহিয়াছে। যখন বিশেষ বিশেষ পরিবারের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বৃত্তি ও অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে সঞ্চারিত হইতে থাকে, তখন ঐ সকল বৃত্তি ও অধিকার যে ঐঐ পরিবারের নিজস্ব সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হইবে, যাহারা ঐসকল পরিবারে জন্মগ্রহণ করে নাই তাহাদের পক্ষে যে ঐ সকল বৃত্তি ও অধিকার অনধিগম্য হইবে, ইহা ত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। বাস্তবিক পক্ষে ইহাই ঘটিয়াছিল, ধর্ম্মশাসনতন্ত্র যেখানে যেখানে একটা জাতির হাতে গিয়া পড়িয়াছে, সেই সেই স্থলেই ইহা একটা বিশিষ্ট অধিকারের আকার ধারণ করিয়াছে, যাহারা ঐ জাতির কোন পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে নাই তাহারা এই শাসনতন্ত্রে প্রবেশলাভ করিতে পারিত না! খৃষ্টিয় চর্চে এতৎসদৃশ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল যে কোন সাদৃশ্য পাওয়া যায় না তাহা নহে, পরন্তু খৃষ্টিয় চর্চ বরাবরই বলিয়া আসিতেছে যে জন্মজাতিনির্বিশেষে সকল ব্যক্তিই চর্চের বৃত্তি অবলম্বন করিতে ও সম্মান পাইতে সমান অধিকারী। বিশেষতঃ পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যাজকবৃত্তির দ্বার সকলের পক্ষেই উন্মুক্ত ছিল। সমাজের উচ্চ নীচ সকল পদবী হইতেই চর্চ লোকসংগ্রহ করিয়া লইত, অধিকাংশ স্থলে নিম্নশ্রেণী হইতেই লইত। চর্চের চতুর্দ্দিকে সর্ব্বত্রই অধিকারবৈশিষ্ট্যের রাজ্য, চর্চই কেবল সাম্য ও সমান সমানপ্রতিযোগিতার নীতি রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল, সেই কেবল সমাজের মধ্যে যে কেহ গুণশ্রেষ্ঠ জাতিপদবীনির্ব্বিশেষে সকলকেই শাসনক্ষমতা পরিচালনের জন্য আহ্বান করিয়াছিল। চর্চ যে জাতি নহে, সংঘমাত্র, ইহাই হইল তাহার সর্ব্বপ্রধান ফল।

আবার, জাতিভেদ প্রথার মধ্যে একটা অচলতার ভাব আছে। এ কথায় কোন প্রমাণ আবশ্যক নাই। যে কোন ইতিহাস খুলিয়া দেখুন, যেখানে যেখানে জাতিভেদ প্রথার প্রাধান্য, সেই সেই সমাজের মধ্যে একটা স্থাবরতার ভাব দেখিবেন। একথা অবশ্য সত্য, যে খৃষ্টিয় চর্চের মধ্যেও এক সময়ে কতকপরিমাণে অগ্রগমনভীতি দেখা দিয়াছিল।

কিন্তু একথা আমরা বলিতে পারি না যে ঐ ভীতি চর্চ্চের মধ্যে প্রাধান্যলাভ করিতে পারিয়াছে, একথা বলা যায় না যে খৃষ্টীয় চর্চ অচল ও স্থাণু হইয়া রহিয়াছে। বহু দীর্ঘযুগ ধরিয়া সে সচল-ভাবে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, কখনও বা বাহিরের আক্রমণে উত্তেজিত হইয়া, কখনও বা অন্তর হইতেই আভ্যন্তরীণ পুষ্টি ও সংস্কার প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া। মোটের উপর এ সমাজ কেবলই পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, ইহার ইতিহাস বৈচিত্র্য-ময় ও অগ্রগামী। সকল শ্রেণীর লোককে যাজকবৃত্তিতে বরণ করিয়া লওয়ার ফলেই, সাম্য-নীতি অনুসারে লোকসংগ্রহের ফলেই অবশ্য চর্চের সজীবতা ও সচলতা বরাবর রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার মধ্যে স্থিতিস্থাবরতা ধর্ম্মের প্রাধান্য ঘটিতে পারে নাই।

চর্চ ত সকল লোকের নিকট শাসনক্ষমতার প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল, কিন্তু এ ক্ষমতা পরিচালনের পক্ষে ন্যায্য অধিকার কাহার আছে, যোগ্যতা ও গুণশ্রেষ্ঠতা কাহার আছে তাহা সে কি করিয়া আবিষ্কার করিত?

চর্চের মধ্যে দুইটি নির্ব্বাচননীতির প্রাধান্য দেখিতে পাই। একটি শ্রেষ্ঠের দ্বারা নিকৃষ্টের নির্ব্বাচন বা মনোনয়ন, অপরটি নিকৃষ্টদ্বারা শ্রেষ্ঠের নির্ব্বাচন, অর্থাৎ আজকাল নির্ব্বাচন বলিলে আমরা যাহা বুঝি তাহাই।

যাজক নিয়োগের ক্ষমতা, কোন লোককে যাজকপদে বরণ করিয়া লইবার ক্ষমতা কেবল সংঘাধিপতির অধিকারে। এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠদ্বারা নিকৃষ্টের নির্ব্বাচন হইল। সেইরূপ ফিউড্যাল-স্বত্ব-সম্পর্কিত কোন কোন যাজকবৃত্তিবণ্টনের সময় রাজা বা পোপ বা ভূস্বামী বৃত্তিভোগীর নাম নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন, অন্যান্য ক্ষেত্রে আবার যথার্থ নির্ব্বাচন প্রণালীই অবলম্বিত হইত। বিশপ্‌রা বহু পূর্ব্ব হইতেই, এবং আমাদের আলোচ্য যুগেও, প্রায়শঃ যাজকসংঘকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন, অনেক সময়ে উপাসকবর্গও এই সকল নির্ব্বাচনে হস্তক্ষেপ করিত। মঠের মধ্যে মঠধারী সন্ন্যাসীবর্গই মঠের আবট্‌ বা মোহন্ত নির্ব্বাচন করিত। রোমে কার্ডিনাল্‌সংঘ কর্ত্তৃক পোপের নির্ব্বাচন হইত, এক সময়ে সমগ্র রোমীয় যাজকবর্গ এই নির্ব্বাচনে যোগদান করিত। এইরূপে চর্চের ইতিহাস, বিশেষতঃ আমাদের আলোচ্য যুগে দুইটি নির্ব্বাচননীতির, প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়—এক শ্রেষ্ঠদ্বারা নিকৃষ্টের নির্ব্বাচন, আর এক নিকৃষ্টের দ্বারা শ্রেষ্ঠের নির্ব্বাচন। হয় পূর্ব্বোক্ত নয় শেষোক্ত প্রণালীতে চর্চ ধর্ম্মশাসন-ক্ষমতার একাংশ পরিচালনের জন্য লোকনির্ব্বাচন করিয়া লইত।

উভয়পদ্ধতি যে একত্র পাশাপাশি বর্ত্তমান ছিল তাহাই নহে, উভয়ের মধ্যে একটা বিরোধও ছিল। বহুশতাব্দীব্যাপী বহুপরিবর্ত্তনের পর খৃষ্টীয় চর্চে শ্রেষ্ঠদ্বারা নিকৃষ্টনির্ব্বাচন-পদ্ধতিই প্রাধান্য লাভ করিল। কিন্তু, সাধারণতঃ পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, নিকৃষ্টদ্বারা শ্রেষ্ঠের নির্ব্বাচন—এই পদ্ধতিরই অধিক প্রসার ছিল। এইরূপ দুইটি বিরুদ্ধ নীতির একত্র সমাবেশে বিস্মিত হইবেন না। সাধারণসমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, জগতের স্বাভাবিক গতি পর্য্যালোচনা করুন, জগতের মধ্যে অধিকার ও ক্ষমতা কিরূপে সঞ্চারিত হয় দেখুন, এই সঞ্চার ব্যাপার কখনও প্রথমোক্ত নীতিঅনুসারে কখনও দ্বিতীয়োক্ত নীতিঅনুসারে সম্পন্ন হয়। চর্চ এ নীতিদ্বয়ের সৃষ্টি করে

নাই ; মানবব্যাপারে বিধাতার শাসন পদ্ধতির মধ্যেই এই নীতি সে পাইয়াছে এবং তাহা হইতেই সে ইহা গ্রহণ করিয়াছে। উভয়ের মধ্যেই সত্য আছে, উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা আছে ; অনেক সময়ে উভয়নীতির সম্মিলনই যথার্থ শাসনাধিকারী নির্ব্বাচনের শ্রেষ্ঠ উপায়। আমার মনে হয় এ একটা পরমদুর্ভাগ্য যে উভয়ের মধ্যে কেবল একটি নীতি—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠদ্বারা নিকৃষ্টের নির্ব্বাচন চর্চের প্রাধান্য লাভ করিল। এ নীতি কিন্তু কখনই সম্পূর্ণ একাধিপত্য করিতে পারে নাই ; নানা বিচিত্র নামে, বিভিন্ন যুগে এই দুই নীতির সংঘর্ষ চলিয়া আসিয়াছে—তাহাতে প্রথম নীতিটি পরাজিত হইলেও অন্ততঃ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে ও চিরপ্রতিষ্ঠিত শক্তিকে বাধা দিতে সমর্থ হইয়াছে।

আমরা যে যুগের আলোচনা করিতেছি তখন এই সাম্যনীতি অবলম্বন ও যোগ্যতার আদর করায় চর্চের প্রভূত বলবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। চর্চই তখন সর্ব্বজনপ্রিয় সমাজ ছিল ; সর্ব্বপ্রকার প্রতিভা ও যোগ্যতার পক্ষে ইহা সহজাধিগম্য ও মুক্ত দ্বার ছিল ; মানব প্রকৃতির যত মহদাকাঙ্ক্ষা, তাহা চরিতার্থ করার পক্ষে ইহা একমাত্র সুগম ক্ষেত্র ছিল। ইহাই হইল ইহার শক্তির যথার্থ স্থল ; এ শক্তি তাহার অর্থ সম্পত্তি হইতেও উদ্ভূত হয় নাই, যুগে যুগে যে সমস্ত অবৈধ উপায় সে অবলম্বন করিয়াছে তাহা হইতেও হয় নাই।

ব্যক্তিস্বাধীনতার মর্য্যাদাবোধরূপ সুশাসনপদ্ধতির যে দ্বিতীয় লক্ষণ, সে বিষয়ে চর্চের অনেক ত্রুটি ছিল। চর্চের মধ্যে দুইটি কুনীতির একত্র সন্নিবেশ ঘটিয়াছিল :—একটি চর্চের মতবাদের সহিত অনুস্যূত ও অবিচ্ছেদ্য ; অপরটি মানুষের স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য হইতে উদ্ভূত, চর্চের মতবাদের অনিবার্য্য ফল নহে।

প্রথমটী এই যে চর্চ ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধির অধিকার অস্বীকার করে, সে সমগ্র ধর্ম্ম-সমাজের মধ্যে স্বানুমোদিত ধর্ম্মবিশ্বাস চালাইবার দাবী করে, সে কাহারও স্বাধীনভাবে বিচার করিবার অধিকার স্বীকার করে না। এ নীতি প্রবর্ত্তন করা সহজ, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে চালান তত সহজ নহে। মানুষের বুদ্ধি নিজে স্বীকার করিয়া না লইলে তাহার মধ্যে একটা নূতন মত বা বিশ্বাস প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায় না : বিশ্বাসটিকে প্রথমে বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ যোগ্য করিয়া তোলা চাই। সে যে আকারেই উপস্থিত হউক না কেন, যত বড় নামেরই দোহাই দিক না কেন, মানুষের বুদ্ধি তাহাকে বিচার করিয়া লইবে ; সে বিশ্বাস যদি লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা-লাভ করে, তাহা হইলে মানুষের বিচারবুদ্ধি তাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে বলিয়াই সে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিয়াছে। এইরূপে মানুষের বুদ্ধির উপর যে কোন ধারণা বা বিশ্বাস চাপাইবার চেষ্টা করা হয়, মানুষের বুদ্ধি তাহা লইয়া স্বাধীনভাবে বিচার বিতর্ক করিবেই ; ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির এই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া নানা প্রচ্ছন্ন আকারে আত্মগোপন করিতে পারে, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একথা খুব সত্য যে মানুষের বুদ্ধিই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে ; সে কিয়ৎপরিমাণে নিজকে বিকলাঙ্গ ও স্বাধিকারভ্রষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে ; তাহাকে নিজের বৃত্তিগুলির অপব্যবহার বা অসম্পূর্ণব্যবহার করিতে সম্মত করা যাইতে পারে। চর্চ-প্রবর্ত্তিত উল্লিখিত কুনীতির ফলে ইহাই বাস্তবিকপক্ষে

ঘটিয়াছিল। কিন্তু এনীতির বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ প্রভাবের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখিব ইহা কখনই সম্পূর্ণভাবে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না বা পারে নাই।

চর্চ প্রবর্ত্তিত দ্বিতীয় কুনীতি এই যে সে শক্তি প্রয়োগের দ্বারা লোককে বাধ্য করিবার অধিকার দাবী করে। বাস্তবিকপক্ষে এ অধিকার ধর্ম্মসমাজের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, চর্চের উদ্ভব-তত্ত্বের বিরোধী, চর্চের আদিম নীতি ও উপদেশের প্রতিকূল। সেণ্ট আম্ব্রোস্, সেণ্ট হিলারী, সেণ্ট মার্টিন প্রভৃতি চর্চের সুপ্রসিদ্ধ আদিম নেতৃগণ এ অধিকার স্বীকার করেন নাই, কিন্তু তথাপি ইহা চর্চের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। লোককে শারীরিক দণ্ড দেওয়া, অত্যাচারের দ্বারা পাষণ্ডদলন, মানবচিন্তার স্বাধীন গতির প্রতি অবজ্ঞা, —এ কুনীতি পঞ্চমশতাব্দীর পূর্ব্বেই চর্চে প্রবেশলাভ করিয়াছিল; এবং ইহার জন্য চর্চকে কম দুর্দ্দশাভোগ করিতে হয় নাই।

অতএব যদি চর্চ-শাসনভুক্ত ব্যক্তিবর্গের স্বাধীনতার সম্পর্কে চর্চের বিচার করি, তাহা হইলে দেখিব এ বিষয়ে চর্চের শাসননীতি তাহার নেতৃনির্ব্বাচননীতি অপেক্ষা অবৈধ ও অকল্যাণকর। তাই একথা মনে করা উচিত নহে যে একমাত্র কুনীতিদ্বারা সমস্ত প্রতিষ্ঠানই দূষিত হইয়া যায়; বা তাহার মধ্যে যাহা কিছু মন্দ দেখা যায়, সমস্তই ঐ একমাত্র কুনীতি হইতে প্রসূত। বিশুদ্ধন্যায়ের যুক্তি যেমন ইতিহাসকে সত্যভ্রষ্ট করে তেমন আর কিছুই নহে। একটা বিশেষ চিন্তা বা ধারণা যখন মানুষের মনকে অধিকার করিয়া বসে, তখন সে ঐ একটি তত্ত্ব হইতে যতকিছু ব্যাপারের উদ্ভব হওয়ার সম্ভব, যুক্তিবলে সবগুলি টানিয়া বাহির করে এবং সবশুদ্ধ ইতিহাসের ঘাড়ে চাপাইয়া বসে। কিন্তু বাস্তবজগতে ঠিক এইরূপ ঘটে না; মানুষের ন্যায়বুদ্ধির নিকট কার্য্যকারণের যেরূপ অব্যবহিত সম্বন্ধ, বাহ্যঘটনার ক্ষেত্রে সচরাচর সেরূপ দেখা যায় না। জগতের সমস্ত ব্যাপারের মধ্যেই ভালমন্দের এমন একটা সুনিবিড় সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়, যে মানবসমাজ বা মানবাত্মার সুগভীর প্রদেশে প্রবেশ করিলেও দেখিতে পাইব এই দুই তত্ত্ব পাশাপাশি ফুটিয়া উঠিতেছে, পরস্পরের সহিত দ্বন্দ্ব করিতেছে কিন্তু কেহ কাহাকেও নির্ম্মূল করিতে পারিতেছে না। মানবপ্রকৃতি কখনও ভালমন্দ কোনটিরই চরমসীমায় পদার্পণ করে না; সে অনবরত একটি হইতে অপরটিতে যাতায়াত করিতেছে, কখনও বা পড়িতে পড়িতে হঠাৎ মাথাখাড়া করিয়া উঠিতেছে, আবার কখনও বা দৃঢ়পদক্ষেপে চলিতে চলিতে হঠাৎ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। যে বৈষম্য, বৈচিত্র্য ও দ্বন্দ্ব আমি ইউরোপীয় সভ্যতার মূলগত প্রকৃতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি এক্ষেত্রে আমরা তাহাই দেখিতে পাইব। (ক্রমশঃ)

(শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, এম্, এ, মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।)

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
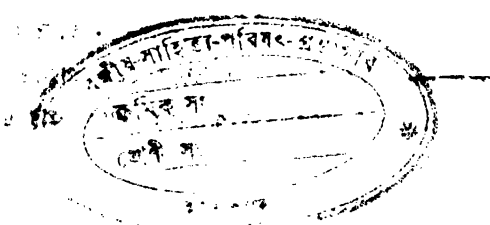
বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

(১৩)

এইবার বঙ্কিমের সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। চারিখানি উপন্যাসকে এই পর্য্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে—বিষবৃক্ষ (১লা জুন, ১৮৭৩), ইন্দিরা (১৮৭৩), রজনী (২রা জুন, ১৮৭৭), ও কৃষ্ণকান্তের উইল (২৯শে আগষ্ট, ১৮৭৮)। বঙ্কিম সামাজিক উপন্যাসেও রোমান্সের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই—তাঁহার সামাজিক উপন্যাসগুলিও অনেকটা রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত। 'রজনী'তে এই অতিপ্রাকৃত ও অসাধারণের স্পর্শ খুব সুস্পষ্ট; 'বিষবৃক্ষে'ও একটা সাঙ্কেতিকতার আভাস বর্ত্তমান; 'ইন্দিরা' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এই প্রভাব হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মুক্তিলাভ করিয়াছে—কিন্তু এই দুইখানি উপন্যাসেও অনৈসর্গিকের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। এই উপন্যাসগুলির কালানুক্রমিক আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন নাই; 'ইন্দিরা' ও 'রজনী' এই দুইখানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস নহে, ইহাদের মধ্যে চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত অপেক্ষা ঘটনা বৈচিত্র্যেরই প্রাধান্য বেশী; 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এই দুইখানিই প্রকৃত উপন্যাস-পদ-বাচ্য, উপন্যাসের অর্থ-গৌরব ও সমস্যা-বিশ্লেষণ ইহাদের মধ্যে বর্ত্তমান। সুতরাং আর্টের ক্রম-বিকাশের দিক দিয়া প্রথমোক্ত উপন্যাস দুইটীর আলোচনা প্রথম হওয়া উচিত। আমরা এখানে এই প্রণালীই অবলম্বন করিব।

ইন্দিরা একটী ক্ষুদ্রায়তন উপন্যাস; কিন্তু ইহা ক্ষুদ্রঅবয়ব ঘটনা-বিন্যাসে অনবদ্য, তীক্ষ্ণ পরিহাস নিপুণতায় উপভোগ্য, সুরুচি-সম্মত হাস্যালোকপাতে ভাস্বর। একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আভা শাণিত ছুরিকার চাকচিক্যের ন্যায়ই গল্পটীকে উজ্জ্বল করিয়াছে; এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি একটা স্ত্রীজনোচিত মাধুর্য্য ও সহৃদয়তার একটা কোমল প্রেম-বিহ্বলতায় মণ্ডিত হইয়াছে; পুরুষের পাণ্ডিত্যাভিমান ও অনিপুণ কর্কশতা কোথাও ইহাকে স্পর্শ করে নাই; রমণীর সুরই গল্পটীর আদ্যোপান্ত অভ্রান্তভাবে ধ্বনিত হইয়াছে। অবশ্য টিলিয়ানওয়ালা ও শিখদের বিশ্বাস-ঘাতকতা উল্লেখ বঙ্গ-পুরস্ত্রীর মুখে একটু অসঙ্গতই শুনায়; কিন্তু এরূপ ভ্রান্তির দৃষ্টান্ত খুবই বিরল; বিশেষতঃ শিখ-যুদ্ধপ্রত্যাগত রসদ-বিভাগের কর্ম্মচারীর পত্নীর পক্ষে এরূপ খবর রাখা নিতান্ত অবিশ্বাস্য নাও হইতে পারে। এই বিষয়ে 'রজনী'র সহিত 'ইন্দিরা'র একটী গুরুতর প্রভেদ লক্ষিত হয়। 'রজনী'তে বিভিন্ন বক্তা বক্ত্রীদের মধ্যে বিশেষ কোন ভাষা-গত পার্থক্য রক্ষা করা হয় নাই, স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে সকলের মুখেই একরূপ ভাষা ধ্বনিত হইয়াছে, সে ভাষা লেখকের নিজের ভাষা হইতে অভিন্ন। অবশ্য বঙ্কিম যে এরূপ একটা প্রভেদ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন নাই, তাহা নহে; রজনীর অন্ধতা, অমরনাথের দার্শনিকোচিত চিন্তাশীলতা, শচীন্দ্রের ভিন্ন প্রকৃতির বুদ্ধিমত্তা, লবঙ্গলতার রমণীসুলভ স্নেহশীলতা ও অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসপ্রবণতা—এই প্রবৃত্তি

গুলির বিশেষ প্রভাব তাহাদের মুখনিঃসৃত ভাষাতে প্রতিফলিত করিতে লেখক চেষ্টা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু চেষ্টা বিশেষ সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 'রজনী' সমালোচনার সময় এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিতে হইবে।

'ইন্দিরা'র উপাখ্যান ভাগ নিতান্তই সামান্য; দস্যুহস্তে অপহরণের পর ইন্দিরার দুঃখ ও স্বামীর সহিত পুনর্মিলনের জন্য নানারূপ কৌশল অবলম্বন, ইহাই ইহার মুখ্য বিষয়। এই সামান্য আয়তনের মধ্যে কোন গভীর সমস্যা আলোচিত হয় নাই, এবং বোধ হয় কোন গভীর সমস্যার অবসরও ছিল না। কিন্তু গ্রন্থখানির স্বল্প-সংখ্যক পরিচ্ছেদ গুলি একটা উদ্বেল আনন্দ-রসে সিঞ্চিত, একটা করুণ-মধুর সহানুভূতিতে আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। চরিত্রগুলি—ইন্দিরা, সুভাষিণী, তাহার শাশুড়ী কালির বোতল. সোণার মা পাচিকা ও হারাণী ঝি—অল্প কয়েকটী রেখাপাতেই জীবন্ত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের ঘটনা-বিরল জীবনের সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রাণরসের প্রবাহ বহাইয়া দিয়াছেন; একটী পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে জীবনের বিচিত্র লীলা ও চিত্তাকর্ষক ঘাত প্রতিঘাতের চিত্র দেখাইয়াছেন। অবশ্য ইহাদের কাহারও মধ্যে বিশেষ একটা চরিত্রগত গভীরতা নাই: সকলেই কতকগুলি সাধারণ ও প্রাথমিক ভাবেরই বিকাশ দেখাইয়াছে; ইন্দিরার অদম্য কৌতুকপ্রিয়তা, সুভাষিণীর সরল ও আন্তরিক সহানুভূতি, গৃহিনীর সন্দেহ-প্রবণতা ও পুত্রস্নেহ, সোণার মার কৌতুক-জনক ঈর্ষা ও আত্মবিস্মৃতি খুব গভীর স্তরের ভাব নহে; কিন্তু ইহারাই আমাদের সাধারণ জীবনের উপাদান; আমাদের অধিকাংশের জীবনের যাহা কিছু রস, যাহা কিছু বৈচিত্র্য, তাহা ইহাদেরই ক্রিয়া ও পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতের ফল। অধিকাংশেরই জীবনে খুব গভীর স্তর থাকে না; ইহাদের প্রকৃতির মধ্যে গভীরতা ও জটিলতা খুঁজিতে গেলে চরিত্রসৃষ্টি প্রায়ই অস্বাভাবিক হইয়া উঠে; বিশ্লেষণ-প্রাচুর্য্য ও বিশ্লেষণ-যোগ্য পদার্থের মধ্যে একটা গুরুতর অসামঞ্জস্য জন্মে; অথবা এই সমস্ত উপর স্তরের নীচে যে একটা আদিম পাশবিক স্তর আছে তাহাতেই অবতরণ করিতে হয়। সুতরাং ইন্দিরার চরিত্রগুলির মধ্যে গভীরতা না থাকুক, স্বাভাবিকতা যথেষ্ট আছে।

গ্রন্থমধ্যে যদি কোথাও কলা-কুশলতার দিক্ হইতে কোন সন্দেহের অবসর আছে, তবে তাহা ইন্দিরার স্বামিলাভের জন্য অত্যন্ত দীর্ঘ ও সুচিন্তিত ষড়যন্ত্রের বিবরণে। এই ষড়যন্ত্রের সমস্ত গ্রন্থিই সমান বিচারসহ নহে; বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীতে নিজেকে স্বামীর উপর বিদ্যাধরী বলিয়া চালাইবার চেষ্টা ঠিক উপযোগী বলিয়া মনে হয় না। তবে বঙ্কিম ইন্দিরার স্বামীকে কুসংস্কারপ্রবণ ও ভুত-প্রেতে বিশ্বাসবান বলিয়া বর্ণনা করিয়া ব্যাপারটীকে অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্বামীকে বশীভূত করিবার অন্যান্য উপায় ও প্রচেষ্টাগুলি খুব সুকৌশলেই নির্ব্বাচিত হইয়াছে, স্ত্রীজাতির মোহ বাড়াইবার অমোঘ অস্ত্রগুলি আশ্চর্য্য সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। মোটের উপর 'ইন্দিরা' সরস বর্ণনায়, অফুরন্ত হাস্যরসে, ও একটা অবর্ণনীয় স্ত্রীজাতিসুলভ মাধুর্য্য ও রমণীয়তায় উপভোগ্য হইয়াছে।

'ইন্দিরা' ও 'রজনী'তে বঙ্কিম উপন্যাস-ক্ষেত্রে একটী নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, আখ্যায়িকাটী নিজে না বলিয়া উপন্যাসের চরিত্রগুলিকেই বক্তার আসনে বসাইয়াছেন। 'ইন্দিরা'তে একমাত্র ইন্দিরাই বক্ত্রী; সুতরাং এখানে ব্যাপার ততদূর জটিল হয় নাই; কিন্তু 'রজনী'তে উপাখ্যানটী বলিবার ভার অনেকের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যবস্থাতে বঙ্কিম একটী নূতন গুরুতর দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে চাপাইয়াছেন; প্রত্যেক বক্তার প্রকৃতির সহিত তাহার ভাষার সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিতে হইয়াছে। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে এই চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই; বিভিন্ন বক্তার চরিত্রানুযায়ী ভাষাগত প্রভেদ বঙ্কিম রক্ষা করিতে পারেন নাই। নায়িকা রজনী সম্বন্ধেই এই বিষয়ে একটা গুরুতর অসামঞ্জস্যের পরিচয় পাওয়া যায়; অন্যান্য চরিত্রের সাক্ষ্য হইতে অন্ধ রজনীর যে কোমল, ব্রীড়া-সঙ্কুচিত, প্রকাশ-বিমুখ, সমবেদনাপূর্ণ ও স্বার্থবিসর্জ্জনতৎপর প্রকৃতিটী ফুটিয়া উঠে, তাহার নিজের পরিহাসনিপুণ, মৃদু বিদ্রূপ-মণ্ডিত, ও বিশ্লেষণকুশল উক্তিগুলি ঠিক তাহার সমর্থন করে না। তারপর তাহার মুখে যে সমস্ত গভীর চিন্তাশীলতাপূর্ণ দার্শনিকোচিত উক্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহা তাহার প্রকৃতির পক্ষে ঠিক শোভন হয় নাই, তাহা অমরনাথ বা শচীন্দ্রের মুখে অধিকতর সঙ্গত হইত। আবার তাহার কথাবার্ত্তায় যেরূপ গভীর সংসারাভিজ্ঞতার নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাও তাহার মত সমাজসংস্রব-রহিত সরল অন্ধ যুবতীর পক্ষে অনধিগম্য বলিয়াই মনে হয়। তবে রজনীর চরিত্রসম্বন্ধে যে অসামঞ্জস্যের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে তাহার একটা স্বাভাবিক ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব নয়। রজনীর শান্ত, স্তব্ধ পাষাণোপম মূর্ত্তির অভ্যন্তরে যে একটা প্রবল প্রেমের আগ্নেয়গিরি জ্বলিতেছে, তাহা তাহার নিজেরই জানার সম্ভাবনা আছে; অপরের পক্ষে অন্ধের রূপোন্মাদ ও প্রবল চিত্তচাঞ্চল্য উপলব্ধি করা যে কত দুরূহ তাহা শচীন্দ্রের উক্তিতেই প্রমাণ হইয়াছে। অন্তঃপ্রকৃতির এরূপ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, হৃদয়ের গোপন রহস্যের এরূপ পূর্ণ উদ্ঘাটন অপরের নিকট আশা করা যায় না, সুতরাং রজনীর আত্মপরিচয় ও অপরের বিবরণের মধ্যে এরূপ একটা অনৈক্য থাকাই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ গল্পের যে অংশে উপাখ্যানের সূত্র রজনীর হাত হইতে লওয়া হইয়াছে, তাহা তাহার জীবনের একটা সন্ধিস্থল; তখন সে নির্জ্জন অন্তর্গূঢ় প্রেমের ধ্যান হইতে বাহ্য জগতের কোলাহলের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এই সময় তাহার চরিত্রের একটা পরিবর্ত্তন ঘটাও সঙ্গত। অমরনাথ ও শচীন্দ্র যখন বক্তার আসন গ্রহণ করিলেন, তখন রজনীর উপর বাহিরের জগতের দৃষ্টি পড়িয়াছে; সে তখন একটা বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাহার প্রেম লইয়া একটা কাড়াকাড়ি, একটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিয়া গিয়াছে, তাহার অন্ধকার-হৃদয়-কন্দরাবদ্ধ চিন্তা এখন বাহ্যজগতের জটিল সম্পর্কজালের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিবার অবসর পাইয়াছে; সে নিজের নব-লব্ধ প্রাচুর্য্য হইতে বিলাইতে বসিয়াছে; কৃতজ্ঞতা ও প্রেমের মধ্যে দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিতেছে; এই সময় তাহার অন্তরের উচ্ছ্বাস অনেকটা শান্ত-সংযত হইয়া তাহার কোমল, মধুর রমণীপ্রকৃতিটী প্রস্ফুট করিয়া দিতেছে। আবার এই সময় রজনীর হৃদয় বিশ্লেষণের কাজ তাহার নিজের হাত হইতে অপরের হাতে চলিয়া গিয়াছে; তাহার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের

চিত্রটী কাজেই ফুটিয়া উঠে নাই ; অমরনাথ বা শচীন্দ্র প্রেমিকের মুগ্ধদৃষ্টিতেই তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছে ; লবঙ্গলতাও তাহাকে বাহিরের দিক হইতেই, দয়াবতী, পরদুঃখকাতরা রমণীরূপেই দেখিয়াছে। সুতরাং রমণীর এই দুই চিত্রের মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য অনেকটা অপরিহার্য্য। কেবল অমরনাথের ক্ষেত্রেই উক্তি ও প্রকৃতির মধ্যে একটা যথেষ্ট সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় ; তাহার উদাসীন, সংসার-বিমুখ, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু প্রকৃতি তাহার বাক্যের মধ্যেই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। শচীন্দ্রের বাক্যে বা চরিত্রে সেরূপ উল্লেখ-যোগ্য বিশেষত্ব কিছুই নাই। লবঙ্গ-লতার ক্ষুরধার বুদ্ধির সঙ্গে অতি-প্রাকৃতে অন্ধবিশ্বাসের—'কামার বউএর পিতলের টুকনি সোণা করিয়া দিয়াছিলেন। উনি না পারেন কি ?'—ইত্যাদি উক্তির সামঞ্জস্য করা একটু কঠিন।

বঙ্কিম 'রজনী'তে যে বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার আর একটী বিপদ আছে। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা যে তাহাদের নিজ নিজ অন্তঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণ করিয়াছে, তাহা একদিকে খুব সরস ও জীবন্ত হইয়াছে ; কিন্তু এখানে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য আছে। উপন্যাস-বর্ণিত ঘটনার কোন্ অংশ বা stage হইতে তাহাদের এই আত্ম-বিশ্লেষণ আরম্ভ হইয়াছে ? অবশ্য ঘটনা শেষ হইবার পরেই বিবৃতি আরম্ভ হইয়াছে ; শচীন্দ্র-রজনীর প্রেম সার্থকতা লাভ করার পরেই সকলে আপন অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছে। তাহা হইলে লিখিবার সময় প্রত্যেকেই শেষ পরিণতি সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল না। এখন এই শেষ পরিণতির জ্ঞান তাহাদের অতীতের বিশ্লেষণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে কি না, বা করিয়া থাকিলে কতদূর করিয়াছে, ইহাই বিচার্য্য বিষয়। উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা যখন কোন বিশেষ ঘটনার আলোচনা করিতেছে, তখন তাহাদের দৃষ্টি বর্ত্তমানেই সীমাবদ্ধ, না ভবিষ্যৎ পরিণতির দিকে তাহার লক্ষ্য আছে ? অবশ্য লেখক নিজে বর্ণনা করিলে, এ সমস্যা আসে না ; কেননা তিনি উপন্যাসের চরিত্রগুলির ভাগ্য-বিধাতা, তাহাদের সম্বন্ধে ত্রিকালদর্শী ; বর্ত্তমানের ক্ষুদ্রতম ঘটনার সহিত অতীতের অঙ্কুর ও ভবিষ্যৎ পরিণতির সংযোগ তাঁহার চক্ষুর সমক্ষে সর্ব্বদাই দেদীপ্যমান। কিন্তু উপন্যাসের মানুষগুলি যখন আপন আপন কাহিনী বর্ণনা করিবার ভার লয়, তখন একটা অসুবিধা এই হয় যে বর্ত্তমানের আলোচনায় শেষকালের জ্ঞান তাহারা ধরিয়া লইবে কি না ; পদে পদে এরূপ ভবিষ্যৎ পরিণতির জ্ঞান ধরিয়া লইলে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের রস জমাট বাঁধিয়া উঠিতে পারে না, বর্ত্তমান বিপদ বর্ণনার সময় যদি আমি আসন্ন উদ্ধারের উল্লেখ করি, তাহা হইলে নাটকোচিত সুসঙ্গতির (dramatic fitness) হানি হয় ; আবার কেবল বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেই দৃষ্টি সীমাবদ্ধ করিলে, বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতের সহিত সংযুক্ত করিয়া না দেখাইলে চিত্র খণ্ডিত, আংশিক ও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই উভয় সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাওয়া খুব উচ্চাঙ্গের প্রতিভা ভিন্ন সুসাধ্য হইতে পারে না।

এইবার কতকগুলি বিশেষ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টীর আলোচনা করা যাউক। রজনীর উক্তিটী একেবারে আদ্যোপান্ত একটা গভীর ক্ষোভ ও খেদের সুরে পরিপূর্ণ ; তাঁহার প্রেম যে এরূপ আশাতীত সাফল্য লাভ করিবে, তৎসম্বন্ধে কোন পূর্ব্বজ্ঞান তাহার উক্তির মধ্যে পাওয়া যায় না। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে তাহার

দৃষ্টি—হীরালালের সহিত তাহার গৃহত্যাগ ও বিজন-গঙ্গা-সৈকতে তৎকর্ত্তৃক বিসর্জ্জন—ইহাতেই সীমা-বদ্ধ; তৎপরবর্ত্তী ঘটনা সম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞানের পরিচয় পাই না। রজনীর চক্ষে এইখানেই তাহার জীবন-নাট্যের যবনিকা-পতন; তাহার যাহা-কিছু খেদোক্তি, ও নৈরাশ্য ভাব, সৃষ্টি-বিধানের বিরুদ্ধে যাহা কিছু বিদ্রোহ-জ্ঞাপন, সমস্তই এই সময়ের মানসিক ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই বর্ত্তমানের প্রতি অখণ্ড মনোযোগ (concentration) নিশ্চয়ই আখ্যানের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে; বর্ণনার মধ্যে একটা উচ্ছ্বসিত ভাব প্রাবল্য আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু এইখানে দুই একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসঙ্গতিও আসিয়া পড়িয়াছে—ভবিষ্যতের বর্জ্জন লেখক যেরূপ সম্পূর্ণভাবে করিতে চাহিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই; রজনীর আখ্যায়িকার দুই একটী উপাদান ভবিষ্যৎ হইতে আহরণ করিতে হইয়াছে। যেমন হীরালালের অসচ্চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান। এইখানে রজনীর উক্তি এই :—"আমরা তখন হীরালালের চরিত্রের কথা সবিশেষ শুনি নাই, পশ্চাৎ শুনিয়াছি" (প্রথম খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ); এই পরবর্ত্তী জ্ঞান লাভ যে কখন হইল, হীরালালের জীবনীর সহিত বিস্তৃত পরিচয় যে কিরূপে সম্ভব হইল—যদি গঙ্গাতীরে বিসর্জ্জনই রজনীর জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত বলিয়া মনে করি তাহা হইলে—এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর দেওয়া যায় না। অবশ্য এই ঘটনার পূর্ব্বে হীরালালের অসচ্চরিত্র সম্বন্ধে রজনীর প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ হইয়াছিল, এই কথা বলিলে কোন দোষ হইত না; কিন্তু "পশ্চাৎ শুনিয়াছি" এই কথা স্বীকার করিলে, ও হীরালালের অতীত জীবনের বিস্তৃত কাহিনী সংগ্রহ করিলে বর্ত্তমানের সীমা রেখা অতিক্রম করিতে হয়, ও যে ভবিষ্যৎকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিতে যাওয়া হইয়াছিল, তাহারই আশ্রয় লইতে হয়। সেইরূপ প্রথম খণ্ড অষ্টম পরিচ্ছেদে "কিন্তু এ যন্ত্রণাময় জীবন-চরিত আর বলিতে সাধ করে না। আর একজন বলিবে।" এই উক্তিই ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করে বলিয়া রজনীর মুখে সুসঙ্গত হয় নাই। আবার রজনীর নিজ অন্ধত্ব সম্বন্ধে যে খেদোক্তি, আলোকের ধারণা পর্য্যন্ত করিতে তাহার অক্ষমতাও সম্পূর্ণভাবে বর্ত্তমানেই সীমাবদ্ধ করিতে হইবে; নচেৎ তাহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টিলাভের সহিত এ অংশের সমন্বয় করা কঠিন হইবে। যদিও অন্ধের আত্ম-বিশ্লেষণ কলা-কৌশল ও কল্পনা-সমৃদ্ধির দিক্ হইতে প্রায় অনবদ্য হইয়াছে, তথাপি একটী ক্ষুদ্র চ্যুতি বঙ্কিমের সূক্ষ্ম দৃষ্টিকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে—যথা হীরালাল সম্বন্ধে রজনীর উক্তি—"হীরালাল তৎকালে ভগ্ন-মনোরথ হইয়া ঘরের এদিক্ সেদিক্ দেখিতে লাগিল"—এ তথ্য আবিষ্কার যে অন্ধের ক্ষমতাতীত, সে বিষয়ে চক্ষুষ্মান্ গ্রন্থকারের মুহূর্ত্তজন্য আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছিল।

অমরনাথের উক্তির প্রারম্ভেই তাহার অতীত জীবনের যে একমাত্র গুরুতর পদস্খলন তাহার উল্লেখ আছে এবং এই পদস্খলনের পরে তাহার মানসিক পরিবর্ত্তনের জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে নূতন ধারণার বিস্তৃত বিবরণ আছে; তাহার প্রকৃতির বিশেষত্বটুকু নির্দ্দেশ করিবার জন্য এই আখ্যায়িকাবহির্ভূত অতীত ঘটনার উল্লেখের প্রয়োজন। কিন্তু তাহার উক্তির সময় অমরনাথ সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমানেই

বদ্ধলক্ষ্য; ভবিষ্যৎ পরিণতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সে প্রতিদিনকার ঘটনা, দৈনন্দিন আশা-নৈরাশ্যের ঘাত-প্রতিঘাত বর্ণনা করিয়া গিয়াছে; রজনীকে পত্নীরূপে পাইবার সম্ভাবনায় তাহার মনে যে অভাবনীয় পুলক-সঞ্চার হইয়াছে; এবং ইহার পরেই যে অপ্রত্যাশিত নৈরাশ্য আসিয়া তাহার হৃদয়কে গাঢ়তর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়াছে, এই উভয় দৃশ্যই খুব বিশদ ও জীবন্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শচীন্দ্রের উক্তি মধ্যে কেবলমাত্র এক স্থানে ভবিষ্যতের পূর্ব্বজ্ঞান সূচিত হইয়াছে—"দ্বিতীয়তঃ, যে অন্ধ, সে কি প্রণয়াসক্ত হইতে পারে? মনে করিলাম, কদাচ না। কেহ হাসিওনা, আমার মত গণ্ডমূর্খ অনেক আছে।" (তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ) কিন্তু অন্য সর্ব্বত্রই কেবল বর্ত্তমানের ঘটনাস্রোতই বর্ণিত হইয়াছে; বিশেষতঃ রজনীর প্রতি তাহার প্রথম দয়া ও সহানুভূতি, তাহার প্রেমে ঔদাসীন্য ও এমন কি বিরক্তির ভাবও যথাযথ প্রকাশিত হইয়াছে; ভবিষ্যৎ প্রেমের ছায়া পড়িয়া ইহার তীব্রতাকে হ্রাস করিয়া দেয় নাই। তাহার পীড়িতাবস্থায় উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তের মধ্যে রজনীর প্রতি প্রেম কিরূপে বদ্ধমূল হইল তাহার একটী সুন্দর, উচ্ছ্বাসময় বর্ণনা বঙ্কিম শচীন্দ্রের মুখে দিয়াছেন: এবং এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের যতটুকু মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব, তাহা দুই এক পরিচ্ছেদ পরেই সন্ন্যাসীর নিকট পাওয়া যাইতেছে। অবশ্য ইহা ঠিক যে শচীন্দ্রের মনোভাব পরিবর্ত্তনের যাহা মূল কারণ, তাহা অতি-প্রাকৃতের রাজ্য হইতে আসিতেছে, বাস্তব জগতের বিশ্লেষণ প্রণালী তাহার উপর প্রযোজ্য নহে। উপন্যাসের দিক হইতে ইহাকে গ্রন্থের একটী অপরিহার্য্য ত্রুট বলিয়াই ধরিতে হইবে। বঙ্কিম রোমাণ্টিক যুগের লেখক, এবং তাঁহার সময় বাস্তব প্রণালী উপন্যাস ক্ষেত্রে তখনও নিজ আধিপত্য বিস্তার করে নাই; সুতরাং তিনি রোমান্সের সমস্ত conventions, সমস্ত সংস্কার ও ধারণাগুলি অবলীলাক্রমে, অসঙ্কুচিতভাবে উপন্যাসে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে একদিকে ক্ষতি হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু অন্যদিকে যে লাভ হইয়াছে তাহাও সামান্য নহে। রোমান্সের আবেগ ও উচ্ছ্বাস, দীপ্তি ও গৌরব আমাদের সাহিত্যে এত সুপ্রচুর নহে, যে উপন্যাস ক্ষেত্র হইতে ইহাকে একবারে বর্জ্জন করিতে পারি। তবে গ্রন্থ শেষে রজনীর অন্ধত্ব আরোগকাহিনীটী রোমান্সের অভাবনীয় বৈচিত্র্যের নিকট ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের সম্পূর্ণ ও অনুচিত আত্ম-সমর্পন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

উপন্যাসের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের মধ্যে আখ্যায়িকা-বর্ণনের ভার বাঁটিয়া দিলে, আর একটী অসুবিধা আছে—উপন্যাসের গতি পদে প্রতিহত ও মন্থর হইয়া থাকে। একই ঘটনা বিভিন্ন লোকের চক্ষু দিয়া আলোচিত হয়; একই ব্যাপার সম্বন্ধে অনেকের মত লিপিবদ্ধ করিতে হয়; সুতরাং পুনরুক্তি দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। বঙ্কিম তাঁহার ঘটনাবিন্যাসের কৌশলে এই দোষ অনেকটা খণ্ডিত করিয়াছেন। তিনি এমনই সুকৌশলে বক্তাদিগের ক্রম-নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, যে গল্পের অগ্রগতি কোথায়ও নিশ্চল হয় নাই। যে যে অংশের প্রধান নায়ক, তাহারই মুখে সেই অংশ বিবৃত করার ভার অর্পিত হইয়াছে। রজনীর গঙ্গা-গর্ভে নিমজ্জনের পর ঠিক তাহার উদ্ধারকর্ত্তা

অমরনাথের উক্তি আরম্ভ; আবার অমরনাথের দ্বারা রজনীর বিষয় উদ্ধারের উপায় স্থিরীকৃত হইবার অব্যবহিত পরেই শচীন্দ্রকে বক্তা করা হইয়াছে। রজনীকে পুনর্ব্বার পাওয়ার পর শচীন্দ্রদের সহিত তাহার পিতা মাতার পরিবর্ত্তিত আচরণ ও তাহার সম্পত্তি উদ্ধারের কাহিনী শচীন্দ্রের দ্বারাই বর্ণিত হইয়াছে। তারপর শচীন্দ্রের অনিচ্ছা সত্বেও রজনীকে বধূ করিতে কৃতসংকল্পা লবঙ্গলতার উক্তি আরম্ভ ও রজনীকে লইয়া অমরনাথের সহিত তাহার চাতুর্য্যপরীক্ষা। এইখানে নাটকীয় ভাব খুব ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে. এবং সেই জন্য প্রায় প্রতি দৃশ্যেই বক্তার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। এই চাতুর্য্যযুদ্ধে অমরনাথের মহানুভবতার নিকট লবঙ্গলতার পরাজয় ঘটিয়াছে। এখানে আবার শচীন্দ্র রজনীর প্রতি বদ্ধমূল অনুরাগের নিদর্শন দেখাইয়া ব্যাপারটিকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছেন; রজনী এমন কেবল একটা যুদ্ধ-জয়ের উপভোগ্য ফল মাত্র নহে; শচীন্দ্রের জীবনরক্ষার জন্য সে এখন অবশ্য-প্রয়োজনীয়া, উপন্যাসে তাহার মূল্য এখন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এইখানে রজনীও প্রেমাস্পদের অবস্থা দর্শনে অত্যন্ত কাতর হইয়া তাহার সংযম ও আত্মদমন শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে, ও অমরনাথের পূর্ব্ব ভ্রমস্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে শচীন্দ্রের প্রতি নিজ প্রবল অনুরাগের কথা প্রকাশ করিয়াছে। রজনীর এই স্বীকারোক্তিই উপন্যাসের সমস্যার সমাধান করিয়াছে, লবঙ্গের অশ্রুজলে সিঞ্চিত হইয়া ইহা অমরনাথের মহানুভব হৃদয়ের উপর সম্পূর্ণ বিজয় লাভ করিয়াছে; লবঙ্গ চাতুরী ও ভয় প্রদর্শনে যাহা পারে নাই তাহা অশ্রুজলে ও কাতরতায় নায়িকার প্রেমাভিব্যক্তিতে সহজেই সিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর উক্তি দিয়া উপন্যাসটী বেশ সহজ অপ্রতিহত গতিতে পরিণতির দিকে চলিয়াছে, এবং প্রত্যেক নূতন চরিত্রের আত্ম-বিশ্লেষণের জন্য দুই একটী পরিচ্ছেদ ঘটনাস্রোতে বাধা প্রদান করিলেও মোটের উপর উপন্যাসের অগ্রগতি ব্যাহত হয় নাই। গঠন-কৌশলের দিক দিয়া রজনীতে বঙ্কিমের কৃতিত্ব সামান্য নহে।

'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—এই দুইখানিই বঙ্কিমের প্রকৃত পূর্ণাবয়ব সামাজিক উপন্যাস; এই দুইখানি উপন্যাসই গভীর-রসাত্মক, ও উভয়েই বিষাদময় পরিণতি। উভয় উপন্যাসেই বিপৎপাতের মূল কারণ অনিবার্য্য রূপতৃষ্ণা, রমণীরূপ-মুগ্ধ পুরুষের প্রবৃত্তিদমনে অক্ষমতা। উভয়ত্রই বঙ্কিম এই অন্তর্বিরোধের চিত্র খুব সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত, একটা গভীর অথচ সংযত ভাব-প্রাবল্যের সহিত চিত্রিত করিয়াছেন; একটা ঘটনা-বহুল, রস-বৈচিত্র্য পূর্ণ নাটকের দৃশ্যের ন্যায় এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের উৎপত্তি বিবৃদ্ধি ও পরিণতির ক্রমপর্য্যায় আমরা রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে অনুসরণ করি: যে সমস্ত দুর্ণিবার শক্তি আমাদের এই আপাত-নিশ্চল জীবনকে চালিত করিতেছে, তাহার প্রচণ্ড গতিবেগ আমাদের হৃদয়-স্পন্দনের মধ্যে অনুভব করি। বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাসে যে একটী ক্রীড়াশীল পরিহাসময় চিত্তবৃত্তির পরিচয় পাই, যাহা বসন্ত-পবনের মত মানবের উপরিভাগের বৈচিত্র্য স্পর্শ করিয়া যায়; হৃদয়মূলে যে অতল-গভীর জলাশয় আছে, তাহার উপরে একটা ক্ষণস্থায়ী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে, এবং যাহা অনুকূল দৈবের ন্যায় হঠাৎ একমুহূর্ত্তে জীবনসূত্রের গ্রন্থিসঙ্কুলতাকে টানিয়া সরল করে; শেষমুহূর্ত্তে বিরোধশান্তি

করিয়া দুর্ভাগ্যের মেঘপুঞ্জকে এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া প্রেমিক প্রেমিকার মিলন ঘটায়, বা যেখানে বিষাদময় পরিণতি অপরিহার্য্য, সেখানেও একটা আদর্শ, কল্পনাসুলভ জ্যোতির্ম্মণ্ডলের মধ্যে মৃত্যুশয্যা বিছাইয়া দেয়,এই দুইখানি উপন্যাসে আমরা সেই ভাব-বিলাসের অনেকটা সঙ্কুচিত অবস্থাই দেখিতে পাই। এখানে বঙ্কিম মানব হৃদয়ের গভীর-স্তরে অবতরণ করিয়াছেন, সত্যের নগ্নমূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন, দুর্জ্জেয় ভাগ্যবিধাতা মানবের মর্ম্মের মধ্য দিয়া যে গভীর-কৃষ্ণ অথচ রক্ত-রঞ্জিত নিয়তির রেখাটী টানিয়া দেন, তাহার গতি-রহস্যটি খুব সূক্ষ্মভাবে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য এখানেও বঙ্কিমের প্রকৃতিসুলভ হাস্য-পরিহাসের ও লঘুস্পর্শের অভাব নাই; বিষাদময় ট্রাজেডির মধ্যেও মানবমনের লঘু-তরল বিকাশগুলির, জীবনের অহেতুক বৈচিত্র্য ও বিসর্পিতগতির চিত্র দিতে তিনি ক্ষান্ত হন নাই; তিনি জীবনকে একটা অবিচ্ছিন্ন ধূসর বা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করেন নাই, তাহার মধ্যে আলো-ছায়ার যথাযথ বিন্যাস করিয়াছেন। কিন্তু এই দুইখানি উপন্যাসে বঙ্কিম-প্রকৃতির লঘুতর উপাদানগুলি অনেকটা সংযত ও সঙ্কুচিত হইয়া এই মেঘাচ্ছন্ন আকাশতলে নিজ ন্যায্য-স্থানই অধিকার করিয়াছে।

'বিষবৃক্ষ'ও সম্পূর্ণরূপে অতি-প্রাকৃতের স্পর্শশূন্য নহে; কুন্দের দুইবার স্বপ্নদর্শন বাস্তব উপন্যাসের মধ্যে অতিপ্রাকৃতে অনুরাগের চিহ্ন-স্বরূপ বিদ্যমান। কিন্তু ইহা গ্রন্থের কেন্দ্রগত বিষয় নহে। গ্রন্থের কেন্দ্রগত বিষয় হইতেছে আত্মসংযমে অক্ষম নগেন্দ্রনাথের রূপমোহ, ও এই অসংযম-প্রবৃত্তির ফলে নগেন্দ্র, কুন্দনন্দিনী ও সূর্য্যমুখী তিনটী জীবনে একটা দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি, তিনটী জীবন-সমুদ্র-মন্থনে হলাহলোৎপত্তি। নগেন্দ্রনাথের পাপ প্রলোভনের ক্রমপরিণতির চিত্রটী বঙ্কিম খুব সুকৌশলে অঙ্কন করিয়াছেন, কিন্তু আধুনিক বাস্তবতা-প্রধান ঔপন্যাসিকদের অতিরিক্ত তথ্যভারাক্রান্ত প্রণালী অনুসরণ করেন নাই। স্বল্প কয়েকটী রেখাপাতে, অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত ও আভাসের দ্বারা, আখ্যায়িকার মধ্য দিয়াই চিত্ত-বিক্ষোভের চিত্রটী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপারের দীর্ঘ বিশ্লেষণের দ্বারা বর্ণনাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলেন নাই। কমলমণির প্রতি সূর্য্যমুখীর পত্রে এই চিত্ত-বিকারের প্রথম উল্লেখ নাই: তখনও নগেন্দ্র প্রাণপণে প্রলোভনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন, অন্তরের গভীর স্তরে তাহাকে চাপিয়া রাখিয়াছেন, বাহ্য ব্যবহারে প্রস্ফুট হইতে দেন নাই; কেবল এক স্নেহময়ী পত্নীর অসাধারণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিই এই নূতন ভাব-পরিবর্ত্তনের ঈষৎ আভাস পাইয়াছে। সূর্য্যমুখীর পত্রে এই বিকারের প্রথম পরিচয় দিয়া বঙ্কিম তাঁহার চিত্রকে কলাকৌশলের দিক্ হইতে এক অপূর্ব্বসুসঙ্গতি ও শোভনত্ব দিয়াছেন। তৎপর-পরিচ্ছেদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিনটী ঘটনার দ্বারা নগেন্দ্রের চিত্তবিকারের প্রথম বাহ্য-বিকাশগুলি অতি সুন্দররূপে ও অদ্ভুত কলা-সংযমের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। এদিকে কমলমণির সহানুভূতি-মিশ্র সূক্ষ্মদর্শিতা কুন্দনন্দিনীর গোপন প্রেমের রহস্যটী আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। তাহার পর ষোড়শ-পরিচ্ছেদে প্রেম-ক্লিষ্টা সরলা বালিকা-স্বভাবা কুন্দনন্দিনীর চিত্ত-ধারার বিশ্লেষণ করা হইয়াছে; এবং নগেন্দ্র ও কুন্দ-নন্দিনীর প্রথম মুখোমুখি সাক্ষাৎ, ও নগেন্দ্রের অপরিমিত প্রেমোচ্ছ্বাসের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই সাক্ষাতের ফলে, কুন্দনন্দিনীর সলজ্জ প্রত্যাখ্যানসত্ত্বেও উভয়েরই মনোভাব

যে আরও প্রবল ও দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা হীরা কর্ত্তৃক হরিদাসীবৈষ্ণবীর স্বরূপ আবিষ্কার; তাহার ফলে কুন্দের চরিত্রে সন্দেহ, সূর্য্যমুখী কর্ত্তৃক তাহার তিরস্কার ও অভিমানিনী কুন্দনন্দিনীর গৃহত্যাগ। এই গৃহত্যাগের ফলে উভয়েরই প্রণয় আরও উচ্ছ্বসিত ও অপ্রতিরোধনীয় হইয়া উঠিল; অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে বঙ্কিম উচ্ছ্বাসময়, কবিত্বপূর্ণ ভাষাতে কুন্দের অনিবার্য্য প্রেমপিপাসা বিশ্লেষণ করিয়াছেন; এদিকে নগেন্দ্র যখন হীরার মুখে সূর্য্যমুখীর তিরস্কারের জন্য কুন্দের গৃহত্যাগের সংবাদ পাইলেন, তখন তাঁহার কষ্ট-সংযত প্রেম সকল বাধা-বন্ধন ছিন্ন করিয়া একেবারে প্রকাশ্যভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিল; এই কঠোর আঘাতে সূর্য্যমুখী-নগেন্দ্রের মধ্যে যে সম্ভ্রম-সঙ্কোচের একটা সূক্ষ্ম পর্দ্দার ব্যবধান ছিল, তাহা ছিঁড়িয়া গেল। নগেন্দ্র অতি কঠোর-নীরস ভাবে, নিতান্ত হৃদয়হীনের ন্যায়, সূর্য্যমুখীর নিকট নিজ বহ্নিজ্বালাময় বাসনার কথা প্রকাশ করিলেন, এবং কুন্দনন্দিনী সম্বন্ধে তাঁহার শেষ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। এই বিরহ-কালের অবসান হইল কুন্দের অনিবার্য্য প্রণয়-প্রণোদিত প্রত্যাবর্ত্তনে; সূর্য্যমুখী প্রত্যাগতা পলাতকাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন ও স্বামির সহিত তাহার বিবাহের উদ্যোগ করিয়া শুভকার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। এইখানে বিষবৃক্ষের একপর্ব্ব শেষ হইল; উদ্দাম বাসনা সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিল; এইবার ধীরে সুস্থে ফলভোগের পালা আরম্ভ হইল। প্রবল ক্রিয়ার স্বাভাবিক ফলই প্রবল প্রতিক্রিয়া।

এই প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রথম আত্মবিসর্জ্জন দিল সূর্য্যমুখী; কমলমণির আগমনের পর সূর্য্যমুখী কমলমণির নিকট স্বামীর ব্যবহারে নিজ গম্ভীর মনোবেদনার পরিচয় দিলেন, ও প্রত্যাখ্যানের অসহ্য দুঃখবশে গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন। সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগেই নগেন্দ্রের ক্ষণস্থায়ী সুখ-স্বপ্ন ভগ্ন হইল; কুন্দনন্দিনীর প্রতি অগাধ অপরিমিত প্রেম এক মুহূর্ত্তেই তীব্র বিরক্তি ও বিতৃষ্ণাতে বিস্বাদ হইয়া গেল; কুন্দের মৌন ভাব, সরস বাক্‌পটুতার অভাব, নিরুদ্ধপ্রকাশ প্রেম নগেন্দ্রের উদ্বেল বুভুক্ষিত হৃদয়কে পরিতৃপ্ত দিতে পারিল না; কুন্দের নিজের আশাতীত আনন্দের মধ্যেও অনুশোচনার বৃশ্চিক দংশন অনুভূত হইতে লাগিল। বিষ-বৃক্ষের ফলাস্বাদনের পর প্রথম অনুভূতি হইল যে সকল সুখেরই সীমা আছে। তারপর নগেন্দ্র হরদেব ঘোষালের পত্রে কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের প্রেম বিশ্লেষিত হইয়া একটা বিরাট ভ্রান্তি, একটা অধম রূপজ মোহের পর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, আদর ও মিষ্ট কথার পরিবর্ত্তে ভর্ৎসনা, তিরস্কারই কুন্দের নিত্য ভোগ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে; মুহূর্ত্তের জন্য মেঘাবৃত সূর্য্যমুখীর প্রতি প্রেম আবার দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মাত্র পনর দিনের মধ্যেই এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে—যে প্রেমসিন্ধু উদ্বেল ও কুলপ্লাবী হইয়া সমাজ, ধর্ম্ম, কর্ত্তব্যজ্ঞান সকলকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহা প্রবলতর বিরুদ্ধ শক্তির আকর্ষণে নিমেষে শুকাইয়া গেল; আবার সূর্য্যমুখীর প্রেমের শুষ্ক খাতে পুনরায় প্রথম জোয়ারের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ আসিয়া পড়িল। বঙ্কিমচন্দ্র দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদের শেষভাগে কয়েকটী অসাধারণ সৌন্দর্য্যপূর্ণ মহাকাব্যোচিত তুলনার দ্বারা পাঠকের মনে এই শোকপূর্ণ পরিবর্ত্তনের চিত্রটী গভীরভাবে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন।

নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে ত্যাগ করিয়া বিদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; এদিকে সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের নিকট প্রত্যাগমনের পথে সঙ্কটাপন্ন রোগে পীড়িত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন হইলেন এবং শীঘ্রই তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ নগেন্দ্রের নিকট পৌছিল। এই মৃত্যুসংবাদে নগেন্দ্রের মনে যে অনুতাপানল জ্বলিতে লাগিল, তাহাতেই তাহার পূর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। বঙ্কিম অসাধারণ শক্ত ও কবিজনোচিত সূক্ষ্ম দৃষ্টির সহিত নগেন্দ্রের এই অনুতাপ ও আত্মগ্লানি চিত্রিত করিয়াছেন। নগেন্দ্র তাঁহার বিষয় সম্পত্তির শেষ ব্যবস্থা করিবার ও গার্হস্থ্য জীবনের নিকট চির বিদায় লইবার জন্য নিজগ্রামে ফিরিবার ঠিক পূর্ব্বেই এক পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার আমাদিগকে অভাগিনী, স্বামি-পরিত্যক্তা কুন্দনন্দিনীর অন্তরের নীরব যন্ত্রণার নৈরাশ্যে পূর্ণ ব্যথার একটী ক্ষুদ্র চিত্র দিয়াছেন। বিষবৃক্ষের ফল কুন্দকেও যথেষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। তারপর নগেন্দ্রের গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনের পর 'স্তিমিত প্রদীপে' নামক পরিচ্ছেদে লেখক নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর পূর্ব্ব প্রণয়ের যে উচ্ছ্বসিত, আবেগময় কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন, যে দুই তিনটী সুনির্ব্বাচিত আখ্যানের দ্বারা তাহাদের প্রেমের গাঢ়তা ও সর্ব্বাঙ্গীন একাত্মতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহা কলাকৌশল ও কবিত্ব শক্তির দিক্ হইতে সাহিত্য ক্ষেত্রে অতুলনীয়। এই করুণ পূর্ব্বস্মৃতি পর্য্যালোচনার মধ্যে, এই তীব্র আত্মগ্লানির বৃশ্চিক দংশনের মধ্যে বঙ্কিম পুনর্জ্জীবিত সূর্য্যমুখীকে আনিয়া দিয়া ও নগেন্দ্রের সহিত তাহার পুনর্ম্মিলন ঘটাইয়া একটী আনন্দপূর্ণ, অথচ সম্পূর্ণ কলাকৌশলসম্মত অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের (surprise) সংঘটন করিয়াছেন।

কিন্তু ট্রেজেডির অধিষ্ঠাত্রী দেবী এই অপ্রত্যাশিত আনন্দের সুরে আখ্যায়িকাটী শেষ হইতে দিলেন না; এবং তাঁহার নির্ম্মম বিচারে একটী বলিদানের প্রয়োজন হইল, এবং চির-উপেক্ষিতা, অভাগিনী কুন্দনন্দিনীই এই কার্য্যের জন্য নির্ব্বাচিত হইল। বিষবৃক্ষের ফল এতদিনে সত্যসত্যই গরল উদ্গীরণ করিল; এবং নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানের ন্যায় গ্রন্থকারের কার্য্য-করণ-শৃঙ্খলার অমোঘ সন্ধি-বন্ধনে এই গরল কুন্দনন্দিনীরই উদরস্থ হইল। কিন্তু যে তরঙ্গ আসিয়া কুন্দকে মৃত্যুর অতল গহ্বরে ভাসাইয়া লইয়া গেল, তাহা তাহার কোমল লজ্জা-সঙ্কুচিত হৃদয়ের নিজ প্রেরণা হইতে আসে নাই; তাহা নিকটবর্ত্তী একটী পঙ্কিল আবর্ত্ত হইতে ঈর্ষ্যা ফেনিল প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসের রূপেই তাহার উপরে আপতিত হইল। বাস্তবিকই বঙ্কিম সুনিপুণ মালাকারের ন্যায়, অসাধারণ কৌশলের সহিত কুন্দ-নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর অপেক্ষাকৃত উন্নত ও গভীর প্রেমের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের সঙ্গে আর একটী কলঙ্কিত অথচ মনোবৃত্তির নিগূঢ়-লীলা-বিচিত্র প্রণয় কাহিনী একই সূত্রে গাঁথিয়াছেন, এবং এই দুইটী স্বতন্ত্র ব্যাপারের মধ্যে একটী ঘনিষ্ঠ ও জীবন্ত সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছেন। হীরা উপন্যাসের villain; গ্রন্থের প্রধান পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে যেখানে হৃদয়ের অসংযত উদ্দাম প্রবৃত্তির জন্যই অগ্নি জ্বলিয়াছে, সেই খানেই হীরা বাহির হইতে সেই অগ্নি বিস্তারে সহায়তা করিয়াছে, অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইয়াছে। সে-ই সূর্য্যমুখী-নগেন্দ্রের মধ্যে শেষ বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে; সে-ই মর্ম্মপীড়িতা কুন্দনন্দিনীর নিকট আত্মহত্যার মন্ত্রণা ও অস্ত্র পৌছাইয়া দিয়া, ট্রাজেডির শেষ দৃশ্যের জন্য আপনাকে দায়ী করিয়াছে। প্রকৃত

জগতেও এইরূপ অন্তর ও বাহ্য শক্তির সম্মিলনেই আমাদের মনোরাজ্যে গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হয়; হৃদয়-কন্দরে যে বহ্নি প্রধূমিত হইতে থাকে, বাহিরের ফুৎকারেই তাহা প্রবল ও প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে। কিন্তু হীরা কেবল পরের অগ্নিতেই ইন্ধন যোগাইয়া আসে নাই, তাহা হইলে সে উপন্যাসের মধ্যে একটা অপ্রয়োজনীয়, বাহিরের জীবমাত্র হইত। তাহার নিজের হৃদয়ে যে আগুন জলিয়াছে, তাহা হইতেই একটা প্রজ্বলিত শলাকা লইয়া সে অন্যের ঘরে আগুন দিয়াছে; নিজের অন্তরস্থ বহ্নিপ্রাচুর্য্য হইতেই তাহার চতুর্দ্দিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়াছে। ইহাই আর্টিষ্টের কৃতিত্ব; তিনি হীরাকে একটা secondary বা গৌণ চরিত্রের পর্য্যায়ে ফেলেন নাই, নগেন্দ্রসূর্য্যমুখীর সৌর জগতের দূরপ্রান্তস্থিত একটা ক্ষীণপ্রভ উপগ্রহ মাত্র করেন নাই; তাহার উপর ধূমকেতুর প্রচণ্ড গতিবেগ ও করাল দীপ্তি আনিয়া দিয়াছেন; নিজের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জগতে তাহাকে নায়িকা করিয়াছেন; আর একটা ঘূর্ণায়মাণ, গতি-বেগ-চঞ্চল জগতের কেন্দ্র-শক্তির পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। হীরাদেবেন্দ্রের কলঙ্কলাঞ্ছিত ইন্দ্রিয়সুখপ্রধান প্রণয়-কাহিনীটীও বঙ্কিম তাঁহার অভ্যস্ত সংযম ও মিতভাষিতার সহিত কয়েকটী অর্থপূর্ণ আভাস ও সুদূরপ্রসারী ইঙ্গিতের দ্বারাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; পাপ সম্বন্ধে বঙ্কিমের একটা সহজ সঙ্কোচ, একটা স্বাভাবিক বিমুখতা ছিল; সুতরাং কোথাও তিনি ইহার সবিস্তার বর্ণনা করেন নাই, আধুনিক বাস্তব লেখকদের ন্যায় প্রতিদিনকার গ্লানি ও কলঙ্কচিহ্ন পুঞ্জীভূত করিয়া চিত্রকে মসীময় করিয়া তোলেন নাই, সর্ব্ববিধ detail সযত্নে বর্জ্জন করিয়াছেন। কেবল পদস্খলনের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাগুলিকে, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও প্রাণপণ প্রলোভন-দমনের চেষ্টাটীকে, সুরুচি ও রসজ্ঞানের নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে, ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন; পাপের পঙ্কিল প্রবাহের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বীচিবিক্ষেপ, প্রত্যেক ক্ষণস্থায়ী আবর্ত্ত সৃজন অনুসরণ করেন নাই; কেমন করিয়া এই নদী ধীরে ধীরে তাহার প্রথম দুর্দ্দমনীয় গতিবেগ হারাইয়া, মন্থর-গামিনী হইয়াছে, এবং ক্রমশঃ অবিমিশ্র পঙ্কিলতার মধ্যে তাহার সমস্ত জলকল্লোল ও অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ লুকাইয়া ফেলিয়া একটা দুর্গন্ধময় কর্দ্দম ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, সেই ক্রমপরিণতির বিস্তারিত বিবরণ দিতে নিজেকে সম্মত করিতে পারেন নাই; কেবল স্বল্পকালব্যাপী চেষ্টার পর এই পাতাল প্রবাহিনীকে সূর্য্যালোকে তুলিয়া, তাহার পর এক অবিশ্রান্ত দ্রুতগতিতে তাহাকে মরণের উপকূলে লইয়া গিয়া প্রায়শ্চিত্তপর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে মৃত্যুর অতল শূন্যতার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছেন, পতনের প্রতিধ্বনি আমাদের কাণে বাজিতে থাকে, একটা প্রাণবেগচঞ্চল বিপুল শক্তির অতর্কিত অন্তর্দ্ধানের বিরাট শূন্যতায় আমাদের চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে; কিন্তু এই শক্তির প্রতিদিনকার ক্রিয়া লেখক আমাদিগকে দেখিতে দেন না। এই সমস্ত মন্তব্য হীরার ক্ষেত্র অপেক্ষা গোবিন্দলাল-রোহিণীর চিত্র সম্বন্ধে আরও অধিকতর প্রযোজ্য; তাহাদের পাপ-প্রণয়ের কোন বিস্তৃত বিবরণ আমরা পাই না; প্রসাদপুরের বিজন প্রাসাদে যে শেষ দিনের চিত্রটী আমরা পাই, তাহার উপর আগন্তুক বিপৎপাতের একটা পাণ্ডুর ছায়া পড়িয়াছে; প্রথম স্রোতোবেগ মন্দীভূত হইয়া, শীর্ণকায়া চিত্রার মতই একটা আগতপ্রায় দুর্দ্দৈবের ম্লান স্বপ্ন দেখিতে

দেখিতে অনিশ্চয়ের উদ্দেশ্যহীন পথ ধরিয়া চলিয়াছে। রোহিনীর প্রণয়ের অতৃপ্ত যৌবন-পিপাসা অবিমিশ্র ভোগধারায় শান্ত হইয়াছে, এবং স্ত্রীলোকসুলভ কৌতুহল ও ধর্ম্মভয় বর্জ্জিতার মধুকরী বৃত্তি তাহাকে পাত্রান্তরাণ্বেষণের জন্য উন্মুখ করিয়াছে; গোবিন্দলালের প্রথম রূপমোহ অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, এবং নভেল পাঠ ও সঙ্গীতের ব্যবস্থা এই ক্ষীয়মান দীপশিখায় তৈলনিষেকের ন্যায়ই বিরক্তি বিমুখ মনকে সতেজ রাখিবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইয়াছে। সমস্ত দৃশ্যটী যেন একটি অনাগত বিপদের প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হইয়া আছে; এবং ভ্রমরের নামোচ্চারণমাত্রেই এই বাহ্য-বিলাস-ভারাক্রান্ত, কিন্তু অন্তঃজীর্ণ জীবন-যাত্রা যেন যাদুমন্ত্রবলে ইন্দ্রজালনির্ম্মিত প্রাসাদের ন্যায়ই শতধা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া বায়ুস্তরমধ্যে নিশ্চিহ্নভাবে মিলাইয়া গেছে। বঙ্কিম রোহিণী-গোবিন্দলালের প্রণয়-লীলা সম্বন্ধে প্রায় মৌণ রহিয়াছেন, কিন্তু ভ্রমরের দীর্ঘ সপ্তবৎসরব্যাপী অভিমান-দুর্ব্বিষহ প্রতীক্ষা একটু বিস্তারিত ভাবেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সুতরাং পাপের প্রতি বঙ্কিমের একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণার জন্যই হীরা ও দেবেন্দ্রের কলুষিত প্রণয়ের কোন detail আমরা পাই না; কিন্তু এই প্রণয়-কাহিনীর বিশেষত্বগুলি লেখক বেশ সূক্ষ্মদৃষ্টির সহিতই আলোচনা করিয়াছেন। হীরাচরিত্র বঙ্কিমের অপূর্ব্ব সৃষ্টি; তাহার চরিত্রের প্রথম লক্ষণীয় বস্তু হইতেছে ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের যে একটা গূঢ় অভিমান ও অকারণ বিদ্বেষ থাকে, তাহাই; হীরা সূর্য্যমুখী অপেক্ষা আপনাকে কোন অংশে হীন মনে করে না, সুতরাং ভগবানের যে ব্যবস্থায় সে দাসী ও সূর্য্যমুখী প্রভুপত্নী তাহার বিরুদ্ধে তাহার একটা চিরস্থায়ী অভিযোগ আছে। দেবেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে এই গূঢ় আত্মাভিমান ও কঠোর আত্মসংযম তাহাকে প্রেমের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ করিয়াছে; কিন্তু তাহার চরিত্রের মূলে একটা ধর্ম্মভীতিমূলক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল না; সুযোগ ও অবসরের অভাবই এ পর্য্যন্ত তাহাকে ধর্ম্মপথে স্থির রাখিয়াছিল। এমন সময় হরিদাসী বৈষ্ণবীর খোঁজে আসিয়া সে দেবেন্দ্রের সাক্ষাৎ লাভ করিল; এবং প্রথম দর্শন মাত্রেই যে প্রেমকে সে এতদিন অস্বীকার করিয়া আসিয়াছিল, সেই প্রেম তাহার দেব-মনকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিল। তাহার হৃদয়ে এই অতর্কিত প্রেমাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি জটিল আনুষঙ্গিক অবস্থাও তাহার চারিদিকে সৃষ্ট হইয়া উঠিল; প্রথম দেবেন্দ্র তাহাকে দাসী জ্ঞান করিয়াই কুন্দের প্রতি নিজ গোপন অনুরাগের কথা তাহার নিকট প্রকাশ করিল, এবং কুন্দ-প্রাপ্তিবিষয়ে তাহার সহায়তা প্রার্থনা করিয়া তাহার মনোমধ্যে একটা বিষম ক্রোধ ও কুন্দের প্রতি বিজাতীয় হিংসা জাগাইয়া তুলিল। তারপর ঘটনাক্রমে পলাতকা কুন্দ তাহারই গৃহে আশ্রয় লওয়ায়, একদিকে তাহার কুন্দের প্রতি হিংসা প্রবলতর হইবার সুযোগ পাইল, অপরদিকে সে কুন্দকে সূর্য্যমুখীর উচ্ছেদের জন্য শাণিত অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিবার সঙ্কল্প পোষণ করিতে লাগিল। অতঃপর সে সময় বুঝিয়া কুন্দ-অস্ত্র ত্যাগ করিয়া সূর্য্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদ সংঘটন করিল। এদিকে দেবেন্দ্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর ও জটিলতর হইয়া উঠিল; দেবেন্দ্র কুন্দের সন্ধানে তাহার গৃহে আসিয়া

একদিকে তাহার প্রণয়-স্বীকারের ও অপরদিকে তাহার আত্মসংযমে দৃঢ় সঙ্কল্পের পরিচয় লইয়া গেলেন: হীরা স্পষ্টই বলিল যে সে দেবেন্দ্রকে ভালবাসে, কিন্তু দেবেন্দ্রের নিকট প্রণয়ের প্রতিদান না পাইলে তাহাকে ধর্ম্মবিক্রয় করিবে না, দেবেন্দ্রও হীরার উপর তাঁহার অসীম প্রভাব আছে ও তাহাকে করধৃতপুত্তলিকার ন্যায় চালাইতে পারিবেন এই ধারণা লইয়া বাটী ফিরিয়া গেলেন; কিন্তু তিনি হীরার সম্পূর্ণ পরিচয় পান নাই। এই ভ্রান্তধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি আবার দত্তবাড়ী গেলেন ও হীরার নিকট আবার কুন্দ সম্বন্ধীয় দুঃসাহসিক প্রস্তাব করিয়া দ্বারবানহস্তে অপমানিত হইয়া ফিরিলেন। এই অপমানভোগের পর দেবেন্দ্র হীরার উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন, ও কপট-প্রণয়জালে শীঘ্রই লুব্ধচিত্তা ধর্ম্মভয়-হীনা হীরা-মক্ষিকাকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন; হীরার আত্মসংযমে ক্ষমতা ছিল, কিন্তু প্রবৃত্তি রহিল না। তারপর হীরার বিষবৃক্ষের ফল ফলিল—ধর্ম্মভ্রষ্টা হীরা দেবেন্দ্র কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত ও পদাঘাতে বিতাড়িত হইল—চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদে কয়েকটী বাক্যেই বঙ্কিম অসাধারণ দক্ষতার সহিত হীরার এই কলুষিত প্রণয়ের শেষ পরিণামটি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। অপমানিতা হীরা পদাহতা সর্পীর ন্যায়ই ফণা ধরিয়া উঠিল; তাহার আত্মহত্যার ইচ্ছা দেবেন্দ্র বা কুন্দকে বিষপ্রয়োগের দ্বারা হত্যার সঙ্কল্পে পরিণত হইল। একদিকে প্রবল নৈরাশ্যের আঘাত তাহাকে উন্মাদ-গ্রস্ত করিয়া তুলিল; অপর দিকে প্রকৃত সয়তানোচিত দুষ্টবুদ্ধি তাহাকে কুন্দের চরম দুঃখের মুহূর্ত্তে তাহাকে আত্মহত্যার মন্ত্রণা দিতে ও তাহার হাতের নিকট আত্মহত্যার অস্ত্র প্রস্তুত রাখিতে প্রণোদিত করিল। হীরার হৃদয়মন্থনজাত ঈর্ষা-ফেনিল বিদ্বেষ-হলাহলই সে কুন্দের মুখের নিকট আনিয়া ধরিল, এবং কুন্দ সেই বিষ পান করিয়াই মরিল। গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে আমরা দেখিতে পাই যে হীরার উন্মাদরোগ আরও ভয়ঙ্কর ও জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে; পূর্ব্বসুখস্মৃতি, অপমানের বৃশ্চিকদংশন, দেবেন্দ্র ও কুন্দের বিরুদ্ধে একটা অনির্ব্বাণ ক্রোধানল—সমস্ত তাহার বিকার-গ্রস্ত মনে একটা তুমুল কোলাহল তুলিয়াছে; এবং এই তুমুল কোলাহলকে ছাপাইয়া তাহার অতৃপ্ত প্রেমপিপাসা পূর্ব্বসুখস্মৃতির শরীর রন্ধ্রপথে ফুৎকার দিয়া এক বিষাদ-করুণ সুর তুলিয়াছে :—

"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।

এই সুরেই হীরার শেষ এবং সত্য পরিচয়—এই অতৃপ্ত বুভুক্ষার হাহাকারই তাহার ঈর্ষ্যা-দিগ্ধ, অভিমান-বিকৃত, বিদ্বেষক্রূর হৃদয়ের অন্তরতম বাণী।

অবশ্য উপন্যাসের মধ্যে প্রধান সমস্যা হইতেছে অনিন্দিত-চরিত্র, পত্নীবৎসল নগেন্দ্রের পদস্খলন; ইহার জন্য লেখক সন্তোষ-জনক কারণ দিয়াছেন কি না, ইহার উপযুক্ত ও পর্য্যাপ্ত বিশ্লেষণ করিয়াছেন কি না, তাহাই গ্রন্থসম্বন্ধে আমাদের প্রধান প্রশ্ন। কুন্দের সহিত নগেন্দ্রের যে প্রথম পরিচয় বা সম্পর্ক তাহা সম্পূর্ণ দয়ার ভিত্তির উপর স্থাপিত; কিন্তু এখানেও বোধ হয় একটা অস্বীকৃত প্রেমের ঘোর তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, ও দৃষ্টিকে বিহ্বল করিয়া তুলিতেছিল; গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নগেন্দ্র হরদেব ঘোষালকে রহস্যময়, সারল্যমণ্ডিত সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতেই মোহের প্রথম ও সূক্ষ্মতম কুহেলিকা-

জালের ইঙ্গিত পাওয়া যায়; পরবর্ত্তী ঘটনার আলোকে আমাদের সন্দেহ হয় যে এই সৌন্দর্য্য-বিচার ঠিক দার্শনিকের তত্ত্বজিজ্ঞাসা নহে; ইহার মধ্যেও বোধ হয় কোন ভবিষ্যৎ মোহের বীজ নিহিত আছে। সেই পরিচ্ছেদেই যখন নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর অনুরোধে কুন্দকে গোবিন্দপুর লইয়া গেলেন, তখন বঙ্কিম এই আপাত-সহজ ও স্বাভাবিক কার্য্যটীতেই বিষবৃক্ষের প্রথম বীজ রোপণের গুরুতর দায়িত্ব আরোপ করিয়াছেন। অনাথা বালিকার প্রতি দয়াপ্রকাশমাত্রই যদি বিষবৃক্ষের বীজ-রোপণ হয় তবে দয়াধর্ম্মকে মনুষ্যের কর্ত্তব্যতালিকা হইতে বিসর্জ্জন দিতে হয়; আর এই অমঙ্গলাশঙ্কা সত্য হইলে ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই; ইহা চাণক্যপণ্ডিতের সেই সনাতন সন্দেহনীতি—যাহাতে নারী ঘৃতকুম্ভ ও পুরুষ তপ্তাঙ্গারের সহিত উপমিত হয়—তাহারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। নগেন্দ্রের চরিত্রমধ্যে দুর্ব্বলতার বীজ নিহিত না থাকিলে এই দয়াপ্রকাশের ফল এত বিষম হইত না। সুতরাং উপন্যাসের ভবিষ্যৎ পরিণতিকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সন্দেহাতীত করিতে হইলে লেখককে নগেন্দ্রের এই প্রাথমিক দুর্ব্বলতার উপরই জোর দিতে হইবে, তাঁহার পদস্খলনের কেবল ঘটনামূলক নহে, মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দিতে হইবে। বঙ্কিম প্রথমতঃ কেবল ঘটনামূলক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, অর্থাৎ প্রেম-প্রকাশের পূর্ব্বলক্ষণ-গুলিই বিবৃত করিয়াছেন; সেগুলি কেন ঘটিয়াছিল তাহা বলেন নাই, বা নগেন্দ্রের চরিত্রগত কোন বিশেষ দুর্ব্বলতার সহিত সম্পর্কান্বিত করেন নাই। সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের পর উনবিংশ পরিচ্ছেদে একটী মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে—নগেন্দ্রের পূর্ব্বজীবনে কোন বিষয়ের অভাব হয় নাই বলিয়া তাঁহার চিত্তসংযমশিক্ষা হয় নাই; "অবিচ্ছিন্ন সুখ, দুঃখের মূল; পূর্ব্বগামী দুঃখ ব্যতীত স্থায়ী সুখ জন্মে না।" এই ব্যাখ্যাতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না, ইহা নীতিবিদের ব্যাখ্যা হইতে পারে, মনস্তত্ত্ববিদের নহে। আমরা আরও একটু ঘনিষ্ঠ ও নিকট সম্পর্কের নির্দ্দেশ চাহি; যেমন আকাশ হইতে জল হয় বলিলেই বারিপতনের উপযুক্ত কারণ নির্দ্দেশ করা হয় না, সেইরূপ নগেন্দ্রের চিত্তসংযম অভ্যাস হয় নাই বলিয়াই তাঁহার পদস্খলন হইল, এই অস্পষ্ট ও সাধারণ উক্তিতে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত হইতে পারে না। কেবল নগেন্দ্রের চিত্তসংযম অভ্যাস হয় নাই এই উক্তি যথেষ্ট নহে; তাঁহার পূর্ব্বজীবনের প্রকৃত কার্য্যকলাপের মধ্যে এই অসংযমের অঙ্কুরের আভাস দিতে হইত। অবশ্য ইহা সত্য যে বাস্তব জীবনে এরূপ অনেক অতর্কিত বিকাশ ও অপ্রত্যাশিত পরিণতির উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন চিকিৎসা-শাস্ত্র বলে যে অনেক সুস্থ ব্যক্তির দেহেও রোগের বীজাণু লুক্কায়িত থাকে, এবং উপযুক্ত অবসর পাইলে ফুটিয়া বাহির হয়, সেইরূপ আমাদের অন্তঃকরণেও অনেক গোপন দুর্ব্বলতার বীজ প্রোথিত আছে, বিশেষ প্রলোভনের সম্মুখীন না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা নিজেই তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকি। সুতরাং কেবল ঘটনা হিসাবে নগেন্দ্রের এই অতর্কিত পদস্খলনও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; তাঁহার অন্তঃকরণের রূপমোহ সম্বন্ধে তিনি নিজেও হয়ত অজ্ঞ ছিলেন, এবং এ তথ্য আবিষ্কার করিলেন তখনই, যখন তাঁহার অন্তরমধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ইতিপূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। হয়ত কুন্দনন্দিনীর সহিত সাক্ষাৎ না হইলে তাঁহার এই রূপমোহ সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত থাকিয়া যাইত, তিনি মৃত্যুপর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অনিন্দনীয় জীবন কাটাইয়া যাইতে পারিতেন। আমাদের অধিকাংশের জীবনেই আমরা কারণ হইতে

কার্য্যের দিকে যাই না; আমাদের সাধারণ গতি প্রায়ই বিপরীতমুখী—কার্য্যের প্রকাশ হইতে কারণের অন্ধকার গুহার দিকে। আমরা সকল সময় গাছ দেখিয়া ফল চিনি না; পরন্তু ফল হইতে গাছের অস্তিত্বের প্রথম নিদর্শন পাইয়া থাকি। কিন্তু এই যুক্তি, বাস্তব জীবনের অনুগামী হইলেও, ঔপন্যাসিকের পক্ষে খাটে না। নগেন্দ্র নিজের রূপমোহ সম্বন্ধে নিজে অজ্ঞ থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তার সেরূপ অজ্ঞতার কোন কৈফিয়ৎ নাই। আমরা স্বভাবতঃই আশা করিতে পারি যে ঔপন্যাসিক জীবনের যে খণ্ডাংশ তাঁহার বিষয়ের জন্য নির্ব্বাচন করিবেন, তাহার কোন রহস্যই তাঁহার নিকট গোপন থাকিবে না; তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রদের মনের প্রত্যেক অলি-গলির, প্রত্যেক অন্ধকার গুহার উপরই তিনি আলোক পাত করিতে পারিবেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্লেষণ এখানে আশানুরূপ গভীর হয় নাই। যখন আমরা নগেন্দ্রের অনিন্দনীয় চরিত্রের ও উচ্ছ্বসিত পত্নী-প্রেমের কথা আলোচনা করি, যখন সূর্য্যমুখীর অবিমিশ্র শ্রদ্ধা-ভক্তি-সমন্বিত প্রশংসাবাক্যগুলি আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হয়, তখন আমরা বুঝিতে পারি না যে তাঁহার কোন দুর্ব্বলতার রন্ধ্র পথ দিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে শনির প্রবেশ হইয়াছে। নগেন্দ্রের আদর্শ চরিত্রই তাঁহার পদস্খলনের সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের মনকে অবিশ্বাসী করিয়া তোলে।

এই বিষয়ে আর একটী ক্ষুদ্র প্রশ্নও আমাদের মনে স্বতঃই মাথা তুলিয়া উঠে। তাহা এই যে নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর মধ্যে এই বিচ্ছেদ-সংঘটনে সূর্য্যমুখীর কোন দোষ ছিল কি না। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ভ্রমরের অভিমানপ্রবণতা ও অন্যায় সন্দেহ গোবিন্দলালের পতনের দায়িত্বভার উভয়ের মধ্যেই ভাগ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু 'বিষবৃক্ষে' লেখক সূর্য্যমুখীকে একেবারে সম্পূর্ণ নিরপরাধ রাখিয়াছেন, এবং অধঃপতনের সমস্ত অবিভক্ত দায়িত্ব নগেন্দ্রের স্কন্ধেই ফেলিয়াছেন। এরূপ একপক্ষের দোষ বাস্তব জগতে যে বিরল ঘটনা তাহা নহে। তবে উপন্যাসে ইহা সূর্য্যমুখীর চরিত্র হিসাবে মুখ্যত্ব কতকটা হ্রাস করিয়া দিয়াছে; সে কেবল অনুকৃত অত্যাচারে উৎপীড়িতা বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য সূর্য্যমুখী যেরূপ উচ্ছ্বসিত, অপরিবর্ত্তিত পতিভক্তি, যেরূপ প্রতিবাদহীন মৌন গৌরবের সহিত এই বিপৎপাত স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তাহাতে তাহার চরিত্রের মাহাত্ম্য ও নিঃস্বার্থ প্রেম বেশ ভাল করিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। বোধ হয় একটু সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে সূর্য্যমুখীরও চরিত্রের মধ্যেই স্বামিপ্রেম হইতে বঞ্চিত হইবার কতকটা কারণ পাওয়া যাইতে পারে। বঙ্কিম একস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন যে সূর্য্যমুখী কিছু গর্ব্বিতস্বভাবা ছিলেন। স্বামীর সহিত ব্যবহারেও তাঁহার এই বিশেষত্বের, এই মৌন অহঙ্কারের, ধর্ম্মশীলা পতিগতপ্রাণা সাধ্বীর একটা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত গর্ব্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। সূর্য্যমুখী প্রথম হইতেই বুঝিয়াছে যে স্বামীর মন তাহার নিকট হইতে অপসৃত ও অন্যাসক্ত হইতেছে, কিন্তু সে কোথাও একমুহূর্ত্তের জন্যও স্বামীর অনুরাগ পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য নগেন্দ্রের নিকটে অধীর আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখায় নাই; কোন অনুরোধ-উপরোধের দ্বারা, কোন ভাব-বিলাস-মূলক নিবেদনের দ্বারা (sentimental appeal), পূর্ব্ব-প্রেমের দোহাই দিয়া স্বামীর পলাতক প্রেমকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করে নাই; কেবল কমলমণির নিকট রোদনের দ্বারা নিজ হৃদয়-ভার লঘু করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু নগেন্দ্রের নিকট

কর্ত্তব্যপরায়ণা স্ত্রীর স্থির মুখকান্তির রেখামাত্র বিচলিত হইতে দেয় নাই। মনের পাষাণভার চাপিয়া রাখিয়া অকম্পিত হস্তে নিজের বধদণ্ডাজ্ঞায় নিজেই স্বাক্ষর করিয়াছে। পরস্ত্রীলোলুপ স্বামীকে নিবৃত্ত করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া নীরবে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে। নিজেই তাহাকে সপত্নীর হস্তে তুলিয়া দিয়াছে। বালিকা ভ্রমর যেমন বিপথগামী স্বামীর পায়ে ধরিয়া প্রেম ভিক্ষা চাহিয়াছিল, আমরা গর্ব্বিতা সূর্য্যমুখীকে কখনও সে অবস্থায় কল্পনা করিতে পারি না। যে বস্তু তাহার ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য তাহাকে সে কখনও ভিক্ষার দান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। অথবা এই যে গর্ব্ব, ইহার মধ্যে পরুষতা কিছুই নাই, ইহা স্বামীর প্রতি একটা তিরস্কার বাক্যে আত্ম-প্রকাশ করে নাই, ইহার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত একটা অকৃত্রিম ভক্তি ও স্নেহরসে অভিসিঞ্চিত; একটা কঠোর অবিচলিত আত্মসংযমেই ইহার একমাত্র পরিচয়। সূর্য্যমুখী ভ্রমরের ন্যায় উচ্ছ্বাসপ্রবণা হইলে বোধ হয় নগেন্দ্রনাথকে ধরিয়া রাখা যাইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সূর্য্যমুখীর ব্যবহারও, তাহা একদিক দিয়া যতই অনিন্দনীয় হউক না কেন, ট্রাজেডির পরিণতির জন্য অন্ততঃ কতকাংশে দায়ী। অবশ্য অন্তর্দ্বন্দ্বের সময় নগেন্দ্রের সূর্য্যমুখীর প্রতি ব্যবহার এত পরুষ ও কোমলতা-লেশ-শূন্য ছিল, যে সূর্য্যমুখীর অশ্রুজলসিক্ত আবেদনও কতদূর ফলপ্রদ হইত বলা যায় না; কিন্তু সূর্য্যমুখীর বিশেষত্ব এই যে সে কখনও সেরূপ আবেদনের কল্পনাও করে নাই। 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ইহাদের বিষয়-বস্তু ও অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকৃতিটি প্রায় একরূপ; কিন্তু বঙ্কিম যেরূপ নিপুণতার সহিত ইহাদিগকে বিভিন্ন করিয়া তুলিয়াছেন, ইহাদের পাত্র পাত্রী ও আনুসঙ্গিক ঘটনাবলীর মধ্যে পার্থক্য রক্ষা করিয়াছেন, তাহা উচ্চাঙ্গের উদ্ভাবনী প্রতিভা ও অসাধারণ কলাকৌশলের পরিচায়ক।

এই দুই প্রেম-চিত্রের বিপরীত একটী তৃতীয় চিত্র কমলমণি-শ্রীশচন্দ্রের অনাবিল একাত্ম, হাস্য-পরিহাস মধুর, কপট-মান-অভিমান-তীব্র প্রেম-কাহিনীতে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে শিশু সতীশ চন্দ্র তাহার মনোহর শৈশব চাপল্যের দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটী সুবর্ণময় সংযোগ-সেতু রচনা করিয়াছে। নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখী নিঃসন্তান; ভ্রমরের শিশু সূতিকাগারেই মৃত; বোধ হয় এই সন্তানের অভাবই এই দুইটী ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদকে এরূপ সম্পূর্ণ ও গভীর করিয়া দিয়াছিল, তাহাদের নিঃসঙ্গ বিরহকে এরূপ অসহনীয়রূপে তীব্র করিয়াছিল; বোধ হয় উভয়ের স্নেহের একটা সাধারণ অবলম্বন থাকিলে তাহাঁদের মনোমালিন্য এরূপ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিত না; তাহা হইলে সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ অসম্ভব হইত, ও গোবিন্দলালের প্রত্যাগমনের একটি পথ খোলা থাকিত। সে যাহা হউক, বঙ্কিম একই উপন্যাসে প্রেমের যে বিবিধ ও বিচিত্র বিকাশ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির নিদর্শন।

চরিত্রাঙ্কণ ও ঘটনাবিন্যাস ছাড়াও অন্যান্য দিক দিয়াও 'বিষবৃক্ষ' খুব উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। সরস ও জীবন্ত বাস্তববর্ণনায় বঙ্কিম বঙ্গ-উপন্যাস ক্ষেত্রে অতুলনীয়। প্রথম পরিচ্ছেদে নগেন্দ্রনাথের নৌকায় যাত্রা, গঙ্গাতীরস্থিত স্নানের ঘাটগুলি ও নৈদাঘঝটিকা-

বৃষ্টির যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহার বাস্তবরসটী বিশেষভাবে উপভোগ্য, সেইরূপ সপ্তম পরিচ্ছেদে নগেন্দ্রের প্রাসাদ ও অন্তঃপুরের সাধারণ জীবনযাত্রার বর্ণনাও তুল্যরূপে প্রশংসার্হ। আধুনিক উপন্যাসে সমস্যাবিশ্লেষণ আমাদিগকে এরূপ ভাবে পাইয়া বসিয়াছে যে বাস্তব বর্ণনাতেও আমাদের উৎসাহ ও শক্তি অনেক ম্লান হইয়া আসিতেছে ; হয় তাহা আদর্শের উচ্চ গ্রামের সহিত সমান সুরে বাঁধা হইয়াছে, নিরুদ্দেশ যাত্রার গোধুলিরাগরঞ্জিত (idealised), নয় তাহার উপর সমস্যার ছায়া, একটা পাণ্ডুর রক্তহীনতা আসিয়া পড়িয়াছে। ক্ষুদ্রবস্তুবর্ণনার যে একটা সজীব সতেজ আনন্দ তাহা আমাদের লোপ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়, এখন বাস্তব বর্ণনাতেও সজীব, সতেজ আনন্দ তাহা আমাদের লোপ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এখন বাস্তব বর্ণনাতেও আমরা হয় কবি না হয় দার্শনিক ; জীবন-রসে অহেতুক আনন্দ আর আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রে খুঁজিয়া পাই না। মুকুন্দরাম, ঈশ্বরগুপ্ত হইতে প্রবাহিত যে ধারা বঙ্কিমচন্দ্রে চরম গভীরতা ও বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান সাহিত্যে প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সাহিত্যের মধ্য দিয়া স্বর্গের অলকনন্দা ও পাতালের ভোগবতী বহিয়া যাইতে পারে। কিন্তু মর্ত্ত্যের সেই চির-পরিচিত বহুপুরাতন প্রবাহিনীর জলকল্লোল আর শুনিতে পাই না।

গভীরভাবাত্মক, অথচ সংযত বর্ণনাতেও বঙ্কিম তুল্যরূপ সিদ্ধহস্ত। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই রোদনপ্রবণ বাঙ্গালীজাতির মধ্যে জন্মিয়াও বঙ্কিম তাঁহার বর্ণনা বা জীবন-সমালোচনায় কোথাও ভাবাতিরেকের (sentimentality) পরিচয় দেন নাই—যেখানে মর্ম্মভেদী দুঃখের কথা বর্ণনা করেন, সেখানেও অশ্রুপ্রাচুর্য্যের পরিবর্ত্তে একটা সংযত গম্ভীর বিষাদই তাঁহার প্রকাশের স্বাভাবিক ভাষা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই বাক্-সংযমই কুন্দনন্দিনীর পিতার দুর্দ্দশার চিত্রটীকে একটী অসাধারণ অর্থগৌরবে ও করুণ-রস-প্রাচুর্য্যে ভরিয়া দিয়াছে। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে কুন্দনন্দিনীর মেঘান্ধকার নিশীথে দত্তগৃহত্যাগ, অষ্টাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদে সূর্য্যমুখীর মৃত্যুসংবাদে নগেন্দ্রের শোকোচ্ছ্বাস, উনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদে মৃত্যুশয্যাশায়িনী কুন্দের অতর্কিত বাক্পটুতার বর্ণনাগুলি বঙ্কিমের এই শক্তির উদাহরণ। অবশ্য স্থানে স্থানে কথোপকথনের ভাষা ঈষৎ শব্দাড়ম্বরদুষ্ট ও সেইজন্য গভীর ভাব প্রকাশের পক্ষে কতকটা অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে ; কিন্তু ইহা বঙ্কিমের শক্তির অভাবের পরিচয় নহে, ভ্রান্তিমূলক সাহিত্যাদর্শঅনুসরণেরই ফল। বঙ্গসাহিত্যে সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'বিষবৃক্ষের' স্থান খুব উচ্চ ; বোধ হয় এক কৃষ্ণকান্তের উইলই ইহাকে অতিক্রম করিয়া যায় ; কেননা সেখানে বিরোধের চিত্রটী আরও সম্পূর্ণতর ও কার্য্যকারণ-সন্নিবেশে অধিকতর সুসংবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'বিষবৃক্ষের' পাঁচ বৎসর পরে ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। চিত্রের পূর্ণতায় ও বিশ্লেষণের গভীরতায় ইহা 'বিষবৃক্ষ' অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, আরও পরিপক্ক, অনিন্দনীয় কলা-কৌশলের নিদর্শন। বিষবৃক্ষে মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণমূলক যে গুরুতর অভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' পূর্ণ হইয়াছে, কার্য্য-কারণ-পরম্পরার কোন শৃঙ্খলই বাদ যায় নাই। সূর্য্যমুখী অপেক্ষা ভ্রমর অধিকতর জীবন্ত

হইয়াছে, তাহার অনুচিত অভিমান ও সন্দেহপ্রবণতা ট্রাজেডিকে আসন্নতর করিয়াছে। কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের অনুরাগ-সঞ্চারের প্রথম অঙ্কুরটী সেরূপ বিশদভাবে প্রস্ফুট করিয়া দেখান হয় নাই; সূর্য্যমুখীর প্রতি বিতৃষ্ণার কোন পর্য্যাপ্ত কারণ দেওয়া হয় নাই; সূর্য্যমুখীর নিজের কোন অপরাধ এই বিচ্ছেদ সংঘটনে সহায়তা করে নাই। কিন্তু বর্ত্তমান উপন্যাসে রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের ভাবের রূপান্তর, দয়া ও সমবেদনা হইতে প্রেমে পরিণতি যথেষ্ট পরিষ্কাররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। তার পর বিষবৃক্ষে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর জীবন প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বাহ্যসম্পর্কশূন্য—বাহিরের জগৎ হইতে যে সমস্ত প্রতিবন্ধক আসিয়া আমাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যাকে জটিলতর করিয়া তোলে, সেগুলিকে যেন সযত্নে বর্জ্জন করিয়াই উহার বিরোধের ক্ষেত্র রচিত হইয়াছে—বাহিরের শক্তির মধ্যে এক হীরাই নায়ক-নায়িকার দুর্ভেদ্য অন্তঃপুরদুর্গে প্রবেশ করিয়াছে। কমলমণিও, অন্তরের যে গভীরস্তরে এই সমস্যার জাল পাকাইয়া আসিতেছিল নিয়তির সেই গোপন কক্ষে, প্রবেশ লাভে অধিকারিণী হয় নাই, কেবল বাহির হইতে সান্ত্বনা সমবেদনার কার্য্যেই নিযুক্ত ছিল। কিন্তু একান্নবর্ত্তী বাঙ্গালী গৃহস্থ পরিবারে বাহিরের সঙ্গে এরূপ সম্পর্কলোপ প্রায়ই সম্ভব হয় না; আমাদের অন্তরে যে গুরুতর বিপ্লববহ্নি প্রধূমিত হইতে থাকে, তাহা আমাদের পরিজন ও প্রতিবাসীদের ফুৎকারেই শিখা বিস্তার করে; শতবন্ধনজালজটিল সামাজিক জীবন আমাদের অন্তরের সমস্যাকে আত্মসীমা-নিবদ্ধ (self-contained) থাকিতে দেয় না, তাহার উপর সূক্ষ্ম, দুরতিক্রম্য প্রভাব বিস্তার করিয়া আমাদের ভাগ্য-সূত্রকে আরও গ্রন্থি-সঙ্কুল করিয়া তোলে। আমাদের বাস্তব জীবনযাত্রার উপরে এই প্রতিবাসী-শ্রেণীর জীবের প্রভাব বড় অল্প নহে। অবশ্য অনেক সময় উপন্যাসকার আমাদের অন্তরের ভাবগুলির ঘাত-প্রতিঘাত স্পষ্টতররূপে দেখাইবার জন্য আমাদের অন্তর্জীবনকে প্রতিবেশ-প্রভাব হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া ইহাকে অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের তলে সমর্পণ করেন—কিন্তু বাঙ্গালী জীবনের উপন্যাসে এইরূপ প্রক্রিয়া যেন একটু অস্বাভাবিক বলিয়াই আমাদের চক্ষে ঠেকে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' এই বাহ্য জগতের শক্তিকে অযথা ক্ষীণ করিয়া দেখান হয় নাই; ইহা অন্তর্দ্বন্দ্বের উপর ইহার সমুচিত ও ন্যায্য প্রভাবই বিস্তার করিয়াছে। এই বাহ্যশক্তিগুলির মধ্যে প্রথম ও প্রধান কৃষ্ণকান্তের উইল। প্রত্যেক বার উইল-পরিবর্ত্তন কেবল যে সম্পত্তির বিভাগ-বন্টনের অংশ বদ্‌লাইয়াছে তাহা নহে, ইহা একটী অলঙ্ঘ্য বিধিলিপির ন্যায়ই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের ভাগ্যপরিবর্ত্তনও করিয়াছে। কৃষ্ণকান্তের তৃতীয় উইল, যাহাতে হরলালের ভাগে শূন্য পড়িল, তাহা হরলালকে রোহিণীর সাহায্য-প্রার্থী করিয়া রোহিণীর জীবনে একটী অভাবনীয় নূতন পরিচ্ছেদ উদ্‌ঘাটন করিয়া দিল। রোহিণীর যে তীব্র মনোবৃত্তি শীতাগমনিস্তেজ-কুণ্ডলীকৃত সর্পের ন্যায় তাহার হৃদয়-বিবরে সুপ্ত ছিল তাহাকে খোঁচা দিয়া জাগাইয়া তুলিল, দংশনলোলুপ বিষধরবৎ সে ফণা উন্নত করিয়া উঠিল। এই নবজাগ্রত-প্রেম-ক্লিষ্টার চক্ষে গোবিন্দলালের সাধারণ সমবেদনা ও তৎপ্রতি অনুষ্ঠিত অবিচারের জন্য অনুতাপ তাহার তৎ-কালীন মনোবিকারের মধ্য দিয়া

শীঘ্রই প্রণয়ে রূপান্তরিত হইল। অতঃপর দ্বিতীয়বার উইল পরিবর্তন করিতে আসিয়া রোহিণী ধরা পড়িল; এবং এই বন্ধন অবস্থাতেই গোবিন্দলালের সহানুভূতির নিবিড়তর সম্পর্কে আসিয়া ভাগ্য পরিবর্ত্তনের এক নূতন সোপানে পা দিল; গোবিন্দ লালের নিকট নিজ অনিবার্য্য প্রণয়াবেগের কথা স্বীকার করিয়া ফেলিল; গোবিন্দ লাল আবার এই কথা ভ্রমরের নিকট প্রকাশ করিল; ভ্রমর তাহাকে বারুণীর জলে ডুবিয়া মরিতে উপদেশ দিল; প্রেমজর্জ্জরা, নিরাশা-দগ্ধ-হৃদয়া রোহিণী সেই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিল। তারপর গোবিন্দলাল কর্ত্তৃক জলমগ্না রোহিণীর উদ্ধার ও পুনর্জ্জীবন দান; এবং তাহার রোহিণী কর্তৃক আকর্ষণের প্রথম অনুভব— এই সমস্তই এক অলঙ্ঘ্য-নিয়তি-শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া উইল-চুরির স্বাভাবিক পরিণতিরূপে আসিয়া পড়িল। আবার কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বে উইলের শেষবার পরিবর্ত্তন ও ভ্রমরের প্রতি গোবিন্দ লালের বিরাগের মাত্রা পূর্ণ করিয়া নিয়তি হস্ত প্রেরিত ছুরিকার ন্যায় দম্পতির মধ্যে ছিন্নপ্রায় বন্ধনসূত্রের শেষ গ্রন্থিটী ছেদন করিয়াছে। পুনশ্চ, এই উপন্যাসের মধ্যে যেটী প্রধান ও শীর্ষস্থানীয় ভ্রান্তি, যাহা নায়ক-নায়িকার ভাগ্য-স্রোতকে নূতন পথে ফিরাইয়া দিয়াছে, তাহা ভ্রমরের গোবিন্দ লালের প্রতি অবিশ্বাস ও অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া পিতৃগৃহ-যাত্রা; এই কাজটীই গোবিন্দ লালের দোলাচল চিত্তবৃত্তিকে একবারে নিঃসংশয়িত ভাবে রোহিণীর দিকে হেলাইয়াছে; অথচ এই গুরুতর পরিবর্ত্তনটী বাহিরের লোকের ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, সহানুভূতির অভাব ও পরচর্চ্চা-প্রিয়তার দ্বারাই সংসাধিত হইয়াছে (২০-২৩ পরিচ্ছেদ)। ঠিক যে মুহূর্ত্তে গোবিন্দ লাল ভ্রমরের একত্রাবস্থান তাহাদের ভবিষ্যৎ সুখের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল, সেই সময়ই ভ্রমরের শাশুড়ী আসিয়া তাহাদিগকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন; এমন কি কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুও এমন অসময়ে ঘটিল, যে ইহাও এই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন দম্পতির মনোমালিন্য-লোপের পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল, বিরোধের যে বাষ্প প্রথম অবস্থাতে একটা ফুৎকারেই উড়িয়া যাইতে পারিত, তাহাকে ঘনীভূত করিয়া আলোক রেখার দ্বারা সম্পূর্ণ অভেদ্য করিয়া তুলিল। এইরূপ সর্ব্বত্রই অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত হইয়াছে; নিয়তি যেখানে দুর্ভাগ্য মানবের জন্য জাল পাতিয়া রাখিয়াছে সেখানে বাহ্যজগতের একটা ঈর্ষ্যা-ক্রুর শক্তি তাহাকে অনিবার্য্যবেগে সেই আসন্ন বিপদের দিকে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে; বাহিরের প্রতিবন্ধক আসিয়া অন্তরের বিরোধটিকে জটিলতর ও অধিকতর দুরতিক্রমনীয় করিয়া তুলিয়াছে বাহ্যজগতের এই ঈর্ষ্যা-ক্রুর প্রতিকূলতা, তাহার মুখে এই বক্র-উপহাসপূর্ণ হাসিটী আমাদিগকে বিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির Ironic treatment of nature এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই বিষয়ে বিষবৃক্ষের অপেক্ষা কৃষ্ণকান্তের উইলের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব।

আরও একটী বিষয়ে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'বিষবৃক্ষের' অপেক্ষা বাস্তবতার অধিকতর অনুগামী——উপন্যাসের পরিণাম-সংঘটনে। 'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর পুনর্ম্মিলন

অনেকটা রোমান্স-সুলভ-আদর্শবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। বিপদ্-ঝটিকার পূর্ণবেগ কুন্দনন্দিনীর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে; সূর্য্যমুখী-নগেন্দ্র যেন একটা স্বল্পকালব্যাপী দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া আবার তাহাদের চিরাভ্যস্ত প্রেমের জীবন-যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে; আগুণের আঁচ সকলকেই অল্প বিস্তর লাগিলেও এক কুন্দনন্দিনীই ইহাতে আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছে, অগ্নি প্রান্তদেশ দাহ করিয়াই চলিয়া গিয়াছে, উপন্যাসের কেন্দ্রস্থলকে স্পর্শ করে নাই। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' নায়ক-নায়িকারা এত সহজে অব্যাহতি পায় নাই, লেখক পাথরের উপর পাথর চাপাইয়া, বাধার উপর বাধা স্তূপীকৃত করিয়া ভ্রমর-গোবিন্দলালের মধ্যে যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃজন করিয়াছেন, তাহা শেষ পর্য্যন্ত অব্যাহত রহিয়াছে, তাহাদের গভীর মনোব্যথার কোন সুলভ সমাধান সম্ভব হয় নাই; ভ্রমর, গোবিন্দলাল, রোহিণী ইহাদের প্রত্যেকের উপর দিয়াই নিয়তি তাহার নিষ্করুণ রথচক্র চালাইয়া গিয়াছে, কোন সদয় হস্ত তাহাদিগকে চক্রগতির সীমার বাহিরে পথিপার্শ্বে সরাইয়া রাখে নাই। লেখক এখানে রোমান্সের অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের মায়ায় ভুলেন নাই, নিয়তির অমোঘ পথরেখারই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথের অপেক্ষা গোবিন্দলালের নিষ্ঠুরতা আরও হৃদয়হীন ও প্রায়শ্চিত্ত আরও কঠোর; সূর্য্যমুখী অপেক্ষা ভ্রমরের দুঃখ আরও মর্ম্মস্পর্শী, সূর্য্যমুখীর একান্ত ক্ষমা হইতে ভ্রমরের অনির্ব্বাণ অভিমান ও হত্যাকারী স্বামীর বিরুদ্ধে নিবৃত্তিহীন বিরাগ অধিকতর বাস্তবানুগামী। গোবিন্দলালের শেষ বয়সে সন্ন্যাসে শান্তিলাভ—প্রকৃত পক্ষে উপন্যাসের সীমাবহির্ভূত; ইহা আর্ট অপেক্ষা রুচি ও বিশ্বাসেরই কথা; আর উপন্যাসের বাস্তবতার যে অসাধারণ তীব্রতা, তাহা ইহার দ্বারা কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। 'বিষবৃক্ষে' বঙ্কিম বাস্তব প্রণালীর অনুসরণ করিয়াও তাঁহার চিরপ্রিয় রোমান্সের প্রভাব হইতে নিজেকে একেবারে মুক্ত করেন নাই: তাঁহার দৃষ্টি ও নগ্ন বাস্তবতার মধ্যে রোমান্সের একটী অতিসূক্ষ্ম রঙ্গীন যবনিকা ব্যবধান রাখিয়াছিলেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' এই সূক্ষ্ম যবনিকাও পরিত্যক্ত হইয়াছে; বঙ্কিম অকম্পিত চক্ষুতে, সমস্ত বাধা-ব্যবধান সরাইয়া ফেলিয়া, অবিমিশ্র বাস্তবতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, এবং আমাদের ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনের মধ্যে একটী অসাধারণ রসপূর্ণ ও দুঃখ-গৌরব-মণ্ডিত সংঘাতের চিত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

এই খানে আর একটী প্রশ্নের মীমাংসা করা প্রয়োজন মনে করি। আধুনিক ঔপন্যাসিক-দের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম একজন, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, বঙ্কিমের আর্টে অসঙ্গতি ও অস্বাভাবিকতার উদাহরণস্বরূপ রোহিণীর অপঘাত-মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে রোহিণীকে ঐরূপ অকস্মাৎ মারিয়া ফেলিয়া বঙ্কিম সামাজিক ধর্ম্মনীতির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কলাবিদের কর্ত্তব্য বিসর্জ্জন দিয়াছেন, রোহিণীকে বলি দিয়া সমাজ-ধর্ম্মের ক্ষেত্র নিষ্কণ্টক করিয়াছেন। আমার আর একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধুও আমার সহিত কথোপ-কথনকালে অন্য একপ্রকার সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন—রোহিণীর অকস্মাৎ মৃত্যু যেন একটা খুব জটিল সমস্যার অন্যায়রূপ সুলভ সমাধান। সুতরাং আমি এই প্রশ্নটী যথাসাধ্য অভিনিবেশ পূর্ব্বক আলোচনা করিয়া বঙ্কিমের অনুসৃত পন্থার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিচার করিতে চেষ্টা করিয়াছি; এবং এই আলোচনার ফলস্বরূপ আমার যে ধারণা হইয়াছে তাহাই এখানে

সসঙ্কোচে ব্যক্ত করিতেছি। আমার মত এই যে মোটের উপর বঙ্কিম এখানে ঠিক পথই অনুসরণ করিয়াছেন, এবং পূর্ব্বোক্ত শ্রদ্ধেয় সমালোচকেরা হয়ত তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করেন নাই। শরৎচন্দ্রের সমালোচনার অর্থ যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে মনে হয় যে তিনি এই বলিতে চাহেন—বঙ্কিম রোহিণীর প্রণয়-কাহিনীটী বেশ সহানুভূতির সহিত বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, যেন আজন্ম-প্রণয়-বঞ্চিতা বিধবা যুবতীর পক্ষে এরূপ প্রেম-প্রবণতা একটা স্বাভাবিক ইচ্ছার বিকাশ, ও ন্যায়সঙ্গত অধিকারের দাবী মাত্র ; তারপর যখন দেখিলেন যে রোহিণীর চিত্রটী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিল, ও তাহার প্রেমাকাঙ্খা পাঠকের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইয়াছে, তখন হঠাৎ এই চিত্রের নৈতিক ফলাফলের কথা তাঁহাকে পীড়িত করিয়া তুলিল, এবং তিনি কলাবিদের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া রোহিণীকে বন্দুকের গুলিতে মারিয়া ফেলিয়া, অবৈধ প্রণয়ের নৈতিক বিষময় ফল প্রদর্শন করিলেন, ও তাঁহার নিজের নীতিজ্ঞান অক্ষুণ্ণ আছে তাহাই সপ্রমাণ করিলেন। শরৎচন্দ্রের উক্তির এইরূপ ব্যাখ্যা না করিলে তাহার মধ্যে বিশেষ জোর থাকে না ; কেন না পাপের দণ্ডমাত্রই কলাকৌশলের দিক্ হইতে নিন্দনীয় নহে ; যদি পাপের শাস্তি, আর্টিষ্টের নিজ অভিরুচি বা সহানুভূতির বিরুদ্ধে, আর্টের অননুমোদিত কোন উপায়ে, একটা অতর্কিত আকস্মিকতার সহিত, দেওয়া হয়, তবেই তাহাতে অনুচিত নীতিজ্ঞানের প্রভাব লক্ষ্য করা যাইতে পারে। সুতরাং যদি দেখান যায়, যে বঙ্কিম প্রথম হইতেই রোহিণীর প্রেম-সঞ্চারকে idealise করিতে তাহার উপর আদর্শবাদের মায়ালোক নিক্ষেপ করিতে চাহেন নাই, প্রথম হইতেই ইহার মধ্যে একটা বিসদৃশতা, একটা ইতর মনোবৃত্তির প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন, এবং তাঁহার রোহিণীর চরিত্রাঙ্কণ বিষয়ে কোন আকস্মিক পরিবর্ত্তন হয় নাই, তাহা হইলে অন্ততঃ আত্যন্তিক নীতিজ্ঞানবিমূঢ়তার অভিযোগ হইতে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারিবে। অবশ্য ইহা সত্ত্বেও বলা চলিবে যে রোহিণীর অতর্কিত হত্যা bad art or কলাকৌশলের দিক হইতে নিন্দনীয়, এ আপত্তি তখনও প্রবল থাকিবে। আমরা প্রথম শরৎচন্দ্রের আপত্তি খণ্ডন করিয়া, পরে এই দ্বিতীয় আপত্তির সমাধান করিতে চেষ্টা করিব।

আমরা রোহিণীর চরিত্রের ক্রম-বিকাশ ও তৎসঙ্গে বঙ্কিমের মন্তব্যগুলি যত্নপূর্ব্বক আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিব যে যদিও রোহিণীর দুরবস্থার প্রতি লেখকের দয়া বা সহানুভূতির অভাব ছিল না, তথাপি এই অবৈধ প্রেমের পরে তাহার প্রত্যেক নূতন পদক্ষেপই তাহার চরিত্রের একএকটী অপ্রীতিকর অংশই বিকাশ করিয়াছে, ও লেখকের সহানুভূতির ভাণ্ডার ক্ষয় করিয়া আনিয়া ক্রমশঃ কঠোরতর সমালোচনাই উদ্রিক্ত করিয়াছে। রোহিণীর ঐ প্রেম-বিকাশের মধ্যে তাহার চরিত্রের যে অংশ বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা এই—যে এই অনিবার্য্য নূতন উন্মেষকে কুন্দনন্দিনীর ন্যায় সলজ্জ সঙ্কোচ ও কঠোর আত্মগ্লানির সহিত গ্রহণ করে নাই, সে ইহাকে দুই হাত মেলিয়া লজ্জা-শালীনতার সীমারেখা ছাড়াইয়া, একটা উৎকট বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া আলিঙ্গন করিতে গিয়াছে। আমরা প্রথমেই দেখি যে হরলালের একটা সামান্য প্রলোভনের ইঙ্গিতমাত্রেই সে চুরি পর্য্যন্ত করিতে সঙ্কোচ বোধ করে নাই—ইহাই কি তাহার চরিত্রগত ইতরতার একটা অবিসংবাদিত নিদর্শন নহে? তারপর

হরলাল কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াও গোবিন্দলালের নিকট অপ্রত্যাশিত সহানুভূতি লাভ করিয়া তাহার মনে অনুতাপ, ও অন্যায়প্রতিকার-সঙ্কল্প প্রভৃতি দুই একটী সদ্‌গুণের ক্ষণিক বিকাশ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু প্রেমের বিক্ষুব্ধ বাত্যাতাড়িত সরোবরেই এই পদ্মফুল ফুটিয়াছিল, এবং অল্পকালের মধ্যেই ইহারাও প্রেম-লালসাতেই রূপান্তরিত হইয়াছে। অতঃপর চৌর্য্যাপরাধে ধৃত হইয়া রোহিণী নিতান্ত লজ্জাহীনার ন্যায়ই গোবিন্দলালের নিকট নিজ প্রণয়াসক্তির কথা প্রকাশ করিয়াছে, ও লালসা-তাড়িত হইয়া গোবিন্দলালের প্রস্তাবিত স্থানত্যাগে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছে; রোহিণীর এই অসম্মতির সহিত কুন্দনন্দিনীর কলিকাতা যাইতে সম্মতি তুলনা করিলেই উভয়ের প্রকৃতিগত পার্থক্য পরিষ্কার হইবে। ইহার পরবর্ত্তী ব্যাপার হইতেছে রোহিণীর বারুণী-নিমজ্জন; অবশ্য ইহাই তাহার প্রণয় জ্বালার অসহনীয়তার একটী অভ্রান্ত প্রমাণ, এবং এই প্রণয়ের জন্য আত্মহত্যাই আমাদের বিচার বুদ্ধিকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া তাহার উপর একটা আদর্শলোকের দীপ্তি ও রমণীয়তার স্পর্শ আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু বঙ্কিম এখানেও দেখাইতে ভুলেন নাই যে একটা অবিমিশ্র উৎকট লালসাই তাহার আত্মঘাতের মূল কারণ, ইহার মধ্যে উচ্চতর বৃত্তি কিছুই নাই। অতঃপর তাহার কলঙ্করটনার পর সে যে কাজ করিয়া বসিল, তাহাই তাহার দুঃসাহসিক, দুরন্ত, ও একান্ত লজ্জাহীন প্রকৃতিটী উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে—সে যে গোবিন্দলালের অনুগৃহীত, তাহাই মিথ্যা-প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা সাব্যস্ত করিতে ভ্রমরের বাড়ী চড়াও হইয়াছে। এইখানে (৩২শ পরিচ্ছেদ) বঙ্কিমের মন্তব্য হইতেছে:—"রোহিণী না পারে, এমন কাজই নাই, ইহা তাহার পূর্ব্ব পরিচয়ে জানা গিয়াছে" ও "স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিতে নাই, এ কথা মানি; কিন্তু রাক্ষসী বা পিশাচীর গায়ে যে হাত তুলিতে নাই, একথা তত মানি না।" ইহার পর রোহিণীর মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে, সে বিনা বাক্যব্যয়ে, অনুতাপের বিন্দুমাত্র চিহ্ন প্রকাশ না করিয়া, সুখের পরিবারে যে অশান্তির আগুন জ্বালাইয়াছে, তাহার দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া অবৈধ-প্রণয়-স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে। এই পর্য্যন্ত বিশ্লেষণে আমরা যাহা পাইলাম তাহাতে নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণ হয় যে বঙ্কিম রোহিণীর প্রণয়-লীলাকে বিশেষ সহানুভূতির চক্ষে দেখেন নাই, ও ইহার অন্তর্নিহিত ইতরতার উপর কোন বিশেষপ্রকারের মাধুর্য্যসঞ্চার করিতে চেষ্টা করেন নাই; সুতরাং সদ্যোজাগ্রত নীতিজ্ঞান যে তাঁহার আর্টের নৌকার মুখ সবলে ফিরাইয়া স্বাভাবিক তরঙ্গ-প্রবাহের বিপরীত দিকে লইয়া গিয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই। রোহিণীর চরিত্র-চিত্রণ সম্বন্ধে তাঁহার ইচ্ছার প্রথম অঙ্কুর হইতে শেষ পরিণতি পর্য্যন্ত অতর্কিত পথ-পরিবর্ত্তনের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না।

এইবার দ্বিতীয় আপত্তির আলোচনা করিব; রোহিণীর অতর্কিত মৃত্যু, লেখকের প্রথমাবধি উদ্দেশ্যানুযায়ী হইলেও, bad art; কেন না এই পরিণতির জন্য লেখক পাঠকের মনকে যথেষ্টভাবে প্রস্তুত করেন নাই। রোহিণীর চতুর্দ্দিকে যে জটিল সমস্যা গড়িয়া উঠিতেছিল, লেখক তাহার আকস্মিক মৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়া, সেই সমস্যার সুলভ সমাধান সাধন করিয়াছেন। এই আপত্তি সম্পূর্ণ যুক্তিহীন নহে; কিন্তু বঙ্কিমের সপক্ষে যে যুক্তি আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম না করিলে এই আপত্তির প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে না। বঙ্কিমের

পাপ-চিত্রের বিস্তৃত বর্ণনায় যে একটা স্বাভাবিক সঙ্কোচ আছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি ; সুতরাং রোহিণী-গোবিন্দলালের প্রণয়-চিত্র যেরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিলে তাহার মধ্যে এই আকস্মিক পরিণতির ইঙ্গিত ও পূর্ব্বলক্ষণ পাওয়া যাইতে পারিত, উপন্যাসে আমরা সেরূপ কিছু পাই না ; সেই জন্য রোহিণীর মৃত্যু বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতই আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে। পাঠকের মনে এই ধারণার জন্য বঙ্কিমের রচনা-প্রণালী ও পাপ-বর্ণনার প্রতি আত্যন্তিক বিমুখতা যে কতকাংশে দায়ী, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বঙ্কিম মন্তব্য ও বিশ্লেষণের দ্বারা বর্ণনার অভাব কতকটা সারিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং এই মন্তব্যগুলি মনোযোগের সহিত অনুসরণ করিলে রোহিণীর পরিণামের আকস্মিকতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইবে। এই বিষয়ে 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র মধ্যে একটু উল্লেখ-যোগ্য প্রভেদ দৃষ্ট হইবে। 'বিষবৃক্ষে' বঙ্কিম প্রলোভনের চিত্রটী সংক্ষেপে সারিয়াছেন, ও ইহার পরবর্ত্তী অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্তের দৃশ্যটীর বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন ; 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রণালী অনুসরণ করিয়াছেন ; এখানে প্রলোভনের চিত্রটী বিস্তারিত ও প্রায়শ্চিত্তের চিত্রটী সঙ্কুচিত ও সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। শেষোক্ত উপন্যাসে ভ্রমরের দীর্ঘ প্রতীক্ষা, রোহিণীর মৃত্যু, গোবিন্দলালের অন্তর্দ্দাহ ও প্রায়শ্চিত্ত নিতান্ত সংক্ষিপ্তভাবে, কেবল মাত্র বিশ্লেষণের দ্বারাই, বিবৃত হইয়াছে। অবশ্য বঙ্কিমের একই প্রকার ঘটনার পুনরাবৃত্তি করিতে অনিচ্ছার জন্যই এই দুইখানি উপন্যাসে এরূপ বিরুদ্ধ প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' প্রায়শ্চিত্তের খুব সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াতে এই দোষ হইয়াছে যে উহার সমস্ত স্তরগুলির পর্য্যায়ক্রমে আলোচনা হয় নাই, ও উহার কার্য্যকারণশৃঙ্খলের মধ্যে অনেক দুর্ব্বল গ্রন্থি রহিয়া গিয়াছে বলিয়া পাঠকের ধারণা হইয়াছে। এই ধারণা অনেকটা ন্যায্য ইহা স্বীকার করিয়া আমরা বঙ্কিমের মন্তব্য ও বিশ্লেষণ হইতে তাঁহার নিগূঢ় উদ্দেশ্যটী পুনর্গঠন করিয়া লইতে চেষ্টা করিব।

গোবিন্দলালের উপর রোহিণীর আকর্ষণের তীব্রতা যে ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছিল, এবং রোহিণীকে গুলি করিয়া মারা যে কেবল তাহার দৈহিক মরণ নহে, পরন্তু গোবিন্দলালের উপর তাহার প্রভাবের অবসান—এইটী ফুটাইয়া তোলা নিশ্চয়ই বঙ্কিমের মনোগত উদ্দেশ্য ছিল। প্রণয়-তরঙ্গে ভাঁটা না ধরিলে, অবিশ্বাসিতার প্রথম চেষ্টাতেই যে গোবিন্দলাল রোহিণীকে হত্যা করিবেন, ইহা একটু অসম্ভব বলিয়াই মনে হয় ; গোবিন্দলাল একটা বর্দ্ধমান বিতৃষ্ণার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই অন্তরের মধ্যে যুদ্ধ করিতেছিলেন, এবং এই দীর্ঘকালব্যাপী অন্তর্দ্বন্দ্বই তাঁহাকে তাঁহার অজ্ঞাতসারে এরূপ একটা সাংঘাতিক পরিণতির জন্য প্রস্তুত করিতেছিল। শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহে' অচলার সহিত একটা দীর্ঘ অন্তর্ব্বিরোধ, অতৃপ্ত প্রেমের একটা রুদ্ধ ক্ষোভই সুরেশকে প্লেগের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িবার শক্তি ও বেগ দিয়াছিল ; এই পূর্ব্বগামী বিক্ষোভের বিস্তৃত বর্ণনা ব্যতীত তাহার আত্মহত্যার প্রবৃত্তিকে স্বাভাবিক করিয়া তোলা সম্ভব হইত না। বঙ্কিম এই শেষমুহূর্ত্তের ঝম্পপ্রদানটী বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে বিপুল শক্তি ঠেলা দিতেছিল, সুরুচি ও সংযমের খাতিরে তাহার কোন বিস্তৃত বিবরণ দেন নাই। ইহা আর্টের দিক্ হইতে দোষ হইতে পারে, কিন্তু এরূপ কল্পনার অপরিণত অঙ্কুর

যে তাঁহার মনোমধ্যে বিদ্যমান ছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি হইতে নিঃসন্দেহ প্রমাণ হইবে।

"রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে এ রোহিণী, ভ্রমর নহেন—এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে—এ ভোগ, এ সুখ নহে—এ মন্দার-ঘর্ষণ-পীড়িত বাসুকি-নিশ্বাসনির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরি-ভাণ্ড-নিঃসৃত সুধা নহে। বুঝিতে পারিলেন যে, এ হৃদয়-সাগর মন্থনের উপর মন্থন করিয়া যে হলাহল তুলিয়াছি, তাহা অপরিহার্য্য, অবশ্য পান করিতে হইবে—নীলকণ্ঠের ন্যায় গোবিন্দলাল সে বিষ পান করিলেন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্থ বিষের মত সে বিষ তাঁহার কণ্ঠে লাগিয়া রহিল। সে বিষ জীর্ণ হইবার নহে, সে বিষ উদ্গীর্ণ করিবার নহে; কিন্তু তখন সেই পূর্ব্ব-পরিজ্ঞাত-স্বাদ বিশুদ্ধ ভ্রমর-প্রণয়সুধা—স্বর্গীয়গন্ধযুক্ত চিত্তপুষ্টিকর, সর্ব্বরোগের ঔষধ-স্বরূপ, দিবা রাত্রি স্মৃতিপথে জাগিতে লাগিল, যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীত স্রোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবলপ্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী, ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তখন ভ্রমর অপ্রাপনীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা, তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তাই রোহিণী অতশীঘ্রই মরিল! যদি কেহ সে কথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে বৃথাই এ আখ্যায়িকা লিখিলাম।" (দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ)

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বিশেষ বর্ণনা-বাহুল্য নাই; লেখক নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা-গুলিতেই আপনাকে সীমা-বদ্ধ করিয়াছেন, যেন গ্রন্থের বিষাদময় পরিণতি তাঁহার কল্পনাবিলাসের পক্ষচ্ছেদ করিয়া দিয়াছে। গ্রন্থের সর্ব্বত্রই একটা সংযত ভাব-প্রকাশ, একটা পরিমিত সামঞ্জস্য-বোধ, একটা নির্দ্দোষ ঘটনা-বিন্যাসশক্তি, ও একটা বিদ্যুৎ-রেখার ন্যায় ক্ষিপ্রগতি ও উজ্জ্বল বুদ্ধির নিদর্শন দেদীপ্যমান। গ্রন্থের প্রত্যেক পরিচ্ছেদ যেন নিয়তির অদৃশ্য রজ্জুর এক একটী পাক; উপন্যাসটী যেমন সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তেমনি এই বন্ধন যেন কাটিয়া কাটিয়া আমাদের হৃদয়ে গভীরতরভাবে বসিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের রহস্যময় সাঙ্কেতিকতার দিকে যে প্রবণতা, তাহা এই কঠোর বাস্তব উপন্যাসেও দুই একটী ক্ষুদ্র ইঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। গোবিন্দলাল যে মুহূর্ত্তে রোহিণীর অধরে অধর স্থাপন করিয়া ফুৎকার দিলেন, ভ্রমর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বিড়ালকে লাঠি মারিতে গিয়া নিজের কপালে লাঠি মারিয়া বসিল। জগতের এই রহস্যময় ইঙ্গিতগুলির প্রতি সূক্ষ্মদর্শিতা আমাদিগকে ক্ষণেকের জন্য E. A. Poe বা Nathaniel Hawthorneএর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। উপন্যাসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ও উচ্ছ্বসিত কল্পনা-লীলা প্রথম খণ্ডের সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদে ভ্রমর-গোবিন্দলালের পরস্পরের প্রতি পরিবর্ত্তিত ব্যবহারের বর্ণনায় একত্র সম্মিলিত হইয়াছে। অতি অল্পস্থানের মধ্যে এরূপ গভীর ভাবপ্রকাশ, বিশ্লেষণ ও কবিত্ব শক্তির এরূপ অসাধারণ সম্মিলন আর কোন উপন্যাসে পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস; ইহা বঙ্কিমপ্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান; রোমান্সের বিশাল জগৎ হইতে সামাজিক

জীবনের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া বঙ্কিমের প্রতিভা এই নূতন সংযম বন্ধনের মধ্যে একটা অসাধারণ দৃঢ় ও পেশীবহুল শক্তি লাভ করিয়াছে, স্বচ্ছন্দবিহার বিসর্জ্জন দিয়া তৎপরিবর্ত্তে একটী নূতন বিশ্লেষণগভীরতা অর্জ্জন করিয়াছে। যখনই আমাদের বঙ্কিমের ক্ষুদ্র ক্রটি বিচ্যুতি ও অপরিহার্য্য দুর্ব্বলতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রতিভাজ্যোতি ম্লান করিবার প্রবৃত্তি হইবে, তখনই বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলের স্মৃতিমাত্রই আমাদের সকল তুচ্ছ সন্দেহ নিরসন করিয়া বঙ্কিম-প্রতিভায় আমাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করিয়া দিবে সন্দেহ নাই এবং অন্তরমধ্যে এই অক্ষুণ্ণ বিশ্বাসের পুনঃসংস্থাপনই বঙ্গসাহিত্য পাঠকের পক্ষে বঙ্কিমের নিকট বিদায় লইবার সর্ব্বাপেক্ষা [উপযু]ক্ত সময়।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈদিক জাতি বা বর্ণতত্ত্ব

বেদের মতে মানবজাতি এক পিতার সন্তান

কোরাণ বলে সমস্ত মানবজাতি "বনী আদামা"—এক আদমের সন্তান। কি আশ্চর্য্য; ঋগ্বেদও বলিতেছে—সমস্ত মানবজাতি এক নহুষের সন্তান—অগ্নিং বিশ ঈলতে মানুষীর্যা অগ্নিং মনুষো নহুষো বিজাতাঃ" (১০-৮০-৬)। "মানুষ প্রজা (বিশঃ) যত আছে, সকলে অগ্নির স্তব করে, নহুষ হইতে উৎপন্ন বিভিন্ন জাতীয় মানুষ অগ্নির স্তব করে।" এই মন্ত্রে আমরা দেখিতেছি সকল মানুষই "বিশ্" বা বৈশ্য, এবং বিভিন্ন জাতীয় মানুষ এক "নহুষ" হইতে উৎপন্ন। এমন কি ঋগ্বেদে মানুষের নামান্তর নাহুষ। (১) ঋগ্বেদের এই 'নহুষ' নামটীর সহিত কোরাণের 'নুহ্' বা 'নু' এবং বাইবেলের 'নো-আ' (Noah) নামটীর তুলনা করিলে কে না বলিবে 'নহুষ্', 'নুহ্', 'নু' এবং 'নো-আ' তিনটীই একজনের নাম? 'নুহ্', 'নু', এবং 'নো-আ', বৈদিক নহুষ নামেরই ভগ্নাবশেষ? কে না বলিবে যে বেদ কোরাণ এবং বাইবেলের মতে সমস্ত মানবজাতি এক পিতার সন্তান? ঋগ্বেদে আবার মানুষকে মনুর সন্তান, (২) মনুকে মানুষের পিতা

(১) "সরস্বতী ঘৃতং পয়ো দুদুহে নাহুষায়" (৭-৯৫-২)
"নাহুষা যুগা" (৫-৭৩-৩) "নাহুষা মনুষ্যাঃ তেষাং যুগ্মাঃ" (সায়ন)।
(২) "প্রজা অজয়ন্মনুনাং" (১-৯৬-২);
"মনুষ্পিতা" (১-৮০-১৬);
"যৎ শং চ যোশ্চ মনুরাযে জে পিতা" (১-১১৪-২);
"যানি মনুরাবৃণীত পিতা নঃ" (২-৩৩-১৩);
"মনুষ্পিতা দেবেষু ধিয় আনজে" (৮-৬৩-১, বালখিল্য); "মনুঃ প্রমতি নঃ পিতা" (১০-১০০-৫)

বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদে আবার বলা হইয়াছে, (৩) মনুর প্রতি প্রীতিমান্ (দেবগণ) যাহারা বিবস্বতের অর্থাৎ বিবস্বৎ-পুত্র মনুর সন্তান মনুষ্যগণকে ধারণ করেন। এই বিবস্বৎ কে? (৪) এই বিবস্বৎ যিনি মনুর পিতা, তিনি আবার যমেরও পিতা। আবার শুধু তাহাই নয়। ত্বষ্টাদেব কন্যার (সরন্যুর) বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন। সেই উপলক্ষে সকল লোক তথায় উপস্থিত। যমের মাতা মহান্ বিবস্বতের স্ত্রী বিবাহ হইতেছে এমন সময়ে অদৃশ্যা হইলেন। দেবগণ অমর সরন্যুকে মরলোক হইতে লুকাইলেন। তাহারই সদৃশ (সবর্ণাং) আর একটী কন্যা করিয়া বিবস্বৎকে দান করিলেন। যখন এরূপ হইয়াছিল তখন সরন্যু অশ্বিনদ্বয়কে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। সরন্যু দুই মিথুন (যম-যমী) ও প্রসব করিয়াছিলেন। ইহার ভিতরে ইতিহাস ও উপকথা (myth) উভয়ই জড়িত। বিবস্বৎ অর্থ বিশেষ দীপ্তিশালী সূর্য্য। সরন্যু অর্থ উষা। সূর্য্যোদয়ে উষা অন্তর্হিত হয় এই এক অর্থ। আবার বৈদিক বিবস্বৎ, জেন্দাবেস্তার বিবঙ্ঘৎ, মানব-জাতির একজন আদিপুরুষ—একজন আদিম ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ঋষি বা রসুল। বেদ বলে তাহার পুত্র 'যম' এবং জেন্দাবেস্তা বলে তাহার পুত্র "যিম।" বেদের যম যে একজন আদিম ঋষি বা রসুল, কঠোপনিষদ তাহার সাক্ষী। যিম যে একজন প্রধান ঋষি (বা রসুল) জেন্দাবেস্তা তাহার সাক্ষী।—"the holy Yima, the son of Vivanghat, the preacher of my law।" মনু নামে বিবঙ্ঘতের অন্য পুত্র ছিল, এরূপ কথা জেন্দাবেস্তাতে নাই। আবার মনু যে যমের ভাই, এরূপ কথাও কোন বেদে অথবা ব্রাহ্মণ গ্রন্থে নাই।

আদিম জল-প্লাবন। (৫)

যদিও ঋগ্বেদে,—বাইবেল ও কোরাণ নো-আ সম্বন্ধে যেরূপ বলিতেছে,—সেরূপ কোন লোকক্ষয়কারী ভীষণ জল-প্লাবনের উল্লেখ নাই, নহুষ সম্বন্ধেও নাই, মনু সম্বন্ধেও নাই, তথাপি শুক্লযজুর্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণে মনুর সময়ের যে জলপ্লাবনের বর্ণনা আছে, যদিও তাহাতে নহুষের নাম নাই, তথাপি বোধ হয় যেন তাহা 'নোওয়ার' সময়ের জল-প্লাবনেরই বৈদিক আকার। নোওয়ার জলপ্লাবনে যেমন এক মাত্র 'নোওয়াই' জীবিত ছিলেন ("Noah only remained alive"), মনুর জলপ্লাবনেও দেখা যায় একমাত্র মনুই জীবিত ছিলেন—"মনুরেবৈকঃ পরিশিশিষে।"

বাইবেল মতে যেমন সাদা, কালো, লাল, পীত সমস্ত মানবজাতি একজাতি, এক পিতার, এক নো-আর সন্তান, শতপথ ব্রাহ্মণ মতেও সাদা, কালো, লাল, পীত সমস্ত মানবজাতি এক পিতার, এক মনুর সন্তান।—আর্য্য, অনার্য্য, হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান সকলে একজাতি। আমরা সংক্ষেপে শতপথ ব্রাহ্মণের (৬) বর্ণনা পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি।

---

(৩) যে দিধিবন্তে আপাং মনু-প্রীতাসো জনিমা বিবস্বতঃ (১০-৬৩-১)

(৪) "যম বিবস্বন্তং হুবে যঃ পিতা তে" (১০-১৪-৫); "ত্বষ্টা দুহিত্রে বহতুং কৃণোতীদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি। যমস্য মাতা পর্য্যুহ্যমানা ম হো জায়া বিবস্বতোন নাশ॥ অপাগূহন্নমৃতাং মর্ত্তেভ্যঃ কৃত্বী সবর্ণাম দদুর্বিবস্বতে। উতাশ্বিনাবভরৎ যৎ তদাসীদ জহাদুদ্বা মিথুনা সরণ্যুঃ॥ ১০-১৭-১, ২॥

(৫) "I bring a flood to destroy all flesh ... ... Noah only remained alive."

"একদিবস প্রাতঃকালে মনু হাতমুখ ধুইতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার হাতে একটী মৎস্য পড়িল। মৎস্য তাঁহাকে বলিল—"আমাকে পালন কর, তোমাকে আমি পার করিব।"

মনু। কি হইতে আমাকে পার করিবে ?

মৎস্য। জলপ্লাবনে সমস্ত প্রজা ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। তখন আমি তাহা হইতে তোমাকে পার করিব। সেই জলপ্লাবন যখন আসিবে, নৌকা ঠিক্ করিয়া আমার শরণাপন্ন হইবে। সেই সময় নৌকার আশ্রয় লইও। আমি তোমাকে পার করিব।

মৎস্য যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছিল সেই সময় মনু নৌকা ঠিক্ করিয়া মৎস্যকে স্মরণ করিলেন। জলপ্লাবন আসিলে, তিনি নৌকার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মৎস্য তাহাকে লইয়া ধাবিত হইল। নৌকার দড়ি মাছের শুঁড়ের সহিত বাঁধা হইল। নৌকা লইয়া মৎস্য উত্তর গিরি অতিক্রম করিয়া দৌড়িল। মৎস্য বলিল, নৌকা বৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখ ; জল যেমন ধীরে ধীরে নামিয়া যাইবে, তুমিও সঙ্গে সঙ্গে চলিবে।"

মনু সেইরূপেই জলের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। এই কারণে ইহাকেই বলে উত্তর গিরি হইতে মনুর প্রত্যাগমন। জলপ্লাবন সমস্ত প্রজা ভাসাইয়া লইয়া গেল। পৃথিবীতে এক মাত্র মনু শুধু অবশিষ্ট রহিলেন।"

নো-আর জলপ্লাবনের বর্ণনার সহিত এই বর্ণনার তুলনা করিলে দেখা যায়—উভয়ত্র নৌকার কথা, পর্ব্বতের কথা, সমস্ত প্রজার নাশের কথা, একমাত্র 'নো-আ' অথবা মনুর জীবন ধারণের কথা। নহুষ মনুরই নামান্তর কি না, অথবা নামের কোন বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে কি না পাঠক সে সম্বন্ধে নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত করিবেন। সে যাহাই হউক—(ম)নুর সন্তানই হউক অথবা নহুষের সন্তানই হউক, (ম)নু এবং নহুষ দুই ভিন্ন ব্যক্তি হইলেও বেদের মতে, সমস্ত মানবজাতি যে একপিতার সন্তান, সাদা কাল লাল পীত আর্য্য অনার্য্য সকলে একজাতি, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

(৬) মনবে হবৈ প্রাতঃ অবনেনিজ্যানায় মৎস্যঃ পানী আপেদে। স হাস্মৈ বাচমুবাদ। বিভৃহি মা পারয়িষ্যামি ত্বেতি। কথান্মা পারয়িষ্যসি। ঔঘ ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা নির্বোঢ়া তত স্ত্বা পারয়িতাস্মি। তদৌঘ আগন্তা তন্মা নাবমুপকল্প্যোপাসাসৈ। স ঔঘ উত্থিতে নাবমাপদ্যা সৈ তত স্ত্বা পারয়িতাস্মি। যতিথীং তৎ সমাং পরিদিদেশ তত্তিথীং সমাং নাবমুপ কল্প্যোপাসাং চক্রে। স ঔঘ উত্থিতে নাবমাচপদে। তং স মৎস্য উপন্যা পুপ্লুবে। তস্য শৃঙ্গে নাবঃ পাশং প্রতিমুমুচে তেনৈতমুত্তরং গিরিং অতি দুদ্রাব। বৃক্ষে নাবং প্রতিবধ্নিষ। যাবদুদকং সমবায়াৎ তাবৎ তাবৎ অন্বব সর্পাসি। স হ তাবত্তাবদেব অন্বব সসর্প। তদপ্যেতদুত্তরস্য গিরের্মনোরব সর্পণং। ঔঘঃ হ তাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা নিরুবাহাথেহ মনুরেবৈকঃ পরিশিশিষে॥"
শতপথ ব্রাহ্মণ ১-৮-১॥

সূচী

ক্যালকাটা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,—৬৫ নং সার্পেণ্টাইন লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নব্যভারত

দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড] ফাল্গুন, ১৩৩১ [১১শ সংখ্যা

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

পঞ্চম অধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চর্চের শাসনতন্ত্রের আর একটা সাধারণ লক্ষণ আছে, সেটা এখানে আলোচনা করা আবশ্যক।

বর্ত্তমানকালে যখন আমরা কোন শাসনতন্ত্রের কথা ভাবি, তখন এটা আমরা নিশ্চয় জানি যে মানুষের বাহ্য আচরণ, মানুষে মানুষে যে ব্যাবহারিক সম্বন্ধ, সেই ক্ষেত্রেই ইহার অধিকারের সীমা; এতদতিরিক্ত কোন বিষয়ে শাসনাধিকারের কোন প্রয়োগ নাই। মানুষের চিন্তা, মানুষের বিবেক, মানুষের চরিত্রনীতি, মানুষের ব্যক্তিগত মত ও ব্যক্তিগত আচার আচরণের ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্র কোন হস্তক্ষেপ করে না; এ সমস্ত ব্যাপারে মানুষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।

খৃষ্টীয় চর্চের উদ্দেশ্য ছিল ঠিক ইহার বিপরীত। সে মানুষের স্বাধীনতা, মানুষের ব্যক্তিগত আচার আচরণ, মানুষের চিন্তা প্রতীতি শাসন করিতে চাহিয়াছিল। যে সমস্ত কার্য্য এককালে নীতিবিগর্হিত ও সমাজের অকল্যাণকর কেবলমাত্র সেই সকল আচরণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য এবং কেবলমাত্র এই দ্বিবিধ লক্ষণাক্রান্ত আচরণের দণ্ডবিধানের জন্য আমরা যেমন একটা ব্যবহার সংহিতা গড়িয়া তুলিয়াছি, চর্চ তাহা করে নাই। সে নীতিবিগর্হিত সমস্ত আচরণের একটা তালিকা প্রস্তুত করিল, এবং সকল গুলিকেই 'পাপ' আখ্যান দিয়া, তাহাদের দমনের জন্য দণ্ডবিধান করিল। এক কথায়, চর্চের শাসনতন্ত্র আধুনিক শাসনতন্ত্র সমূহের ন্যায় কেবল বাহ্যমানবকে, মানুষের ব্যাবহারিক সম্বন্ধকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিল না; সে শাসন করিতে চাহিল মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি, মানুষের বুদ্ধিবিবেক, অর্থাৎ যাহা কিছু মানুষের অন্তরের সামগ্রী, যাহা অবলম্বন করিয়া সে নিজের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করে, শাসন বন্ধন মানিতে চাহে না। অতএব চর্চের উদ্দেশ্যের মধ্যেই, এবং তাহার

শাসনতন্ত্রের কতকগুলি মূলনীতির মধ্যেই এমন একটা সম্ভাবনা রহিল যে সে অত্যাচারী হইবে, অবৈধভাবে শক্তি পরিচালন করিবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এমন একটা বিরুদ্ধশক্তি উঠিয়া চর্চের শক্তিকে প্রতিরোধ করিল, যে চর্চ তাহাকে পরাজয় করিতে পারিল না। মানুষের চিন্তা ও স্বাধীনতার গতি যতই সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ থাকুক না কেন, সে সমস্ত শাসন চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া করিতে থাকে, অত্যাচারী শক্তিকে প্রতি মুহূর্ত্তেই অধিকারচ্যুত করিতে থাকে। খৃষ্টীয় চর্চের ক্রোড়ে এইরূপ ব্যাপারই সংঘটিত হইয়াছিল। আপনারা দেখিয়াছেন চর্চ পাষণ্ড-মত দলন করিতে চাহিয়াছে, স্বাধীন চিন্তা অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়াছে, ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছে এবং কর্ত্তৃত্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া মত প্রচার করিতে চাহিয়াছে। উত্তম কথা! কিন্তু চর্চের মধ্যে ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধি যেমন সতেজে ফুটিয়া উঠিয়াছে এমন আর কোন্ সমাজে ঘটিয়াছে বলুন দেখি! বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়, বিভিন্ন পাষণ্ড মত, এগুলি যদি ব্যক্তিগত মতের বিকাশ নহে, তবে কি? চর্চের মধ্যে যে মানুষের বুদ্ধি বিবেকের একটা স্বাধীন লীলা চলিতেছিল, এইগুলি তাহার অকাট্য প্রমাণ। এ লীলার ইতিহাস ঝটিকায় বিক্ষুব্ধ, বিপদ সঙ্কুল, ভ্রমবিড়ম্বিত, পাপকলঙ্কিত কিন্তু তথাপি ইহার মধ্যে একটা মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য আছে, এবং ইহা হইতে মানব মনের নানা বিচিত্র সুন্দর বিকাশ ঘটিয়াছে। এই সকল বিরোধী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া চর্চের মূল শাসন তন্ত্রের দিকেই দৃষ্টিপাত করুন; দেখিবেন ইহার গঠন ও কার্য্যপ্রণালীর সহিত ইহার কোন কোন নীতির সেরূপ মিল নাই। সে স্বাধীন সত্যানুসন্ধানের অধিকার স্বীকার করে নাই, ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধির স্বাধীনতা সে কাড়িয়া লইতে চাহিয়াছে; অথচ এই বিচার বুদ্ধির নিকটই সে অনবরত জবাব দিহি করিয়াছে, স্বাধীনতার মর্য্যাদা কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। সে কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে, কোন্ কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া কাজ করিয়া আসিয়াছে দেখুন। প্রাদেশিক সংসদ্, জাতীয় সংসদ্, সাধারণ সংসদ্, ক্রমাগত পত্র ব্যবহার, পত্রাদিদ্বারা উপদেশ-অনুযোগ প্রচার, রচনা প্রকাশ—এই সমস্তই ইহার অবলম্বিত উপায়। আর কোন শাসনতন্ত্র কখনও এত অধিক পরিমাণে স্বাধীন বিচার ও সম্মিলিত পরামর্শ দ্বারা শাসন কার্য্য চালায় নাই। এ যেন প্রাচীন গ্রীসের একটা দার্শনিক চতুষ্পাঠী; অথচ এখানে শুধু আলোচনার জন্য আলোচনা নহে, সত্যানুসন্ধানই এ আলোচনার চরম লক্ষ্য নহে; এ আলোচনার ফলে শাসনাধিকার নির্দ্দিষ্ট হইল, বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইল, মীমাংসা প্রচারিত হইল—এক কথায় শাসন কার্য্য পরিচালিত হইল। কিন্তু শাসনতন্ত্রের মর্ম্মস্থলেই মানুষের বিচার বুদ্ধির এমন একটা প্রবল ক্রিয়া চলিতেছিল, যে কালক্রমে তাহারই প্রাধান্য ও ব্যাপ্তি ঘটিল, তাহার নিকট আর সকল শক্তিই পথ ছাড়িয়া দিল; এবং চারিদিকে বিচার বুদ্ধি ও স্বাধীনতার আলোকই প্রতিভাসিত হইয়া উঠিল।

আমি একথা বলিতে চাই না যে চর্চ-অবলম্বিত কুনীতিগুলির কোন ফলই

ফলে নাই। আমাদের আলোচ্য যুগেই উহারা যথেষ্ট কুফল প্রসব করিয়াছিল, এবং পরবর্ত্তী যুগে উহারা আরও কুফল প্রসব করিয়াছে ; কিন্তু তাহাদের পক্ষে যতটা অকল্যাণ সাধন করা সম্ভব, ততটা অনিষ্ট তাহারা করিতে পারে নাই ; তাহাদের চারিপার্শ্বে একই মৃত্তিকায় যে সমস্ত কল্যাণের অঙ্কুর ছিল সে সবগুলিকে তাহারা চাপিয়া মারিতে পারে নাই।

এই হইল চর্চের স্বরূপ, এই তাহার আভ্যন্তরীণ গঠন, তাহার প্রকৃতি। এখন রাষ্ট্রপতিদের সহিত, ঐহিকশাসকবৃন্দের সহিত চর্চের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল দেখা যাউক।

রোমীয় সাম্রাজ্যের ক্রোড়েই খৃষ্টীয় চর্চের উদ্ভব ; রোমীয় শাসনতন্ত্রের পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ইহারও পরিপুষ্টি ঘটিয়াছিল ; উভয়ের রীতিপদ্ধতি, উভয়ের অভ্যাস সংস্কারে অনেক সাদৃশ্য ছিল। সেই রোমীয় সাম্রাজ্য যখন ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাহার পরিবর্ত্তে যখন চারিদিকে বর্ব্বরদলপতি ও রাষ্ট্রপতিগণ কখনও যাযাবর ভাবে, কখনও বা স্ব স্ব দুর্গ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশ শাসন করিতে লাগিল, চর্চ তখন বিপন্ন ও শঙ্কাগ্রস্ত হইয়া পড়িল।

তখন চর্চের মধ্যে একটিমাত্র প্রবল আকাঙ্খা জাগ্রত হইয়া উঠিল—এই সকল নবাগত-বৃন্দকে নিজের অধিকারে আনিতে হইবে, তাহাদিগকে চর্চের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লইতে হইবে। চর্চের সহিত বর্ব্বরদিগের প্রথম সম্পর্কের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না বলিলেই হয়। বর্ব্বরদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে, তাহাদের ইন্দ্রিয় ও কল্পনা আকর্ষণ করিতে হইবে। সুতরাং এই যুগে উপাসনা-পদ্ধতির মধ্যে জাঁকজমক সম্পন্ন নানা বিচিত্র অনুষ্ঠান প্রবেশ করিল দেখিতে পাই। ইতিহাস হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে চর্চ প্রধানতঃ এই উপায়েই বর্ব্বর সমাজকে বশ করিয়াছিল। তাহারা যখন নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিল, চর্চের সঙ্গে যখন তাহাদের একটা সম্বন্ধবন্ধন ঘটিল, তখনও কিন্তু চর্চ তাহাদের পক্ষ হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ হইতে পারে নাই। বর্ব্বরদিগের পাশবতা ও প্রবৃত্তি-প্রবণতা এরূপ প্রবল ছিল যে নূতন ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মভাব তাহাদের উপর সামান্যমাত্র প্রভাব স্থাপন করিতে পারিল। বর্ব্বরসুলভ অত্যাচার উপদ্রব শীঘ্রই আবার মাথা তুলিয়া উঠিল, এবং সমাজের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় চর্চও এই উপদ্রবের ফলভাগী হইল। পূর্ব্বে রোমীয় সাম্রাজ্যের শাসনকালেই চর্চ অস্পষ্টভাবে একটি নীতি প্রচার করিয়াছিল যে ঐহিক শাসনশক্তি ও পারত্রিক শাসনশক্তি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ও পরস্পরনিরপেক্ষ। এখন আত্মরক্ষার জন্য চর্চ এই পুরাতন নীতিটি পুনরায় ঘোষণা করিয়া দিল। এই নীতির বলেই চর্চ বর্ব্বরসংসর্গে স্বচ্ছন্দভাবে বাস করিতে পারিয়াছিল ; সে প্রচার করিল যে ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মমতের উপর শাসন শক্তির কোন অধিকার নাই ; ব্যবহারিক জগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। এ নীতি যে সমাজের পক্ষে কিরূপ কল্যাণকর হইবে তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। চর্চের ত ইহাতে সাংসারিক সম্পর্কে উপকার হইলই, তাহাছাড়া ইহাদ্বারা একটা বড় কাজ এই হইল যে একই সমাজে বিভিন্ন শাসনশক্তি কিরূপে পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পরস্পরের ন্যায্য অধিকারের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে ও পরস্পরকে সংযত করিয়া সমাজকে অত্যাচার-উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিতে পারে

তাহা এই নীতিপ্রবর্তনের ফলেই প্রথম দেখা গেল। পরন্তু, সাধারণভাবে সমগ্র চিন্তাজগতের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়া ইহা ব্যক্তিগত চিন্তার স্বাতন্ত্র্য-প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। চর্চ বলিল, ধর্ম্মবিশ্বাসপদ্ধতির উপর বাহ্যশক্তির জোর খাটে না; ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব চিন্তা ও বিশ্বাসের সম্বন্ধে চর্চ-কথিত নীতি প্রয়োগ করিতে লাগিল। বাস্তবিক পক্ষে চর্চের স্বাতন্ত্র্যনীতি ও ব্যক্তিবিবেকের স্বাতন্ত্র্যনীতি উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

দুঃখের বিষয় যে স্বাতন্ত্র্যলিপ্সা অতি সহজেই প্রভুত্বলিপ্সায় পরিণত হয়। চর্চের পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। মানবস্বভাবসুলভ দুরাকাঙ্খা ও অহঙ্কারের প্রভাবে চর্চ শুধু ধর্ম্মতন্ত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, সে ঐহিক শাসনতন্ত্রের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু একথা মনে করিবেন না যে মানবচরিত্রসুলভ দৌর্ব্বল্যই ইহার একমাত্র কারণ; ইহার আরও কতকগুলি গভীরতর কারণ আছে, সেগুলি জানা আবশ্যক।

যখন চিন্তাজগতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বিরাজ করিতেছে; যখন মানুষের বুদ্ধি ও বিবেক এমন কোন শক্তির অধীন নহে যে তাহার বিতর্ক মীমাংসার অধিকার অস্বীকার করে, বা তাহার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করে; যখন সমাজের মধ্যে এমন একটা সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষ গঠন-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মশাসনতন্ত্র নাই যে লোকের মতামত নির্দ্দেশ করিয়া দিবার অধিকার প্রয়োগ করে; তখন ধর্ম্মব্যবস্থা কর্তৃক ঐহিক ব্যবস্থার উপর আধিপত্যস্থাপন সম্ভবপর নহে। জগতের বর্ত্তমান অবস্থা অনেকটা এইরূপ। কিন্তু যখন দশম শতাব্দীতে যেমন ছিল সেইরূপ একটা ধর্ম্মশাসনতন্ত্র থাকে; যখন মানুষের চিন্তা ও বিবেক একটা শাসনাধিকার-সম্পন্ন কর্তৃত্বশক্তির বিধিব্যবস্থা দ্বারা আবদ্ধ; তখন এটা স্বাভাবিক যে এই ধর্ম্মশাসনতন্ত্র ক্রমশঃ ঐহিক ব্যাপারেও আধিপত্য স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইবে। সে বলিবে—"একি কথা? মানুষের মধ্যে যাহা সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন তাহার উপর আমি অধিকার ও প্রভাব প্রয়োগ করিতেছি, আমি মানুষের চিন্তা, মানুষের আকাঙ্খা, মানুষের বিবেক শাসন করিতেছি; আর মানুষের বাহ্য আচরণ, মানুষের ঐহিক ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করিতে পারিব না? আমি সত্য ও ন্যায় ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা, অথচ সত্য ও ন্যায় ধর্ম্ম অনুসারে মানুষের সাংসারিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে আমার কোন অধিকার নাই?" এই যুক্তির বলে ধর্ম্মশাসনতন্ত্র যে ঐহিক ব্যাপারে অধিকার বিস্তার করিতে চেষ্টা করিবে ইহা ত অবশ্যম্ভাবী। তখন আবার মানবচিন্তার সমস্ত গতি চর্চের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল; তখন ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্যাই একমাত্র বিদ্যা ছিল; ধর্ম্মতত্ত্বপদ্ধতিই একমাত্র চিন্তাপদ্ধতি ছিল; অলঙ্কার বলুন, গণিত বলুন, সঙ্গীত বলুন, অন্য সমস্ত বিদ্যাই ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্যার অন্তর্গত ছিল। (ক্রমশঃ)

(শ্রীযুক্ত বিনয়কুমারসরকার, এম্, এ, মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।)

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

হিন্দু মুসলমান সমস্যা

বিশেষজ্ঞেরা এই বিষয়ে অনেক কথাই বলেছেন ও লিখেছেন। আমি রাস্তার লোক --সব কথা বুঝিনি। তাই রাস্তার লোকের সন্দেহসংশয়কেই একটু ফুটিয়ে তুলতে চাই।

প্রথমেই গোলযোগ বাধে এই নিয়ে যে হিন্দুমুসলমানের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ কতটা বৃটীশ শাসনের ফল। প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই বিদ্বেষ, তার পূর্ব্বে ছিল কি না এবং বৃটীশ শাসনের ব্যাপ্তির সঙ্গে এই বিদ্বেষ বেড়ে উঠছে কিনা।

বিদ্বেষ যে ছিল না একথা ঐতিহাসিকেরা আজ পর্য্যন্ত প্রমাণ করতে পারেন নি এবং যতদিন তা না পারছেন ততদিন এর অস্তিত্ব মেনে নিতে আমরা বাধ্য। বাধ্য এই জন্য যে দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি সৌহৃদ্য থাকত তা হলে বৃটীশ শাসন সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা আমরা পেয়েছি, সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে মানতে পারা যায় না যে এর দ্বারাই ওই সৌহৃদ্য বাঁধন ছিন্ন হয়েছে। মানতে গেলে বুদ্ধিকে নিয়ে বড় বেশী টানাহেঁচড়া করতে হয়। বৃটীশ শাসনই যে অনিষ্টের মূল কারণ এই যুক্তি নিতান্ত দুর্ব্বল বোধ হয়, যখন এই যুক্তির মতলবটা আমাদের চোখে পড়ে। জাতীয়তার দুর্গ বজায় রাখতে হলে শত্রুর ঘাড়েই দোষ চাপান উচিত নয় কি? হাঁ উচিত এবং কাজ চালানোর পক্ষে দরকারও। কিন্তু সত্যটাকে বুঝে রাখতে দোষ কি? তারপর কথা এই যে যদি বৃটীশশাসনই করে থাকে তা হলে কি কি উপায়ে করেছে। উপায় প্রধানতঃ দুটী (১) রাজনৈতিক ব্যাপারে দুই সম্প্রদায়ের প্রতি ব্যবহার ভেদ এবং (২) বিদ্বেষের বীজ ছড়ানোর জন্য খুব বড় রকমের প্রচারসংঘের সৃষ্টি। কিন্তু ব্যবহার ভেদ ত খুব অল্প দিনের। বখরা করে চাকরী দেওয়া এবং কাউনসিলে আলাদা প্রতিনিধির বন্দোবস্ত করা—সে ত বিংশশতাব্দীর ব্যাপার, প্রায় স্বদেশী আন্দোলনের সমসাময়িক। আর প্রচার সংঘের কোন প্রমাণ পেয়েছি কি? শয়তানকেও তার প্রাপ্য দাও—এই নীতি খুব সমীচীন; বিশেষতঃ সত্যানুসন্ধানের সময়।

যাক্, এসম্বন্ধে কোন চরম সিদ্ধান্তে না হয় নাই আসলাম। না হয় মেনেই নিলাম যে বৃটীশ শাসনকেও অব্যাহতি দেওয়া যায় না। নাই গেল কিন্তু এই খানেই কি শেষ? যদি অন্য কারণ বিদ্যমান থাকে তবে দেখতে হবে কোনটা প্রবলতর, কোনটা মৌলিক। এই দেখার উপরই সমস্ত নির্ভর করছে।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে বৃটীশ শাসনের সঙ্গে হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বাড়ছে কি না। হাঁ, বাড়ছে বলেই মনে হয়, তবু এই দুটোকে কার্য্যকারণভাবে যুক্ত করে ফেলা অন্যায় হবে—কতকটা কাকতালীয়ের মত। মূল কারণ কি? এই বিদ্বেষের শিকড় কোথায়? এটা বুঝলে তবে এই শিকড় উপড়াতে আমরা সক্ষম হব।

যদি বিশেষজ্ঞদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে, আমরা বাংলাদেশের দৈনন্দিন জীবনের দিকে দেখি তা হলে সব চেয়ে চোখে পড়ে, জীবনের ক্ষেত্রে এই দুই সম্প্রদায়ের কোথাও এতটুকুও মিল নেই। কলেজে যাও দেখবে মুসলমান ছাত্রেরা আলাদা বসে জটলা করছে,

তাদের জল খাওয়ার জায়গা পর্য্যন্ত আলাদা। যে কোন হিন্দু ছাত্রকে জিজ্ঞাসা কর, তার মুসলমান বন্ধু কয়জন আছে, কয়জনের বাড়ীতে সে যায়; কেহই নেই। হিন্দু গৃহস্থের বাড়ীতে কখনও কোন অবকাশেই মুসলমান বন্ধুর, মুসলমান অতিথির, মুসলমান নিমন্ত্রিতের সমাগম হয় না। এমন কোন সামাজিক উৎসব বা অবসর নেই যেখানে হিন্দু ও মুসলমানের একত্র সমাবেশ হতে পারে। হাওড়া ষ্টেশনে যাও দেখবে হিন্দুর চায়ের দোকান আলাদা, মুসলমানের চায়ের দোকান আলাদা। হিন্দুর লেখা প্রবন্ধ পড়, গল্প পড়, উপন্যাস পড়, দেখবে মুসলমান চরিত্র আদৌ নাই; যেখানে আছে তাও বিদ্রূপমাত্র। হিন্দুকে জিজ্ঞাসা কর, রমজান কি বলতে পারবে না; শুধু এই রমজান না কি একটা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময় নিয়ে গোলমাল উপস্থিত হয়, এরই একটা তিক্ত স্মৃতি অনেক হিন্দু ছাত্রের মনে জাগরূক রয়েছে। ক্লাবে যাও, দেখবে হিন্দু ক্লাবে মুসলমান সভ্য আদৌ নাই। যেখানে পাঁচজন হিন্দু একত্র হয়েছে, সেখানে মুসলমান সম্বন্ধে কথা উঠলেই এমন অশ্লীল ভাষা ও ঘোর অজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় যে আমরা আশ্চর্য্য হই না শুধু তা নিতান্ত গা সওয়া হয়ে গেছে বলে। আমি হিন্দুর দিকে একটু ঠেস দিয়ে বলেছি, কেন না নিজে হিন্দু; কিন্তু মুসলমান সম্বন্ধেও ঐ একই কথা খাটে। অথচ এই বাংলাদেশেই অর্দ্ধেক হিন্দু, অর্দ্ধেক মুসলমান। আশ্চর্য্য!

এই কথাগুলো খুব পচা, পুরাণো ও কদাকার, তবু এর মধ্যে একটু ভাববার আছে —এই আমার বিনীত নিবেদন। আমি বিশেষজ্ঞদের কিছু বলছি না। কিন্তু যাঁরা আমার মত রাস্তার লোক, তাঁদের অনুরোধ করছি যে তাঁরা কংগ্রেসের ও ইউনিটি কন্‌ফারেন্সের রিপোর্টের বা প্রাগব্রিটীশ যুগের ইতিহাসের পাতা না উল্টে যদি এই দিকে একটু চোখ দেন তা হ'লে হয়ত একটু আলো দেখতে পাবেন। কেন না এই অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিসগুলা খুব সুবৃহৎ সত্যের ইঙ্গিত মাত্র। সেই সত্যটি এই যে হিন্দুর ও মুসলমানের সামাজিক শ্রেণীচেতনার বৃত্ত কোথাও পরস্পরকে ছেদন করে না। এরা সম্পূর্ণ আলাদা হয়েই অবস্থান করছে। এদের প্রকাশ্য লড়াইগুলো শুধু এক অপ্রকাশ্য ও সদাস্থায়ী যুদ্ধ ঘোষণার লক্ষণ মাত্র। হিন্দু মুসলমান সমস্যার এইটেই সব চেয়ে বড় কথা। আমি এইটেকেই আর একটু পরিষ্কার করে তোলবার চেষ্টা করব।

এই শ্রেণীচেতনা ইউরোপে দেখা গিয়েছে, Nationalismএর রূপ ধারণ করে, এবং Nationএর গণ্ডীর ভিতর, Proletariat এবং Bourgeoisieএর অন্তর্ব্বিরোধের মধ্য দিয়ে। সেখানে দেখি প্রত্যেক Nationই তার নিজের নিজের বৃত্তের ভিতর নৈতিক মূল্যগুলি পূর্ণমাত্রায় মেনে চলে, কিন্তু তার বাইরে সেগুলো কাজে লাগাতে চায় না। Germany এ কথা ভেবে দেখে না যে তার cartel চালানোর ফলে ইংলণ্ডের কয়েকটি দরিদ্র মজুর ও তাদের অসহায় স্ত্রীপুত্র অনাহারে কষ্ট পাবে কিনা। এই ভেবে দেখাটা কেউ আশাও করে না। কেন না নেশনের লক্ষ্যই হল অপর নেশনের সহিত টক্কর দিয়ে জেতা; সুতরাং টক্করের বাজীতে কোনরূপ প্রেমের ভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া, আত্মহত্যার পরিচায়ক। Problatariat ও Bourgeoisie মধ্যেও কতকটা এই মরিয়া ভাব এসে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু

গত যুদ্ধের সময় দেখা গিয়েছে যে, নেশনের সীমারেখার বাইরে, এদের বিরোধ নিভে যায়। তাই যাঁরা আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী, তাঁরা অনেকে আন্তর্জাতিক Bourgeoisieর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক Proletariatকে খাড়া করতে চান, এবং মনে করেন ন্যাশনালিজমকে টিপে মেরে ফেলার এইটেই প্রকৃষ্ট পন্থা। একটু আদর্শবাদী যাঁরা তাঁরা cultureএর ভিতর দিয়ে হৃদয়ের প্রসার বাড়িয়ে ন্যাশনাল চেতনার উগ্রতাকে একটু শীতল করতে চান।

সে যাই হোক্ আমার বক্তব্য এই যে শ্রেণীচেতনা সমূহ-বোধ যখনই বেশ বেড়ে ওঠে তখনই তা মারমুখী হয়ে দাঁড়ায়, কেন না তার স্বভাবই এই, তার ধর্ম্মই এই। অবশ্য এই সমূহ-বোধের তীব্রতার অনেক ধাপ আছে। একটা পরিবারের মধ্যেও বেশ সমূহবোধ দেখা যায়, কিন্তু এই সমূহবোধ সেই পরিবারের সমস্ত জীবনকে আবেষ্টন করে থাকে না। তবু যতদূর তার প্রভাব পৌঁছয়, ততদূর পর্য্যন্ত অন্য পরিবারের মঙ্গল অমঙ্গল হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে না। একটা সহরের মধ্যেও এইরূপ বোধ জন্মাতে পারে। কিন্তু যখনই এই শ্রেণীবোধ কোন মানবসমষ্টির সমস্ত জীবনকে সম্পূর্ণভাবে ঘিরে ফেলে, তখনই অন্যান্য সমষ্টির সহিত সমস্ত নৈতিক সম্পর্ক আল্গা হয়ে পড়ে। প্রশ্ন এই যে হিন্দু-মুসলমানের ক্ষেত্রে কি ওইরূপ হয়েছে।

হাঁ হয়েছে এবং এই দিক থেকেই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমস্ত তথ্যগুলির একমাত্র মীমাংসা হতে পারে, এইটেই আমার স্থির বিশ্বাস। বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ। এই অঙ্কের মর্য্যাদা রাখার জন্য মুসলমানেরা সরকারী চাকরীর শতকরা পঞ্চান্ন-ভাগের কড়ায় গণ্ডায় হিসাব চায়। কেন চায়? বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে অব্রাহ্মণ ও অকায়স্থের সংখ্যা খুব সম্ভব আশীভাগ। কই তারা ত শতকরা আশীভাগ চাকরীর হিসাব চায় না। যদি সমস্ত বাংলাদেশকে একটা সমষ্টি মনে করে কাজ চালাতে হয়, তবে চাকরীর বিতরণ নির্ণীত হবে কতকটা যোগ্যতার দ্বারা এবং কতকটা আকস্মিকতার দ্বারা। যদি তাও না হয়, যদি দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বখরা করেই দিতে হয় তবে দিতে হবে—সরকারী চাকরীই যাদের একমাত্র আশ্রয় তাদের সংখ্যা হিন্দুদের মধ্যেই বা কত এবং মুসলমানের মধ্যেই বা কত—এই অনুপাতে। এই হল প্রকৃত মাপকাঠি। এর স্বপক্ষে আমি কিছুই বলতে চাই নে। চাকরী দাও, পঞ্চান্নভাগ কেন পঁচানব্বই ভাগ দাও; যদি এতেই বিদ্বেষ মেটে তবে সমস্ত দাও, তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু দাবীর পিছনে এই উগ্রতা কেন? এই কড়ায় গণ্ডায় হিসাব চাওয়া কেন? এটা কি লক্ষ্য করবার জিনিস নয়? এটা লক্ষ্য করি বলেই প্যাক্টচুক্তির স্বপক্ষে খুব চোখা চোখা যুক্তিগুলিও আমার কাছে অত্যন্ত ভোঁতা ঠেকে। কেন না বেশ দেখতে পাই রক্তচক্ষুই এখানে দুই পক্ষেরই প্রধান যুক্তি। অন্য যা কিছু তা এই রক্তচক্ষুকেই একটু ভদ্রতার আবরণ দেওয়ার জন্য।

কাউনসিলে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ব্যাপারেও ঐ একই কথা খাটে। একজন মুসলমানকে জিজ্ঞাসা কর, তার কি কি স্বার্থ রক্ষার জন্য সে আলাদা প্রতিনিধি চায়; হয়ত একটা ফর্দ্দ দেবে, কিন্তু তাতে কিছুই পরিষ্কার বোঝা যাবে না। উভয় সম্প্রদায়ের অবস্থা ত একই; যা কিছু প্রভেদ তা ধর্ম্ম নিয়ে। কিন্তু ধর্ম্ম ত সর্ব্বসম্মতিক্রমে আইন-পরিষদের বাইরে। তা হলে কি হয়। তার মুখের দিকে চেয়ে দেখ, দেখবে আঁকা

রয়েছে একটা অস্পষ্ট আশঙ্কার ছাপ না, হিন্দুর হাতে আমাদের স্বার্থ—তা সে যাই হোক্ না কেন—কখনই নিরাপদ নয়। তার মুখে দেখবে নিজের অধিকার বজায় রাখার একটা ক্ষুব্ধ জিদ। এতেই ওই ফর্দটা বেশ জলের মত বোঝা যাবে। জিদ! হিসাব! আত্মপ্রতিষ্ঠা! তবে আর প্রশ্ন করে লাভ কি?

এখন গরুতে এসে পৌছান যাক্। এই নিরীহ জীবটি যে কোটি কোটি লোককে এমন করে ক্ষেপিয়ে তোলে এতে হাসবার বিষয় অনেক আছে। কিন্তু হাসি আসে না, কেননা মাথার উপর একটু দরদ আছে; থাকা খুবই স্বাভাবিক। গরুর উপর হিন্দুদের এই অশ্লীল অনুরাগের কারণ কি? উত্তর, মহাত্মাজী পর্য্যন্ত বলেছেন, গরু ও হিন্দুধর্ম্ম একই জিনিষের বিভিন্ন নাম মাত্র—"Hinduism is nothing if not cow-protection." এরূপ দুর্ভেদ্য জায়গায় আশ্রয় নিলে হতাশ হয়ে পড়তে হয়। এটাকে ক্ষমা করা যেত যদি বুঝতাম এটা শুধুই ভুল, শুধু অযৌক্তিকতারই একটা নিদর্শন মাত্র, কিন্তু তা নয়। রক্তপতাকা উড়িয়ে গোরক্ষিণী সভার সভ্যরা যখন গান করতে করতে যায়, তখন তারা যে শুধু ভুল করে তা নয়; তারা একটা জেদের পরিচয় দেয়, মুসলমানের গো-হিংসার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই আমরা গরুরই চার পা ধরে তাকে আকাশের উপর তুলে ধরব। মুসলমানও ছেড়ে কথা কয় না; সেও হিন্দুদের ভুল ভাঙ্গবার জন্য কৃতসংকল্প। জেদের বিরুদ্ধে জেদ! শ্রেণীচেতনা! সমূহবোধ! তবু একতরফ থেকে ছেলেদের জন্য দুধ জোগাড় করার এবং অন্যতরফ থেকে গরীবের জন্য সস্তায় খাদ্য সংস্থান করার অনন্ত তর্ক! অবাক্ হয়ে যেতে হয়।

ব্যাপার এই, হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। দুজনে দেখা হলেই একজনের অন্তরাত্মা বলে "কাফের", আর একজনের অন্তরাত্মা বলে "নেড়ে কোথাকার!" তারপর যুক্তিবিচার আরম্ভ হয়। এইখানেই সমস্ত গোল। ইউরোপে যেমন জর্ম্মাণি ও ফ্রান্স, এখানেও তেমনই হিন্দু ও মুসলমান। অন্ততঃ পঞ্জাবে তাই। বাংলা দেশেও তার আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। কেউ কারুর মুখের দিকে তাকায় না। উভয়পক্ষই নিজের জেদ বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। prestigeএর জন্য তারা সব ত্যাগ করতে প্রস্তুত। তাই ছোটখাট খোঁচাখুঁচি অবিরাম চলেছে—জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই; শুধু মাঝে মাঝে একটা বড় রকমের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তখন তাড়াতাড়ি আমরা সভাসমিতির আয়োজন করি।

আমি একটু রঙ ফলিয়ে বলেছি একথা জানি, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত সত্যকে, কোনমতে অস্বীকার করা চলে না। আমি স্থিরনিশ্চিত যে হিন্দু মুসলমানের বিদ্বেষের মূলে কোন নির্দ্দিষ্ট কারণ নেই। এদের grievances অভিযোগগুলো নিতান্ত বাজে জিনিষ—অবিমিশ্র ছলনা। এই অভিযোগ মেটানের চেষ্টা করে যদি বিদ্বেষ দূর হবে বলে বিশ্বাস করি—যা আমরা করে আসছি—তা হলে ঠকতে হবে, ভয়ঙ্কর ঠকতে হবে, আর ঠকছিও। শোনা গেছে যে ইউনিটি কনফারেন্সে একজন হিন্দু প্রতিনিধি চিৎকার করে উঠেছিলেন "Lay your cards on the table." এতে কয়েকটি মুসলমান

প্রতিনিধি ভয়ঙ্কর চটে গিয়েছিলেন। চটবার কথা; বাস্তবিকই। There are absolutely no cards to lay out, on either side! এই ত এই খেলাটার মজা! তা না হলে আর জমবে কেন।

কথা এই যে এই দুই সম্প্রদায় সামাজিক লুটপাটের চুলচেরা বখরা চায়। তাদের হৃদয় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন; তাই সদাই ক্ষোভ, সদাই সংশয়, সদাই আশঙ্কা। তাইত, আমি যদি একটু জমি ছেড়ে দিই তা হলে ও হয়ত তৎক্ষণাৎ দখল করবে। এইখানেই গোলযোগ। এই Nervousnessকে দূর করতে হবে। দূর করার জন্য আমার কতকগুলা অদ্ভুত অদ্ভুত প্ল্যান আছে। এই প্ল্যানগুলির একটু ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করব।

সমূহবোধ জিনিসটার একটা দাম আছে। জীবনসংঘর্ষে যারাই দল বাঁধতে পারবে তারাই জিতবে—এটা সহজ সত্য। কিন্তু এই দল বাঁধা প্রয়োজনমূলক হওয়া চাই। অর্থাৎ জীবনের সত্যকারের দ্বন্দ্ব যেগুলি, সেইগুলিই হবে দল বাঁধবার রশি। যদি তা না হয়, তবে দল বাঁধলেও তা কাজে আসবে না। ন্যাশনালিজমের সার্থকতা এই যে তা আমাদের কাজে আসে। রাষ্ট্র হল যৌথভাবে কাজ করবার সর্ব্বপ্রধান যন্ত্র। সুতরাং কোন এক মানবসমষ্টি যদি ঐক্যভাবের বলে একটা রাষ্ট্রের সৃষ্টি করতে পারে, ত সংসারে তারা জয়ী হওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু এই ঐক্যভাব সৃষ্টি হয় কিসে? ইতিহাসের ঐক্য, ভাষার ঐক্য, জয়পরাজয়ের স্মৃতির ঐক্য এইগুলির দ্বারা। এর মধ্যে Volitional factor—ইচ্ছাগত কারণ খুবই কম। ন্যাশনালিজমের আইডিয়াল হল, একই আইন, একই প্রথা, একই আকারের অধীনস্থ থাকা; যাদের সঙ্গে হৃদয়ের বাঁধন গজিয়ে উঠেছে, সমস্ত সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে তাদের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকা। কিন্তু প্রয়োজনের দিক দিয়ে ন্যাশনালিজমের বাঁধনই যে চূড়ান্ত একথা মানা যায় না। ধরা যাক্ ধনবিভাগ। এই দিক থেকে, এক নেশ্যনের শ্রমিকের সহিত অপর নেশ্যনের শ্রমিকের যে স্বার্থৈক্য, সেই নেশ্যনেরই ধনীর সঙ্গে ততটা নয়। কিন্তু শ্রমিকদের মধ্যে আন্তর্জাতিক সমূহবোধ গড়ে ওঠে নি। তাতে বাধা দেয় যে সমস্ত social emotion—সামাজিক আবেগ আমরা পরম্পরাসূত্রে পেয়েছি, সেইগুলি। এই আবেগগুলি বুদ্ধির খাতির রাখে না; স্বার্থৈক্য না থাকলেও ইংরাজ ধনী ও ইংরাজ শ্রমিকের মধ্যে দেখা হলেই "Hallo man! আপনি এসে পড়ে। কিন্তু নবযুগের শিক্ষা এই যে স্বার্থৈক্য ও প্রয়োজনৈক্যের বিচার করে আমরা চেষ্টার দ্বারা একটা নূতন সামাজিক আবেগের সৃষ্টি করতে পারি। এইরূপে একটা নূতন সমূহবোধ গড়ে উঠতে পারে।

একটা নূতন সামাজিক আবেগের সৃষ্টি করে একটা নূতন শ্রেণীচেতনা গড়তে পারি—এ একটা যুগান্তকারী শিক্ষা। এই ভারতবর্ষে দেখি একটা Fideral রাষ্ট্রের মালমশলা বেশ মজুত রয়েছে। বাঙ্গালী হিন্দুদের পরস্পরের প্রতি টান, তাদের সহিত পঞ্জাবী হিন্দুর টানের চেয়ে বলবত্তর। আবার বাঙ্গালী হিন্দুর ও পঞ্জাবী হিন্দুর যে কালচারের ঐক্য রয়েছে সেটা অভারতীয়ের সহিত কারবারে তাদের হৃদয়কে মিলিয়ে রাখে। এই পর্য্যন্ত বেশ। কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে প্রাদেশিকতাবোধ খুবই কম। সমস্ত

মুসলমানই নিজেদের এক ভাবে। আবার তারা অভারতীয় মুসলমানদের ভারতীয় হিন্দুদের চেয়ে বেশী আপনার ভাবে। সুতরাং প্রশ্ন হল দুটি (১) কি করে সমস্ত ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা সমূহবোধ আনা যায় এবং (২) কি করে প্রত্যেক প্রদেশের হিন্দুমুসলমানের মধ্যে আর একটা সমূহবোধ আনা যায়। এই হল অঙ্ক। গরু কাটা, চাকরী দেওয়া এগুলো আনুসঙ্গিক ব্যাপার। এখন এর সমাধান কি?

মুসলমান যে মুসলমানকে আপনার ভাবে, তাহার প্রধান কারণ উভয়ের আচার ব্যবহার একই। হিন্দুদের ক্ষেত্রেও তাই। এই আচরণ-নিষ্ঠার আইডিয়ালকে উভয় সম্প্রদায়ই খুব বড় করে দেখেছে এবং সেইজন্য আচরণ-বৈষম্যের প্রতি উভয়ের মনেই একটা নির্ব্বিচার ঘৃণা জন্মায়। ভাষার প্রভেদ নাই বললেও চলে, পঞ্জাবে ও বাংলায় ভাষা একই। সম্প্রদায় হিসাবে যা কিছু বৈষম্য তা একমাত্র আচার ব্যবহার নিয়েই।

কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিতগণের intellectualsদের মধ্যে বিরোধ আর একটু গভীরতর। ইতিহাস চর্চ্চা করার ফলে হিন্দু কালচার ও মুসলমান কালচারের প্রভেদ এঁদের চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ে এবং বিভিন্ন কালচারের উপাসনা করে, এঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতা খুব জমাট হয়ে দাঁড়ায়। উচ্চতর আবেগের প্রভাব থাকে বলে তাঁদের বিরোধ আরও তীব্র হয়ে পড়ে। হিন্দুরা পৌত্তলিক বলে নিরক্ষর ও সাধারণ মুসলমানের মনে কোন ঘৃণা আসে না, কিন্তু শিক্ষিতগণের অনেকেরই মনে আসে।

আমি ধর্ম্ম বিশ্বাসের প্রভেদ না বলে, আচরণ বৈষম্যই বলেছি। কেননা শুধু বিশ্বাস জিনিষটা চোখে ঠেকে না; ঠেকে ঐ বিশ্বাস অনুযায়ী কার্য্যগুলি। ঐগুলিকেই আমি আচার নাম দিয়েছি।

সুতরাং দেখ যাচ্ছে হিন্দুমুসলমান সমস্যার পিছনে রয়েছে:—

প্রথমতঃ—হিন্দুরা পৌত্তলিক। যারা গোঁড়া মুসলমান তারা পৌত্তলিকতাকে ঘৃণা করে।

দ্বিতীয়তঃ—ধর্ম্মবিশ্বাসকে আশ্রয় করে, যে সমস্ত আচার ব্যবহার রয়েছে সেগুলি হিন্দুদের মধ্যে আলাদা মুসলমানদের মধ্যে আলাদা, এবং সেগুলি উভয় সম্প্রদায়ই খুব নিষ্ঠার সহিত পালন করে।

তৃতীয়তঃ—জীবনের যে সমস্ত কাজে হৃদয়ের টান আছে সেখানে হিন্দু ও মুসলমান একত্র মেলার একটুও অবকাশ পায় না। সেইজন্য পরস্পরকে অপরিচিত ঠেকে এবং পরস্পরের মতলবের ও গতিবিধির প্রতি একটা অস্পষ্ট সন্দেহ ও আশঙ্কা উপস্থিত হয়।

চতুর্থতঃ—শিক্ষাবিস্তারের ফলে শিক্ষিতগণ কালচারের বিশেষত্ব ও বিভিন্নতাগুলি খুব তীব্রভাবে হৃদয়ঙ্গম করেন। সম্প্রদায়ের সমস্ত যৌথ কার্য্যের এঁরাই হলেন প্রতিনিধি। শ্রেণীচেতনাকে এঁরাই নানাভাবে প্রস্ফুট করে তোলেন এবং suggestionএর দ্বারা অশিক্ষিতগণের মধ্যেও ছড়িয়ে দেন। বৃটীশ শাসন যে হিন্দুমুসলমানে বিদ্বেষ এনেছে তা এই দিক দিয়েই।

পঞ্চমতঃ—হিন্দুরা, দুর্ব্বল ও নির্ব্বিরোধ বলেই মুসলমানদের মনে বিশ্বাস জন্মে গিয়েছে যে তাদের সমস্ত দাবী তারা সহজেই কাজে পরিণত করতে পারবে।

এইবার আমার Utopia গুলি কি তার আভাস দিচ্ছি।

(১) আচারনিষ্ঠতার ideal কে দূর করবার জন্য একটা নূতন idealএর প্রচার করা। আমি একটা economic idealএর সন্ধান দিচ্ছি। হিন্দু শ্রমিক ও কৃষকদের এবং মুসলমান শ্রমিকও কৃষকদের একত্র করে উভয় সম্প্রদায়েরই ধনীদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে, একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করা যেতে পারে। এতে নূতন সমূহবোধ উদয় হয়ে সাম্প্রদায়িক সমূহবোধকে ক্ষুণ্ণ করে ফেলবে।

(২) ধর্ম্মবিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান যে অবস্থাবিশেষের ও আকস্মিকতার ফল, এদের দাম ততটুকুই, যতটুকু এরা আমাদের সত্যিকারের দরকার আসে—এইরকম একটা pragmatic philosophyও প্রচার করা। কোরাণ শরিয়ৎ ও স্মৃতিশাস্ত্রের আদেশগুলো তখন আর তেমন অলঙ্ঘনীয় মনে হবে না।

(৩) ধর্ম্ম নিয়ে যারা বাড়াবাড়ি করে—Hindu first, Bengali next, Mahammadan first, Indian next—এদের বিরুদ্ধে একটা Campaign of ridicule সৃষ্টি করা যেতে পারে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করাই যে indecent এরকম একটা idea ছড়াতে পারলে অনেক উপকার হওয়ার সম্ভাবনা।

(৪) হিন্দু ও মুসলমানদের ভালবাসার বাড়াবাড়িকে খুব militant ভাবে কথায় বার্ত্তায় ব্যবহারে এবং গল্প ও উপন্যাসের মধ্য দিয়ে প্রচার করা।

(৫) আমার সব চেয়ে Practical plan হল—হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষিতদের নিয়ে একটা সমিতি স্থাপন করা। এই সমিতির উদ্দেশ্য হবে, বাঙ্গলাদেশের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে একটা সমূহবোধের সৃষ্টিকরা। সভ্যদের কাজ হবে, বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমান শুধু বাঙ্গালী বলেই অন্যান্য দেশের ও প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমান থেকে কিসে কিসে বিভিন্ন তা ফুটিয়ে তোলা এবং খুব ভাবের রঙ ফলিয়ে তা প্রচার করা। স্বার্থের ঐক্যে আমরা কতদূর আবদ্ধ তা শুধু পুনরুক্তির জোরে লোকদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং ক্রমে তা থেকে হৃদয়ের ঐক্যও জন্মাতে পারে। সমিতির সব চেয়ে বড় কাজ হবে, শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান যুবকদের মধ্যে এমন একটা mentality ঢুকিয়ে দেওয়া যাতে তারা সমস্ত জিনিষই সমগ্র বাংলার দিক থেকেই দেখে। Intellectualদের দলে টানতে পারলেই massও দলে আসবে। আমি intelletualদের Convert করে কার্য্য সিদ্ধি করার সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। আমার স্বপক্ষে Maxim Gorkyর নজির দেখাতে পারি। তারপর একটা কাগজও বের করা যেতে পারে; এই কাগজে young Turkey যারা খিলাফৎ দূর করে দিয়েছে তাদের আদর্শ ও কাজ নিয়ে আলোচনা করা হবে; পৌত্তলিকতা ও গবানুরাগের বিরুদ্ধেও একটু আধটু লড়াই করা চলতে পারে। প্রথমে দরকার এমন কয়েকটি যুবক যাঁরা বাঙ্গলা দেশকে একটা unit করে পৃথিবীর ধুলামাটির লড়াইয়ে জিতবার idealএ সম্পূর্ণ বিশ্বাসী।

আসল কথা মাড়োয়ারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেই হোক্ বা ইংরাজকে গালাগাল দিয়েই হোক্ বা নেশ্যালিজম প্রচার করেই হোক্ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা common social emotion তৈরী করা। আর একটা বিরুদ্ধ emotionএর সাহায্য না নিলে বর্ত্তমান আচার নিষ্ঠার emotionকে দমন করতে পারব না। যুক্তির জের এই emotion এর উপরই আমি বেশী জোর দিতে চাই। এইরূপ একটা emotion এর সাহায্যে যেদিন পরস্পরের সম্বন্ধে আর কোন nervousness থাকবে না সেই দিনই হিন্দু-মুসলমান সমস্যা প্রকৃত দূর হবে।

আর যদি কোন উপায়েই হৃদয়ের ঐক্য আনা অসম্ভব হয়, যদি অপর সম্প্রদায়ের কাউকে দেখলেই মনের আপনা হতেই সঙ্কুচিত হওয়ার ভাব না কাটে তবে শ্রেষ্ঠ পন্থা হল হিন্দুদের সবল করে তোলা।—সত্যিকারের প্রতিদ্বন্দ্বীদের ভিতর, একটা বড় রকমের লড়াই হয়ে যাওয়ার পর অনেক সময় খুব বন্ধুত্ব জন্মায়। কিন্তু শত্রুদের একজন যদি দুর্ব্বল বলে যুদ্ধবিমুখ হয় তবে প্রকাশ পায় শুধু মানঅভিমান ও নিষ্ফল গর্জ্জন, শান্তির ভাণ ও গোপন ঘৃণা, প্যাক্ট চুক্তি ও ইউনিটি কন্‌ফারেন্স। অন্ততঃ এই অবস্থাটার প্রতিকার করা দরকার। নয় কি ?

শ্রী—

স্বামী রামতীর্থ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বামী রামতীর্থের জীবনের এই যে সর্ব্বব্রহ্মময়তার উপলব্ধি, আপনাকে দেহের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরে ছড়াইয়া দেওয়ার এই যে ভাব ইহা বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ; সুতরাং জ্ঞানেই তাঁহার জীবন পরম পরিণতিলাভ করিয়াছিল একথাও যেমন বলা চলে তেমনি সেই সঙ্গে এই কথা বলিতে হয়—এ জ্ঞান সেই জ্ঞান যাহা লাভ করিলে মানুষ প্রেমিক হয় 'দিবানা' হয় ; সেই পরমজ্ঞান লাভ করিয়া স্বামী রামতীর্থ "মস্ত্", প্রেমিক, 'দিবানা' হইয়াছিলেন।

তাই তাঁহার জ্ঞান ও শিশুর সারল্যে উদ্ভাসিত, হাস্যমুখর, তাঁহার বক্তৃতা পাণ্ডিত্যের পরিচয়প্রদর্শনক্ষেত্র নহে, সহজ সরল উপলব্ধির প্রাণবান্, অনাড়ম্বর সরস প্রকাশ মাত্র ;

তাঁহার জীবনের মূলকথাটী তিনিও এই ভাবে বলিয়া গিয়াছেন ; "At-one-ness with the universe" বিশ্বের সহিত অভেদাত্ম হওয়াই আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিলে সকল দ্বন্দ্ব, ভাবনা দূর হইয়া যায় ; সকল বৈষম্যের সকল দুঃখের ক্ষয় হইয়া মন পরমপ্রসাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

প্রায় দশবৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখকের রামতীর্থের রচনাবলীর সহিত

পরিচয় হইবার পূর্ব্বে তাঁহার একটী ছবি তাহার হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল। মনের পট হইতে সেই ছবির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ছায়া মিলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও মনে পড়ে সেই দীর্ঘদিন পূর্ব্বে ছবিতে যে প্রসন্ন সৌম্য মুখটী দেখিয়াছিলাম; আজও তাঁহার কোন ছবি হাতে আসিলে সেই প্রসন্ন হাস্যমণ্ডিত মুখশ্রীর কথাই মনে জাগে। এই প্রসাদই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিচয়রূপে সেদিন আমার কাছে প্রতিভাত হইয়াছিল, আজও হয়।

মিঃ সি এফ অ্যান্দ্রুজ In woods of God realisation নামক রামতীর্থের রচনাবলী সংগৃহীত গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্যত্রয়ের মধ্যে এই প্রসাদগুণের উল্লেখ করিয়াছেন। Overflowing charity kindliness of Spirit ও abounding joy মিঃ অ্যান্দ্রুজের মতে তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। এগুলি সেই প্রসাদগুণের রূপান্তর মাত্র।

রামতীর্থের জীবনের অন্যতম বিশেষত্ব তাঁহার সাংসারিক নির্লিপ্ততা, অবৈষয়িকতা; সংসার তাহার ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের গণ্ডীর মধ্যে তাঁহার বিরাট মনকে কোন দিনই ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। এই ত্যাগের ভাব, তাঁহার জীবনের প্রতিদিনের প্রতিকর্ম্মের ইতিহাসে, রচনাবলীর প্রতিছত্রে, বক্তৃতার প্রতি কথায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল: এই ত্যাগের বাণী তিনি সারাজীবন প্রচার করিয়াছিলেন। "ত্যাগকর এই মিথ্যা অভিমান, এই ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ, এই হীন প্রেম; পরিপূর্ণভাবে ত্যাগ কর, নিজের জন্য কিছুই রাখিও না।" দুইহাজার বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ খৃষ্ট যে ভাবে এই ত্যাগের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, আকাশের স্বচ্ছন্দচারী বিহঙ্গকে দেখাইয়া বনের স্বতঃবিকশিত পুলক দেখাইয়া, তেমনি ভাবে রামতীর্থ এই ত্যাগের কথা বলিয়াছিলেন। "How all desires can be fulfilled" নামক বক্তৃতায় তাঁহার এই কথাটা বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন "যাহা চাও তাহা যে পাও না এই অভিমানে ত্যাগ করিও না, সকল বাসনাকে জীবন হইতে নির্ব্বাসন দাও, যদি দিতে পার দেখিবে তোমার জীবন সাফল্যে মণ্ডিত হইয়া কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।" ইহাই ছিল তাঁহার বাণী।

তাঁহার এই নির্লিপ্ততা দেখিয়া আমেরিকার জনৈক বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ বলিয়াছিলেন "যাহার মন সর্ব্বদাই এই দেহ হইতে এত উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত তাহার আত্মার এই দেহের সহিত যোগ দীর্ঘদিন স্থায়ী হইতে পারে না।"

রামতীর্থের এই ত্যাগের বাণীর মধ্যে কর্ম্মত্যাগের কোন কথা নাই; এই ত্যাগের কথা মন সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে; মন যেন নির্লিপ্ত থাকে; সে যেন কর্ম্মের বন্ধনে নিজেকে ধরা না দেয়। কাজ করিতেই হইবে। নিজের দেশের সমাজের জগতের প্রতি যে কর্ত্তব্য আছে সেগুলিকে করিতে হইবে; শুধু করিলেই চলিবে না ভাল করিয়াই করিতে হইবে; এই কর্ত্তব্যগুলিকে সুচারুরূপে করিতে হইলে গীতায় যাহাকে 'স্থিতপ্রজ্ঞ' বলা হইয়াছে তাহাই হইতে হইবে। 'স্থিতপ্রজ্ঞ' না হইলে একর্ম্মগুলি ঠিক করিয়া যে করা যায়-না তাহা কর্ম্মবীরগণের জীবন আলোচনা করিলেই দেখা যায়।

দার্শনিক পরিভাষায় এই যে সমুচ্চয়বাদ ইহা ভারতের অতি প্রাচীন শিক্ষা; বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উদ্ভব, এই কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির একটী সুন্দর সামঞ্জস্য গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায়।

সুতরাং রামতীর্থকে জ্ঞানী বা ভক্ত মনে করিয়া কর্ম্মত্যাগের উপদেষ্টা বলিয়া যেন আমরা ভুল না করি। বরং তিনি বারবার কর্ম্মকুশলতা শিক্ষার জন্য বলিয়াছেন। য়ুরোপ ও আমেরিকার উদাহরণ দেখাইয়া তিনি বলিয়াছেন এই যে ইহাদের সফলতা, কুশলতা, বিজয়লাভ ইহাই আমাদের অনুকরণীয়; ইহারা আমাদের চেয়ে ধার্ম্মিক বলিয়াই ইহাদের এই জয়লাভ।

বেদান্তের উপদেশগুলি তাহাদের জীবনে ব্যাপকতর ভাবে কাজ করিতেছে। Practical Vedantaই, (কার্য্যকরী বেদান্ত) তাঁহার মতে প্রতীচ্যশ্রেষ্ঠতার মূল কারণ। তাহাদের কাছে এই শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে; গ্রহণ করিয়া বড় হইতে হইবে, শক্তিলাভ করিতে হইবে। এ জগৎ মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। জগৎ মায়া নহে, মায়া হইতেছে আসক্তি, কামনা, যাহা আমাদের জীবনের জয়যাত্রায় পদে পদে প্রতিহত করিতেছে। ভারতবর্ষ বেদান্তের এই ভ্রান্ত ব্যাখ্যায় লুব্ধ হইয়াই জগতে এত হীন নিবীর্য্য হইয়াছে; ইহার সে অবস্থা দূর করিতে হইবে। বিশ্বেশ্বর আমাদের যে শক্তি দিয়াছেন তাহার সম্পূর্ণ প্রয়োগ করিতে হইবে; কোনটা রাজসিক বলিয়া ত্যাগ করিলে চলিবে না। একটী চমৎকার উদাহরণ দিয়া তিনি ভারতের এই বর্ত্তমান অবনতির কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাল একটী বাগান রচনা করিতে হইলে একান্ত কুদৃশ্য, অনুপযোগী কাঁটা দিয়াই চারিপাশ ঘিরিয়া দিতে হয় নতুবা সব নষ্ট হইয়া যায়। তেমনি ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতা নিশ্চিন্তভাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে, তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজসিক শক্তিগুলির যে চর্চ্চার প্রয়োজন তাহা করি নাই বলিয়াই আমাদের আজ এই দুরবস্থা, আমাদের সভ্যতা নষ্টপ্রায়। সুতরাং বর্ত্তমান প্রতীচ্যের সভ্যতাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিলে চলিবে না, তাহার যাহা ভাল তাহাকে আনিয়া আমাদের প্রাচীন নষ্টগৌরব আধ্যাত্মিক সভ্যতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া নবীনভারত গড়িয়া তুলিতে হইবে। সুতরাং আমাদের প্রত্যেককে কর্ম্মবীর হইতে হইবে, শক্তির সাধনা করিতে হইবে।

ব্যবহারিক জ্ঞানের এই অভাব দূর করিতে রামতীর্থ বারবার বলিয়াছেন। এইখানে তাঁহার জীবনের আর দুইটী সত্য উপলব্ধির পরিচয় আমরা পাই; একটী তাঁহার নির্ভীক পবিত্র স্বদেশপ্রেম, অপরটী তাঁহার প্রতিচ্য শক্তিবাদ কর্ম্মবাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। এইখানে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত স্বামী রামতীর্থের অনেকখানি ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

বিবেকানন্দ বহুস্থলে এই শক্তির সাধনার কথা বলিয়াছেন; ইহাই যে ভারতের একান্ত প্রয়োজন তাহা তিনি বলিয়া গিয়াছেন; প্রতীচ্যের সভ্যতার এই মূল তথ্যটি আমাদের জীবনে গ্রহণ করিতে হইবে নতুবা আমাদের সভ্যতা নষ্ট হইবে, আমরা মরিব।

প্রাচীন কালে আধ্যাত্মিক সভ্যতার প্রতি অনুরাগে ও বর্ত্তমান ভারতের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে প্রজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত যে স্বদেশপ্রেম অন্তরে জাগ্রত হয়, উভয়ের চরিত্রে

সেই স্বদেশ প্রেমের পরিচয় আমরা পাই। ইহার মধ্যে হিংসা নাই, উগ্রতা নাই—ইহা প্রতীচ্যের জাতীয়তা বাদ, Aggresive Nationalism নহে। ভারতবর্ষের সভ্যতার জগতের প্রয়োজন আছে; ভারতবর্ষের শিক্ষা প্রাণবান করিয়া রাখিতে হইবে সুতরাং ভারতবর্ষকে বাঁচিতে হইবে। ভারতবর্ষকে বাঁচিতে হইলে তাহার সকল অভাব, বাধা দূর করিতে হইবে; সুতরাং তাহাকে স্বাধীন, স্বপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে; জগতকে কিছু দিবার যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে প্রথমে স্বরাট্ হইতে হইবে, স্বরাজ্য লাভ করিতে হইবে।

রামতীর্থ ও বিবেকানন্দের এই নিষ্কলুষ স্বদেশ প্রেম বর্ত্তমান ভারতে মহাত্মা গান্ধীর স্বদেশ প্রেমেরই অনুরূপ।

রামতীর্থের কর্ম্মবাদের উল্লেখ পূর্ব্বে কিছু করা হইয়াছে; এই স্বদেশপ্রেম তাঁহার মনে যে কর্ম্মবাদের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার কিছু পরিচয় এইখানে দেওয়া দরকার।

ভারতের দৈন্যের মোটামুটী কয়েকটা কারণ তিনি এই ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষার ও ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব সমাজের অস্পৃশ্যতাদোষ ও কলুষিত বিবাহ বিধি। রামতীর্থ বর্ত্তমান ধরণের সংস্কারক ছিলেন না; তিনি একান্তই ভারতীয় ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন সুতরাং এই দৈন্যগুলি দূর করিবার যে পথ তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহার রক্ষণশীল ক্রমোন্নতির পথ; কোন সামাজিক বিপ্লবের দ্বারা এগুলি দূর করিবার কথা তিনি ভাবিতেও পারেন নাই। অভাব, আর্থিক দারিদ্র্য ও কলুষিত বিবাহ বিধির প্রতিকার কল্পে তিনি স্ত্রীশিক্ষা, জনসাধারণের শিক্ষা, বাল্যবিবাহ নিবারণ, অর্থকরী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে বলিয়াছিলেন। দেশের জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, তাহাদের উপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে হইবে, দেশের নারীদের জাগাইতে হইবে, অকালে বিবাহ দিয়া এই দারিদ্র্যপীড়িত দেশের সন্তানসন্ততির বৃদ্ধি করিয়া দেশকে ভারাক্রান্ত করিলে চলিবে না। এই অন্যায়গুলি দূর করিতে পারিলেই তবে দেশ জাগিবে।

ধর্ম্মান্ধতা ও অস্পৃশ্যতাবোধ দেশকে অবনতির কোন সীমায় আনিয়া ফেলিয়াছে, দেশকে কতখানি স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের প্রতি অন্ধ করিয়া তুলিয়াছে তাহার উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন, সু-উত্তরে জনৈক বৈষ্ণব দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবের জন্য প্রাণ দিতে পারিবে অথচ স্বগ্রামস্থ কোন শাক্তের বা পতিতের সেবা করিবে না। আমেরিকার উদাহরণ দিয়া তিনি বলিয়াছেন সেখানেও ত বহু ধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন পন্থী লোক রহিয়াছেন, কৈ তাহারা ত' দেশসেবায় এই মতবিরোধ ও পার্থক্যকে বাধা হইতে দেয় না। রামতীর্থ বলিতেন এই অখণ্ড স্বদেশপ্রেম জাগাইয়া তুলিতে হইবে যাহার টানে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বৈষ্ণব, শাক্ত, হিন্দুমুসলমান এক হইবে।

রামতীর্থ এই কর্ম্মবাদের প্রচার করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার জীবনে তিনি কোন কিছু গড়িয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি যে বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা করিয়া গিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিবন্ধাবলীর মধ্যেই বদ্ধ হইয়া আছে, বাহ্যজগতে তাহার কোন প্রকাশ হয় নাই।

হয়ত আরো কিছুদিন বাঁচিলে তিনি এসকল বিষয়ে কিছু করিয়া যাইতে পারিতেন;

সে সম্বন্ধে কিছু বলা চলে না। তবুও মনে হয় জগতে সকলেই কর্ম্মী হইয়া আসে না; কেহ আসে জ্ঞান দিতে, কেহ আসে নব নব আদর্শের সঙ্গীতে দেশকে জাগাইয়া তুলিতে, কেহ বা আসে প্রেমে দেশকে এক করিয়া দিতে। শ্রীচৈতন্য যে কর্ম্মবীর ছিলেন না বা কবির খৃষ্ট প্রভৃতি যে বিরাট একটা কর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া যাইতে পারেন নাই তাহার জন্য দুঃখ করিবার কিছুই নাই। সকলেই নেপোলিয়ান, শঙ্করাচার্য্য বা বুদ্ধের মত বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া যায় নাই।

রামতীর্থ ছিলেন বিশেষ করিয়া কবি; যে হিসাবে খৃষ্ট, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি ছিলেন কবি; তাঁহারা ঋষি, দ্রষ্টা, swinburneএর ভাষায়, seers, trumpeteers; রামতীর্থ নব আদর্শ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহারই সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহারই বাণী প্রচার করিয়াছিলেন; তাঁহার সে আদর্শকে মূর্ত্ত্য করিয়া তুলিবার ভার আমাদের উপর, আমরা যাহারা তাঁহার সে বাণী সে সঙ্গীত শুনিয়াছি। যদিও তিনি নিজে তাহাকে মূর্ত্ত্য করিয়া তুলিতে পারেন নাই তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি ত কিছুই নাই।

রামতীর্থ কর্ম্মবীর ছিলেন না কবি ছিলেন; এইখানেই বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার সব চেয়ে বড় পার্থক্য। উভয়েই ছিলেন পরমজ্ঞানী, কিন্তু বিবেকানন্দ ছিলেন কর্ম্মবীর, রামতীর্থ ছিলেন প্রেমিক কবি। যে আদর্শ ভবিষ্যতের গর্ভের ভারতের নবীন জনসাধারণ কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইবার অপেক্ষায় ছিল তাঁহারা উভয়েই তাহার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; উভয়েই তাহার কথা বলিয়া গিয়াছিলেন; বিবেকানন্দ সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়া তাহা পরিপুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু রামতীর্থ কোন সম্প্রদায় গড়েন নাই বা গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণ যখন তাঁহাকে একটী বিশেষ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া তৎলব্ধ এই নবীন জ্ঞান ও আদর্শ প্রচার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—"হিন্দু, মুসলমান, ঈশাই খৃষ্টান সকলই ত' আমার সম্প্রদায়; আমার কাজ সকলকেই সেবা করা, সকল সম্প্রদায়েরই মধ্যে আমার এই আদর্শ ফুটাইয়া তোলা; এখনি ত অনেক সম্প্রদায় আছে, নূতন একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া কি লাভ হইবে?" "স্বদেশের সুবৃহত্তর অস্তিত্বের মধ্যে আমাদের ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক স্বার্থ, অস্তিত্ব ডুবাইয়া দিতে হইবে।"

স্বামী রামতীর্থের এই বিরাট প্রসন্ন অসাম্প্রদায়িক স্বদেশপ্রেম, তাঁহার নিষ্কাম কর্ম্মবাদ, তাঁহার পরম জ্ঞান ও প্রেম, আজ ভারতবর্ষের বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহার জীবনের বাণী আমাদের জীবনে মূর্ত্তিমান প্রাণবান্ হইয়া উঠুক্, তবেই তাঁহার জীবন সার্থক হইবে।

তীর্থসেবক।
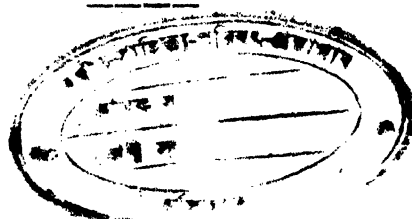
হীরকের সৃষ্টিতত্ত্ব।

স্বচ্ছতায়, বর্ণোজ্জ্বল্যে, আলোকরশ্মি প্রতিফলিত করিবার ক্ষমতাবশতঃ, কাঠিন্যে এবং দুষ্প্রাপ্যতা হেতু অতি প্রাচীনকাল হইতেই হীরক জিনিষটি রত্নরাজ্যে সমুচ্চস্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে, সম্ভ্রান্ত ও সৌখীন সমাজে চিরকালই ইহার বিশেষ সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। সম্রাট ও নৃপতিগণের শিরোভূষণরূপে ইহা প্রায়ই বিরাজ করিয়া থাকে। অতিমূল্যবান রত্ন বলিয়া ইহার খনির অধিকার লইয়া যুদ্ধ বিগ্রহের কথাও শুনা যায়, অনেকের ধারণা দক্ষিণ আফ্রিকার বিগত বুয়র যুদ্ধেরও মূলকারণ এই হীরক খনির অধিকার। ইহা ছাড়া আমাদের বাঙ্গলা দেশের অনেক বিখ্যাত ঔপন্যাসিকগণও ইহাকে একটি মারাত্মক বিষের মধ্যে গণ্য করিয়া তাঁহাদের গল্পের নায়িকার আত্মহত্যার অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা যে একটি বিষ এইরূপ ধারণা এখনও বিরল নহে। কোন বিশেষ বিশেষ হীরকখণ্ডের নাম তাহাদের বিচিত্র ঐতিহাসিক কাহিনীর জন্য জগতে সুপরিচিত। ভারতবর্ষের কোহিনুরের নাম ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সুতরাং হীরকের ইতিহাস অত্যন্ত রহস্যবিজড়িত। ইহার স্বরূপ, উৎপত্তি ও সৃষ্টি আরো রহস্যাত্মক। অনেকেই এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, ইহারই আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ ইহার জন্ম বা উৎপত্তিস্থান নির্ণয় করা আবশ্যক মনে করি। অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষেই সর্ব্বপ্রথম হীরকের আবিষ্কার হয়। খৃষ্ট জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বের রচিত কাব্য, নাটক ও অয়ুর্ব্বেদাদি গ্রন্থে ইহার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। নদীতীরের বালুকা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরখণ্ডের সহিত এবং অনেক স্থলে মাটীর উপরের স্তরে ইহাকে পাওয়া গিয়াছে ভারতবর্ষের "গোলকুণ্ডার" হীরকখনি একটি বিখ্যাত খনি। কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর তীরে নিজামরাজ্যে ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ইহা অবস্থিত। এই খনি হইতেই অনেক জগৎবিখ্যাত ঐতিহাসিক হীরকখণ্ড পাওয়া গিয়াছে; যথা কোহিনুর, রেজেন্ট, দি গ্রেট মোগল ইত্যাদি। মাদ্রাজের বেলারী জেলায়, মধ্যপ্রদেশে মহানদীর নিকটে সম্বলপুরে, বিহারে ছোটনাগপুরে, বুন্দেলখণ্ডে পান্না প্রভৃতি স্থানেও হীরকের খনি রহিয়াছে। ব্রাজিলে নদীতীরস্থিত বালির মধ্যে সোণার কণার সহিত উহাকে অনেক স্থলে পাওয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার অরেঞ্জ নদীর তীরের বালু ও পাথর কণার মধ্যেও অনেক হীরক পাওয়া গিয়াছে। ষ্টার অফ সাউথ আফ্রিকা নামক (Star of south Africa) প্রসিদ্ধ হীরকখণ্ডটির এখানেই আবিষ্কার হয়। Stewart নামে বৃহৎ হীরকখণ্ডটিও এইখানেই পাওয়া গিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বার্লি এবং প্রিতোরিয়াও হীরকখনির জন্য প্রসিদ্ধ। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হীরকখণ্ড "কুলিনান" ১৯০৫ খৃঃ অব্দে প্রিতোরিয়ার খনিতে আবিষ্কার হয়, ইহার ওজন ৩০২৫¾ কেরাট বা ৬২১·২ গ্রাম অর্থাৎ ১০⅙ ছটাক বা আধসেরের উপর। একপ্রকার নীলমাটির অভ্যন্তরে এখানে হীরক পাওয়া যায়। সম্প্রতি রোডেশিয়া ও জার্ম্মান দক্ষিণ আফ্রিকায়ও হীরক পাওয়া গিয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই বোর্ণিয়ো দ্বীপে নদীতীরস্থ মাটি ও বালির মধ্যে হীরক পাওয়া

যাইতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার অনেক স্থানে হীরকের খনি আছে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অনেক প্রদেশে সোণার সহিত হীরক পাওয়া যায়; কেলিফোর্ণিয়া ইহার মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ইউরোপে কেবলমাত্র উরল পর্ব্বতের স্থানে স্থানে সোণার সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকের দানা পাওয়া গিয়াছে।

হীরক দেখিতে ফটিকের মত স্বচ্ছ; সাধারণতঃ ইহা জলের মত বর্ণহীন, কিন্তু অনেক সময় নানাবিধ বর্ণযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন হীরকখণ্ড নীলাভ, কোনটি হরিতাভ, কোনটি পীতাভ এবং এমন কি কৃষ্ণাভ বা একেবারেই কৃষ্ণবর্ণ। শেষোক্ত হীরকের ইংরাজী নাম "কার্বনেডো" Carbonado. কদাচিৎ লালবর্ণের হীরক দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুক্ষণের জন্য সূর্য্যরশ্মিতে স্থাপিত করিয়া পরে অন্ধকারে আনিলে হীরক নানা রংএর আলোক বিকীর্ণ করিয়া জ্বলিতে থাকে। আলোকরশ্মি প্রতিফলিত ও বক্রী করণে হীরকের অদ্ভুত ক্ষমতা।

হীরকের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে বহুকাল যাবৎ নানাবিধ ভ্রান্তধারণা প্রচলিত ছিল। জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটনের মতে হীরক কঠিনীকৃত চর্ব্বি বিশেষ। কেহ কেহ ইহাকে বালি বিশেষের দানা বলিয়াও মনে করিতেন। কিন্তু যখন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে হীরক কয়লা ও গন্ধকের ন্যায় অনাবৃত পাত্রে উত্তাপের সাহায্যে উড়িয়া যায়, তখন পূর্ব্ব প্রচলিত ধারণাসমূহের ভ্রান্তি সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রহিল না। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে বিখ্যাত রাসায়নিক মহামতি লেভাইশিয়ার পরীক্ষার ফলে প্রমাণ করিলেন হীরক কয়লারই মতন একটি দাহ্য পদার্থ বিশেষ, এবং বায়ুর সাহায্যে উত্তাপের দ্বারা কয়লা পোড়াইলে যেমন অঙ্গারম্লের উৎপত্তি হয় সেইরূপ হীরক পুড়িয়াও অঙ্গারাম্ল মারুতে পরিণত হয়। পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা আরো দেখাইলেন যে সমান ওজনের হীরক ও কয়লা পুড়িয়া সমপরিমাণ অঙ্গারম্লের সৃষ্টি করে। এই সমস্ত পরীক্ষার ফলে ও বিশেষতঃ ডেভি, ডুমা ষ্টাশ্‌ প্রমুখ পণ্ডিতগণের চেষ্টায় ইহা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হয় যে হীরক একটি অঙ্গার বিশেষ।

অঙ্গার বা কয়লা হইতে কি প্রাকৃতিক উপায়ে হীরকের জন্ম হইতেছে এই বিষয়েও নানাবিধ মত প্রচলিত ছিল। কিন্তু যখন বিখ্যাত ফরাসী রাসায়নিক মঁইসা ১৮৯৩ খৃঃঅব্দে কৃত্রিম উপায়ে পরীক্ষাগারে অঙ্গার হইতে এই মহামূল্য রত্ন হীরক প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইলেন, তখন আর ইহার গোপন সৃষ্টি রহস্য কাহারো অগোচর রহিল না। এইখানে এই অদ্ভুত পরীক্ষার বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

ইটালীর এরিঝোনা জেলায় প্রাপ্ত একটি উল্কাপাথর পরীক্ষা করিয়া মঁইসা দেখিলেন যে উল্কাপাথরের লৌহপিণ্ডের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরক কণা ঘন অঙ্গারের স্তরে আবৃত রহিয়াছে। ইহা হইতে তিনি মনে করিলেন যে সম্ভবতঃ যখন গলিত লৌহে দ্রবীভূত অঙ্গার উত্তাপের হ্রাসে ক্রমশঃ শীতল হইয়া উঠে তখনই ইহার কিয়দংশ হীরকের দানারূপে জমিয়া পৃথক হইয়া পড়ে। যেমন ফুটন্ত জলে যথেষ্ট পরিমাণ সোডা বা লবণ গুলিয়া যদি ঐ জলকে ঠাণ্ডা করা হয়, তখন অনেক পরিমাণ সোডা বা লবণ দানা বাঁধিয়া ঐ জল হইতে পৃথক হইয়া পড়ে ও জলভাণ্ডের তলদেশে জমিতে থাকে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি অঙ্গারকে নানাবিধ গলিত ধাতুর মধ্যে দ্রবণীয় করিয়া পুনরায় শীতল করিয়া

লইলেন। অঙ্গারকে গলিত ধাতুবিশেষের মধ্যে দ্রবণীয় করিতে অত্যধিক উত্তাপের আবশ্যক হয়। ইহার জন্য ম'ইসা বৈদ্যুতিক চুল্লীর ব্যবহার করেন, ইহাতে তাপের মাত্রা প্রায় ৩০০০ হইতে ৩৫০০ হাজার ডিগ্রী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই ভীষণ উত্তাপের সাহায্যে নানাবিধ ধাতুতে অঙ্গারের সহিত দ্রবীভূত করিয়া পুনরায় ঐ তরল পিণ্ডকে শীতল করা হয়। কিন্তু এই চেষ্টা ফলবতী হইল না, এই উপায়ে অঙ্গারকে হীরকে পরিণত করিতে তিনি সমর্থ হইলেন না। ইহাতেও তিনি পশ্চাৎপদ হইলেন না। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে হীরক যখন সাধারণতঃ খনির অভ্যন্তরেই পাওয়া যায়, তখন ইহার সৃষ্টি বা উৎপত্তি উপরিস্থিত মৃত্তিকাস্তরের চাপের প্রভাবেও নিয়মিত হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী চেষ্টায় তিনি অধিক উত্তাপ ও চাপ এই উভয় শক্তির প্রভাব একই সময়ে প্রয়োগ করিয়া অঙ্গারযুক্ত তরল লৌহপিণ্ড হইতে হীরক প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বৈদ্যুতিক চুল্লিতে লৌহ গলাইয়া ঐ গলিত লৌহে তিনি যথেষ্ট পরিমাণ অঙ্গার (চিনি পোড়াইয়া যে কয়লা হয় তাহাই তিনি ব্যবহার করিয়াছিলেন) দ্রবীভূত করিয়া লন। তৎপর ঐ অঙ্গার সমন্বিত তরল লৌহপিণ্ডকে শীতল জল বা অপেক্ষাকৃত শীতল তরল সীসকের মধ্যে প্রক্ষেপ করেন। ইহাতে এই লৌহপিণ্ডের বহির্স্তর হঠাৎ শীতল হইয়া কঠিন হইয়া যায়; কিন্তু আভ্যন্তরীণ ধাতু তখনও তরল অবস্থায় থাকে; বাহিরের কঠিন আবরণের বেষ্টনীর ভিতর এই তরল ধাতুপিণ্ড তখন ধীরে ধীরে শীতল হইয়া জমিতে থাকে। কিন্তু জলের মতন তরল লৌহও জমিয়া কঠিন হইবার সময় আয়তনে বাড়িয়া যায়। এই বর্দ্ধনশীল তরল লৌহপিণ্ড যখন শীতল হইতে থাকে, তখন তাহার স্বাভাবিক আয়তন বৃদ্ধি বাহিরের কঠিন বেষ্টনীর দরুণ সহজে ঘটিতে পারে না, ফলে ঐ তরল ধাতুপিণ্ড বাহ্যিক কঠিন বেষ্টনীর ভীষণ চাপের অধীনে ক্রমশঃ শীতল হইয়া জমিতে থাকে, এই অবস্থায় দ্রবীভূত অঙ্গার ঐ ধাতুপিণ্ড হইতে হীরকাকারে কিঞ্চিৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এবম্বিধ পরীক্ষার ফলে ম'ইসা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি হীরক কণা প্রস্তুত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, বাকী অধিকাংশ অঙ্গার গ্রেফাইট (Graphite) রূপে পরিণত হইয়াছিল। এইপ্রকার প্রস্তুত সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হীরক কণার ব্যাস মাত্র $\frac{1}{২৫}$ বা '০২৪ ইঞ্চি সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে কৃত্রিম উপায়ে অঙ্গার হইতে হীরক প্রস্তুত করিয়া বিশেষ লাভবান হইবার এখনও কোন সম্ভাবনা নাই। এই প্রকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরককণা প্রস্তুত করিতে যাহা খরচ পড়িবে প্রাকৃতিক হীরক তাহা অপেক্ষা অনেক সস্তাদরে পাওয়া যায়। তবে আশা করা যায় ভবিষ্যতে আরো এমন কোন সুবিধাজনক সহজ উপায় আবিষ্কার হইতে পারে যাহার দ্বারা অতি অল্পব্যয়ে রাসায়নিকের পরীক্ষাগারে অঙ্গার হইতে রাশি রাশি হীরক প্রস্তুত হইয়া পৃথিবীর প্রধান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে রপ্তানী হইবে। ইহা বিন্দুমাত্রও অসম্ভব কল্পনা নহে, কারণ কাল কুচকুচে মলিন অঙ্গারকে যে উজ্জ্বল স্বচ্ছ বহুমূল্য রত্ন হীরকে পরিণত করা যাইতে পারিবে ইহাও কিছুকাল পূর্ব্বে অনেকেই উদ্দাম কল্পনা বা স্বপ্ন বলিয়া মনে করিতেন।

রাসায়নিক তাঁহার পরীক্ষার ফলে প্রমাণ করিলেন যে এই কাল অঙ্গারের সহিত উজ্জ্বল হীরকের কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য নাই। তাহারা উভয়েই একই উপাদানে গঠিত, একই

অঙ্গারাণুর বিভিন্ন প্রকার শৃঙ্খলার দরুণ তাহারা বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট হইয়াছে। তাহারা একই উপাদানের রূপান্তর মাত্র; এবং অবস্থাভেদে এককে অন্যে পরিণত করা যাইতে পারে। কথায় বলে বটে—"কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না", কিন্তু অবস্থাভেদে ইহার ময়লা বিনষ্ট হইলে হীরকরূপে ইহা সম্রাট্ ও নৃপতিগণের শিরোভূষণ রূপে বিরাজ করিতে থাকে। তাই জ্ঞানীগণ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন—হেয় ও প্রেয়, শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট, উচ্চ ও নীচ ইহাদের মধ্যে কোন প্রকৃত পার্থক্য নাই, অবস্থার তারতম্যই এই দৃশ্যমান ভেদের জনয়িতা। তাই—

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়।

মহাভারত-মঞ্জরীর

সমালোচনার প্রতিবাদ।

গত ফাল্গুনের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্ এ, বিদ্যানিধি কৃত শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত মহাভারত-মঞ্জরীর সমালোচনা পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম। সমালোচক স্বীকার করিয়াছেন যে, এই বৃহৎ গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন নাই। এই জন্যই তিনি এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অবিচার করিয়াছেন। তাহার পর তিনি লিখিয়াছেন, "এ সকল বিষয়, স্মৃতির বিষয়, শাস্ত্রের বিষয়, শাস্ত্রের বিষয় আলোচনার যোগ্যতাও আমার নাই।" অথচ সে সকলেরই তীব্র আলোচনা করিয়াছেন! সমালোচকের সকল ভুল দেখাইতে গেলে প্রবন্ধ অতি বৃহৎ হইবে বলিয়া অতি সংক্ষেপে কতিপয় ভুল দেখাইতেছি।

বিদ্যানিধি প্রথমেই লিখিয়াছেন, মহাভারতমঞ্জরীর ৩১৬ পৃষ্ঠা। আমরা পাইলাম ৩৩৬+২০=মোট ৩৫৬ পৃষ্ঠা।

তিনি পূর্ব্বে লিখিয়াছেন, "ইহাতে (মহাভারতে) বিস্তর প্রক্ষিপ্ত আছে।" পরে তাহা ভুলিয়া গিয়া লিখিয়াছেন, "আমরা কিন্তু প্রক্ষিপ্তের প্রতি মমতা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না।" এজন্য মঞ্জরীকার ও সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি বৃথা ভ্রূকুটি করিয়াছেন।

তিনি এই গ্রন্থের চারিটী উদ্দেশ্য কল্পনা করিয়াছেন। আদ্যন্ত পড়িলেই বুঝিতে পারিতেন যে এই বৃহৎ গ্রন্থ বহু মহৎ উদ্দেশ্যে পূর্ণ।

তিনি লিখিয়াছেন "অপ্রিয় সত্য বলিয়া বোধ হয় কাহাকেও নিজমতে আনিতে পারা যায় না," তবে রাজা রামমোহন ও বিদ্যাসাগর প্রভৃতি কিরূপে অপ্রিয় সত্য প্রচার করিয়া কত লোককে নিজমতে আনিয়াছিলেন ও আনিতেছেন? যে সত্য একদিন অপ্রিয় থাকে, শিক্ষার গুণে পরে তাহা প্রিয় হয়।

বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন, "যে দৃষ্টিতে অতীত সমুজ্জল দেখায়, তাহা করিব।" অর্থাৎ অতীত বর্ত্তমান অপেক্ষা কল্পনাতেই সমুজ্জল, প্রকৃত প্রস্তাবে নহে। মহাভারত-মঞ্জরী অতীতের গৌরবের বহু প্রমাণ দিয়াছেন। বর্ত্তমান ত আমাদের সম্মুখে। সে স্থলে অতীতের ধর্ম্ম, স্বাধীনতা, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, সামাজিক অবস্থা, আদর্শ, অধ্যবসায় প্রভৃতি বহু বিষয়ের সহিত বর্ত্তম্যনকে কি তুলনা করা যায়?

সমালোচক আবার লিখিয়াছেন, "কবিই অতীতের গৌরবের ইতিহাস গাইয়া বর্ত্তমানকে সে গৌরবের অধিকারী করিতে পারেন।" তিনি ইহার পূর্ব্বেই লিখিয়াছেন যে, অতীত অপেক্ষা বর্ত্তমানই গৌরবান্বিত, তাহা এখানে ভুলিয়া গিয়াছেন। আবার তাঁহার এই মতটী সত্য হইলে রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি অ-কবিরা ভারতের অতীত গৌরবের ইতিহাস বৃথাই গাইয়াছেন! আর, এখনও অ-কবির দল ভারতের অতীত গৌরবের বৃথাই অনুসন্ধান (research) করিতেছেন!

সমালোচক লিখিয়াছেন যে, যাহা সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ তাহা উঠিয়া যায় না। তাহা হইলে বেদান্তের ধর্ম্ম, গীতার ধর্ম্ম উঠিয়া গিয়া কি রূপে বামাচারবহুল তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছিল? শ্রেষ্ঠ উঠিয়া যায় বলিয়াই দেশ অবনত হইয়া পড়ে।

বিদ্যানিধি "অবরোধের" অর্থ বুঝেন নাই, লিখিয়াছেন। মঞ্জরী-কার লিখিয়াছেন, "মহাভারতের নানা স্থানে আছে যে, দ্রৌপদী বাহিরে বাহির হইতেন। ইহার কারণ কি? পূর্ব্বে ভারতে অবোধের প্রথা ছিল না।" ইহাকে মঞ্জরীকর্ত্তার অর্থ অপ্রকাশিত আছে কি? মঞ্জরীলেখক তাঁহার গ্রন্থের নানা স্থানে পূর্ব্বে অবরোধ না থাকার বহু প্রমাণ দিয়াছেন। পরে উক্ত "অবরোধ" শীর্ষক প্রস্তাবের অনেক প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারত হইতেও রাজপরিবারে অবরোধ না থাকার অনেক প্রমাণ দিয়াছেন। বিদ্যানিধি তাহা খণ্ডন না করিয়া অযোধ্যায় অবরোধ না থাকার একটী প্রমাণ ও লঙ্কায় অবরোধ না থাকার আর একটী প্রমাণ রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। রামায়ণের উক্ত উভয় উক্তিই অতিশয়োক্তি বলিয়া বোধ হয়। কারণ তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই রাম জনাকীর্ণ রাজ পথ দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছেন, কোন সৈন্য তাঁহার অনুগমন করে নাই (অযোধ্যাকাণ্ড ২৬—১২)। অপর সে সময় অযোধ্যায় যদি অবরোধ প্রথা থাকিত, তাহা হইলে সীতা কখনই জনাকীর্ণ রাজপথ দিয়া হাঁটিয়া যাইতেন না; তাঁহার কি রথের অভাব ছিল? তাহার অব্যবহিত পরেই ত রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা এক রথে চড়িয়া বনবাসে গিয়াছেন!

• •

রামায়ণে আর কি পাই? অযোধ্যার সর্ব্বত্রই বধূগণের নাট্য-শালা ও ক্রীড়াভবন ছিল (আদিকাণ্ড ৫—১২।১২)। অযোধ্যার লোকে সুসজ্জিত হইয়া স্ত্রী, পুত্র এবং পৌত্র সঙ্গে লইয়া উপবনে ক্রীড়া করিত (লঙ্কাকাণ্ড ১২৭—২৯)। কুমারীগণ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া দলে দলে সন্ধ্যাকালে ক্রীড়ার্থ বিহারউদ্যানে যাইত (অযোধ্যাকাণ্ড ৬৭—১৭) (সে সময় বাল্যবিবাহ না থাকায় এই কুমারী অর্থে যুবতীও বুঝিতে হইবে)। রাম রাজা হইবার পর নৃত্যগীতপটু সুন্দরীরা তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিয়াছেন (উত্তর কাণ্ড ৫২—২২)।

রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, এই সংবাদ প্রচার হইবার পর রাম যখন রাজপথ দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছিলেন, তখন গৃহস্থিত ও ভূতলস্থিত কত মহিলা রামের নিকট গিয়া বলিয়াছে, "হে জননীর হর্ষবর্দ্ধন, কৌশল্যাদেবী আপনার অভিষেকে নিশ্চয়েই আনন্দিত হইবেন" (অযোধ্যাকাণ্ড ১৬—৩৭।৩৮।৩৯১ ।

রাম বনে যাইবার সময় রাজা দশরথ রামকে দেখিবার জন্য তাঁহার রাণীগণ ও ৭৫০ স্ত্রী লইয়া জনাকীর্ণ রাজপথ দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছেন। সে সময় বহু অমাত্যও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন (অযোধ্যাকাণ্ড ৪০ অধ্যায়)। বহু অপর পুরুষও ছিল (৪২ অ)। রাম বনে গেলে কৌশল্যা বিলাপ করিয়াছেন, " কবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন জাতির কন্যারা রামের প্রত্যাগমন জনিত আনন্দে আনন্দিত হইয়া পুষ্প ও ফল ছড়াইয়া নগর প্রদক্ষিণ করিবেন?" (অযোধ্যা ৪৩—১৫)।

রাম বনে যাইবার সময় বহু ব্রাহ্মণ রাজপথ দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছিল বলিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা রথ হইতে নামিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সেই জনাকীর্ণ রাজপথ দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছেন (অযোধ্যা ৪৫—১৭।১৮)। রামের বনবাস হইতে আগমন সময়ে দশরথের পত্নীগণ উপযুক্ত রথে নির্গত হইয়াছেন (লঙ্কাকাণ্ড ১২৯—১৫)। স্ত্রীলোক, বালক, যুবা ও বৃদ্ধ, সকলেই "ঐ রাম" বলিয়া চীৎকার করিয়াছেন ও যান হইতে ভূমিতলে (অর্থাৎ জনাকীর্ণ রাজপথে নামিয়া আকাশস্থিত চন্দ্রের ন্যায় পুষ্পকরথারূঢ় রামকে দেখিয়াছে (লঙ্কাকাণ্ড ১২৯—৩৩।৩৪)।

রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, এই সংবাদ রামের বন্ধুগণ কৌশল্যার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে জানাইয়াছেন (অযোধ্যা ৩—৪৬।৪৭)। রাজা দশরথের অন্তঃপুরে বহু পরস্থ পুরুষ যাইত ও রাণীরা তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিতেন (অযোধ্যা ১৪।১৬।৩২।৩৩।৩৫।৩৬।৩৭।৩৯।৪০।৪২।৫৭ অধ্যায়)।

নারীগণ নানা দেশ হইতে আসিয়া রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে অন্ন ও পানীয় গ্রহণ করিয়াছিল (আদিকাণ্ড ১৪—১৬)। রাম ও সীতা একত্রিত হইয়া বহু জনপূর্ণ সভায় অভিষিক্ত হইয়াছেন। কন্যাগণও সেই সভায় তাঁহাদের অভিষেক করিয়াছেন (লঙ্কাকাণ্ড ১৩০ অ)।

কিষ্কিন্ধ্যাতেও লক্ষ্মণ সুগ্রীব রাজার অন্তঃপুরে গিয়াছেন ও রাণী তারার সহিত কথোপকথন করিয়াছেন (কিষ্কিন্ধ্যা ৩৩ সর্গ)।

সমালোচক যে মন্দোদরীর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, সেই মন্দোদরীও যৌবনপ্রাপ্তির পর তাঁহার পিতার সহিত বনে বিচরণ করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার সহিত রাবণের সাক্ষাৎ ও বিবাহ হয় (উত্তরকাণ্ড ১২ সর্গ)। ইহাও কি অবরোধ প্রথা না থাকার প্রমাণ নহে? অবরোধ প্রথা ছিল না বলিয়াই রাবণের সহোদরা ভগিনী শূর্পনখা দণ্ডকারণ্যে গিয়া অপরিচিত রাম ও লক্ষ্মণের সহিত কথা কহিয়াছিলেন (অরণ্য ১৭ সর্গ)। লঙ্কাতেও রাবণ তাঁহার বহু স্ত্রী ও বহু অমাত্যগণের সহিত একত্রিত হইয়া সীতাকে কাটিতে অশোকবনে গিয়াছিলেন (লঙ্কা ৯৩ অ)। নগরের বাহিরে রাবণের সৎকার সময়েও তথায় বহু

অন্তঃপুরচারিণীগণ গিয়াছিলেন (লঙ্কা ১১৩—১১১)। লঙ্কার বহু নারী রামের নিকটেও উপস্থিত হইয়াছিলেন। সে সময় রাম তাঁহার সৈন্যগণে পরিবৃত ছিলেন (লঙ্কা ১২৩ সর্গ)।

তবেই পাইলাম (১) অযোধ্যার সর্ব্বত্র বধূগণের নাট্যশালা ও ক্রীড়াভবন ছিল। (২) তথায় রমণীরা পুরুষের সহিত উপবনে যাইত। (৩) অযোধ্যার রাণীদের অন্তঃপুরে বহু পরপুরুষ গমনাগমন করিত। (৪) রাণীরা তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতেন। (৫) রাজা দশরথের রাণীরা ও ৭৫০ স্ত্রী এবং সীতা জনাকীর্ণ রাজপথ দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছেন। (৬) সে সময় সেই রাজপথে অগণ্য অপরিচিত পুরুষ ছিল। (৭) অযোধ্যার অন্য নারীরাও রাজপথে ও প্রকাশ্যস্থলে বাহির হইতেন। (৮) তাঁহারা অপরিচিত যুবক ও রাজপুত্র রামের নিকট গিয়াছেন ও তাঁহার সহিত কথা কহিয়াছেন। (৯) নৃত্যগীতপটু রমণীরা রাম রাজা হইবার পর তাঁহার নিকট নাচিয়াছেন।

মহাভারতের বহু প্রমাণ মহাভারত মঞ্জরীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে তখন অবরোধ প্রথা ছিল না। বিদ্যানিধি স্বীকার করিয়াছেন যে মহাভারতের পর রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। তাহা হইলে মহাভারতের সময় অবরোধ না থাকিলে রামায়ণের সময় তাহা প্রচলিত হইবার কারণ কি ? হস্তিনাপুর হইতে অযোধ্যাও বহু দূরে নয়।

আবার মহারাষ্ট্র দেশে অবরোধ ও অবগুণ্ঠন, উভয়ই নাই। সে দেশবাসীরা আর্য্যাবর্ত্ত হইতেই তথায় গিয়াছিল। যদি আর্য্যাবর্ত্তে তাহা থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যেও তাহা থাকিত।

সমালোচক লিখিয়াছেন, "যখন বিদেশী, বিধর্ম্মী দস্যু ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন উত্তর ভারতে অবরোধও প্রখর হইয়াছিল," অর্থাৎ তাহার পূর্ব্ব হইতেই তথায় অবরোধ প্রথা ছিল। মহাভারত মঞ্জরীতে যে সকল প্রমাণ উর্দ্ধৃত হইয়াছে, তাহা খণ্ডন না করিয়া বিদ্যানিধি বলিতে পারেন না যে উত্তর ভারতে অবরোধ প্রথা ছিল ও পরে প্রখর হইয়াছিল। আবার তিনি তাহার পরেই সে মত পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছে, "তাহার পূর্ব্বে (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দস্যুগণের ভারতে প্রবেশের পূর্ব্বে) সাধারণ প্রজার মধ্যে নারীর অবগুণ্ঠন 'হয়ত' ছিল, কিন্তু গৃহের অবরোধ ছিল না।" অসংখ্য সাধারণ প্রজার মধ্যে যে রীতি, তাহাই দেশের রীতি বলিয়া গণ্য। তাহা হইলে উত্তর ভারতে পূর্ব্বে নারীগণের গৃহের অবরোধ ছিল না, ইহা বিদ্যানিধি শেষে স্বীকার করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যে পূর্ব্বেও ছিল না, এখনও নাই। সুতরাং মঞ্জরীকার রাজপরিবারেও অবরোধ প্রথা না থাকার যে ভূরি ভূরি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, "পূর্ব্বে ভারতে অবরোধ প্রথা ছিল না," তাহা সত্য নয় কি ?

বিদ্যানিধি কোন প্রমাণ দেন নাই যে পুরাকালে আর্য্যনারীরা অবগুণ্ঠন ব্যবহার করিতেন। ফলতঃ ঐরূপ কোন প্রমাণ মহাভারত ও রামায়ণে নাই। বিদ্যানিধির 'হয়ত' দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না।

সমালোচক লিখিয়াছেন, "সীতার বিবাহ বাল্যকালে হইয়াছিল।" রামায়ণে আছে :—জনক বলিতেছেন, "অনেক রাজা এখানে আসিয়া 'বৰ্দ্ধমানা' সীতাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন" (আদিকাণ্ড ৬৬—১৫।১৬)। পঞ্চানন তর্করত্ন 'বৰ্দ্ধমানা'র অর্থ লিখিয়াছেন "যৌবনসম্পন্না।" অন্যত্র সীতা বলিয়াছেন, "আমার পিতা আমার পতিসংযোগ সুলভ বয়স' হইয়াছে বলিয়া চিন্তাকুল হইলেন" (অযোধ্যা ১১৮—৩৪)। এই সকল ঘটনার পর রামের সহিত সীতার বিবাহ হইয়াছিল। আর বিবাহের পরেই সীতা ও তাঁহার ভগিনীগণ সম্বন্ধে রামায়ণ আছে :—

রেমিরে মুদিতাঃ সৰ্ব্ব ভর্তৃভিঃ সহিতা রহঃ। (আদি ৭৭—১৪)।

পূর্ব্বে বাল্যবিবাহ না থাকার বহু প্রমাণ মহাভারত-মঞ্জরীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। বিদ্যানিধি তাহা খণ্ডন করেন নাই।

সমালোচকের সকলই অভিনব মত। আর একটি এই যে ঋগ্বেদের বহু বহু পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন জাতিছিল। ঋগ্বেদের বহু বহু পূর্ব্বে কি ছিল ও যাহার প্রমাণ নাই, তাহারই কল্পনা! পণ্ডিত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বেদের বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে ঋগ্বেদের বহু বহু পূর্ব্বে কেন, ঋগ্বেদের সময়েও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন জাতি ছিল না (প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩২০, পৃঃ ১)।

বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন, "মঞ্জরীকার স্ত্রী-রত্ন শব্দে বুঝিয়াছেন, সুন্দরী স্ত্রী। কিন্তু স্বজাতির মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, রত্ন শব্দের এই অর্থ প্রসিদ্ধ," মঞ্জরীকার কেন 'শ্রেষ্ঠ' অর্থ গ্রহণ না করিয়া 'সুন্দরী' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার বিশিষ্ট কারণ দিয়াছেন। বিদ্যানিধি তাহার উল্লেখ ও খণ্ডন করেন নাই। সৌন্দর্য্য না থাকিলে কোন নারীই নারীশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আবার যে নারী দুষ্কুলজাত, সে নারী রূপবতী ও গুণবতী হইলেও স্ত্রীজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ নহে। 'নারীশ্রেষ্ঠ' বলিলে নারীজাতির মধ্যে সৰ্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ বুঝিতে হইবে। তাহার পর, মঞ্জরীকার যত দুষ্কুলজাত স্ত্রীরত্ন গ্রহণের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, সকলেরই স্বামী তাঁহাদের শুধু রূপের জন্য বিবাহ করিয়াছেন, "স্ত্রীজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ" বলিয়া নহে। পণ্ডিত অবিনাশ চন্দ্র বিদ্যাবিনোদও স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপির অর্থ করিয়াছেন, "নীচবংশ হইতেও 'সুন্দরী কন্যা' গ্রহণ করা যাইতে পারে" (চাণক্য শ্লোক পৃঃ ৮)।

সমালোচক মঞ্জরীকারের সহিত একমত হইয়া প্রথমে লিখিয়াছেন, "অনুলোম বিবাহ যে বহুকাল পৰ্য্যন্ত চলিতেছিল, তাহারও বহু প্রমাণ আছে।" তাহার পরে সে মত পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছেন, "পূৰ্ব্বকালে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল, অসবর্ণ বিবাহ যে শাস্ত্র সম্মত, উহার বহু শাস্ত্র মঞ্জরীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা যে প্রচলিত ছিল, উহার বহু দৃষ্টান্তও মঞ্জরীতে আছে। সমালোচক সে সকল খণ্ডন করেন নাই। সে স্থলে ঐ জন মত পরিবর্ত্তন সঙ্গত কি?

তিনি আবার লিখিয়াছেন, "বিবাহ কন্যাদান নহে, চিরস্থায়ী নহে, সাময়িক চুক্তি মাত্র—এই রূপ মত তিনি (মঞ্জরীকার) যত সহজে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, আমার নিকট ততই অ-সহজ বোধ হইয়াছে।" গ্রন্থখানি মনোযোগ দিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ না করার

এই সকল ফল। মঞ্জরীকার ঐ সকল বিষয় 'স্বীকার' করিয়া লন নাই। তিনি শাস্ত্রের বহু বচন ও বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা সে সকল প্রমাণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের এক অংশের সহিত অন্য অংশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সমালোচক ঐ সকল বিষয়ের সহিত "সধবাস্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ" ও "বিধবা-বিবাহ" এক সঙ্গে পড়িলে ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিয়া ঐ সকল বিষয় হয়ত তাঁহার নিকটেও সহজ হইত।

সমালোচক আর একটী দোষ ধরিয়াছেন যে পূর্ব্ব প্রথা কেন উঠিয়া গিয়াছে, মঞ্জরীকার তাহার কারণ দেন নাই। তিনি অনেক স্থলে দিয়াছেন। যাহা সহজ, তাহারই কারণ দেন নাই।

বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন, "মঞ্জরী একাই মূল্যবান্ তথ্যের আকর। * * * যা নাই মঞ্জরীতে, তা নাই ভারতে। * গ্রন্থকারের ভাষা ভাল, রচনারীতিও ভাল।" তথাপি তিনি লিখিয়াছেন, "এই অংশ (গল্পাংশ) যুবকগণের শিক্ষাপ্রদ হইবে।" সমালোচক মনোযোগ দিয়া গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত পড়িলে বুঝিতে পারিতেন যে, শুধু গল্পাংশ নহে, সমুদয় গ্রন্থই, শুধু যুবকগণের নহে, বৃদ্ধগণেরও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। নতুবা কি পক্ষপাতশূন্য সার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিতেন—"ইহা পাইবামাত্র পড়িবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ইহার প্রতি পত্রে গভীর গবেষণা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে যে সমস্ত প্রামাণিক বচন সংগ্রহ করিয়াছেন এবং যে মন্তব্য ও সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অশেষ কল্যাণ হইবে। হিন্দুজাতি বাস্তবিকই ধ্বংসোন্মুখ। এখনও যে আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন হইতেছে না ইহাই আক্ষেপের বিষয়।" এমন কি, বর্ত্তমান সময়ের একজন প্রধান সাহিত্যিক নাটোরের মহারাজা বাহাদুরও এই গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "আমি সাধারণ ভাবে পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি, আপনি বিপুল শ্রম স্বীকার করিয়া ভারত মহাসমুদ্র এবং ভারতীয় অপরাপর শাস্ত্র বারিধি মন্থন করিয়াছেন ও রত্নরাজি, 'সূত্রে মণিগণের ন্যায়', গ্রথিত করিয়া বঙ্গ বাণীর কণ্ঠহার প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা আমাদের সাহিত্য ভাণ্ডারে একটী মূল্যবান্ রত্ন হইয়া রহিল মনে করিতেছি।"

শ্রীঅক্ষয় কুমার পাল।

আঁধারের যাত্রী

মেঘাচ্ছন্ন স্তব্ধ মূক রাত্রি—
চলিয়াছি অন্তহীন নিরানন্দ আঁধারের যাত্রী !
নিশ্ছিদ্র গগন
সুগভীর বেদনায় আজি নিমগন
অবিচ্ছিন্ন অন্ধশোক অন্ধকার মাঝে ;
ক্ষুব্ধ লাজে,
ধরণী সে আপনারে ঢাকিবারে চাহে এক কোণে
ঘন তমিস্রার সিক্ত বসন অঞ্চল আবরণে ;
আজি সারা রাতি
শূন্যে শূন্যে দিকে দিকে রুদ্ধ রোদনের আমি সাথী !

মনে হয় এরই সাথে সাথে
কবে কোন সমুজ্জ্বল প্রাতে
দীপ্ত মুখরিত মুগ্ধ আনন্দের মহাযজ্ঞ হ'তে
ভেসেছিনু অনুকূল স্রোতে
প্রদোষের স্নিগ্ধ-তপ্ত নির্ম্মল আলোতে।
তরীতে ছিল না স্থান, আকাশে ছিল না মেঘকণা,
সংশয় ছিল না চিত্তে, ছিল না ভাবনা,
যাত্রী দল
আনন্দচঞ্চল,
আমারে ঘেরিয়া কত নব উৎসবের আয়োজন
গানে গানে পূর্ণ করি নিখিল গগন,
দিকে দিকে পড়েছিল টুটিয়া লুটিয়া—
আবেগে হিল্লোলে রঙ্গে তরঙ্গে তরঙ্গে আবর্ত্তিয়া
হানিয়া তরণীতটে, মৃদুমন্দ মৃদঙ্গের ধ্বনি—
উচ্ছ্বসিত তটিনীর স্পন্দমান হৃদয়ের যেন প্রতিধ্বনি।
নবারুণরাগদীপ্ত শুভ্র সে প্র[illegible]
চঞ্চল এ চিত্তভৃঙ্গ পান করেছিল মধু[illegible] বাতে
আলোর অমৃতধারা,—
বিদ্যুৎ সঞ্চারি' দেহে করেছিল মোরে আত্মহারা।

নয়নে কি মোহ ছিল ! এ বিশ্বের প্রতি অণুটিরে
চেয়েছিল পেয়েছিল বুকে ফিরে ফিরে,
আমারি চিত্তের মাঝে এ নিখিল পেয়েছিল পরম আশ্রয়
অনন্ত বিভূতি লয়ে—একি এ বিস্ময় !
সারা বিশ্ব আপনার আনন্দ সম্ভারে
সম্ভাষিয়া মোরে বারে বারে
বলেছিল "প্রিয় তুমি, প্রিয় ওগো, তুমি প্রিয়তম।"
সেদিনো এ রুদ্ধ বক্ষে মম
এমনি নিবিড় ব্যথা, আনন্দের আঘাতে সংঘাতে
রুদ্ধ করি কণ্ঠ মোর সিক্ত করি আঁখি অশ্রুপাতে,
উঠেছিল হৃদয়ে ঘনায়ে—
পড়িল ঝরিয়া বুঝি হাসিভরা অশ্রুরূপে পত্রপুষ্পে শিশির কণায়।
মনে হয় এ জীবন যেন এক অপরূপ রক্ত শতদল
অশ্রুসায়রের পরে করে টলমল,
অরুণ কিরণ লভি আনন্দে হাসিয়া উঠে তারি অশ্রুজল।

আজি নিশি ঘনঘটা ঘোর
আচ্ছন্ন বিভোর—
আজিও তেমনি ব্যথা অন্তরে অন্তরে
বন হতে বনে বনান্তরে
সমস্ত বিশ্বের চিত্তে উঠিছে গুঞ্জরি,
গগনে গগনে তার প্রতিধ্বনি কেঁদে মরে গুমরি গুমরি।
ওগো এই তিমির যামিনী
হবে না কি অবসান ? সুদৃপ্ত সৌদামিনী
ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত দাপটিয়া রোষে
আকাশ প্রাঙ্গন জুড়ি গভীর নির্ঘোষে
ত্রাসিয়া দংশিয়া এই নিবিড় আঁধারে বারম্বার
ফিরিবে কি শূন্যে শূন্যে তীব্র বিষে জর্জ্জরিয়া মূর্চ্ছিত আঁধার ?
চলিয়াছি একা
গভীর তিমিরে লুপ্ত কোথা পথ নাহি যায় দেখা,
একটি তারার ক্ষীণ আলো
একটি প্রদীপ নাহি, চারিদিকে অন্ধকার ঘেরিয়া দাঁড়ালো,
ঝর ঝর ঝরিছে কেবল
তিমির অন্তর ভেদি অশ্রুজলধারা অবিরল।

ভুবনে গগনে মনে আজি একাকার,
জলধারাতন্ত্রে বাঁধা পান্থবীণা ডাকে বারবার
"এস বাহিরিয়া এস, এস এস ওগো পথহীন
এস নিরুদ্দেশ যাত্রী"—চরাচর তিমিরবিলীন
সীমাশূন্য অম্বর অঙ্গনে,
চকিত চপলদীপ্তি চমকিছে শুধু ক্ষণে ক্ষণে
আজি শুনা যায় কোথা আঁধারের পারে
অস্পষ্টের সুদূর কিনারে
ধ্বনির আকুল গীতি, চিত্তে মোর তুলিছে হিন্দোল
ধরণীর চিরন্তন মহাঅশ্রুসিন্ধুকলরোল।

শ্রীজীবনময় রায়।

আমেরিকার লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অভ্যুদয়

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সংরক্ষণের জন্য দুইবার আইন প্রণয়ন করিলেন। বিদেশাগত দ্রব্যের উপর আমদানিকর (Import duty) স্থাপন এবং আর্থিক সাহায্য (bounty) প্রদানের ফলে যদি ভারতীয় লৌহশিল্প উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করে, তাহা সুখের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সংরক্ষণ নীতিই (protection) যে শিল্পের উন্নতির একমাত্র বা প্রধান উপায় নহে ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমেরিকার লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি আলোচনা করিলে এই ধারণা স্পষ্ট হইবে। ১৮৭০ হইতে ১৯১০ সাল, এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে আমেরিকার লৌহশিল্পের বিস্ময়জনক উন্নতি হইয়াছে; ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য প্রস্তুত করিত এবং যুক্তরাজ্যের উৎপাদন অতি নগণ্য ছিল। ১৮৯০ সালে যুক্তরাজ্য ইংলণ্ডের উৎপাদনকে পশ্চাতে রাখিয়া এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের তুলনায় প্রায় তিনগুণ সামগ্রী উৎপন্ন করিয়া লৌহজগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

সাল	ইংলণ্ড	যুক্তরাজ্য
১৮৭০	৫,৯৬৩	১,৬৬৫ হাজার টন
১৮৭৫	৬,৩৬৫	২,০২৪
১৮৮০	৭,৭৪৯	৩,৮৩৫

সাল	ইংলণ্ড	যুক্তরাজ্য
১৮৮৫	৭,৪১৫	৪,০৪৪
১৮৯০	৭,৯০৪	৯,০২৩
১৮৯৫	৭,৭০৩	৯,৪৪৬
১৯০০	৮,৯৬০	১৩,৭৮৯
১৯০৫	৯,৬০৮	২২,৯৯২
১৯১০	১০,০১২	২৭,৩০৪

এই চল্লিশ বৎসর বিদেশজাত লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্যের আমদানির উপরে উচ্চহারে কর বসাইয়া যুক্তরাজ্য স্বদেশী শিল্পের উন্নতির সহায়তা করিয়াছে। সংরক্ষণ নীতির প্রয়োগ ও উন্নতির আয়তন দেখিলে পরস্পরের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, ইহা অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। তথাপি বিশেষজ্ঞেরা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন আমেরিকার লৌহশিল্পের অভ্যুত্থানের মূল কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আমেরিকার অধিকাংশ স্থলে এ্যানথ্রাকাইট কয়লা দ্বারা লৌহ গলান হইত। এই কয়লার প্রচুর সরবরাহ ছিল না এবং মূল্যও অপেক্ষাকৃত উচ্চ ছিল। প্রায় ১৮৭০ সাল হইতে বিটুমিনাস্ জাতীয় কয়লার প্রচলন হইতে থাকে। বিটুমিনাস্ কয়লা অজস্র পরিমাণে উৎপন্ন হইত। ইহা পুড়াইয়া কোকরূপে লৌহ গলানর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া লৌহোৎপাদনের খরচ অনেক কমিয়া আসে। ঠিক এই সময়ে সার হেনরী বেসমার ইস্পাত প্রস্তুত করিবার এক অভিনব প্রণালী উদ্ভাবন করেন। বেসমার প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত ও গৃহীত হয়। যে লৌহে ফস্ফোরাসের ভাগ অধিক তাহাতে বেসমার প্রণালী প্রয়োগ করা চলে না। আমেরিকার সৌভাগ্যক্রমে সুপিরিয়ার হ্রদের সন্নিকটে বেসমার প্রণালীর উপযোগী লৌহের অসংখ্য খনি আবিষ্কৃত হয়। আশানুরূপ কয়লা ও লৌহ হস্তগত হইলেও তাহা একত্র করা এক ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। কিন্তু ১৮৭০ সালের কাছাকাছি সময়ে যুক্তরাজ্যের রেল লাইন এত বিস্তৃত ও উন্নত হইয়াছিল এবং স্থান হইতে স্থানান্তরে এত সস্তা ও সুবিধায় মাল প্রেরণ করা চলিত যে লৌহ ও কয়লার খনির পরস্পরের দূরত্ব ও ব্যবধান শিল্পের উন্নতির পরিপন্থী হয় নাই।

আমেরিকা বৃহৎ ব্যবসায় ও কারখানার (Trusts and combinations) লীলাভূমি! বিভিন্ন কারখানা একের কর্তৃত্বে সম্মিলিত হইয়া সমযোগে কাজ করিলে নানাদিক দিয়া ব্যয়সঙ্কোচ হইয়া থাকে। যুক্তরাজ্যের লৌহব্যবসায়িগণ সংহতির উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্যবসায়ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়াছিল। উৎপাদনের নানা স্তর একের অধীনে কেন্দ্রীভূত ও বিভিন্ন কারখানা সম্মিলিত ভাবে পরিচালিত হওয়ায় যুক্তরাজ্যের লৌহশিল্প অল্প সময়ের মধ্যে বিশালভাবে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

আমেরিকায় শ্রমজীবিসমস্যা অদ্যাবধি প্রবল আকার ধারণ করে নাই। ১৮৭০ হইতে ১৯১০ সালের মধ্যে মজুররা মাত্র দুইবার ধর্ম্মঘট করিয়াছিল, দুইবারই তাহারা বিফলপ্রযত্ন

হয়। ইংলণ্ডে শ্রমজীবিদের মধ্যে আন্দোলনের বিরাম নাই। তাহাদের দাবী অনেকস্থলেই গ্রাহ্য হইয়াছে। আমেরিকায় শ্রমজীবিসঙ্ঘের হস্তে বিশেষ কোনো ক্ষমতা নাই। ইংলণ্ডের তুলনায় আমেরিকার কারখানার মালিকরা শ্রমজীবী পরিচালনায় নানাবিধ সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। যুক্তরাজ্যে মজুরের অভাব অদ্যাবধি অনুভূত হয় নাই। ঐ দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার জন্য অন্যান্য দেশ হইতে দলে দলে লোক আগমন করে। সুদক্ষ না হইলেও অল্প মাহিনায় এইরূপ উপনিবেশিক শ্রমজীবী নিযুক্ত করিয়া অনেক কাজ পাওয়া যায়। লৌহ ও ইস্পাতের কারখানায় এই জাতীয় অসংখ্য শ্রমজীবী কাজ করিতেছে। অল্প-পারিশ্রমিকে ইহারা কাজ করে বলিয়া লৌহ উৎপাদনের খরচাও তদনুপাতে কম হইয়া থাকে। ইহাও যুক্তরাজ্যের শিল্পের উন্নতির অন্যতম কারণ।

এই সকল ঘটনা একত্র সম্মিলিত হইয়া আমেরিকায় লৌহ শিল্পের উন্নতি সত্বর আনয়ন করিতেছে। শ্রীবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া, ইহাদের উপেক্ষা করিয়া একমাত্র সংরক্ষণনীতির প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিলে অত্যন্ত ভ্রম হইবে। তবে লৌহশিল্পের উন্নতির মূলে সংরক্ষণনীতির প্রভাব যে একেবারেই নাই—তাহাও সত্য নহে।

প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাজ্যের লৌহশিল্পের জীবননাট্যে সংরক্ষণনীতি উৎসাহদাতার অংশ গ্রহণ করিয়াছে। আমেরিকায় সুবিধা ও সুযোগ এত অধিক ছিল যে রক্ষণ শুল্ক ব্যতিরেকেও তাহার লৌহশিল্প নিশ্চয়ই উন্নতিলাভ করিত, তবে উন্নতি এত সহজ ও দ্রুত হইত কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সংরক্ষণনীতি, কাঁচামাল, লৌহ ও কয়লা, এবং মূলধনের যোগাযোগ অতি শীঘ্র সংঘটিত করিয়াছিল। আমদানিকর বৈদেশিক দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া যুক্তরাজ্যের বাজারে স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয়ের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল, বাজারে লৌহ ও ইস্পাত সামগ্রীর প্রভূত কাটতি হওয়ায় ঐ ব্যবসায়ের মালিকগণ প্রচুর হারে লাভ করিতেছিল এবং শিল্পের উন্নতির প্রতি বৈজ্ঞানিক ও মূলধনের অধিকারীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

সংরক্ষণনীতির প্রভাব ইহার অধিক অগ্রসর হয় নাই। অবশ্য এই প্রভাবই নিতান্ত অল্প নহে—কিন্তু লৌহশিল্পের উন্নতির জন্য একমাত্র ইহাকেই দায়ী করিলে ইতিহাসের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করা হইবে। সংরক্ষণনীতি অনেক সময়ে কৃত্রিম আশ্রয়দান করিয়া শিল্পের উদ্যম ও অধ্যবসায় নষ্ট করিয়া ফেলে, কখনও বা অযোগ্যকে আশ্রয় দিয়া দেশের জনসাধারণকে অযথা ক্ষতিগ্রস্ত করে। এক্ষেত্রে সংরক্ষণনীতিকে সে ভাবে অভিযুক্ত করা চলে না। সংরক্ষণনীতি যুক্তরাজ্যের লৌহব্যবসায়িগণের সম্মুখে যে সুযোগ উপস্থিত করিয়াছিল তাহারা নানাবিধ অনুকূল অবস্থার মধ্যে তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছে।

সংরক্ষণনীতির সহায়তা লাভ করিয়াছে বলিয়াই যে ভারতীয় লৌহশিল্পের উন্নতি সুনিশ্চিত—এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ নাই, তবে এই সুযোগের সম্যক্ সদ্ব্যবহার করিলে উন্নতির সম্ভাবনা আছে ইহা স্বীকার করা চলিতে পারে। যুক্তরাজ্যের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া লৌহশিল্প পরিচালনা করিলে ভারতবাসীর পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

হিমালয়

দিগন্ত-প্লাবী অম্বর-চুম্বী
অনন্ত-যোগী নিরুদ্ধ-সংজ্ঞা,
তুষার-তৃপ্তি-স্নাত-হেমাঙ্গ
বিরাট শৃঙ্গী কাঞ্চনজঙ্ঘা।

বনানী শ্যামা চরণাবলেহী
সীত অভ্রভেদী শ্রীকণ্ঠহারা ;
মহান্ত শিরে সীত চূড়া-লগ্না ;
বক্ষে করুণা জাহ্নবীধারা !

প্রশান্ত ভালে ধ্যান-মৌন আঁখি,
অনন্তমুখী অবিলাপী ছন্দ !
ঝঙ্কারে বীণে কোটিকল্প বাণী
উৎসারে গন্ধমাধুরী-আনন্দ।

যুগযুগান্ত, লাখবাণী ভাষা
তিমিরে স্তিমিত অগণিত সংখ্যা
সতত প্রহরী অবিনাশী আত্মা
শ্বেতপদ্ম আঁখি কাঞ্চনজঙ্ঘা !

উমা অন্নপূর্ণা স্নেহাভিষেকে
তন্বী কিশোরী ধবলী তুষারে !
মেনকা মহিষী হৃদি পদ্মাসীনা
মানসী-প্রতিমা বিলাসে বিহারে !

হে মৌন সম্রাট ! প্রশান্তযোগী
কহ বক্ষ ভাষা শব্দকলাপে
পদ কল্প ছায়ে ধরণী সুধন্যা
গাহুক প্রশস্তি আলাপে-প্রলাপে।

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ বসু

পুস্তক-পরিচয়

স্বাস্থ্য ঃ—শ্রীচন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত; সুশ্রুত-সঙ্ঘ (১৭৭, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা) কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা মাত্র।

এই ছোট বইখানিতে সাধারণ ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য সকল বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর পুস্তকের যত বেশী প্রকাশ ও প্রচার হয় দেশের ততই মঙ্গল। বাঙ্গালী যে আজ মরণোন্মুখ জাতি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাধীনতা তাহার একমাত্র কারণ নহে। স্বাস্থ্য রক্ষার অতি সাধারণ ও মৌলিক তথ্যগুলি সম্বন্ধে জনসাধারণের ঘোরতর অজ্ঞতা ও উদাসীনতা দেশের এই শোচনীয় অবস্থার যে একটী গুরুতর কারণ তাহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। আমরা আশা করি আলোচ্য পুস্তকখানি এই দেশব্যাপী অজ্ঞানতা কিঞ্চিৎ দূর করিতে সমর্থ হইবে। দুঃখের বিষয় স্বাস্থ্য বিষয়ক গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় খুব কমই লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশে বিশেষজ্ঞ মণীষীর অভাব নাই। আমরা আশা করি তাঁহাদের দৃষ্টি এই উপেক্ষিত অথচ অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টীর প্রতি আকৃষ্ট হইবে।

খাদ্য ও স্বাস্থ্য ঃ—শ্রীচন্দ্র কান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত। মূল্য বার আনা মাত্র।

বইখানিতে বাঙ্গালীর দৈনিক খাদ্যের মূল উপাদান ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাহার উপকারিতা ও অপকারিতা আলোচিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি সাধারণের উপযোগী হইবে আশা করা যায়।

জ্বর ঃ—শ্রীচন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

বাঙ্গালা দেশ ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের আক্রমণে শ্মশানে পরিণত হইতে চলিল। অথচ এই দুইটী ব্যাধি প্রতিকার সাপেক্ষ। উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিলে ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনকে ইহাদের হস্ত হইতে নিরাপদ্ করা যায়। শুধু অজ্ঞানতার পাপেই প্রতি মিনিটে ৪০ জন বাঙ্গালী ম্যালেরিয়ার প্রকোপে প্রাণ হারাইতেছে। আলোচ্য পুস্তক খানিতে লেখক সহজ ভাষায় এই রোগের নিদান ও চিকিৎসার আলোচনা করিয়া বাঙ্গলার জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

সংক্রামক রোগ ঃ—শ্রীচন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

বইখানিতে কলেরা, প্লেগ, বসন্ত, উপদংশ প্রভৃতি সংক্রামক রোগের উৎপত্তির কারণ ও তাহার প্রতিকার অতি প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র লোক শুধু স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অজ্ঞতা ও অসাবধানতাবশতঃ নানাপ্রকার সংক্রামক রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতেছে। সুতরাং আলোচ্য পুস্তকখানি যে দেশবাসীর খুব উপকারে আসিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নব্যভারত

অতিরিক্ত পত্র

১ম খণ্ড] ফাল্গুন, ১৩৬১ [১ম সংখ্যা

জাতীয় শিক্ষা

কোন জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ লিখিতেছেন "বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে যে দাস-মনোভাবের সৃষ্টি করিতেছে আমাদের তরুণ বংশধরগণকে উহার প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে ব্যাপকভাবে জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন আরব্ধ হয়। এই আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এইরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যেখানে জাতির আয়ত্বাধীনে জাতীয় ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা হয়। সকল আন্দোলনের নেতৃগণই উদীয়মান বংশধরগণের নিকট হইতে পর্য্যাপ্ত সহায়তার প্রত্যাশা করেন, সুতরাং উহাদের প্রথম দাবী যে দেশের যুবকবৃন্দের উপরেই থাকে তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। এই দিক হইতে দেখিতে গেলে ১৯০৬ সনের আন্দোলন এক হিসাবে সফল হইয়াছিল। ইহাতে এমন একদল কর্ম্মীর সৃষ্টি হইয়াছিল যাহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসাহের সহিত আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা স্বত্বেও নিছক শিক্ষামূলক আন্দোলন হিসাবে যে ইহার পৃথক একটা অস্তিত্ব অথবা মূল ছিল না তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল প্রবাহে উৎপত্তিই ইহার দুর্ব্বলতার কারণ। সুতরাং প্রথমটীতে যখন ভাটা পড়িল তখন পরেরটীও কাজ কাজেই শুকাইয়া গেল।

"অসহযোগ আন্দোলন জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনে দ্বিতীয়বার শক্তিসঞ্চার করে। সমগ্র দেশে শত শত বিদ্যালয় ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠিল। ইহাদেরও উদ্দেশ্য অতিশয় সঙ্কীর্ণ ছিল। কেবল এক বৎসর কালের জন্য অসহযোগী ছাত্রদের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াই ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল। উহাদিগকে 'স্বরাজ সৈনিকে' পরিণত করা, অর্থাৎ অসহযোগ সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্য্যে নিয়োগ করাই ছিল লক্ষ্য। এক্ষেত্রেও শিক্ষা সম্বন্ধীয় আন্দোলনের রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে পৃথক কোন অস্তিত্ব ছিল না। শেষেরটীর বেগ কমিয়া আসিলে প্রথমটীও ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিল।

"ইহার ফল হইয়াছে এই যে আমাদের কার্য্য পদ্ধতিতে জাতীয় শিক্ষা চিরকালই নিম্নতর স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে এবং কোনি নেতাই কোন কালে এবিষয়ে

বৈজ্ঞানিক অথবা স্বাধীন চিন্তা নিয়োগ করেন নাই। ইহাকে যে আপনি খদ্দরের ন্যায় মূল্যবান বিবেচনা করেন তাহা বোধ হয় না, অথবা হয়ত আপনার কাছে খদ্দর এবং জাতীয় শিক্ষা সমার্থক! স্বরাজীগণ কাউন্সিলেই মগ্ন হইয়া আছেন। এইরূপ অবস্থায় এই আন্দোলনের উন্নতির সম্ভাবনা কোথায়? আর এই আন্দোলন যদি পুনঃ পুনঃ কেবল বিফল হইয়াই চলে তাহা হইলে অধিকাংশ দেশবাসীর উপর ইহার প্রতিক্রিয়া কি নিরাশাজনক এবং শোচনীয় হইবে না?

"সরকার তরফের চাল এবং সুবিধা অনুসারে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এবং 'সূত্রধারী'* নেতৃবর্গের হস্তে রাজনীতি বিভিন্ন আকার ধারণ করে। জাতীয় মহাসমিতি হয়ত চিরকালই এক অথবা অপর দলের আয়ত্বে থাকিবে, এবং প্রত্যেক দলেরই কার্য্য পদ্ধতি পৃথক হইবে। কেহ হয়ত খদ্দর উৎপাদন এবং অস্পৃশ্যতার নিরাকরণে জোর দিবেন, কেহ সার্ব্বজনীন শিক্ষা চাহিবেন, আবার কেহ হয়ত একেবারেই আইন অমান্য আরম্ভ করিতে চাহিবেন। আপনি অবশ্যই বলিবেন এই সকল কাজ জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণেরই করা উচিৎ, কারণ জাতির ডাকে আগ্রহের সহিত সাড়া দেওয়া উহাদের কর্ত্তব্য। আপনি কি মনে করেন ছেলেদের যদি আজ এক কার্য্যপদ্ধতি এবং কাল অপর কার্য্যপদ্ধতির অনুসরণ করিতে হয় তাহা হইলে উহাদের শিক্ষা, চরিত্র, অথবা কার্য্যদক্ষতা সম্বন্ধীয় ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধন হইবে?

"শিক্ষার লক্ষ্য শিশুগণের শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তি সমূহের বিকাশ সাধন, যাহাতে উহারা নাগরিকের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে। কেবল উচ্চ বিদ্যালয়েই এমন শিক্ষা সম্ভবপর হইতেপারে। ইহার পূর্ব্বে উহারা একেবারে কচি থাকে, আর ইহার পরে উহাদের চরিত্র এমন একটা বিশিষ্ট মোচড় খায় যে অভিলষিত অপর কোন পথে উহাকে পরিবর্ত্তিত করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। আপনার মতে উচ্চ বিদ্যালয়ের বয়সটা প্রধাণতঃ হাতে সুতাকাটা ও কাপড় বোনা এবং তৎসম্পর্কিত সকল প্রকার কাজে নিয়োগ করা উচিৎ। যে শিক্ষায় কার্য্য-দক্ষতার পার্থক্য স্বত্বেও সকল ছাত্রকে একই ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয় উহা কি অস্বাভাবিক এবং অত্যাচারমূলক নহে? যে সকল বালক এই প্রকার শিক্ষা লাভ করিবে উহারা শিক্ষার সকল প্রকার ফলই লাভ করিবে, এইকি আপনি মনে করেন? জাতীয় জীবনের সকলক্ষেত্রে নবজীবন সঞ্চার করিবার যোগ্যতা কি উহারা লাভ করিবে? সাধারণ অভিজ্ঞতা এই যে, যে সকল শিক্ষক এবং ছাত্র উপযুক্তরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন সমাজে উহারা সরকারী শিক্ষালয়ে তথাকথিত 'উদার শিক্ষা' প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও হীন বিবেচিত হইয়া থাকেন। শিক্ষককেই যদি সাধুভাবে জীবিকার্জ্জনের অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহা হইলে সমাজে তাঁহার স্থান হীন হয়, এবং ফলে ছাত্র অথবা জনসাধারণ কাহারও উপায়ই তিনি প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না। আপনার বিদ্যালয় সমূহে কেবল তাঁতীর ছেলেদেরই শিক্ষার সুবিধা হইতে পারে। অপরের পক্ষে অধিকতর ব্যাপক এবং উদার শিক্ষাপ্রণালীর প্রয়োজন। সুতাকাটা এবং কাপড়বোনা শিক্ষাপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত বিষয়বিশেষ হইতে পারে, কিন্তু উহাকে ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না, এবং থাকা উচিৎ

*সূত্রধারী—In power

ও নয়। জাতীয় শিক্ষার মৌলিক এবং সুনির্দ্দিষ্ট কতকগুলি সূত্র নির্দ্দেশ করিয়া প্রত্যেক বিদ্যালয়কে নিজের প্রয়োজন, ক্ষমতা, এবং ছাত্রগণের যোগ্যতা অনুসারে ব্যবস্থা করার অধিকার দিলেই কি অধিকতর ভাল হয় না?

"আপনি অনেক সময় বলেন যে ইংরাজ রাজের সহিত একটা বাস্তব অহিংসা যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে এবং আপনি উহার জন্য সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত সৈনিক চাহেন। আপনি কি মনে করেন যে সকল বিদ্যালয়ে কেবল সুতাকাটা ও কাপড় বোনা শেখান হয় সেই সকল বিদ্যালয় হইতে এইরূপ সৈনিকের একটা অনবচ্ছিন্ন প্রবাহ পাইবেন? এই সকল অপরিণত, এবং আংশিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বলিয়া অসম্পূর্ণরূপে সজ্জিত যুবকগণের পরাজয়ের সম্ভাবনাই কি অধিক নহে?

"গত ৪০ বৎসর অথবা অধিক কালের মধ্যে জাতীয় শিক্ষা বিষয়ে কতকগুলি পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আপনি কি এমন একটি প্রতিষ্ঠান নির্দ্দেশ করিতে পারেন যাহার আদর্শ আমরা সরকারকে অনুসরণ করিতে বলিতে পারি?

"সমগ্র জগৎ জড়বাদ-মূলক সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে। উহার অভাবে যে আমাদিগকে অসুবিধায় পড়িতে হইবে তাহা নিশ্চিত। বৈজ্ঞানিক এবং বৈষয়িক উন্নতির পথে পেছনে পড়িয়াছিল বলিয়াই যে ভারত পাশ্চাত্য জাতি সমূহের কবলিত হইয়াছে তাহা এখন নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে। ইতিহাসের এই শিক্ষা উপেক্ষার বিষয় নহে। কিন্তু আপনি যে কখনও রসায়নশাস্ত্র অথবা পদার্থ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বের আরোপ করিয়াছেন তাহা বোধ হয় না। ইহা কি বিস্ময়কর নহে?"

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের অবস্থা কি ছিল আমি জ্ঞাত নহি, কিন্তু ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের অবস্থা অবগত আছি। যদি বাস্তবিক 'জাতীয়' হইতে হয় তাহা হইলে জাতীয় শিক্ষায় সমকালীন জাতীয় অবস্থা প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের জাতীয় অবস্থা কতকটা অনিশ্চিত, সুতরাং জাতীয় শিক্ষায়ও অল্লাধিক নিশ্চয়তার অভাব অনিবার্য্য। অবরুদ্ধ স্থানের শিশুগণ কি করে? উহারা কি পরিবর্ত্তমান অবস্থার সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লয় না, এবং নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী অবরোধকারীর আক্রমণ প্রতিরোধে সহায়তা করে না? উহাই কি উহাদের পক্ষে প্রকৃত শিক্ষা নহে? পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের কৌশলই শিক্ষা। বর্ত্তমান কালের শিক্ষা প্রণালীর সর্ব্বপ্রধান ত্রুটী এই যে ইহাতে বাস্তবের ছাপ নাই, শিক্ষিতেরা দেশের পরিবর্ত্তনশীল প্রয়োজনে সাড়া দেয় না। স্থানীয় পারিপার্শ্বিকের সহিত প্রকৃত শিক্ষার সামঞ্জস্য থাকে, না থাকিলে উহা সুস্থতার পরিচায়ক নহে। শিক্ষায় অসহ-যোগের উদ্দেশ্য ছিল এই সামঞ্জস্যবিধান। এই আদর্শের প্রতিষ্ঠা যে আমরা করিতে পারি নাই তাহা সত্য। ইহার কারণ আমাদের অপূর্ণতা, আমাদের পারিপার্শ্বিকের মোহ কাটাইয়া উঠিবার অক্ষমতা।

একথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ শুধু সুতাকাটা ও কাপড় বোনা শিক্ষালয়ে পর্য্যবসিত হইবে! সুতাকাটা ও কাপড় বোনাকে আমি জাতীয় শিক্ষার একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ বিবেচনা করি, কিন্তু ইহাতেই শিশুগণের সমগ্র সময় নিয়োগ

করিতে বলিনা। নিপুণ অস্ত্র চিকিৎসকের মত আমিও পীড়িত অঙ্গে মনোনিবেশ করিয়া উহার তত্বাবধানে রত হই কারণ আমি জানি যে তাহাই অন্যান্য অঙ্গের যত্ন লইবার শ্রেষ্ঠ উপায়। শিশুর আত্মা, বুদ্ধিবৃত্তি, এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তিনেরই বিকাশ আমার অভিলষিত। তিনের মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড় হইয়া পড়িয়াছে, আর আত্মাকে ত একান্তভাবেই অবহেলা করা হইয়াছে। এই জন্য সময় অসময় বিচার না করিয়া সকল সময়েই আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার এই সকল গুরুতর ত্রুটী সংশোধনের জন্য অনুযোগ করিয়া থাকি। শিশুগণের পক্ষে দৈনিক আধঘন্টা করিয়া সূতাকাটা কি অতিরিক্ত শ্রমসাধ্য হইবে? ইহারই ফলে কি উহাদের মানসিক পক্ষাঘাত জন্মাইবে?—

বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব আমি অবগত আছি, যে সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত আমি সাক্ষাৎ-ভাবে জড়িত আছি বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় উহারা যদি বিজ্ঞান শিক্ষায় অবহেলা করিয়া থাকে উহার কারণ শিক্ষকের অভাব। কার্য্যকরী শিক্ষাদানের উপযোগী পরীক্ষাগারও ব্যয়সাপেক্ষ। এই প্রাথমিক এবং অনিশ্চয়ের অবস্থায় উহার জন্যও আমরা প্রস্তুত নই। (National education; ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২ই মার্চ্চ, ১৯২৫)

জন্ম নিয়ন্ত্রণ *

(মো, ক, গান্ধী)

বর্ত্তমান বিষয়ের আলোচনায় আমি যথেষ্ট সঙ্কোচ ও দ্বিধা বোধ করিতেছি। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর হইতেই জন্মসংখ্যা নিয়মণের জন্য কৃত্রিম উপায়ের ব্যবহার সম্বন্ধে আমি বহু পত্র পাইয়া আসিতেছি। ব্যক্তিগতভাবে ইহাদের উত্তর দিয়া থাকিলেও এযাবৎ প্রকাশ্য ভাবে উহার আলোচনা আমি করি নাই। ৩৪ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতে ছাত্রাবস্থায় থাকা কালীন এবিষয়ে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই সময়ে কৃত্রিম উপায়ের পক্ষপাতী জনৈক চিকিৎসকের সহিত একজন নীতিবাদীর প্রবল বিতণ্ডা চলিয়াছিল। ইনি স্বাভাবিক ভিন্ন অপর উপায়ের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। আমার জীবনের সেই প্রথম বয়সেই সংক্ষিপ্তকালের জন্য কৃত্রিম উপায়ের দিকে ঝুঁকিয়া পরে আমি উহার ঘোরতর বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলাম। কতকগুলি হিন্দী কাগজে এই সকল উপায় এত বীভৎসভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে তাহাতে লোকের শ্লীলতাবোধে আঘাত না লাগিয়া পারে না। একজন লেখক কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়াই কৃত্রিম উপায়ের অনুরাগীরূপে আমার নামের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল উপায়ের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে একবারও লিখিয়াছি বা

* Birth control. Young India; 12. 3. 25

বলিয়াছি বলিয়াত আমার মনে পড়ে না। কৃত্রিম উপায়ের সমর্থনে আরও দুইজন খ্যাতনামা ব্যক্তির নামের উল্লেখ দেখিয়াছি। নামের অধিকারীগণের নিকট হইতে সংবাদ না লইয়া উহাদের নাম আমি প্রকাশ করিলাম না।

জন্মনিয়মণের প্রয়োজন সম্বন্ধে মতবিরোধ সম্ভবপর নহে। আত্মসংযম অথবা ব্রহ্মচর্য্যই যুগযুগান্তের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ইহার একমাত্র উপায়। এই অমোঘ ঔষধে অভ্যাসকারীরও প্রভূত উপকার সাধিত হইয়া থাকে। চিকিৎসকেরা যদি জন্মনিয়মণের কৃত্রিম উপায় নির্দ্ধারণের পরিবর্ত্তে আত্মসংযমের উপায় নির্দ্ধারণ করেন তাহা হইলে উহারা মানব জাতির অশেষ ধন্যবাদ অর্জ্জন করিবেন। সঙ্গমের উদ্দেশ্য আমোদ নহে, সৃষ্টি রক্ষা। সৃষ্টি রক্ষার বাসনার যেখানে অভাব, সঙ্গম সেখানে গুরুতর অপরাধ।

কৃত্রিম উপায়ের অনুসরণে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। উহা স্ত্রীপুরুষকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলে। সম্ভ্রমের আবরণে আবৃত হইলে এই সকল উপায় লোকাচারের বাধাকে শিথিল করিয়া দেয়। কৃত্রিম উপায় অনুসরণের অবশ্যম্ভাবী ফল শক্তিহীনতা এবং স্নায়বিক অবসাদ। এই প্রতিকার মূল পীড়া হইতেও সাংঘাতিক। কর্ম্মফল এড়াইবার চেষ্টা নীতিবিরুদ্ধ ও অন্যায়। পেটের বেদনা এবং পরবর্ত্তী উপবাস অমিতাহারীর পক্ষে মঙ্গলজনক। কামনায় প্রশ্রয় দিয়া রসায়ন অথবা অপর ঔষধের সাহায্যে ফল এড়াইবার চেষ্টা অহিতকর। পাশববৃত্তির প্রশ্রয় দিয়া ফল এড়ান আরও মন্দ। অনিবার্য্য প্রকৃতি নিজের নিয়মের বিরুদ্ধাচরণের পূর্ণ প্রতিশোধ লইয়া থাকেন! কেবল নৈতিক সংযম দ্বারাই নৈতিক ফল উৎপাদন সম্ভবপর। অন্য সকল প্রকারের সংযম নিজেদের উদ্দেশ্যকেই বিফল করে। 'ভোগ জীবনের নিয়ম'—এই ধারণাটি কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের মূলে; ইহা অপেক্ষা ভ্রমাত্মক ধারণা আর নাই। জন্মনিয়মণে যাহারা উৎসুক উহারা প্রাচীনগণের উদ্ভাবিত ধর্ম্মসঙ্গত উপায়সমূহ অধ্যয়ন করুন, এবং উহাদের পুনরুজ্জীবনের উপায় নির্দ্ধারণের চেষ্টা করুন। উহাদের সম্মুখে প্রচুর কাজ পড়িয়া রহিয়াছে। বাল্যবিবাহ প্রজাবৃদ্ধির একটী প্রধান কারণ। বর্ত্তমানকালের জীবনযাত্রা পদ্ধতি ও ইহার জন্য কম দায়ী নহে। এই সকল কারণের অনুসন্ধান এবং প্রতিকার হইলে সমাজের নৈতিক উন্নতি সাধিত হইবে। অধীর ভোগলিপ্সুগণ যদি এই সকল বিষয় উপেক্ষা করেন, এবং কৃত্রিম উপায়ই প্রচলিত নিয়ম হইয়া দাঁড়ায় তবে ফলে নৈতিক অবনতি অনিবার্য্য। যে সমাজ বহুবিধ কারণে বীর্য্যহীন হইয়া পড়িয়াছে, কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে উহা আরও বীর্য্যহীন হইয়া পড়িবে অতএব যে সকল লোক লঘুভাবে কৃত্রিম উপায়ের অনুমোদন করেন উহারা আবার নূতন করিয়া এ বিষয় অধ্যয়ন করুন, এবং এই ক্ষতিকর কার্য্যপ্রণালী স্থগিত রাখিয়া বিবাহিত এবং অবিবাহিত উভয়ের জন্য ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করুন। জন্মনিয়ন্ত্রনের ইহাই সরল এবং মহৎ পন্থা।

চয়ন

শ্রীযুক্ত রোম্যা রোলাঁর 'মহাত্মা গান্ধী' নামক পুস্তকের ১১৬ পৃষ্ঠা হইতে মহাত্মাজীর সহযোগী শ্রীযুক্ত ডি, বি, কালেলকার মহোদয়ের, 'gospel of swadeshi' নামক পুস্তিকার ইংরাজী অনুবাদের অংশ বিশেষের উল্লেখ করিয়া জনৈক পত্র প্রেরক 'স্বদেশী ও জাতীয়তা' সম্বন্ধে উঁহার মতামত বিশদভাবে জানিতে চাহিয়াছিলেন। মূলের সহিত অনুবাদের অসঙ্গতির উল্লেখ করিয়া মহাত্মাজী বলিতেছেন:—

স্বদেশী
জাতীয়তা

'স্বদেশীর যে সংজ্ঞা আমি নির্দ্দেশ করি তাহা সকলেই জানেন। নিকটতম প্রতিবেসিকে উপেক্ষা করিয়া দূরতর প্রতিবেসির সেবায় আমি আত্মনিয়োগ করিতে পারি না। ইহাতে প্রতিহিংসা অথবা শাস্তির কোন কথা উঠিতে পারে না। ইহাকে সঙ্কীর্ণচিত্ততাও বলা যাইতে পারে না। কারণ আমার বিকাশের জন্য যাহা কিছুর প্রয়োজন হয় তাহা আমি জগতের সর্ব্বত্র হইতেই আহরণ করিয়া থাকি। স্বভাবের বশে যাহারা আমার নিকটতম প্রতিপাল্য যাহাতে উঁহাদের অনিষ্ট হয় অথবা যাহা আমার বিকাশের অন্তরায় তাহা যতই সুশোভন হউক না কেন আমি কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করিনা। কার্য্যকরী সৎসাহিত্য আমি সর্ব্বত্রই খরিদ করি। আমি ইংলণ্ড হইতে ডাক্তারী যন্ত্রাদি, অষ্ট্রিয়ার পিন এবং পেন্সিল, এবং সুইজারল্যাণ্ড হইতে ঘড়ি আহরণ করিয়া থাকি। কিন্তু আমি জাপান, ইংলণ্ড, অথবা অপর স্থানের সুচিকন কার্পাস বস্ত্র এক ইঞ্চি পরিমিতও খরিদ করিতে প্রস্তুত নই। উহা ভারতের কোটী কোটি অধিবাসীর প্রভূত ক্ষতি সাধন করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। ভারতের একান্ত রিক্ত এবং চিরঅভাবগ্রস্থজনগণের কাটা ও বুনা কাপড় ফেলিয়া বিদেশী কাপড় ক্রয় করা আমি পাপ কার্য্য মনে করি—যদিও উহা উৎকর্ষে ভারতীয় হাতে কাটা সূতার কাপড় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। হাতে বোনা খদ্দরকে কেন্দ্র করিয়া ভারতে প্রস্তুত ও প্রস্তুতক্ষম সকল বিষয়ে আমার স্বদেশী প্রসারিত হইয়াছে। আমার জাতীয়তাও আমার স্বদেশীরই মত ব্যাপক। সমগ্র জগতের মঙ্গলের জন্যই আমি ভারতের মুক্তি কামনা করি। অপর জাতির ধ্বংসের উপর ভারতের উন্নতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে আমি চাহি না। সামর্থ্য এবং বল থাকিলে ভারত নিজের শিল্পসম্পদ এবং স্বাস্থ্য-পোষক মসলা জগতের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিত, কিন্তু প্রভূত লাভের সম্ভাবনা থাকিলেও অহিফেণ অথবা মত্ততাজনক পানীয় রপ্তানী করিতে অস্বীকার করিত। *'

জনৈক ইংরাজকে প্রেরকের উত্তরে মহাত্মাজী বলিতেছেন—

"জাতিভেদ ও অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে আমার মতামত বহুবার প্রকাশ করিয়াছি। বিবাহ যে বন্ধুত্বের নিদর্শন তাহা আমার মনে হয় না, এমন কি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও না, গোষ্ঠীগত

* Swadeshi and Nationalism ; Young India, 12. 3. 25

কথাই নাই। এমন সময়ের কল্পনা আমি করিতে পারিনা যখন সমগ্র মানবজাতি এক ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। কাজে কাজেই বিবাহের মধ্যে ধর্ম্মগত একটা বাধা সচরাচর থাকিবে। লোক নিজের ধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতরেই বিবাহকরিবে। এইরূপে একটা দেশগত বাধাও থাকিবে। জাতি বা বর্ণগত বাধা এই নিয়মেরই ব্যাপ্তি মাত্র। সমাজের সুবিধার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা। অভিজাত বংশীয় ইংরেজের ছেলে মুদীর মেয়েকে সচরাচর বিবাহ করেন না। শুধু পাত্রীর জন্মের বিষয় বিবেচনা করিয়াই এইরূপ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইবে। আমি অস্পৃশ্যতার বিরোধী কারণ উহাতে সেবার পরিসর সঙ্কুচিত করা হয়। বিবাহ সেবামূলক নয়। স্ত্রীপুরুষ নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই ইহাকে বরণ করে। স্বাচ্ছন্দ্যের পরিসর সীমাবদ্ধ করায় অথবা বিবাহের ন্যায় জীবনের আমূল পরিবর্ত্তনমূলক একটা ব্যাপারে নির্ব্বাচনপ্রবন হওয়ায় দোষ দেখিনা। নিজের কন্যাকে পুত্রবধুরূপে না দিলে অথবা উহার পুত্রকে জামাতৃপদে বরণ না করিলে যদি কেনিয়ায় উপনিবিষ্ট ব্যক্তি আমার উপস্থিতি প্রার্থনীয় মনে না করেন তবে স্বভাব বিরুদ্ধ একটা বন্ধন স্বীকারকরিয়া লওয়া অপেক্ষা কেনিয়ার বাহিরে থাকাই বরং পছন্দ করিব। সে যাহাই হউক আমি বলিতে পারি যে কেনিয়ায় উপনিবিষ্ট ইংরেজ এইরূপ সম্পর্কের কথা আমাকে কল্পনাও করিতে দিবেন না; যদি এইরূপ কোন দাবী আমি করি উহা উহার একচটিয়া অধিকার হইতে আমার বহিষ্কারের অতিরিক্ত কারণ স্বরূপ হইবে। যদিও ব্যাপারটী আমার নিকট নিতান্ত স্পষ্ট বলিয়াই মনে হইতেছে, এবং কার্য্যতঃ জগতের সর্ব্বত্রই জাতি, গোষ্ঠি, ইত্যাদিতেই বিবাহ ব্যাপার সীমাবদ্ধ থাকিতে দেখা যায়। তথাপি এণ্ড্রুজ সাহেবের পত্রলেখক যে আমার উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন সে সম্ভাবনা অল্প। অন্ততঃ এটুকু আমি নিশ্চয়তা সহকারে বলিতে পারি যে কাহাকেও বিরক্ত করিবার ভয়ে বিচার্য্য বিষয় এড়াইতে চেষ্টা করি নাই। পত্রলেখক 'রাজনৈতিক' শব্দটী যে সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন সে অর্থে আমি রাজনীতিক নহি। আমার যাহা বিশ্বাস তাহাই আমি লিখিয়াছি। রাজনীতিক সুবিধার খাতিরে কোন নীতিকে আমি বিসর্জ্জন দিই নাই। যে সমাজে আমার বিচরণ করিতে হয় অসবর্ণ বিবাহ নিষেধাত্মক হিন্দু বিধির বিরুদ্ধে গেলেই হয়ত উহার নিকট আমার অধিক আদর হইবে। আমার লক্ষ্য সমগ্র মানবসমাজে সাম্যের প্রতিষ্ঠা, এবং সাম্য অর্থই সেবার সাম্য। সেবার অধিকারে কেহই বঞ্চিত হইবে না। বিবাহে প্রকৃতিগত ও অন্যান্য সাদৃশ্যের কথা উঠে। কোন স্ত্রীলোক যদি রক্তবর্ণ চুলবিশিষ্ট কোন লোককে বিবাহ করিতে অস্বীকার করেন তাহাতে দোষ হইবে না, কিন্তু কেবল চুল রক্তবর্ণ বলিয়াই যদি তিনি উহার সেবায় অবহেলা করেন তাহা গুরুতর দোষের বিষয় হইবে। বিবাহ নির্ব্বাচনের বিষয়, কিন্তু সেবা অবশ্য কর্ত্তব্য।

পতিত সমস্যা ও অসবর্ণ বিবাহ

অস্পৃশ্যতা এবং বর্ণভেদের মধ্যে একটা গূঢ় পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমটীর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই, যুক্তিদ্বারাও উহার সমর্থন করা যাইতে পারে না। ইহা মানুষকে মানুষের সেবার অধিকার হইতে এবং বিপন্ন অস্পৃশ্যকে সেবার দাবী হইতে বঞ্চিত করে। আমার মতে বর্ণভেদ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর

অস্পৃশ্যতা ও বর্ণভেদ

প্রতিষ্ঠিত। উহা যুক্তিবিরুদ্ধ ও নহে। ইহার অসুবিধা সুবিধা দুইই আছে। ইহা শূদ্রের সেবা করিতে ব্রাহ্মণকে বাধা দিতে পারে না। বর্ণ সামাজিক এবং নৈতিক সংযমের জনক। বর্ণভেদের বিস্তার করা যাইতে পারে না। আমি উহাকে চতুবর্ণের মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার পক্ষপাতী। উহার বিস্তার কুফলপ্রসূ হইবে। আমি বর্ণসংস্কারের এবং উহার ত্রুটী স্খালনের পক্ষপাতী, কিন্তু বর্ণভেদ উঠাইয়া দিবার কোন সার্থকতা দেখি না। এক্ষেত্রে উৎকর্ষ অপকর্ষের কোন কথা দেখি না। যে ব্রাহ্মণ মনে করেন অপর জাতির প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিবার জন্যই উহার জন্ম হইয়াছে, তিনি ব্রাহ্মণ নহেন। যদি তাঁহাকে বড় হইতে হয়, সেবার অধিকারেই বড় হইতে হইবে।)

"একই ছাত্রাবাসের অধিবাসী বিভিন্ন বর্ণের শিশুগণকে একটী সাধারণ ভোজনগারে একত্রে বসিয়া খাইতে বাধ্য করা কি উচিৎ?"—জনৈক পত্রপ্রেরকের এই প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মাজী বলিতেছেন :—

প্রশ্নটী ঠিকভাবে উপস্থাপিত হয় নাই। যে রকমভাবে প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে তাহার উত্তর এই যে বিভিন্ন বর্ণের শিশুগণকে একসঙ্গে আহার করিতে বাধ্য করা যায় না।

আন্তবর্ণ্য ভোজন

কিন্তু তাহা হইলেও আন্তবর্ণ্যভোজন বিষয়ক কোন সর্ত্ত না করিয়া ছেলে ভর্ত্তি করিয়া উহাদিগকে ভিন্ন জাতির ছেলেদের সঙ্গে একত্র ভোজন করিতে বাধ্য করা যেমন অযৌক্তিক, কোন হোটেল-ওয়ালা বিভিন্ন বর্ণের একত্র ভোজনের সর্ত্তে সভ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না, এইরূপ দাবী করাও তেমনি অন্যায়। অপর নিয়মের অভাবে আমরা এই ধরিয়া লইতে পারি যে প্রচলিত প্রথানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পৃথক পৃথক আহারের ব্যবস্থা আছে আন্তবর্ণ্য ভোজন অতিশয় জটিল সমস্যা, এ বিষয়ে খুব বাঁধাধরা কোন নিয়ম নির্দ্দেশ সম্ভবপর নহে। আন্তবর্ণ্য ভোজন যে একটা আবশ্যকীয় সংস্কার তাহা আমি মনে করি না, কিন্তু তাহা হইলেও এই বিষয়ক সামাজিক বাধার একান্ত বিলোপ সাধনের যে একটা চেষ্টা রহিয়াছে তাহা আমি স্বীকার করিব এই বাধার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে, উভয় পক্ষেই আমি যুক্তি দেখিতে পাই। এই পরিবর্ত্তনের গতিবেগ ত্বরিত করিয়া দিবার পক্ষপাতী আমি নই। কোন লোক অপরের সহিত একত্র ভোজন না করিলে সেটাকে আমি পাপ কার্য্য মনে করি না, আবার কেহ যদি অন্তর্ভোজনের পক্ষপাতী হয়েন, তাহাও পাপ মনে করি না। কিন্তু তাহা হইলেও যদি কেহ অপরের মনোভাবকে উপেক্ষা করিয়া এই বাধা ভাঙ্গিতে যান, সেই চেষ্টায় বাধা দেওয়া আমি কর্ত্তব্য মনে করি। আমি বরং এবিষয়ে উহাদের সংসারকে শ্রদ্ধা করিয়াই চলিব।

সূচী

ক্যালকাটা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,—৬৫ নং সার্পেণ্টাইন লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নব্যভারত

দ্বিচত্বারিংশ খণ্ড] চৈত্র, ১৩৩১ [১২শ সংখ্যা

চম্পারণে মহাত্মা গান্ধী

প্রথম অধ্যায়

চম্পারণ

চম্পারণ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের পশ্চিমোত্তর কোণে অবস্থিত একটী জেলা। ইহার উত্তরে হিমালয় ও নেপাল রাজ্য, পশ্চিমে যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত গোরখপুর জেলা, পূর্ব্বে মজঃফরপুর ও দক্ষিণে সারণ (ছাপরা) জেলা। হিমালয়ের দক্ষিণাংশের কিছু সোমেশ্বর বলিয়া পরিচিত। তাহার কিয়দংশ চম্পারণে পড়ে। তাহাই চম্পারণ ও নেপালের মধ্যে সীমা নির্দ্দেশক। সোমেশ্বর পর্ব্বতের উচ্চতা প্রায় ২৫০০ ফিট; ইহার একটী শীর্ষের উচ্চতা ২৮৮৪ ফিট, সেখানে একটী দুর্গ আছে।

এই জেলার সকলের চেয়ে বড় ও বিখ্যাত নদী নারায়ণী; তাহা শালগ্রামী ও গণ্ডক নামেও পরিচিত। প্রাচীনকালে এই নদী জেলার প্রায় মধ্যস্থল দিয়া প্রবাহিত ছিল, কিন্তু সে ধারার পরিবর্ত্তন হইয়াছে; আজ ইহা জেলার দক্ষিণ সীমা হইয়া উঠিয়াছে। নারায়ণী হিমালয়ের ত্রিবেণী নামক স্থান হইতে বাহির হইয়াছে। ত্রিবেণী পর্য্যন্ত ইহাতে নৌকা চলিতে পারে। গ্রীষ্মে জল বেশী না থাকিলেও নৌকা চলাচলের উপযুক্ত জল থাকে। বর্ষায় ইহার বিস্তার অনেক বাড়িয়া যায় এবং স্রোত প্রখর হয়। নদীতে মকর কুমীর অনেক আছে। গজ গ্রামের পৌরাণিক কাহিনীতে এই নদীরই সারণ জেলাস্থিত একটী অংশের উল্লেখ আছে। গণ্ডক ছাড়া এই জেলার ছোট গণ্ডক নামের আর একটী নদী উল্লেখযোগ্য। ইহা সোমেশ্বর পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া প্রায় জেলার মধ্যস্থল দিয়া বহিয়া গিয়াছে। সোমেশ্বর হইতে বাহির হওয়ার কিছু দূর পর্য্যন্ত ইহার নাম হরহা, তাহার পরে সিকরহনা ও শেষাংশ বূড়ীগণ্ডক নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে ছোট ছোট বহু পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী আসিয়া মিলিয়াছে, তাহার ফলে গ্রীষ্মকালেও ইহার যেখানে (সিকরহনা) বিস্তার প্রায় ১০০ গজ থাকে, বর্ষায় তাহাই স্থানে স্থানে দুই মাইল হইয়া দাঁড়ায়। অন্যান্য ছোট ছোট নদী ছাড়া এই জেলায় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উৎখাত ত্রিবেণীর খাল আছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে গণ্ডক প্রাচীনকালে কোন সময়ে জেলার মধ্যস্থল দিয়া বহিয়া যাইত। এখন সে গর্ভ হইতে নদীর ধারা সরিয়া আসিয়াছে কিন্তু এখনও তাহার চিহ্ন ঝীলরূপে

বর্ত্তমান আছে। এইরূপে সমস্ত জেলায় প্রায় ৪৩টী ঝীল রহিয়াছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি বেশ গভীর; সেগুলিতে সারা বৎসর জল থাকে; সে জল পানযোগ্য নহে। নীলকুটীগুলি সেই জল কাজে লাগায় এবং অনেকগুলি কুটীই ঝীলগুলির তীরে অবস্থিত।

চম্পারণ জেলার জমি দুই প্রকারের। সিকরহনা নদীর উত্তরের ভূমি কিছু শক্ত এবং নিম্ন হওয়ায় চাষের পক্ষে খুব উপযুক্ত। তাহাতে নীলের চাষ চলে না। এই প্রকারের জমিকে 'বাঁতার' বলা হয়। সিকরহনার দক্ষিণাংশের জমিতে বালির পরিমাণ বেশী থাকায় তাহা ধান চাষের উপযুক্ত নহে। তাহা ভুট্টা, গম ইত্যাদি রবিশস্যের পক্ষে খুব উপযোগী। এই সকল জমিতে নীলের চাষও খুব ভাল হয়। ইহা 'ভীট' নামে বিখ্যাত। পর্ব্বতের সানুদেশের জমির উর্ব্বরতা খুব বেশী, সুতরাং যদিও সেখানকার জলবায়ু মানুষের পক্ষে অত্যন্ত খারাপ তবুও তাহা চাষের পক্ষে খুব উপযুক্ত। তরাই অঞ্চলে বেশীর ভাগ ধানের চাষই হয় এবং সমগ্র জেলায় ধানই প্রধান শস্য। আবাদী জমির শতকরা ৭৫ ভাগে ধানের চাষ হয়। গ্রাম্য কথা আছে—

আজব দেশ মঁঝৌয়া
জহাঁ ভাত ন পূছে কৌয়া।

(আজব দেশ মঁঝৌয়া যেখানে কাককেও ভাত চাহিতে হয় না।)

মঁঝৌয়া চম্পারণের বৃহত্তম পরগণার নাম।

চম্পারণের জলবায়ু বিহারের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা খারাপ। সে অঞ্চলে জ্বরের প্রকোপ খুবই বেশী; আর বর্ষার পরে প্রত্যেক পরিবারই হাঁসপাতাল হইয়া দাঁড়ায়। দক্ষিণাংশের আব্‌হাওয়াও ভাল বলা চলে না। অন্যান্য জেলা অপেক্ষা এই জেলায় শীত বেশী এবং গ্রীষ্ম কম। এই কারণে ইংরেজরা এ জেলা খুব পছন্দ করেন। গণ্ডক এবং সিকরহনার তীরবর্ত্তী গ্রামগুলির জলবায়ু এরূপ খারাপ যে লোকে প্রায়ই বিকলাঙ্গ হয়। এ অঞ্চলের লোকগুলির বুদ্ধিও খুব তীক্ষ্ণ হয় না। খোঁড়া, গলগণ্ডদুষ্ট লোক অনেকই দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাদের মধ্যে অনেকেরই বুদ্ধি খুব কম। তাহারা শুনিতে পারে না, ঠিক করিয়া কথা বলিতে পারে না, অপরের কথাও বুঝিতে পারে না, অকারণে হাসে। আশপাশের লোকেরা তাহাদের 'বাগড়' বলে এবং বিহার প্রদেশের অন্য জেলাতেও 'মঁঝৌয়ার বাগড়' কথা প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। শোনা যায় নাকি কোথাও কোথাও পশুদেরও গলগণ্ড হয়।

এই জেলায় মাত্র দুইটী নগর আছে, মোতিহারী, জেলার প্রধান নগর ও বেতিয়া; বেতিয়া পূর্ব্বে ব্যবসায়ের খুব বড় কেন্দ্র ছিল; বর্ত্তমানে ইহা রাজার রাজধানী ও সবডিভিজনের প্রধান নগর। এই জেলার আয়তন ৩৫৩১ বর্গমাইল। গ্রামের সংখ্যা ২৮৪১ এবং জন সংখ্যা (১৯১১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী) ১৯০৮৩৮৫। জেলার শতকরা দুইজন লোক নগর বাসী, বাকি সকলেই গ্রামবাসী। জেলার প্রতিবর্গমাইলের লোকসংখ্যা প্রায় ৫৪০। চম্পারণের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভাগের যে অংশ মজঃফরপুর ও সারণ জেলার সহিত সংলগ্ন, তাহাতেই চাষ বেশী হয় এবং পশ্চিমোত্তর অংশে যেখানে জল বায়ু খুব খারাপ সেখানে খুব অল্পই হয়। এই স্থলে এটী উল্লেখযোগ্য যে সারণ ও মজঃফরপুর জেলা হইতে বহু লোক এখানে আসিয়া বাস করিতেছে

এবং এই প্রকারের লোকের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহারা চাষের লোভে এখানে আসে।

বিহারের অন্যান্য জেলার ন্যায় এখানেও হিন্দুর সংখ্যা বেশী। তাহাদের সংখ্যা ১৬,১৭,৪৫৬, মুসলমানের সংখ্যা ২,৮৬,০৬৭, বেতিয়া সহরে ও তাহার আশপাশে বহু খৃষ্টান বাস করে। কথিত আছে বেতিয়ার রাজা ধ্রুবসিংহের পত্নীর একবার অত্যন্ত অসুখ হয়, তিনি এক খৃষ্টান পাদরীর চিকিৎসায় সুস্থ হন। এই জন্য রাজা প্রসন্ন হইয়া অনুমান ১৭৪৫ খৃঃঅব্দে খৃষ্টান পাদরীদের ডাকিয়া বেতিয়ায় স্থান দেন। তখন হইতেই চম্পারণ নগরে খৃষ্টানদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে; বর্ত্তমানে তাঁহাদের সংখ্যা ২৭৭৫। এখানকার খৃষ্টানদের মধ্যে এই বিশেষত্বটী দেখা যায় যে তাঁহাদের পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য জাতীর রীতিনীতিতে কিছুই প্রভেদ দেখা যায় না। শুধু তাহাদের স্ত্রীলোকেরা একপ্রকার ঘাঘরা পরিধান করেন যাহা হিন্দু রমণীরা ব্যবহার করেন না। এখানকার হিন্দুমুসলমান বিহারের অন্যান্য জেলার হিন্দুমুসলমানদের মতই থাকে। এখানে হিন্দুদের মধ্যে আরু নামে একটি বিশেষ জাতি আছে তাহা অন্য কোন জেলায় দেখিতে পাওয়া যায় না; তাহাদের সংখ্যা ৩৪৬০২। তাহারা প্রায় তরাই অঞ্চলেই থাকে। আরুরা সে অঞ্চলের আবহাওয়া বিশেষ করিয়া সহ্য করিতে পারে। তাহারা অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ ও সরল এবং মোকদ্দমাকে খুব ভয় করে। চাষের কাজেও তাহারা খুব দক্ষ হয়। কোন কিছু গোলমাল বা কষ্ট হইলে গ্রামশুদ্ধ সকলেই গ্রাম ছাড়িয়া অনাত্র চলিয়া গিয়া বাসস্থাপন করে। এ অঞ্চলে ধান ভাল হওয়ায় তাহাদের জীবন সুখেই কাটে।

চম্পারণের হিন্দুমুসলমানের ভাষা হিন্দীরই এক রূপান্তর। ইহাকে ভোজপুরী বলে; সারণের প্রচলিত ভাষার সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশের ভাষায় মজঃফরপুরের মৈথিলী ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। আরুদের ভাষাও ভোজপুরী, কিন্তু শুধু এই পার্থক্য আছে যে তাহাদের ভোজপুরীতে তাহাদের আদিম ভাষার কোন কোন শব্দ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাস

চম্পারণ চম্পারণ্যের অপভ্রংশ। পুরাণে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। চম্পারণের বন-গুলিতে ঋষিদের তপোবন ছিল। কথিত আছে যে দুহো ও সুহো তপ্পার (পরগণার) নাম উত্তানপাদ রাজার দুইরাণী দুয়ো ও সুয়ো হইতে হইয়াছে। ধ্রুব এই উত্তানপাদের পুত্র ছিলেন, তাঁহার জন্ম এই তপোবনেই হইয়াছিল এবং তাঁহার আশ্চর্য্য তপশ্চর্য্যা এখানকার বনেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বাল্মীকি মুনির আশ্রম এই জেলারই কোথাও ছিল। জানকী বনবাসের পর এই আশ্রমেই আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন, আর এই খানেই লব কুশের জন্ম হয়। রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার পুত্রদ্বয়ের যুদ্ধ এই জেলারই কোন স্থানে হইয়াছিল। কথিত আছে যে বিরাট রাজার রাজধানী যেখানে পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসে ছিলেন তাহাও এই জেলার কোথাও ছিল। রাম

নগরের কিছু দূরের আর একটী স্থানের বর্ত্তমান নাম বিরাহী। শোনা যায় বিরাটরাজের রাজধানী এইখানেই ছিল বিদেহরাজ্যও এইখানেই ছিল এবং রাজা জনক জানকীগড়ে (ইহার বর্ত্তমান নাম চানকীগড়) বাস করিতেন।

খৃষ্টজন্মের প্রায় ছয় শত বর্ষ পূর্ব্বে লিচ্ছবি বংশের রাজ্য চম্পারণে অবস্থিত ছিল। মগধের রাজা অজাতশত্রুর সহিত তাহাদের যুদ্ধ হয়। তাহাতে লিচ্ছবি পরাজিত হইয়া মগধকে কর দিতে বাধ্য হয়। আজও নন্দনগড় প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন গড়ের চিহ্ন পাওয়া যায়; ইতিহাস-বেত্তাদের অভিমত এগুলি লিচ্ছবিদের সময়ের। এখানে খৃঃ পূঃ ১০০০ বৎসরের প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগের বহু নিদর্শন চম্পারণে পাওয়া যায়। কথিত আছে বুদ্ধদেব পলাসী হইতে কুশীনগর যাওয়ার পথে চম্পারণ হইয়া গিয়াছিলেন। লৌরিয়া নন্দনগড়ে বা পার্শ্ববর্ত্তী কোন স্থানে তাঁহার দেহভস্ম কোন স্তূপে রক্ষিত আছে। এই জেলায় সম্রাট অশোক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি স্তম্ভ পাওয়া যায়। যেখানে যেখানে এরূপ স্তম্ভ আছে তাহার অধিকাংশেরই নাম লৌরিয়া বা স্তম্ভ-স্থান বলিয়া পরিচিত। ইহাতে বোঝা যায় কোন সময়ে এখানে বৌদ্ধদের খুব প্রভাব ছিল। সম্রাট অশোক তীর্থযাত্রা কালীন পাটলীপুত্র হইতে কেসরিয়া, লৌরিয়া, অরেবাজ, লৌরিয়া নন্দনগড় হইয়া রামপুরবা গিয়াছিলেন এবং এই সকল স্থানে স্তম্ভ বা লৌর প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছিলেন। সে সময়ে নেপাল ও মগধ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং প্রায় সকল রাজকর্ম্মচারীকেই এই পথে ভিখ্‌নাথোরী (এই জেলার উত্তরাংশে স্থিত একটী স্থান) হইয়া নেপাল যাইত হইত। চীনপর্য্যাটকগণও এই পথে আসিয়াছিলেন। ফাহিয়ান্ ও হিউয়েনসাং দুইজনেই এই সকল স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। বৌদ্ধযুগের পর গুপ্তরাজগণ চম্পারণ অধিকার করেন এবং কথিত আছে সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনও এখানে আপনার বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া যান। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বের ইতিহাস পাওয়া যায় না কিন্তু অনুমিত হয় ছেদীবংশীর রাজগণও একসময়ে চম্পারণে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

ইহার পরে প্রমাণ পাওয়া যায় যে চম্পারণ ত্রিহুতের রাজাদের অধীনে আসে। তাহাদের মধ্যে সিমরা ও সুগাঁও রাজ্যের নাম উল্লেখযোগ্য। ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মুসলমানগণ চম্পারণ আক্রমণ করেন কিন্তু তাঁহাদের রাজ্য স্থায়ী হয় নাই। ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সিকন্দর লোদী ত্রিহুত আপনার অধিকারভুক্ত করিয়া লন এবং সেই সময় হইতেই ত্রিহুত (চম্পারণ ও তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল) স্থায়ীভাবে মুসলমান অধিকারে আসে। ইহার পরের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। কারণ চম্পারণের ইতিহাস তখন হইতে অন্যান্য জেলার ইতিহাসের সহিত যুক্ত হইয়া গিয়াছিল। ১৮শ শতাব্দীতে যখন আলীবর্দ্দী খাঁ বিহার ও বাংলার নাজিম নিযুক্ত হইলেন তখন তিনি চম্পারণ আক্রমণ করেন। মজঃফরপুরের আফগানগণ তাঁহার সাহায্য করিয়াছিল। আলীবর্দ্দী খাঁ বিজয়লাভ করিয়া বহু ধন লুণ্ঠন করেন। কিছুদিন পরে যে আফগানগণ তাঁহার সহায় ছিল তাহারা তাঁহার সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। আলীবর্দ্দী তাহাদের আক্রমণ করিয়া পরাজিত করেন। তাহাদের মধ্যে আফগান শমসের খাঁ ও সরদার খাঁ বেতিয়ারাজের শরণ গ্রহণ করেন। এই কারণে আলীবর্দ্দী খাঁ

বেতিয়া রাজ্য আক্রমণ করেন। তাহার ফলে বেতিয়ারাজ এই দুইজনকে সপরিবারে আলীবর্দ্দীর হস্তে সমর্পণ করেন।

অনুমান ১৭৬০ খ্রীঃ অব্দে আবার চম্পারণে যুদ্ধ বাধে। এবার যুদ্ধ শাহ আলম ও ইংরেজগণের মধ্যে হয়, তাহাতে শাহ আলম পরাস্ত হয়েন।

শাহআলমের সহায়তাকারিগণের মধ্যে পূর্ণিয়ার সুবেদার খাদিম হুসেন ছিলেন। তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বেতিয়াভিমুখে পলায়ন করেন। তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মীরণ ও জেনারল ক্লাউড সেখানে উপস্থিত হন। কিন্তু বজ্রাঘাতে মীরণের অকাল মৃত্যু হওয়ায় জেনারল ক্লাউডকে ফিরিয়া আসিতে হয়। ফিরিবার সময় জেনারল ক্লাউড বেতিয়ারাজের নিকট হইতে কবগ্রহণ করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বেতিয়ারাজ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তখন মীরকাসিম বেতিয়া আক্রমণ করিয়া রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে শাহআলম বাঙ্গলা ও বিহারের সহিত চম্পারণকেও ইংরাজদের হস্তে অর্পণ করেন। কিন্তু তাহার পর হইতেই চম্পারণে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল, এটা মনে করিলে ভুল হইবে। অল্পদিনের মধ্যেই রাজা যুগলকিশোর ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন, কিন্তু শীঘ্রই পরাজিত হইয়া আপনার রাজ্য ত্যাগ করিয়া বুন্দেলখণ্ডে পলায়ন করেন। এই সময়ে দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল। ইংরেজগণ যে রাজস্ব পাইতেন তাহা উত্তরোত্তর কমিয়া যাইতে লাগিল। তখন ইংরেজগণ মনে করিলেন যে যুগলকিশোর ছাড়া বেতিয়া রাজ্যে সুব্যবস্থা আর কিছুতেই হইবে না ও রাজস্ব দিন দিন কমিতেই থাকিবে। এই স্থির করিয়া তাঁহারা যুগলকিশোরকে বুন্দেলখণ্ড হইতে ডাকাইয়া ১৭৭১ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে মঝৌয়া ও সিমরৌণ এই দুইটী পরগণা অর্পণ করিলেন। এই সময়েই তাঁহার আত্মীয় শ্রীকৃষ্ণসিংহ ও অবধূতসিংহকে মেহসী ও ববরা পরগণা প্রদান করা হয়। ১৭৯১ খৃঃ অব্দে যখন দশশালা বন্দোবস্ত হইল, তখন মঝৌয়া ও সিমরৌণ পরগণা দুইটীর বন্দোবস্ত যুগলকিশোর সিংহের পুত্র বীরকিশোর সিংহের সহিত করা হইল এবং অবধূতসিংহ ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহকে যে মেহসি ও ববরা পরগণা দেওয়া হইয়াছিল, এই দুইটী মিশাইয়া শিবহর রাজ্য সৃষ্ট হইল। সেই সময়েই রামনগর ও মধুবন এই দুইটী জমিদারি সৃষ্ট হইল। এইরূপে চম্পারণ সেই সময়ে চারিটী জমিদারের হাতে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল; বেতিয়া, রামনগর, শিবহর ও মধুবন। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এই বন্দোবস্তই ধার্য্য রহিল। কিছুদিন পরে ববরা পরগণাকে মজঃফরপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হইল এবং শিবহরের ছোট ছোট অংশ চম্পারণে থাকিল। আজকাল অনেকগুলি ছোট ছোট জমিদারীর সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু মস্ত জমিদারী তিনটীই আছে, বেতিয়া, রামনগর ও মধুবন। কিন্তু এটা বুঝিলে ভুল হইবে যে এই সকল জমিদারীর উৎপত্তিও এই সময়েই হইয়াছিল। বেতিয়া রাজ্য বহু প্রাচীন। সম্রাট শাহজহাঁ প্রথমে উজ্জৈন সিংহকে ইহা দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বংশধরগণই এখানে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছিলেন। এইরূপে রামনগর রাজ্যও বহু পুরাতন। কথিত আছে রামনগরের রাজাদের পূর্ব্বপুরুষগণ চিতোর হইতে আসিয়া

নেপাল অধিকার করেন এবং তাঁহাদেরই এক বংশধর রামনগর প্রতিষ্ঠা করেন। আওরংজেব ১৬৭৬ খৃঃ অব্দে রামনগরের জমিদারকে রাজা উপাধি দান করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

নীল

(১) কুঠি

বেতিয়া রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল প্রায় ২০০০ বর্গ মাইল। প্রথমে সেখানে, আজকাল রাস্তাঘাট প্রভৃতির যে সুবিধা আছে, তাহা ছিল না। সুতরাং রাজ্য শাসনের সুবিধার জন্য ছোট ছোট ভাগ করিয়া ঠিকাদারের হাতে ভার দেওয়া হইয়াছিল; তাহাদের কাজ ছিল নিজের নিজের অংশের দেখাশুনা করা ও যথাসময়ে প্রজাদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া রাজার নিকট জমা দেওয়া। প্রথম প্রথম সকল ঠিকাদারই হিন্দুস্থানী ছিলেন এবং প্রত্যেকেই ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের আগে হইতে ঠিকাদারীর কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। পরে ইংরাজ ব্যবসায়ীরা, যাহারা বিশেষ করিয়া ইক্ষু ও নীলের ব্যবসা করিত, এই কাজে ঢুকে এবং যোগ দেয়। প্রথম কুঠি কর্ণেল হিকী বারায় স্থাপন করেন। সময়ে এই প্রকার আরও বহু কুঠি স্থাপিত হয় এবং ঠিকাদারীর কাজ হিন্দুস্থানীদের হস্ত হইতে ইংরেজদের হস্তে চলিয়া যায়। প্রথম আমলে যেখানে ইক্ষু ও নীলের চাষ হইত, সেই সব জায়গায়ই কুঠি স্থাপন করা হইত। কিন্তু কিছুদিন পরে যখন তাহাদের (ইংরেজ ঠিকাদারদের) অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইল ১৮৭৫ খৃঃ অব্দের পরে কয়েকজন কুঠিদার জেলার উত্তর পশ্চিমাংশে বিশেষ করিয়া জমা হইল। এখানে নীলের চাষের সুবিধা না থাকায় তাহারা লাভের অন্য পন্থা বাহির করিল; এই প্রকারে সমগ্র জেলা কুঠিতে ছাইয়া গেল; বর্ত্তমানে চম্পারণে প্রায় ৭০টী কুঠি আছে; তাহাদের ইতিহাস এইখানে বলা হইবে। কুঠি প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিবার জন্য ইংরেজ ঠিকাদারগণ বেতিয়া রাজার নিকট কিছু জমি সামান্য খাজনায় স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল। ১৮৮৮ অব্দে বেতিয়া রাজ্য ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ায় রাজ্যের ম্যানেজার মিঃ গিব্বন বিলাতে ৮৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করেন; ব্যবস্থা হইল ইংরেজ ঠিকাদারগণের সহিত রাজ্য স্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে এবং ইহারা ঋণের মুক্তির জন্য কিছু টাকা দিবে। এই ভাবে ১৪ জন কুঠিয়ালের সহিত ৮॥০ লক্ষ টাকার স্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইল; এই স্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তাহাদের অধিকার আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা ছাড়া কয়েকটী ঠিকাদারও তাহারা পাইল! রামনগর রাজাও ইংরেজদের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া কয়েকটী গ্রাম দিল। কিন্তু এটা যে কেমন করিয়া ও কোন অবস্থায় পড়িয়া যে হইল তাহা বলা কঠিন। কিছু দিন হইল কয়েকজন কুঠিদার জমিদারীও কিনিয়াছে; কিন্তু সেটা খুবই কম। ইহাদের মধ্যে ২৩ জন নীলের ব্যবসা করে; রাজ্যের প্রায় অর্দ্ধেক অংশ ইংরেজ ঠিকাদারদের হাতে আছে

(২) নীলের চাষ

প্রথমে কুঠিদারগণ নীলের সহিত ইক্ষুর চাষও করিত কিন্তু, অনুমান ১৮৫০ অব্দ হইতে নীলের চাষে বেশী লাভ হওয়াতে ইক্ষুর চাষ কমাইয়া দেওয়া হইল। তখন হইতে কুঠিয়ালরা দুই প্রকারে নীলের চাষ করিয়া আসিতেছে। (১ম) জীরাত (২য়) অসামীবার।

১ম জীরাত—কুঠিয়ালদের দখলে যে সকল জমি ছিল সে গুলি তাহারা নিজেদের লাঙ্গল দিয়ে চাষ করাইত। এ সকল জমি হয়ত তাহাদের নিজস্ব হইত বা তাহাতে তাহাদের খাস থাকিত। এগুলি চাষের সম্পূর্ণভার কুঠিয়ালদের উপরেই ছিল। প্রজাদের সহিত এই জমিগুলির এই সম্বন্ধটুকু ছিল যে কুঠির দরকার হইলে তাহাদিগকে মজুর খাটাইয়া লইতে পারিবে বা প্রয়োজন মত তাহাদের লাঙ্গল লইতে পারিবে। অবশ্য ইহার পরিবর্ত্তে কুঠিয়ালদের কিছু দিতে হইত; কিন্তু পরে দেখান হইবে যে এই মজুরী এত কম হইত যে প্রজাগণ ইহাতে যথেষ্ট দুঃখ পাইত, অসন্তুষ্ট হইত। তাহার উপরে আবার কুঠির আমলাগণ এই সামান্য হইতে নিজেদের দস্তরী কাটিয়া লইত। চম্পারণ অনুসন্ধান কমিটীর সম্মুখে সাক্ষ্য দিতে গিয়া সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার মিঃ জে, এ, স্বীনী এই প্রকার জীরাত আবাদের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে কোন কুঠীর পক্ষেই তাহার খাস জমির সবটুকু নিজে চাষ সম্ভবপর হয় না।

২য় অসামীবার—এই প্রথায় কুঠিয়ালরা সাধারণ প্রজাদের দ্বারা নীল উৎপাদন করাইত। ইহার আবার কয়েক প্রকার আছে, ইহার মধ্যে আবার তিন কাঠিয়া প্রথাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রচলিত; অন্য দুইটী উল্লেখযোগ্য প্রথা খুশ্‌কী ও কুর্ত্তাবেনী।

কুর্ত্তাবেনী প্রথায় কুঠিয়াল প্রজার জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া নিজে তাহা চাষ করায়। এ প্রথা চম্পারণে বিশেষ প্রচলিত নহে, কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে এ প্রথা প্রজার পক্ষে ক্ষতিকারী নয়। *

তিন কাঠিয়া এই প্রথাই চম্পারণে বিশেষভাবে প্রচলিত। ইহাতে কুঠিয়ালরা প্রজাদের জমির একটা অংশে নীলের চাষ করাইতেন; এই নীল নির্দ্দিষ্ট মূল্যে কিনিবার সর্ত্তও থাকিত।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি বিঘাপ্রতি ৫কাঠায় নীল চাষ করিবার ব্যবস্থা ছিল, কিছুদিন পরে ১৮৬৭ সালের কাছাকাছি এই পরিমাণ কমাইয়া বিঘায় তিনকাঠার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; তখন হইতে ইহার নাম তিন কাঠিয়া প্রথা হইয়াছে। প্রথম যখন চম্পারণে নীল করেরা অধিকার বিস্তার করিতেছিল তখন তাহাদের একটুকুও জমি ছিল না; বেতিয়া রাজ্য হইতে কয়েকটী গ্রাম বন্দোবস্ত করিয়া লইবার পর তাহারা জীরাতী প্রথায় কিছু নীলের চাষ করে।

* পাটনার কমিশনার ১৮৭৩-৭৫ সালের রিপোর্টে কুর্ত্তাবেনী প্রথার বিষয়ে লিখিয়াছেন—

The Kurtanli lease is a new institu ion dating from a few years back. There is growing up in our midst and inspite of our efforts at beneficient legislation a system under which the ryot mortgages his entire holding and the very site of his house for a period probably extending beyond his own lifetime, redemption being contingent on the repayment of loan, the ryot, to use the common expression, is selling himself body and soul into hopeless servitude.

কিন্তু তাহার পরিমাণ খুবই অল্প ছিল। তাহারা বেতিয়া রাজকে লোভ দেখাইয়া যত বেশী সম্ভব কর দিবার সর্ত্তে গ্রাম ইজারা করিয়া লইয়া প্রজাদের দ্বারা নীলের চাষ করাইত। বেতিয়ারাজ বসিয়া বসিয়া খাজনা পাইত; নীলকররাও নীলে যথেষ্ট লাভ করিত। মধ্যে পড়িয়া মারা যাইত গরীব প্রজা; ইহাতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে যখনই কোন গ্রাম নীলকরদের হাতে আসিত তাহারা চেষ্টা করিত কেমন করিয়া যত বেশী সম্ভব নীল উৎপাদন করা যায়। এই জন্য তাহারা সরল কৃষকদিগকে ভুলাইয়া, বুঝাইয়া, ফুসলাইয়া, জোর করিয়া বাধ্য করিয়া তাহাদের জমিতে নীল উৎপাদন করাইত। কিছুদিন পরে যে সকল সর্ত্তে প্রজারা নীল চাষ করিত তাহা এই দলিলরূপে লেখা হইত; তাহাতে লেখা থাকিত প্রজা আপনার জমির বিঘা প্রতি তিনকাঠায়— বর্ষ পর্য্যন্ত (কখনও কখনও তাহার পরিমান ২৫।৩০ বৎসর পর্য্যন্তও হইত) নীল বুনিবে। জমির কোন্‌টুকুতে নীল বোনা হইবে তাহাও ঠিক করিয়া দিত কুঠির কর্ম্মচারীরা। জমি প্রস্তুত করিবার কাজ থাকিত চাষীর উপর, কিন্তু তাহার দেখাশুনা করিবে কুঠির কর্ম্মচারী। নীলের ফসল ভাল হইলে তাহা বিঘা প্রতি এক নির্দ্দিষ্ট মূল্যে কিনিয়া লওয়া হইবে। যদি ফসল ভাল না হইল—তাহা যে কোন কারণেই হউক না কেন প্রজা কম দাম পাইবে। যদি প্রজা নীল চাস না করিয়া সর্ত্তের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহা হইলে তাহাকে অসম্ভব রকম একটা কিছু জরিমানা দিতে হইবে।

প্রমাণ পাওয়া যায় যে চম্পারণে যে সময়ে নীলের চাষ আরম্ভ হয় প্রায় সেই সময় হইতেই জিরাতি ও অসামীবার প্রথারও প্রবর্ত্তন হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রথম প্রথম বিঘাপ্রতি ৫ কাঠায় নীল চাষ করিতে হইত এবং ১৮৯৭ সালের পর হইতে তাহা তিনকাঠায় ঠিক করা হইয়াছিল। ১৯০৯ সালে নীলকরদের এক সভায় স্থির হয় বিঘা প্রতি দুই কাঠায় নীলের চাষ করা হইবে; জানা যায় না কতগুলি নীলকর এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; এটা ঠিক যে অনেক নীলকরই ইহা স্বীকার করিয়া লয় নাই এবং অনেকের পক্ষেই তাহার প্রয়োজনও হয় নাই; ইহার কারণ পরে লিখিত হইবে। নীলের দামও নীলকরগণ গবর্ণমেণ্টের ও প্রজার চেষ্টায় বাড়াইতে বাধ্য হইয়াছিল। ১৮৬৭ সালের পূর্ব্বে প্রতি একর নীলের জন্য প্রজা ৬॥০ পাইত। সে বৎসরের গোলমালের পরে গবর্ণমেণ্টের দাবীতে নীলকরেরা তাহা বাড়াইয়া ৯৲ করিতে বাধ্য হয়। তাহা ১৮৬৭ অব্দে ১০।৵০, ১৮৯৭ অব্দে ১২৲ এবং ১৯০৯ অব্দে মিঃ গুর্লের রিপোর্টের ফলে ১২॥০–১৩॥০ হয়। ইহা ছাড়া ১৮৭৮ সাল হইতে যে জমিতে নীল বোনা হইত তাহার খাজনা মাপ করার প্রথাও চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু সকল কুঠিই এই নিয়ম কার্য্যে পরিণত করে নাই।

এই প্রকারে যে পরিমাণ নীলের চাষ চম্পারণে হইতে তাহা বিহারের অন্য কোন জেলায় হইত না। ১৮৯২-৯৩ সালে ৯৫৯৭০ একর জমিতে নীলের চাষ হইয়াছিল অর্থাৎ যত আবাদী জমি ছিল তাহার শতকরা ৬·৬৩ অংশে নীলের চাষ হইয়াছিল। ইহার এক চতুর্থাংশ জীরাত প্রথায় ও বাকিটুকু অসামীবার অর্থাৎ তিন কাঠিয়া প্রথায় আবাদ করা হইয়াছিল। তখন নীলের কারখানায় ৩৩০০০ মজুর কাজ করিত। কিন্তু পরে জার্ম্মাণীর কৃত্রিম রংএর প্রবর্ত্তন হওয়ায় নীল চাষের লাভ কমিয়া যাওয়ায় নীলকরগণ নীলের চাষ কম করিয়া দেয়। ১৯০৫ সালে

নীলের জমির পরিমাণ ৪৭৮০০ একর ও ১৯১৪ সালে মাত্র ১০০ একর হইয়া যায়। ১৯১৪ সালে জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধ বাধিলে সেখান হইতে কৃত্রিম নীল আসা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় নীলের চাষের পূর্ব্বগৌরব ফিরিয়া আসিল। নীলকরগণ এই অবস্থার সুযোগ লইয়া নীলের চাষ বাড়াইয়া দিল। ১৯১৬ সালে ২১৯০০ একর ১৯১৭ সালে ২৬৪৮০ একর জমীতে নীলের আবাদ করা হইল, ইহার প্রতি ভাগ তিন কাঠিয়া প্রথায় ও বাকী জীরাতি প্রথায় চাষ করান হইল।

নীলের চাষ কম হইয়া যাওয়ায় কিন্তু নীলকরদের লোকসান হয় না কারণ তাহারা অন্যান্য উপায়ে গরীব চাষীদের রক্ত শোষণ করিতে লাগিল; তাহার বিবরণ পরে লিখিত হইবে।

নীল দুই প্রকারের—সুমাত্রা ও জাভানেটাল। ১৯০৬ সালের পূর্ব্বে কেবল সুমাত্রা চাষ হইল। ইহার জন্য আশ্বিন হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত জমীর পাট করিতে হয়; ফাল্গুন মাসে নীল বোনা হইত এবং আষাঢ় মাসে কাটা হয়। আষাঢ় মাসে কাটিবার সময় গাছের যেটুকু জমীতে থাকিয়া যায় তাহা আবার ভাদ্রমাসে কাটা হয়। জাভা-নেটাল নীল নীল কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে বোর হইত এবং সুমাত্রার সঙ্গে কাটা হয়। ১০০ মণ নীলের চারা হইতে প্রায় ১০ সের নীল পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ)

সেবক

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদের গ্রন্থ হইতে

সিরাজউদ্দৌল্লা

(১)

মাতামহ পার্শ্বে প্রিয় দৌহিত্র শয়ান
দুর্ল্ললিত, দুর্দ্দান্ত যে নানা অত্যাচারে
করেছিল জর্জ্জরিত ভীত বাঙ্গালারে;
হৃতরাজ্য না পাইয়া দাঁড়াবার স্থান
কৃতঘ্ন ঘাতক হস্তে যার অবসান
অগৌরবে; সত্যমিথ্যা নানা কথা যারে
করিয়াছে ভয়ঙ্কর। কে বলিতে পারে
কি ছিল সে—সর্ব্বদর্শী বিনা ভগবান?

সিরাজউদ্দৌলার সমাধি দেখিয়া লিখিত।

সুন্দর সে কিশোরের নিভৃত হৃদয়ে
কি ছিল পৈশাচ ক্রুর, পাপের আবহ,
কি বা ছিল বালকের দীপ্ত কৌতূহল,
কি ছিল সংকল্প সাধু—গেল ব্যর্থ হয়ে—
যার পরিচয় লভি বৃদ্ধ মাতামহ
অতিশয় স্নেহে তারে করিল দুর্ব্বল ?

(২)

চিত্রপটে মূর্ত্তি তার নহে মনোহর,
ইতিহাসে সে চরিত্র কলঙ্কমণ্ডিত ;
তার ক্রূরতার কথা শুনি শিহরিত
এ দেশের বালবৃদ্ধ যত নারীনর
সার্দ্ধেক শতাব্দী ধরি। এতকালপর
কালচক্রআবর্ত্তনে হইছে খণ্ডিত
বহু অপবাদ তার। ধিক্‌ত দণ্ডিত
তার তরে করুণায় ভরিছে অন্তর।

তাহার সৌন্দর্য্য যাহে মাতামহচিত
ছিল মুগ্ধ, তুষিত কি নরের নয়ন
কে জানে না ? বৃদ্ধ যুবা উভয়ে সমান
গতরূপ, বীততৃষা, ব্যথাবিরহিত।
তবু হেরি কাছাকাছি দোঁহার শয়ন
দর্শকের দৃষ্টি করে অশ্রুজলে ম্লান।

(৩)

রুষ্ট ভাগ্যলক্ষ্মী মুখ ফিরাইলা যবে,
বিশ্বাসঘাতকদল যবে চুপে চুপে
পাতিছে বিষম ফাঁদ, সর্ব্বনাশকূপে
ফেলিতে তোমারে, ঘোর দুর্গতিঅর্ণবে
ভাসাইতে নিজেদের—হে সিরাজ, তবে
বলেছিলে, এ যাত্রায় বাঁচিলে, এরূপে
পালিব রাজার ধর্ম্ম, সকলে এ ভূপে
স্মরিবে আনন্দে, নাম ভক্তিভরে লবে।

অশ্রুস্নাত চক্ষে, হায়, মুহূর্ত্তের তরে
নির্দ্দয় নিয়তিরূপে গেল দেখা দিয়া
অতীতের কর্ম্মফল। পেলেনা সুযোগ
করিবারে প্রায়শ্চিত্ত অনুতাপভরে
করিবারে প্রতীকার সুকৃতি সঞ্চিয়া,
চলে গেলে দুষ্কৃতির করি দণ্ড ভোগ।

শ্রীকামিনী রায়।

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

পঞ্চম অধ্যায়

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

এইরূপে চর্চ যখন দেখিল যে সে মানবচিন্তার সমস্ত বিচিত্রবিকাশের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে, তখন স্বভাবতঃই সে জগতের সমগ্র শাসনাধিকার দাবী করিয়া বসিল। আর একটি কারণেও এই পরিণতির সহায়তা করিল। ঐহিক শাসন ব্যাপারে তখন ভয়ানক বিশৃঙ্খলা; শাসকবৃন্দের উপদ্রব ও অন্যায়াচরণে লোকসমাজ তখন বিধ্বস্ত।

আমরা বহুশতাব্দী ধরিয়া ঐহিকশাসনতন্ত্রের ন্যায্য অধিকারের পক্ষে অনেক কথা বলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আমাদের আলোচ্য যুগে, ঐহিকশাসন কেবল বাহুবলের উপদ্রবমাত্র, অদম্য দস্যুবৃত্তিমাত্র। চরিত্রনীতি ও ন্যায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে চর্চের ধারণা যতই অসম্পূর্ণ হউক না কেন, এরূপ ঐহিকশাসনতন্ত্র অপেক্ষা চর্চের শাসনতন্ত্র শতসহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ ছিল; প্রজাবৃন্দের আর্ত্তনাদে অনবরতই তাহাকে ঐ শাসনতন্ত্রের স্থান অধিকার করিতে হইয়াছিল। যখন পোপ কিম্বা বিশপগণ ঘোষণা করিতেন যে অমুক রাজা অন্যায়াচরণের দরুণ স্বাধিকারভ্রষ্ট হইলেন এবং তাঁহার প্রজাবৃন্দ তাঁহার শাসনপাশ হইতে মুক্ত হইল, তখন অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদের এই মধ্যবর্ত্তিতা ন্যায়সঙ্গত ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইত। সাধারণতঃ, মানবজাতি যখনই স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তখন ধর্ম্ম আসিয়া তাহার স্থান পূরণ করিবার ভার লইয়াছে। দশমশতাব্দীতে প্রজাবৃন্দের এমন অবস্থা ছিল না যে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে; রাজশক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজেদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে; ভগবানের নাম লইয়া ধর্ম্ম আসিয়া তখন প্রজারক্ষা করিত। ধর্ম্মশাসনতন্ত্রের ক্ষমতাবৃদ্ধির এটি একটি প্রবল কারণ।

আর একটী তৃতীয় কারণ আছে, সেটি প্রায়ই লক্ষ্য করা হয় না। চর্চের নেতৃবৃন্দের

সামাজিক পদবী ও অবস্থান অত্যন্ত জটিল; তাঁহারা সমাজে নানা বিচিত্ররূপে নানা বিচিত্র সম্বন্ধে দেখা দিতেন। একদিকে তাঁহারা ধর্ম্মনেতৃ যাজকপ্রধান, ধর্ম্মসমাজের অঙ্গ, ধর্ম্মশাসন তন্ত্রের পরিচালক,—এহিসাবে তাঁহারা স্বাধীন। অপরদিকে তাঁহারা ভূম্যধিকারী, সুতরাং সে হিসাবে ফিউড্যাল্‌তন্ত্রের বিধিবিধানের অধীন, উর্দ্ধতন ও নিম্নতন ভূম্যধিকারীর সহিত ফিউড্যাল্‌ দায়বন্ধনে আবদ্ধ। শুধু ইহাই নহে, তাঁহারা আবার রাষ্ট্রপতির প্রজা। প্রাচীন রোমীয় সম্রাট্‌দিগের সহিত সে কালের বিশপ্‌ ও যাজকবর্গের যে সম্বন্ধ ছিল, অভিনব বর্ব্বর নৃপতিগণের সহিত ও যাজকদিগের কতকটা সেইরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। নানা কারণে বিশপগণ বর্ব্বরনৃপতিগণকে প্রাচীন রোমীয় সম্রাট্‌দিগের উত্তরাধিকারীস্বরূপ গণ্য করিতে থাকেন। যাজকনেতৃবর্গের তাহা হইলে এই ত্রিবিধ প্রকৃতি, প্রথমতঃ তিনি যাজক, সুতরাং স্বক্ষেত্রে স্বাধীন; দ্বিতীয়তঃ তিনি ফিউড্যাল্‌ ভূম্যধিকারী, সুতরাং কতকগুলি কর্ত্তব্যের দায়ে আবদ্ধ; এবং সর্ব্বশেষে তিনি রাজার প্রজা, সুতরাং একেশ্বর রাজার আদেশ পালন করিতে বাধ্য। এখন ইহার পরিণাম কি দেখুন। ঐহিক রাজবৃন্দের অর্থলিপ্সা বা প্রাধান্য-লিপ্সা বিশপ্‌দিগের অপেক্ষা কম ছিল না। তাঁহারা ফিউড্যাল ভূস্বামী বা রাষ্ট্রপতি ছিলেন। স্ব স্ব ক্ষমতা পরিচালন করিয়া অনেক সময় বিশপ্‌দিগের ধর্ম্মতন্ত্রঘটিত অধিকারেও হস্তক্ষেপ করিতেন; অনেক সময় তাঁহারা নিজেরাই যাজকনিয়োগ বা বিশপ্‌নিয়োগ বা চর্চের বৃত্তি-বণ্টন করিতে চাহিতেন। এদিকে আবার বিশপ্‌গণও চর্চ-শাসনের অলঙ্ঘ্য গণ্ডীর মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া ভূম্যধিকারীর দায় ও প্রজার কর্ত্তব্য হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেন। সুতরাং উভয় পক্ষ হইতেই স্বভাবতঃ চেষ্টা হইতে লাগিল যে একে অন্যের উচ্ছেদসাধন করিবে। রাষ্ট্রপতি চর্চের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিতে চাহিলেন, যাজকপ্রধানগণ তেমনি চর্চের স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া সমাজের সমগ্র শাসন ক্ষমতা অধিকার করিতে চাহিলেন।

ইহার পরিণাম যে কি ঘটিয়াছিল তাহা সর্ব্বজনবিদিত, একদিকে যাজকবরণ লইয়া কলহ, অপর দিকে সম্রাটের সহিত পোপের কলহ। এ কলহে কাহার ন্যায্য অধিকারের সীমা কতটুকু তাহা নির্দ্দেশ করা এবং এই সকল বিরুদ্ধ দাবীর মীমাংসা করা যে এত কঠিন ছিল, তাহার যথার্থ কারণ চর্চের নেতৃবৃন্দের অবস্থানবৈচিত্র্য ও সম্বন্ধবৈচিত্র্য।

চর্চের সহিত রাষ্ট্রপতিগণের আর একটি তৃতীয় সম্বন্ধ ছিল; এই সম্বন্ধ চর্চের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অকল্যাণজনক হইয়াছিল। পাষণ্ডদলনকার্য্যে চর্চ রাষ্ট্রপতিগণের সহকারিতা দাবী করিত; এ কার্য্যসাধনের জন্য তাহার নিজের কোন উপায় ছিল না; তাহার হাতে সৈন্য সামন্ত ছিল না, বলপ্রয়োগের কোন উপকরণ ছিল না; পাষণ্ডবিধর্ম্মীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াই তাহাকে ক্ষান্ত থাকিতে হইত, তাহাকে দণ্ড দিবার কোন উপায় তাহার হাতে ছিল না। সে তখন কি করিতে পারে? সে তখন ঐহিক বাহুবলের সহায়তা ভিক্ষা করিত; ঐহিকতন্ত্রের শক্তি ধার করিয়া লইত। এইরূপে ঐহিক শাসকদিগের সম্পর্কে তাহাকে কতকটা হীনতা ও আনুগত্যস্বীকার করিতে হইত। ঐহিক সহকারিতা ও উৎপীড়ন নীতি অবলম্বন করিতে গিয়া তাহাকে এই দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

চর্চের সহিত সাধারণ জনবর্গের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, কোন্ কোন্ নীতিদ্বারা এই সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হইত এবং সভ্যতার ইতিহাসে এই সকল নীতির ফল কিরূপ দাঁড়াইয়াছে—এসকল কথা এবারকার মত অবশিষ্ট থাকিল। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই আলোচনার পর আমরা ইতিহাসের ঘটনার সহিত আমাদের যুক্তিলব্ধ সিদ্ধান্তগুলি মিলাইয়া দেখিব।

(শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার, এম, এ, মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশিত সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।)

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

কেদার-বদরী

অতীতের সকল স্মৃতিই মধুর। সেই স্মৃতি যদি আবার সুখ-স্মৃতি হয়, তবে তাহার মোহিনী শক্তিতে মানুষ স্বতঃই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। সেই সুখ-স্মৃতিটি উপভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রতি মানবেই অল্পাধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। কেহ যদি ইহাকে দুর্ব্বলতা আখ্যায় ভূষিত করিতে ইচ্ছা করেন, করিতে পারেন, কিন্তু তবু ইহা মানবপ্রকৃতির একটা বিশেষ বৃত্তি একথা স্বীকার করিতেই হইবে। এই আকাঙ্ক্ষাদ্বারা প্রণোদিত হইয়াই আজ তিন বৎসর পরে কেদার-বদরী ভ্রমণের সুখ-স্মৃতি আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বদরিকাশ্রম (বদরী নারায়ণ সাধারণতঃ এই নামেই পরিচিত) যাইবার আকাঙ্ক্ষা অতি শৈশব হইতেই আমার মানসপটে বিদ্যমান ছিল—কেমন করিয়া যে এই আকাঙ্ক্ষার বীজ সেই তরুণ হৃদয়ে উপ্ত হইয়াছিল, আজ বার্দ্ধক্যের দ্বারে উপনীত হইয়া তাহা স্মরণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। তবে শ্রদ্ধেয় জলধর বাবুর "হিমালয়" পাঠে যে সে আকাঙ্ক্ষা বীজ অঙ্কুরিত ও মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। যে বৎসর হরিদ্বার কুম্ভমেলায় গিয়াছিলাম, সে বৎসরও বদরিকাশ্রম যাইবার জন্য কতিপয় শ্রদ্ধেয়া আত্মীয়া কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু তখন যাওয়া হইল না। তার পর, ১৯২০ সনে যাইবার জন্য এতই অস্থির হইয়া উঠিলাম যে, যে দিবস বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশের ছুটি হইল, সেই দিবসই বেলা ১২টার গাড়ীতে দিল্লী এক্সপ্রেসে, তল্পী তল্পা বাঁধিয়া, আসক্তির দৃঢ় বন্ধনটাকে একটুকু শিথিলীকৃত করিয়া, এক অননুভূত আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া উদ্বেল-হৃদয়ে হাবড়া ষ্টেসনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার প্রিয় ছাত্রবৃন্দের অনেকেই ষ্টেসনে আমাকে পৌঁছাইয়া দিতে গিয়াছিল; কিন্তু সেদিন যাত্রীর সংখ্যা এত বেশী ছিল যে কোনও মতেই টিকিট করা সম্ভব হইল না। আমি ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া বিনা টিকিটেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা কিছুতেই নামিব না। আমার স্নেহাস্পদ জনৈক ছাত্র অনেক চেষ্টা করিয়া কিঞ্চিৎ

রজত মুদ্রার সাহায্যে প্লাটফরম হইতেই একটা টিকিটরূপী ছাড়পত্র যোগাড় করিয়া আনিল। আমি সেটাকে পকেটে পুরিয়া রাখিলাম।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ছাত্রদের দিকে বিদায়সূচক করুণনেত্রে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া আমি গাড়ীর প্রবেশপথেই অতি কষ্টে দাঁড়াইয়া রহিলাম। মোগলসরাই পর্য্যন্ত এইরূপ দাঁড়াইয়াই গেলাম, কোনও কষ্ট নাই, মন তখন নূতনের আকাঙ্খায় পরিপূর্ণ, অনিশ্চয়তার আনন্দে উৎফুল্ল, একাকিত্বের অনুভূতিতে ভরপুর, শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সুবিধা অসুবিধা তখন গ্রাহ্যের মধ্যেই নয়। মুক্তবিহঙ্গের মত তখন প্রাণ উধাও হইবার জন্য ব্যস্ত, অনন্তের মাঝে আত্মহারা।

২৫শে বৈশাখ সকালে ৪॥০ ঘটিকার সময় স্বামী ভোলানন্দের যাত্রী নিবাসে পৌঁছিলাম। এই সুদূর দুর্গমপথে একাকী যাইতেছি বলিয়া অনেক হিতৈষী বন্ধু দুঃখিতহৃদয়ে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি সকলের সকল অভাব পূরণ করেন, তিনি, আমি হরিদ্বার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, আমার সাহচর্য্যের জন্য ভক্ত, বিনয়ী, মধুরপ্রকৃতি রাধাকৃষ্ণ বাবুকে তথায় আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। উদারপ্রাণ রাধাকৃষ্ণ বাবু (তিনি তখন বরিশালে ডেপুটি ছিলেন) অতি সমাদরে আমায় গ্রহণ করিলেন। প্রথম দর্শনেই পরস্পরের হৃদয় চির পরিচিতের মত সঙ্কোচবিহীন হইয়া পড়িল। দড়ীর জুতা ও লাঠি কিনিয়া আমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম, শৈশবের স্বপ্ন সফল হইতে চলিল ; আজ যে কি আনন্দ, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরে কল্পনা করিতে পারিবে না। সহরের হট্টগোল হইতে নির্জ্জন স্থলে গমন করিলে চঞ্চল মন স্বভাবতই একটু স্থির হইয়া আসে। কিন্তু আজ আমরা যে রাজ্যে চলিয়াছি, সে যে শুধু নির্জ্জন নয়,—সে লোকালয়ের সকল বন্ধনমুক্ত প্রকৃতির খাস অন্দর মহল, এখানে সভ্য অসভ্য কোন জগতেরই প্রায় সাড়া পাওয়া যায় না—সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে, যে দিকে দৃষ্টি করা যায়, শুধু বন আর বন। কোথায় ছোট ছোট ঝোপ, আবার একটু বড় গাছ, আর একটু বড়, আরও বড় গাছ—এমনি গাছ, তার পর গাছ, তার পর আবার গাছ—আর পাহাড়, তার আর অন্ত নাই—কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিবার উপায় নাই—ঊর্দ্ধদিক ব্যতীত আর কোনও দিকেই বহুদূর নিরীক্ষণ করা যায় না—পাহাড়, পাহাড়, কেবল পাহাড়—কোথায়ও ছোট, কোথায় বড়, কোথায় মাঝারী ; কোথায়ও বৃক্ষলতা-বিহীন, কোথায় আবার বৃহৎ বৃহৎ বনস্পতিপরিশোভিত সর্ব্বত্রই দৃষ্টি-শক্তি প্রতিহত হইয়া ঠিকরিয়া আসিতে চায়। এ শুধু বন নয়—শুধু পাহাড়ও নয়, বন বা পাহাড় বলিলে ইহাকে ঠিক বলা হয় না—এ বন ত বটেই—তা ছাড়া—এ পাহাড়ের বন। এ পাহাড়ের যেন আর শেষ নাই।

তার পর এরাজ্যে মানুষের আপনার জন কেহই নাই, এ রাজ্যে বন্ধুবান্ধবের বা আত্মীয় স্বজনের স্নেহের দৃষ্টি বা স্নেহের ক্রোড় কাহারো জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকে না, এরাজ্যে মানুষকে অভাব অনটনের জ্বালায়, শত সহস্র চিন্তাজালে জর্জ্জরিত হইতে হয় না, এ রাজ্যে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই উদর প্রপূর্ত্তির আয়োজনে লোক ব্যস্ত হয় না, এরাজ্যেও উদর আছে বটে কিন্তু উদরপূর্ত্তির জন্য কেহ ব্যস্ত নয়, নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই মন ভগবদআরাধনায় মগ্ন হইয়া পড়ে, সকলেই প্রতিনিয়ত একটা কোন অচিন্তনীয় রাজ্যের চিন্তার মোহে অভিভূত

হইয়া, ঘাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া, সুখ স্বচ্ছন্দতা বিলাসিতাকে পদদলিত করিয়া ঊর্দ্ধনেত্র, বা অন্তঃনেত্র হইয়া সম্মুখের দিকে অক্লান্ত গতিতে দিনের পর দিন শুধু চলিতে থাকে, এখানে মানুষ বিরাম সুখ চায় না—আরাম সুখ কামনা করে না—মানুষ শুধু চলে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, সম্মুখের দিকে—পশ্চাতের দিকে সে একবারও ফিরিয়া তাকায় না—তাকাইবার অবসরও পায় না। সম্মুখ লইয়াই সে ব্যস্ত, মন তার অবিরাম ছুটীয়া চলে সম্মুখে আরও সম্মুখে, আরও সম্মুখে : চরণ শত দ্রুত চলিয়াও মনের সঙ্গে চলিয়া উঠিতে পারে না। প্রতিনিয়ত মনের মধ্যে যে মন আছে সেখান হইতে ধ্বনিত হইতে থাকে—এগিয়ে চল ভাই এগিয়ে চল, এ রাজ্যে মানুষ সকলেই নিঃসঙ্গ বা তদেকসঙ্গ। মানুষের সাধ্য নাই যে সে শুধু নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া এ পথে চলে—তাকে প্রতি কাজে, প্রতি পদে সেই সর্ব্ব-নিয়ন্তার উপর নির্ভর করিতেই হইবে। যিনি যে ধর্ম্মই বিশ্বাস করুন না কেন, এ পথে তাঁহাকে ঐশী শক্তির উপর নির্ভর করিতেই হইবে। এই অনণ্যশরণতা, ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভরতাই এই পথের একমাত্র পাথেয় এবং এই দুর্গম পথ ভ্রমণের অমূল্য সুলভ পুরস্কার।

কেদার-বদরী-যাত্রীর যাত্রার দিন সন্নিহিত হইতেছে। অক্ষয়তৃতীয়ার দিন মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় ; সুতরাং কেদার নাথ ও বদ্‌রী নারায়ণ যাত্রীর প্রাণ নিশ্চয়ই এখন আকুল হইয়া উঠিয়াছে, তাই এই প্রবন্ধ শেষে তাঁহাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য কতকগুলি বিষয় এখানে লিখিতেছি।

যাঁহারা অর্থ ব্যয় করিতে সমর্থ, তাঁহাদের পক্ষে পাণ্ডার সাহায্য লওয়াই উচিত। এবং যদিও যানারোহণে গমন করিলে পুণ্যের লাঘব হয় বলিয়া কথিত আছে, তথাপি আমাদের মতে বিশেষ কষ্টসহিষ্ণু লোক ব্যতীত আর সকলেরই যানের বন্দোবস্ত করা সঙ্গত। বাসন কোষন যতদূর সম্ভব কম নেওয়া উচিত, কেননা ইহাতে বোঝা ভারী হইয়া যায়, এবং ভাড়ার টাকা অনেক বেশী লাগে। এ বৎসর পূর্ব্বে প্রতি মণে ঋষিকেশ হইতে ৬৫৲টাকাপর্য্যন্ত ভাড়া লাগিত। এখন হয়ত আরও অধিক লাগিবে। তারপর রাম নগর পর্য্যন্ত আবার মণ প্রতি ৭।৮ টাকা। প্রতি চটিতেই বাসন কোষণ পাওয়া যায়। তজ্জন্য কোনও ভাড়া দিতে হয় না। প্রতি চটীতেই চাল ডাল ইত্যাদি পাওয়া যায়। যে চটি হইতে চাল ডাল ক্রয় করা হয়, সেখানেই বাসন কোষণ মিলে। সুতরাং বোঝা বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। তারপর শীতবস্ত্র লওয়া যথেষ্ট সঙ্গে লওয়া প্রয়োজন, দুই খানা ভাল কম্বল প্রত্যেকেরই লওয়া উচিত। ভাল সোয়েটার ১টা ও গরমকোট ১টা বা ওভার কোট একটি হইলে বেশ ভাল হয়। কিছু কাপড়ধোওয়া সাবান, দিয়াসলাই, সম্ভব হইলে ছোট একটা হারিকেন, অভাবে candle, কেননা সর্ব্বত্রই আলোর অভাব। full woollen মোজা ২ জোড়া, দড়ির জুতা অন্ততঃ ৪ জোড়া, হরিদ্বারে ৷৶০ করিয়া পাওয়া যায়। ছুরি বেশ ভাল দেখে ১খানা, কিছু সুচ সুতা, কুইনাইন পিল, আইওডাইন, আমাশয়ের ঔষধ রূপে হোমিওপ্যাথিক ৪।৫টী ঔষধ। সর্ব্বদাই খুব প্রত্যুষে রওয়ানা হওয়া উচিত এবং সকালে ৫।৬ মাইল ও বিকালে ৩।৪ মাইলের বেশী কাহারও চলা উচিত নয়। পারিলেও নয়। কেননা ইহাতে তখন কোনও কষ্ট বা অসুখ না হইলেও পরে অনেককেই ৪।৫ মাস ভুগিতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং তাড়া

তাড়ি না করিয়া অল্প অল্প চলিলে, শরীর মন দুই-ই ভাল থাকিবে এবং সর্ব্বদাই অপার আনন্দ পাওয়া যাইবে। সমস্ত পথেই, চাউল এবং ডাল পাওয়া যায়। লঙ্কা, হলুদাদি প্রায়ই দুষ্প্রাপ্য সুতরাং সম্ভব হইলে কিছু চূর্ণমসলার ব্যবস্থা করিয়া নিলে সে অসুবিধা দূর হইতে পারে। দুধ সর্ব্বত্রই মিলে। একটুকু বিবেচনাপূর্ব্বক তাহা ব্যবহার করিলে শরীর সুস্থই থাকে। পথে ঘাটে কাহাকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা সঙ্গত নয়, আবার একেবারে অবিশ্বাস করিলেও চলিবে না। টাকা পয়সা কখনও কাহারও সম্মুখে বাহির করিতে নাই। সমস্ত পথেই ৩।৪টি চটি অন্তর অন্তর প্রায়ই পোষ্টাফিস্ আছে। দূরত্বের হিসাব করিয়া পূর্ব্ব হইতে আত্মীয় স্বজনকে জানাইয়া গেলে মাঝে মাঝে তাহাদের পত্রাদি পাওয়া যাইতে পারে। যে সমস্ত চটিতে খুব কম লোক থাকে, তাহাতে রাত্রিবাস না করাই শ্রেয়। চটির নাম ও দূরত্ব পূর্ব্ব হইতেই জানা থাকা প্রয়োজন। যে সব চটিতে সহজে জল পাওয়া যায়, পূর্ব্ব হইতে হিসাব রাখিলে, তাহা সহজলভ্য হয় ও কষ্টে পড়িতে হয় না। নচেৎ অনেক স্থলে জলের জন্য বড়ই কষ্ট পাইতে হয়. যাত্রীদের সুবিধার জন্য নিম্নে পর পর চটির নাম, দূরত্ব, জলের সুবিধা ও পোষ্টাফিস্ ইত্যাদি লিখিত হইল। এ প্রবন্ধে কেদার বদরী সম্বন্ধে কিছুই লিখিতে পারিলাম না, সুযোগ হয়ত পরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

* হরিদ্বার হইতে—

সত্যনারায়ণ—	৭ মাইল
হৃষিকেশ—(পোঃ আঃ)	১৪ ,,
লছমনঝোলা—	১৭ ,,

লছমনঝোলা হইতে

ফুলবাড়ী—	৩¾ ,,
গুলার—	৬ ,,
মোহন—	৯ ,,
ছোটবিজ্‌নী—	১০॥ ,,
বড়বিজনী—	১২ ,,
কুণ্ড—	১৫ ,,
বন্দরভেল—	১৮ ,,
মহাদেব—	২১। ,,
শ্যামল—	২৫ ,,
কাণ্ডি—	২৭॥ ,,
ব্যাসঘাট—(পোঃ আঃ)	৩২ ,,
উম্‌রু—	৩৭। ,,
সৌর—	৩৯॥ ,,
দেবপ্রয়াগ—(পোঃ আঃ)	৪১ ,,

দেবপ্রয়াগ হইতে—

রাণীবাগ—	৭॥০	মাইল
*রামপুর—	১১	,,
ভিল্ল কেদার—	১৫	,,
*শ্রীনগর (পোঃ টেলীঃ অঃ)—	১৮	,,

শ্রীনগর হইতে—

সুকরতা—	৫	,,
*ভট্টিসেরা—	৭॥০	,,
ছাতেখাল—	৯॥০	,,
খাঁকরা—	১২	,,
*নরকোটা—	১৫	,,
গুলার রায়—	১৮	,,
*রুদ্রপ্রয়াগ (পোঃ অঃ)—	২০	,,

রুদ্রপ্রয়াগ হইতে—

*ছাতৌলী—	৫	,,
মাটিয়ানা—	৬॥০	,,
অগস্ত্যমুনি—	১১	,,
*সৌড়ি—	১৩॥০	,,
*চন্দ্রপুরি—	১৫॥০	,,
*ভৌরী—	১৮	,,
*কুণ্ড—	২২	,,
*গুপ্তকাশী (পোঃ অঃ)—	২৪	,,

গুপ্তকাশী হইতে—

নালা—	১	,,
*ভেটা—	২	,,
ব্যুঙ—	৪	,,
দুর্গা—	৬	,,
কাটা—	৭	,,
বাদল—	১০॥	,,
রামপুর—	১২	,,
শোণপ্রয়াগ—	১৪	,,

(এস্থান হইতে ত্রিযুগী নারায়ণ ৩॥ মাইল চড়াই ; তার পর ৩ মাইল উৎরাই করিয়া শোণ প্রয়াগের রাস্তা ধরিতে হয়)

* গৌরী কুণ্ড—(পোঃ অঃ)	১৭

* রাম বাড়া—	২১	মাইল
* কেদার নাথ—	২৫	”

কেদার নাথ হইতে ফিরিবার সময় নালা পর্য্যন্ত এক পথ।

নালা হইতে—

*উখীমঠ (পোঃ টেঃ স্থাঃ)—	৩॥	”
গনেশচটি	৬	”
*দুর্গা—	৮	”
দরিয়া—	৯	”
*পোথি বাসা—	১১	”
গণেশ চটি—	১২॥	”
বনিয়াকুণ্ড—	১৪	”
*চোপতা—	১৫॥০	”

এখান হইতে তুঙ্গনাথ ৩ মাইল চড়াই ; আবার অন্যপথে ৩ মাইল নামিয়া পূর্ব্ব রাস্তায় আসিতে হয়, ও পরে ভুলকণা চটি পাওয়া যায়—

ভুলকণা—	১৭	”
*ভীমগোড়া—	১৯	”
জঙ্গল—	২২	”
মণ্ডন—	২৫॥০	”
*আরাম—	২৭	”
সেটুনা—	২৮	”
*গোপেশ্বর—	৩০	”
*লালসাঙ্গা বা চামৌলী (পোঃ, টেলি অঃ)—	৩৩	”

লালসাঙ্গা হইতে——

*মঠ—	২	”
ছিনকা—	৩	”
সিয়াহার—	৬	”
*হাট—	৯	”
*পিপলকোট (পোঃ অঃ)—	১০	”
*গরুড় গঙ্গা—	১৩	”
টাংনী—	১৫	”
দেওয়ারা—	১৬	”
*পাতাল গঙ্গা—	১৭	”
*গুলাবকোটী—	১৯	”
কুমার—	২২	”
খনটি—	২৪॥০	

সিঙ্গধার—	২১	মাইল
*যোশীমঠ— (পোঃ টেলিঃ আঃ)	২৮	,,

যোশীমঠ হইতে—

*বিষ্ণুপ্রয়াগ—	২	,,
বলছুড়া—	৩	,,
*ঘাট—	৬	,,
*পাণ্ডুকেশ্বর—	৮	,,
লামবগড়—	১১	,,
*হনুমান—	১৪	,,
*বদরী নারায়ণ (পোঃ অঃ)—	১৯	,,

ফিরিবার পথে চামোলী পর্য্যন্ত একই পথ।

চামোলী হইতে—

কুমেড়—	১॥০	,,
মৈঠানা—	৩	,,
*নন্দপ্রয়াগ (পোঃ অঃ)—	৬	,,
ফেনলা—	৯	,,
ভরত—	১০	,,
লাহাসু—	১২	,,
জৈকণ্ডী—	১৫	,,
*কর্ণপ্রয়াগ (পোঃ, টেলিঃ অঃ)—	১৭	,,

কর্ণপ্রয়াগ হইতে———

পাটলি—	২	,,
সিমলি—	৪	,,
সিরৌলী—	৬	,,
*টোলী—	৭॥০	,,
*আদিবদ্রী—	১২	,,
জঙ্গল—	১৬॥০	,,
*কেশব চটি—	১৮॥০	,,
কালিমাটি—	২০	,,
গোয়ার—	২১	,,
নারায়ণ—	২২	,,
*ধুনার ঘাট (পোঃ অঃ)—	২৩	,,
আরাম—	২৪	,,
হনুমান—	২৫	,,

*মেহেল চৌরী—	২৯ মাইল
(গাড়োয়াল রাজ্য শেষ)	

মেহেল চৌরী হইতে——

সিমলক্ষেত—	২ ,,
নারায়ণ—	৪ ,,
রাম—	৬ ,,
*চৌঘুটিয়া—	৮ ,,
ভাটকোট—	৯ ,,
চিনৌনী—	১১ ,,
ভগবতী—	১২ ,,
গনেশ—	১৩ ,,
বাণালী—	১৪ ,,
*মাসী—	১৫ ,,
বৃদ্ধকেদার—	১৯॥০ ,,
সোন্না—	২০॥০ ,,
বাসেড়ী—	২১॥০ ,,
নওলা—	২৩॥০ ,,
জয়নাল—	২৪॥০ ,,
*ভিখিয়াসেন—	২৬ ,,
সেরকোট—	২৯ ,,
*ব্যাসকোট—	৩১॥০ ,,
ছোট সিম—	৩৩ ,,
বড় সিম—	৩৪ ,,
গুজার ঘাটি—	৩৭ ,,
জৌখাণ্ডা—	৪২ ,,
*গদি—	৪৪ ,,
টোটাম—	৫০ ,,
সৌরাল—	৫২॥০ ,,
কুমেরিয়া—	৫৭ ,,
চকথুলা—	৬২ ,,
গরজিয়া—	৬৩ ,,
ঢিকুলি—	৬৪ ,,
রামনগর (পোঃ টেলিঃ অঃ)—	৭০ ,,

*চিহ্নিত চটিগুলিতে জল সহজ লভ্য।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ বসু।

হিন্দুর ধর্ম্মসাহিত্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৪) বেদাঙ্গ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (১) শিক্ষা (২) ব্যাকরণ (৩) নিরুক্ত (৪) কল্প (৫) জ্যোতিষ এবং (৬) ছন্দোভেদে বেদাঙ্গ ছয়টী। ইহাদের মধ্যে শিক্ষার অধ্যয়ন দ্বারা অক্ষরগুলিকে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিবার রীতি বিদিত হওয়া যায়। প্রথমত স্বরগুলিকে হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, ইহাদের আবার উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিতরূপে প্রত্যেকের তিনটী বিভাগ করা হইয়াছে। এই স্বরসমূহের উচ্চারণের পরস্পর ভেদ এবং ব্যঞ্জনের যথাযথ উচ্চারণ এই শিক্ষাগ্রন্থের অধ্যয়নদ্বারা জানা যাইতে পারে। অনেকে মনে করিতে পারেন এবং বস্তুতঃ অনেকেই মনে করেন যে বৈদিক মন্ত্রাদি কোনরূপে উচ্চারণ করিতে পারিলেই আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবে, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম, কার্য্যসিদ্ধি এবং উপকার ত দূরে থাক্, ইহাদ্বারা অনেক সময়ে বিশেষ অপকারই হইয়া থাকে। এ বিষয়ে নিরুক্তের শ্লোকটীই আমরা প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিতে পারি ; যথা—

"মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা,
মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ,
স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ।'

অর্থাৎ কোন মন্ত্র যদি বর্ণহীনভাবে উচ্চারিত হয় কিংবা যথাযথভাবে যদি মন্ত্রের স্বরসমূহ উচ্চারিত না হয়, তাহা হইলে দোষযুক্ত সেই মন্ত্র স্বার্থপ্রকাশে অসমর্থ হইয়া বজ্রস্বরূপ যজমানকে আঘাত করিয়া থাকে, 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দোচ্চারণে দোষ হওয়ায় যেরূপ যজমানের মঙ্গল না হইয়া অমঙ্গলই হইয়াছিল। 'ইন্দ্রশত্রু' উচ্চারণ সম্বন্ধে একটী প্রাচীন গল্প আছে। গল্পটী এই, "দেবরাজ ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে নিহত করেন, তজ্জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া ত্বষ্টা প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া এক যজ্ঞ আরম্ভ করেন এবং তাহাতে "ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব" বলিয়া আহুতি প্রদান করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল "হে অগ্নে! ইন্দ্রের শত্রু অর্থাৎ বিনাশকর্ত্তা পুরুষরূপে তুমি এই যজ্ঞকুণ্ড হইতে আবির্ভূত হও," কিন্তু তাহার স্বরোচ্চারণে ত্রুটী থাকায় ষষ্ঠীতৎপুরুষস্থলে বহুব্রীহিসমাসদ্বারা অর্থ হইল—"ইন্দ্র শত্রু যার" সে এই যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হউক। তাই বৃত্র সেই যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হইলেন এবং পরে ইন্দ্র তাঁহার শত্রু অর্থাৎ বিনাশকর্ত্তা বলিয়া ইন্দ্রের দ্বারা নিহত হন্॥" স্বরোচ্চারণে ত্রুটী হইলে এইরূপ কুফল হইবারই সম্ভাবনা তাই সকলেরই স্বরজ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং শিক্ষাগ্রন্থদ্বারা আমরা তাহাই সুচারুরূপে জানিতে পারি।

ব্যাকরণ ঃ—শব্দের এবং বাক্যের যথোচিত রীতিতে প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত

ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োজন। পাণিনি মুনিই ব্যাকরণশাস্ত্রনির্ম্মাতা আচার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই পাণিনীয় ব্যাকরণেই পূর্ব্বোক্ত শিক্ষাশাস্ত্রের একটী প্রকরণ সন্নিবেশিত আছে। তিনি বিক্রম হইতে ৭৫০ বৎসর পূর্ব্বে দাক্ষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তিনি শালাতুর নামক স্থানে বাস করিতেন, অনেকে বলেন পাণিনি পেশোয়ারের নিকটবর্ত্তী 'তুদী' গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাণিনীয় ব্যাকরণের একটী নাম অষ্টাধ্যায়ী, কারণ ইহাতে আটটী অধ্যায় আছে। এই অষ্টাধ্যায়ীতে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মসমূহ সূত্ররূপে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত আছে। তাঁহার পরে বিক্রম হইতে প্রায় ৩৪৩ বৎসর পূর্ব্বে কাত্যায়ন নামক একজন ঋষি পাণিনীয় ব্যাকরণে আরও সূত্রের প্রয়োজন মনে করিয়া কতকগুলি সূত্র প্রস্তুত করেন, তাহাদিগকেই বার্ত্তিক বলা হইয়া থাকে। পতঞ্জলি নামক অপর একজন ঋষি পাণিনির সূত্র ও কাত্যায়নের বার্ত্তিকের অর্থবোধনার্থ 'মহাভাষ্য' প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পতঞ্জলি পাটনায় বাস করিতেন, তাঁহার মাতার নাম গোণিকা, তিনি বিক্রম হইতে প্রায় ৯৮ বৎসর পূর্ব্বে মগধের তুঙ্গবংশের রাজা পুষ্পমিত্রের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে পতঞ্জলির আর একটী নাম ছিল "গোনর্দ্দীয়" এবং তাঁহাদের মতে গোনর্দ্দ Oudh অর্থাৎ অযোধ্যার প্রান্তস্থিত বর্ত্তমান গোঁড়ের পূর্ব্বপ্রচলিত নাম। তাই তাঁহাদের মতে পতঞ্জলি গোঁড়ে বাস করিতেন, পাটনায় নহে। পাণিনীয় ব্যাকরণকে "ত্রিমুনি ব্যাকরণ" বলা হইয়া থাকে—কারণ পাণিনিকৃত সূত্র, কাত্যায়নকৃত বার্ত্তিক এবং পতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্য এই তিনখানি গ্রন্থ পাঠ না করিয়া পাণিনির সূত্রের গূঢ়ভাব বুঝা যায় না; কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলি পাণিনির মতই প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নাই, তাই এই তিনজনের গ্রন্থই একত্র করিয়া পাঠ করা অভিপ্রেত।

ছন্দ—বৈদিক মন্ত্রগুলি ছন্দে রচিত হইয়াছে, এই হেতু এই ছন্দঃসমূহের উচ্চারণরীতি প্রদর্শনার্থ এবং ইহাদের লক্ষণাদি যথাযথরূপে জানাইবার নিমিত্ত ছন্দঃশাস্ত্র নামক বেদাঙ্গের প্রয়োজন। ছন্দঃ দ্বিবিধ—লৌকিক এবং অলৌকিক; অলৌকিক ছন্দঃ বেদে পাওয়া যায়। পিঙ্গলনাগ ছন্দোবিবৃতি নামক গ্রন্থে এই দ্বিবিধ ছন্দেরই নিরূপণ করিয়াছেন। গায়ত্রী উষ্ণিক, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্ এবং জগতী প্রধানতঃ এই সাত ছন্দঃ এবং ইহাদের অবান্তর ভেদ হেতু ভিন্ন ভিন্ন আরও বহুবিধ বৈদিক ছন্দঃ এই গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, উপজাতি, ইন্দ্রবজ্রা, বসন্ততিলকা প্রভৃতি যে সকল লৌকিক ছন্দঃ ইতিহাস এবং পুরাণাদিতে পাওয়া যায় তাহাদের নিয়ম নির্দ্ধারণার্থ বৃত্তরত্নাকর ছন্দোমঞ্জরী, শ্রুতবোধ প্রভৃতি আরও অনেক ছন্দোগ্রন্থ আছে।

নিরুক্ত—বেদে একশব্দই বহুবিধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তজ্জন্য শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি এবং প্রতিশব্দগুলি জানার বিশেষ আবশ্যকতা আছে, যে বেদাঙ্গে এই সমস্ত বিষয় জানা যায় তাহাকে নিরুক্ত বলে। নিরুক্তের রচয়িতা যাস্ক, ইনি বিক্রম হইতে প্রায় ৮৪৩ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। এই গ্রন্থপাঠ করিলে বৈদিক শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি এবং উহাদের অর্থের যথোচিত জ্ঞানের নিয়ম জানা যায়। বৈদিক মন্ত্রগুলির

ঠিক ঠিক অর্থ বহুস্থলেই এই নিরুক্তের দ্বারাই জ্ঞাত হওয়া যায়। নিরুক্ত একখানি প্রধান প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

কল্পসূত্র :—কোন্ কোন্ বৈদিক কর্ম্ম করিবার কি কি ক্রম তাহা যে বেদাঙ্গে কথিত আছে তাহাকে কল্প বলা হইয়া থাকে, এবং সেই সেই ক্রমনির্দ্দেশক সূত্রসমষ্টিকে কল্পসূত্র বলা হয়। এই কল্পসূত্র তিনভাগে বিভক্ত, যথা শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, এবং ধর্ম্মসূত্র। যাহাদের শ্রুতি অর্থাৎ বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্‌গুলির সহিত সম্বন্ধ আছে তাহাদিগকে শ্রৌতসূত্র বলা হইয়া থাকে। শিশুর জন্ম হইতে মৃত্যুপর্য্যন্ত যে সমস্ত বৈদিক কর্ম্ম যথানিয়মে সম্পাদন করা উচিত, তাহাদের নিয়ম গৃহ্যসূত্রগুলিতে লিখিত আছে। ধর্ম্মসূত্রগুলিতে চতুর্ব্বর্গ এবং আশ্রমচতুষ্টয়ের কর্ত্তব্যসমূহ যথোচিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই প্রাচীন যুগের আচার ব্যবহারাদি জানিবার জন্য এই ধর্ম্মসূত্রগুলি আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই ধর্ম্মসূত্রসমূহকেই মুখ্যতঃ অবলম্বন করিয়া মনু স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ রচিত হইয়াছিল। লাট্যায়ণ, দ্রাহ্যায়ণ প্রভৃতি শ্রৌতসূত্র, আশ্বলায়ণ, গোভিল, পারস্কর প্রভৃতি গৃহ্যসূত্র এবং বৌধায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন প্রভৃতি ধর্ম্মসূত্রসমূহ আজ পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে। কোন কোন বৈদেশিকের মতে এই কল্পসূত্রগুলি বিক্রম হইতে প্রায় ৪৪৩-১৪৩ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

জ্যোতিষ :—বেদে যে সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে সেগুলি ঠিক নিয়মিত সময়ে করা আবশ্যক এবং তাই সময়ের ঠিক ঠিক জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত জ্যোতিষ শাস্ত্র লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে তিথি, বার, নক্ষত্র, মাস, বর্ষ প্রভৃতি সময়বিভাগ জানিবার রীতি নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গলাদি গ্রহসমূহের গতি প্রভৃতির নিয়ম সুন্দর-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। জ্যোতিষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ "পারাশরী সংহিতা"—এই সংহিতা-খানি পরাশর নামক কোন এক ব্যক্তির দ্বারা লিখিত হইয়াছিল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু ইনি ব্যাসদেবের পিতা পরাশর কিনা সে বিষয়ে কিছু সন্দেহ আছে। যদি ইনি ব্যাসদেবের পিতা হন তবে এই গ্রন্থখানি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়েই লিখিত হইয়াছিল, আর যদি ইনি বৈদেশিক মতানুযায়ী কোন দ্বিতীয় পরাশর হন তাহা হইলে যবনাদি জাতি সমূহের নামাদি দর্শন করিয়া এই গ্রন্থখানি বিক্রম হইতে প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমানও অগ্রাহ্য করা যায় না। জ্যোতিষের দ্বিতীয় প্রাচীন গ্রন্থের নাম "গর্গসংহিতা," ইহার লেখক গর্গাচার্য্য পরাশর হইতে প্রায় ১০০ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার গ্রন্থমধ্যে লিখিত আছে যে সেই সময়ে শকগণ যবনদিগকে বিতাড়িত করিয়া স্বকীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। যবনদিগকে জ্যোতিষশাস্ত্রবিষয়ক ব্যুৎপত্তির প্রশংসাও গর্গ নিজ গ্রন্থে করিয়া গিয়াছেন। তারপরে আমরা আর্য্যভট্টীয় নামক বিখ্যাত জ্যোতিষ গ্রন্থখানির নাম উল্লেখ করিতে পারি। ইহার লেখক আর্য্যভট্ট পাটনার নিকটে ৫৩৩ সংবতে অর্থাৎ ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যদিগের মতে পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, কিন্তু আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রকারগণের মতে সূর্য্যই ঘুরিতেছে এই প্রবাদই সাধারণতঃ সকলে জানেন। অবশ্য পৃথিবী যে ঘুরিতেছে

তাহার প্রামাণ্য স্থাপন করিতে পাশ্চাত্যগণ যথেষ্ট যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন সেগুলি অকাট্য বলিয়াই মনে হয়, তথাপি এটাও বোধ হয় অনেকে জানেন যে তাঁহাদের দেশেও Geocentric ও Heleocentric এই দুইটী theoryতে ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং উভয় theory দ্বারাই গ্রহণ প্রভৃতির সময় ঠিক ঠিক নির্দ্ধারিত করা যাইত, কিন্তু অন্যান্য যুক্তির বলে কালক্রমে Heleocentric theoryই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আমাদের দেশেও বহুদিন পূর্ব্বে এরূপ একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল এবং আর্য্যভট্টই বোধ হয় তাহার প্রথম পথ প্রদর্শক। তিনি তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন যে পৃথিবী তাহার মেরুদণ্ডের উপর অনবরত ঘুরিতেছে এবং তিনি চন্দ্রগ্রহণ সূর্য্যগ্রহণেরও ঠিক ঠিক কারণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থেই আমরা দেখিতে পাই যে

"অনুলোম গতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যা চলং বিলোমং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সম পশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্॥

অর্থাৎ যেমন কোন লোক নৌকায় কোনদিকে যাইবার সময়ে তীরস্থিত অচল বস্তুগুলিকে বিপরীত দিকে যাইতে দেখে, লঙ্কা হইতে সেইরূপ অচল নক্ষত্র সমূহকে পশ্চিম দিকে চলিতেছে বলিয়া মনে হয়। অতএব এ বিষয়ে যে পাশ্চাত্যগণই প্রথম তথ্য আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছেন এরূপ ভ্রম যেন কাহারও না হয়। তারপর আমরা "বৃহৎসংহিতা" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানির নাম করিতে পারি, ইহার রচয়িতা নবরত্নের অন্যতম রত্ন বরাহমিহির। তিনি মালবদেশবাসী ছিলেন, ৫৫৯ সংবতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, এবং প্রায় ৬৬৬ সংবতে পরলোকগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত ৪ খানি গ্রন্থ আমরা বর্ত্তমানে পাইয়া থাকি তাহাদের নাম বৃহৎসংহিতা, বৃহজ্জাতক, লঘুজাতক ও পঞ্চসিদ্ধান্তিকা। ইঁহার গ্রন্থে ভূগোল, খগোল, গণিত, বনস্পতি এবং প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতি সকল বিষয়েরই বিস্তৃত বর্ণনা দেখা যায়। "ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত" নামে আর একখানা প্রাচীন জ্যোতিষগ্রন্থ আছে—এই গ্রন্থখানি অষ্টম বিক্রম শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থখানিতে গণিত ও ফলিত এই দ্বিবিধ বিদ্যারই সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে দেখা যায়। ইহার রচয়িতা ব্রহ্মগুপ্ত ৫৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ত্রিশবৎসর বয়সের সময় এই পুস্তকখানি লিখিয়াছিলেন এইরূপ জানা যায়। তৎপর দ্বাদশ বিক্রম শতাব্দীতে ভাস্করাচার্য্য সিদ্ধান্ত শিরোমণি, লীলাবতী এবং বীজগণিত রচনা করিয়া,এই সময়ের হিন্দুদিগের জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞানের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। লল্ল, শ্রীধর ইত্যাদি আরও অনেক প্রাচীন পণ্ডিত জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক নানাগ্রন্থ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে আমরা অনেক জ্যোতিষগ্রন্থ দেখিতে পাই যাহা আরবী ভাষা হইতে সংস্কৃতভাষায় অনূদিত হইয়াছে ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।

উপাঙ্গ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (১)পুরাণ, (২) ন্যায়, (৩) মীমাংসা ও (৪) ধর্ম্মশাস্ত্রকে চতুরুপাঙ্গ বলে, তাই প্রথমতঃ আমরা পুরাণ সমূহের বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

পুরাণ :—হিন্দুদিগের মধ্যে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে পুরাণ গ্রন্থগুলি মহর্ষি

বেদব্যাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং ইহারা সংখ্যায় আঠার খানি। এই পুরাণগুলিতে সৃষ্টির ক্রমানুসারে বংশ, মন্বন্তর, এবং সেই সেই সময়ের মনুষ্যদিগের চরিত্র, ইতিহাস প্রভৃতি লিখিত আছে। এই অষ্টাদশ পুরাণকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই পুরাণগুলির নাম এবং কোন্‌টী কোন্ বিভাগান্তর্গত তাহা নিম্নলিখিত শ্লোক কয়টী এবং চিত্র হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। যথা—
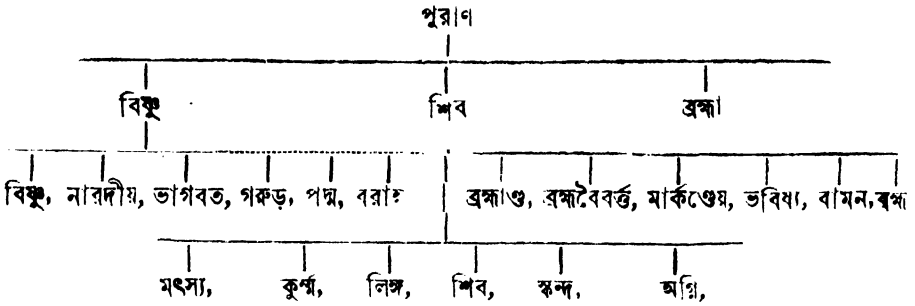
(কেহ কেহ শিবস্থলে বায়ুপুরাণের নামোল্লেখ করিয়া থাকেন)

"মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গম্ শৈবং স্কান্দং তথৈব চ।
আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধত ॥
বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে ॥
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ ॥
ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত ॥

অর্থাৎ মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ ও অগ্নি এই ছয় পুরাণকে তামস বলা হইয়া থাকে; বিষ্ণু, নারদ, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম, বরাহ, এই ছয় পুরাণকে সাত্ত্বিক বলা হইয়া থাকে এবং ইহারা মঙ্গলদায়ক; আর ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্ম এই ছয় খানিকে রাজস পুরাণ বলা হইয়া থাকে।

ইহার গুণাগুণসম্বন্ধেও উক্ত গ্রন্থেই লিখিত আছে——

"সাত্ত্বিকা মোক্ষদাঃ প্রোক্তা রাজসাঃ স্বর্গদাঃ শুভাঃ।
তথৈব তামাসা দেবি নিরয়প্রাপ্তিহেতবঃ ॥

অর্থাৎ হে দেবি! সাত্ত্বিক পুরাণগুলি মোক্ষপ্রদ, রাজসিকপুরাণগুলি স্বর্গ প্রদান করিয়া থাকে—ইহারা মঙ্গলদায়ক, এবং সেইরূপ তামসিক পুরাণগুলি নরকপ্রাপ্তির হেতু।

এই অষ্টাদশপুরাণের অতিরিক্ত আরও নানা পুরাণ আছে, তাহাদের মধ্যে আঠারখানি উপপুরাণ ব্যাসদেবের পিতা পরাশর প্রণয়ন করিয়াছেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। সনৎকুমার সংহিতা, নৃসিংহপুরাণ, নান্দিপুরাণ, শিবধর্ম্মোত্তর, দুর্ব্বাসস্ সংহিতা, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, মনুসংহিতা, উশনস্ সংহিতা, বরুণপুরাণ, কালীপুরাণ, বশিষ্ট সংহিতা, বসিষ্টকৃত লিঙ্গপুরাণ, মহেশ্বরপুরাণ, সাম্বপুরাণ, সূর্য্যপুরাণ, পরাশরসংহিতা, মরীচিপুরাণ ও ভৃগুসংহিতা প্রভৃতিকেই উপপুরাণ বলা

হইয়া থাকে। কেবল যে এই কয়েকখানিমাত্র পুরাণ এবং উপপুরাণ আছে তাহা নহে, এতদ্ভিন্ন শিব পুরাণ, কল্কিপুরাণ, দেবীভাগবত, বৃহন্নারদীয় প্রভৃতি আরও অসংখ্য পুরাণ আছে।

পুরাণগুলির বিষয়ে ইহাই প্রসিদ্ধ আছে যে মহর্ষি বেদব্যাস এবং তাঁহার পিতা পরাশর এইগুলি লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কোন কোন কারণবশতঃ এই প্রচলিত প্রবাদে সাধারণের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। প্রথমতঃ আজকাল যে সকল পুরাণগ্রন্থ দেখা যায় তাহাদের অধিকাংশের মধ্যেই পরস্পর এত ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় যে তদ্দ্বারা ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে যে একই ব্যক্তি বা কোন এক সম্প্রদায় বা পরিবারভুক্ত লোকের দ্বারা লিখিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ পুরাণসমূহ বিশেষভাবে আলোচনা করিলে এই সকল একসময়েই রচিত হইয়াছিল এরূপ মনে হয় না। তারপর কয়েকখানি পুরাণের সম্বন্ধে তাহারা পুরাণ কি উপপুরাণ, ব্যাসদেবরচিত না তাঁহার পিতা পরাশরদ্বারা রচিত ইত্যাদি বিষয়ে নানা সন্দেহ আছে।

এতদরিক্ত পুরাণগুলিতে এত প্রক্ষিপ্ত অংশ শেষে যোগ করা হইয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস যে সেগুলি মূল হইতে পৃথক্ করা বর্ত্তমানে একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন যে পরাশর এবং ব্যাসদেব-রচিত বাস্তবিক পুরাণগুলি বৌদ্ধ এবং ম্লেচ্ছদিগের সময়ে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং পরে পণ্ডিতগণ বৌদ্ধাদিধর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মণাদির ধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত কিছু অংশ নিজ নিজ স্মৃতি হইতে এবং কিছু কিছু কল্পনাদ্বারা সেইগুলি পুনরায় রচনা করিয়া গিয়াছেন, এবং এই হেতু ইহাদিগকে 'পুরাণ' নাম প্রচলিত করাও অসঙ্গত হয় নাই। কোন কোন জায়গায় যাহাতে সাধারণের হৃদয় ইহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় তজ্জন্য যথোচিত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনও প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক এই পুরাণগুলি বৈদিক ধর্ম্মের প্রায় অধিকাংশেই অনুকূল বলিয়া ইহাদিগকেও হিন্দুদিগের প্রামাণিকগ্রন্থ বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। তারপর যদিও আধুনিক পুরাণগুলির মধ্যে একখানাকেও ব্যাস বা পরাশরের লিখিত বলিয়া প্রমাণ করা যায় না, তথাপি যে এগুলি ঋষিকল্প বিদ্বান্ ও পণ্ডিতগণের দ্বারা লিখিত হইয়াছিল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আর আমাদের মনে হয় যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে যতটা অর্ব্বাচীন অর্থাৎ আধুনিক বলিয়া কল্পনা করেন, এই গ্রন্থগুলি তত বেশী আধুনিক নহে। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিবার সময় এই পুরাণগুলি হইতে যতটা সাহায্য পাওয়া যায় অন্য কোন গ্রন্থ হইতে তাদৃশ সাহায্য আমরা পাইতে পারি না। তারপর পুরাণের ঐতিহাসিক বিষয়গুলি অবিশ্বাস করিবারও কোন কারণ নাই, যেহেতু মৌর্য্যবংশ এবং উহার উত্তরাধিকারী ক্ষত্রিয় রাজবংশগুলির যেরূপ বংশাবলী পুরাণগুলিতে পাওয়া যায়, প্রায় ঠিক সেইরূপই শিলালিপি ইত্যাদি অন্যবিধ প্রামাণিকবস্তুদ্বারাও প্রমাণিত হয় ইহাই অনেকে বলিয়া থাকেন।

পুরাণগুলির মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও সমধিক প্রচলিত। ইহার দ্বাদশ স্কন্ধে যেখানে কলিযুগের ভাবী রাজগণের ও রাজ্যগুলির বর্ণনা আছে, সেখানে গুপ্তবংশের রাজগণের রাজ্য বর্ণনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উল্লেখ পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি

পুরাণগুলির রচনা গুপ্তদিগেরই একরূপ সমসাময়িক বলিয়া মনে করেন, অর্থাৎ এই যে চতুর্থ বা পঞ্চম বিক্রম শতাব্দীতে এই গ্রন্থগুলি রচিত হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করেন। হিন্দুগণ কিন্তু এই সমস্ত কল্পনার প্রতি একেবারেই শ্রদ্ধাবান নহেন এবং ইহাদের মূলে যে কোন সত্য নিহিত আছে তাহাই স্বীকার করেন না। বিভিন্ন পুরাণের বিরুদ্ধ মতগুলির সামঞ্জস্য করিতেই তাঁহারা সচেষ্ট; প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উপেক্ষা করিতে তাঁহারা একেবারে অসম্মত। শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্য পুরাণ, বায়ু পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ঐতিহাসিকগণের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

শিখ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)
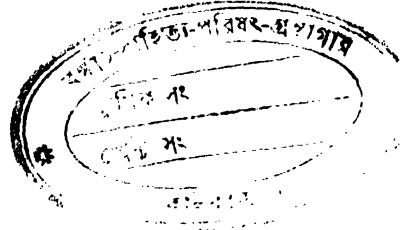
বর্ত্তমান শিখ জাগ্রতির ইতিহাস।

জীবনসংগ্রামের প্রশস্ততর পথের সন্ধানে বহু ভারতসন্তানই ভারতের বাহিরে ভাগ্যান্বেষণে গিয়াই দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকা, ফিজী প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছিল। ভারতের লোকের প্রয়োজন বোধ অল্প, তাহারা অল্পেই সন্তুষ্ট, পরিশ্রম করিতেও পারে বেশী, এই কারণে বাহিরের জগতে তাহারা অতি সহজে অর্থসঞ্চয় ও প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারিয়াছিল; একদিন তাহাদের সমাদরও ছিল যথেষ্ট, কারণ এত ভাল কুলি আর কোথাও মেলে না। কিন্তু পরাধীন জাতি কোনদিনই স্বাধীন জাতির নিকট প্রকৃত সম্মান লাভ করিতে পারে না; প্রবাসী ভারতবাসীগণও কুলির, কৃষ্ণাঙ্গের কর্ম্মপটুতার জন্য ভৃত্যের আদর পাইয়াছিল, কিন্তু কোনদিনই সমানের আদর পায় নাই। ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্রই পরাধীনের লাঞ্ছনা; ইহার হাত হইতে প্রবাসী ভারতবাসীগণও অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই।

শিখগণও অন্যান্য ভারতবাসীদের সহিত আমেরিকা ইত্যাদি স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; এই কর্ম্মপটু কুশল হিন্দুস্থানবাসীদের আগমনে তত্তৎদেশবাসী প্রথম প্রথম বিশেষ আপত্তি করে নাই, কিন্তু পরে যখন তাঁহারা দেখিল দিনের পর দিন ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং কর্ম্মপটুতার জন্য ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় শ্বেতাঙ্গগণ পরাজিত হইতেছে, তখন হইতেই ইহাদের প্রতি দেশবাসীর মন বিমুখ হইয়া উঠিতে লাগিল এবং ছলে বলে কৌশলে যে কোন উপায়েই হোক্ তাহারা প্রবাসী ভারতবাসীগণকে দেশ হইতে দূর করিতে কৃতবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করিতে লাগিল। কানাডায় বহু প্রবাসী শিখ

জীবন যাপন করিতেছিল, সুতরাং কানাডা গবর্ণমেণ্ট বিশেষ করিয়া ইহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। একই সাম্রাজ্যের নাগরিক এসব ভুয়া কথায় সেখানকার লোকে ভুলিল না। স্বার্থের দ্বন্দ্বে মনুষ্যত্ব যে কোথায় পড়িয়া থাকে, বিশেষ করিয়া যেখানে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায়ের স্বার্থের বিরোধ, তাহার নিদর্শন দক্ষিণ আফ্রিকার গান্ধীজীর কার্য্যকলাপে প্রত্যেক চিন্তাশীল ভারতবাসীর নিকট সুপরিচিত হইয়াছে।

এক্ষেত্রেও অনেকাংশে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরোধের পুনরভিনয় হইল। কানাডা গবর্ণমেণ্ট ১৯১০ সালে এমন কতগুলি আইন জারি করিলেন, যাহার ফলে মুখ্যতঃ ভারতবাসীর সে দেশ গমন নিষিদ্ধ হইল। তাঁহারা বলিলেন ঔপনিবেশিকের দেশ হইতে জাহাজ সোজা আসিয়া কানাডায় পৌছাইলেই তাহাকে কানাডায় ঢুকিতে দেওয়া হইবে, নতুবা নহে। ভারতবর্ষ হইতে কানাডা সোজা যায় এমন কোন জাহাজের ব্যবস্থা ছিল না।

ইহা ছাড়াও কানাডা গবর্ণমেণ্ট বহুবিবাহ, অসভ্যতা ইত্যাদির দোষারোপ করিয়া শিখদিগকে দেশে ঢুকিতে দিতেছিল না; এমন অনেক ক্ষেত্রে হইয়াছে যে দেশ হইতে হয়ত স্ত্রী পুত্র আসিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে কানাডায় ঢুকিতে দিল না।

প্রবাসী শিখগণ এ সকল ব্যাপার লইয়া নানা আন্দোলন করিয়াও কোন সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। স্বার্থপর গবর্ণমেণ্ট শিখগণের কোন যুক্তিই শুনিল না।

এদিকে ১৭ই অক্টোবর (১৯১৩) কয়েকজন শিখ কানাডায় পৌছিলে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের বহিস্করণের আদেশ দেন, কিন্তু তাহারা কানাডা হাইকোর্টে আপিল করিলে হাইকোর্ট এই বহিস্করণের আদেশ অন্যায় বলিয়া রদ্ করিয়া ১৯২০ সালের অর্ডিনেন্সও অন্যায় বলিয়া আদেশ দেন।

শিখগণ এই সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; যাহারা এতদিন এই অন্যায় আইনের বলে কানাডায় যাইতে পারে নাই, তাহারা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। বাবা গুরুদিৎ সিংহ নামক প্রবীণ ও শ্রদ্ধাভাজন শিখ এই উদ্দেশ্যে কোমাগাটা মারু নামক জাহাজ ভাড়া করিয়া কানাডার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন; পথে তাঁহাকে নানা বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল,।

এদিকে কানাডার গবর্ণমেণ্ট জেনারেল ১৯১০ সালের পূর্ব্বোক্ত অর্ডিনান্সেরই অনুরূপ—যাহা হাইকোর্টের বিচারে অন্যায় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল—এক আইন জারি করিলেন; শিখগণ দেশের ধর্ম্মাধিকরণের ন্যায়বিচারের পর নির্ভর করিয়া তাহাতে নিরস্ত হইল না।

২৩ শে মে কোমাগাটা মারু ভ্যাঙ্কুভরে পৌছিল; এইবার গোলমাল সুরু হইল। এমিগ্রেশনের কর্ম্মচারীগণ কোন যাত্রীকেই—এমন কি বাবা গুরুদিৎকে পর্য্যন্তও—কূলে অবতরণ করিতে দিল না। ফলে বাবা গুরুদিৎ সিংকে যথেষ্ট অর্থক্ষতি দিতে হইল। এদিকে জাহাজের খাদ্য নিঃশেষ হইয়া গেল, কিন্তু ইমিগ্রেসন কর্ম্মচারীগণ বাহিরের কাহাকেও কোন প্রকার সহায়তা দিতে দিল না; ইহারই উপর আবার পুলিস জাহাজকে বন্দর হইতে সরাইবার জন্য আক্রমন করিল। এই অবস্থায় বন্দর ত্যাগ করার অর্থ স্বাচ্ছাভাবে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লওয়া; সুতরাং জাহাজের যাত্রীরা কোন মতেই বন্দর ত্যাগ করিতে রাজী হইল না;

অবশেষে গবর্ণমেণ্ট যাত্রীদের খাদ্য দিয়া সশস্ত্র পুলিস আনিয়া তাহাদিগকে বন্দর ত্যাগ করিতে আদেশ দিল ! বাবা গুরুদিৎ সিং ও তীরস্থ শিখগণ বিলাতে ও ভারত সরকারে আবেদন করিয়াও এই অন্যায় যথেচ্ছাচারিতার কোন প্রতীকার লাভ করিতে পারিলেন না। এস্থলে অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাদিগকে ফিরিতে হইল।

২৭ শে সেপ্টেম্বর (১৯১৩) কলিকাতার নিকট বজ্‌বজে জাহাজ আসিয়া পৌছিল, ভারত সরকার ও পাঞ্জাব সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া বাঙ্গলার গবর্ণমেণ্ট ঠিক করিয়াছিলেন প্রত্যাগত শিখদের স্পেশল ট্রেনে ভর্ত্তি করিয়া তাহাদের দেশে পাঠাইয়া দিতে হইবে! জাহাজ পৌছিলে খানাতল্লাসী করা হইল, কোন অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া গেল না; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এই প্রস্তাবে ১৭ জন ব্যতীত আর কেহই সম্মত হইল না, তাহারা বলিল পাঞ্জাবে আমাদের আর কিছুই নাই: আমাদের কলিকাতায় ভাগ্যান্বেষণ করিতে হইবে; শিখগণ দল বাঁধিয়া গ্রন্থসাহেব মধ্যে রাখিয়া কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইল। তখন মিলিটারী সৈন্য আনিয়া তাহাদের ষ্টেশনে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করা হইল। সেইখানে এক বীভৎস দৃশ্যের অনুষ্ঠান হইল; ষ্টেশনে মারামারি ও গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে গুলি ছোঁড়ায় বহু লোক আহত মৃত ও আহত হইল; বাকি যাহারা ধরা পড়িল তাহাদের বন্দী করিয়া আনিয়া পাঞ্জাবের নানা জেলে অন্তরীণ করা হইল। বাবা গুরুদিৎ সিংকে গবর্ণমেণ্ট ধরিতে পারেন নাই। সাত বৎসর পরে তিনি গবর্ণমেণ্টের হস্তে আত্ম সমর্পণ করেন; কয়েক মাস কারাবাসের পর তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ১৯২২ সালে তিনি আবার ধৃত হন এবং বিচারে ৫ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'ন।

বজ্‌বজের এই ব্যাপারে সমস্ত দেশময়, বিশেষ করিয়া শিখ সমাজে, সাড়া পড়িয়া যায়। ইহার পরেই য়ুরোপীয় মহাসমরের শেষে সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া গণমন্ত্র ও সাম্যবাদের যে প্রবাহ জাগিয়া উঠিল, ভারতবর্ষেও তাহা সাড়া দিয়া গেল;

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মণ্টেগু শাসন সংস্কার দিয়া এই গণজাগরণের ক্ষুধা কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস পাইলেন। পাঞ্জাবে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন উপলক্ষে শিখ্‌গণের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইল; তাহারা অধিকসংখ্যক প্রতিনিধির দাবী করিতে লাগিল। দেশের জনসাধারণের এই ভাবে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক জাগরণের উন্মেষ হইল।

শিখগণের মধ্যে যাঁহারা চিন্তাশীল ছিলেন তাঁহারা নানাকারণে নিজদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছিলেন। কতকগুলি ব্যাপারে নিজদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্যই রাজনৈতিক সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ব্যাপারে ও শিখগণের ধর্ম্মসাধনপঞ্চকের অন্যতম কৃপাণ ব্যবহারের আন্দোলনে যখন গবর্ণমেণ্ট তাহাদের দাবী অতি সহজেই অস্বীকার করিল, তখন শিখগণ বুঝিল সঙ্ঘবদ্ধতার দাবীগুলি উপস্থিত না করিতে না পারিলে কোনদিনই সেগুলি স্বীকৃত হইবে না।

১৯১৯ সালের জালিয়ানবালাবাগের হত্যাকাণ্ডের ফলে এই ধারণা তাহাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইল এবং সেই বৎসর ডিসেম্বর মাসে অমৃতসর কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গেই শিখগণের প্রথম বিশিষ্টভাবে রাজনৈতিক অনুষ্ঠান, শিখলীগের প্রথম অধিবেশন হইল। অল্পকালমধ্যেই ইহার

শাখাপ্রশাখা দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল এবং শিখলীগ প্রভাবশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল।

১৯০২ সালের অক্টোবরে শিখলীগ মহাত্মাজী প্রবর্ত্তিত অসহযোগ প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিল।

এইভাবে শিখগণ ভারতের সাধারণ রাজনীতিক্ষেত্রে যোগ দিল। এই অসহযোগ প্রস্তাব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা নিজেদের নিজেদের ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান গুরুদ্বারগুলিকে পাপমুক্ত করিয়া আত্মশুদ্ধি করিবার পথ বাছিয়া লইয়াছিল। সুতরাং অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়াও তাহারা বিশেষভাবে এই গুরুদ্বার সংশোধন আন্দোলনে যোগ দিল।

নির্ভয় সিংহ

জড়

বিশ্বসাথে নিগূঢ় বন্ধন নাহি করি অনুভব,
নাহি হেরি যোগাযোগ তৃণ, পুষ্প, পথধূলি সনে।
চাঁদ উঠে, নদী ছুটে, পাখী করে মিষ্ট কলরব
নিয়ম-নিগড়ে বাঁধা, নহে মোর প্রীতির কারণে॥

উঠেছে ডুবেছে রবি যুগযুগ প্রতিদিন ধরি
মোর সুখে দৈন্যদুখে চিরদিন সমান উজল।
বরষা বসন্ত শীত আসে চক্র আবর্ত্তন করি
ব্যথিত ব্যথায় মম গতি কভু করেনি বিকল॥

শ্মশানে জ্বলিছে চিতা, প্রিয়দেহ ভস্ম হয় ধীরে,
আকাশে বাতাসে তবু কেন হয় সুন্দরের খেলা।
দেহমন ফেলে যবে নিদারুণ যন্ত্রণায় ঘিরে
নেহারি নিখিল বিশ্বে ক্রূর প্রকৃতির হাসমেলা॥

অথবা সে জড় চলে জড়ত্বের নিয়ম বন্ধনে,
মানুষেরেই মনে আছে সুখদুঃখ সুন্দরের বোধ।
বাঁধা পথে নিত্য ধায় হাস্যলাস্য বেদনা ক্রন্দনে,
মোরা ভাবি প্রকৃতির পরিহাস উপহাস ক্রোধ॥

আমরা কি জড় নহি, হাসি কাঁদি স্বভাব-অভ্যাসে
সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে প্রকৃতির নিয়মেতে চলি।
অচ্ছেদ্য নিয়মবদ্ধ জীবনের প্রতিটি নিশ্বাসে
প্রাণ কোথা? ভ্রান্তিবশে জড়েরে জীবন্ত মোরা বলি॥

প্রকৃতির নিয়ন্তা সে জড়মূক প্রকৃতি আপনি,
ঈশ্বরের খেলা ইহা অক্ষমের ভ্রমান্ধ কল্পনা।
কেহ জাগরূক নাই ন্যায়অন্যায় পাপপুণ্য গণি।
দণ্ডহাতে এতদিন বিশ্বে কেহ করেনি চালনা॥

আপনি চলেছে সৃষ্টি বীজ হতে হতেছে অঙ্কুর,
কদর্য্যতা বীভৎসতা পাপপুণ্য কোথা কিছু নাই।
অন্ধ কবি ভাবে শোনে কত মধু অন্তহীন সুর,
ধূলিরে ভাবেনা ধূলি, ভাবে ছাই নহে শুধু ছাই॥

আছে সুর উঠে তাহা নিখিলের গতির প্রবাহে
জন্ম আর মৃত্যু আছে এইমাত্র নিয়ম অনাদি।
প্রেমিক ধূলির সনে আপন যোগের গান গাহে,
অস্তিত্ব নাহিক যার, পায়ে তার চিত্ত রাখে বাঁধি॥

কভু কি দেখেছ তুমি আর্ত্ত যবে পীড়িত ধরণী
মানুষের হাহাকারে মেঘ হ'তে ঝরিয়াছে জল।
তোমার হৃদয়ে যবে উঠে বার্থ ক্রন্দনের ধ্বনি
থেমেছে কি ক্ষণতরে প্রকৃতির নিত্য কোলাহল॥

দেখেছ কখনো তুমি নীলাকাশ হয়েছে পাণ্ডুর
রৌদ্রতাপে দগ্ধ যবে শস্যভরা শ্যাম বসুন্ধরা।
রোগ যন্ত্রণায় রোগী শোনে কভু তারকার সুর,
ব্যথায় ব্যথিত হ'য়ে রজনী কি পলায় সত্বরা॥

প্রাণহীন জড়ে লয়ে কল্পনার নাহিক অবধি,
ছন্দ গান কবিত্বের প্রস্রবণ নিত্য উৎসারিত।
যে কাঁদে সে কাঁদে, আর যে হাসে সে হাসে নিরবধি,
জর্জ্জর যে বেদনায় সে হতেছে নিত্য জর্জ্জরিত॥

দুই মনুষ্যের মাঝে তিলমাত্র নাহি কোথা মিল,
স্বভাবের বশে দেখি রহে সবে নিত্য আত্মহারা

আমি ব্যথাতুর যবে হাসিতেছে অনন্ত নিখিল,
পূর্ণ যবে কণ্ঠ দেখি প্রকৃতি ঢালিছে সুধা ধারা ॥

হাসি পায় শুনি যবে মানুষের যন্ত্রণা বিলাপ,
অজানা শক্তির পায়ে জানায় করুণ অভিযোগ।
পীড়া যবে বাড়ে, হানে তারি নামে ব্যর্থ অভিশাপ,
তবু হায় নিত্য রহে একই ভাবে বেদনা বিয়োগ ॥

বৃক্ষলতা পশু পক্ষী তুমি আমি অনন্ত সংসার
নিয়ম নিগড়ে বাঁধা যুগ যুগ একই ভাবে চলি।
সাধ্য নাই পলমাত্র ভিন্ননীতি করিতে প্রচার
সাধ্য নাই ক্ষণতরে সে নিয়ম পায়ে যাই দলি ॥

বৈশাখ সংখ্যা হইতে পারিবারিক কৃষি ও গোপালন সম্বন্ধে 'কৃষি প্রবন্ধ' প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কৃষিতত্ত্ববিদ্ বাঙ্গালার লুথার বারব্যাঙ্ক শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর সিংহ মহাশয়ের মৌলিক গবেষণালব্ধ ফল ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে। জাতীয় জীবনের বিভিন্নক্ষেত্রে যাঁহারা কাজ করিতেছেন তাঁহারা নিজেদের সুবিধা-অসুবিধা, অভাব-অভিজ্ঞতা আমাদিগকে জানাইলে সুখী হইব।

নব্য ভারত

অতিরিক্ত পত্র

১ম খণ্ড] চৈত্র, ১৩৩১ [২য় সংখ্যা

আর্ল উইণ্টার্টন ও তুলার চাষ

বেশী দিন হয় নাই, ইংলণ্ড হইতে রয়টারের একটী তার আসিয়াছিল, সেই হইতে আমি উহা আমার 'রাইটিং-কেস'এ রাখিয়া দিয়াছি। প্রিষ্টনের বণিক সভার একটী ভোজে সহকারী ভারত সচীব, আর্ল উইণ্টার্টন ভারতের সহিত ইংলণ্ডের তুলার কারবার সম্বন্ধে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ল্যাঙ্কেশায়ারের তুলার কারবারের এই দুর্গে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে ইংলণ্ডের পক্ষে সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের তুলনায় ভারতের সহিত কাপড়ের বাণিজ্যের গুরুত্ব অনেক বেশী! ইহার পরে তিনি অন্যান্য কারবারে উন্নতির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইলেও ভারতের বাজারে বিলাতী কাপড় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাটিতেছেনা কেন এই গুরুতর সমস্যার বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি বলেন যে আমেরিকায় তুলার কমতি পড়ায় সূতার দর চড়িয়া গিয়াছিল, তাই আজ যুদ্ধের ছয় বৎসর পরেও সূতি কাপড়ের দর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ভারতের কৃষকই বিলাতী কাপড়ের সর্ব্বপ্রধান খরিদ্দার। তাহার জীবিকার মাপকাটী সামান্য। মূল্যাধিক্যের লাভটা সে পায় নাই বরং উহাতে তাহার অসুবিধাই যথেষ্ট হইয়াছে এবং ব্যয় সঙ্কোচের জন্য সর্ব্ব প্রথমেই উহাকে নিজের ও পরিবারের কাপড়ের বরাদ্দ কমাইতে হইয়াছে। কৃষক দাম পড়িবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দাম পড়িলেই সে আবার * ল্যাঙ্কেশায়ারের কাপড় কিনিতে আরম্ভ করিবে। ইহাই সহকারী ভারত সচীবের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও আশা।

আর্ল উইণ্টার্টন আরও বলিয়াছেন যে কাপড়ের দর স্বাভাবিক অবস্থায় নামিয়া আসিলেই ভারতবাসীরা যে আবার বিলাতী কাপড় পরিবে তাহার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকান তুলার রপ্তানী যে আবার বাড়িতেছে তাহা বড়ই আশার কথা। ল্যাঙ্কেশায়ারের বস্ত্রশিল্পের উন্নতির জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লম্বা আঁশ তুলার প্রয়োজন। ভারতবর্ষেও যে ইহার ব্যবস্থা হইতেছে তাহা বড়ই আনন্দের কথা। পূর্ব্ব আফ্রিকা ভবিষ্যতে

* ল্যাঙ্কেশায়ার বিলাতের একটী প্রদেশ। বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র

তুলার বাজারে প্রধান স্থান অধিকার করিবে; ভারতে যদি অধিক পরিমাণে দীর্ঘতন্তু কার্পাস উৎপন্ন হয় তাহা হইলে ভারত আর দীর্ঘতন্তু কার্পাসের জন্য পূর্ব্ব আফ্রিকায় ইংরাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিবে না, এবং যে বৎসর ভারতে ভালরূপে তুলা জন্মিবে সে বৎসর স্থানীয় অভাব মোচনের পরেও রপ্তানীর জন্য অধিক পরিমাণে তুলা থাকিয়া যাইবে।

এই বক্তৃতায় অনেক শিখিবার বিষয় আছে। ল্যাঙ্কেশায়ারের সুবিধার জন্য ভারতের মঙ্গল তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে বিসর্জ্জন দিতে পারেন, সুতরাং ভারতের করদাতাগণকে যে আর তাহার বেতন যোগাইতে হইতেছে না সেটা আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিতে পারি। ল্যাঙ্কেশায়ারের সুবিধাকে প্রথম স্থান দিবার চেষ্টাসূচক এইরূপ আর একটী বক্তৃতা খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত। এইরূপ প্রমাণ থাকিতে তাঁহাকে সহকারী ভারত সচিব আখ্যা না দিয়া ল্যাঙ্কেশায়ারের সহকারী সচিব আখ্যা দেওয়াই অধিকতর সঙ্গত।

বক্তৃতার আর একটী অসঙ্গতি এই যে ইহাতে অসহযোগ অথবা খদ্দর প্রচার চেষ্টার কোনই উল্লেখ নাই। তাঁহার মানসচক্ষে ইহার দূরতর একটা স্থান আছে বলিয়াও মনে হয় না। এবিষয়ে তাঁহার মন একেবারে ফাঁকা। ভারতীয় জীবনের সহিত সংস্পর্শ-শূন্য এইরূপ আর একজন ভারত সচিব পাওয়াও কঠিন।

এই বক্তৃতায় পূর্ব্ব আফ্রিকার উল্লেখের বিশেষ গুরুত্ব আছে। পূর্ব্ব আফ্রিকায় প্রতি বৎসর অধিক হইতে অধিকতর পরিমাণে দীর্ঘতন্তু কার্পাস উৎপন্ন হইতেছে। 'উচ্চভূমি', 'নির্ব্বাচনপ্রণালী', 'উপনিবেশ' স্থাপন ইত্যাদি সকল সমস্যার পেছনে প্রকৃত সমস্যা হইতেছে ভারতীয় ব্যবসায়ীগণকে জগতের বাজারে এই তুলার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা।* ভিক্টোরিয়া নিয়াঞ্জা হ্রদের উভয় পার্শ্ব, সুদূর দক্ষিণে সুদানে কিয়োগ হ্রদের চতুষ্পার্শ্ব, এবং আরও ভিতরে নীল নদের উভয় তীরে জগতের শ্রেষ্ঠ 'কৃষ্ণ কার্পাস মৃত্তিকা' পতিত রহিয়াছে। স্থানীয় তুলার উৎপাদন প্রতি বৎসরই প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। দূর দূরান্তর হইতে না আনিয়া যদি এই অঞ্চল হইতে দীর্ঘতন্তু কার্পাস আমদানী করা সম্ভবপর হয় তাহা হইলে ভারতীয় কলসমূহ অধিকতর সমানে সমানে ল্যাঙ্কেশায়ারের সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ হইবে। আমেরিকার বাড়তি § তুলা কমিয়া আসায় ল্যাঙ্কেশায়ারের ব্যবসায়ীগণ এই তুলা আয়ত্ত করিবার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করিতেছেন।

আর একটী কথার উল্লেখ করিতে বাকী রহিয়া গিয়াছে। ভারত সচিবের দপ্তর সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে ভারতের সহিত কোন উপনিবেশ অথবা খাস

---

* বহু প্রাচীন কালে, পাশ্চাত্য জাতীয়েরা জগতের সর্ব্বত্র উপনিবেশ স্থাপন প্রয়াসী হইবারও বহু পূর্ব্বে আফ্রিকার সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। কালক্রমে পূর্ব্ব আফ্রিকার কেনিয়া অঞ্চল জার্ম্মাণীর অধিকারে আসে। তখনও ভারতের ব্যবসায়ের অধিকার সেখানে অক্ষুণ্ন ছিল। যুদ্ধের সময় কেনিয়া ইংরেজের হাতে আসে, সেই হইতে নানা প্রকার অপবাদ দিয়া সেখান হইতে ভারতীয়দিগকে তাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে। এই চেষ্টার মূল কোথায় বর্ত্তমান প্রবন্ধেই পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন।

§ বাড়্তি—কোন দেশের আভ্যন্তরীণ সমুদয় অভাব মোচন করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহাকে বাড়্তি মাল বলে।

গ্রেট বৃটেনের কোনরূপ স্বার্থসংঘর্ষ উপস্থিত হইলে পরাধীন ভারতকেই স্বীয় বিসর্জ্জন দিতে হয়। এইচ, জি, ওয়েলস্ সাহেব স্বরচিত পুরাবৃত্ত-সারে কিঞ্চিৎ শ্লেষ-সহকারে জাতিসঙ্ঘের (তথাকথিত) সভ্যরূপে ভারতের উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যবস্থা ছিল স্বায়ত্বশাসিত না হইলে কোন জাতিই জাতিসঙ্ঘের প্রাথমিক সভ্য রূপে গণ্য হইতে পারিবে না। ওয়েলস্ সাহেব বলিতেছেন—"ভারতবর্ষ আত্মশাসিত রাষ্ট্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছে দেখা যাইতেছে!"—বিস্ময় বোধক চিহ্নটা অর্থ-পূর্ণ।

আমি ভারতীয়গণের জন্য সামান্য সামান্য অধিকার চাহিবার জন্য (যেমন ট্যাঙ্গানিয়াকার ভারতীয় সওদাগরগণকে গুজরাতী ভাষায় হিসাব রাখিবার অধিকার দেওয়া, ফিজি হইতে পোলট্যাক্স উঠাইয়া লওয়া ইত্যাদি) বহুবার ঔপনিবেশ দপ্তরে গিয়াছি, সর্ব্বত্রই দেখিয়াছি ভারতবর্ষের কথা উঠিলেই কর্ত্তৃপক্ষ একেবারে নাছোড়বান্দা হইয়া দাঁড়ান। অধিক কি, ভারত সচীবের দপ্তরও সম্পূর্ণ নিরাপত্তিতে পুনঃ পুনঃ আত্মসমর্পণ করিয়াছে। অতএব সহকারী ভারত সচীব হইয়াও যে আর্ল উইন্টার্টন ভারতের মঙ্গল অপেক্ষা ল্যাঙ্কশায়ারের মঙ্গল বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। অধীনতার ইহা মূল্য, আর এই অঙ্কুশাঘাতই আমাদিগকে স্বরাজের পথে অগ্রসর করিবে।

কঠিন সমস্যা ✓

(মো, ক, গান্ধী)

জনৈক অন্ধ্র পত্র-প্রেরক নিজের সমস্যা এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

গত সপ্তাহের ইয়ং ইণ্ডিয়ায় অস্পৃশ্যতা বিষয়ে জনৈক বঙ্গীয় পত্রপ্রেরকের পত্রের উত্তরে আপনি লিখিয়াছেন:—

"শূদ্রের স্পৃষ্ট জল গ্রহণ করিতে পারিলে অস্পৃশ্যদিগের জল গ্রহণ করিতেও 'আমাদের' ইতস্তত: করা উচিত নয়।" 'আমাদের' বলিতে আপনি অবশ্যই উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের কথাই বলিতেছেন। উত্তর ভারতে কিরূপ প্রথা প্রচলিত জানিনা, কিন্তু আপনি অবশ্যই অবগত আছেন যে অন্ধ্র এবং আরও দক্ষিণে ব্রাহ্মণেরা যে কেবল অব্রাহ্মণের হাত হইতে জল গ্রহণ করে না, শুধু তাই নয়, যারা একটু বেশী গোঁড়া উহারা অব্রাহ্মণের প্রতিও অস্পৃশ্য জাতিরই মত ব্যবহার করেন।

"আপনি প্রায়ই বলেন যে জাতিগত উৎকর্ষ সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা অপনোদনের অপরিহার্য্য উপায় স্বরূপে আন্তর্বর্ণ্য ভোজনের অনুমোদন আপনি করেন না। একস্থলে পণ্ডিত মালবীয়ের দৃষ্টান্ত দিয়া আপনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ

* ১।৩।২৫ তারিখের young Indiaর A Difficult Problem হইতে।

পণ্ডিতজী আপনার হাত হইতে জল অথবা অপর আহার্য্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেও আপনাকে তাচ্ছিল্য করিবার কোন উদ্দেশ্য যে উহার থাকিতে পারে এমন কথা আপনি বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। আমি স্বীকার করি এক্ষেত্রে ঘৃণার কোন কথা না থাকিতে পারে, কিন্তু আপনি কি জ্ঞাত আছেন যে অব্রাহ্মণ ১০০ গজ দূর হইতেও কোন খাদ্য দেখিতে পাইলে এদেশীয় ব্রাহ্মণেরা উহা গ্রহণ করেন না; স্পর্শ করা ত দূরের কথা! রাস্তায় শূদ্রের মুখে ২।১টী বাক্য উচ্চারিত হইলেই গোড়া ব্রাহ্মণেরা ক্রোধে আত্মহারা হইয়া আহার্য্য পরিত্যাগ করেন এবং সারাদিন উপবাসী থাকেন। এ যদি অবজ্ঞা না হয়, ইহার অপর কি অর্থ হইতে পারে? এক্ষেত্রে কি ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠতার ভাণ করেন না? এই সকল প্রশ্নের সুমীমাংসা আপনি করিয়া দিলে বাধিত হইব। আমি নিজেও একজন ব্রাহ্মণ যুবক, সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেই লিখিতেছি।"

অস্পৃশ্যতা বহুশির রাক্ষসের ন্যায়। ইহা একটী জাতীয়, নৈতিক, ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমস্যা। আন্তর্বর্ণ্য ভোজন একটা সামাজিক সমস্যা। প্রচলিত অস্পৃশ্যতায় যে স্বজাতীয়ের একটী অংশের প্রতি অবজ্ঞার ভাব রহিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। কর্কটিকা রোগের ন্যায় ইহা সমাজের জীবনীশক্তি ধ্বংস করিতেছে। ইহা মানুষের অধিকারের অস্বীকৃতি। ইহা আন্তর্বর্ণ্য ভোজনের সমশ্রেণীস্থ নহে। সমাজ সংস্কারকগণের প্রতি আমার নিবেদন উহারা যেন দুইটাতে খিচুড়ী পাকাইয়া না ফেলেন। যদি তা করেন তাহাতে ক্ষতিই হইবে। ব্রাহ্মণ পত্র প্রেরকের সমস্যাটা বাস্তব। রোগ যে কতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছে ইহাতে তাহা বোঝা যায়। ব্রাহ্মণ শব্দটী পুরাকালের ন্যায় চরম দীনতা, অনহঙ্কার, ত্যাগ, পবিত্রতা, সাহস, ক্ষমা, এবং প্রকৃত জ্ঞানের সমার্থক হওয়া উচিত। কিন্তু আজ এই পুণ্যভূমি ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের বিবাদে অভিশপ্ত হইয়াছে। অনেক স্থলেই দাবী না করিয়াও সেবার অধিকারে যে শ্রেষ্ঠতা ব্রাহ্মণ লাভ করিয়াছিলেন তাহা হারাইয়াছেন। যে শ্রেষ্ঠতার দাবী এখন ব্রাহ্মণের নাই, তাহা ফলাইবার প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়া ব্রাহ্মণ আজ ভারতের কোন কোন অংশে অব্রাহ্মণদিগের ঈর্ষা উৎপাদন করিয়াছেন। ভারতের এবং হিন্দুধর্ম্মের সৌভাগ্য যে পত্র প্রেরকের ন্যায় ব্রাহ্মণও দেশে আছেন, এবং এই চেষ্টার বিরুদ্ধে সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিয়া নিঃস্বার্থ অধ্যবসায়ের সহিত অব্রাহ্মণদিগের সেবা করিয়া নিজেদের ঐতিহ্যের* মান রক্ষা করিতেছেন। সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই ব্রাহ্মণেরাই শাস্ত্র হইতে প্রামাণ্য উদ্ধার করিয়া উহার সহায়তায় অস্পৃশ্যতা নিরাকরণে অগ্রণী হইয়া লড়িতেছেন। পত্র প্রেরক যে শ্রেণীর দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন, উহাদের প্রতি আমার নিবেদন উহারা কালের চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া মিথ্যা আভিজাত্যের গৌরব, এবং যে অন্ধসংস্কার অব্রাহ্মণের দর্শনে পাপস্পর্শ সম্ভাবনায় সঙ্কুচিত হয় অথবা বাক্য শ্রবণে খাদ্য দূষিত বিবেচনা করে,—সেই কুসংস্কারের প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করুন। ব্রাহ্মণেরাই জগৎকে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিতে শিখাইয়াছিলেন। অতএব বাহির হইতে কলুষিত হইবার আশঙ্কা কোথায়? পাপ আসে ভিতর হইতে। ব্রাহ্মণেরা

* ঐতিহ্য—tradition (বিজয়চন্দ্র মজুমদার)

পুনরায় জগৎকে শিক্ষা দিন যে অন্তরস্থ কুবৃত্তি সমূহই অস্পৃশ্য। 'মানুষ নিজেই নিজেকে কলুষিত করে, নিজেই নিজেকে বন্ধন করে, নিজেই নিজেকে মোচন করে', জগৎকে এই বাণী ব্রাহ্মণই দিয়াছিলেন।

অন্ধ্র পত্র প্রেরক যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে অব্রাহ্মণগণের বিচলিত হওয়া উচিৎ নহে। অন্ধ্র পত্রপ্রেরকের ন্যায় ব্রাহ্মণগণই পূর্ব্বের মতন তাহার হইয়া লড়িবেন। কয়েকজনের পাপের জন্য সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজকে ঘৃণা করিবার যে ক্রমবর্দ্ধমান প্রবণতা দেখা যাইতেছে, সেরূপ প্রবৃত্তি যেন উঁহাদের না হয়। অসদ্ব্যবহার করা যাহাদের স্বভাব তাহাদের নিকট সদ্ব্যবহারের দাবী না করিবার মত মহত্ব যেন তাহাদের থাকে। পথিক যদি আমাকে চিনিতে না পারে, আমার উপস্থিতি, সুস্পর্শ, অথবা স্বরে যদি নিজেকে কলুষিত বিবেচনা করে তাহাতে অপমান বোধ করিবার কোন কারণ নাই। তাহার আজ্ঞায় যদি আমি পথ হইতে সরিয়া না যাই অথবা তাহার শোনার ভয়ে যদি কথা বলা হইতে বিরত না হই উহাই যথেষ্ট। উহাদের অজ্ঞতাপ্রসূত শ্রেষ্ঠতার ভাণ অথবা অন্ধসংস্কার আমার কৃপার উদ্রেক করিতে পারে, কিন্তু ক্রুদ্ধ হওয়া, অথবা যে তাচ্ছিল্য নিজের প্রতি প্রযুক্ত হইলে আমি ক্ষুব্ধ হই উহাকে মাথা তুলিতে দেওয়া অনুচিত। সংযম হারাইলে উহাতে অব্রাহ্মণের ক্ষতিই হইবে। সংযমের সীমা অতিক্রম করিয়া যেন উহারা স্বপক্ষাবলম্বী ব্রাহ্মণদিগকে অপ্রস্তুত না করেন। ব্রাহ্মণেরা হিন্দুধর্ম্মের এবং মানবজাতির শ্রেষ্ঠ কুসুম স্বরূপ। আমি এমন কিছুই করিব না যাহাতে সে ফুল ঝরিয়া পড়ে। আমি জানি উহারা আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ সক্ষম। ইহার পূর্ব্বেও বহু ঝড় উহাদের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। অব্রাহ্মণের সম্বন্ধে একথা বলার অবসর যেন না হয় যে উহারা ইহার শোভা ও সৌরভ বিনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের ধ্বংসাবশেষের উপর যে অব্রাহ্মণের উন্নতির পত্তন হয় তাহা আমি কামনা করি না। ব্রাহ্মণেরা উন্নতির যে শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, উহারাও সেখানে উঠুন, এই আমার কামনা। ব্রাহ্মণের জন্ম হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য জন্মগত নহে। ইহা একটী গুণ, এবং ইহার চর্চ্চা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর লোকেরও আয়ত্তীভূত।

চয়ন

কোন কোন যায়গায় সুতা কাটিবার জন্য কলের পাঁজ ব্যবহার হইতেছে। ইহাতে সুতা কাটিবার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় সুতরাং কলের পাঁজে কাটা সুতা হাতেকাটা সুতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তুলা ধোনা ব্যবসায় এখনও এদেশ হইতে লুপ্ত হয় নাই, বরং সর্ব্বত্রই সুদক্ষ ধুনুরী পাওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বে এদেশের গৃহলক্ষ্মীগণ নিজেরাই নিজেদের তুলা ধুনিয়া লইতেন, আবার সে ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক কংগ্রেস কার্য্যালয়েই তুলা ধোনার, ও ধোনা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকা উচিৎ।

কংগ্রেস সংবাদ

অনেক জায়গায় কংগ্রেস কর্ম্মীগণের নিকট হইতে সুতার বদলে সুতার মূল্য লওয়া হইতেছে। কংগ্রেসের সভ্যগণকে আমি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে সুতার মূল্য লওয়ার প্রস্তাবও কংগ্রেসে আলোচিত হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। কংগ্রেসের হিসাব পত্রে কেবল সুতার রসিদই দেওয়া যাইতে পারে, টাকার রসিদ নহে। যাহারা সুতা কাটিতে ইচ্ছা করেন না উহারা সুতা কিনিয়াও পাঠাইতে পারেন, কিন্তু কংগ্রেসের সকল সভ্যেরই চেষ্টা রাখা উচিত যাহাতে সকল সভ্যই সুতা কাটেন। অতএব চাঁদা হিসাবে গৃহীত সমুদয় অর্থ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সমূহে ফিরাইয়া দেওয়া উচিৎ। যাহারা সুতা কিনিতে ইচ্ছা করেন উহাদের বাজার হইতে সুতা কিনিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এই দিকে লক্ষ্য না রাখিলে নূতন ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিবার চেষ্টা করিয়াছি এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। যদি সভ্যেরা বাহিরের উৎসাহের অপেক্ষা না রাখিয়া কেবল সভ্য হইবার গৌরবের জন্যই সুতা কাটেন তাহা হইলে সভ্য সংখ্যা কয়েক শত মাত্র হইলেও ক্ষতি দেখিনা। টাকার পরিবর্ত্তে সুতা দেওয়ায় কাহারও আপত্তি থাকিলে এ বিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটীর নির্দ্ধারণ চাহিবার সম্পূর্ণ অধিকার সভ্যগণের আছে।

বোম্বাইয়ে শুনিতে পাইলাম অনেক সভ্য সম্পূর্ণ ভাবে খদ্দর পরিহিত না হইয়াও কংগ্রেসের আলোচনাদিতে যোগদিবার জন্য জেদ করেন। আমার মতে ইহারা কংগ্রেসের সভ্য গণ্য হইতে পারেন না, এবং হাতে কাটা ও হাতে বোনা কাপড় পরিধান না করা পর্য্যন্ত ভোট দিতে ত পারেনইনা, কোন আলোচনায়ও যোগ দিতে পারেন না।

আহামদাবাদের প্রস্তাবানুযায়ী গত ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ৭ মাসে খাদি বোর্ডে সর্ব্বশুদ্ধ ৬৮৯৩ পাউণ্ড বা ৮৪/২ সের সুতা পাওয়া গিয়াছে। মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ১০৬০২ জন সভ্য সংগৃহীত হইয়াছেন। ৫৩১৮ জন প্রথম শ্রেণীর, অর্থাৎ নিজে সুতা কাটেন। ইহার মধ্যে গুজরাট হইতে ২১৯৬, যুক্তপ্রদেশ হইতে ১৩৩৬ এবং বাঙ্গালা হইতে ১২১৬। (বাংলার ১৩১৬ জনের মধ্যে মাত্র ২৫৪ জন নিজে সুতা কাটেন, অর্থাৎ প্রতি জেলায় গড়ে ১০ জনও নিজেসুতা কাটেনণা, পক্ষান্তরে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র গুজরাট ২১৯৬ জনের মধ্যে ২০৯৫ জনই নিজে সুতা কাটেন।—অনুবাদক)

শ্রীযুক্ত রেবাসঙ্করের ঘোষিত পুরস্কার লাভের জন্য কয়েকজন যুবক আন্তরিক চেষ্টা করিতেছেন। কতকগুলি রচনা সুন্দর হইয়াছে। প্রতিযোগি শুনিয়া সুখী হইবেন শ্রীযুক্ত অম্বালাল সারাভাই পরীক্ষক সভায় যোগ দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এ বিষয়ে ক্রমবর্দ্ধমান সাহিত্যের পুষ্টির জন্য উপযুক্ত রচনার অভাব হইবে না আশা করিতেছি।

কোন কোন সভ্য সূতা কাটার এত অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছেন যে উঁহারা ব্যক্তিগত ব্যবহারের কাপড় বুনাইবার জন্য নিজেদের সূতা কিনিয়া লইতে ইচ্ছুক! লোকে অবসর কালে নিজের পরিধেয় বসনের উপযোগী সূতা কাটিবে ইহাই আদর্শ, এবং বস্ত্র বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হইবার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পন্থা। অতএব ক্রীত সূতা পুনরায় চাঁদা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করিবেন না এই সর্ত্তে কাটুনীগণকে নিজের কাটা সূতা ক্রয় করিতে উৎসাহ দেওয়াই আমার পরামর্শ।

২২শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি ১০টায় সিন্ধুপ্রদেশের সক্কর সহরের কেন্দ্রস্থলে থানার নিকটে একটী ভারতীয় ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়। ডাকাতদের কেহ ধরা না পড়ায় মহাজনগণ শঙ্কিত চিত্তে অবস্থান করিতেছেন এই মর্ম্মে তার পাইয়া মহাত্মাজী লিখিতেছেন——

"এই তারের উদ্দেশ্য অবশ্যই সাধারণের সহানুভূতির উদ্রেক, এবং জগতে সর্ব্বাপেক্ষা ব্যয়শীল হইয়াও যে সরকার সাধারণের সম্পত্তি ও জীবন রক্ষার অপারগ উহার সমালোচনা।

আত্মরক্ষার অধিকার ও স্বরাজ

সাধারণের সহানুভূতি সক্করবাসীগণ পাইবেন, সরকারের কড়া সমালোচনার অভাবও হইবেনা, কিন্তু ইহা অপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন এই যে ডাকাতেরা যখন আসিল মহাজনেরা তখন কি করিতেছিলেন। তারে দেখা যায় উঁহারা অল্লাধিক কৃত-কার্য্যতার সহিত আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইলে আত্মরক্ষা চেষ্টার সীমানির্দ্দেশ করা চলে না। লুষ্ঠিতের নিরুপায় ক্রন্দন যখন আমার কর্ণগোচর হয়, তখন সরকারের অক্ষমতা অপেক্ষা লুষ্ঠিতের দুর্ব্বলতার কথাই আমার বেশি মনে পড়ে। আইনে আত্মরক্ষার অধিকার দিয়াছে। আত্মরক্ষার সাহায্যেই লোকের মর্য্যাদা রক্ষা হয়। লোকে যদি সর্ব্বত্রই আত্মরক্ষা, মানরক্ষা এবং সম্পত্তি রক্ষার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের মুখের দিকে চাহিয়া না থাকিয়া নিজেদের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা করে তাহাতেই আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষালাভ হইবে।

শ্রীহট্টের রাজনৈতিক অবস্থা বিবৃত করিয়া মহাত্মাজীকে আহ্বান করায় মহাত্মাজী লিখিতেছেন :—

"শ্রীহট্টের অতীত কার্য্যাবলীর ইতিহাস উজ্জ্বল সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন জাতি শুধু তাহার অতীত কাহিনী লইয়া বাঁচিতে পারে না। গৌরবময় অতীত বর্ত্তমানের প্রেরণা হওয়া

শ্রীহট্টের আর্ত্তনাদ

উচিত, কিন্তু শুধু বর্ত্তমানের কার্য্যই ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। সুতরাং গঠনমূলক কার্য্যে নিজেদের অংশ সাফল্যমণ্ডিত করিতে শ্রীহট্টবাসীর উদ্বুদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য। কারাবাস দেশের সর্ব্বত্র জনসাধারণকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়াছে ইহা বড়ই শোচনীয় কথা। আমরা যদি নির্য্যাতন সহনের গূঢ়তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতাম তাহা হইলে নির্য্যাতন আমাদিগকে এই প্রকার অবসাদগ্রস্ত না করিয়া অধিকতর উৎসাহ আনিয়া

দিত। শ্রীহট্ট হইতে যে তুলা রপ্তানী হয় তাহার কিয়দংশ রক্ষা করা, তাঁতীদিগকে হাতেকাটা সুতার কাপড় বুনিতে প্ররোচিত করা, এবং জিলাজাত চরকার সুতা তাহাদিগকে সরবরাহ করা শ্রীহট্টবাসীর ক্ষমতার বহির্ভূত হওয়া উচিত নয়। শ্রীহট্টবাসী যখন এই কার্য্যগুলি করিতে পারিবেন তখনই তাহারা আমাকে তাহাদের জিলাতে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতে অধিকারী হইবেন—তৎপূর্ব্বে নহে।*

অনেক জেলারই অবস্থা শ্রীহট্টের মত হইতে পারে এই বিবেচনায় উপরের মন্তব্যটি উদ্ধৃত হইয়াছে। নিম্নে ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মিলনীকে উপলক্ষ্য করিয়া মহাত্মাজী যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত হইল। আশা—মহাত্মাজীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদনের চেষ্টায় কালহরণ না করিয়া আমরা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব। যে শ্রদ্ধা কর্ম্মে আত্মপ্রকাশ করে না তাহা বন্ধ্যানারীর মতই দুর্ভাগিনী

ফরিদপুর সম্মিলনী ও মহাত্মা

দেশের সর্ব্বত্র হইতে যে আহ্বান আসিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া মহাত্মাজী বলিতেছেন :—

'সর্ব্বত্র যাইবার ইচ্ছাই আমার আছে, কিন্তু একই সময়ে সর্ব্বত্র যাওয়া সম্ভবপর নয়, সুতরাং কোন বিশেষ সময়ে কোথায় আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাজে লাগিতে পারিব তাহাই আমাকে বিবেচনা করিতে হইবে। আমি বেশ অনুভব করিতেছি আমার স্থান এখন ভাইকমের বীর্য্যবান সত্যাগ্রহীদলের মধ্যে। * * * আমি সত্যাগ্রহীদের কিছু কাজে লাগিতে পারি, কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে আমার যাওয়া কেবল লোক দেখানর জন্য। এটা আমি বেশ অনুভব করিতে পারি। উহাদের প্রতি আমার ব্যবস্থা নিতান্ত সাধারণ। স্থানীয় বিবাদ বিসম্বাদ হিন্দুমুসলমান অথবা ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের মধ্যেই হউক, উহার মীমাংসা করিয়া ফেল, যত পার সুতা কাট, সকল সময়ই খদ্দর ব্যবহার কর, কংগ্রেসের জন্য যতটা সম্ভব 'স্বয়ং সুতাকাটা' সভ্য সংগ্রহ কর, যাহারা নিজেরা সুতা কাটিবেন না কিন্তু অপরকে দিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সুতা কাটাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন উহাদিগকেও যোগ করিয়া লও, নিজের জিলা অথবা প্রদেশের অন্ত্যজ জাতিগণকে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা কর, নিজেদের কর্ম্মস্থল হইতে অহিফেন ও মদ্যের প্রচলন দূর কর, তারপরে অধিকতর চেষ্টার জন্য আমাকে আহ্বান করিও। যদি আগামী বৎসরে আমরা নূতন আশার যুগের সূচনা দেখিতে চাই তাহা হইলে সরকার কি করেন বা না করেন তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বাঙ্গালার ordinance স্বত্ত্বেও আমাদের সমগ্রশক্তি জাতীয় গঠনমূলক কার্য্যে নিয়োগ করিতে হইবে। অর্ডিন্যান্স যদি আমাদিগকে রদ করিতে হয় তজ্জন্য আমাদিগকে উপযুক্ত বলসঞ্চয় করিতে হইবে। সমগ্র শক্তির সহিত গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করাকেই আমি উহার একমাত্র উপায় বলিয়া জানি। §

* এই অনুবাদ ৩রা চৈত্রের জনশক্তি হইতে গৃহীত।

§ স্থানাভাবে এই দুইমাসে এই অংশের জন্য এক ফর্ম্মার অধিক দেওয়া সম্ভবপর হইল না। বৈশাখ হইতে যাহাতে কার্পণ্যের জন্য কোন লেখা বাদ দেওয়া হইবে না। অনুবাদক।